আমি তোমাদেরই লোক

সমরেশ বসু

ই

আমি তোমাদেরই লোক

সমরেশ বসু

জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স
৫৩/১বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা

প্রচ্ছদপট : বিমল দাস

অলঙ্করণ : পার্থসারথী মণ্ডল

প্রকাশক : শান্তনু ভাণ্ডারী

মুদ্রাকর : জগদ্ধাত্রী প্রিণ্টার্স, ৫৯/২, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯
সহযোগিতায় : নারায়ণ প্রেস ও সেঞ্চুরী প্রেস

সূচীপত্র

ভূমিকা

'সবার রঙে রঙ মেশাতে' চাইলেও সকল স্তরের মানুষের সঙ্গে কবি যে একাত্ম হতে পারেন নি, তাঁর জীবনযাত্রার বেড়াগুলি যে বাধা হয়ে ছিল, তিনি যে সর্বত্র প্রবেশের দ্বার পান নি, জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে তাঁর এই 'স্বতন্ত্র অবস্থানের বেদনা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে আলোড়িত করে। ধর্ম, শিক্ষা, ঐতিহ্য, পারিবারিক অবস্থান এবং বিশ্ব-ভারতীর ভাণ্ডারে নিরন্তর টানাপোড়েন চলা সত্ত্বেও বিত্তগতভাবে রবীন্দ্রনাথ কখনই সেই শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সমপর্যায়ে আসতে পারেন নি, মূলত যাদের জন্য তাঁর চিন্তা আগ্রহ ঔৎসুক্য ও কৌতূহল এবং, সর্বোপরি, সুনিবিড় ভালবাসা সমস্ত সংশয়ের অতীত। তাঁর অভিজ্ঞতার সীমানা নির্ধারিত থাকায় তিনি সমাজের অবহেলিত মানুষদের ঘরে প্রবেশ করতে পারেন নি কিন্তু তাদের প্রাঙ্গণে তিনি উপস্থিত হতে চেয়েছেন। শ্রেণী-গতভাবে তাঁর গল্প-উপন্যাস মূলত মধ্যবিত্তনির্ভর এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিন্যাসের সূত্রেই তাঁর উপন্যাস ও ছোটগল্পের সীমানা নির্ধারণ করা চলে। তা ছাড়া, তাঁর ব্রাত্য দেশবাসীর প্রধানতম সাংস্কৃতিক প্রতিনিধির চেতনার সঙ্গে ওদের কোন যোগসূত্র ছিল না, নিরক্ষতার কৃষ্ণ ঘেরাটোপে ওরা ছিল আদ্যন্ত আবৃত। রবীন্দ্রনাথ তা জানতেন কিন্তু এক শ্রেণীর মানুষের প্রবল বিষোদ্গারে বিক্ষত কবিকে আপন সত্য পরিচয় দিতে গিয়ে পতিত ও অবমানিত মানুষের পঙক্তিতে দাঁড়াতে হল; খ্যাতির মোহ ও সম্মানের মাদকতার পরিবর্তে তিনি মানব-ইতিহাসে তাদেরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে থাকতে চাইলেন যারা পতিত, শোষিত, পদদলিত।

প্রয়াণের প্রান্তে পৌঁছে ১৯৪১ সালের ২১ জানুয়ারি সকালে উদয়নের বারান্দায় বসে কবি যেন তাঁর অকপট জবানবন্দী রচনা করলেন। সেই সরল সত্যভাষণে তিনি জানিয়ে গেলেন তাঁর অপূর্ণতার কথা, সীমাবদ্ধতার কথা। তিনি জানালেন :

> 'কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
> কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
> যে আছে মাটির কাছাকাছি,
> সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি।'

তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন, সাহিত্যের আনন্দের ভোজে তিনি নিজে যা পরিবেশন করতে পারেন নি, বঞ্চিত মানুষের জীবনের সেই সত্যস্বরূপ আবিষ্কারে তিনি ক্লান্তিহীন। সার্থক রূপকারকে তিনি জীবন থেকে পাঠ নেওয়ার উপদেশ দিয়েছেন, পরিপার্শ্ব থেকে সম্ভবত তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল, ভঙ্গীসর্বস্বতা পাঠককে বিভ্রান্ত করতে পারে, সাহিত্যের খ্যাতি চুরি করার সহজ সড়ক দিয়ে অনেকে 'শৌখিন মজদুরি' করেও অনেক মূল্য পায়।

সেদিন, সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রভাতে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'অখ্যাতজনের নির্বাক মনের' কবিকে মর্মের বেদনা উদ্ধার করতে আবাহন জানিয়েছিলেন তখন চব্বিশ পরগণার উত্তর শহরতলীর শিল্পাঞ্চলে একজন সতেরো বছরের তরুণ নিজেকে প্রস্তুত করছিল হাতে-লেখা পত্রিকায় গল্প লিখে বা ছবি এঁকে এবং সবচেয়ে যা তাৎপর্যপূর্ণ, তা হল, জীবনের পাঠ নিয়ে। এই কিশোরের চালচলন যাবতীয় প্রথাবহির্ভূত—সে মিশুকে কিন্তু নিঃসঙ্গ, বৈদ্যালয়িক চৌহদ্দিতে ক্লান্তিবোধ করে কিন্তু সাহিত্য-সংগীত-চিত্রকলায় তার বিস্ময়কর

অভিনিবেশ, যারা তার অন্তরঙ্গ তাদের কাছ থেকে মানসিক দিক থেকে সহজে [illegible] তার অবস্থান, স্থানীয় এলাকায় সে প্রায় নির্বিঘ্ন তরুণের সম্মান ও ঘৃণা পায়, কোন তরুণী তার মন ছুঁয়ে গেলে সে উদাসীন থাকে না অথচ তরুণীদের প্রতি অসম্ভ্রম আচরণ করলে সে ওই আচরণকারীকে প্রায় আততায়ীর শাস্তি দেয়। এরই মধ্যে অর্থাৎ রবীন্দ্র-নাথের ওই আকুল আমন্ত্রণের মুহূর্তে এই কিশোর বস্তুতপক্ষে সংসারতাড়িত ও ভাগ্য-বিড়ম্বিত, যে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে শুরু করেছিল এবং তার অভিভাবকেরা দুই বাংলার স্বতন্ত্র পরিবেশেও তাকে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল ছবি দেখাতে পারেন নি।

রবীন্দ্রনাথের আকুল আর্তির মাত্র সাড়ে পাঁচ বছরের ব্যবধানে, ১৯৪৬ সালের শারদ সংকলনে 'পরিচয়'-এর পাতায় আত্মপ্রকাশ ঘটল এই অখ্যাত তরুণের 'আদাব' নামে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে লেখা ভিত-কাঁপানো গল্প। নারাইনগঞ্জের সুতাকলের হিন্দু শ্রমিক ও বুড়িগঙ্গার সুবইডার না'য়ের জনৈক মুসলমান মাঝির পারস্পরিক সাক্ষাৎ, সন্দেহ, প্রত্যয় ও পারস্পরিক সম্প্রীতির পরিপ্রেক্ষিতে শাসকশ্রেণীর স্বার্থে ও উসকানিতে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয় সেই সরল সত্যের অকপট ঘোষণা এই গল্পটি। লেখকের নাম সমরেশ বসু। কে এই সমরেশ বসু? রাজনীতির মিশেল থাকলেও সাহিত্য ও সংস্কৃতির যে মুখপত্রটি তখন বামপন্থী বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে সম্মানিত আশ্রয়স্থল, সেখানে নিতান্ত আকস্মিকভাবে নৈহাটির শিল্পাঞ্চল থেকে বাইশ বছরের এক তরুণ কিভাবে নিজের স্থান করে নিলেন—সেদিন সেই প্রশ্নে আলোড়িত হয়ে গেল সংস্কৃতিমনস্ক সচেতন পাঠকেরা। লেখকের পক্ষে অতঃপর আত্মগোপন করে থাকা সম্ভবপর হয় নি, তখন থেকেই তাঁর অভিযান শুরু হয়ে যায় এবং আজ, এই আশির দশকের মধ্যপ্রান্তে পোঁছেও, এই ক্লান্তিহীন অভিযাত্রী জীবনের রহস্যসন্ধানে কি এক গভীর তাড়না অনুভব করেন যা তাঁকে স্বস্তি দেয় না, যা তাঁর আপন বৃত্তের বাইরে তাঁকে ছাড়িয়ে নিয়ে যায়, জগৎ ও জীবনের অনাবিষ্কৃত রহস্যের অনুসন্ধানে তাঁকে নিয়ত অনুপ্রাণিত করে।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে পোঁছতে পারেন নি বলে আক্ষেপ করেছেন, সমরেশ সেখান থেকে উঠে এসেছেন। 'আদাব'-এর কাল থেকে সুদীর্ঘ চারটি দশক এই পশ্চিম বাংলার জীর্ণ জীবনের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে আছেন। সরকার পালটায়, বিভিন্ন খাতে স্বপ্নপ্রতিম পরিকল্পনা রচিত হয়, সরকারী পরিসংখ্যানে দেখানো হয় মাথাপিছু আয়বৃদ্ধির আশাব্যঞ্জক চিত্র, কয়েকটি বিশাল প্রকল্প রচনা করে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশ থেকে বৃহৎশক্তিতে উন্নীত হতে চলেছি তা-ও প্রচুর ঢক্কানিনাদ সহকারে প্রচার মাধ্যমগুলি অবিরত আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু বেকার সমস্যার প্রশ্নে ভারতবর্ষের এই অন্যতম ক্ষুদ্র রাজ্যটি প্রথমতম স্থানে রয়েছে, সাক্ষর ব্যক্তির চেয়ে নিরক্ষর লোকের সংখ্যা বেশি, লক্ষ লক্ষ ভূমিহীন ক্ষেতমজুর ও অসংগঠিত শ্রমিকের বর্তমান অন্ধকার ও ভবিষ্যৎ মৃত্যুকল্প, এমন কি, এই রাজ্যের বৃহত্তম পাটশিল্পের সংগঠিত শ্রমিকরা প্রতি মুহূর্তে ছাঁটাইয়ের ভয়ে সন্ত্রস্ত, ইত্যাকার নানাবিধ গোলমেলে ডামাডোলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি-অর্থনীতি চলছে, শোষণ-লুণ্ঠন-অত্যাচার অব্যাহত এবং এই কালো মেঘের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সমরেশ সূর্যবন্দনা করতে কোন আগ্রহবোধ করেন নি। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু বিচিত্র এবং অবশ্যই বিস্ময়কর, প্রায় দুই শতাধিক গল্পের মধ্যে ভাবরূপের সাদৃশ্য নেই একটির। [illegible]

[illegible]। কিন্তু তাঁর এই সুনির্বাচিত গল্পমালার মধ্যে সুস্পষ্ট একটি সত্যসূত্র নির্ণয় করা চলে—সেটি হল, চরিত্রগত উপাদানের প্রশ্নে এই গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যের মধ্যবিত্ত-নির্ভর প্রথা ভেঙে সমাজের যে স্তর থেকে আহৃত হয়েছে, নিচুতলার সেই বিশাল অনাবিষ্কৃত জগৎ এতদিন আমাদের কাছে কয়েকটি বিরল ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় অপরিচিতই ছিল। বন্য আদিম অসংস্কৃত এবং বিত্তহীন নরনারীদের জীবন সংগ্রাম নিয়ে পরিমাণগতভাবে এতগুলি উৎকৃষ্ট গল্পের লেখক বাংলা সাহিত্য জগতে যে একমাত্র সমরেশ বসুই, বর্তমান গ্রন্থে তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রয়েছে।

সমরেশের অধিকাংশ গল্পের প্রসঙ্গ, বাঁচার লড়াই। না, সুখে শান্তিতে সমৃদ্ধিতে নয়, নিছক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার নিয়ত সংগ্রামে যাদের জীবন কাটে, সমরেশ তাদেরই লোক, তাঁর সমাজসচেতনতা ও শিল্পভাবনা তাদেরই নিয়ে। জীবনের এই যুদ্ধের টানাপোড়েনে মানুষগুলো ভুলে যায়, তারাও একদিন মানুষ ছিল। কখন কোন্ আবিলতা, কোন্ অসম্মাননা, কোন্ অস্বীকৃতি ওদের পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনে ওরা তা ভাবতেও পারে না। 'সোনাটারবাবু' গল্পে পুরসভার এ্যাসিস্ট্যান্ট স্যানিটারি ইনস্পেক্টর বিষ্ণুপদ সাত সন্তানের জনক, অষ্টম সন্তান তার স্ত্রীর গর্ভে। প্রচণ্ড গরমের মধ্যে, সারাদিন মাঠে-ঘাটে সে তার সাগরেদকে নিয়ে বেওয়ারিশ কুকুর-নিধন-পর্ব চালিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত বিষ্টুপদ এমন এক কুকুরীকে মারতে উপক্রম করল যার স্তনবৃন্তে মুখ দিয়ে স্তন্যপান করছে একগাদা বাচ্চা কুকুর। কুকুরীটাকে মারা হয় না, অথবা মারা যায় না, কারণ সেটি তখন বিষ্টুপদর চোখে শিবি, তার সন্তানের জননী। 'আইন নেই' গল্পের কুঁচলালও বাঁদরী মারতে পারে নি ওই একই কারণে, যদিও মহাজনের হাত থেকে উদ্ধার করা খুবই জরুরী ছিল তার চাষের জমিটা। কুঁচলাল হেরে গেছে, বিষ্টুপদ পরদিন আবার কুকুর নিধনে বেরোবে। তবু এরা কেউ লড়াই থেকে পিছিয়ে আসে নি, আসবে না, আসতে পারে না। এই সমাজে লক্ষ লক্ষ মানুষকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং তারপরেও রাত্রির কৃষ্ণ যবনিকা যখন সুন্দর পৃথিবীকে ঢেকে দেয়, তখনও নিছক বেঁচে-থাকার প্রয়োজনে অবিরত লড়াই চালিয়ে যেতে হয়—ক্ষেতে-খামারে, কলে-কারখানায়, সমাজের বিভিন্ন সীমানায়। 'লড়াই' গল্পে সমরেশ বিদ্রূপ করে বলেছেন, 'মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন। মানুষকে ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়েছেন উনি। তাদের লড়ে বাঁচতে বলেছেন।' অতএব, লড়াই অবধারিত। সাঁইমারার চর বন্যার প্লাবনে প্লাবিত হলেও মাছমারা সম্প্রদায়ের জনৈক কিশোরকে মাছ ধরতে গিয়ে প্যাঙাস মাছের কাঁটার আঘাতে জীবন দিতে হয়, তার বাবা জাল নৌকো চুরি করে মাছ ধরতে গিয়ে মরে। অবশ্য, যে দেড়মণ ওজনের প্যাঙাস মাছটার কাঁটার আঘাতে ছেলেটি মরে গেল সেটি কিন্তু ওর বাবার মহাজন গঞ্জের হাটে এনে বিক্রী করে ঋণের কিছু টাকা উশুল করেছে।

সমরেশ গল্পের উপকরণ খোঁজেন সংগ্রামী মানুষের মধ্যে, কিন্তু সেই সংগ্রামী মানুষটি কোন দিনই পাদপ্রদীপের সামনে এসে বিজয়ীর বেশে দাঁড়িয়ে করতালির শব্দ শোনেন না। সেই চরিত্রগুলো প্রায়শই পাঠকের অস্বস্তির কারণ হয়, যে সামাজিক অত্যাচার ও অর্থনৈতিক শোষণে তারা পর্যুদস্ত সেই কদর্য সামাজিক বাতাবরণে আমরা উদাসীন হয়ে পিঠ ফিরিয়ে আছি। 'ও আপনার কাছে গেচে' গল্পে লেখক দেখিয়েছেন, বন্যার ভেসে-যাওয়া নির্মলাদের পরিবার মৃত্যু, দুর্দশা, অসহায়তা

এবং ইজ্জত বাঁচানোর নিরন্তর সংগ্রামের মধ্যে কি গভীর বিপন্নতাবোধ—নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে। এই গল্পটি লিখতে বসে সমরেশ স্বীকার করেছেন, কিভাবে একটা উপলব্ধি তাঁর গল্পের উপকরণ হয়ে ওঠে। 'গল্প তো আর হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না। আমার মস্তিষ্কটা তেমন জলে ভেজা উর্বর না, বারো মাস যেখানে ব্যাঙের ছাতার মত গল্প গজায়। ঘরে বাইরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আর চরিত্রের নানা সমাবেশে, বিদ্যুচ্চমকের মত হঠাৎ এক একটা গল্প ঝলকিয়ে ওঠে। পথে, পান্থশালায়, শুঁড়িখানায়, ট্রেনে, বাসে, এমন কি, আকাশপথেও, এক একটা সামান্য বিষয় কল্পনার আশ্চর্য স্পর্শে হঠাৎ গল্প হয়ে বিদ্যুচ্চমকের মত মস্তিষ্কে বিঁধে যায়। এটা কি বলে? উপাদান? বিষয়বস্তু? ভাষা সেই মুহূর্তে কোন কাজই দেয় না। নারীর ডিম্বাণুকোষে পুরুষের শুক্রকীটের প্রবেশের মত, সেই মুহূর্তে মস্তিষ্ক কেবল ধারণ করে। অথবা জন্ম নেয়। একটা আশ্চর্য সুখের মত হৃদয় তখন মথিত হয়। আলোড়িত হয়। এই পর্যন্তই। আর সেই বিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেই, ভাষা তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। মস্তিষ্কে বিদ্ধ ভ্রূণের সঙ্গে, তার ভবিষ্যৎ অবয়ব বা কলেবর, যাকে আমি সহসা-বিদ্ধ সেই গল্পের বিষয়বস্তুটির ভাষা বলে মনে করি, যা দিয়ে বিষয়টি তার যথার্থরূপে ফুটে উঠছে, ধীরে ধীরে—ভাষা যার নাম, দীর্ঘকাল গর্ভধারণের মতই যা একাধারে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, অথচ অনিবার্য স্বাভাবিক এবং ভবিষ্যতের একটি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভরা স্বপ্নের মূর্তি, সেই মুহূর্তে জন্ম নেয়। আসলে এই রূপের বাহন নিহিত থাকে ভ্রূণের মধ্যেই।'

কিন্তু 'কল্পনার আশ্চর্য স্পর্শে' তিনি যে কোন সামান্য বিষয়কে অসামান্যতা দান করতে পারেন, জীবনের চারদিকে ছড়ানো-ছিটানো কোন অভিজ্ঞতা 'কল্পনার আশ্চর্য স্পর্শে হঠাৎ গল্প হয়ে বিদ্যুচ্চমকের মত মস্তিষ্কে বিঁধে যায়' এবং সেই অভিজ্ঞতা গল্পের আধারে বন্দী হয়ে যাবার সময় অনুষঙ্গী 'ভাষা তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়,' তা সমরেশের যে-কোন একটি গল্প বেছে নিলেই প্রমাণিত হয়ে যায়। প্রত্যেক ট্রেনযাত্রীর মত চালের চোরাচালানকারীরা সমরেশের অপরিচিত ছিল না কিন্তু তেরো বছরের গোরাকে তিনি 'এস্‌মালগার' গল্পে চিরস্মরণীয় করে রাখলেন। 'কপালকুণ্ডলা ঃ ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ' গল্পের ময়নাও তার বিপন্ন অস্তিত্ব নিয়ে সুন্দরবনের জনমানবহীন একটি ছোট্ট দ্বীপে ফেরারী হয়ে তার বাবার সঙ্গে জীবন কাটায়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'র রোমান্টিকতা নেই, নাটকীয়ভাবে লেখক এক কলমের খোঁচাতে সেখানে কোন নবকুমারের আবির্ভাব ঘটান নি, পূর্ব পাকিস্তান বাংলাদেশে পরিণত হলে ওরা সেখানে চলে গেছে কিনা, লেখক তা-ও জানতে পারেন নি, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী সীমানায় এই চরিত্রগুলির অবস্থান। শুধু তাই নয়, চেহারায় স্বভাবে বা অন্য কোন দিক থেকে এই ধরনের চরিত্রেরা একেবারে স্বাতন্ত্র্যহীন, বিশেষত্ববর্জিত। বিহারের গ্রাম থেকে আসা 'পাড়ি' গল্পের সেই নিঃস্ব দম্পতির চেহারা শিল্পাঞ্চলে যত্রতত্র দেখা যায়, কিন্তু বস্তুতপক্ষে উনত্রিশ আনা মজুরী ও গায়ে মাথার জন্য কিছু কড়ুয়া তেলের বিনিময়ে ওরা যখন উনত্রিশটি শুয়োর নিয়ে দারুণ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মধ্যে ভরা গঙ্গার স্রোত, ঘূর্ণী ও বানের জলের আবর্ত সঙ্কুল উর্মিলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে প্রাণীগুলিকে প্রতিশ্রুতিমত গঙ্গাপ্রান্তে পৌঁছে দেয় তখন তাদের বাঁচার সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান না হলেও শিল্পী একটি আঁচড়ে জীবনযুদ্ধে মৃত্যুর বিরুদ্ধে মানুষের

প্রতিবেদনধর্মী হয়ে বস্তুনিষ্ঠ দলিল তৈরি করে দেন। গোয়া, মরনা বা বিহারের সুদূর গ্রামাঞ্চল থেকে আগত এই বিহারী দম্পতির জীবনে যে সমস্যা, তার কোন স্বপ্নকল্প সমাধান রচনা করেন নি সমরেশ কারণ তাঁর বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি শিল্পসৃজনের প্রশ্নে তাঁকে এই সমাজের শোষণ, বঞ্চনা, বৈষম্য ও অত্যাচারের প্রবহমানতা সম্পর্কে কখনও দ্বিধাগ্রস্ত করে তোলে নি। 'আলোর বৃত্তে' গল্পে কেদারের মনে প্রশ্ন জেগেছিল, তার ভালবাসার বউ টগর কি সত্যিই বেশ্যা হয়ে গেল? কিন্তু আত্মহননের সূত্রে টগর কেদারের জীবন থেকে হারিয়ে না গিয়ে যদি সত্যিই বেঁচে থাকত তাহলে অন্তত একবারও কি কেদার আলোর বৃত্তে তাদের দাম্পত্য প্রেমের ছবিটি দেখতে পেত?

সুখ শান্তি স্বপ্ন বা ঐশ্বর্যের জন্য নয়, নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত অসংখ্য সাধারণ মানুষের চিত্রশালা সমগ্র সমরেশ-সাহিত্য। তাঁর সাহিত্য জীবনের উদ্ভব ও বিকাশ শিল্পাঞ্চলে। তাই, তিনি ওখান থেকেই মূলত সংগ্রহ করেছেন তাঁর সৃষ্টির মালমশলা—ভিখারী, পাগল, চোর, পতিতা থেকে শুরু করে স্বল্পবিত্ত দোকানদার, মজুর, কুলি, ভূমিহীন কৃষক ইত্যাদি। শিল্পাঞ্চলের নিজস্ব কসমোপলিটান চরিত্রের জন্যই অসংখ্য অবাঙালী চরিত্র যেমন তাঁর সাহিত্যের আঙ্গিনায় ভিড় করেছে, তেমনি বিভিন্ন সম্প্রদায়েব মানুষের প্রতিও তাঁর অনুসন্ধিৎসা বিস্ময়ের উদ্রেক করে। সমরেশ শাস্ত্রবিরোধী গল্পকারদের মত গল্পের আঙ্গিক ভেঙে গল্প না বলে, গল্প লেখায় বিশ্বাসী নন। এদিক থেকে তাঁর বহুব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা তিনি পূর্বসূরী তারাশঙ্করের মতই উজাড় করে দিতে চান, কিন্তু বিষয়বস্তু বিচারে তিনি এমন অনেক প্রসঙ্গ বাংলা সাহিত্যের আসরে স্ব-মর্যাদায় উপস্থাপিত করেছেন যা তারাশঙ্করের স্বীকৃত উপজীব্য নয়। 'মানুষ রতন-'এর বিষয়বস্তু ও তার শৈল্পিক উপস্থাপন সমরেশের অনন্যতাই সূচিত করে—মনা, জগা, ত্যাবড়া, সোতে ও পুনিয়াদের মত রিক্‌শাওয়ালা আমাদের অপরিচিত নয়, কিন্তু একটি মৃতদেহকে কেন্দ্র করে তারা অর্থসঞ্চয় করতে নামল বলেই আমরা এই আপাততুচ্ছ ঘটনার অন্তরালে দেখলাম প্রতিদ্বন্দ্বী গণেশ ও তার সাগরেদদের মারামারি, পুলিশের উৎকোচগ্রহণ, রেলপুলিশের বখরা ইত্যাদি। ওই পাঁচজন রিক্‌শাওয়ালা ও যমুনা (পঞ্চপান্ডব ও 'দ্রুপদি') মৃতদেহটির মুখাগ্নি থেকে শুরু করে অশ্রুবিসর্জন—কোন কিছুই বাদ দিল না। কিন্তু এই আপাত-হাস্যকর পরিস্থিতির নেপথ্যে সমরেশ এমন একটা বেদনাদায়ক বাতাবরণ সৃষ্টি করেছেন, যা সচেতন পাঠককে স্পষ্টতই অস্বস্তিতে ফেলে।

আদিম রিপুর তাড়নায় অন্ধ মানুষের কথা বলতে গিয়েও সমরেশ প্রথা-বহির্ভূত উপকরণ আহরণ করেছেন আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে থেকে। 'অকাল বৃষ্টি'র সুলোচনা সিধু ও ভূতেশ ডোমের অবিবাহিতা বউ হয়ে দুই পুরুষের মধ্যবর্তী অবস্থানে হেসে নেচে গেয়ে জীবনটা বেশ কাটিয়ে দিচ্ছিল এবং ও মরে গেলে শ্মশানের খাতায় সুলোচনার স্বামী হিসেবে ভূতেশ নিজের নাম লেখে এবং সিধুকে বলে, 'জান্‌লি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।' কিন্তু এই জীবনাবেগের সঙ্গে আদিম অন্ধকার মিশে যায়। যেমন 'মহাযুদ্ধের পরে' গল্পটি। ইছামতীর তট, বাজার ও রেললাইনের ধার থেকে সমরেশ এমন দুটি চরিত্রকে বেছে নিয়েছেন যারা অন্ধ, এক অন্ধকার পৃথিবীর আদিম মানুষ। একদা তারা পেয়ে গেল এক সঙ্গিনীকে। তার নাম কানী কুরচি, ওরা আদর করে নাম দিল

ব্যালাইন্ডানি। অরণ্য-আদিম অন্ধকার মনে যে পাশব প্রবৃত্তি লুকিয়ে থাকে সেই প্রবৃত্তির তাড়নায় শুরু হল সংঘাত। জীবনধারণের সংঘাত পরিণত হল জৈবিক ক্ষুধার সংগ্রামে। অন্ধ জীবনাবেগের হিংস্র তাড়নায় দ্বৈরথ সমরে লিপ্ত হয়ে ক্রমক্রমে যখন কুরাচিকে মেরে ফেলে বটা, একমাত্র তখনই তারা যেন ধাতস্থ হয় এবং আততায়ী বটা ব্যালাইন্ডা তার প্রতিদ্বন্দ্বী সুলা ব্যালাইন্ডার সঙ্গে রাত্রে ডেরায় ফিরে এসে ভাষাহীন সুরহীন শব্দ করে কাঁদে। এদের মত 'উরাতীয়া'র লাখপতি আর ঘামারির অলসছন্দে প্রবাহিত জীবনযাত্রায় নতুন সুর আর মধুর আবেশ নিয়ে এসেছিল লাখপতির স্ত্রী উরাতীয়া, কিন্তু দুই পুরুষের মধ্যে যখন ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেল তাকে কেন্দ্র করে, তখন উরাতীয়ার আত্মহত্যা করা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকল না।

অথচ, এই জীবনাবেগ কিন্তু নিরন্তর ধ্বংসের পথে প্রবাহিত না করে মানুষকে সৃষ্টির দিকেও নিয়ে যায়, তার কাছে সঞ্জীবনী-সুধা হয়েও আসে। শুধু প্রেম, সেবা, মমতা ও সাহচর্য নয়, নিছক দৈহিক উত্তাপেও যে মুমূর্ষু পুরুষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারে তা তো 'উত্তাপ' গল্পের সাঁওতাল যুবতীটি প্রমাণ করেছে। আবার, প্রকৃতি কোথাও পুরুষের বুকে নারীর আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলতে পারে, মানুষের হাসি-সুখ-উচ্ছলতার শব্দময় জগৎ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিলেও একখণ্ড জমিতে চাষ-বাস করে তরি-তরকারী ফলাতে গিয়ে বুকের নীচে অনুভব করে সৃষ্টির উন্মাদনা। ফসলের উৎপাদনশীলতার আকাঙ্ক্ষা নিগূঢ় স্পন্দন জাগায় হৃদয়ের গোপনতম অন্তঃপুরে। 'উজান' গল্পের নায়ক একদা নারী ও সন্তান হারিয়েছিল, এখন স-সন্তান নারী তার জীবনে পুনর্বার উজান বইয়ে দেয়।

প্রচলিত প্রেমের গল্প লেখায় সমরেশের আগ্রহ নেই, প্রথাসিদ্ধ দাম্পত্য জীবন-চিত্রণে তাঁর নেই কোন কৌতূহল। তিনি জীবনচর্যার ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত ট্র্যাডিশন ভেঙেচুরে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছেন, অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য বয়স সম্মান ও অসুস্থতা তাঁর সামনে কোন প্রতিবন্ধকতাই নয়। 'বাসিনীর খোঁজে'র পরকীয়া-প্রেমতত্ত্ব সমরেশ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে পরিবেশন করতে গিয়ে তাই কোন গূঢ় রহস্যের ইংগিত দেন না অথচ বাদাবনের খেতমজুরণী, দুই সন্তানের মা, বাসিনীর জীবনে অভাব-অনটন, শোচনীয় দারিদ্র্য, অমানুষিক পরিশ্রম, স্বামীর প্রহার ছিল, আছে, থাকবে আবার সমান্তরালভাবে সে যখন 'লালটনের ড্যাইভার' পবনচন্দন মৈস্তিরের কাছে আসে তখন তার ঠোঁটে আর চোখে সেই 'গেমোবনের ছায়া-পড়া নদীর জলের মত কি যেন থাকা-না-হাসি' দেখা যেত। বাসিনী যখন কৃষক-আন্দোলনে সামিল হয়ে কলকাতার রাজপথে মিছিলে আসে তখন সেই বিপর্যস্ত, বিধ্বস্ত কলকাতায় সান্ধ্য আইনের মধ্যে সরল পবন তার গাড়ি চালিয়ে এসে আইনের রক্ষকদের ক্রুদ্ধ মেজাজের শিকার হলেও ওর মনে পড়ে যায় 'বাসিনীর সেই মুখটা। যা দেখে কোন দিন কিছু বোঝা যায় নি। তবে আছে, বাসিনীর সঙ্গে তার আছে। মানে ভাব-ভালবাসা যাকে বলে আর কি।'

'সুবাসী' গল্পের নায়িকার স্বামী সুবাসীকে ভালবাসত বলে তার মৃত্যুর পর সুবাসী তার স্মৃতি বুকে আঁকড়ে একটা নিঃসীম অসহায়তার মধ্যে নিজেকে ক্রমশ হারিয়ে ফেলবে—এই ধরনের বুজরুকিতে সমরেশের কোন আস্থা নেই। তাই, স্বামীর একদা-সহযোগী কমরেডের কাছে সুবাসী যখন আশ্রয় পায় তখন পারিবারিক উত্তেজনা ও পারিপার্শ্বিক সমালোচনা যতই হোক না কেন, ওরা লেখকের সহানুভূতি পেয়েছে অথচ ওই গল্পেরই অন্তর্গত আর এক বিধবা যুবতী দেওরের কাছে মানসিক যন্ত্রণার মধ্যে বাস করলেও লেখক তার প্রতি মোটেই সহানুভূতিশীল নন।

দেহের দেহলী দিয়ে মঙ্গলের দেউল যেখানে রচিত হয় নি, তেমন প্রেমের গল্প সমরেশ খুব সামান্যই লিখেছেন। তাঁর 'সুবাসী' গল্পের নায়িকা সুবাসীও 'বলিষ্ঠ সুন্দরী', তাই বিপিনের সঙ্গে ওর মিলনের প্রশ্নে সামাজিকতার প্রাচীর ওরা নিজেরাই ভেঙে ফেলেছে, কিন্তু 'অকাল বসন্ত' গল্পের বিষয়বস্তুই এমন যেখানে নিমি, বিজি ও টুনির যৌবনে ভাঁটার টান না ধরলেও, 'জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে' উঠলেও এবং দেহের 'সু-উচ্চ রেখায় বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত' হলেও তারা সামরিক যানবাহনের কারখানার ভারী ট্রাকের চালক অভয়কে ধরে রাখতে পারে নি। অভয় যখন ওখানে সাময়িক অতিথি হয়ে এল এবং ও চলে যাবার পরেও ওখানে যা থাকবে তা হল ভাঙা বাড়িটা, ঢোকবার দরজা নেই, শুধু একটা ছিটেবেড়ার আড়াল, দেয়ালের ইট চোখে পড়ে না, সর্বত্র গোবর-চাপাটির দাগ। কিন্তু অভয় যতদিন ওখানে ছিল ততদিন ওই দৃশ্যত সার্বিক নিঃস্বতার মধ্যে দেখা গেল বট-অশ্বত্থের ছায়া, বনকর্মালির লতা, অন্ধকার রাত্রের আকাশে খই-ফোটা নক্ষত্রের মত ফুটে ওঠা কালকাসুন্দের ফুল, হলুদে আর লাল কৃষ্ণকলি। পালা করে তিন যুবতী আসত সেই নিঃসঙ্গ যুবকের সেবা করতে—ভোর রাত্রের আবছায়ায় বাসি খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে, কখনও বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সন্ধ্যার গোধূলি-আলোয়। কিন্তু নিমির মমতা, বিনির হাসি এবং টুনির অভিমান মাড়িয়ে একদা অভয় যখন নিজের জগতে ফিরে গেল তখন শুধু দেয়ালের নোনা ইঁটে মুখ চেপে ওদের বুড়ী মা কাঁদতে থাকে। কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

সমাজের নিচুতলার যে মানুষেরা নিজেদের ভুল-ভ্রান্তি, সমস্যা-সংকট ও বাসনা-বিভ্রম নিয়ে সমরেশের ঘনিষ্ঠ পরিচিত ও আত্মার আত্মীয় বলে সমরেশ দাবি করতে পারেন তাদের চারিত্রিক স্ব-বিরোধিতা তাঁর নজর এড়ায় নি। যেমন, 'শুভবিবাহ' গল্পটি। গল্পটির প্রাণকেন্দ্রে আছে একটি বিবাহ-অনুষ্ঠানের কথা। অতএব গল্পটির নাম 'বিবাহ' হতে পারত। কিন্তু 'শুভ' শব্দটি যখন যুক্ত হয়েছে তখনই পাঠকরা ধরে নিতে পারেন এই বিবাহের সব কিছুই প্রথাবিরোধী ব্যাপার। বিবাহবাসর : প্রাকৃতিক দুর্যোগের রাত্রে মফঃস্বলের এক স্টেশনের নীচে। পাত্র-পাত্রী : ভিখারী অনাথ ও ভিখারিনী কালার বউ। মৃতকল্প নিঃস্ব নিরাশ্রয় মানুষগুলির মনের মধ্যে আমূল প্রোথিত সংস্কারগুলো কিন্তু মরে নি। বিবাহের রীত-প্রকরণ নিয়ে তাদের কোলাহল যতই হাস্যকর হোক, জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে ওরা সচেতন। 'পেত্থম যখন বে হয়েছিল তখন তো কালার বউয়ের সবই ছিল, সব হারিয়েই তো আজ ও পথের ভিখারিণী, আজ আবার যখন ওর বে হচ্ছে তখন সে ভিখারীর স্ত্রী থাকবে কেন?' এই প্রশ্নটি অত্যন্ত সঙ্গত মনে হয়েছে উপস্থিত জনৈক রিক্‌শাওয়ালার। তাই, পাত্র অনাথ যদিও 'বেরাম্ভণের ছেলে', তবু পরদিন তাকে ঘর ঝাঁট দেওয়া ও মাল বওয়ার কাজে রিক্‌শা-মালিকের গদীতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দেয় সে। দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত সংসারে সম্মাননা ও সমাদরের প্রতি আকুলতা যে কোন মানুষের পক্ষে থাকাই স্বাভাবিক—'শুভবিবাহ' গল্পের সুর কিন্তু তা নয়। ওই গল্পের চরিত্রগুলো ধ্বংসের শেষ সীমায় পৌঁছেও কতকগুলো সংস্কার ও মূল্যবোধ কিছুতেই ছাড়তে পারছে না। এই সংস্কারটাই তো হৃদয় নামক উৎপাত হয়ে মানুষের জীবনটাকে কুরে কুরে খায়। তাই 'উৎপাত' গল্পে গেমোতালির ভূমিহীন চাষী সুরীনের প্রায়-স্বৈরিণী বউটা শত

অভাব ও বেঁচে থাকার হরেক জ্বালার মধ্যেও সিঁথিটা বিধবাদের মত সাদা রাখতে পারে না, দোকানীর গঞ্জনা সহ্য করেও এক চিমটি সিঁদুর ভিক্ষে করে। 'প্রত্যাবর্তন'-এর বাসন্তী যে তার পিত্রালয়ের নারকীয় পরিবেশ ছেড়ে প্রেমিক পবনের সঙ্গে, নতুন জীবনের সন্ধানে গঙ্গা পাড়ি দিয়ে চন্দননগরে চলে যেতে পারল না সেটা কোন সংস্কারের জন্য নয়। নীচতা মালিন্য অশালীনতা, কুৎসিত নোংরামি ও চূড়ান্ত দারিদ্র্যের, মধ্যে আদ্যন্ত নিমজ্জিত থেকেও ঠান্ডারাম-সুকুমারী-নবা-কেষ্টা-কেলো-হারাণীদের কাছ থেকে তার রূপ যৌবন ও ব্যক্তিত্ব যখন মর্যাদা আদায় করল তখন বাসন্তী যেন একটা নতুন মমতা মাখানো দৃষ্টিভঙ্গিতে ওই ঘৃণ্য জীবগুলোকে দেখতে থাকে। সে ওদের কাছে বাঁধা পড়ে যায়।

নিষ্ঠাশীল কর্মী হিসেবে সমরেশ একদা মার্ক্সবাদী আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন, এজন্য জীবনে তাঁকে কারাবাস ও নিগ্রহভোগ করতে হয়েছে। শাসক ও শোষক শ্রেণীর হাত থেকে অধিকার ছিনিয়ে না নিলে নিছক আপোষে বা সামঞ্জস্যের গোঁজামিলে কোন সামাজিক পরিবর্তন সম্ভব, তা তিনি বর্তমানে বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত না থেকেও বিশ্বাস করেন না। 'মান' গল্পে তিনি নম্র ও কোমল স্বভাবের সুখ্যাত ব্রজবিহারীর বিপরীতে উদ্ধত, অবিনয়ী বনবিহারীর প্রতি পাঠকের শ্রদ্ধা আদায় করেছেন। মিত্তির ডাক্তার যখন ওদের মা সুখবতীকে 'ছেনাল' বলে গালি-গালাজ করল তখন বনবিহারী সহিংস প্রতিবাদ করে তাকে আহত করে হাজতে গেল আর বিনয়ের অবতার ব্রজবিহারী মিত্তির ডাক্তারের কাছে ক্ষমা চেয়ে মীমাংসা করতে উদ্যোগী হতে গিয়ে বনবিহারীর হাতেই আহত হয়েছে। বনবিহারীর জন্য জীবনে এই প্রথম সুখবতী সুখী হয়েছে, সে ব্রজকে তার পাদোদক পান থেকে নিবৃত্ত করেছে।

পেশাগতভাবে একদা সমরেশ শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে ছিলেন, মার্ক্সবাদে দীক্ষিত হয়ে তিনি বস্তুবাদী ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ওদের সমস্যা ও স্বরূপ বুঝতে চেয়েছিলেন। শ্রমিক হিসেবে তাঁর জীবনের অভিজ্ঞতা স্বল্পকালের কিন্তু সেই স্বল্পকালীন অভিজ্ঞতা, মার্ক্সবাদ এবং শিল্পগুণের নিজস্ব সামগ্রিক চরিত্র তাঁকে চিরকালই শ্রমজীবী মানুষের মাঝখানে বন্দী করে রেখেছে, উত্তরকালে তিনি অসংখ্য কালজয়ী গল্প লিখেছেন শ্রমজীবী মানুষকে নিয়ে। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা ও দেশবিভাগ—বাংলার ওপর দিয়ে ঝড় বইয়ে দিয়েছে। সামাজিক কাঠামোর চেহারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এই সব ঘটনা না ঘটলে হয়তো ঢাকা জেলার কাছে বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়ে পুষ্পলতাকে শিয়ালদা লাইনের লোকাল ট্রেনগুলোতে ন্যাকড়ার পুতুল বিক্রী করে বিধবা মা ও অপোগণ্ড ভাইবোনদের বাঁচাবার প্রত্যাশায় আসতে হত না। কিন্তু তার বয়স, মাথার কেশভার, সর্বোপরি নারীত্ব তাকে যাত্রীদের কাছে কৌতুক ও কৌতূহলের পাত্রী করে তোলে। বিদ্বেষ ও সংশয়ের বিষে জর্জরিত সমগোত্রীয় হকারদের কটূক্তি, কুৎসিত ইঙ্গিত ও নোংরা প্রতিরোধ তাকে এক দুঃসহ দুঃসময়ের মধ্যে হাঁটতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত পুষ্পলতাসহ সমস্ত হকাররা যখন রেল কর্তৃপক্ষ ও পুলিশের কাছে শাস্তি পেল তখন ভুল ভেঙে গেল বিড়ম্বিত ও অত্যাচারিত হকারদের। সংগ্রাম ও প্রতিরোধের প্রশ্নেই শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্য গড়ে ওঠে, তাই, পুষ্পলতা নিঃস্ব ও অত্যাচারিতদের শ্রেণীতে ওর জায়গা করে নিল, 'পসারিণী' হিসেবে সে নিজেকে ওদের সঙ্গে একাত্ম করে পেল। শ্রমিক শ্রেণীর বিভেদ নয়, ঐক্যই সবচেয়ে জরুরী, কারণ পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় মালিক

শ্রেণীর মুনাফাই যেখানে মোক্ষ, কর্তাভজা পদ্ধতির মধ্যে আছে সরকারী অনুদান বা ঋণপ্রাপ্তির আশ্বাস দাওয়াই সেখানে শ্রমিক-মঙ্গলের চিন্তা বাতিল করা তো একান্তই জরুরী। থাক না 'রঙ' গল্পের সেই শ্রমিক বনোয়ারীর কাটা হাতটা প্যাকিং বাক্সের আড়ালে চটের তলায় পড়ে। বড় কর্তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে বনোয়ারীর রক্ত কোন ভাল কারখানার ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের রঙ, মাংস হল পশুর চর্বি। শ্রমিকরা বসে থাকুক না বনোয়ারীর মৃতদেহ নিয়ে কিন্তু তাই বলে বড় কর্তা, সরকারী প্রতিনিধি ও উঁচু মহলের পুরুষ-মহিলাদের মনোরঞ্জনের জন্য আয়োজিত যুবতী নর্তকীর ইন্দ্রিয় কলা-কৌশল দেখানোর বাধা কোথায় ?

তাই, প্রতিরোধের কথা না বলে সমরেশের মত দায়িত্বসচেতন শিল্পী চুপ করে থাকতে পারেন না। এই প্রতিরোধ শুধু শ্রমিকের ফ্রণ্টে নয়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে —যেখানে অত্যাচার, সেখানেই প্রতিরোধ। মানুষের প্রতি অত্যাচারের বেদনা তাঁকে সমাজের সকল স্তরের শোষিত ও পতিতদের মাঝখানে টেনে নিয়ে যায়, একদা এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগপূর্ণ রাত্রে বিপর্যস্ত ও কপর্দকহীন অবস্থায় কিভাবে এক পতিতার ঘরে গিয়ে বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে ফিরে আসেন, 'প্রাণপিপাসা' গল্পে তিনি অকপটে সেই কাহিনী শুনিয়েছেন। সমরেশ বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেন ওখানকার 'ঘর দোর জায়গা জিনিস' কিছুই ওদের নয়, যা একটি নারীর পরম কাম্য। তারা ওখানে খাটতে আসে। তারা অসুস্থ হলেও মানিব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করে না, মর্জি হলে তবেই করে। পতিতাটি লেখককে একটি মর্মান্তিক বাক্য বলেছে, 'কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকেরা তাদের চিকিচ্ছে করায় ?' এই সামান্য একটি প্রশ্নবোধক বাক্যে সমরেশের পূর্ণ রসসিদ্ধি ঘটেছে, পুরুষ-শাসিত সমাজে নারীত্বের বিড়ম্বনার কথা এর চেয়ে সংক্ষেপে, শ্লেষাত্মক ভঙ্গিমায় বলা অসম্ভব। সমরেশ সেই রাত্রির বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন, 'যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কি প্রতিরোধের লড়াই !' জীবনের সমস্ত ফ্রণ্টে এ লড়াই অবিরত চলছে, এ লড়াইয়ে সামিল না হয়ে কোন সচেতন মানুষের মুক্তি নেই। 'প্রতিরোধ' গল্পের কবি-গায়ক সুবলের মত শিল্পীকে প্রতিজ্ঞা করতে হয়—তার আশ্রয়দাতা সংগ্রামী মনাইয়ের অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীকে যারা ধর্ষণ ও হত্যা করেছে, স্বজন-হারানো শ্মশানে তাদের চিতা না তোলা পর্যন্ত সে নিরস্ত হবে না।

রাজনৈতিক চেতনার প্রশ্নে কোন প্রকার বিভ্রান্ত থাকলে চলবে না, সংগ্রামী মানুষের নিশানা সঠিক হওয়া চাই। 'বিবেক' গল্পের বিভূতির রাজনৈতিক পথভ্রষ্টতা অবশ্য তার দলের অভ্যন্তরীণ সংকটের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে, তাই সে একজন ফেরিওয়ালাকে খুন করে জেলে যায়। কিন্তু বিভূতি যে রাজনৈতিক বিভ্রান্তির শিকার, পারিপার্শ্বিক অবস্থা কিন্তু ওই নিহত ফেরিওয়ালার অশিক্ষিতা স্ত্রীকে সেই বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি দিয়েছে। শুধু রাজনীতি নয়, যে কোন সামাজিক অসঙ্গতিই মানুষকে জীবন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারে। 'সাধ' গল্পের রিকশাওয়ালা গোপীনাথ নিজের সত্য পরিচয় লুকিয়ে মেয়ে কালিকে লেখাপড়া শেখানোর সাধ মেটাতে গিয়ে বাধা পায় সেই কালির কাছেই, কারণ মেয়েটির মনের মধ্যে একটা চেতনার কলি ক্রমশ মুকুলিত হয়ে উঠতে থাকে এবং সেই অপ্রতিরোধ্য চেতনা ওকে স্বস্থানে স্থাপিত করে, মায়ের আদর না খেয়ে, বাবাকে মিথ্যে সম্বোধনে 'গুপীদাদা' বলে নিজেকে প্রতারণা করা সম্ভব হয় না। শুধু শিক্ষা

নয়, পরিপার্শ্বও প্রস্তুত করে দেয় এক-একটা মনের কাঠামো। তাই, একই সমাজব্যবস্থায় বাস করে, একই অর্থনৈতিক প্যাটার্ণের মধ্যে থেকে 'শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ'-এর সন্ধ্যা যেখানে মুক্তি খোঁজে নিজের দেহকে পণ্য করে, শুভ্রা সেখানে সংগ্রাম করে পরিচ্ছন্ন দেহমন নিয়ে বাঁচতে শিখেছে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছে, 'দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেবো এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেবো আমাদের সরকারী অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এই সব ব্যবস্থাই গরীবকে আরও গরীব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরও বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পরে, আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই।'

রাষ্ট্রব্যবস্থার যে গলদের ফলে মানুষ মানুষের মত বাঁচতে পারে না সেই বিচ্যুতি ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানায় শুভ্রা, ধিক্কার জানান সমরেশ। 'স্বীকারোক্তির' অনলের মনের মধ্যে ব্যক্তির বিপন্নতাবোধ সম্পর্কে কতকগুলো প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। সে যেন আজন্ম বন্দীশিবিরে আছে এবং ক্রমাগত একটার পর একটা জিজ্ঞাসাবাদের মাঝখান দিয়ে উত্তীর্ণ হযে তাকে আসতে হচ্ছে। কেন সে যৌবনে স্কুল পালিয়ে বুড়িগঙ্গার মাঝিমাল্লাদের কাছে ছুটে যেত, অমানুষিক নির্যাতনের মধ্যে তার বাবাকে কৈফিয়ৎ দিতে হত, বন্ধুদের কাছে দুঃসহ অপমান সহ্য করেও অলকার সঙ্গে মেশার জন্য কেন তাকে বন্ধুদের কাছে জবাবদিহি করতে হত, নীরার প্রতি তার নিরুচ্চার প্রেমের জন্য কেন তাকে স্ত্রী রেবার কাছে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে, ধ্রুবকে আশ্রয় দিতে গিয়ে পার্টি-নেতৃত্বের কাছে কেন একাধিকবার তাকে বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছে, এই আত্মজৈবনিক গল্পে অনলের মনের এই প্রশ্নগুলো একইভাবে সমরেশেরও জিজ্ঞাসা। তাই সমরেশ ও তাঁর চরিত্র অনলের সিদ্ধান্ত, 'জীবনব্যাপী দুর্যোগ। তাকে রোধ করা যায় না। যে-বিশ্বে বাস, সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দুর্যোগের নানান কার্যকারণ ইন্ধন।'

শোষণের চিত্র আঁকতে গিয়ে সমরেশ এই সমাজের মুখোশ খুলে দিয়েছেন সেই গল্পগুলিতে যেখানে চূড়ান্ত দারিদ্র্যের প্রেক্ষিতে তিনি শিশু ও কিশোরদের লাঞ্ছিত জীবনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। 'মরেছে প্যালগা ফরসা'র পটভূমি ১৫ আগস্ট, ১৯৭৯। নয়া প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী চরণ সিং দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়েছেন। 'গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদের সংকেত', 'রাজনৈতিক অস্থিরতা' ইত্যাদি বাঁধা-বুলির একঘেয়েমি নয়, আজ আনন্দের দিন। এর ওপর আবার ওই বছরই আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ। 'মায়ের জন্মদিনে আজ শিশুদেরই তো সব থেকে বেশি কদর করতে হবে।' তবু এই উত্তেজনা ও উন্মাদনার আয়োজন সত্ত্বেও প্যাল্‌গা (পাগলা শব্দের বিকৃত রূপ) প্রহারের চোটে মরে গেল এবং মৃতদেহটা শ্মশানে নিয়ে গেল ওরই বন্ধুরা, পুলিশের চোখে যারা 'কুত্তার বাচ্চা'। অবশ্য, ব্যানারে লেখা ছিল 'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ', সুখী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন' কারণ আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে শুভকামনা জানাতে হবে তো। কিন্তু 'নিষিদ্ধ ছিদ্র' গল্পের বেন্দার মত কত সহস্র ভাগ্যবিড়ম্বিত কিশোর আমাদের চারপাশে প্রতিনিয়ত মৃত্যুর মুখোমুখি হয়ে বেঁচে থাকতে থাকতে শেষ পর্যন্ত হেরে যায় জীবন সংগ্রামে ('পেলে লেগে যা' গল্প) তা সমাজসচেতন, দরদী শিল্পীর তৃতীয় নয়নে ধরা পড়ে। তাঁর ভাষা শাণিত হয়ে ওঠে, গল্পের অন্তে থাকে না

কোন দেশের সৌভ্রাত্র' ; আত্মীয় বিয়োগ বেদনায় যেন মুহ্যমান হয়ে পড়েন সমরেশ, বিশেষত সেই মৃত চরিত্রটি যখন একটি কিশোর।

জীবনে বা শিল্পভাবনায় সমরেশের কোন ছুৎমার্গী মনোভাব নেই, তিনি যে কোন বিষয় থেকে গল্পের উপকরণ বেছে নিতে পারেন। পতিতালয়ে যাবার পথে প্রাচীরের গায়ে একটি দেওয়াল লিখন নিয়ে প্রশাসনিক অপদার্থতা ('দেওয়াল লিপি') বা ক্রমক্রমে এক নারীর পরিবর্তে আপন কন্যার সঙ্গে যৌনসংসর্গের পরিণতিতে সেই কন্যার আত্মহনন এবং পিতা ও প্রেমিক কর্তৃক মৃতদেহটি শ্মশানে আনীত হলে কন্যার সঙ্গে আত্মিক সংকটে জর্জরিত পিতার সহমরণ ('পাপ পুণ্য') নিয়ে গল্প বাংলা সাহিত্যে একমাত্র সমরেশই লিখেছেন। বিশ্বরহস্যের অনির্বচনীয়তা রাবণ হালদারকে সূর্যাস্ত দেখতে প্রাণিত করে না, পরন্তু সূর্যাস্ত হলেই সুদ এক পয়সা করে বেড়ে যাবে—এই নির্মম, নির্লজ্জ মানসিকতাই তাকে 'শোভাবাজারের শাইলক'-এ পরিণত করলেও সে কেন সুখদার মেয়ে ময়নার বিয়েতে পাঁচশো টাকা ও একখানি শিল্কের শাড়ি উপহার দিয়ে লোকের কাছে প্রচণ্ডভাবে প্রহৃত হল তার জবাব রাবণ নিজেই দিয়েছে, 'সংসারে পাপ এখনও আছে। তোরা কখনও মুক্তি পাবি নে,আমারও মুক্তি নেই।'

একদিকে আত্মিক সংকট, অন্যদিকে অর্থনৈতিক সমস্যা। এই দুই অপ্রতিরোধ্য জীবন-যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের বেদনাকে অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যে প্রকাশ করেছেন সমরেশ। নিচুতলার মানুষের দুর্দশা ও অসহায়তা যখন তাঁর শিল্পীসত্তা মথিত করেছে তখন তাদের ভাষার সঙ্গে সংবেদনশীল লেখক সংযুক্ত করেছেন আপন তির্যক দৃষ্টিভঙ্গি-সম্ভূত রূপকল্প যা চরিত্র ও স্রষ্টাকে একই পঙক্তিতে দাঁড় করিয়ে দেয়—'শানা বাউরীর কথকতা'য় শানা যখন সুন্দর রায়, জীবন বাঁড়ুজ্জে আর হারাণ গাঙ্গুলীর কাছে তার বিপর্যস্ত জীবনের গভীরতম সংকটের কথা শোনাতে থাকে তখন পাঠক জানতে পারেন স্বাধীন দেশের নাগরিক শানা উঁচুতলার মানুষ কেদার মুখুজ্জের লালসার হাত থেকে তার বউকে বাঁচাতে পারে না কারণ কেদারের 'ধান আছে, তো উয়ার আপনকারা আছেন, পুলিশ দারোগা আছে, দুমকা সদরটো আছে। আমার কি আছে ?'

না, শানা বাউরীর পাশে কেউ নেই। এই স্বাধীন দেশে শিক্ষার সুযোগ, আর্থিক সচ্ছলতা, প্রশাসনিক তৎপরতা, আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ, বিচার-ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা, সবই আছে। তবে ও সব শানাদের জন্য নয়। ওরা চিরকাল অন্ধকারের মধ্যে দূরে অবস্থিত বিশাল দৈত্যের মত রাজমহলের স্থবির পাহাড় আর বিশাল-বিশাল নিশ্চল শালবনের জড়াজড়ির ক্যানভাস পিছনে রেখে দুর্গম রাস্তার চড়াই-উৎরাই ভাঙবে।

তবু ওদের সমাজে মিশে গিয়ে, ওদের হৃদয়ে কান পেতে, ওদের আত্মার আত্মীয় হয়ে সমরেশ জীবনে যে বিশাল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন তাতে ওদের ঘরে প্রিয়তম অতিথি রূপে তাঁর আসন চিরস্থায়ী হয়ে গেছে। তাই তিনি সগর্বে ঘোষণা করতে পারেন, 'আমি তোমাদেরই লোক'।

নিতাই বসু

৭২/৪ বারুইপাড়া লেন
কলকাতা-৭০০০৩৫

আদাব
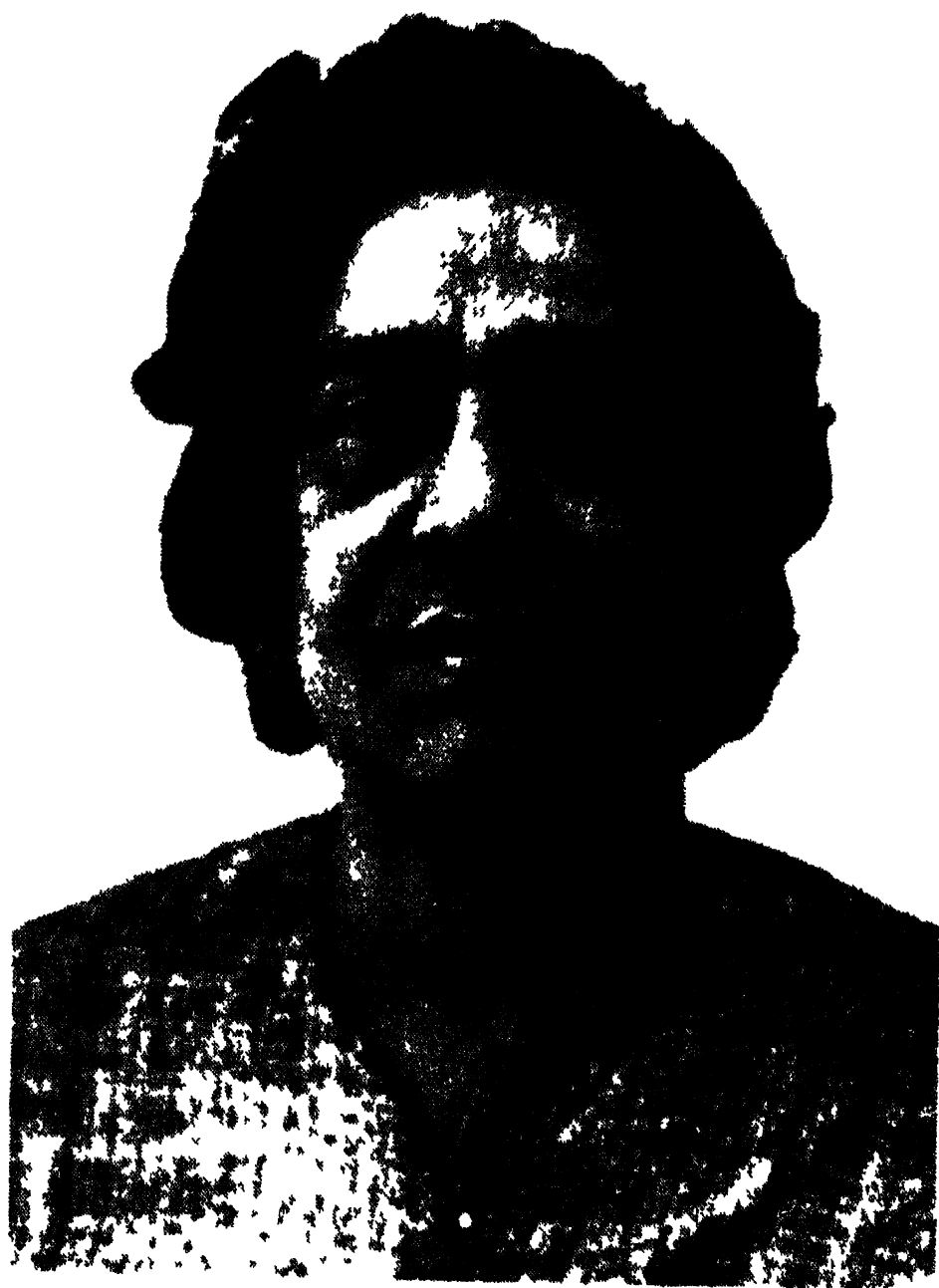
রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে।

লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যু-কাতর নারী-শিশুর চিৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলি ছুড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে।

*　　　*　　　*

দুদিক থেকে দুটো গ' ' এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উল্টে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হল না, নির্জীবের মত পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।—'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম'।

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্যে। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।…… নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধ হয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খা'. ক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সঙ্গে এবার একটু কৌতূহল হল। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা……ওপাশ থেকেও উঠে এল ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী,

নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর।……। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোন পক্ষ থেকেই আক্রমণ এল না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দুজনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু, না মুসলমান?

আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে। …প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে, বাড়ি কোন্‌খানে?

বুড়িগঙ্গার হেই পারে—সুবইডায়। তোমার?

চাষাড়া—নারাইণগঞ্জের কাছে।…কি কাম কর?

নাও আছে আমার, নায়ের মাঝি।…তুমি?

নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দুজন দুজনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।……হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দু পক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দুজনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

ধারে-কাছেই য্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

হ, চল, এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল, আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোন বদ্ অভিপ্রায় নেই তো! সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়ে ছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, ক্যান্?

ক্যান্? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল, ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভাল ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানা রকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল। —যামু না তো কি এই আন্দাইরা গলির ভিতর পইরা থাকুম নাকি ?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল, তোমার মতলবডা তো ভাল মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা ?

এইটা কেমুন কথা কও তুমি ? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

ভাল কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না ?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কি ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হল শুনে।

তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি ?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মত নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মত। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ-ছেলেমেয়েদের কথা···তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে··· ··কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্র-পাতের মত নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইযে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কি করে ? কি অভিশপ্ত জাত ! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

বিরি খাইবা ? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমত দু-একবার টিপে, কানের কাছে বারকয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করে নি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এল সুতা-মজুরের পাশে।

আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহিনি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু-একবার খস্‌খস্ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

সোহান্ আল্লা। নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।

ভূত দেখার মত চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা। তুমি··· ?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফঃ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড় বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্ করে উঠে দাঁড়াল। বলল, হ আমি মোছলমান। কি হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল, কিছু হয় নাই, কিন্তু···মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কি আছে?

পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইডা জামা আর একখান শারি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

আর কিছু নাই তো! সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখ। পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

আরে না না ভাই, দেখুম আর কি। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন যায়—তুমিই কও?

হেই তো হক্ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো?

ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানডা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দুজনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ সহকারে দুজনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

আইচ্ছা···মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।—আইচ্ছা কইতে পার নি—এই মাই'র-দই'র কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকণ্ঠেই জবাব দিল সে, দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল, হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?

আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাডা—হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে।—তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলাইমায়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেরাইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পরল আমার ঘারের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর প্যা দিয়া হুকুমজারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামরা-কামরিটা লাগে কেম্বায়? নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।

হ।

আমাগো কথা ভাবে কেডা? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি; নাওটারে কি আর ফিরা পামু? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি? জমিদার রূপবাবুর বারির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নাযে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিশ্ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাকি জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে—

* * *

সুতো-মজুর কি বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যে বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

কি করবা? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।

চল পলাই। কিন্তুক যামু কোন্ দিকে? শহরের রাস্তাঘাট তো ভাল চিনি না।

মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিসের মাইর খামু না;—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।

হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্ দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পরল।

এই দিকে।—গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চল, কোন গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাহলে আর ডর নাই।

মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুটফুট করছে। দুজনেই একবার থমকে দাঁড়াল—ঘাপটি মেরে নেই তো কেউ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়ে—এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।

কিনারে কিনারে চল। সুতা-মজুর বলে।

রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।

থারাও। মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থমকে দাঁড়ায়।

কি হইল ?

এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানাবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।

হেদিকে দেখ।

মাঝির সঙ্কেত মত সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলই পা ঠুকছে মাটিতে।

মাঝি বলে, ওইটা ইসলামপুর ফাঁড়ি। আর ইকটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।

সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল। —তবে ?

তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে, এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুর হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বারিত্ যাইবা গা।

আর তুমি ?

আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগ আর আশঙ্কায় ভেঙে পড়ে, আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কি হইল না হইল আল্লাই জানে। কোন রকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

আরে না না মিয়া কর কি ? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

ধইরো না, ভাই, ছাইরা দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপজানের কোলে চরব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন করতাছে। মাঝির গলা ধরে আসে।

সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।—যদি তোমায় ধইরা ফেলায় ? ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান্ উইঠো না। যাই…

ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব। —আদাব।

আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্-ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, হে ভগমান্ মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হল, মাঝি বোধ হয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে আনন্দ করে পরবে। বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?' সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কি করবে? মাঝি তখন—

হলট্······

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কি যেন বলাবলি করছে চিৎকার করে।

ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম্। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর হাতের একটা আ৲ল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলা-মাইয়া, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।

প্রতিরোধ

সেই আকালের দিনে কাঙাল কঙ্কালের মেলায় মনাই আর রাধার সঙ্গে সুবলের পরিচয়। তখন থেকে সবাই জানে সুবলকে—সে কবি-গায়ক। সেই থেকেই সুবল সকলের ভালবাসার ও শ্রদ্ধার পাত্র, সুবল সকলের আপনার।

আকাল গেছে, আবার মানুষ ভিটায় ফিরে এসেছে। আবার শুরু হয়েছে জীবনের গান—বাঁচার অভিযান। মনাই দাস ছাড়ে নি সুবলকে।

বলেছে, 'দুঃখের দিনে শান্তি দিছ, নিজে না খাইয়া খাওয়াইছ। তোমারে নি ছাড়তে পারি?'

মনাই আবার বুক বেঁধেছে। পীতাম্বর সা'র সেই লম্বা মোটা খাতাটায় টিপ সই দিয়ে, টাকা নয়, নিয়ে এসেছে বীজধান। আবার পীতাম্বরেরই মাঠে লেগেছে ভাগচাষে।

সেই থেকে সুবল মনাইয়ের অতিথি। তা-ও আজ কয়েক বছর আগের কথা। পুরনো ঘা যে শুকিয়ে আসছে। তবুও সুবলের নিস্তার নেই। তার ডাক নিরন্তর। সেই আকালের গান তাকে অমর করে রেখেছে। যে অবুঝ শিশুরা আজ বড় হয়েছে, তারা সুবলের গানে জানতে পারে দেশে একদিন এসেছিল মন্বন্তর। সেই দুর্দিনের সাক্ষী থাকবে তার গান—মানুষের শত্রুদের সেই নিষ্ঠুর কাহিনী। সময় নেই, অসময় নেই। আজও মনাইয়ের বউ রাধা সুবলকে ধরে বসে, হেই গান গাও!

সুবল ধরে :

শুন গো দেশবাসী, শুন মন দিয়া,
কহিতে পরান কান্দে, কান্দে আকুল হিয়া।
রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইল, মইল উলুখড়,
আশি ট্যাকা মণ চাউল হইল বাড়ল ধানের দর।
শুক্‌না মাঠ দৈত্যের মত হাঁ কইরা রইছে,
পানি দেওয়ার লোক নাই সব মরণ শয্যা লইছে,
কামারশালে আগুন নাই—হাপরে নাই টানা—
বাজারে নাই লোহা—কামারের প্যাটে নাই দানা।

শুনতে শুনতে রাধার মনে সেই পুরানো ঘায়ের পোকাগুলো যেন কিলবিলিয়ে ওঠে। সেই বিরাট ক্ষুধা, দুরন্ত প্রলোভন, দুনিয়ার যে কদর্যরূপ ভুলবে না সে কোন দিন। সুবলের গলা আরও করুণ হয়ে ওঠে ঃ

এমুন মহা মন্বন্তর জম্মে দেখি নাই।
মায়ের বুকে সন্তান মরে এক ফোঁটা দুধ নাই।
ছিটাল কাটালের ভাত লইয়া মায়ে পুতে ঝগড়া
(ও হরি কইমু কি) সন্তানেরে ফাঁকি দিয়া, করে পচা অন্নের বখরা।

'কিন্তুক ব্যাপারডা কি জানেন নি আপনারা?' বলেই ঠাস্ ঠাস্ করে হাততালি দিয়ে গেয়ে উঠত সে ঃ

নোটের গোছা বান্ধে গেঁজে হাইসা চোরা ব্যাপারী,
ও হরি মাথা খাও, পিছা মারো এমন আড়তদারির।
প্যাটের জ্বালায় পোলা মরে, বস্ত্র জ্বালায় মা দেয় গলায় দাড়,
হায়রে—পেট কাঁপাইয়া, দাঁত দেখাইয়া, হাসে ড্যাক্রা চোরাকারবারী।
চক্ষের জলে বুক ভাসে ভাই কইতে দুঃখের কথা,
হাইযো সুবল সাধুব সাথে সব কও—দূর কর এই অরাজকতা।

শুধু এই আহবান জানিয়ে তৃপ্তি পায় নি সুবল। মানুষের আর নিজের দুঃখ তাকে এমনই নির্মম করে তুলেছিল যে, মানুষের শত্রুদের আঙুল দেখিয়ে সে গেয়েছে ঃ

রহিম চাষী মনাই চাষীর ক্ষয় ধরে গো হাড়ে
আড়তদার রঘুসাউ গুদামে বইয়া চাউলের পোকা ঝাড়ে।
ও ভাই চাউলের বস্তায় পচানি ধরেছে :
সোনা মিয়ার আড়তে ভাই বস্তা নাহি ধরে.
ও ভাই—কলিরাজা মরণ বাড় বেড়েছে।

এ গান শুনে স্থানীয় দারোগাবাবু তাকে আচ্ছা করে ধমকে দিয়েছিল। বলেছিল, গাঁয়ের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিযে এ গান গাওয়া চলবে না। কিন্তু আর আর মানুষগুলো নাছোড়বান্দা। তারা সুবলকে নিয়ে এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে টানাটানি করে, বসায় গোপন আসর। তাই মনাইয়ের অকৃত্রিম বন্ধুত্ব পেয়েছে সে। রাধার প্রিয় সহচর সুবল।

মনাই সারাদিন থাকে কাজে কর্মে। সুবল আর রাধা সারাদিন বসে বসে গান বাঁধে, গান গায়—গল্প করে।

রাধা আর সেই কঙ্কাল রাধা নেই। গায়ে মাংস লেগেছে, দেহের রেখায় রেখায় ফুটেছে উদ্দীপ্ত যৌবনের ধার। যেন সেই আগের রাধা। সেই আয়ত চঞ্চল চোখ, পাতলা চাপা ঠোঁট, স্ফীত যৌবনের গরিমায় উদ্ধত বুক। সুবলের বড় সাধ রাধার এই রূপকে সুরের মায়া দিয়ে জড়িয়ে রাখে।

সুবল একটি গান বাঁধে। কিন্তু লজ্জা করে, সঙ্কোচ লাগে সুবলের। না জানি রাধা কি ভাববে। হয়তো তার সুবল-সখার ওপর রুষ্ট হবে। রাধাকে দুঃখ দিতে পারবে না সে। কিন্তু রাধার জিভের বাক্ নেই। সে একদিন বলেই ফেলে, 'আমারে চাইয়া চাইয়া দেখ, আর নিশ্বাস ফেলাও ক্যান্ ? কিছু কও না যে ?'

সুবল লজ্জায় এতটুকু হয়ে যায়। পরমুহূর্তেই হেসে বলে, 'তুমি হইলা আমার সখার বঁধু, তোমারে দেখুম না—দেখুম কারে। দুইটা চোখ ভইরা খালি তোমার রূপই দেখি আর ভাবি—কালার মনমোহিনী রাইমণিও কি এমুনই আছিল ?'

রাধা মিষ্টি গলায় খিলখিল করে হেসে ওঠে। 'হ, তুমি হইলা কবি, তোমার লগে নি মাইন্‌ষে কথায় পারে ?'

সুবল বলে, 'কিন্তু তোমার ওই রূপের ধারে আমার মুখে ক্যান্ কথা আটকাইয়া যায় ?'

'রূপ না ছাই !' রাধা ঘাড় ফিরিয়ে বাঁকা চোখে হেসে চলে যায। সুবল তাড়াতাড়ি একতারাটা পেড়ে গান ধরে :

ও সখি তোমার রূপের আলোয় আলো পড়ে আমার চোখেতে
কালো ভোমরা পাগল হইল, পুইড়া মইল, তোমার রূপেতে।
ও বঙ্কিম নয়ন তুইলা আমার পানে চাইও না
কালসাপিনী মনমোহিনী কেশ দুলাইও না,
ওই হাসি দিয়া ভুলাইও না এই মিনতি করি তোমার পায়েতে।

গান শেষ করে সুবল রাধার অভিনন্দনের জন্যে হাসি মুখে বসে থাকে। একটা গভীর তৃপ্তির আবেশে চোখ জড়িয়ে আসে তার। এমন তৃপ্তি সে পেয়েছিল মন্বন্তরের গান বেঁধে। এমন তৃপ্তি পেয়েছিল যাত্রার দল থেকে বেরিয়ে প্রথম যেদিন সে একতারাটা নিয়ে পথে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার গান-মুগ্ধ লোকেরা বাবাজী বলে যখন তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বলেছিল, 'নাম আমার সুবল সাধু !' লোকে বলেছিল, 'বিনয়ের অবতার। তা—কুণ্ঠাইকার সাধু গো ? গয়া না কাশীর ?'—এ ঠাট্টার কি সুন্দর জবাব দিয়েছিল সুবল। 'আহা।' গেয়েছিল—

রসিকজনে ঠাট্টা করেন দেইখ্যা জনম সুখীরে
শুইনা হাসেন সাধু-পরিচয়—
ও হরি—কইয়া দেও তোমার জনম সুখীরে ;
সাধু মাঝে চোর বাটপার ব্রহ্মচারি নয় !

এ গান শুনে চারিদিক থেকে সেই সাধুবাদ, সেই অভিনন্দন ভুলবে না সুবল। সুবলের বাল্যগুরু কমরুদ্দিন ফকির। সে তাকে ডাকত, সুবল সাধু।

তাই সে এই পরিচয় দেয় লোকের কাছে। আজ রাধাকে নিয়ে যে গান সে গাইল—তা বড় আকস্মিক। তৈরি না করেও এ গান তার আপনা আপনিই এসে গেছে।

কিন্তু রাধা গেল কই? গান শুনে তো সে কিছু বলতে এল না! হয় তো লজ্জা পেয়েছে।

সুবল রান্নাঘরে গিয়ে উঁকি দেয়। রাধা নেই। ঢেঁকি ঘরে দেখে। সেখানেও নেই। গেল কোন্‌খানে?

সুবল বাড়ির পিছনে আসে। -হ'—হাসতেছে বুঝি? কামরাঙা গাছের গোড়াটায় বসে যেন হাসির দমকে দমকে ফুলছে রাধা। সামনে গিয়ে সুবল আড়ষ্ট স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। এ কি কাঁদছে! ব্যগ্র গলায় প্রশ্ন করে সে, 'কি হইল সখি, আমার গান শুইনা দুঃখু পাইছ?'

কান্নার আবেগে রাধা কথা বলতে পারে না। কি এক পুঞ্জীভূত বেদনার অশেষ কান্নায় যেন সে ভেঙে পড়েছে। ক্ষোভে-দুঃখে সুবলের বুক ভরে ওঠে। গান গেয়ে সে দুঃখ দিল সখিকে? বিস্মিত ক্ষুব্ধ প্রশ্ন জমাট বেঁধে ওঠে তার মনে। বলে, 'আমি না জাইনা গাইছি সখি, আমারে ক্ষমা কর। তোমারে তো আমি দুঃখ দিতে চাই নাই।'

চোখ মুছে রাধা কান্না জড়ানো গলায় বলে, 'তোমার দোষ নাই, আমারই কপাল মন্দ। এই রূপ দিয়া কি করুম সখা, ধুইয়া জল খামু? এই রূপ দেইখা তোমার বন্ধু শান্তি পায় না।'

আবার অশ্রুর বন্যা আসে রাধার চোখে।

সুবল বিস্মিত প্রশ্ন করে, 'ক্যান্‌?'

রাধা বলে, 'তুমি কি দেখ না, তোমার বন্ধু আমার লগে কথা কয় না। আমারে য্যান্‌ ঘিন্না করে। আমারে আর ভাল লাগে না তার। তবে আর এই পরানের কি দাম আছে, কও?'

'হ!' সত্যিই তো, সুবল কিছু দিন থেকে দেখছে মনাই যেন কেমন আনমনা। কাজকর্মের পর বাড়িতে গুম হয়ে বসে থাকে। কথাবার্তা নেই, কেমন চিন্তিত ব্যথিত উদাসীন।

'কিন্তুক ক্যান্‌ সখি?' সুবলের বড় অস্বস্তি লাগে।

'আমার এই পোড়া রূপেই সার মাকাল ফলের বাহার। এই রূপের কথা শুনলে পরে আমার বড় কষ্ট লাগে।'—কান্নার আবেগে রাধার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে।—'তোমার বন্ধু···আমার কাছ থেইক্যা·· একটা পোলা চায়।' বলতে বলতে হৃৎপিণ্ডটা যেন ছিঁড়ে যেতে চায় রাধার। 'কিন্তুক—আমার যে পোলা হইব না গো! আমি যে—'

বন্ধ্যা কথাটা উচ্চারণ করতে গিয়ে ডুকরে ওঠে সে। সুবলের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে ওঠে। আহা! সত্যিই তো। রাধা আর মনাইয়ের এত বড়

দুঃখের কথাটা তো কোন দিন ভেবে দেখে নি সে! মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারে না সে রাধাকে। আনমনে একতারাটার তারে ঘা দেয়।

এর কোন প্রতিকার তো জানা নেই তার। এ তো স্বয়ং ভগবানের হাত, মানুষের সৃষ্টিকর্তা তিনি। দীর্ঘ নিশ্বাসে ভারী হয়ে ওঠে সুবলের বুক। বলে 'কাইন্দো না। কি করবা, মাইনষের হাত নাই এইতে। কামনা করি তোমার য্যান্ ঘর-ভরা পোলাপান হয়।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে গুনগুনিয়ে ওঠে সে ঃ

প্রভু অবুঝ মোরা, বুঝি না তোমার রঙ্গ হে।
মা করিয়ে গড়েছ যারে দিয়েছ এতেক রূপ,
তবু শূন্য বুক, শূন্য গর্ভ এ তোমার কেমন রঙ্গ হে?

এমন সময় আসে মনাই। বড় ব্যস্ত মনে হয় তাকে। সঙ্গে তার আরও অনেক লোক—শ্রীশ, ফকির, মধু, হেম, মানু, অনেকে। ব্যাপারটা কি? সুবল এগিয়ে আসে। জিজ্ঞেস করে মানুকে, 'ব্যাপার কি তোমাগো মানু?'

মানু রহস্যজনকভাবে হাসে। সুবলের কানের কাছে মুখ নিয়ে কি যেন বলে ফিস্ ফিস্ করে।

'হ? অহন কি তয় কামারবাড়ি যাইতেছে?' সুবলের মুখ বিস্মিত-হাস্যে ভরে ওঠে।

'হ। তোমারে কিন্তু গান কইরতে হইব, সাধু।' মাথা ঝেঁকে হেসে বলে মানু।

'আরে নিচ্চয়, নিচ্চয়।'

চিঁড়ে-মুড়ির পুঁটলি নিয়ে বেরিয়ে আসে মনাই। সুবলকে বলে, 'হেই কাইল লাগাৎ ঘরে ফিরুম, বোঝলা সাধু? চলি।'

চকিতে ঢেঁকি-ঘরের পাশে রাধার ব্যাকুল-জিজ্ঞাসু মুখের দিকে একবার কটাক্ষ করে আবার বলে সে, 'ডর নাই। কামারবাড়ি যাইতেছি। কাম রইছে মেলা।' সঙ্গীদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ে সে।

পরদিন ভোরবেলা রাধা উঠোন নিকোতে নিকোতে বোধ হয় মনাইয়ের দুর্ব্যবহারের কথা মনে করেই চোখের জল ফেলছিল, আর সুবল একতারাটার তারে আনমনা খেয়ালি হাতে ঘা দিচ্ছিল।

এমন সময় হঠাৎ চতুর্দিক গম্‌গম্ করে ওঠে ঢাকের শব্দে। চকিতে রাধা খাড়া হয়ে ওঠে, থর্‌থর্ করে কেঁপে ওঠে সে। জলে-ভেজা চোখে তার শঙ্কা না পুলক …বোঝা যায় না। মনাইরা কি তাহলে সত্যি সত্যি শুরু করল?

আচম্‌কা থেমে যায় সুবলের হাত। চোখ দুটো তার চকচকিয়ে বড় হয়ে ওঠে। তাহলে শুরু হল? তারা দুজনে ছুটে গিয়ে ওঠে দাওয়ার ওপর। তাকায় মাঠের দিকে।

হ্যাঁ, সত্যিই শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে—তাই পাগলা ঘোড়ার মত ছুটোছুটি করছে পীতাম্বর সা। বুক চাপড়াচ্ছে, শাসাচ্ছে, গালাগাল দিচ্ছে একটা অসহায় ক্ষেপা কুকুরের মত।

সরু আল পথ বেয়ে দলে দলে নারী-পুরুষ শিশু-বৃদ্ধ জমা হয়েছে। ঘিরে রেখেছে, ব্যূহ রচনা করেছে পাকা ফসলের মাঠ ঘিরে।

বিসর্জনের বোল ভুলে গেছে ঢাকিরা। উৎসবের পাগলা মাতনের বোল যেন কথা কইছে ঢাকের পিঠে।

জীবনভর পেটের জ্বালার পরিসমাপ্তি করবে আজ তারা। তাই আজন্ম ক্ষুধার্ত আর ম্যালেরিয়া রোগীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাঠে। নিজেদের পেটের দানা আজ তারা কেড়ে নেবে। লড়াই তারা করবে, প্রাণ তারা দেবে, তবু ঘাড় থেকে তারা ঝেড়ে ফেলবে বহু দিনের সঞ্চিত সমস্ত ঝামেলা, কাঁটার বোঝা।

গভীর উত্তেজনায় রাধা সুবলের একটা হাত চেপে ধরে। সুবল ভাবছে, শ্রীশ, মধু, হেম, ফকির, মানু, মনাইদের কথা। রোগা ক্ষীণজীবী ঝগড়াটে স্বার্থপর মানুষগুলির মধ্যে প্রাণের এত আবেগ! এরা সেই তারা—যাদের সম্বন্ধে সুবল কত দিন গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়ে বলেছে,—ভগবান! তোমার রাজ্যে মানুষকে আঁধিয়ার করেছে কে? কিন্তু আজ এ কি দিন এল?

সুবল একতারাটা নিয়ে মাঠের দিকে পা বাড়ায়। কি গান গাইবে সে আজ! আজ তো তাকে গাইতে হবে ঢাকের তালে তালে।

গাঁয়ের ধারে ধারে ভিড় করা মানুষগুলোর চোখে যেন কি এক উল্লসিত স্বপ্নের ছায়া নেমে এসেছে।

সুবলের মনে পড়ে মনাইয়ের কথাগুলি ঃ জোতদারের ঘরে এবার অর্ধেক ফসল তারা তুলে দিয়ে আসবে না। তিন ভাগের দু ভাগ তারা নেবে, এটা হক—ন্যায্য প্রাপ্য। বলে, 'সবই তো আমাগোর। পীতাম্বরের আছে কি? তার বাপ-ঠাকুর্দা জমি কিনা রাখছিল, হের লেইগা অর্ধেক ধানে তার হক থাকব নাকি? বীজ-ধানের থেইক্যা শুরু কইরা—ভিজা পুইড়া হালার আমাগো পরান শুকাইয়া গেল—আর আধা বখরা দিমু তারে! ক্যান? মরুম? দেনায় জমি গেছে, ভিটা গেছে আর আছে কি?'

রাধা বলত একটা মিঠে বোকাটে কটাক্ষ করে, 'এইডা তো জগতের নিয়ম! ভাগে কাম কর না তোমরা?'

মনাই যেত চটে। বলত, 'তুই চুপ থাক দেহি! চিরদিনই এই অনিয়ম অনাচার থাকব নাকি? আমাগো হক নাই এট্টা? আমরা কি গোরু?'

'হা, হাচা কথা কইছ ভাই।' সুবল সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করত মনাইকে,—'আমাগো হক আছে, হেই কথা ভাবব কেডা আমরা না ভাবলে?'

তাকে আসতে দেখে সবাই চিৎকার করে ওঠে, 'সাধু আইও, কবি আইও!'

সুবল একেবারে মাঝখানে এসে ঘাড় কাৎ করে, গালে একটা হাত দিয়ে সুর দেয়, হা-আ, আ-হা-রে…'

ঢাকিরা এগিয়ে আসে সুবলের কাছে। সুবল ধরে ঢাকের তালে তালে ঃ

হায়—এ কি ঘটন ঘটল কলির রাজ্যে
মরা মাইনষের হকের লড়াই—
ঢাকের বোলে বাজছে !

ধান কাটতে কাটতেই সবাই ধুয়া দিয়ে ওঠে ঃ 'হায়—হায় রে !'

সুবলের বুকের মধ্যে দুলে ওঠে। এক উন্মত্ত নেশায় যেন পাগল হয়ে ওঠে সে। ঢাকের তালে তালে নাচতে দেখে ঢাকিদের মগজেও যেন কেমন নেশা চেপে যায়। তাদের কোমর দোলানি শুরু হতে থাকে, আস্তে আস্তে সারা দেহ এঁকেবেঁকে ওঠে সাপের মত।…সুবল আবার ধরে ঃ

আমার খুনের দানা কাইটা লমু মানি না হুকুমদারি।
কলিজার খুনের পরদায়—প্রাণ-বাচামু সত্য-যুগের হক্‌দারি।

'হায় হায় রে !' ধারালো কাস্তের দুরন্ত বেগের সঙ্গে ধুয়া দিয়ে ওঠে সবাই।

সারাটা বেলা সুবল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়ায়। কোথাও বাকি নেই। সারাটা পরগণা জুড়েই পড়েছে ধান কাটার পালা। শহরে দেখা সেই মেশিনের মত সবাই একযোগে নেমে পড়েছে মাঠে। সুবলকে অভিনন্দন জানায় সবাই। পরগণার প্রাণ সুবল। তাদের এই অভিনব নতুন দিনে সমস্ত ত্রাসটুকু সুবল যেন নীলকণ্ঠের মত গিলে নিয়েছে। তাই অসহ্য ভাষার আবেগে সুবলের জিহ্বা চঞ্চল, কণ্ঠ ক্লান্তিহীন।

অন্ধকার ঘোর হয়ে আসে। বাড়ি ঢুকতেই সুবল শুনতে পায় মনাই বলছে, 'জলটুকু খাইয়া ফেলো রাধা। মহেশ ঠাকুরের পড়া জল, মা ষষ্ঠীর চরণ ধোয়া। এব লেইগা হেই নিমাইহাটা গেছিলাম। কপালে যদি থাকে !'

বিস্মিত রাধা বলে, 'হ ? নিমাইহাটা গেছিলা নি ? হা আমার পোড়া কপাল !' একটা সশব্দ দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে তার।

সুবল কম বিস্মিত হয় না। এর মধ্যে ধান কেটে মনাই নিমাইহাটা থেকে ঘুরে এসেছে ! হতাশায় নুয়ে পড়া মনটায় এত আশা, এত অনুপ্রেরণা কোত্থেকে এল ?

'নে খাইয়া ফেলা। আর বাতাস লাগাইস না।' বাইরের হাওয়া লেগে পড়া-জল টুকুর মাহাত্ম্য নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে মনাই বলে।

রাধা দ্বিরুক্তি না করে ঢক করে খেয়ে ফেলে জলটুকু।

অন্ধকার উঠোনে দাঁড়িয়ে ঠাকুরের উদ্দেশে সুবল যুক্ত কর কপালে ছোঁয়ায়।

কিছু দিনের মধ্যে ধানকাটা প্রায় শেষ হয়ে আসে। সুবলের ডাক পড়ে এখানে। তাকে নিয়ে মাতে সবাই ধানকাটার গানে, শোনে তাদের বোবা মনের অবোধ্য, অব্যক্ত ভাষা—সুবলের গলায়।

কিন্তু সুবলের চোখে-মুখে একটা বিস্ময়ের ঘোর যেন সদাই লেগে আছে। সে রাধাকে দেখে আর থমকে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। ব্যাপারডা কি? এট্রা ম্যান্ কেমুন মনে হয়? হু!

কিন্তু বলতে পারে না কিছু। লজ্জা হয়, সঙ্কোচ হয়, দ্বিধা আসে মনে। হয়তো তা নয়। তবু এমন স্পষ্ট হয়ে ঠেকে সুবলের চোখে—যে সে নিজেকে আর অবিশ্বাস করতে পারে না। একদিন বলেই ফেলে, 'এট্রা কথা কমু, সখি, অপরাধ লইও না।'

রাধার মুখে হঠাৎ কেমন লালচে ছোপ ধরে যায়। লজ্জিত জিজ্ঞাসু চোখে তাকায় সে সুবলের দিকে। সুবলের দৃষ্টি তীক্ষ্ম হয়ে ওঠে। বেশ দৃঢ়ভাবেই বলে, 'তোমার পোলা হইবে সখি।'

হঠাৎ যেন একটা ভারী জিনিসে ধাক্কা খেয়ে রাধা কেঁপে উঠে টলতে থাকে। চোখ দুটো বুঁজে আসে। পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সুবল ধরে ফেলে তাকে তাড়াতাড়ি। —'কি হইল রাধা?'

কয়েক মুহূর্ত মাত্র। একটু পরেই রাধা আবার সোজা হয়ে দাঁড়ায়। তবু চোখের পাতা তার এত ভারী হয়ে এসেছে যে সে সুবলের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারে না। কয়েক মাস ধরে যে সন্দেহ সে মনে মনে গোপনে পোষণ করে আসছে, তাকেই দ্বিধার সঙ্গে প্রকাশ করে, 'বোধ হয়!'

সুবলের মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। —'বোধ হয় না, ভাই। এ আর কিছু না! তুমি নিজের দিকে চাইয়া দেখ না নাকি—আঁই? তা নইলে'—তার উৎসুক দৃষ্টিটা রাধার কটি-বন্ধনের কাছে গিয়ে থেমে যায়। বলে, 'কত দিন থেইক্যা?'

'প্রায় চার-পাঁচ মাস। আমার কিছু—' রাধার মুখে আর কথা ফোটে না। এত অসম্ভব লজ্জাবতী সে কবে থেকে হল।

সুবল কপাল চাপড়ায়—'হা পোড়া কপাল! এই পাঁচটা মাস তুমি মনাইরেও কিছু কও নাই?'

রাধার ঘর্মাক্ত হাতটা ছেড়ে দিয়ে সে প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'মনাই···মনাই হে! মানুষডা গেল কুনঠাঁই?' উচ্ছ্বসিত হয়ে বেরিয়ে পড়ে সে বাইরে।

রাধা চকিতে ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে কোমর থেকে কাপড়টা খুলে ফেলে: নিজের সামান্য স্ফীত জঠর সে মুগ্ধ বিস্ময়ে নিরীক্ষণ করতে থাকে। আলতো-ভাবে খুব সাবধানে গভীর মমতায় হাত বুলায়। হু, ক্যামুন ম্যান্ লাগে! গভীর সুখে তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। সে আজ বিজয়িনী, সে আজ সত্যি গরবিনী। কারুর চেয়ে কোন অংশে কম নয় সে। তার ইচ্ছে করে পেটের উপর কান পেতে শোনে তার সমাগত সন্তানের হৃৎস্পন্দন। কিন্তু তা হবার নয়। না হোক—সে স্পষ্ট অনুভব করে তার মধ্যে রয়েছে আর একটা মানুষ—ছোট্ট—এইটুকু।—তার মনাইয়ের সন্তান—রাধার সন্তান।

গভীর সুখানুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে সে। সত্যিই তো, মানুষটা গেল কুনঠাঁই? সে কি জানে না যে তার রাধা তার সন্তানের মা হতে চলেছে?

বাড়ির বাইরে আসে রাধা। মাঠের দিকে তাকায়। হ,—মাঠের উপর অনেক লোকজন জমা হয়েছে বলে মনে হচ্ছে! ব্যাপারডা কি? এক পা এক পা করে এগোয় সে।

ও! সভা ডেকেছে পীতাম্বর সা, সোনা মিয়া, জহুরুদ্দিন—সব জোতদারেরা। ক্যান্? দেশের অমঙ্গল হয়েছে, সর্বনাশ ডেকে এনেছি আমরা? অর্ধেক পথ থেকেই ফিরে আসে রাধা। মানুষডা হেই ঢ্যামনাগো কথা শুনছে বুঝি?

পোড়া কপাল!

পিছনে পিছনে সুবল আসে হন্তদন্ত হয়ে।

'শোন শোন সখি, এট্টা কথা শোন!' খুশি উপ্চে পড়ে তার গলায়—'বড় ভাল কলি মনে আইছে, শোন দেহি।' গুন্গুন্ করে ধরে সে ঃ

তা না না—না—না--রে—
পরান ছেঁচিয়া সোনা তুলিল নিজ ঘরে,
সোনায় আনিল সোনা মলিনার গর্ভে—
জননীর হাসিতে মা লক্ষ্মীগোলা ভরে।
অঘটন নয় হে সখি—শোন সখার কথা—
ভণ্ড কলি পরাস্ত, হাসি-খুশি মুক্ত বটে স্বরগের দেবতা!...

রাধা বিস্মিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে ওঠে—'হ, বড় মানানসই গাইছ কিন্তুক সখা। পরান ছেঁচিয়া সোনা তুলিল নিজ ঘরে—বড় হাচা গান গাইছ।'

সুবল মুচকি হেসে বেমক্কা জিজ্ঞাসা করে ফেলে, 'কেউরে খুঁজতে আইছিল' নাকি সখি?'

'উঁহুঁ!'—রাধা মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

সুবল গম্ভীর হবার চেষ্টা করে।—'আমি ভাবলাম বুঝি কোন মানুষরে খুঁজতে আইছ! তা—' হঠাৎ চোখাচোখ হতেই উভয়ে অজস্র হাসির আঘাতে ভেঙে পড়ে।

'যাঃ ফাজিল কুনঠাঁইকার!'

কুটিল কটাক্ষ হেনে রাধা তাড়াতাড়ি এগিয়ে যায়। পদক্ষেপের চঞ্চল বেগে তার সর্বাঙ্গ দুলে দুলে ওঠে, নেচে নেচে ওঠে। তার দোলায়মান দেহে ফুটে ওঠে মত্ত নাচের ভঙ্গি, হৃদয়াবেগের দৈহিক প্রতিচ্ছবি। সুবল গেয়ে ওঠে ঃ

জনম তপস্যা তব সফল হইল গরবিনী
হেলিয়া দুলিয়া চলে স্বামী-সোহাগিনী।
আহা—হেলিয়া দুলিয়া চলে—

গান শেষ করে বলে, 'বন্ধুরে আসতে কিন্তু দেরি হইব সখি। তাগো সমিতির ঘরে নাকি সভা হইব।'

রাধা ক্ষুব্ধ হয়। 'হ,—মানুষটার য্যান্ দিশা নাই। সমিতি আর সভা, এত ল্যাঠা ক্যান্?'

সুবল বুঝতে পারে রাধার অভিমান! অপরাধটা গায়ে পেতে নিয়ে ওর মনের কথাটাই সে প্রকাশ করে দেয়, 'একটা গোলমাল হইতে পারে, হামলা হইব বইলা মনে হইতেছে।'

রাধা চমকে ওঠে—সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। গ্রামবাসীর আশঙ্কা তাহলে সত্যি?

সুবল রীতিমত গম্ভীর হয়ে ওঠে। বলে, 'সখি, এই দুনিয়ার মানুষের কিছুতে হক কাড়তে হইলে পরান দিয়া লড়তে হয়। সোয়ামী তোমার হকদারির যোদ্ধা—লড়াই শেষ করতে হইব না তারে?'

'হ।' রাধা স্বীকার না করে পারে না।

পীতাম্বর সা-র সভা শেষ হয়। লোকজন ফিরতে থাকে রিক্ত মাঠের ওপর দিয়ে। রাধা ঘরে যায়। সন্ধ্যা দিতে হবে।

সুবল কেমন উদাস হয়ে যায়—দিগ্‌দিগন্তহীন শূন্য মাঠের দিকে চেয়ে। সমস্ত ফসল কাটা হয়ে গেছে, শুধু চোখে পড়ে এখানে-সেখানে জলে-ঘাসের হেলানো মাথা, বিলের কচুরিপানার উত্তোলিত ডগা বিরাট বিল জুড়ে ছাওয়া।...আবার আসবে পৌষ, কাটা হবে ফসল, সকলের গোলা হবে ভরতি। অনাহার নয়, দেনা নয়, রোগ নয়, মৃত্যু নয়, মা লক্ষ্মী থাকবে ঘরে বাঁধা। আর আবার রাধার দেহে নতুন সন্তান সম্ভাবনা হয়তো ফুটে উঠবে রেখায় রেখায়। আহা মানুষের সে জীবন কি সুন্দর—না জানি কেমন।

ক্রমশ রাত্রির অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। রাধা বলে, 'সন্ধ্যাবাতি দিতে গিয়া আমার হাত থেইক্যা ধুপতি পইড়া গেছে। সখা, কেমুন করতেছে মনডা। তোমার বন্ধুরে একবার ডাইকা লইয়া আহ!'

দ্বিরুক্তি না করে সুবল বেরিয়ে পড়ে। খানিকটা যেতেই দেখে—দক্ষিণের আকাশ লাল হয়ে উঠেছে। আর একটু পরেই দাউদাউ করে ওঠে লেলিহান আগুনের শিখা। ভেসে আসে একটা চাপা আর্তনাদ কোলাহল। কার বাড়িতে আগুন লাগল? এগোবার উপক্রম করতেই হঠাৎ একটা শব্দে চমকে সে রাস্তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। কে যেন আসছে! কিন্তু লোকটা সুবলের সামনে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে। রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞাসা করে, 'কে?'

মনাইকে চিনতে পেরে সুবল সামনে আসে, বলে, 'আমি সুবল, ব্যাপার কি?'

'আইছে, তারা আইয়া পড়ছে। আগুন লাগাইয়া দিছে সমিতির ঘরে। চল্—ঘরে চল্।' কেমন ব্যস্ত এবং রুদ্ধ শোনায় মনাইয়ের গলা।

বাড়ি এসে কিছু ছিঁড়ে মুড়ি নেয় সে কাপড়ে। সব শুনে রাধা সমস্তটাই ব্যবস্থা করে দেয়।

'হুলিয়া বাইরইছে আমাগো। বোঝলানি? নিমাইহাটার বংশী মণ্ডলের বাড়িতে চললাম রাধা। দেখিস, পারবি তো?'

রাধা গর্জে ওঠে, 'আমি শিবদাস মোড়লের মাইয়া না? ধান কাড়বনি আমার কাছ থেইক্যা? কত মায়ের দুধ খাইছে ঢ্যামনারা দেইখ্যা লমু। তুমি যাও গা—দেরি কইরো না।'

সুবল কোথাও যেতে অস্বীকার করে। মনাইয়ের কানে কানে বলে, 'তোমার বউ যে পোয়াতি, আমারে দেখতে হইব না?'

'হ?' মনাইও আবার বেঁকে বসে। বলে, 'তবে আর যামু না। পরান দিতে হয়—এখানেই দিমু।'

কিন্তু রাধা দৃঢ় গলায় আপত্তি জানায়, 'তোমারে ধইরা লইয়া যাইব যে। তুমি থাকতে পারবা না—যাও!' জোর করে সে মনাইকে সরিয়ে দেয়।

তারপর সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করে থাকে। সমস্ত গ্রামটাই প্রতীক্ষা করে থাকে অনিবার্য লড়াইয়ের দৃঢ় প্রতিরোধের জন্য। শত্রুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে সবাই। জান কবুল, তবু ধান ছাড়বে না কেউ। এ তাদের অভাব-অনটন রোগ-শোককে ছাড়িয়ে বাঁচার অভিযান।

রাত্রি ভোরেই ওঠে আর্তকোলাহল। এসেছে, শত্রু এসেছে। ধড়মড় করে উঠতে গিয়ে সুবলের ধাক্কা লেগে একতারাটা পড়ে যায়। থাক থাক। চকিতে একবার সেদিকে দেখে সে বেরিয়ে পড়ে।

ডুকরানি শুনে শ্রীশের বাড়িতে ঢোকে সে।

সব শেষ করে দিয়েছে। শ্রীশের বউ পড়ে আছে উঠানে—গালের কশ বেয়ে রক্ত ঝরছে। ঘরের সমস্ত ঘটি-বাটি-কাঁথা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে আছে উঠানের ওপর।

'পুলিশের লোক আমার মায়েরে মাইরা ফেলাইছে।'

সুবল চকিতে ফিরে দেখে শ্রীশের বারো বছরের ছেলে গোলার কাছে মায়ের উপর পড়ে চিৎকার করছে, 'মা মা গো।'……

সুবলের বুকের মধ্যে কান্না ঠেলে আসে। ছুটে বেরিয়ে আসে সে।

'সাধু…সাধু'…

সুবলকে ডাকছে রহিমের বড় মেয়ে। রহিমকে মেরে ফেলেছে ওরা। জমাট বেঁধে উঠেছে তাজা রক্ত রহিমের পাঁজরায়! রহিম! রহিম! কবি সুবলের দাঁতে দাঁত চেপে বসে যায়। নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে তার পদক্ষেপ। এ লড়াই কি শেষ লড়াই।

'মাইরা ফেলাইল গো…বাঁচাও!'

উলঙ্গ মানুর বউকে তাড়া করে আসছে পশুর দল।

মার—মার···

বহু দূরে থেকে মেয়েরা ছুটে আসছে দা কুড়ুল লাঠি ঝাঁটা যা পেয়েছে তাই নিয়ে। সর্বাগ্রে রহিমের বউ—হাতে কাটারি! আশ্চর্য! একদিন পেটের জ্বালায় রহিমকে ছেড়ে না সে অপরকে নিকা করেছিল! অপরের পর্দানশীন বিবি সে!

ডাকাতগুলি ততক্ষণে ধরে ফেলেছে মানুর বউকে। ইস্! পাশবিক ধর্ষণের এমন বীভৎস রূপ কল্পনা করতে পারে না সুবল। ধান-কাটা মাঠের শক্ত খোঁচা খোঁচা ডাঁটাগুলোর উপর ফেলে হিংস্র কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ছে সব। ভোরের স্পষ্ট আলো ঝাপসা হয়ে আসে সুবলের চোখে। পীতাম্বর সা'র উল্লসিত মুখটা কুৎসিত অট্টহাস্যে কেমন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে!

মার—মার—

মারমুখী মেয়ের দলকে কাছাকাছি এসে যেতে দেখে ডাকাতগুলো পীতাম্বর সা'র পিছনে পিছনে ছুটে পালায়।

মানুর বউয়ের কাছে উদ্বেগে ভেঙে পড়ে সব।—হায় ভগমান—বাঁচবনি?

পুলিশ নিয়ে পীতাম্বর সা'র দল ঘুরে আবার গ্রামের মধ্যে ঢোকে। রাধা একলা রয়েছে মনে হতেই সুবল ছোটে গাঁযের দিকে।

থেকে থেকে বন্দুকের শব্দে গ্রাম কেঁপে ওঠে। কেঁপে ওঠে সুবলের বুকের ভেতর। প্রাণপণ গতিতে সে ছোটে।

গুড়ুম! · তালা লেগে যায় সুবলের কানে।

'সুবল—সু-ব-ল!' কে যেন ডাকছে সুবলকে। পিছন ফিরে দেখে—মনাই! কেন আসছে? সে কি জানে না পুলিশ এসেছে গাঁয়ে। তছনছ, খুনখারাপি, ধর-পাকড় ভীষণভাবে হচ্ছে গাঁয়ের মধ্যে, শুনে দেখেও সে আসছে কেন?

আধখানা জিভ প্রায় বের করে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়ায় মনাই। মুখের দুই কশে থুথু জমে উঠেছে ফেনার মত।

'কেমুন মানুষ তুমি—আইয়া পড়লা যে?' সুবল ধমকে ওঠে উৎকণ্ঠিত গলায়।

মনাইও অনুরূপ উৎকণ্ঠায় বলে, 'গেরামের অবস্থাডা দেখছনি?'

'আরে—হেইর লেইগাই তো তুমি শিমাইহাটা গেছিলা। এইখানে আইলা কোন্ কামে?'

উদ্বেগে মনাইয়ের গলা কাঁপে—'পারলাম না রে সুবল সখা, মনডার মধ্যে কেমুন করতে ছিল, পারলাম না থাকতে। রাধার পেটে না পোলা! কত দিনের আশা—মনডা মানে না।'

'আমি আছিলাম না?' বলতে বলতে সুবল চলতে আরম্ভ করে। 'তোমারে যদি অহন ধইরা লইয়া যায়?'

'হ' সে আশঙ্কাও অস্বীকার করে না মনাই। তবু বলে উৎকণ্ঠিত করুণ গলায় 'রাধারে বারেক ভাল দেইখ্যা আবার আমি যামুগা।'

এদিক থেকে পুলিশ সরে গেছে। নিরুপদ্রবে মনাই আর সুবল এগিয়ে যায়।

বাড়িতে ঢুকেই মনাই থমকে দাঁড়িয়ে ডুকরে ওঠে, 'রাধা!'

রাধার মুখে সাড়া নেই। অক্ষত গোলার সামনে উবু হয়ে পড়ে আছে রক্তাক্ত রাধা।

মনাই পাগলের মত ছোঁ মেরে রাধাকে বুকে তুলে নেয়।—'রাধি রে।'

রাধার তলপেটটা যেন কে ছিঁড়ে দিয়েছে। অনর্গল রক্তধারায় ভিজিয়ে দিয়েছে মাটি।

'হে, রাধার পেটে না পোলা আছিল? বড় আশা—বহু দিনের…।' দাউদাউ করে আগুন জ্বলে ওঠে মনাইয়ের বুকে।

সুবল মনাইকে জড়িয়ে ধরে।

'—একটা পোলা আছিল। একটা—।' হুহু করে কেঁদে ফেলে মনাই।

সুবলের বুকে আগুন জ্বলে। রাধার রক্তে ধোয়া মাটির উপর দাঁড়িয়ে কম্পিত ঠোঁটে কি যেন ফিসফিস করে বলে। বলে আর তার চোখের দৃষ্টিটা ঝাপ্‌সা হয়ে আসে, বলে, 'তোমারে ভুলুম না কোন দিনের তরে।'

আলোর বৃত্তে

কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ?

টগর আর একবার জিজ্ঞেস করল। সন্দেহ আর বিদ্রূপ, দুই-ই আছে ওর গলায়।

কথা না বলে, চুপচাপ চল।

কেদারের মোটা চাপা গলা আক্রোশে ফুঁসে উঠল।

টগরের ঠোঁটের কোণে একটি রেখা বেঁকে উঠল। চলতে চলতেই অপাঙ্গে আপাদমস্তক দেখল একবার কেদারের। মুখের মধ্যে চর্বিত পানের সুপারি-কুচি বোধ হয় তখন ছিল। তাই হয়তো দাঁতে দাঁতে কাটার শব্দ হল কুট্‌ করে।

জল-কাদা ছিটকে গেল কেদারের পায়ের চাপে। একটা অস্ফুট শব্দ উচ্চারিত হল তার গলায়।

রাস্তাটা খারাপ। বহুদিন মেরামতের অভাবে নানান জায়গায় আলকাতরার প্রলেপ উঠে গিয়েছে। খানে খানে গর্ত হাঁ করে আছে। আলোর অবস্থাও শোচনীয়। সবগুলি জ্বলছে না। যেগুলি জ্বলছে সেগুলিও ছানি-পড়া চোখের মত জ্যোতিহীন। কলকাতার একেবারে পায়ের কাছে, উত্তর উপকণ্ঠে, এ-অঞ্চলটাও শ্রীহীন, দরিদ্র। যেন একটা চিরদুর্ভাগ্যের অভিশাপে, টালি, খোলা, টিন, জীর্ণ দেওয়াল, কাঁচা কানাগলি, খানাখন্দ, সব নিয়ে একই ভাবে অপরিবর্তনীয় অবস্থায় পড়ে আছে।

যদিও মাত্রই সন্ধ্যা উত্তীর্ণ, তবু আকাশে মেঘের ঘটাই লোক তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে রাস্তা থেকে। কালো মেঘ, ভারী জমাট, গোটা আকাশটাকে ঢেকে যেন একটা মন্ত্রস্তব্ধতায় থমকে আছে। চুপ করে আছে, এবং কোথাও থেকে, কোন অদৃশ্য থেকে খাপিস চোখে তাকিয়ে রয়েছে কোন দূর অন্ধকারের শূন্যে, এমনি একটা ভাব। কেবল মাঝে মাঝে বায়ু-কোণে ক্রুদ্ধ কটাক্ষের এক-একটা ঝিলিক হেনে উঠছে। '—আমি আসছি!' যেন বলছে, আর তার পূর্বলক্ষণ হিসাবে ভ্যাপসা পচা গুমসোনির গ্লানি ছড়িয়ে দিচ্ছে।

ওরা দুজনে সামনের দিকে তাকিয়ে চলেছে।

দুজনেই চুপ।

কেদারের ঘামে-ভিজে-ওঠা গায়ে একটা গেঞ্জি। মাপের থেকে ছোট, ছেঁড়া গুটোনো একটা খাকী প্যাণ্ট। খালি পা। মাথায় চুল কম। পাতলা চুলগুলি উষ্কখুষ্ক। সপ্তাহ দুয়েকের গোঁফ-দাড়ি মুখটাকে বড় করে দিয়েছে। রাগে ও উত্তেজনাতেও বোধ হয় মানুষের মুখ বড় দেখায়। রাগ এবং উত্তেজনার থেকেও আর কিছু ছিল কেদারের মুখে। হিংস্রতা আর নিষ্ঠুরতা। চাপা মোটা ঠোঁট, শক্ত চোয়াল, নিষ্পলক জ্বলন্ত চোখ। সাঁড়াশির মত শক্ত হাতের থাবা থেকে থেকে মুঠো পাকাচ্ছে, খুলছে!

আর তার কাঁধ-সমান টগর। টগরের কাজল-মাখা চোখেও দৃষ্টি অপলক। ভ্রূ ঈষৎ কোঁচকানো। পান-খাওয়া ঠোঁট দুটি লাল। মুখে একটু হিমানীর প্রলেপও আছে। কপালে কুমকুমের টিপ। চোখ-মুখের বিচারে প্রশংসা করবার মত কিছু নেই। কিন্তু একটা চটক আছে। একটা ভঙ্গি, একটা ছাঁদ, সব মিলিয়ে হঠাৎ একটা ফুটন্ত ফুল ফুল। কি ফুল তার বিচারে যেও না। সেই চটকটাই শরীরের বাঁধুনিতে বিদ্যমান। চোখে পড়ার মত। যেমন শাড়ির সবুজ ডোরাগুলি, কটির নিচে উচ্ছ্বিত, বৃত্তাকারে বাঁকা। চলার লয়ে উত্তরঙ্গ।

সাদায়-সবুজে ডুরে শাড়িটা ফর্সাই। বেগুনী রঙের জামাটাও গায়ে খুলেছে। গায়ের রঙটা মাজা মাজা, তাই। আর এ সবই সাজা, বোঝাই যাচ্ছে। এই কাজল হিমানী পান শাড়ি, এর কোন কিছুই অনেকক্ষণের নয়। এ সবই যখন অঙ্গে তুলেছিল টগর, তখনই কেদার চোয়াল শক্ত করে চোখ-খাবলার মত তাকিয়ে দেখছিল। এই খানিকক্ষণ আগে মাত্র। ভাঙা আয়নাটা বেড়া থেকে তুলে, টগর মুখটা দেখছিল। তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল কেদারের ভাবসাব সে লক্ষ্য করেছে। সামান্য একটু অস্বস্তির ছায়া মুখে পড়েছিল কিনা ধরা যাচ্ছিল না। কিন্তু ঠোঁটের কোণ একবার বেঁকে উঠেছিল টগরের। তারপর উল্টে জিভ দিয়ে চেটে বিম্বোষ্ঠা হয়েছিল। ভ্রূ টেনে, টিপটা লক্ষ্য করেছিল, ঠিক মাঝখানেই এঁকেছে। দেখে, আয়নাটা রেখে, সেই গুহা, হ্যাঁ ঘরটা গুহার মতই নিচু, লম্বায় চওড়ায় ছ হাত বাই তিন হাত, উচ্চতায় তিন চার ফুট হতে পারে, সেই গুহার ভিতর থেকে হামা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। লম্ফর আলোয়, তার ছায়ার আড়ালে দু বছরের ছেলেটা ঘুমোচ্ছিল। টগর বেরিয়ে যাবার পর, ছেলেটাকে দেখা গিয়েছিল।

টগর বেরিয়ে যেতেই কেদার একবার তাকিয়ে দেখেছিল ছেলেটার দিকে। তারপর ডেকে উঠেছিল, দাঁড়াও। আমার সঙ্গে যাবে।

ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মাঝামাঝি গলায় জিজ্ঞেস করেছিল টগর, কোথায়?

কেদার বেরিয়ে এসে ঘরের মুখে ঝাঁপ টেনে দিতে দিতে বলেছিল, যেখানে যেতে বলি, সেখানেই।

তখনই কেদারের চাপা মোটা গলায় একটা ভয়ংকর নিষ্ঠুর সুর বেজে উঠেছিল। টগরের বুকে কিংবা কাঁধের ওপর নিবদ্ধ চোখ দুটো হিংস্রতায় জ্বলছিল কেদারের।

টগর কিন্তু ফিরে তাকায় নি। তার মুখটা কঠিন হয়ে উঠেছিল। নিষ্ঠুরতা কিংবা হিংস্রতা সেটা নয়। একটা দৃঢ় কঠিন পণে, ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, দূরে অন্ধকারের দিকে স্থির অপলক চোখে তাকিয়ে, এক মুহূর্ত চুপ করে ছিল। যেন কি একটা সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। তারপর স্পষ্ট নিচু গলায় বলেছিল, ছেলেটা?

ঘুমোক।

উঠে পড়লে?

লোকে দেখবে।

তা লোক ছিল। ফুটপাথের ওপর, লম্বা পাঁচিল ঘেঁষে লাইনবন্দী খুপরি। প্রতি খোপেই লোক। এক-একটা পুরো পরিবার এক-একটা খোপে। হোগলা, গোলপাতা, ছেঁচা বেড়া, টিনের টুকরো, নানান জোড়াতালিতে খুপরিগুলি তৈরি। একদা এরা রিফ্যুজি ছিল। এখন কি তা নিজেরাই হয়তো ভুলে গিয়েছে।

টগর বলেছিল, চল।

কেদার পা বাড়িয়েছিল। দুজনের কেউই ছেলেটার জন্যে কাউকে কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করে নি। কেবল, কয়েক পা এগিয়েই টগর যখন বাঁদিকে মোড় নিতে যাচ্ছিল, তখনই কেদার চাপাস্বরে গর্জে উঠেছিল, বারো খোপের কবুতরি! ওদিকে না, এদিকে।

টগর একবার ঠাণ্ডা তীক্ষ্ম নিষ্পলক দৃষ্টিতে কেদারের জ্বলন্ত চোখের দিকে তখন তাকিয়েছিল। সারা পথে সেই একবারই চোখে চোখ মিলেছিল ওদের। খুব সূক্ষ্মভাবে, তখন একবার বোধ হয় টগরের চোখের কোণ দুটি কুঁচকে উঠেছিল আর নাকের পাশে, ঠোঁটের কোণে, রেখা একটু গাঢ় হয়েছিল। যাতে সম্ভবত একটা বিদ্রুপের আভাসই ছিল। আর ঘৃণা, হ্যাঁ ঘৃণাও ছিল বোধ হয়। একটা ঈষৎ সন্দেহের স্পর্শ।

সেই পথ ধরেই, দুজনে এ পর্যন্ত এসেছে। হয়তো কেদার ভেবেছে, সমস্ত পথটাই এ রকম অন্ধকারময় দুর্ভাগ্য অঞ্চলের ওপর দিয়ে চলেছে। বড় রাস্তায় একবারও পড়ে নি। কিংবা তার গন্তব্যের এই হয়তো রাস্তা।

এবং তখন থেকেই দুজনের এই একই রকম ভাব। কোন পরিবর্তন হয় নি। একজন যেন রাগে হিংস্রতায় ভিতরে ভিতরে অস্থির নিষ্ঠুর। আর একজন কঠিন ঠাণ্ডা। কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, টগরের থমথমে কাঠিন্যের মধ্যেও একটা দপদপে আগুন-চাপা ভাব। তবু. হঠাৎ একটা সন্দেহ তার ভ্রূ জোড়া কাঁপিয়ে দিল। শ্লেষের একটু খোঁচা মিশিয়ে কথাটা বলল। আর কেদারের জবাব শুনে হঠাৎ টগরের পদক্ষেপই যেন দ্রুত হয়ে উঠল। কেদারের পায়ের চাপে জল-কাদা ছিটকে গেল।

মেঘ গলছে না। জমাট বেঁধেই হয়তো একটু একটু করে নামছে। কারণ অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসছে। বায়ু-কোণের অস্পষ্ট চিকুরহানা ঝিলিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর রাস্তাটা যেন এঁকে-বেঁকে ধীরে ধীরে নিচের দিকে যাচ্ছে। অঞ্চলটাই হয়তো নিচু। কারণ এখানে-সেখানে বর্ষার জল জমে রয়েছে। নর্দমাগুলিও কাঁচা। তার থেকে নোংরা জল উপছে উঠেছে।

এ সমস্ত অঞ্চলটাই যেন পৃথিবীর বাইরে। এই অস্পষ্ট, আবছা, ছায়াময়, বাতাসহীন পরিবেশ। অধিবাসী এবং পথচারীরা যেন ঠিক মানুষ নয়। কতকগুলি ছায়া। ছায়াগুলি কিম্ভূত। কেউই স্পষ্ট ভাষায় কথা বলছে না। অস্পষ্ট, ভাঙা ভাঙা, চুপি চুপি, নানান রকমের মিশ্রিত গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে এক-একটা ভারী মোটর-ট্রাক, সগর্জনে লাফাতে-লাফাতে, আলোর ঝলক বিঁধিয়ে পিছন থেকে সামনের দিকে দৌড়ুচ্ছে। গাড়িগুলি আবর্জনা ভরতি।

টগরের ভ্রূ আর একবার কেঁপে উঠল। ঠোঁট নড়ল। নত চোখের কোণ দিয়ে একবার কেদারের হাত-পা-কোমরের দিকে দেখল। কিন্তু কিছু বলল না। আবার ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, সামনের দিকে তাকিয়ে হাঁটতে লাগল। খসে-যাওয়া ঘোমটা তুলে দিল। টুংটুং করে বেজে উঠল লাল নীল বেলোয়ারী চুড়ি।

কেদারের ভাবান্তর অবিশ্যি কিছু দিন ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। চুপচাপ, গম্ভীর এবং সব সময়েই যেন কি ভাবছে। সেই গুহাটার মধ্যে, কালো কঠিন থ্যাবড়া হাত, পা-গুলি গুটিয়ে, একটা কোণ নিয়ে বসে থাকছিল চুপচাপ। টগরের সঙ্গে কথাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল।

সারাদিন যা-ও বা দু-চারটে বলছিল, সন্ধ্যেবেলা একেবারেই মুখে খিল। একটা ভয়ংকর আক্রোশে, প্রায় সাপের মত ঘাড় কাত-করা অপলক চোখে যেন টগরের বেশভূষা বদলানো দেখছিল।

ওই সময়েই টগর সারাদিন পরে লুটি-লুটি ধূলি-ধূলি ন্যাকড়াটা গায়ের থেকে খুলত। আর এই জামা-কাপড় পরত। এই কাপড়টা, এই জামাটা। পুরনো বিবর্ণ একটা সায়া পরত তখন, আর একটা 'বডি'। টগর ওটাকে তাই বলে। যেটা প্রথম বুকে আঁটতে ওর লজ্জা করেছিল। কেমন একটা অসভ্যতা বলে মনে হত। মনে মনে বলত, ছি! এ আবার কি? কেদারের চোখ দেখেই বুঝতে পারত, ওটা পরলেই সে ক্ষুধাতুর চোখে চেয়ে থাকে। বলে, কেমন বেশ দেখায়।

পরে টগর মেনে নিয়েছিল। সারাদিন নয়, সন্ধ্যাবেলার সময়ের জন্যে। সন্ধ্যাবেলায় জামা-কাপড় পরে সাজত টগর। কাজল হিমানী মাখত। কপালে টিপ দিত। পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করত। কেদার বসে-বসে দেখত। সারাদিন নানান উঞ্ছবৃত্তি করে, সামান্য রোজগারের ধান্দা করে এসে, বসে-বসে দেখত। সরকারী ডোল বন্ধ হয়েছে কয়েক মাস। তার আগে, কয়েক বছর ধরেই কেদার

অনেক রকম কাজের ধান্দা করেছে। কিন্তু, কিছু পায় নি। কাজেই যে বাজারটা আছে, সেখানেই ঝাঁকা মুটে, বাজারওয়ালাদের মাল খালাস, এ সব ছাড়া কিছু জুটিয়ে উঠতে পারল না। এবং এ সব কোন দিন করতে হবে ভাবে নি। করেও, দুটো পেট চালানো দুরূহ হয়েছিল। পেট তো সরকারী ডোলেও চলছিল। কিন্তু মানুষ নামের পরিচয়টা ক্রমশ ভুলে যেতে হচ্ছিল। যেতে হচ্ছিল নয়, ভুলেই গিয়েছে বা।

সাত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল টগরের। নমশূদ্রদের ঘরে যে রকম হয়ে থাকে। তেরো বছর তখন কেদারের। বিয়ের দু বছর পরে দেশ ভাগাভাগি। তার তিন বছর পরে এ-দেশে এসেছিল। তখন কেদারের বাপ-মা ভাই-ভাজেরা ছিল। তারপর বাপ-মা মারা গিয়েছে। ভাইয়েরা কে কোথায় ছিটকে গিয়েছে। কেদার টগরকে নিয়ে আরও অনেকের সঙ্গে শহরের এ-তল্লাট কামড়ে পড়ে রয়েছে। তাও আট বছর হয়ে গেল।

এই পৃথিবীতে মানুষেরা যা-ই করুক, প্রকৃতি তার নিয়মেই চলে। গ্রীষ্ম আসে, বর্ষা আসে, সূর্য একটা অয়নবিন্দু থেকে আর এক বিন্দুতে ফিরে যায়। ঠিক তেমনি, দাঙ্গা, দেশভাগ আর দেশ ছেড়ে পথে, পথের ধুলায়, একদা কেদার যুবক হল, আর টগর যুবতী। এবং একদা ওরা দুজনেই আবিষ্কার করল, দুজনের একটা খোপ না হলে চলে না। সেই আবিষ্কারের প্রথম ফল একটি মেয়ে, জন্মের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মরে গিয়েছিল। পরের ফল ছেলেটা এখনও বেঁচে রয়েছে।

তারপরেই তো এল সেই সাজার পালা। টগর সাজত, কেদার বসে-বসে দেখত। প্রায় ছ মাস ধরে এই চলছে।

প্রথম টগর আপত্তি করেছিল।—না ছিঃ!

কেদার হেসে বলেছিল, আ রে! দ্যাখ মেয়েমানুষের বুদ্ধি। শুধু টোপ দেখিয়ে যদি মাছ ধরা যায়—

টগর বলে উঠেছিল, না।

তখন কেদার বলেছিল, এইটুকুতেই আপত্তি? একবেলা খাই, টগর তোর প্রাণে একটু দয়া-মায়া নেই?

কথাটা লেগেছিল প্রাণেই। তাকে দয়া-মায়ার খোঁটা দেয় কেদার। আজকের মতই এমনি ঠোঁট টিপে, কেদারের মুখের দিকে তাকিয়েছিল টগর। তারপরে কেদারের শরীরের দিকে। হঠাৎ একটা নিশ্বাস ফেলে ভাঙা আয়নাটা তুলে, টগর নিজের মুখখানি দেখেছিল। মনে মনে হাসতে গিয়ে, অস্বস্তিতে থমকে গিয়েছিল। তবু রাজি না হয়ে পারে নি।

প্রথম প্রথম কেদার দেখত, আর হাসত। বলত, শালার খিঙ্গি শোল যাবে কোথায়? এমন তাজা চকচকে আরশোলার টোপ!

টগর হাসত কি না-হাসত, বোঝা যেত না। ঘাড় বাঁকিয়ে চোখ তুলে বলত, একটু লজ্জা করে না বলতে ?

কেদার বলত, নে রাখ, এই নিয়ে আবার লজ্জা ! এতে তোরই বা কি। আমারই বা কি। তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।

সাচ্চাগিরি দেখাচ্ছে আমাকে !

কেদার চাপা গলায় ফুঁসে উঠল। আর ক্রমাগত নিচু পথটার জল-কাদার ওপর দিয়ে ছপ্‌ছপ্‌ করে এগিয়ে চলল। পরমুহূর্তেই দাঁতে দাঁত পিষে উচ্চারণ করল, চেমনি !

টগরের চোখেও যেন একটা হিংস্রতা দপ্‌ করে জ্বলে উঠল একবার। ঠোঁটে ঠোঁট আরও শক্ত করে চেপে বসল। কঠিন মুখে স্ফীত নাসারন্ধ্রে, ঘাড় না ফিরিয়ে, চোখের তারায় একবার পাশ থেকে দৃষ্টি হানল।

ক্রমেই বাতির সীমানা পেরিয়ে, দিগন্ত-বিস্তৃত অন্ধকার এগিয়ে আসছে। ক্রমেই লোকালয় কমে আসছে আর মেঘ জমাট আকাশ এবং পৃথিবীর নিঃশব্দ কালো হতে দুজনকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

টগরের ঠোঁটের কোণে হঠাৎ চিকুর হেনে গেল। চাপা তীক্ষ্ম স্বর শোনা গেল তার, লজ্জা করে না !

চুপ !

সজোরে কনুইয়ের ধাক্কা এসে লাগল পাঁজরে। কিন্তু টগর থামল না। পাঁজরে ব্যথা লাগল হয়তো। তবু মুখের ভাব অপরিবর্তিত রইল। এবং আবার উচ্চারণ করল, মুরোদ !

চুপ বলছি ! প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কেদার। চকিতে একবার ফিরে তাকাল আশেপাশে। বোঝা যাচ্ছে, একটা নিষ্ঠুর বাসনায় সে অস্থির হয়ে উঠেছে। কিন্তু কঠিন বিদ্রূপে টগরের ঠোঁট উল্টে গেল। সে কাদার উপর দিয়ে সমান তালে এগিয়ে চলল।

টগর সাজত। ছেলে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে কেদার দেখত। তারপরে টগর বলত, চল।

ঘুমন্ত ছেলেকে ঝাঁপ বন্ধ করে রেখে দুজনে বেরুত। একটু এগিয়ে, পাঁচিলের ধারে, জল-কলের পাশেই বিষ্টুর মূর্তি ভেসে উঠত। তাদের খোপেরই এক অধিবাসী বিষ্টু। অন্ধকার পৃথিবীর এক মূর্তিমান দূত। অনেককে সে অনেক পথের সন্ধান দিয়েছে।

কেদার দাঁড়িয়ে পড়ত। বিষ্টুর সংকেতে কেদার এগিয়ে যেত। সেখানেও মানুষের সব ছায়া। অনেক দূরে দূরে নিষ্প্রভ আলো। তা আলো দেয় না,

অন্ধকারকে ছায়ালোকের রহস্যে ভরে তোলে। দু পাশের কারখানা পাঁচিলের গায়ে, স্বল্প পথচারীদের পায়ের শব্দ কয়েদখানার সাবধানী প্রহরীর পায়ের প্রতিধ্বনিতে বাজে। আর সেই আবছায়ায় দুটি কাজল কালো চোখের তারা যেন অনুসন্ধিৎসায় বিচ্ছুরিত হত। দুটি লাল ঠোঁট জেগে উঠত, ভাসতে ভাসতে যেত একটি ডোরাকাটা উচ্ছ্রিত দেহের তরঙ্গ।

বিষ্টুর সংকেতে টগর যেন একটা মন্ত্রের মায়ায় এগিয়ে চলত। তারপরে আবছায়ার আর এক বিন্দুতে ভেসে উঠত রতনের মুখ। খোপের অধিবাসী, অন্ধকারের আর এক দূত। রতনের সংকেত লক্ষ্য করত টগর, ঘাড় না ফিরিয়ে, নিঃশব্দে, চোখের পলকে। আর মন্ত্রাচ্ছন্নের মত এগিয়ে চলত। জাল বিস্তৃত হত। নিঃশব্দে, আটঘাট বেঁধে, জাল পাতা হত, ছড়িয়ে পড়ত। শিকার বড় কানখাড়া ভীরু এবং সুচতুর। সাবধান! এগিয়ে চল। দাঁড়াও একটু। তোমার পাশে একটা শিকারের ছায়া। তাকাও!···হল না। এগিয়ে চল।

দূরে দূরে বিষ্টু আর রতন। প্রতি পলে পলে তাদের সংকেত। মন্ত্রাচ্ছন্ন টগরের নিশ্বাস ক্রমেই দ্রুত হত। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসত। বুকের থেকে একটা আগুনের শিখা উঠে, চোখের দরজায় এসে স্থির হয়ে জ্বলত। এগিয়ে যেত। সাবধান! শিকার সামনে। আস্তে চল। আরও আস্তে। তাকাও। একটু হাসো। বারে বারে তাকাও। অন্য দিকে তাকাবার অবসর দিও না। আর একটু হাসো। ভয় নেই, চোখ নামিও না! দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে পড়।

টগরের বুকের মধ্যে ধকধক করত। নিশ্বাস গলার কাছে এসে ঠেকে থাকত। গায়ের কাছে একটা পুরুষ। একটু অস্ফুট খ্যাঁকারি। তারপর 'কোথায় থাকা হয়?' নীরবতা। 'নতুন নামা হয়েছে বুঝি?' তাকাও। 'ঘরের বউ বলে মনে হচ্ছে।' খুশির স্বর। চোখ নামাও। 'কোন জায়গা-টায়গা—'

কি হয়েছে? কিসের জায়গা মশায়?

বিষ্টু যেন সহসা, অন্ধকারে পড়ে-থাকা সাপের মত ফণা তুলে এসে দাঁড়াত। আর চমকানো থতিয়ে যাওয়া একটা শব্দ উঠত, অ্যাঁ?

সঙ্গে সঙ্গে বিষ্টুর ঠোঁট বেঁকে উঠত।

ও! গরীবের মেয়েছেলেকে রাস্তায় দেখেছেন, আর অমনি—। কথা শেষ করার আগেই, গোখরোর পাশেই শঙ্খচূড়ের মত রতন ভেসে উঠত।

কি হয়েছে রে বিষ্টু?

বিষ্টুর নিষ্ঠুর বিদ্রূপ একটা ভীরু অসহায় বুকে যেন ছোবল বসিয়ে দিত। এই আমাদের টগর-বউদিকে লোকটা কি সব বলছে। খারাপ কথা, না বউদি?

সত্যি বুঝি ভয় এবং লজ্জা হত টগরের। হয়তো কান্নাও পেত। কিংবা সেই রকম একটা ভঙ্গীতেই টগরের ঘাড় নড়ে উঠত। আর সঙ্গে সঙ্গে উৎকণ্ঠিত ভয়ার্ত একটা পুরুষের গলায় শোনা যেত, না, মানে······

না মানে আবার কি ? যাচ্ছেন কোথায় মশায় ?

রতন জামা টেনে ধরত।

অসহায় ভীরু অপরাধীর চোখের দৃষ্টি চারদিকে একবার দেখে নিত। আত্ম-সমর্পণের আকুতি শোনা যেত, যাচ্ছি না ভাই।

নিষ্ঠুর ভয়ংকর গলা শোনা যেত, যেতে দিচ্ছে কে ? লোকজন ডাকি, পুলিস আসুক, তারপরে তো।

তখন মৃত্যুর গ্রাস থেকে যেন আর্তনাদ শোনা যেত, ক্ষমা করে দিন ভাই। মানে, আমি—

হুঁ ! ক্ষমা ? রতন বলত।

বিষ্টু ঘোষণা করত, তা ক্ষমা হতে পারে। মোটা মালকড়ি ছাড়ুন তো দেখি, কি আছে ?

তারপর শিকার বুঝে দরাদরি, টানাটানি। কিন্তু কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই, নাটকের সেই চরম দৃশ্য শেষ হয়ে যেত। কোন পক্ষেরই দেরি করার উপায় নেই। এবং তারপরেই হাতের মুঠোয়, ধাতু আর কাগজের মুদ্রা ঝনঝনিয়ে খসখসিয়ে বেজে উঠত।

টগর ফিরে আসত। বিষ্টু আর রতনের সঙ্গে গিয়ে মিলত কেদার। তখন টগরকে দেখে মনে হত, এই সবে যেন ওর প্রবল জ্বরটা ঘাম দিয়ে ছেড়েছে। কাজল হত চোখের কালি। ঠোঁট হত যেন বাসি রক্ত জমা শুকনো। মুখটা রক্তহীন ফ্যাকাসে। শূন্য নিষ্পলক নত দৃষ্টি নিয়ে টগর খোপে এসে বসত। ভাবত। অথচ প্রথম দিন এত মতলব করে এর শুরু হয় নি। সন্ধ্যার পর একদিন শুরুর দিন, জলকলের কাছে আবছায়ায় দাঁড়িয়ে ছিল টগর। রাত ন'টা হয়েছিল। সকাল থেকে কেদার খোপে ফেরে নি। টগর দূরের দিকে, অন্ধকারে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। আর যারা যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে সকলের দিকে চোখ তুলে তুলে দেখছিল। ঠিক তখনই একজন তার সামনে দিয়ে যাবার সময় থমকে দাঁড়িয়েছিল। চোখে চোখ পড়তে একটু বুঝি চমকেছিল টগর। চমকাবার কথা নয়। কতদিনই অর্ধ উলঙ্গ দেখেছে তাকে লোকে। লোভীর মত তাকিয়েছে। বুকটা কিংবা কাঁধটা একটু ঢাকবার চেষ্টা করেছে টগর। সেদিন সে বুকের আঁচলটা টানতেই যেন ভুলে গিয়েছিল। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে গিয়ে, আবার তাকিয়েছিল। তার ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল। লোকটা অস্ফুটে কি যেন উচ্চারণও করেছিল। আর ঠিক সে সময়েই, বিষ্টুরও আবির্ভাব হয়েছিল। দেখা গিয়েছিল, অপরাধীরা কত সহজে শিকার হয়। ওদের কথার মধ্যে আর টগর ছিল না। খোপে ফিরে এসেছিল। রাত্রে কেদার হাসতে হাসতে এসে পাঁচ টাকার একটা নোট দেখিয়ে বলেছিল, টগর, মাঝে মাঝে কলতলায় গিয়ে একটু দাঁড়ালেই পারিস।

টগর অবাক হয়ে বলেছিল, কেন ?

ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছিল কেদার। টগর আপত্তি করেছিল, না। ছি !

কিন্তু কেদারের কাছ থেকে যে প্রাণের দয়া-মায়ার খোঁটা সহ্য হয় নি টগরের। কেদারের সারাদিনের অভুক্ত ক্লান্ত শরীরটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ নিশ্বাস পড়েছিল তার। মনে হয়েছিল, আহা। তার প্রাণের পুরুষের শরীরটা যে সত্যি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই, যা একদিন কুড়িয়ে পাওয়া গিয়েছিল, তা চুরি করবার জন্যে হাত বাড়াতে হয়েছিল। এবং সব কিছুরই একটা ছাঁদ ভঙ্গি আছে। তাই, হিমানী কাজলও মাখতে হয়েছিল। আর কলতলা থেকে পায়ে-পায়ে পথ বিস্তৃত করতে হয়েছিল দূরে, আর একটু দূরে।

তারপর যা ছিল দ্বিধার, লজ্জার, ভয়ের, শঙ্কার, তাই হয়ে উঠেছিল অন্তঃস্রোতের একটা উত্তেজিত হাসির খোরাক। সঙ্কোচ কেটে যাচ্ছিল নিঃশেষে। কারণ, কেদার যে বলত, 'তুই আর আমি তো সাচ্চা আছি।' স্বভাবতই রতন আর বিষ্টু হয়ে উঠেছিল অন্তরঙ্গ। সাচ্চা প্রাণের ভয় কি !

প্রথম প্রথম যে অসুস্থতা বোধ করত টগর, বিতৃষ্ণা আর ঘৃণা, একটা রুদ্ধ অভিমানে কেদারের সঙ্গে কথা বলতে পারত না, সেটা সহজ হয়ে আসছিল। সাচ্চা প্রাণ, ঝুটা কাজ। সে কাজের আবার দায়িত্ব কি !

ছিল না কিছু ? আরও দূর অন্ধকার পথের সংকেত পাওয়া যায় নি বিষ্টু-রতনের কাছ থেকে। ওদের সেই সাহসের মুখের ওপর তো সাচ্চা প্রাণের মুখ-থাবাড়ি দেওয়া যায় নি। চুপ করে শুনতে হচ্ছিল। আর টগরের প্রাণের মধ্যে কি একটা অশুভ ছায়া যেন সাপের মত ফণা তুলছিল আস্তে আস্তে। একটা ব্যথা, হতাশা যেন গ্রাস করছিল তাকে। অনেক ঝড়ের দুর্ভাগ্যের মধ্যেও তাদের খোপের ভিতরে যে মেয়ে-পুরুষ পায়রা দুটোর বকম বকম শোনা যেত, তা বন্ধ হয়েছিল কবে থেকে। টের পাওয়া যাচ্ছিল না। খোপের মধ্যে, গায়ে-গায়ে শুয়েও ব্যবধান দুস্তর হয়ে উঠেছিল। এবং কয়েকদিন ধরেই কেদারের চুপচাপ স্তব্ধতা, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকা থেকেও কিছু আবিস্কার করা যায় নি। যেন সাচ্চা প্রাণ নিয়ে, নিঃশব্দে দুজনে খাচ্ছিল, শুয়ে থাকছিল। আর সন্ধ্যাবেলার অপেক্ষা করছিল। কিছুই তো করার ছিল না আর।

এই সাত দিন আগেই, সেজেগুজে যখন ডেকেছিল টগর, কেদার লুটিয়ে শুয়ে পড়ে বলেছিল সেই প্রথম, তুই যা !

শরীর খারাপ নাকি ?

হ্যাঁ !

ওষুধ খেলেই পারো।

হ্যাঁ, ওষুধ খাওয়ার পয়সা যে একেবারে নেই, সে অবস্থা তো আর ছিল না তাদের। কেদার বলেছিল, খাব।

কিন্তু, কেন, কথা বন্ধ কেন? অমন আগুনের মত চোখ করে, টগরকে দেখা কেন? আপত্তি? তাহলে তো বলতই। নিজেও তো কেদার রোজগারের জন্যে বেরুচ্ছিল না! ঝগড়া-বিবাদ চলছিল নাকি কারুর সঙ্গে, কে জানে। টগরের তো বসে থাকবার উপায় ছিল না। সময় বয়ে যায়। রাত পোহালেই যে ভাবনা, সে যেন টগরের কাঁধেই কবে গুটিসুটি এসে উঠেছিল।

কিন্তু কথা বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা রুদ্ধশ্বাস অবস্থা ঘনিয়ে উঠেছিল। কেদার যেন লোহার মত শক্ত হয়ে উঠেছিল। আর আগুনে গুঁজে রাখার মত, তেতে দপদপিয়ে উঠেছিল। এবং এই অকারণ বিতৃষ্ণা স্তব্ধতা, জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টিতে, টগরও যেন নিজের মধ্যে গুটিয়ে যাচ্ছিল। কঠিন মুখে অপলক চোখে, যন্ত্রের মত সব কিছু করছিল। তারপরেই তো —

ওদিকে কোথায়? চাপা ক্রুদ্ধ গর্জনে ফেটে পড়ল কেদার। টগরের কাঁধের কাছে সাঁড়াশি-থাবায় খামচে ধরে আর একদিকে ছুঁড়ে ফেলল প্রায় তাকে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, অসৎ! কুলটা!

হয়তো ভুল করেই টগর অন্য দিকে যাচ্ছিল। লোকালয়ের শেষ প্রান্তে, প্রেতচক্ষু শেষ আলোটার পাশ দিয়ে, আরও দূরের একটা আলোর দিকে চোখ ছিল বলেই বোধ হয় টগর আনমনে সেদিকে যাচ্ছিল। এখন রাস্তাটা আরও সরু হয়ে গিয়েছে। সামনের অন্ধকারে একটা দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তর চুপ করে পড়ে আছে বলে মনে হচ্ছে। সেই অন্ধকারের বুকে একটি গাঢ় উঁচু রেখা চোখে পড়ছে। যে রেখাটা পৃথিবী এবং মেঘ জমাট আকাশের মাঝখানটাকে অস্পষ্টভাবে ভাগ করে দিয়েছে।

বায়ু-কোণের ক্রুদ্ধ কটাক্ষের ঝিলিক এখন আরও স্পষ্ট। সেই ঝিলিকেই, অনুমান করা গেল, উঁচু গাঢ় রেখাটি রেললাইন। আর বায়ু-কোণের সেই দৃষ্টিশিখা সাপের জিভের মত ক্রমেই এগিয়ে আসছে। নামছে আস্তে আস্তে। চাপা গর্জনও এখন শোনা যাচ্ছে।

টগর আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। আলোর অস্পষ্টতায় প্রথমে মনে হল, কপালের কুমকুমের টিপ বুঝি ভ্রূর কাছে, কপালের পাশে সরে গিয়েছে। পর মুহূর্তেই সেই রক্তাক্ত বিন্দুটিকে গলে পড়তে দেখে বোঝা গেল, কপালটা কেটে গিয়েছে। টিপ ঠিক আছে। গালের পাশে কাদামাটি লেগেছে। কিন্তু বুক থেকে খসে-যাওয়া আঁচল শান্তভাবেই টেনে দিল টগর। চোখে তার আগুন আছে কিনা, বোঝা যায় না। জল নেই এক ফোঁটা। কঠিন জমাট মুখ, আর স্ফীত নাসারন্ধ্রে সে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে দূর অন্ধকারের দিকে তাকাল।

হিংস্র চাপা গলায় দ্রুত বলে উঠল কেদার, এবার বুঝতে পারছিস, কোথায় নিয়ে আসতে চেয়েছি তোকে? বলতে বলতে সে টগরের পায়ের কাছে এসে দাঁড়ায়।

ঝিঁঝি যেন আতঙ্কিত গলায় চিৎকার করছে। বায়ু-কোণ থেকে একটা তীক্ষ্ণ রেখা মাটিতে নেমে এসে দূরে চাপা স্বরে গর্জন করে উঠল।

টগর নিচু স্পষ্ট গলায়, দূরে চোখ রেখেই বলল, বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মিছে কথা বোলো না।

মিছে কথা? তুই কুলটা নোস?

না।

টগর উচ্চারণ করবার আগেই, হিংস্র উন্মত্তের মত তাকে আবার সজোরে আঘাত করল কেদার। এবারও টগর সামলাতে পারল না। অনেকটা দূরে গিয়ে ছিটকে পড়ল। ভারী পতনের সঙ্গে কাঁচের চুড়ি ভাঙারই ঠুংঠুং শব্দ বাজল বোধ হয়। এবং এবার উঠতে টগরের সময় লাগল। চেষ্টা করে, একটু একটু করে ঠেলে সে উঠল। আস্তে আস্তে আঁচলটা টেনে দিল। রক্ত লেগে গিয়েছে চোখের কোলে গালের পাশে। আর একটা চোখের কাছে ফুলে গিয়েছে কিংবা কাদাই লেগেছে। খোঁপা ভেঙে পড়েছে ঘাড়ের কাছে। কিন্তু মুখ কঠিনতর। ঠোঁট যেন চির-আবদ্ধতায় শক্ত। শুধু একটা নিশ্বাসের শব্দ উঠল। অপলক চোখের দৃষ্টি অন্ধকারে। বিদ্যুৎ সারা আকাশটাকে একটা ফালা করে দিল।

কেদারের গর্জন শোনা গেল, কসবী!

টগর মুখ না ফিরিয়েই আবার বলল, মিছে কথা বোলো না।

কেদার আঘাত করতে উদ্যত হয়ে একটা প্রবল বেগে ঝুঁকে পড়ে বলল, চুপ! চুপ! আমি জানি না? আমি বুঝি না? নষ্ট ছাড়া আর কারা এমন করে?

তুমি বলেছিলে।

তাই? তাই বুঝি? তাহলে এই করেই তোকে চিনতে পেরেছি। বেশ্যা!

এবার সহসা যেন রুদ্ধশ্বাসে বলল টগর, ও কথাটা আর বোলো না।

বলব। বলেই টগরের চুলেব মুঠি ধরে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে ঠেলে দিল কেদার। বলল, চল। ওই উঁচুতে তোকে টুকরো করে রেখে যাব।

টগর পড়ে গেল না। সে চলতে লাগল। ততক্ষণে বায়ু-কোণ থেকে সারা আকাশে ঘন ঘন চমক লেগেছে। রুদ্ধ বাতাসেব মুখও খুলে দেওয়া হয়েছে বোধ হয়। বাতাস বইতে শুরু করেছে। এবং সেই উঁচু রেখাটির কাছে দূরে একটি অস্পষ্ট আলোর ইশারা স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। ইঞ্জিনের ঝক্‌ঝক্ শব্দ এগিয়ে আসতে লাগল।

কিন্তু কেদার ক্রুদ্ধ চাপা গলায় বিড়বিড় করতে লাগল, তোর চিহ্ন আমি শেষ করব। লোপাট করব। আমি আর পারছি না। আর কিছুতেই পারছি না। তোকে নিয়ে···না, তোকে নিয়ে আমি আর··

কেদারের গলার স্বর টুঁটিচাপা হয়ে উঠল। আর হঠাৎ তার খেয়াল হল, টগর তার আগে আগে, দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। এবং দেখতে দেখতে, টগর দৌড় দিল।

ছুটল উঁচু রেখাটার দিকে, যেখানে তীক্ষ্ম আলোর বৃত্তটা ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে, এগিয়ে আসছে। ধোঁয়া উড়িয়ে, ভারী মালগাড়ি বেগে মাটি কাঁপিয়ে ছুটে আসছে।

কেদার চকিতে একবার থমকে দাঁড়াল। এবং মুহূর্তে তার সমস্ত অনুভূতি কাঁপিয়ে, তার মুখ দিয়ে আপনি উচ্চারিত হল, ও মরতে যাচ্ছে! টগর মরতে যাচ্ছে! কথাটা মনে হতেই তার বুকের মধ্যে একটা অসহ্য যন্ত্রণা বিদ্যুতের মত চিরে দিয়ে গেল। হঠাৎ ভয়ে এবং একটা তীর-বিদ্ধ কণ্ঠে সে চিৎকার করে উঠল, টগর! যাস না। টগর বড় কষ্টে···

কথা শেষ হল না। কেদার ছুটল। আলোর বৃত্ত সামনে। সেই আলোর টানে যেন তীরবেগে ছুটছে টগর। ইঞ্জিনের গর্জনে একটা ক্ষুধার চিৎকার উঠছে। এবং টগর, তখনও উচ্চারণ করছিল, বোলো না, ওগো বোলো না—

কেদার প্রাণপণ বেগে ছুটতে ছুটতে কেবল উচ্চারণ করছিল, টগর, আমাকে ফেলে যাস না। টগর তখন তোর সাত বছর·

আলোর বৃত্তটা পার হযে গেল। তারপরেই নিকষ অন্ধকারে, লাইনের বাইরেই সম্ভবত জড়াজড়ি করে পড়ে গেল দুজনে। কিংবা ভিতরেই। এত অন্ধকার যে, দেখা গেল না।

পলাতকা

সেই সময় সে এসে দাঁড়াল।

যখন চৈত্রের দুপুর ঝিমোচ্ছিল। যখন কলকাতা থেকে মাইল বারো দূরে উত্তরের এই স্টেশনটাও ঝিমোচ্ছিল এই দুপুরের মতই। অবসন্ন, হাত পা এলিয়ে চোয়াল নাড়া, ল্যাজে মাছি না তাড়ানো অবসাদগ্রস্ত চোখ বোজা জানোয়ারের মত।

যখন দক্ষিণের হাওয়াটা উঠছিল এলোমেলো হয়ে, আড় মাতলার মত টিন্ শেডের কানায় ঘা খেয়ে হঠাৎ দমকা নিশ্বাসের মত শব্দ তুলে যাচ্ছিল হারিয়ে।

যখন বড় গাছগুলির মাথা দুলছিল, স্টেশনের পুবের ঘন ঘন ঘাস কাঁপছিল আর আকাশ যেন উত্তাপের ভয়ে পাখা-মেলা চিলগুলিসহ হঠাৎ নেমে আসছিল খানিকটা। যখন স্টেশনটা, প্ল্যাটফর্মের ঘুমন্ত কুকুরটা হঠাৎ ঘাড় তুলে কিসের গন্ধ শুঁকছিল বাতাসে, কুলিরা উঁকি মেরে দেখছিল দূরের সিগন্যাল, স্টেশন-মাস্টার নাকের ডগায় চশমা নিয়ে তাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন আপিসে। যখন বয়স ও অবয়বহীন, ব্যাগ ও ছোটখাটো কাঠের বাক্স জড়ানো একটা মানুষের দলা স্তূপাকার দেহপিণ্ডের মত পড়ে ছিল ওয়েটিং রুমের কোণে, ডাউন প্ল্যাটফর্মের লোহার বেড়ায় হেলান দিয়ে। পুবের ফোর্থ লাইনে অপেক্ষমান এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ারাশি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়।

তখন সে এল। ধীরে এসে দাড়াল আপ প্ল্যাটফর্মের কিনারে। একবার দেখল উত্তরে আর একবার দক্ষিণে। তারপর পুবে ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওই স্তূপাকার দেহপিণ্ডের দিকে। সেইদিকে সে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, একটু বেশি কৌতূহল নিয়ে।

চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা কঠিন। হতে পারে আঠারো কিংবা বাইশ, নয়তো আরো দু-বছর বেশি। হতে পারে এমনও, সে পঞ্চদশী বা ষোড়শী। রোগা রোগা গড়ন, সেজন্যে একটু লম্বা মনে হয়। একটু লম্বা, যেন হঠাৎ ছোট একটা মেয়ে কিছুটা বেড়ে উঠেছে। মাজা মাজা রং, ফিতাহীন এলো খোঁপার রুক্ষ গোছাটা এত বড় যেন ওটার ভারে সে নুয়ে পড়েছে। দেহের সমস্ত গড়নটা যেন তার চুলেই কেন্দ্রীভূত। চোখ-মুখ বলার মত কিছু না, অথচ একটা না-বলার শান্ত দৃঢ়তার ছাপ তার মুখে। হাতে-কাচা একটা নীল শাড়ি

সাদাসিদেভাবে তার পরনে, গায়ে সাদা জামা। পায়ে রোদে জলে ধোয়া পোড়া মান্ধাতার আমলের স্যাণ্ডেল। কাঁধে একটা ছিটের ব্যাগ। ব্যাগটা নতুন। হাতে গোটা কয়েক কাচের চুড়ি। নাম তার পুষ্প,—পুষ্পবালা। পুষ্পর চোখগুলি বড় বড়, কিন্তু করুণ। তাকে দেখলেই মনে হয় যেন, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে একটু গোছগাছ করে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসন্ন সকালে। দাঁড়িয়েছে আশা ও সংশয় নিয়ে।

ওভারব্রীজের উপর দিয়ে সে এল ডাউন প্ল্যাটফর্মে। এসে বসল একটা বেঞ্চিতে। বেঞ্চিটার দু-তিন হাত দূরেই, একটা মাল-ঠেলা ট্রলির উপর গায়ে গায়ে লেপটে পড়ে ছিল সেই মানুষগুলি। ট্রলির নিচেও দু-একজন। কয়েকজন রেলিঙে হেলান দিয়ে রয়েছে। কোলে বগলে কাঁধে তাদের ব্যাগ, বয়াম, কাঠ অথবা টিনের ছোট বাক্স। মনে হচ্ছিল, সব মিলিয়ে দেহস্তূপটা নিশ্চল, নিঃশব্দ।

কিন্তু তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্তূপটা নড়ছে। কান পাতলে শোনা যায় চাকের মৌমাছির মত একটা চাপা গুঞ্জন। একটা গোঙানি।

পুষ্প দেখল সেদিকে আড়চোখে, বসল অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে। কান পেতে রইল ওই গোঙানি স্বরের মধ্যে যেন কোন গোপন কথা শুনছে, এমনি কৌতূহল তার বড় বড় চোখ দুটিতে। কোলের উপর টেনে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ব্যাগটা।

মনে হচ্ছিল গোঙানি। গোঙানি নয়, কথা। পুষ্পর পুরনো স্যাণ্ডেলের খস্‌খসানিতে কথাটা থামল। তারপর, চাপাস্বরে কেউ বললে—যেন পুষ্প শুনতে না পায়, কে রে বাইরন ওয়াটার ?

কিন্তু একাগ্রভাবে কান পাতায় শুনতে পেল পুষ্প। কিন্তু বাইরন ? এমন নাম শোনে নি জীবনে। তারপরের সব নামগুলিই আরও অদ্ভুত। বোধ হয় বাইরনেরই গলা শোনা গেল, একটা মেয়ে।

আইবুড়ো ?

বোঝা যাচ্ছে না।

কি রে নিমের মাজন ?

সম্ভবত জবাব দিল নিমের মাজন, কি জানি। ভিকস্‌কে জিজ্ঞেস কর। ও সব বোঝেও।

ভিকস্‌ বলল, কেন বাবা, মরটনকে জিজ্ঞেস কর না, বিক্রি বেশি, মানুষ চেনে।

মরটন বলল, তোদের যেমন শালা কথা। আজকাল আইবুড়ো আর নাইবুড়ো বোঝা যায় ?

তবে ভদ্দরলোক বলে মনে হচ্ছে।

আবার প্রথম গলাটাই শোনা গেল, এই জন্যেই তো বলছিলাম। দ্যাখ না, দু-পয়সার মাল যদি বিকোয় দুপুরের ঝোঁকে। কই রে দার্জিলিঙের নেবু।

বোধ হয় এবার জবাব দিল লেবুই। লেবু খাওয়ার মত চেহারা মনে হচ্ছে না—তারপর যা বলছিলি তার কি হল বল।

টিপটিপ করছিল পুষ্পর বুকের মধ্যে। এত জোরে টিপটিপ করছিল যে, বুকের কাছে আঁচলটা কষে টেনে দিতে হল তাকে। চোখে ত্রাসের ছায়া।

তবু কৌতূহল, আর তার মাজা মাজা মুখে হাসি লজ্জা ও ভয়ের মিলিত বিচিত্র ছাপ পড়ল।

আবার একটা ভাঙা ও চাপা উৎসুক গলা শোনা গেল ঃ তারপর কি হল রেন, থার্ড, পারিজ সুইট ? সুইটি না কি ?

জবাবে আবার সেই গোঙানিটা শোনা গেল ঃ তারপর আবার কি, ম্যাট্রিকটা পাস করে ফেললুম। মেদিনীপুর কলেজে ভর্তিও হয়েছিলাম মাইরি। কেঁচে গেল।

কি করে ?

যেমন করে কেঁচে যায়। পয়সা নেই। বাবা বললে, খুব হয়েছে। এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিগে যা। ম্যাট্রিক পাস হয়েছিস, বংশে এই প্রথম। আবার কি। শা- -লা।…

শালা কেন ?

কে দেবে চাকরি। ভিকস্ও তো ম্যাট্রিক পাস করেছে। কি রে কেষ্ট, বল না তোর চাকরির কথা।

ভিকস্ ভেংচে উঠল, আবার কেষ্ট কেন, ভিকস্ বলা যায় না ? ম্যাট্রিক পাস আবার কিসের ? সে তো করেছিল কেষ্ট রায়। মরে ভূত হয়ে গেছে কবে। এখন ভিকস্। সর্দি, কাশি, মাথা ধরা…

এই চাপাস্বরের গোঙানির মধ্যেই সমবেত গলার একটা হাসি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চাপা পড়ে গেল। যেন পোড়োবাড়ির রুদ্ধ অন্দরে দমকা হাওয়া পাক খেয়ে মুখ গুঁজে হারিয়ে গেল !

আবার, ওই যে কালি বিক্কির করে চশমাওয়ালা ছোঁড়াটা, ও নাকি গেজেট।

কে, দার্জিলিঙের নেবু বুঝি ? গজেট কি রে শালা। বল গ্রাজুয়েট।

দার্জিলিঙের লেবু তাতে লজ্জা পেল না। বলল, কি জানি। মুখে না এলে, জিভটা তো আর আঙুল দিয়ে নাড়া যায় না !

পাগল ! কিন্তু আসামের লেবু তো দার্জিলিঙের ঠিক বলতে পারিস ?

হ্যালহেলে গলায় হেসে জবাব দিল, তো ব্যাওসা চালাতে হলে…। যা বলছিলুম, গেজেটও শালা হকারি করে আর কি রকম ভদ্দরলোক দেখিছিস ছোঁড়াটাকে। নির্ঘাত কেটে পড়বে একদিন…।

কথাগুলি যেন গিলছিল পুষ্প। সে বসে ছিল পশ্চিম দিকে মুখ করে। কিন্তু চোখে তার ওদেরই কথার ছায়া। সব মিলিয়ে তার শিশুর মত মুখে কৌতূহল ও চাপা হাসির আলো পড়ে দুষ্ট মেয়ের ভাব হয়ে উঠেছে।

একটা নতুন গলা শোনা গেল আমিও শালা কেলাস এইট অব্দি পড়েছিলাম।

মাইরি ?

কেন, বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

না, বলি কোন্ ইস্কুলে ?

কেন, ঢাকা শহরের হাইস্কুলে ?

বটে ? তোরা তো আবার বিক্রমপুরের জমিদার ছিলি, না ?

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আর একজন, হ্যাঁ জমিদার। এখন চানাচুরদার হয়েছে।

আবার একটা চাপা হাসি ও ক্রুদ্ধ গলার গুঞ্জন উঠল। চানাচুরদারই বলে উঠল. আমি জমিদার ছিলাম না, আমার মেসোমশায়।

ওই হল। মায়ের বোনের বর তো ? আ হা হা উঠছিস কোথায় ?

না হয় শালা এইট অব্দিই পড়েছিস্। হল তো ? বোস্ এখন।

আর একটা নতুন গলা : আমি তো শালা জীবনে বই ছুঁই নি।

আমিও না।

আমি তো বই দেখলে কেটেই পড়ি শালা।

আর মেয়ে দেখলে জমে যাস।

আবার হাসি। তারপর শান্ত গম্ভীর গলায় একজন বলল, থাম থাম।

হরেন তারপর ?

হরেন বলল, তারপর আবার কি ? বিয়াল্লিশে দেশ স্বাধীন করতে গেলুম. গুলি খেয়ে ঠ্যাংটা গেল। তারপর লাঠি বগলে দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এই ট্রেনের হকারি। ক্ষণিক নৈঃশব্দ। শুধু ফোর্থ লাইনের বেকার এঞ্জিনটার সোঁ সোঁ।

তারপর আবার, মাইরি, আমাকে আবার লোকে গলায় মালা দিয়েছিল, যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলুম। আর এ লাইনের পুরনো হকাররা প্রথম প্রথম পাছায় লাথি মারত।

পুষ্পের শান্ত মুখের হাসিটুকু হঠাৎ উধাও হল। ব্যাকুল অথচ চাপা ব্যথায় ভরে উঠল মুখটা। ফিরে তাকাতে গিয়েও পারল না। শুধু কাত হয়ে পড়ল তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপা।

কে আর একজন বলল, আমার বৌটা মরে গেল তাই। নইলে—

একটা বিদ্রূপাত্মক কাঁচা গলা শোনা গেল : আমার তো বাপ মা সবই মরে গেল দাঙ্গায়।

বৌ গেলে বৌ হয়। বাপ মা—

আমার গ্লাস ফ্যাক্টরির চাকরিটা খেয়ে নিল শালা পালবাবু।

হঠাৎ সমস্ত দেহস্তূপটা থেকে অভাব, অভিযোগ, ব্যথা, ব্যর্থতার ক্রুদ্ধ একটা মিলিত গুঞ্জন উঠতে লাগল। যেন একনাগাড়ে উড়ে চলেছে এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। তারা কেউ বাপ-মা-বৌ হারিয়েছে, জমি-ছাড়া হয়েছে, ছাঁটাই হয়েছে

কারখানা থেকে, বিতাড়িত হয়েছে ঘর থেকে। কাউকে খাওয়াতে হয় গাদা গাদা পোষ্যদের, যোগাতে হয়, নয়তো স্রেফ শালা সিনেমা আর নেশা, মাইরি।

পুষ্পের চাপা বুকটার মধ্যে কি যেন কলরব করে উঠল ওদের মত। চুপি চুপি ফিসফিস করে আর্তনাদ করে উঠল, তার বুকের মধ্যে; বুড়ি মা, ছোট ছোট ভাই-বোন, অনাহার, পীড়ন, অপমান। বিয়ে, বর, ঘর ও শান্তির স্বপ্ন একটু ভালবাসা, এক ছিটে সোহাগ…

একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি চমকে দিল চৈত্রের দুপুরের ঝিম-ধরা স্টেশনটাকে। যেন গলা টিপে ধরল সমবেত গোঙানি-স্বরটা। চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ। তারপর শোনা গেল হাসির চেয়েও তীব্র শ্লেষভরা কথা, এই, হয়েছে। সব ব্যাটার সর্দি ধরে গেছে। লাও, ভিকস্।'

ভিকস দোস্ত, ভিকস্। সর্দি, কাশি, মাথা ধরা।

আর একজন ঃ আই কিওর, আই কিওর। লাগাও চোখের জল আর পড়বে না মাইরি বলছি।

আবার সাড়া পড়ল হাসির। আটকে-পড়া ঘূর্ণি জলের আবর্ত ছাড়া পেল। এবার কড়া হাসি চড়ল আরও। নিরাশার পাগলা হাওয়া সঙ্গী পেল অনেকগুলি।

আশ্চর্য। পুষ্পের চাপা-পড়া অস্থির বুকটাতে হুস্ করে হাওয়া লাগল একটু। সে শান্ত হল, বিপথ থেকে পথে ফিরল হৃদয়। একটু হাসিও দেখা দিল চোখে। খুলে পড়েছিল শুধু চুলের গোছাটা। সেটাকে বাঁধল আবার টেনে।

দূর থেকে ভেসে এল ট্রেনের হুইশল্। মাল-ঠেলা ট্রলিটা খালি করে ভেঙে গেল দেহস্তূপটা। যেন চাকের মৌমাছি সব খালি করে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথমে ক্রাচ ঠুকে ঠুকে এল হরেন, পারিজ সুইট। একটা বুক-খোলা, গায়ে-ছোট জামা আর সরু পাজামা। দূরে তাকিয়ে দেখল গাড়ি, তারপরে মহিলা প্যাসেঞ্জারের চেহারাটা অর্থাৎ পুষ্পকে। যদি দুটো লজেন্স কাটে। কিন্তু না, কোন আশা নেই। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আঁচল গড়ের মাঠ। কেবল তার খোঁড়া চেহারাটার দিকেই মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন জীবনে আর খোঁড়া দেখে নি কোন দিন। নেহাত ভদ্রলোকের মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পুষ্প। তারপর আর একজন। একজন একজন করে সবাই দেখল মাত্র একটি প্যাসেঞ্জারকে। বায়রন ওয়াটার, ভিকস্, মরটন, চানাচুর, পানবিড়ি, ফাউণ্টেন পেন…সকলে। এই দুপুরের ঝোঁকে যখন অনেক দেরিতে দেরিতে আসে ফাঁকা গাড়ি তখন ছুটকো খদ্দেরকে তারা এমনি শিকারী বাজপাখির মত দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু মস্ত চুপড়ির মত খোঁপা-ওয়ালা মেয়েটা যে কিছু কিনবে, এমন আশা হল না তাদের।

ইতিমধ্যে এল আরও দু-একজন প্যাসেঞ্জার। এল গাড়ি। দুপুরের লোকাল ট্রেন। অধিকাংশ দরজাগুলি খোলা, কামরাগুলি ফাকা। ভিখিরী অন্ধ আর

হকাররাই মাত্র যাত্রী। পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে দেদার। সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। তারাও ঝিমুচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে। কেউ বই পড়ছে নয়তো গান ধরেছে গুনগুন করে। এর মধ্যেই কোন কামরা থেকে ভেসে আসছে একঘেয়ে গান 'অন্ধ হয়ে ভাই কত দুঃখ পাই…।' যে গাইছে সে নিশ্চয় খাঁটি অন্ধ। নইলে চেঁচাত না ফাঁকা গাড়িতে। আর কামরায় কামরায় হকারদের চিৎকার নেই, দলে দলে গুলতানি চলছে।

কে একজন চিৎকার করে বলল, কই রে, প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা বসে রইলি যে?

জবাব এল, প্যাসেঞ্জারই নেই, কি হবে এখন গিয়ে?

প্যাসেঞ্জার কি আকাশ থেকে পড়বে? ছুটির সময় হল, শিয়ালদা চল।

প্রত্যেকটি কথা কান পেতে শুনল পুষ্প। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রত্যেকটি হকারের চেহারা। প্রত্যেকের চলা বলা হাসি, তাদের কথার ভঙ্গি। তারপর দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে একটা কামরার হাতল ধরল। ধরে উঠবে গাড়িতে, তেমন শক্তিটুকুও যেন নেই হাতে। এখান থেকে শিয়ালদা, মাত্র বারো মাইল যার দূরত্ব। তবু সে যেন কত দূর। কত দুঃসাহসের যাত্রা। বুকের মধ্যে ভয়ের ধুক-পুকুনি, ধড়ফড়ানি। আর এই মানুষগুলি, উষ্কখুষ্ক চুল, এবড়ো-খেবড়ো মুখ, ছেঁড়া ময়লা জামা। কাঁধে বগলে যাদের চলন্ত দোকান, ছুটন্ত ট্রেনের সংকীর্ণ পাদানির বিপজ্জনক পথে পথে চলেছে ছুটে। এত শক্তি কোথায় পুষ্পের দেহে।

কিন্তু সময় নেই ভাববার। বাঁশি বাজাল গার্ড। বাঁশি বাজল গাড়ির। তারপর কয়েক মুহূর্তের থেমে যাওয়া চাকাগুলি একটা তীব্র আর্তনাদ করে এগিয়ে চলল। যেন পুষ্পের সমস্ত সংশয় ও ভয়ের দাড়টাকে ছিঁড়ে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল তাকে শব্দটা। স্টেশনটা আবার ঝিমুতে লাগল পিছনে।

যেতেই হবে। এই পথের যাত্রী ছাড়া জীবনে আর কোন যাত্রা নেই। জীবনের সমস্ত যাত্রা আজ ঠেলে দিয়েছে এই পথে। মানুষের জীবনে তার পিছনটা শুধু ঝিমোয়, এই ফেলে-আশা স্টেশনটার মত। পুষ্পের পিছনটা কেবল তাড়া করে। কখনও দারুণ অভাবের বেশে, অপমানের বেশে। কখনও ঘৃণ্য লোভের মূর্তিতে, দুরন্ত কান্নার বন্যায়।

সুদীর্ঘ, বিরলযাত্রী কামরার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল পুষ্প। খোলা দরজা দিয়ে দুর্বার হাওয়া এসে বিস্রস্ত করে দিল তার শাড়ির আঁচল আর চুলের গোছা। দু-হাতে ব্যাগটি বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চল হয়ে তবু বসে রইল পুষ্প। পুষ্পবালা, ঢাকা জেলার কাছে বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়ে। তবু তার বুকে চাপা ভয়ের পাথর, ব্যাকুল সংশয়। সে পারবে কি? পারবে তো?

চোখের উপর ভেসে উঠল বিধবা মায়ের মুখ। সে মুখ মেয়ের প্রতি নির্দয়, অথচ মমতাময়ী। সেই মুখটি চোখে ভাসল আর মন বলল, পারব। অপোগণ্ড

ভাইবোনগুলির মুখ মনে পড়ল, আর বলল, পারব। তার নিজের ক্ষুধাকাতর পুষ্ট ও অপুষ্টতায় মেশা এই দেহ ও মন দাঁড়াল তার সামনে, মন বলল, পারব পারব। তার এই সুদীর্ঘ চুলের গোছা যতই এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ততই তার শিরদাঁড়া থেকে পায়ের দিকে একটা অদৃশ্য শক্তি নুয়ে-পড়া দেহটাকে সোজা করে দিয়ে ছুটে এল পারব পারব বলে।

ওই তো কয়েকজন যাত্রী আবার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার অতিকায় চুলের দিকে। চুলের ওইটুকুই তার রূপ। তার সুখ দুঃখ অপমান। বাবা বলত আদর করে, 'আমার এলোকেশী'। এই চুল একদিন আদর দিয়েছে, সোহাগ কেড়েছে। হাতিয়ে সুখ, আঁচড়ে দিয়ে সুখ, বেঁধে দিয়ে আনন্দ। অনেক সঙ্গিনী শুধু খেলার জন্যে দশটা করে বিনুনি বেঁধে দিয়েছে, শিবের মত দিয়েছে জড়িয়ে। আজও এ চুল মন টানে, চোখ টানে। আর পুষ্প ভাবে, এ চুল গলায় বেঁধে ঝোলা যায় না কড়িকাঠে? এ-চুলে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলে দরকার হবে না চিতার কাঠ সাজানোর।

তবু তো এ চুল মুড়িয়ে দিতে হাত উঠেও ওঠে নি। আগুন জ্বালাতে নিভে গেছে দীপশলাকা। প্রাণটাকে টিপে শেষ করতে গিয়েও থাবা গুটিয়ে এসেছে আপনি। মৃত্যু যে বাসা বাঁধে নি মনের কোথাও। সে তাকে ঠেলে দিয়েছে এই পথে। সে পারবে না কেন?

এই গরমের দুপুরবেলা যখন আপনার গলা শুকিয়ে আসছে—। কিশোর গলা শুনে চমকে চমকে উঠল পুষ্প। দেখল একটা ছেলে, কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার স্বরে চিৎকার করছে—যখন আপনার ঘুম আসছে আর শরীরটা ভার ভার লাগছে, তখন মুখে পুরে দিন এক স্লাইস মরটনের টকমিষ্টি লজেন্স। মুখ ভরে উঠবে রসে, নতুন এনার্জি আপনাকে ফ্রেশ করে তুলবে. না হলে পয়সা ফেরত। এক স্লাইস দু পয়সা. দু স্লাইস চার পয়সা, ছ স্লাইস দশ পয়সা। বলুন কোন দাদাকে দেব, বলে ফেলুন।

কিন্তু যাত্রীরা নির্বিকার। কেউ এক-আধবার তাকিয়ে দেখল, শুনল কেউ কেউ, ঝিমোতে লাগল অধিকাংশ। দুপুরের যাত্রী, ছাত্র-কেরানীর ভিড় নেই। খুচরো ব্যবসাদার, বেকার, উমেদার আর ভিখারির ভিড়।

এই যে, এখানে একটা দাও।

ছেলেটা ফিরে তাকাল আর হাসির রোল পড়ল। আর একজন মরটন লজেন্সের হকারই তাকে ডাকছে। বলল, দে না একটা, কেউ তো নেবে না, আমিই নিই।

দেখা গেল, মরটন, প্যারিজ, বায়রন, প্রগতিশীল কাগজ, ফাউন্টেন পেন, চানাচুর, সব একসঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে কামরার এক কোণে।

ছেলেটাও হাসল। তবু বলল, বলুন আর কারও চাই? শুধু শুধু ঝিমুবেন না, তেষ্টায় কষ্ট পাবেন না। এক স্লাইস আধঘণ্টা আপনার গালে থাকবে।

একজন ফিরে তাকাল। বোধ হয় বুড়ো উমেদার। ছেলেটা বলল, আধঘণ্টা থেকে একঘণ্টা স্বাদে গন্ধে ভরে রাখবে আপনার মুখ।

এক ঘণ্টা? লোকটি বলল, দেখি একটা।

ছেলেটি বলল, দুটো দিই?

এক ঘণ্টা থাকে তো গালে?

ছেলেটা বলল, না চিবুলে সোয়া ঘণ্টা থাকবে। পাথর. দাদা পাথর।

লোকটি কিনে ফেলল দুটো। আর কারও চাই, বলুন?

সে আবার লজেন্সের গুণগান আরম্ভ করল। আরও সুন্দর ভাষায়, জোরালো ভাষায়। আরও তিনটে বিক্রি হল।

পুষ্প জানে না, অজান্তেই তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। সে ভারি খুশি হয়েছে ছেলেটার কৃতকার্যতায়। হঠাৎ ছেলেটা তাকেই জিজ্ঞেস করছে, 'আপনাকে দেব এক স্লাইস দিদিমণি, মরটনস্ সুইট?'

বিস্মিত লজ্জায় চমকে পুষ্প ঘাড় কাত করে ফেলল। ছেলেটা কয়েক লাফে হাজির হল তার কাছে। পুষ্পর বুকের মধ্যে ঢাক বাজছে। পয়সা? পয়সা আছে তো? আছে। সাত পয়সা আছে। পয়সা বার করতে গিয়ে পুষ্প বারবার ছেলেটাকেই দেখছে। বোতামহীন, হাট-করে-খোলা জামার ফাঁকে হৃৎপিণ্ডটা থরথর করে কাঁপছে ছেলেটার। ঢোঁক গিলছে, কাশছে আর পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলছে খোলা দরজা দিয়ে। ছোট্ট মুখটিতে উত্তেজনা, বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরা। আর হলদে চোখ দিয়ে দেখছে পুষ্পর চুলেরই গোছা। সমীহ করে দেখছে, দিদিমণি বলে ডাকছে। পুষ্প ওদের খরিদ্দার।

সব মিলিয়ে যেন অনেকগুলি পোকা কুরে কুরে খেতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কেন, কেন পুষ্পকে ওরা ওদের সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না? পুষ্প যে ওদেরই মত এসেছে ব্যাগ কাঁধে ট্রেনের মধ্যে। দু-পয়সা দিয়ে লজেন্সটা ঘামে-ভেজা মুঠির মধ্যে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে, সারাদিনে কত বিক্রি হয়?

ছেলেটা একটু অবাক হল। একে খরিদ্দার তায় মেয়ে। ছেলেটা হঠাৎ দয়ার প্রত্যাশায় করুণ হয়ে উঠল। করুণা পাওয়ার জন্যে মিছে কথা বলল, সারাদিনে খেটে কিছু পাই না, জানেন। কয়েক পয়সা হয়।

হতাশা ঘিরে আসতে লাগল পুষ্পর মনে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা এমনি করে ঘোর, রেল কোম্পানি কিছু বলে না?

কি আর করবে। মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়, হাজতে পুরে রাখে।

কেঁপে উঠল পুষ্পর বুকের মধ্যে। বলল, টিকিট কাটলে হয় না?

ছেলেটা বলল, কিসের টিকিট? মান্থলি? মান্থলি, তো প্যাসেঞ্জারের। আমাদের লাইসেন্স চাই. ভেণ্ডারস লাইসেন্স। কোথায় পাব। গবরমেণ্ট তো দেয় না আমাদের। আর একটা লজেন্স দেব আপনাকে?

চমকে উঠল পুষ্প। বলল, অ্যাঁ! না, আর চাই না।

ছেলেটা চলে গেল। আর পুষ্প চটকাতে লাগল লজেন্সটা হাতের মধ্যে। তবে? লজেন্সটা পড়ে গেল হাত থেকে। থাক। পুলিস হাজত ও অপমান?

এ অপমান। কিন্তু তার যৌবন ও হৃদয়ের অপমান? সেই ভয়ঙ্কর ঘোর অন্ধকারের রাক্ষসটা? অদৃশ্যে যে রেখেছে তাকে চোখে চোখে?

তবুও পারল না পুষ্প। শুধু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে দাঁড়িয়ে রইল শিয়ালদা স্টেশনের জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে। ব্যাগটিকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। তার পসরার ব্যাগ। থরে থরে এনেছে সাজিয়ে। আর হকারের দল তাদের পসরা দেখিয়ে সেধে সেধে গেল তার মূঢ় মুখের সামনে।

সন্ধ্যাবেলা একটা ভিড়বহুল কামরাতে উঠে পড়ল পুষ্প। অফিস-ফেরতা মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে সমস্ত কামরাটা। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল পুষ্প। বুকটা কাঁপছে থরথর করে। কাঁপুক। তবু, বলবে, দেখাবে তার পসরা। দেখুক সকলে, সে একজন মেয়ে হকার।

হঠাৎ একটি যুবক কেরানী উঠে দাঁড়াল। চশমা-পরা চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তার পুষ্পের চুলের দিকে। একটু বিরক্ত হল বোধ হয়। কণ্ঠে কিছু সমীহ। বলল, বসুন আপনি।

চমকে উঠল পুষ্প। হকার নয়, যাত্রিণী। মহিলা যাত্রীর সম্মান ও কষ্ট লাঘব করা। পারল না, বসে পড়ল পুষ্প। বসে রইল মাথা নিচু করে। নারীর সম্মান। কিন্তু জীবন এমনই শক্ত চিড়ে যে, সে শুধু সম্মানের জলে ভেজে না। ক্রাচ্ বগলে পারিজ সুইট তখন বলছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলে গেছে স্যার। হাওয়া ঠাণ্ডা না হতেই, আবার ড্রাম বাজানো হচ্ছে। আপিসে এখনও অনেক হিসাব কষতে হবে। মাথা ঠাণ্ডা রাখুন, ভাবুন, পারিজ সুইট মুখে রাখুন। পারিজ কোকো সুইট্, চার পয়সা স্লাইস বাট ইকোয়েল টু ওয়ান কাপ কোকো।...

কে একজন বলল, এম-এল-এ-রাও নাকি অবাক হয়ে হকারদের বক্তৃতা শোনে। আর একজন যোগ করল, প্রফেসাররাও হার মানে।

ততক্ষণে অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে পুষ্পর। নিজের স্টেশনে নেমে, ঝাপসা চোখে অন্ধকার গলিপথে বাড়ির দিকে চলল সে।

কিন্তু আবার এল তার পরদিন। আবার দেখা হল সেই দলটার সঙ্গে। ওরা আবার বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। বোধ হয় কিছু জুটেছে মেয়েটার কলকাতায়। মেয়ে হলেই নাকি শালা একটা কিছু জুটে যায়, মাইরি।

তারপর সন্ধ্যাবেলা, শিয়ালদহের যাত্রী ও হকারের দল অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সবাই দেখল, ভিড়াক্রান্ত গাড়িতে একটা মেয়ে, অল্পবয়সী ভদ্রলোকের মত দেখতে একটা মেয়ে, কি যেন বলছে। হরেন ক্রাচ্ বগলে বক্তৃতা

দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে তার ভিকস্‌, দার্জিলিং-এর কমলালেবু, মরটন, বাইরন, প্রগতিশীল মাসিক বিক্রেতার দল।

তারা সবাই মিলে হাঁ করে রইল।

কেবল ভিকস্‌ বলল, নির্ঘাত ভিক্ষে চাইছে। ভেংচে বলল চাপা গলায়, দেখুন, আমার স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নিয়ে—

পুষ্পের হাতে তখন ছোট ছোট কয়েকটা ন্যাকড়ার পুতুল জুলজুল করে নুলো দোলচ্ছে। আর একটা চাপা সরু মেয়েলী গলা ঃ আমার নিজের হাতের তৈরি, ন্যাকড়া আর তুষের তৈরি, উপরে রং করা। দাম দু-আনা করে···

গলাটা কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসছে, একটু বা চড়ছেও।

যাত্রীদের মধ্যে বিস্ময়টুকু কেটে গিয়ে, বিস্ময়, লজ্জা, বিরক্তি, করুণা ও হাসির মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠতে লাগল।

ছি ছি, কি কাণ্ড। এ সব কি হচ্ছে আজকাল? একটা অতবড় মেয়ে।

এখনই কি, আরও কত দেখতে হবে।

উঃ, কি অবস্থা ভাই দেশের।

বিবাহিতা।

নুনাঃ। কি জানি, হবে হয়তো। কিন্তু সিঁদুর তো নেই।

কেবল দার্জিলিঙের লেবু হরেনের কাছে চাপা হুংকার দিয়ে উঠল, ওরে শালা এ যে হকারনি দেখছি।

হরেন বলল, তাই তো।

মরটন বলল, সর্বনাশ করেছে।

কে একজন বলল, কোন তেল কোম্পানি। শো-কেসে বসে থাকলে চুল দেখিয়ে মাইনে পেত।

সত্যিই সর্বনাশ। এমন একটা মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী কল্পনা করে নি তারা কোন দিন। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু এ রকম একটা মেয়ে হকার। সত্যি সর্বনাশ। আর সেই সর্বনাশের আশঙ্কায় তাদের মুখগুলি এঁকেবেঁকে দুমড়ে কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। মলম, মাজন, রেলে-ঘোরা আজব ডাক্তার ডেণ্টিস্ট থেকে শুরু করে সবাই দেখল মেয়েটাকে, অনাগত এক পথ-দ্রষ্টাকে। তাদের সকলেরই মুখগুলি বিরূপ হয়ে উঠল।

হরেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, সেই মেয়েটা।

চানাচুর বলল, নিশ্চয়ই সাত-ঘাটের জল-খাওয়া মেয়ে।

আর একজন মন্তব্য করল, নইলে আর রেলে এসেছে হকারি করতে। কত বড় বুকের পাটা।

মাজন প্রায় চেঁচিয়েই বলল, বুকের পাটা আবার কিসের? বুকের বালাই শালা করেই খেয়ে বসেছে। কোন দিন দেখব, ছুঁড়িটাই মাজন বিকোচ্ছে।

ওইটিই বোধ হয় সবচেয়ে বড় ভয়। ওই নজরেই তারা দেখে সমস্ত ঘটনাটা। নতুনেরা পুরনোদের কাছে অনেক লাথি ঘুষি খেয়েছে। পরে তারা একত্রিত হয়েছে। বাধ্য হয়েছে পরস্পরে হাত মেলাতে। এই মেয়েটা এসেছে আজ খদ্দেরদের মন ভোলাতে। তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে। খদ্দেরের মন আর মেয়েমানুষ। এই ভেবেই তাদের বিবেক, বুদ্ধি, মন কুঁকড়ে গিয়ে হঠাৎ প্রতিশোধের জন্যে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চাইল।

কেরানী ও ছাত্রদের সন্দেহপরায়ণ মন দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশ্বাস ও ও অবিশ্বাসের মাঝে দুলতে লাগল সকলের মন। দোলার ঝোকটা অবিশ্বাসের দিকেই যেন বেশি। গরিব? হ্যাঁ, গরিবই মনে হচ্ছে। আটপৌরে শাড়ি আর কাচের চুড়ি ক-গাছা। চুলগুলিই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু না, মেয়েটা ভাল হওয়া তো সম্ভব নয়। একেবারে রেলে হকারি! যা দিনকাল। বয়সও তো নেহাত কাচা। যাকে বলে উঠতি বয়স। এই বয়সে একেবারে পথে, গাড়িতে, ভিড়ের মধ্যে। কেমন যেন ঝাপসা লাগছে ব্যাপারটা।

মাথাটা উঠছে আস্তে আস্তে পুষ্পর। একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটছে গলায়। চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু আধা অন্ধ। কেবল ভিড়ের উপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, পরিষ্কার দেখছে না কাউকে। বলছে, ন্যাকড়া বেশ মোটা আর শক্ত। ছিঁড়বে না সহজে। বাড়ির ছেলেপুলেরা……বলছে, দেখছে শুনছে সবাই, কিন্তু কেউ নিচ্ছে না। যেন নিতে পারাটাই একটা মস্ত ব্যাপার। চাকরি ব্যবসা করে না, অথচ রোজগার করে এ রকম এক শ্রেণীর ভদ্রলোকের মত যাত্রীও দু-একজন ছিল। তারা টিপ্পনি কাটল, অর্থপূর্ণ গলায় বলল, মন্দ নয়, কি বলিস। তবু শালা দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

শুধু একজন হাত বাড়িয়ে একটা পুতুল নিল। পরনে ময়লা হাফ প্যান্ট, তেলকালি-মাখা নীল জামা। গা-ও তেলমাখা। গোঁফজোড়াটা বিরাট। কোন তেল-কলের মিস্তিরি মজুর হবে হয়তো। অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল গম্ভীর মুখে। দেখে পয়সা দিল।

অমনি পুষ্পর সঙ্গে ওই মানুষটাও দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল একটা। শোনা গেল, হুঁ বুঝলুম! কিন্তু মানুষটা নির্বিকার।

পরমুহূর্তে একটা চিৎকার: ভিকস্। ভিকস্ স্যার। আপনার মাথা সাফ হয়ে যাবে, জাম ছেড়ে যাবে।

আই কিওর স্যার, চোখের গণ্ডগোল কাটুন

অ্যান্ড্ পারিজ্ড সুইটস্। আজেবাজে চিন্তা থেকে আপনার মনকে একমুখো করুন!…

দার্জিলিঙের নেবু!…চানাচুর!…সাড়েচার ভাজা!…ধূপ!…বায়রনের জল! কে. পি. দে-র মলম গুলি। সীসের নয়, তানসেনের।

কামরাটার চারদিকে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল পড়ে গেল। ডুবে গেল পুষ্পর গলা। সে অবাক হয়ে তার ভীত করুণ চোখ মেলে দেখতে লাগল চারদিকে। একটা কামরাতে এতগুলি হকার একসঙ্গে। কেন?

কাছ থেকেই কে একজন কেশো গলায় বলে উঠল, ওই দেখুন যারা চেনে আর জানে, তারা ঠিক ব্যবস্থা করছে। দু-দিনে তাড়িয়ে ছাড়বে মশাই।

শোনার দরকার ছিল না। তাব আগেই বুঝল পুষ্প। সমস্ত চিৎকার-গুলি তার কানে আর বুকে এসে বিঁধিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। অন্ধকার হয়ে এল চোখের দৃষ্টি। তাকে ওরা তাড়িয়ে দিতে চায়। সেই মানুষগুলি।

গাড়ি ছাড়ল। স্টেশনে নেমে নেমে সে যে যে কামরায় গেল, একই চিৎকার। চিৎকার আর বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষে পুষ্পকে খুঁচিয়ে দিশেহারা করে তুলল।

বাড়ি ফেরার পথে মফস্বলের অন্ধকার গলিটাতে থমকে দাঁড়াল পুষ্প। বুকে মুঠিকরা হাতে একটি দু-আনি, একটি পুতুলের দাম। সেটিকে বুকে চেপে সে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল। বহু ভয় ও সংশয় পেরিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বাধার কথা মনেও আসে নি। না, সে পারবে না, পারবে না।

তবু আবার এল পরদিন। দূরের এই স্টেশনটা আজও ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু সে আসবামাত্র ডাউন প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা চিৎকার ভেসে এল, পুতুলের মা এসেছে রে।

দেখতে দেখতে সকলেই দাঁড়াল উঠে। সর্বাগ্রে ক্রাচ বগলে হরেন। একজন বলল, পুতুলগুলি মরা না জ্যান্ত, জিজ্ঞেস কর।

আর একজন বলল, জিজ্ঞেস কর তো কার পুতুল?

না, নিজেরগুলো ঘরে রেখে এসেছে।

সেগুলোকেও নিয়ে এলেই হত।

পুষ্পের বুকটা ছিঁড়ে গেল ওদের ইঙ্গিতে। তার জ্যান্ত পুতুল। পুতুলের মা। তার সারা শরীরের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায়, অনেক দিন কান্না চিৎকার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। অনেক দিন অজান্তে তার বুকে ঠোঁটে অসহ্য বেদনায় ও আনন্দে বিচিত্র শিহরণের স্পর্শে তারা মাতাল করে গেছে পুষ্পকে। সে ছিল যৌবনের স্বপ্ন। আঠারো বছরের পূর্ণ যৌবনে সে পুতুলের মা, হকারনি। মেয়ে নয়। শাঁখা সিঁদুরের আবির্ভাব ঘটে নি। পুতুলের জন্মদাতা আসে নি ঘর দোর-আশ্রয়ের ঢোল-কাঁসি বাজিয়ে।

রাগ হল না। বিষণ্ণভাবে হাসল পুতুলের মা পুষ্প। পুতুলের মা-ই। তার নিজের হাতের পুতুল। কিন্তু সে ভয় পেল না। পেলে তাকে ফিরে যেতে হবে নরকে। পঙ্ক-অঙ্কে নিতে হবে আশ্রয়। তার সে মরণের পর কেউ পুতুলের মা বলেও বিদ্রূপ করবে না।

মাথা তুলে ফিরে তাকাল সে ওদের দিকে। কিন্তু ওরা টিটকিরি ও বিদ্রূপের জেদী ও চাপা চিৎকারে ভেঙে পড়ল। শোনা যায় না, তাকানো যায় না ওদের ছেঁড়া জামা আর রোদে-পোড়া নিষ্ঠুর মুখগুলির দিকে।

অথচ এই হরেন বিয়াল্লিশের গুলি-খাওয়া মানুষ। ভিকস্‌ও নাকি ছেচল্লিশে জেল খেটেছে। ওদের অনেকের পিছনে অনেক ইতিহাস। শুধু পুষ্পর মধ্যে এক কলঙ্কিনী শত্রু-মেয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু খুঁজে পায় নি।

কেবল প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা, গোঁফ মুচড়ে শান্ত গলায় বলল, শত হলেও মেয়েমানুষ।

হরেনই খ্যাঁক করে উঠল, তা কি করতে হবে?

না, দেখ, আজকাল দেশের এই অবস্থায় নারী-জাতির—

সে খুব গম্ভীর গলায় আরম্ভ করেছিল। হরেন ভেংচে উঠল, থাক, তোমায় আর পেগ্‌তিছিল বাক্তমে দিতে হবে না। শালা আজ একটা মেয়ে যদি আঁচল উড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে, কাগজ নিয়ে ওঠে গাড়িতে, তবে আর তোমাকে পয়সা দিয়ে চাল কিনে খেতে হবে না, বুঝেছ?

কাগজ-বিক্রেতা বিমূঢ় গলায় বলল, অ্যাঁ?

ভিকস্‌ বলল, অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ। ব্যাটা, শোঁক শোক, ভিকস্‌ শোঁক, মাথাটা সাফ কব।

কিন্তু কাগজ বিক্রেতার গোঁফজোড়া বেয়াড়া রকম বেঁকে রইল, না রে, কথাটা বোধ হয় ঠিক নয়।

মরটন বলে উঠল, এ যে পুতুলের সাক্ষাৎ বাপ এল দেখছি!

তাই না বটে! সবাই তিক্ত গলায় হেসে উঠল।

বিদ্রূপ ও চিৎকারে যেন পুষ্পকে ওরা তাড়া করে নিয়ে এল শিয়ালদায়। তারপর সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। পুষ্প মুখ খোলবার আগেই বহু পসরার বিজ্ঞাপনের কলরোলে ডুবে গেল তার গলা। তেমনি করেই আবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এল তার স্টেশনে।

দেবে না, তাকে ওরা কোন অধিকার দেবে না। আইনের অধিকার দেওয়ার মালিক যারা, তাদের মুখোমুখি কোন দিন দাঁড়াতে হবে কিনা কে জানে। কিন্তু আসল অধিকারীরাই বিরূপ।

শুধু এই চলল। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আর তাড়িয়ে নিয়ে আসা। প্রতিবাদী যাত্রী হয়তো কেউ কেউ ছিল। তারা সংখ্যায় ন গ। অধিকাংশ শুধু মজাই দেখে যেতে লাগল।

কেবল, পুষ্প প্রতিদিন থমকে দাঁড়ায় বাড়ি ফেরার পথে, অন্ধ গলিপথটাই যেন ছায়ালোকের কোন অভিশপ্ত আত্মা। কখনও চুলের গোছা দিয়ে সে চোখ দুটো চেপে ধরে। খনও বা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বুকের কাপড়।

ওরা চেয়েও দেখল না, মেয়েটা দিন দিন শুকোচ্ছে। চুলগুলো জট পাকাচ্ছে। সেই একই অধৌত জামাকাপড় ধূলিমলিন হয়ে উঠছে।

ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মারামারি করে, কিন্তু বন্ধুত্বে কখনও ফাটল ধরে না। কেবল পুষ্পকে ওরা তাড়া করে। শুনিয়ে বলে নানান কথা।

কোন দিন বলে, পুলিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব জমজমাটি। নইলে আর বেমালুম পুতুলের মা হয়ে রেলে ঘুরছে?

অথচ সেপাইগুলি চোখ ঘোঁচ করে গোঁফ পাকায় তার দিকে চেয়ে। কোন দিন বলে, রেলের বাবুদের কাছেও যাওয়া আসা আছে, সেইজন্যেই অত সাহস।

সত্যি, এ যে কোন্ সাহস ঠেলে দিয়েছে তাকে এই পথে, পুষ্প নিজেও ভালভাবে টের পায় না।

কখনও লোকের ভিড়ে, রেলের পা-দানিতে চোখাচোখি হয় হরেনের সঙ্গে। হয়তো হরেন তখন বিপজ্জনকভাবে ক্রাচ্‌সহ চলন্ত ট্রেনে কামরা বদলাচ্ছে। কখনও ভিক্‌সের ক্ষুধাকাতর চোখের সঙ্গে, অদম্য কাশিক্ষুব্ধ মরটনের সঙ্গে, কখনও বুগ্ন তানসেনের গুলির সঙ্গে।

যেন কিছু বলতে চায় পুষ্প। কিন্তু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না তার। অপমানে ধিক্কারে ঘৃণায় জ্বলে যায় বুকের মধ্যে।

একদিন শিয়ালদায় কে তার কানের কাছে বলে উঠল, পুতুলের মা'র ক-বিয়ে? ফিরে দেখল পুষ্প, অদূরে দার্জিলিঙের লেবুর বাঁকা চোখ-জোড়া। আর তার সামনে একটি নতুন বর আর কনেবৌ। কনেবৌ, কানে দুল, নাকে নাকছাবি, গলায় চেন, হাতে চুড়ি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পুষ্পর দিকে। পুষ্পের চুলের দিকে।

হকারনি নয়, স্বপ্ন নেমে এল হঠাৎ আঠারো বছরের এক বাঙালী মেয়ের চোখে। যেন হঠাৎ চুলকে উঠল তার নাকের ও কানের শূন্য ছিদ্রগুলি। ছোটবেলায় বিঁধিয়েছিল বাপ-মা শখ করে। একদিন সোনা পরবে বলে। ওই বেশে একদিন সাজবে বলে। আজন্ম শুভ্র সিঁথি একদিন লাল হবে বলে।

সত্যি, কত বিয়ে করেছে পুষ্প মনে মনে? শৈশবের সেই বিয়ের যে সংখ্যা নেই। দার্জিলিঙের লেবুকে বলবে কি করে সে-কথা?

কনেবৌটি দিব্যি জিজ্ঞেস করল, অসুখ করেছে ভাই?

না তো?

তবে অমন ধুঁকছ যে?

পুষ্প হেসে বলল, এমনি।

তাই তো, পুষ্প অবাক হয়। বৈশাখ এসে পড়েছে। চৈত্র চলে গেছে, তাই এত বিয়ের হিড়িক। বর-কনেরা বেরিয়েছে পথে। আর এতদিনে মাত্র সাতটি পুতুল বিক্রি করতে পেরেছে পুষ্প। অনেক বাধা মাড়িয়ে পেরেছে।

কিন্তু তাতে আশা বাড়ে নি, বিপদ বেড়েছে। ঘরে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস বাইরে। কোথাও সে কিছু পেল না, দিতেও পারল না। এবার তাকে যেতে হবে পথে ফেরি করতে ঃ পুতুল, হাতে-গড়া পুতুল নেবেন?

আবার কানে এল ঃ পুতুলের মা অনেক বিয়ে বিয়ে খেলেছে। এবার পুতুলের বিয়ে দেবে। আহা! আজকে ওরা কি কথাগুলিই বলছে! সত্যি, কত বিয়ে বিয়ে খেলেছে। কিন্তু সেই পুতুল নিয়ে খেলা তো তার আজও শেষ হল না।

একদিন শেষদিন মনে করে এল সে। আজকে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে চলে যাবে কলকাতার পথের ফেরিতে।

কিন্তু যেতে পারল না। আজ আইনের অধিকারীরা স্টেশনের চারপাশে জাল ছড়িয়ে বসেছিল। বেটন ও বন্দুকধারী পুলিসের বেশে ব্যূহ রচিত হয়েছিল বেআইনী হকারবৃত্তি নিবারণের স্পেশাল কোর্টের। যারা ছিল কাছেপিঠে, তারা ধরা পড়েছে অনেকেই। দুপুরের ঝোঁকে যারা বাইরে মফস্বলে চলে যায়, ফিরে আসে বিকালে, এবাঃ আক্রান্ত হল তারা।

হঠাৎ পুলিসের আক্রমণে, চিৎকারে, গণ্ডগোলে যাত্রীদের অকারণ ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে একটা শ্বাসরুদ্ধ দৃশ্যের অবতারণা হল।

ধক্ করে উঠল পুষ্পের বুকের মধ্যে। পুলিস দেখে নয়। সে দেখল হরেনের একটা ক্রাচ ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে, আর তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই। ক্রাচটা নেওয়ার জন্যে অগ্রসর হতেই তাকে বিশালকায় এক মহিলা এসে শক্ত হাতে ধরল। আর পুলিসের চড় খেতে খেতে একটা পানবিড়িওয়ালা ছোট ছেলে কুড়িয়ে নিল হরেনের ক্রাচ্টা।

কিছু বলবার অবকাশ মিলল না। গলায় সোনার চন্দ্রহার, আর হাতে কঙ্কণ ও ঘড়ি পরা মহিলাটি পু‌‌ ‌ ‌ক এনে হাজির করল টেবিলের সামনে। একটা খেঁকুরে গম্ভীর গলা শোনা গেল, লাইসেন্স আছে?

না।

পঞ্চাশ টাকা ফাইন বাব কব।

পঞ্চাশ টাকা?

পুষ্পের মনে হল, তাকে বুঝি ঠাট্টা করেছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

অনাদায়ে সাত দিন হাজতবাস।

মহিলাটি তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা ছিঁ ' ' নিল। নিয়ে ঠেলে দিল পুলিসের ঘেরাওয়ের মধ্যে। সেখানে আর কেউ নেই. শধু সে। পুষ্পবালা ঢাকার বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়ে।

সেখান থেকে পুষ্প দেখল, পারিজ সুইট হরেন, ভিকস্, বায়রন, মরটন, চানাচুর, প্রগতিশ ল কাগজ-বিক্রেতা, দার্জিলিঙের লেবু সকলেই রয়েছে, আর

একটা ঘেরাওয়ের মধ্যে। ঘর্মাক্ত ধুলোমাখা, উষ্কখুষ্ক। ওদেরই মত জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে ওদের মালগুলি।

কে বলে উঠল, আরে শত হলেও হকারনি। রাত্রে ঠিক ছেড়ে দেবে দেখিস।

হয়তো দেবে। যদি না দেয়? যদি না দেয়, তবে মা ভাববে, সন্দেহ এতদিনে কাটল। সর্বনাশী শেষে সর্বনাশ করে পালিয়েছে। কিন্তু পালাতে পারে নি তো এতদিন। তারপর চালান দিয়ে দিল সবাইকে হাজতে।

সাতদিন পর।

বেলা দশটায় কোর্ট খুলল। বেলা এগারটায় ছাড়া পেল হকারেরা। সকলেই গিয়ে জড়ো হল, ভিড়ের বাইরে, পুবের রেলহাসপাতালের কাছে।

এঃ শালা, চানাচুরগুলো সব সাবাড় করেছে ধর্মপুত্তর সেপাইরা।

আমার একটা লজেন্সও নেই মাইরি।

দার্জিলিঙের লেবু সব ফাঁক।

মাইরি আমার কাগজগুলোও কমে গেছে। ওরা কি প্রগতিশীল কাগজও পড়ে?

পড়ে, ধার দেখবার জন্য।

হ্যাঁ রে, সেই মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছে না?

তারপর হাসি আর গালাগালির একটা ঝড় বইতে থাকে। হরেন চেঁচিয়ে উঠল, আমার অনেকগুলি মাল আছে।

মাইরি?

মাইরি। আয়, সব হাজত-খাটাকে একটা করে দিই, তারপর নতুন করে আবার আরম্ভ করা যাবে। বলতেই সবাই ঘিরে এল তাকে, হরেন একটা করে লজেন্স দিতে লাগল সবাইকে।

হঠাৎ চাপা গলায় ভিকসু ডাকল, এই হরেন।

হরেন বলল, কি?

ওই দ্যাখ।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, পুতুলের মা। কোর্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। চুলগুলি জড়ানো কিন্তু জট পাকিয়ে আরও বড় হয়ে উঠেছে। স্যাণ্ডেল নেই, খালি পা। কাপড়টা কুঁকড়ে পায়ের থেকে উঠে গেছে অনেকখানি। চোখের কোলগুলি বসে গেছে। গাল দুটো গেছে চড়িয়ে। ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে। কাচের চুড়িগুলি হলহল করছে হাতে। ব্যাগটা ঝুলছে কাঁধে।

ওরা সকলে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু একসঙ্গেই সকলের গলায় হাসিটা কি রকম আটকে গেল। একজন বলল, হাজতে ছিল রে। হ্যাঁ, কি রকম দেখাচ্ছে, না?

হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হরেন। খট্খট্ করে খানিকটা গিয়ে, খ্যাঁকারি দিয়ে ডেকে উঠল, পুতুলের মা!

পুষ্প দাঁড়াল থমকে। ঠিক এমনি সুরের ডাক তো কখনও শোনে নি সে ওদের কাছ থেকে! তবুও নতুন অপমানের জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। আজ শুধু অপমান নয়, শোধও নেবে।

পিছনে সকলেই ভ্রূ কুঁচকে চোখ তুলে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। আর ঠক্ঠক্ করে হরেন এসে দাঁড়াল পুষ্পর সামনে। পুষ্পর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল হরেন। কৌটো থেকে একটা লজেন্স বের করে হরেন বলল, মানে, যারা হাজত খেটেছে, তাদের সকলেরই একটা করে পাওনা হয়েছে। তা আপ…আপ… তোমার একটা আছে, নিতে হবে কিন্তু ভাই।

কি কি শুনেছে, এ কি শুনেছে পুষ্প! হরেনেরা, হকাররা তাকে তাদের সঙ্গিনী করে নিচ্ছে? তাদের পুতুলের মাকে?

ততক্ষণে সকলেই ভিড় করে এসেছে। আর পুষ্পর শিশুর মত মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরনা, সেই সঙ্গে আচমকা চোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। সে লজেন্সটা নিল।

হরেন ফিস্ফিস্ করে বলল, সত্যি মানে কেঁদে কিছু হয় না, তুমি কেঁদো না। বলতে বলতে তারও গলাটা আটকে এল। আর সবাই নিঃশব্দে ঢোঁক গিলছে।

তারপরে বলল, চানাচুরের শেষ প্যাকেটটা তুমি খাও।

দেখা গেল সকলেই, তাদের অবশিষ্ট মালটুকু পুষ্পর হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত।

এই নাও, একটা কাগজও দিলুম, পড়ো।

কাগজটা কি তা বললি না?

হেসে উঠল সকলে। চোখের জলে ও হাসির আলোছায়ায় অন্ধ হয়ে এল পুষ্পর চোখ! সে দেখল শুধু, তাকে ঘিরে ওদের হাজত-খাটা উস্কখুস্কো চেহারার ভিড়ের মধ্যে সে একাত্ম।

প্রত্যাবর্তন

সন্ধ্যার ঝোঁকে যখন গলিটা অন্ধকারে ভরে ওঠে, অস্থির হয়ে ওঠে শ্বাসরুদ্ধ ধোঁয়ায় এবং অস্পষ্ট ছায়ার মত দেখা যায় গলির লোকগুলোকে, তখন মনে হয় মানুষের জগৎ-ছাড়া যেন কোন অন্ধকার গুহার অভ্যন্তর এটা। হাওয়া ঢোকে না এখানে বেরুবার পথ নেই বলে। সরকারী আলো নেই, কারণ সরকারী গলি নয় এটা। তাই মেথর খাটা বা ঝাড়ু দেওয়ার কথা এখানে অবান্তর। জলকলের কথা উপহাস মাত্র। মনে হয় আকাশ নেই গলিটার মাথায়।

এ সময়ে বাসন্তী যখন তার কোমল বেড়া-বিনুনিটিতে গিঁট দিয়ে ছোট-ছোট হাতে উনুনে আগুন দেয়, তখন তার বাবা ঠাণ্ডারাম আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে রক্তচক্ষু আধবোজা করে এসে বসে উনুনের প্রায় কাছটিতে। তারপর একবার উনুনের ধোঁয়া ও বাসন্তীর মুখের দিকে দেখে চোঙা মুখে দিয়ে কথা বলার মত মোটা গলায় বলে, 'লবাবের বেটীর কোন্ রাজকাজটি হচ্ছিল অ্যাতখোন এঁ! জানো না তোমার বাপ আসার সময় হল?'

রোজকার ব্যাপার, রোজকার কথা। বাসন্তী একটু সরে বসে যাতে ঘুষি লাথিটা এসে না পড়ে। ঠাণ্ডারামের নেশাচ্ছন্ন মনে কারবাইড গ্যাসের মত উত্তাপ চড়তে থাকে। চা বিনা, আফিমের ধোঁয়ানো নেশা আসে সাফ হয়ে।

বাসন্তীর অদূরেই তার পিঠের বোন হারাণী ঘুমিয়ে থাকে অন্ধকার কোণে, ওর সারা গায়ে গোবরের গন্ধ। পায়ে গোবর, হাতে গোবর শুকিয়ে থাকে। সারাদিন গোবর কুড়িয়ে আর চাপটি দিয়ে বসে থাকতে আর পারে না সে।

হারাণীর পিঠোপিঠি ভাই কেলো রোজ ঠিক এ সময়টিতেই রকের ধারে রাস্তার পাশে কাঁচা নর্দমাটিতে বসে মলমূত্র ত্যাগ করে এবং হাত মাথা নেড়ে গলার শির ফুলিয়ে দুলে দুলে শুরু করে গান—

ছকি, বাঁছি আল্ কি কালুল্ নাম জানে না…

তার এ গানকে যদি সানাই-সুর মনে করা যায় তা হলে ঠিক পোঁয়ের মত থেকে থেকে সাড়া দিয়ে ওঠে তার নিজের ভাই আট-মাসের নোলা। সারাদিন ছেলেটা রকে হামা দিয়ে জলে কাদায় মাখামাখি করে বাসন্তীর কোল ধামসে একরকম থাকে। সন্ধ্যার ঝোঁকটাতেই শুরু করে কান্না।

ঠাণ্ডারামের জমাট নেশাটা ভেঙে পড়তে চায় এ কান্নায় আর গানে। কেলোকে চেঁচিয়ে গান থামাতে বলে। কেলো শুনতে না পেলে সে প্রাণপণ চিৎকার করে ওঠে ঃ ওরে শোরের বাচ্চা, বাঁশী তোর বাপের নাম জানে। চুপ মার, নইলে তোর কেষ্টলীলা আমি···

কেলো অন্ধকারে পিটপিট করে বাপকে দেখে কিন্তু গানটার আমেজ তার অবুঝ মনে এতই গভীর যে, গলা নামলেও গুনগুনানি আর থামতে চায় না।

এর পরে আসে সুকি অর্থাৎ সুকুমারী। ঠাণ্ডারামের পরিবার, লোকে বলে নবার মা। বড় ছেলের নাম তার নবা। সুকি আসে ফরফর করে, বসে ধপাস করে ঠাণ্ডারামের হাতখানেক দূরে। নোলাকে টেনে তুলে নেয় কোলের উপর। বুক থেকে কাপড়টা সরিয়ে স্তন গুঁজে দেয় তার মুখে। একবার দেখে নেয় উনুনে চায়ের জল চেপেছে কি না, তারপর ঠাণ্ডারামের দিকে খানিকক্ষণ কটমট করে দেখে বাঁ হাতে মুখ থেকে পানের ছিবড়ের দলাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে বাইরে। আর একবার দেখে ঠাণ্ডারামের ঝিমুনি, তারপর নিজের মনেই কখন ঠোঁট বাঁকিয়ে, চোখ ঘুরিয়ে, নাক ফুলিয়ে, হঠাৎ দাঁতে দাঁত চেপে বলে ওঠে, 'অমন নেশার কপালে মারি ঝাড়ু।'

ঠাণ্ডারাম হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে সটান হয়ে ওঠে। তার তোবড়ানো মুখটা লম্বা হয়ে ওঠে এবং রক্তচক্ষু শিবনেত্র করে একবার সুকিকে দেখেই হেসে ওঠার মত করে দাঁত বের করে ফেলে। চোখ কুঁচকে চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, 'এয়েছ ঠাকরুন? বাঁচিয়েছ।'

খ্যাঁকানোর চেয়ে এ তিক্ত খোঁচানি আরও অসহ্য। সুকি রীতিমত গলা চড়িয়েই জবাব দেয়, 'আসব না তো নেশা করে পথে পথে ঘুরব? না, তোমার ভিটেয় এয়েছি?'

'নাঃ তোমার বাপের ভিটেয় এয়েছ।'—আরও তিক্ত আরও মোলায়েম করে বলে ঠাণ্ডারাম। তাতে সুকি আরও চড়ে এবং ঠাণ্ডারাম নেশাখোর না লাথখোর সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে বলে, 'যার নিজের পেট চলে না, সে ওই থুথু খায় কি বলে? ভাগাড়ে মুখ দে থাকগে না।'

এইভাবে যখন হাওয়া গরম হতে থাকে, তখন আসে নবা। গায়ে ভরা ধুলো আর ঘাম, নাকের পাটা দুটো ফোলা, নিশ্বাস পড়ে ঘন-ঘন। আসে যেন পথের ধারে এটা একটা চা-খানা। গায়ের-সঙ্গে-লেপটে-থাকা জামাটা খুলতে খুলতে বলে, 'লাও, জলদি চা লাও।'

গলার স্বরটা তার ছেঁড়া, সরু ও ঝাঁজালো। চেহারাটা প্রায় ঠাণ্ডারামের ইয়ারের মত হয়ে উঠেছে।

সে এসে ঢুকতে-না-ঢুকতেই হাজির হয় তার পিঠের ভাই কেষ্ট। ঠাণ্ডারাম বলে, ম্যানেজার সায়েব। একটা ফুল প্যাণ্ট তার পরনে, জামাটা বেশ খানিকটা

পরিষ্কার এবং সেটা গুঁজে দিয়েছে প্যান্টের মধ্যে। পায়ে ক্যাম্বিসের তালিমারা জুতো। মাথার টেরিটি সুস্পষ্ট ও আঁচড়ানো। ফিটফাট কেষ্ট সকলের থেকে বেশ খানিকটা দূরত্ব রক্ষা করে ফুঁ দিয়ে হাত দিয়ে ঝেড়ে ঘুমন্ত হারাণীর কাছে আলগোছে বসে। বাসন্তী সবাইকে চা দেয়। সবাই যখন চা পান আরম্ভ করে তখন হঠাৎ মনে হয়, সকলেই পরম তৃপ্ত। হ্যাঁ, তৃপ্ত বটে, কিন্তু এর মাঝে আছে এক দারুণ গুমরানি। লম্ফর শিষটাও এ সময়ে স্থির হয়ে থাকে। এরা সকলেই রোজ-কামানোর লোক। ঠাণ্ডারাম সেলুনে কাজ করে, ওটা তার জাত-ব্যবসা। সুকুমারী করে ঠিকা ঝিয়ের কাজ। নবা রিক্‌শা চালায়, কেষ্ট হাফ বেকার। কখনও কাজ পায়, কখনও বসে থাকে। রিক্‌শা চালাতে সে নারাজ।

চা খেতে খেতেই সুকি আরম্ভ করে, 'নেশার মৌতাত তো জমাচ্ছ, পয়সা বের কর পিণ্ডি গেলার!'

ঠাণ্ডারাম যেন শুনতেই পায় নি এমন ভাবে সে মহা আরামে চায়ে চুমুক দিতে থাকে। নবা কেষ্টও চায়ের গেলাসে তাড়াতাড়ি চুমুক দেয়।

সুকি তাদের দিকেও তাকিয়ে বলে, 'চা তো গিলছিস সব, পয়সা দে ঘরের।'

কে কার কথা শোনে।

ঠাণ্ডারাম বলে ওঠে, 'তুই কে পয়সা নেওয়ার! অ্যাঁ। আমি থাকতে তুই কে? দে, তোর পয়সা দে দিকিনি।'

সুকি অমনি জ্বলে ওঠে তুবড়ির মত 'ওরে আমার লাট রে, ওকে নেশা করতে আমি পয়সা দেবো, ঝাড়ু দেবো।'

নেশাই জমুক আর দেহে বলই বাড়ুক, যা-ই হোক, এবার ঠাণ্ডারাম রুদ্র-মূর্তিতে হেঁকে ওঠে, 'চো—প, চোপরাও শালী! তোর বাপের পয়সায় নেশা করি রে? দাও পয়সা, দে লবা, তোর পয়সা দে।'

নবা বলে ওঠে, 'লবারটা বড় মিষ্টি, না? আগে তোমারটা দাও, কেষ্টা দিক।'

কেষ্ট একবার জ্বলন্ত চোখে নবাকে দেখে বলে, 'আজ কিছু কামাই নি।'

ঝেঁকে ওঠে নবা, 'কামাস নি তো খাস কেন? শালা, মেয়েমানুষের বাড়ি যাস রোজ রাতে।'

'তোর পয়সায় খাই, না, যাই। বেশি বলবি তো—'

নবা তেড়ে আসে, 'মারবি, মার না দেখি।'

সুকি মারামারির তোয়াক্কা করে না, কিন্তু পয়সা হাতছাড়া হাওয়ার ভয়ে আগেই দুজনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে বলে, 'লাথখোরেরা যেখানে খুশি মরগে যা, আগে পয়সা দে।'

ঠাণ্ডারামও গর্জন করে উঠে আসে, 'হ্যাঁ, পয়সা লাও আগে।'

নবা এক ধাক্কায় ঠাণ্ডারামকে দেওয়ালের গায়ে সরিয়ে দিয়ে হঠাৎ হিন্দীতেই বাপকে বলে ওঠে, 'চোপ শালা, বাবাগিরি ফলানে আয়া?'

তারপরেই হঠাৎ তাদের চারজনের মধ্যে একটা দারুণ ধস্তাধস্তি পেটাপিটি শুরু হয়ে যায় ! কে কার লক্ষ্যস্থল বোঝবার জো থাকে না। কিল-চড়, লাথি-ঘুঁষি আর মাঝে মাঝে সুকি বলে ওঠে, 'জগা নাপতের বেটী হই তো—'

ঠাণ্ডারামেরও গলা শোনা যায়, 'বাপের ব্যাটা হই তো—' বলতে বলতে তাড়াতাড়ি মার বাঁচিয়ে জলভরা ঘটিটা উপুড় করে উনুনে ঢেলে দেয়। ভোঁ-স করে উনুনটা যায় নিভে। তার ফলে মারামারিটা আরও জমে।

নবা বলতে থাকে, 'খুন করেঙ্গা আজ…'

কেষ্ট যুগপৎ জামা প্যাণ্ট ও টেরি আগলাতে আগলাতে সামনের আটার হাঁড়িটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলার চেষ্টা করতে থাকে, আর ধস্তাধস্তির মধ্যে বলতে থাকে, 'শালাদের উপোস না রাখলে টিট্ হবে না—'

এ দৃশ্যে খানিকক্ষণ দেখতে-দেখতে বাসন্তীরও চোখ মুখ জ্বলে ওঠে এবং হঠাৎ যে কোন একজনের উপর পড়ে আঁচড়ে খাম্চে দিতে থাকে।

ঘুমন্ত হারাণী আচমকা ক'কিয়ে ঘুম ভেঙে ডুকরে চিৎকার করে উঠে যাকেই সামনে পায়, তার কোমরে পায়ে কামড়ে ধরে।

কেলো সুযোগ বুঝে গলা ছেড়ে গান ধরে—

ছকি, আমি যখন বছে থাকি গুলুজনেল্ মাঝে
নাম ধলিয়ে বাজায় বাঁছি…

আর একটা ছোট লাঠি দিয়ে রকের ধারে পিপের টিনের বেড়াটা পিটতে থাকে, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্…

আট মাসের নোলা সারাদিন পরে মায়ের স্তন পেয়ে আবার তা হারিয়ে তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দেয়। লম্ফর লালচে আলোয় ছায়াগুলো আরও কিম্ভূতকিমাকার হয়ে ওঠে। মানুষ নয়, মানুষের একটা দল যেন ছটফট করে। আগুনে জল পড়ে ধোঁয়া উঠতে থাকে উনুনের। কলসিটা থেকে জল গড়িয়ে কাদা হয়ে যায়।

মনে হয়, এরা মা নয়, বাপ নয়, ছেলেমেয়ে নয়, ভাই বোন নয়। একদল ক্ষিপ্ত জানোয়ার পরস্পরকে আক্রমণ করে গিলে খেতে চাইছে।

অন্ধ সুড়ঙ্গের মত গলিটার খুপরি ঘরগুলোতে এদের মরণ কামনা করতে থাকে কটূক্তি আর শাপমন্যিতে, কেউ হাসি-তামাশা করে খিস্তি-খেউড়ের ঢেউ তুলে। এই হয় রোজ। যেন এটা ওদের অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে।

তারপর ওরা নিজেরাই এক সময় থামে, থেমে বসে হাঁপাতে থাকে। ঠাণ্ডারাম মোটা গলায় কাঁদে বোধ হয় নেশা ছুটে যাওয়ার জন্য, সুকি ভূতে পাওয়ার মত কাঁপানো সরু গলায় বিড়বিড় করে, নবা খিস্তি করতে থাকে, কেষ্ট ব্যস্ত থাকে চিরুনি দিয়ে টেরি বাগাতে, বাসন্তী হারাণী আর কেলো কোথায় লুকিয়ে পড়ে অন্ধকারে কিছুক্ষণের জন্য। এমনি হয় রোজ।

কিন্তু তাদের জীবনের রোজকার এই বাঁধাধরা গতি একদিন হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে আচমকা একটা মস্ত ফাটল ধরে যেন এক বিচিত্র প্রাণের ধাক্কায় ও টানে চিড় খেয়ে গেল।

সেদিনও যখন এমনি ভাবে আস্তে-আস্তে ফুঁয়ে-ফুঁয়ে চাপা আগুন ধক্ করে জ্বলে উঠতে যাবে ঠিক সেই সময় বাসন্তী তার মায়ের হাত দুটো ধরে কান্নাভরা গলায় বলে উঠল, 'মা থাম, দাদা থাম তোরা, তোমার পায়ে পড়ি বাবা, থাম!'

তারা এমন কথা আর কোন দিন শোনে নি, সবাই হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল তার দিকে। সবাই ভেবেছিল রোজকার মত আজ হয়তো সে কাউকে কামড়ে খামচে দিতে আসছে, কিন্তু আজ সবাই তাজ্জব হয়ে দেখল বাসন্তীর মুখটা কান্নার বেদনা ও যন্ত্রণায় অপূর্ব হয়ে উঠেছে। কেন?

অবশ্য কিছু দিন থেকে সে এমনিতেই সরে সরে থাকত। কিন্তু আজ··

'থাম তোরা, থাম পায়ে পড়ি।'—বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে উঠল।

ঠাণ্ডারাম বাসন্তীকেই একটা ঘুষি তুলেও হঠাৎ থেমে গেল। কি করুণ আর মিনতি-ভরা মুখ হয়েছে মেয়েটার! তবু খানিক ভয়-ভয় ভাব।

নবার সটান লাথিটা থেমে গিয়ে পা বাঁকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। বোন বাসির ভাসা-ভাসা চোখ দুটেতে জল দেখে প্রাণটা তার চমকে উঠল।

কেষ্ট জামা আর টেরি বাগাবে কি, সে খালি তাকাতে লাগল। বাসিটা এত সুন্দর! সবাই অবাক। এমন কি কেলো পর্যন্ত গান ভুলে দিদির অমন মুখখানি হাঁ করে দেখতে লাগল।

তাকিয়ে থাকতে থাকতে চমকে উঠল সুকি। দেখল, বাসন্তীর সারা শরীর যেন কি জাদুতে উছলে উঠেছে, ছেঁড়া-খোঁড়া ময়লা ফ্রকটা ফেটে যেন উছলে উঠতে চাইছে শরীরের প্রতিটি রেখা। বেড়া-বিনুনি নেই, নিজের হাতে বাঁধা তার বাঁকা খোঁপা, হাত পায়ের গোছ হয়ে উঠেছে ভারী শক্ত আর সুন্দর। হায় পোড়া-কপাল, ছুঁড়ী যে কবে ধুমসী মাগী হয়ে গেছে।

খপাত করে মেয়ের হাত ধরে ঘরের ভিতরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গেল সুকি। বিড়বিড় করতে লাগল, 'আ সব্বোনাশ, ছুঁড়ীর জল নেগেছে কবে গো, বাড় নেগেছে কবে?' বলে তাড়াতাড়ি নিজেরই একটা ছেঁড়া ময়লা শাড়ি জড়িয়ে দিল বাসন্তীর গায়ে আর মনে মনে বলতে লাগল, 'তাই ছুঁড়ীর শরীরে রঙ নেগেছে, সাত-পাঁচ ওর ভাল লাগে না, ওর ভাল লাগে না এত ঝম্-ঝামেলা তাই···তাই।'

আর জীবনে বুঝি এই প্রথম বাসন্তী মায়ের রুক্ষ বুকটাতে মুখ রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলতে লাগল, 'তোরা এমন করিস নে মা, আমার গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে করে।'

বাইরের ক্ষিপ্ত মানুষগুলো এই ফোঁপানি শুনতে শুনতে পরস্পরের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে যে যার জায়গায় বসে পড়ল। তাদের কানের মধ্যে বার বার

সেই একই সুর বাজতে লাগল, 'তোরা থাম থাম।' এবং এক বিচিত্র বেদনাবোধে সকলেরই মনটা যেন কিসের আঘাতে টনটন করতে লাগল। কে জানতো তাদের লাথিঘুষি-খেকো বাসি আবার অমন কথা বলতে পারে, আর ঘরের এ সব কাণ্ড দেখে গলায় দড়ি দিতে তার মন চায়!

ঠাণ্ডারাম গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'হুঁ, ছুঁড়ী ডেঁসেছে। খো-উব হুঁশিয়ার, হাঁ বলে দিলুম।' বলতে বলতে একটা দীর্ঘনিশ্বাসে তার গলার স্বর হারিয়ে গেল। তার প্রথম জীবনের ছবিটা ভেসে-ভেসে উঠতে লাগল চোখের সামনে।

নবা আর কেষ্টর মনটা হঠাৎ কেমন বাউল বিবাগী হয়ে উঠল।

নবা বলল, 'না, কিছু ভাল লাগে না আর শালা।'

কেষ্ট বলল, 'চলে যাব মাইরি কোথাও।'

হঠাৎ আজকে তাদের সকলের কাছে চলতি জীবনটা বড় অসহ্য ক্লেদাক্ত আর ভারী হয়ে উঠল। এ ঘরের বাসিন্দাদের মৃত্যু-কামীরা ভাবল বুঝি আজ সন্ধ্যা নামে নি গলিটাতে। কে জানে গলিটার মাথায় আজ আকাশ দেখা দিয়েছে কিনা।

অম্বুবাচির রজঃস্বলা গঙ্গার অথৈ লাল জলে আচমকা চোরা ঢেউ এসে তার শক্ত শুকনো পাড়কে ভিজিয়ে নরম করে দেওয়ার মত ঠাণ্ডারামের পরিবারটা যেন প্রাণের রসে ভিজে উঠল। আর, তাদের সে প্রাণগঙ্গা হল বাসন্তী, তাদের বাসি।

মানুষ তার মনের হদিস কতটুকু পায়। নবা যে মন নিয়ে বলেছিল, কিছু ভাল লাগে না, সে মনই আবার তার মনে মনে গাইল, জগতের সবাই আর কিছু খারাপ নয়। কেষ্টর যে বিবাগী প্রাণটা মাইরি দিব্যি কেটে বেরিয়ে পড়তে চেয়েছিল, তার মনে হল যেন মায়া পড়ে গেছে হা-ভাতে ঘরটার উপর। মেয়ের বয়সের ভারে যে সুকির বুকে পোড়ানি লেগেছিল, সে সব পোড়ানি কাটিয়ে খানিক কন্যে-সোহাগী মা হয়ে উঠল আর ডাঁসা মেয়ের হুঁশিয়ারী করতে গিয়ে ঠাণ্ডারাম নিজের মনটাকেই দিতে লাগল হুঁশিয়ার করে।

হারাণী আর কেলো জন্মে অবধি যাকে দিদি বলে নি, তাকেই তারা দিদি বলে আদর কাড়ানো শুরু করল।

আর বাসি…হাসিতে, গাম্ভীর্যে, পরিশ্রমে, নবরসে এক নতুন কিশোরী সকলের মন কেড়ে এ ঘরের উনুন আঁস্তাকুড় থেকে মানুষগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। যেন সকলের আপদ-বালাই বিষজ্বালা নিয়ে-থুয়ে মনে আর শরীরে আলো নিয়ে ভাঙা অন্ধকার ঘরটায় মশালের মত জ্বলছে।

তা বলে কি এ ঘরের বিবাদ-বিসম্বাদ পয়সা নিয়ে কাড়াকাড়ি, গালাগালি খেয়োখেয়ি একেবারেই শেষ হয়ে গিয়েছে? না, তা যায় নি।

তারা এখনও পরস্পরকে আক্রমণ করে বসে, হঠাৎ শুরু হয়ে যায় লাথি ঘুষির ঝড়, ছোটে গালাগালির তোড়। কিন্তু বাসি প্রতি মুহূর্তে তাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়।

ঠাণ্ডারাম তেমনই আফিমের নেশায় বুঁদ হয়ে এসে উনুনের ধারে বসে, সুকি তেমনি গালাগাল দেয়। ঠাণ্ডারাম মারবার উদ্যোগ করলেই বাসি গিয়ে মাঝখানে পড়ে; তখন ঠাণ্ডারাম বাসিকেই বলে, 'দেখ দিনি হারামজাদীর কাণ্ড, সরিয়ে নে যা ওকে, নইলে মারব মুখে—'

সুকিও তড়পে ওঠে, 'মার দিকি মিনসে, দেখি—'

বাসি মায়ের হাত চেপে ধরে, 'মা, থাম।'

বাপের পায়ে হাত রেখে বলে, 'তা বাবা, তুমি সব পয়সায় নেশা করলে সমসার চলবে কেন?'

ঠাণ্ডারাম অমনি ধমকে ওঠে, 'অ্যাই চোপ! ডেঁপোমি করবি তো মারব থাপড়া।' তারপর হঠাৎ যেন একেবারে ঝিমিয়ে পড়ে জোর করে নেশাচ্ছন্ন চোখের পাতা একটু খুলে মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে চাপা গলায় বলে, 'কোথা ছিলি, অ্যাঁ! সেদিন ছিলি কোথা? যেদিন পয়লা নেশায় হাতে-খড়ি হল? আজ যখন মরতে বসেছি…'

হঠাৎ চুপ করে গিয়ে আবার তার গলায় গোঙানি ওঠে, 'ওই তোর মা মাগী বিয়োতে লাগল কাঁড়ি কাঁড়ি, এ ঘরের পেট হল অভর, শালা খালি দে দে, খাই খাই…। তো নেশা করব না তো কি করব? কি করব? খুন করব, না, ডাকাতি করব? আর মাইরি বলছি, লোকের মাথায় শালা চুল গজানোই কমে গেল, না কি নাপতের বংশই বেড়ে গেল, দুটো খদ্দের পাওয়া যায় না সারাদিনে।'

তারপর হাত ঝটকা দিয়ে বলে, 'এ শালার দুনিয়া বিগড়ে গেছে, নইলে বামুনের ছেলে সেলুন খুলে বসে!'

সুকির প্রাণে খোঁচা লেগেছে। তাই সেও সুর করে বাসিকে মধ্যস্থ করে, 'তা বল তুই বাসি, আমি বিয়োলুম কাঁড়ি কাঁড়ি সে কি আমার দোষ? বলি জগা নাপতের বেটী কবে ভেবেছিল নোকের দোরে-দোরে ঘুরে ঝি খেটে মরবে, মিনসের ঝাঁটা-নাথি খাবে। তো বলি, কি না, ছেলে আমার? কিন্তুন্…… এ সমসারের ঝকমারি কলের ঠাওর পাই নে আমি।'

'থাক থাক'—বলতে বলতে ঠাণ্ডারাম হয়তো কখনও হঠাৎ কিছু পয়সা বাসির কাছে বাড়িয়ে দেয়। 'নে, যা ছেল নিয়ে নে। কাল যদি কামাই না হয় তো মরব নেশা বিনে দেখিস।'—বলে তোবড়ানো মুখটায় বিচিত্র হেসে বলে বাসিকে, 'তখন কিন্তু কিছু দিস, অ্যাঁ? লইলে তোর বাপ……' বলতে বলতে আবার হঠাৎ বিকৃত মুখে বলে, 'হুঁ, খুব ডেঁপো হয়ে গেছিস। খোউব হুঁশিয়ার!'

সুকিও তার রোজ কামানোর প্রাণধরা পয়সা একটি একটি করে টিপে টিপে দেয় বাসিকে দু চোখ ভরা সংশয় নিয়ে। অর্থাৎ সাবধান, একটি পয়সা যেন এদিক ওদিক না হয়। তারপর নিজেই আবার বলে, 'শোনপাপড়ি, না কি খেতে চেয়েছিলি? খাস, খাস কালকে দু পয়সার।'

নবা এসে রোজই সেই এক কথা বলে, 'মাত্তর পাঁচ সিকে পেয়েছি।' অর্থাৎ রিক্‌শার মালিককে ভাড়া বাবদ পাঁচসিকে দিতে হয়। অতএব···কেষ্টকে দেখিয়ে বলে, 'ও দিক না।'

বলতে-না-বলতেই তাদের পরস্পরের মধ্যে লেগে যায়। সুকি ঠাণ্ডারামও বাদ যায় না। তারাও হামলে পড়ে এবং ছেলের পয়সায় মায়ের হক বেশি, না বাপের হক বেশি সমস্যায় হঠাৎ এক হুড়োহুড়ি আরম্ভ হয় প্রায়।

বাসি অমনি সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। ঠাণ্ডা করে সবাইকে। নবাকে বলে, 'থাক দাদা, না থাকলে কোত্থেকে দিবি ?'

নবা সরু গলায় হি হি করে হেসে ওঠে, পরমুহূর্তেই বুক ঠুকে বলে, 'লবা রিক্‌শাওয়ালার প'সা নেই মানে ? হেঃ, শালা ঘেয়ো কুকুর সোয়ারি হলেও ছাড়ি নে জানিস ? এই মোটর বাস চালু হয়েই যত সব্বোনাশ করেছে, লইলে···' বলে পয়সা বাড়িয়ে দেয় বাসির হাতে ! চেয়েও দেখে না কেষ্ট পয়সা দিল কি না কিংবা রইল কি না নিজের খরচের পয়সাটা।

কেষ্ট লুকোয় না। হয়তো তার একটা শৌখিন রুমাল কিংবা একটা চিরুনি কেনার সাধ ছিল। কিন্তু বাসির কাছে মিছে বলতে কেমন খচ্‌খচ্ করে। যা থাকে সব দিয়ে বলে, 'নে, কানু মুদীর দরজার পাল্লাটা সারিয়ে দিয়েছিলাম, কিছু পেয়ে গেছি।' তারপর দারুণ দুঃখে ও রাগে ফোঁস্ করে ওঠে, 'শালা দিনকালও তেমনি হয়েছে, একটা কাজ তো দূরের কথা, চটকলগুলোতে রোজ দুটো চারটে মিস্তিরি তাড়াচ্ছে।'

সারাদিন খাটুনির পর সব ঝাড়-ঝামেলা কাটিয়ে সবাই উনুনের কাছে বাসিকে ঘিরে বসে। বাসি রুটি বেলে সেঁকে সবার পাতে পাতে দিতে থাকে।

সবাই খেতে থাকে আর তাদের প্রাণের যত কথা সব পেড়ে বসে বাসির কাছে। ঠাণ্ডারাম তো বলবার ফাঁক না পেয়ে চেঁচিয়ে ওঠে, 'থামবি তোরা, আমাকে একটু বলতে দিবি নাকি যত কেরামতি তোদেরই !'

প্রাণটা ভরে ওঠে বাসির। প্রাণের খুশির গমকে মুখ তার হাসিতে সোহাগে অপূর্ব হয়ে ওঠে। সে হাসির ঢেউই যেন তার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ে পরম গাম্ভীর্যে ও জৌলুসে।

এ সময়ে এদের দেখলে মনে হয়, কোন দিন এরা বিবাদ করে নি, মারামারি করে নি, খেয়োখেয়ি কামড়া-কামড়ি করে নি পয়সার জন্যে। সুখে দুঃখে ওরা পরস্পরের গায়ে গা দিয়ে বেঁচে আছে।

শুধু এই নয়, আরও কিছু ছিল। সে হল বাসির ঢল-নামা যৌবন ও নীলাকাশের মত মস্ত প্রাণটাতে আর একজনের আনাগোনা। সে যেন এক পক্ষীরাজের পিঠে চাপা রাজপুত্তুর, বাসিকে উড়ান দিয়ে নিয়ে চলে যেতে চায়।

বাসি যখন ঘরের মানুষগুলোর প্রাণ ঠাণ্ডা করে, প্রাণতোষ করে বসিয়ে খাওয়ায়, তখন সে এসে রোজ দূরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকে কিংবা সবাই ঘুমিয়ে পড়লে সে আসে। শক্ত কালো জোয়ান ছোকরা, নাম পবন। এ বস্তিরই উল্টোদিকে একটা ঘরে থাকে, কাজ করে ফিটার মিস্তিরির, রোজগার নেহাত মন্দ নয়। খায় পরে একলা, মা ছিল, মরে গেছে। তারপর কিছু দিন পবন এ-ঘাটে সে-ঘাটে ঘুরে বেড়িয়েছে বাউণ্ডুলের মত। কিন্তু সে ভারি ওস্তাদ কারিগর, লোহা আর মেশিনের সঙ্গে তার মিতালী গভীর। আবার কাজ ধরল। কিন্তু কেমন যেন নিজের মন-প্রাণের হদিস হারিয়ে ঝিমিয়ে পড়ল সে। অবশেষে ঘরের কানাচে যেদিন বাসিকে আবিষ্কার করল, সেদিন তার প্রাণের পালে হাওয়া লেগে গেল।

কেমন করে জানি না, বাসি যেন আষ্টে-পৃষ্ঠে ধরা পড়ে গেল পবনের কাছে। তাতে তার কিশোরী মনটা যেন ভরা-গঙ্গার মত তীব্র স্রোতবাহী অথচ গম্ভীর মৌনতায় ভরে উঠল, রহস্যময়ী হয়ে উঠল তার ঠোঁটের রেখাটি, বিচিত্র ভাব ঝলকে ঝলকে উঠতে লাগল তার ভাসা ভাসা চোখ দুটোতে।

আবার এ রূপের মহিমায় ঘরের মানুষগুলোও কেমন যেন অবাক মানে, অথচ এক অপূর্ব আনন্দে তাদের ক্ষত-বিক্ষত বুকগুলো ভরে উঠে। যেন যৌবন এসেছে এই অন্ধ বদ্ধ সারা ঘরটাতে।

প্রাণ খানিক খুলে গেছে কেলোরও। দুপুরবেলা দিদির কাছে তার কেষ্ট-লীলা গাওয়ার ভয় নেই। সে থেকে থেকে গান ধরে—

ছুকি, কেন কুঞ্জল ধালে দাঁলিয়ে কালা.
ফিলে যেতে বল্।

সে গানে হঠাৎ বাসিরও মনটা নেচে ওঠে। মনে হয়, যেন রাধিকার মত মিলনের ছল খুঁজে সে-ই পবনকে অভিমান করে ফিরিয়ে দিচ্ছে। সে চোখ ঘুরিয়ে কপট বেদনার ভাব করে বলে, 'কেন বলব ফিরে যেতে?'

কেলো কেষ্টযাত্রার রাধার ঢঙে গেয়ে ওঠে—

আমি না বুঝে-ছুঝে লাখালেল্ ছঙ্গে মজে.
ছুকি, তাল পেলেম পিতিফল।

তাই কি? হাসতে গিয়ে থমকে যায় বাসি। তার কানে বাজে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে পবনের প্রাণের ডাক: বাসি, চল্, চলে যাই, ঘর করিগে দুজনে বেশ সোন্দর, তুই আর আমি। বাপ ভাই কি কাবুর নেই, না চেরকাল থাকে? আমি ভ্যানতাড়া করে ঘুরি, পয়সা কিছু জমিয়েছি. সব লষ্ট হয়ে যাবে. চল্ চলে যাই, হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে বাসির চোখের সামনে ভেসে ওঠে ঘরের মানুষগুলোর শুকনো পোড়া মুখগুলো, তাদের সেই মারামারি গালাগালি কাড়াকাড়ি, তাদের হাসি কান্না সোহাগ। সে বলে, যাব যাব। কিন্তু যেতে পারে না।

কোলের ভাই নোলাটাও অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। বাসিকে শাড়ি পরা দেখে বোধ করি মা ভেবেই তার অশক্ত নড়বড়ে ঘাড়টা মাটি থেকে তুলে বড় বড় চোখে তাকিয়ে আঁউ-আঁউ করে কেঁদে ওঠে। কোলে উঠেই নোলা আজকাল বাসির বুকে মুখ ঘষে কাঁদে।

বাসি খিলখিল করে হেসে উঠে বলে, 'এই সেরেছে, আমি কি মা নাকি রে?'

নোলা সে সব বোঝে না, কেবলই হাঁই হাঁই করে আর মুখ ঘষে।

শেষটায় বাসি ঘরের অন্ধকার কোণটায় গিয়ে সত্যি ভাইয়ের মুখের কাছে তার শক্ত পুষ্ট বুক খুলে দেয়। কিছুই হয়তো নোলা পায় না। তবু অঘোরে ঘুমিয়ে পড়ে পরম শান্তিতে। কেবল কাঁটা দিয়ে ওঠে বাসির সারা শরীরে, মাথাটার মধ্যে ঝিমঝিম করে। তার পরে অবাক হয়ে দেখে বিন্দু বিন্দু ঘামের মত সাদাটে গাঢ় রস ফুটে বেরুচ্ছে স্তনের বোঁটায়। মুহূর্তে তার সারা শরীরটা দুলে ওঠে, হাসি-কান্নায় বেদনায় ভরে ওঠে বুকটা। উদাস হয়ে যায় মনটা। তাড়াতাড়ি নোলাকে শুইয়ে দিয়ে ঘরের ফোকর দিয়ে এক চিমটি আকাশের দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলে, চলে যাব—চলে যাব।

কিন্তু তার পরেই আসে সন্ধ্যা। রাজ্যের বোঝা ঠেলে মানুষগুলো ফিরে আসে তিক্ত উত্তপ্ত মনে। রুক্ষ শুকনো ধুলো-কালিভরা চেহারা নিয়ে, নিয়ে চড়া-ভরা মেজাজ। তবু আজকাল তাদের কাড়াকাড়ি খেয়োখেয়ি অনেকটা কমে শান্ত নরম হয়ে এসেছে মনটা।

বরং ঠান্ডারাম হয়তো কারচুপে দু পয়সার ঘুগনিদানা বা এক টুকরো বোম্বাই আমসত্ত্ব বাসির হাতে তুলে দেয়, নবা হয়তো নিয়ে আসে বাসির বড় সাধের সর-পুঁটি, কেষ্টর হাতে ঝলকে ওঠে সরেস ব্লাউজের ছিটের একটা ফালি কিংবা একরাশ কাচের চুঁড়ি। কি প্রাণপণ কষ্টে যে দালদা ঘিয়ের কারখানায় প্যাকিং বাক্স বানাবার কাজটা পেয়েছে, তা বাসি ছাড়া বুঝি কেউ জানে না।

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়। সুকির চেয়েও যে হারাণীর পয়সা হল প্রাণ, সেও তার ঘুঁটে বিক্রির পয়সা বাসির হাতে তুলে দেয়।

মাঝে মাঝে তাদের মন কষাকষি বিবাদে হঠাৎ তারা তাদের মেয়ে ও বোন বাসির কাছে বিচার দাবী করে বসে।

বাপ মা ভাই বোন মিলে এক ভরা-সংসার তাদের।

পবনের ব্যাপারটাও সকলেই আঁচ করে নিয়েছে এবং সকলেই তারা অকথ্য ভাষায় গালাগালি দেয় পবনকে।

নবা বলে, 'শালার চোখ গেলে দেবো এদিকে তাকালে।'

কেষ্টর রাগটাই বোধ হয় বেশি, কেননা সেও মেশিনের কাজকর্ম জানে কিছু আর জামা কাপড়েও পবন ভারি দুরন্ত। বলে, 'শালা ভারী মিস্তিরি। লোহা কাটতে পারলেই হল। ঝাড়ব একদিন রন্দা, বাপের নাম নে সরে পড়বে।'

সুকিও চোখ পাকায়। ঠাণ্ডারাম বলে, 'লে আয় ব্যাটাকে, আপিম গুলে খাইয়ে ফেলে দিয়ে আসি গঙ্গায়। নেশাও হবে, মজাও বুঝবে।'

তারপর তারা বাসিকেও বলে, 'খুব হুঁশিয়ার! ওই মুদ্দোটাকে একদম ঘেঁষতে দিস নি।'

কোন কোন দিন হঠাৎ তারা সবাই তাদের তিক্ত সংশয়ে ফেটে পড়ে। হিসেব চেয়ে বসে বাসির কাছে : দে, হিসেব দে, কালকের পঁসার। কি করছিস, কারচুপে কে জানে! বলে তারা সবাই মিলে ক্ষিপ্ত জানোয়ারের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার উদ্যোগ করে।

বাসি দাঁতে দাঁত চেপে কান্না রোধ করে তাদের পাই-পয়সাটির হিসাব দিয়ে দেয়, বরং তার বুদ্ধির দৌড়ে এদের হিসেবের কড়ি বাড়তিও থেকে যায়।

মুহূর্তে সব মানুষগুলো ধিক্কারে লজ্জায় একেবারে স্তব্ধ হয়ে মাথা নিচু করে নেয়, মুখ ফুটে ক্ষমা চাইতে পারে না। তোষামোদের হাসি হাসতে গিয়ে হঠাৎ বিষণ্ণ হয়ে এক বোবা বেদনায় ও গভীর সংশয়ে ড্যাবা ড্যাবা চোখে নতমুখী বাসির দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাসি মনে করে, তবু তো এইটুকু, কুরুক্ষেত্তর তো করে নি।

আর ওরা পরস্পর হঠাৎ 'কে আগে হিসেব চেয়েছে' তাই নিয়ে বিবাদ শুরু করে দেয়। বাসি আবার মাঝে এসে দাঁড়ায়।

পবনের প্রাণের দামামা আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে, প্রাণটা ছটফট করে শক্ত শরীরের পিঞ্জরে। সে কারখানা পালিয়ে দিনের নিভৃতে আসে মাঝে মাঝে। অনুরাগে, আবেশে অস্থির হয়ে সে বাসির হাত দুটো ধরে বলে, 'চল বাসি চল। মাইরি, তোর এ থমকানি আর সয় না। বাপ ভাই কি আর কারুর থাকে না?'

বাসি তবু থমকে থাকে। কি বলবে, ভেবে পায় না।

পবন হঠাৎ রেগে মাটিতে প্রচণ্ড একটা ঘুষি মেরে বলে, 'আমি মরে গেলে যাবি? ধ্যাত্ শালা, আর যদি আসি তো—'

একটু গিয়েই আবার সে ফিরে এসে বাসির সামনে দাঁড়ায়।

অসহায় চোখে, বেদনায় বঙ্কিম ঠোঁটে, আড়ষ্ট মনে অবহেলায় ঝোঁকা শরীরে এক বিচিত্র বেদনায় কি অপূর্ব রূপ যে ফুটে ওঠে বাসির সারা শরীরে! প্রাণ ও মনের জোয়ারের কুলকুলু ধ্বনি যেন শোনা যায় তার শক্ত বলিষ্ঠ শরীরটার রেখায়।

পবন হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, হাত বাড়িয়ে দেয় পায়ের কাছে : আমি পারব না বাসি, তোকে ছাড়তে পারব না। চল, চল…

বাসিও পারে না, ভেঙে পড়ে। পবন যে তার ভালবাসার মানুষ। শক্ত জোয়ান ফিট্‌ফাট্ ওস্তাদ কারিগর পবন।

পবনের পায়ে-ধরা হাত দুটো বুকে তুলে বলে, 'যাব, ঠিক যাব।'

পবনের গলা কেঁপে ওঠে, 'কবে ?'

'যবে বলবে।'

'আজকেই ?'

'বেশ।'

হাসতে গিয়ে হাসি আটকে গেল পবনের বুকে। দিশেহারা হয়ে সে হঠাৎ এক-লাফে কারখানার দিকে ছুটল। বাসি ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে হাসল, কত রকম তার ভাব। ফিস্‌ফিস্‌ করে উঠল, আমার ঘর, সম্‌সার, ছেলে, পবন।

সন্ধ্যার ঝোঁকে অন্ধ সুড়ং গলিটার মধ্যে সুকিদের রকটা অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে ছিল এবং সবাই ফিরে এসে অবাক বিস্ময়ে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর লম্‌ফটা জ্বালতেই খালি উনুনটা, চায়ের জলের হাঁড়িটা হাহাকার করে উঠল। এক কোণে হারাণী বসে আছে নোলাকে নিয়ে। কেলো বসে আছে এক কোণে একটা কুকুর বাচ্চার মত। হাতা খুন্তি কড়াগুলো যেন ঠুঁটো জগন্নাথের মত পড়ে আছে, উনুনের ধারে পিঁড়িটা পাতা কিন্তু যেন কত দিন ধরে।

সুকি চেচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বাসি কোথায় ?'

হারাণী বলে, 'চলে গেছে।'

'চলে গেছে ? কোথা ?'

'পবন মিস্তিরির সঙ্গে।'

'পবনের সঙ্গে ?' হঠাৎ ক্ষেপে গিয়ে সুকি হারাণীকেই দড়াম করে কষাল এক লাথি। সে হাউমাউ করে নোলাকে ফেলে, দিল ছুট।

তারপর তারা সকলেই হাঁকডাক চিৎকার শুরু করে দিল, 'লে আও শালাকে, মেরে ফেলব ওদের, দুটোকেই আজ খুন করব।'

কিন্তু কোথায় তারা! চিৎকারটা তাদের নিজেদের কানেই অসাড় ঠেকতে তারা থেমে গেল।

ঠাণ্ডারাম তার নেশাজড়ানো গলায় বলে উঠল সুকিকে, 'বলেছিলুম কিনা, ছুঁড়ী খোউব ডেঁপো হয়েছে, পেকেছে আম অমনি টুপ করে খসেছে। অ্যাই তোর —মাগী, সব তোর দোষ।'

সুকিও অকারণ দায়দোষে রুখে উঠল, 'ছ্যাঁচড়া মিন্‌সে, আমার দোষ হল ? সোহাগ করে আমি নুক্কে নুক্কে ঘুগনি খাওয়াতুম ?'

'চো-প !'

'তুই চোপ !'—সুকিও বলে।

নবাও বলে উঠল, 'সব তোদের দোষ।' কেষ্টকে বলল, 'যা না, খুব চুড়ি এনে দে, জামা এনে দে—'

'তুই তো মাছ এনে খাওয়াতিস, আবার আমাকে বলছিস ?'

পরস্পরের এমনি ঝগড়ায় ঝগড়ায় তারা পরস্পরের উপর আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েও হঠাৎ থেমে গেল। আচমকাই তাদের নজরটা গিয়ে পড়ে খালি উনুন, উবু করা হাঁড়ি, রান্না-সাজহীন রক, খালি পিঁড়িটা। বাসি নেই সেখানে।

চকিতে মনটা তাদের ভেঙে যায়, জড়সড় হয়ে বসে লম্‌ফটার দিকে চেয়ে থাকে। তাদের মুখে বেদনা, না কান্না ঠাহর পাওয়া যায় না। উদ্বন্ধনে একদল চোখ-চাওয়া মড়ার মত বসে থাকে তারা, অসহায় চোখে। অন্ধ গুহার গায়ে একদল প্রস্তর মূর্তি, নয়তো যেন ভূতুড়ে পুতুলেরা বোবা অস্থিরতায় নিরেট!

বাসি চলে গেছে…

হ্যাঁ, বাসি চলেছে শহর ছাড়িয়ে, পবনের পাশে পাশে দীর্ঘ মাঠের পথ দিয়ে গঙ্গার দিকে। পবনের হাতে একটা টিনের সুটকেস, পরনে কারখানার পোশাক। দুলে দুলে উঠছে তার শক্ত জোয়ান শরীরটা চলার তালে তালে।

আঃ! কি অফুরন্ত হাওয়া! সন্ধ্যা রাত্রির তারাভরা আকাশ। সেই আকাশে মিশে গেছে মাঠ গঙ্গা। হাওয়ার সরসরানি গান গেয়ে চলেছে, ডাক দিয়েছে যেন দূর-চক্রবালের কানাচে অস্তগামী সূর্যের তপ্ত ধূসর আকাশ।

প্রাণ খুলে বক্‌বক্‌ করে চলেছে পবন, 'জানিস বাসি, চন্দননগর শহরটা ভারি সোন্দর। খুব ছোটমোট একখানা ঘর দেখেছি। ভাড়াও খুব কম। আমার এক দূর-সম্পর্কের পিসি আছে, তাকে বলব আমাদের বে দিতে, অ্যাঁ? মাইরি, তুই যা ভোগালি—উঃ। কালকেই সব গুছিয়ে ফেলব ঘরের। তবে বলি তোকে, আমার না, তিনশো টাকা আছে—মাইরি। তুই যা খুশি তাই করিস।'

এসব বলতে বলতে তারা গঙ্গার ধারে এসে পড়ে।

তীব্র বেগে জোয়ার ছুটে চলেছে উত্তরে। তারার আলো ঢেউয়ে ঢেউয়ে নিমেষে হারিয়ে যাচ্ছে।

পবন বলল, 'আজকে আর খেয়া লৌকয় লয়, জানলি বাসি। সে তো সব সময়ই হয়। আজকে একটা পুরো লৌকই ভাড়া করব, অ্যাঁ?'

মাঝগঙ্গার অন্ধকারে আচমকা-মাথা-তোলা ঢেউয়ের মতই বিচিত্র হেসে ঘাড় নাড়ে বাসি।

পবন নৌকা ডাকে। নৌকা দর-দস্তুর করে বলে, 'ওঠ বাসি, জোয়ারের টানে পেরুই, শালা ভাঁটায় আবার বেশি টাইম লেগে যাবে।'

বাসি হঠাৎ পবনের পায়ের উপর পড়ে বলে উঠল, 'আমি যাব না, না মিস্তিরি, ফিরে চল।'

পবনের মনে হল গলায় এসে তার প্রাণটা ঠেকে গেছে।—'অ্যাঁ! কি বলছিস তুই, পাগল নাকি? ওঠ ওঠ।'

বাসি কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'আমি পারব না মিস্তিরি। এতখোনে ওরা না জানি কি করছে! ওরা নিশ্চয় মারামারি করছে, মরছে বুঝি মারামারি করে!'

'করুক।'—ধমকে ওঠে পবন, 'সবাই করে, ওঠ।'

কিন্তু বাসির প্রাণে আরও উৎকণ্ঠা, আরও বেশি অস্থির হয়ে ওঠে সে। 'না, ফিরে চল মিস্তিরি।'

পবন হাসবে, না কাঁদবে বুঝতে পারল না।

মাঝি বলল, 'যাবে, না কি?'

পবন দেখল, অন্ধকারে চোখের জল চক্‌চক্‌ করছে বাসির গালে। জামা নেই, হাওয়ায় কাপড় এলোমেলো। হাওয়াতেই বুঝি শিউরে শিউরে উঠছে তার শরীরটা। আর জোয়ারের জলে ভেজা পাড়ের মত কেমন চক্‌ চক্‌ করছে বাসির রঙটা। কিন্তু বাসি একেবারে মুখ ঘুরিয়েছে।

কান্নাই পায় নাকি রাগই হয়, পবনও আর পারে না। সে মাটির উপর আছড়ে ফেলে সুটকেসটা। ছেঁড়া গলায় চেঁচিয়ে ওঠে, 'না, শালা মেয়েমানুষের সঙ্গে কখনও ভালবাসা করতে নেই। যা—যা, তুই আমার সামনে থেকে চলে যা।'

রহস্যময়ী অন্ধকারে করুণ চোখ তুলে তাকাল বাসি পবনের দিকে।

পবন আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল 'যা বলছি।'

তার সে চিৎকারের প্রতিধ্বনি উঠল জোয়ারের ঢেউয়ে ঢেউয়ে।

মাঠের পথ ধরে বাসি ফিরে চলল, ধীরে ঝুঁকে পড়ে যেন হাওয়ায় গা ভাসিয়ে। সে হাওয়ায় ভেসে গেল তার ফিস্‌ফিসানি: আমি পারব না, ওরা যে মরে যাবে—

রুদ্ধ নিশ্বাসে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল পবন। রাগে দুঃখে স্তব্ধ!

অন্ধকার মাঠটা তার দিকে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তার কিনারে কিনারে ঢেউয়ের ছলছলানি যেন হেসে হেসে বিদ্রূপ করে উঠল তার কিছুক্ষণ পূর্বের স্বপ্ন রচনাকে।

সে ফিরে তাকাল ওপারে চন্দননগরের দিকে। গঙ্গার বুক থেকে উঠে আসা হাওয়ায় তার চুলগুলো এলোমেলো হয়ে পড়ল চোখে মুখে।

হঠাৎ তার চোখ দুটো জ্বালা করে—মাঠ, গঙ্গা, চন্দননগর সব ঝাপসা হয়ে গেল। উবু হয়ে সুটকেসটা কুড়িয়ে সে আবার ওপারের অন্ধকারের দিকে দেখল। নাঃ, বাসি যদি নেই, তবে আর চন্দননগরে কি আছে!…

বাসির ফিরে চলা মাঠের পথ ধরে সুটকেসটা কাঁধে নিয়ে এগুলো সে।

অকাল বসন্ত

অবশেষে একটা ঠাঁই পাওয়া গেল। বর্ষার শেষ, শরতের শুরু। যাই যাই করে তবু বর্ষা এখনও যেতে পারে নি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে। হঠাৎ লজ্জা পাওয়া মেয়ের মুখের মত লাল ছোপ ধরে গেছে সেই মেঘে। উড়ে চলেছে দিক হতে দিগন্তরে এই মফস্বল শহরের কারখানা ইমারত ও অসংখ্য বস্তির ঢেউয়ের উপর দিয়ে।

অনেক অলিগলি পেরিয়ে ভেলো অর্থাৎ ভালোরাম আর একটা রুদ্ধশ্বাস কানাগলির মধ্যে ঢুকল। সঙ্গে তার অভয়পদ। প্রৌঢ় ভেলো এখানকার স্থানীয় লোক। কাজ করে একটা সামরিক যানবাহনের কারখানায়। অভয় তার কারখানার কর্মী, ভারী ট্রাকের ড্রাইভার। কিন্তু বিদেশী। ভেলো তাকে একটা ঘরের সন্ধান দিয়েছে তাই সে চলেছে তার নতুন বাসায়। সামগ্রী বলতে হাতে তার একটা টিনের সুটকেস ও ছোট বিছানার বাণ্ডল। গলিটাতে দিনের বেলাতেও অন্ধকার। দু-পাশে ঘন টালি ও খোলার চালা গলির মাথায় আর একটা দীর্ঘ চালার সৃষ্টি করেছে। আকাশ দেখা যায় না, একফালি রুপোলী পাতের ঝিলিকের মত মাঝে মাঝে দেখা দেয়। গলি পথটাকে পথ বলার চেয়ে নর্দমা বলাই ভাল। দু-পাশের বস্তির যত ক্লেদ এসে জমেছে সেখানে। নর্দমা থাকলে ময়লা বেরুবার একটা পথ থাকত। কিন্তু তা নেই। সারা গলিটার মধ্যে একটা মাত্র টিউব-ওয়েল। সেখানে মেয়ে পুরুষ ও শিশুর ভিড় ও পাতিহাঁসের প্যাঁকপ্যাঁকানির মত পাম্পের শব্দ শোনা যায়। সেই সঙ্গেই ঝগড়ার চিৎকার ও হট্টগোল। গলিটায় ঢোকবার মুখে একটা বাতি আছে, ইলেকট্রিক বাতি। সেটা এখনও জ্বলছে। সব সময়েই জ্বলে। গলিটা যে স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির আণ্ডারে, ওই বাতিটাই তার প্রমাণ।

ভেলোর সঙ্গে অভয়কে দেখে গলির লোকগুলি সবাই একবার করে দেখে নিচ্ছে। ভাবখানা যেন কোন আপদ এসে জুটেছে তাদের পাড়ায়।

অভয়ের গায়ে সবজেটে জাপানী খাকীর জামা ও ঢলঢলে লম্বা প্যাণ্ট। মাথায় একটা চাষাদের টোকার মত দীর্ঘবেড় টুপি। পায়ে ভারী বুট। চেহারাটা

তার সাধারণ বাঙালীর তুলনায় অনেক লম্বা। মাথাটা চালার গায়ে ঠেকে যাওয়ার ভয়ে ঘাড় গুঁজে চলেছে সে। যেন কোন দলছাড়া সৈনিক চলেছে ট্রেঞ্চের ভিতর দিয়ে। কিন্তু মুখে তার এখনও কোমলতার আভাস। চোখে এখনও স্বাস্থ্যের ঔজ্জ্বল্য। ঠোঁটের কোণে একটা হাসির ঢেউ তাকে খানিকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে, নয়তো দুর্বোধ্য।

সে আর না ডেকে পারল না, 'ভেলোখুড়ো।'

ভেলোকে ওই নামেই সবাই ডাকে কারখানায়। বলল, 'ভাবছ কেন। তুমি বামুনের ছেলে, ভালোরাম কি তোমাকে মিছে কথা বলবে। পাকা বাড়ি, যাকে বলে ইঁটের গাঁথুনি, খুঁটে খুঁটে দেখে নিও, বুঝেছ?

বুঝেছে, কিন্তু এই বস্তির ভিড়ে পাকা বাড়ির কোন ইশারাও যে চোখে পড়ে না। ভেলো গোঁফের ফাঁকে হেসে আবার বলল, 'কিন্তু যা বলছিলুম, একটু সাবধানে থেকো, বুঝলে দাদা। মানে, আইবুড়ো ছেলে তুমি। আমার আর কি বল, মরে তো শালার বাদলা পোকাগুলোন।'

'তার মানে, আমিও মরব?' অভয়ের গলায় যেন বিরক্তির ঝাঁজ।

ভেলো বলল, 'ওই, চটলে তো? ওটা একটা কথার কথা। সেখানে কি আর পেত্নী আছে যে ঘাড় মটকাবে। মানুষ খুব ভাল, জানলে। তবে মানুষের প্রাণ······'

'মানুষের প্রাণ!' ভেলোর কথার রেশ টেনে বলল অভয়, 'খুড়ো, একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ও সব বালাই নেই।' বলতে বলতেই দাঁড়াল দুজনে।

সামনেই একটা চালাঘর যেন ঠেলে এসে পথ রুখে দাঁড়িয়েছে। তার পাশ দিয়ে একটা অন্ধকার সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে অবিশ্বাস্য রকম একটা খোলা জায়গায় এসে পড়ল তারা। সামনেই একটা মুচকুন্দ গাছ। বড় বড় শালপাতার মত অজস্র কালচে সবুজ পাতা আর ছাগলবাটি লতার বেষ্টনীতে ঝুপসি ঝাড়ের মত দাঁড়িয়ে আছে গাছটা। তলা ঘেঁষে স্তূপাকার হয়ে আছে আধলা ইঁটের রাশ। তার আড়ালে একটা ভাঙা বাড়ির ইশারা জেগে রয়েছে। তার পিছনে যেন ঘন অরণ্যের বিস্তৃতি, মাঠ ও রেললাইনের উঁচু জমি।

ভোলা বলল, 'ওই যে তোমার বাড়ি।'

বাড়ি? বাড়ি কোথায়? বস্তির গায়েই এই হঠাৎ অবাধ উন্মুক্ত জায়গাটা নির্বাক বিষণ্ণতায় গা এলিয়ে পড়ে আছে। লোকজন দেখা যায় না একটাও। এ নির্জন নিস্তব্ধতার মধ্যে প্রতি মুহূর্তে যেন একটা নিরাকার অস্থিরতা অদৃশ্যে ছটফট করে মরছে। এর মধ্যে বাড়ি কোথায়।

ভেলো বলল, 'এসো।' বলে সে মুচকুন্দ গাছটার তলা দিয়ে একটা পুকুরের ধার ঘেঁষে এগুল। পুকুরটায় কচুরিপানার ঘন বিস্তার। পুষ্ট লকলকে ডগাগুলি মাথা উঁচিয়ে রয়েছে কালকেউটের ফণার মত। তার মধ্যেই খানিকটা

জায়গা পরিষ্কার করে ভাঙা ইঁট বসিয়ে ঘাট করা হয়েছে। ঘাটের কোলে কালো জল। গভীর ও নিস্তরঙ্গ।

পুকুরটার দক্ষিণ পাড়েই আবার থমকে দাঁড়াতে হয়। একটা ভাঙা বাড়ি। পোড়োবাড়ির মত। বাড়িটাতে ঢোকবার দরজা নেই, একটা ছিটেবেড়ার আড়াল রয়েছে। দেয়ালের ইঁট চোখে পড়ে না। সর্বত্রই গোবর-চাপটির দাগ। বোঝা যায় এক সময়ে দোতলা ছিল, এখন ভেঙে গিয়েছে। বট অশ্বত্থের ছায়া আর বনকমলির লতা নিচে থেকে উপরে অবাধে জড়িয়ে ধরেছে সর্বাঙ্গ। সামনের ঘরটার জানালার গরাদ নেই। পোকা-খাওয়া পাল্লা দুটো আছে। ফাটল-ধরা ভাঙা বারান্দায় ছড়িয়ে রয়েছে ছাগল-নাদি। বারান্দার নিচেই কৃষ্ণকলি গাছের ঝাড়, ফাঁকে ফাঁকে কালকাসুন্দের বন। বন সেজেছে। অন্ধকার রাত্রের আকাশে খই ফোটা নক্ষত্রের মত ফুটেছে কালকাসুন্দের ফুল, হলদে আর লাল কৃষ্ণকলি।

ভেলো বলল, 'কি গো, পছন্দ হয় কি না হয়? ফুলবাগান, পুকুর······'

অভয় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'পাকাবাড়ি। খুঁটে আর দেখব কি, এ তো খাসা ইঁটের বাড়ি। তবে পোষাবে না ভেলোখুড়ো, চল কেটে পড়ি। ও আমার ঘিঞ্জি বস্তিই ভাল, সাপের কামড়ে প্রাণ দিতে পারব না।'

ভেলো হা হা করে হেসে উঠল। বলল, 'সাপ কোথায়, এখানে মানুষ বাস করে। কলকারখানার বাজারে একটু হাঁফ ছাড়তে পারবে। আর···'

কথা শেষ হওয়ার আগেই ছিটেবেড়ার আড়াল থেকে একটি মুখ বেরিয়ে এল। একটি মেয়ের মুখ। রংটা মাজা-মাজা, হঠাৎ ফর্সা বলে মনে হয়। বয়স পঁচিশ-ছাব্বিশের কম নয়, কিন্তু সিঁদুর নেই কপালে। আঁট করে বাঁধা চুল। মুখে হাসি। কিন্তু সামনে মানুষ দেখে হাসিটা মিলিয়ে বিস্মিত জিজ্ঞাসায় বেঁকে উঠল ভ্রু-লতা। অভয়পদর টুপি-পরা বিদঘুটে চেহারার দিকে তাকিয়ে সে জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলছ ভেলোখুড়ো?'

বোঝা গেল, ভেলো এ অঞ্চলের সকলেরই খুড়ো। বলল, 'কে বিনি ভাইঝি! বলছি, তোর মাকে একবারটি ডেকে দে। সেই লোকটি এসেছে ঘরের জন্যে।'

বিনি একবার আড়চোখে অভয়কে দেখে ভেতরে ঢুকে গেল।

অভয় বলে উঠল, 'খুড়ো, এ যে একেবারে বিয়ের যুগ্যি।'

ভেলো বলল, 'বে-র কেন, হলে অ্যাদ্দিনে ক-গণ্ডা হত, তাই বল। তা হলে বোঝ, এর উপরে একজন, নিচে আর একজন। তা বে কে দেবে। বাপ থাকতেই খেতে জোটে নি, এখন তো বেধবা মা। আর জাতেও যদি শালা বামুন কায়েত হত একটা কথা ছিল, জাত যে তোমার ভেলোখুড়োর, মানে সৎচাষা। আর মা-ষষ্ঠি দিলে দিলে, তিনটেই মেয়ে দিলে। একে বলে কপাল।'

অভয়পদর নিজেরই বুকে যেন উৎকণ্ঠার কাঁটা ফুটল। বোধ হয় তার নিজের বাড়ির কথা মনে পড়েছে, নিজের অবিবাহিতা বোনটির কথা।

কিন্তু সে হতাশ গলায় বলল, 'কিন্তু খুড়ো, এখেনে তো আমি থাকতে পারব না।'

ভেলো অবাক হয়ে বলল, 'ওই নাও, তোমার তাতে কি? দেখে শুনে একটা বামুনের ছেলে নিয়ে এলুম বলে, যাকে-তাকে তো আর এনে তুলতে পারি নে। আর মেয়েমানুষগুলো একলা থাকে, একটা সাহসও তো পাবে। তারপরে তুমি তোমার ওরা ওদের।'

অভয়ের আবার আপত্তি ওঠার অগেই বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এল বাড়ির মালিক, বিধবা বুড়ি। দু-হাতে গোবর মাখা। গায়ে কোন রকমে কাপড়টা জড়িয়ে দেওয়া। এল হাঁ করে দাঁতশূন্য মাড়ি বের করে। মুখে অজস্র রেখা পড়েছে যেন জট পাকানো সুতোর দলার মত। গলার চামড়া গলকম্বলের মত ঝুলে পড়েছে। কাঁপছে থরথর করে। বেঁকে পড়েছে খানিকটা শরীরটা। চোখে বোধ হয় ভালো ঠাওর পায় না। কয়েক মুহূর্ত অভয়কে দেখে বলল, 'ভেলো, লোকটা বাঙালী তো?'

ভেলো হেসে ফেলল, 'তবে কি পাঞ্জাবী। তোমাকে তো বলেছিলুম সব।'

বুড়ি আর দ্বিরুক্তি না করে অমনি আবার ফিরল, 'না তা বলছি নে। চেহারাটা যেন কেমন ঠেকল। চোখের মাথা তো খেয়েছি। তা এসো, থাক। ঘর বড়সড়। একটু পুরানো, তা ·· ··' হঠাৎ চোপসানো ঠোঁট কেঁপে উঠে গলাটা বন্ধ হয়ে এল বুড়ির। চোখের কোলে জল এসে পড়ল। বলল, ফিসফিস করে, 'আমি যে জম্মো পাপিষ্ঠা। আমার গলায় বুকে শুধু কাঁটা। সে মানুষটা যদ্দিন ছিল ভাড়া দিই নি, এখন কেউ নিতেও চায় না। তা থাকো।'

চোখ মুছে ডাকল, 'ও নিমি. ঘরটা খুলে দে।'

অভয় তাকালো ভেলোর দিকে। ভেলো ঠোঁট উল্টে চাপা গলায় বলল, 'উঠে পড়। দুনিয়ার সব জা..গাই সমান, থাকা নিয়ে কথা।' বলে বুড়ির পিছন পিছন অভয়কে নিয়ে বাড়িতে ঢুকল সে।

বাড়ি মানে, বেড়াটার আড়ালে একটা গলি। গলির দু-পাশের দুটি ঘর। ভেতরে দেখা যায় একটা উঠোন। উঠোনের উত্তরে একটা পাঁচিলের ভগ্নাবশেষ। ওপারে সেই মুচকুন্দ গাছ ও ইঁটের স্তূপ। নজরে পড়ে বস্তির খোলার চালা আর মোড়ের সেই লাইট পোস্টটা। বাতিটা জ্বলছে তেমনি।

অভয়ের ভারী বুটের শব্দ দ্বিগুণ হয়ে উঠল গলিটার মধ্যে। নিমি বোধ করি বিনির চেয়েও ফর্সা। কেননা, অন্ধকার গলিটাতে তার মুখটা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তারপর চুল আঁট করে বাঁধা। দোহারা গড়ন। চোখে তার শান্ত বিষণ্ণতা। বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি।

দরজাটা খুলে দিয়ে সে সরে দাঁড়াল। তার পিছনেই দাঁড়িয়েছে টুনি, সকলের ছোট। বিনির মত-ই একহারা ছিপছিপে গড়ন তার। চোখের কালো তারার খর

চাউনি, বিস্ময়ের ঝিকিমিকি। অভয়ের চেহারা দেখেই বোধ হয় তার ঠোঁটের হাসিটুকু ব্যঙ্গ হয়ে উঠেছে। তার চুল খোলা। হয়তো বেঁধে ওঠার অবসর হয় নি।

ভেলোর পিছনে ঘরে ঢুকে সুটকেস ও বিছানা নামিয়ে অভয় একবার ভাল করে ঘরটার চারদিক দেখে নিল। মেঝেটার অবস্থা মুখে বসন্তর দাগের মত। সিমেণ্ট উঠে গিয়েছে এখানে সেখানে। দেয়ালের অবস্থাও তাই। পলেস্তারার 'প' নেই, সর্বত্রই নোনা ইঁট বেরিয়ে পড়েছে। তবে ঘরটার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে বোঝা যায়। ঘরটার কোলেই সেই বারান্দা, কৃষ্ণকলি ও কালকাসুন্দের ঝাড়, তারপরে পুকুর।

ভেলো বলল, 'নাও, ঘরদোর সাজিয়ে বস, এবার আমি চললুম। ভাড়ার কথা বলাই আছে।' বলে ভেলো লোম-ওঠা ভ্রূ-সংকেতে ইশারা করল, 'সব ঠিক হয়ে যাবে।' তারপর বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'চললুম গো বৌঠান, এবার তোমরা বুঝে পড়ে নিও।' বলে সে চলে গেল।

একে একে সবাই অদৃশ্য হয়ে গেল, নিমি, বিনি, টুনি। বুড়ি বলল, 'ওই পুকুরে নাইবে; খাবে তো তুমি হোটেলে। না যদি খাও, বাড়িতে আলগা উনুন নিয়ে এস, রেঁধে বেড়ে খেও। আর···'

কথা শেষ হওয়ার আগেই একটা মেয়েলী গলার উচ্ছ্বসিত খিলখিল হাসি যেন তীরের মত এসে বিঁধল এ ঘরের দুটো মানুষের বুকে। একজনের জিভ আড়ষ্ট, চোখে শঙ্কা, কুঞ্চিত লোল চামড়া আবৃত জড়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। আর একজনের ঠিক তা নয়, তবু যেন ভয়। আর একটা নাম-না-জানা তীব্র অনুভূতিতে নিশ্বাস আটকে রইল বুকের মধ্যে।

তারপর হাসিটা নিশ্বাসের দমকে দমকে হারিয়ে গেল, মিলিয়ে গেল, নিঃশব্দ জলের বুকে বুদবুদের শব্দের মত। ঈষৎ হাওয়ায় শিউরে শিউরে উঠল কৃষ্ণকলির ঝাড়।

লাল মেঘের বুকে পড়েছে সন্ধ্যার ধূসর ছায়া। এ নৈঃশব্দ্যের ফাঁকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে অন্ধ গলিটার হট্টগোল।

বুড়ি হঠাৎ অভয়ের দিকে ঝুঁকে পড়ে বুকের দু-পাশ ও গলাটা দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'এই বুকে আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারি নে, রাখতেও পারি নে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি, যে দিন আমি থাকব না।'

বলেই সে যেন আগুনের হল্কার জ্বালায় দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। ঝোল-ঝাব্বা পরা অভয় একটা অতিকায় ভূতের মত নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে রইল। ভাবল, এ কোন্ হতভাগা জায়গায় এনে তুলল আমাকে ভেলো-খুড়ো। যে নিশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরতে লাগল।

বোধ করি সেই নিশ্বাসটা ফেলবার জন্যেই অভয় সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যায়, ফেরে সেই রাত্রে। আসবার সময় রোজই শুনতে পায় পাশের ঘরটায় খসখস কাগজের শব্দ। যে মুহূর্তে গলিটাতে তার বুটের শব্দ হয়, তখন থেকে কয়েক মুহূর্ত শব্দটা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যায় সেই সঙ্গে বেলোয়ারী চুড়ির রিনিঠিনি। একটু বা ফিসফিস কিংবা চাপা হাসির সঙ্গে কোন গলার একটা মৃদু শব্দ।

অভয় শুনেছে ভেলোখুড়োর মুখে, ওরা তিন বোন কাগজের ঠোঙা আর পিসবোর্ডের বাক্স তৈরি করে। ওটাই ওদের প্রধান উপজীবিকা।

কিন্তু অভয়ের শরীরটা তখন অসহ্য ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। সারাদিনে ভারী ট্রাকের হুইলের কাঁপুনি আর বিবাট হাতির মত বডিটার ঝাঁকুনি গায়ের মাংস-পেশীতে ছুঁচ ফোটার মত ব্যথা ধরিয়ে দেয়। চোখ দুটো জ্বালা করে। নাকের মধ্যে ভারি শ্লেষ্মার মত ধুলো জাম হয়ে থাকে।

কোন রকমে লম্ফটা জ্বালিয়ে বিছানা পেতে বিড়ি ধরিযে লম্ফ নিভিয়ে শুয়ে পড়া। খাওয়া হয়ে যায় সন্ধ্যার একটু পরেই। তারও অনেক পরে শোনা যায় হয়তো নিমি ডাকছে বিনিকে কিংবা টুনিকে। ওদের খাওয়ার সময় হল। খাওয়ার পর গলিটার বুকে ওদের পায়ের টিপটিপ শব্দ শোনা যায়, ভীত চকিত মানুষের বুকের দুরুদুরু যেন। আবার সেই চুড়ির রিনিঠিনি। রাত্রির নৈঃশব্দ্যে আবার সেই চাপা চাপা গলার আভাস। পুকুরঘাটে শোনা যায় বাসন ধোওয়ার আওয়াজ।

তিন বোনের গলা আলাদা করতে পারে না অভয়। শুধু শোনে, কেউ বলে, 'উঃ পাযে কি ব্যথা হয়েছে রে।' কেউ বলে, 'তাড়াতাড়ি কর, বড্ড ঘুম পেয়েছে।' কেউ বা, 'সেই মুখপোড়া সাউটা সকালেই মাল নিতে আসবে, বাক্সের গায়ে তো এখনও লেবেল আঁটা হল না।'

অন্ধকারে যতই ঝিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কান দুটো যেন হাঁ করে থাকে। তারপব হঠাৎ কি কাবণে তীব্র মিহি গলার খিলখিল হাসিতে শিউরে ওঠে রাত্রি। যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে। কিন্তু হাসিটা শেষ হযে আবার সেই অস্থিরতাই দলা পাকিয়ে ওঠে।

অভয় অশরীরী সাক্ষীর মত উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। দেখা যায় মুচকুন্দ গাছেব ঝুপসি আর মোড়ের সেই বাতিটা। তার এক চোখের নিষ্পলক দৃষ্টিটা যেন বিদ্রূপ করে বলতে থাকে অভযকে, আমি জেগে আছি বহু দিন, এবার তুইও জাগছিস।

পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে। দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়েব ঘরে, তার গায়ে। সে ছেলে-মানুষের মত মটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি ফুটছে তার গায়ের মধ্যে। তারপর আবার নিঃশব্দ ও অন্ধকার। শুধু দূরের কারখানার বয়লারের ধিকিয়ে চলার একটানা ঘুসঘুস শব্দ।

সেদিন রাত্রে ঘরে ফিরতে গিয়ে কৃষ্ণকলির বনে থমকে দাঁড়াল অভয়। কে যেন কাঁদছে। এখনও বস্তিতে হট্টগোল, টিউবওয়েলের প্যাঁকপ্যাঁকানি। তার মধ্যে এখানকার নিরালায় কান্নার শব্দ।

অভয় কান পাতল। ভুল হয়েছে। কান্না নয়, গান গাইছে। দুটি গলার মিলিত সরু গলার গান। গাইছে দুই বোন—

বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।

সে গানের টানা সুরের লহরীতে রাত্রি দুলছে না, আড়ষ্ট ব্যথায় থমকে দাঁড়িয়েছে। শরতের আকাশে আধখানা চাঁদ, অসংখ্য অপলক চোখেব মত তারা। নিচেও তারার মতই রাত্রির নিরালায় ঘোমটা খোলা কৃষ্ণকলি।

কিন্তু হাসি নেই, সুপ্তিব আরাম নেই। চাপা আগুনের পোড়ানিতে যেন এ বিশ্বসংসার দিশেহারা, তবুও নির্বাক নিরেট।

ধিকধিক আগুন জ্বলে যেন অভয়ের বুকেও। ভাবে, পিছুবে। কিন্তু পিছিয়েও সামনেই এগোয়। গানটা থেমে গেছে। তবুও আবার থামতে হয়। শোনা যায়, একজন বলেছে, 'না এখনও আসে নি।'

আর একজন, 'কে—সেই মিলিটারি তো?'

'মিলিটারি নয় রে. ভেলোখড়ো বলছিল, মোটরের মিস্তিরি।'

অভয় নিজের অজান্তেই আরও উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। শোনে, 'মাইরি, লোকটা যেন কি। আমাদের যেন ভয় পায়।'

আর একজনের তীব্র বিদ্রূপাত্মক গলা শোনা যায়, 'ভয় নয়, ঘেন্না করে। ভাবে, ধুমসী পেত্নীগুলো কোন দিন দেবে ঘাড় মটকে।'

তারপর একটা হাসির উচ্ছ্বাস উঠতে গিয়েও মাঝপথেই ব্রেকের অ্যাকসিলেটর চাপার মত সেটা থেমে যায়। শব্দ ওঠে কাগজের খসখস।

অভয়ের গায়ে যেন আগুন লাগে। নিজেকে কিছু জিজ্ঞেস করেও জবাব না পাওয়ায় বোকার মত খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খট খট শব্দ তুলে ঝনাৎ করে শিকল খুলে ঘরে ঢোকে।

কিন্তু পরদিন শরৎ আকাশের রং-বাহারী বাড়ন্ত-বেলায় অবিশ্বাস্য রকমে অভয়ের বুটের শব্দ শোনা যায় গলিতে। শব্দটা অভয়ের নিজের কানেই অদ্ভুত ঠেকে। মনে হয়. কি একটা মহাপাপ করে ফেলেছে সে।

ওদিকে তিন বোনের মধ্যে কি যেন একটা গুলতানি চলছিল। ওরাও একেবারে চুপ হয়ে গেল।

ওদের বুড়ি মা-ও আশেপাশেই আছে কোথাও। বুড়ি সারাদিন ওই মুচকুন্দ গাছের মোটা গোড়া থেকে শুরু করে এখানে সেখানে ঘুঁটে দিয়ে ও গোবর কুড়িয়ে

বেড়ায়। কিন্তু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়ে, না বিষ না মধু সেই অমূল্য বস্তুগুলির প্রতি তার নিয়ত সতর্ক দৃষ্টির প্রহরা ঘুরছে।

অভয় এই মুহূর্তের সংকোচ ও আড়ষ্টতাকে কাটিয়ে তোলার জন্যেই যেন দুপদাপ শব্দে ঘরে ঢোকে, খাকী ঝোল-ঝোম্বা খোলে। গামছাটা কাঁধে নিয়ে হুসহুস করে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে এসে বসে। অনেক দিন পরে বিকালের দিকে শরীরটা ক্লেদমুক্ত হয়ে একটু আরাম পায়। কিন্তু মনের মধ্যে থাকে একটা বিষের খচখচানি।

একটু পরেই কৃষ্ণকলির বনে তিন বোনের মূর্তি ভেসে ওঠে। খালি গায়ের উপর কাপড় জড়ানো। তিনজনেই সদ্য বাঁধা মস্ত খোঁপায় দিয়েছে চন্দনের বিচির মত লাল মটর দেওয়া সস্তা কাঁটা। সেগুলি যেন কুণ্ডলী পাকানো কালসাপিনীর চোখের মত জ্বলজ্বল করে। আর আশ্চর্য, এতখানি বয়সেও ঘোচে নি কারও লালিত্য। যৌবনের জোয়ারে ধরে নি ভাঁটার টান। জোয়ার যেন বাধা পেয়ে উদ্দাম হয়ে উঠেছে। বঙ্কিম ঢেউ উদ্ভাসিত সুউচ্চ রেখায়।

তবু যেন মনে হয় একটা ক্লান্তিকর বিষণ্ণতা ঘিরে রয়েছে তাদের। নিমি যেন এক ছেলের মরা মা, বিনি মন-গোমড়ানো বৌ, টুনি প্রেমিকা কিশোরী।

তিন বোন যেন তিন সই। মিটিমিটি হাসে, আড়ে আড়ে চায়। তবু চাইতে পারে না। তিনজনে গায়ে গায়ে গিয়ে নামে পুকুরের জলে। ঢেউয়ে দোলে কচুরিপানা ফণা তোলা কালনাগিনীর মত।

অভয় চেষ্টা করেও চোখ ফেরাতে পারে না। জানালা থেকে সরে আসব আসব করেও সময় বয়ে যায়। না দেখতে চেয়েও দেখে ছপছপ শব্দে গা ধুয়ে ফিরে চলেছে তিনজন। না হাসি না হাসি করেও ফিক করে হেসে উঠে মোহাচ্ছন্ন করে রেখে যায় সমস্ত জায়গাটা।

তারপর হঠাৎ দীর্ঘশ্বাসে ‍ফবে ওঠে অভয়। পিছনে দেখে বুড়িমা। ঝুঁকে তাকিয়ে আছে দক্ষিণের আকাশেব দিকে। থরথর করে কাঁপছে অতিকায় গিরগিটির মত গলার চামড়া। অভয় ফিরে তা‌কাতে ফিসফিস করে বলে, 'বুকের মধ্যে ধুকধুক করে, গলায় ধড়ফড় করে। কোথা রাখি, যাই কোথা। খালি, তরাসে তরাসে মরি।' বলেই বুড়ি বিড়বিড় করতে করতে বেরিয়ে যায়।

অভয়ের মনে হয় সে পাথর হয়ে গিয়েছে। বুকের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি নিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে বস্তির গণ্ডগোল, হাসি ও হল্লা। ঢোলক অথবা খঞ্জনির বাজনা।

এমনি চলে কয়েকদিন। রোজই অভয় ফিরে আসে বিকালের ছুটির পর। আসব না আসব না করেও আসে।

কয়েকদিন পর, বিকেলে পুকুরে ডুব দিয়ে ঘরে ঢুকে অভয় থমকে দাঁড়াল। চোখের সামনে এক অবিশ্বাস্য বস্তু দেখে চমকে উঠল। দেখল এলুমিনিয়ামের

গেলাসে খয়েরী রঙের ধূমায়িত চা। চা? চা-ই তো, হ্যাঁ। মনে হল গেলাসটা সাগ্রহে চুমুকের প্রত্যাশায় ব্যাকুল সংশয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাকিয়ে আছে জোড়া জোড়া চোখ।

অভয় একবার ভাবল, পিছন ফিরে দেখে। কিন্তু দেখে না। যেন কিছুই হয় নি, এমনি ভাবে ধীরে সুস্থে চায়ের গেলাসটি নিয়ে চুমুক দেয়। ঢোকে ঢোকে উষ্ণতাতে বুকের মধ্যে একটা দরজা খুলে যায়। মনটা ভোর হয়ে আসে।

তারপর শূন্য গেলাসটা রাখতে গিয়ে উঠে দাঁড়ায়। গেলাস নিয়ে গলিটা পেরিয়ে একেবারে ভেতরের উঠোনে এসে পড়ে। শূন্য উঠোন। কেউ নেই। ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখল তিন বোন মাথা নিচু করে কাজে ভারি ব্যস্ত।

অভয় বারান্দায় উঠে এসে দাঁড়াল। কিছু বলবে মনে করেও কথা আসে না মুখে। কয়েক মুহূর্ত এমনি চুপচাপ।

হঠাৎ টুনিই বলে, 'তুই দিয়ে এসেছিলি বুঝি?'

নিমি বলে, 'আমি কেন, বিনি তো।'

বিনি বলে 'ও মা, কি মিথ্যুক। আমি কেন বামুনের ছেলেকে চা দিতে যাব।'

অভয় দেখে কালো চোখের চোরা চাউনিতে হাসির চমকানি। হাসিটা তারও মনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। বলে, 'না হয় গেলাসটা হেঁটে হেঁটেই গেল, তাতে বামুনের জাত যাবে না। বামুন আর কোথায়, একেবারে জাত ড্রাইভার। সারাদিনের খাটুনির পর বিকেলে এ রকম, মানে একটু চা পেলে ··· আচ্ছা আমি না হয় চা চিনিটা· ।' বলে সে হেসে ফেলে।

তৎক্ষণে তারা তিন বোন উচ্চ হাসিতে ঢলে পড়ে এ ওর গায়ে। টুনি বলে, 'বিনি তুই-ই না হয় চা-টা দিস।'

বিনি বলে, 'নিমি, তুই তাহলে দুধটা দিস।'

নিমিও বলে, 'চিনিটা তাহলে টুনির।'

তারপরে আবার হাসি। এবার অভয়ও না হেসে পারে না। এই ভাঙা বাড়ির বুকে মেয়ে পুরুষের মিলিত গলার উচ্ছ্বসিত হাসি বোধ হয় এই প্রথম। যেন এখানকার চাপা-পড়া দুঃসহ অস্থিরতা একটা মুক্ত দ্বার দিয়ে অবাধে বেরিয়ে এল।

কিন্তু মুহূর্ত পরেই হাসিটা থেমে এল বুকে ফিক ব্যথা লাগাব মত। ফিরে এল সেই রুদ্ধ অস্থিরতা।

নিমি বলে, 'বিনি, মা কোথা?'

বিনি বলে, 'মাঠে গোবর কুড়াতে গেছে। পালের গোরু ফিরবে এবার।'

তবুও কেউই চাপতে পারে না একটা ছোট্ট নিশ্বাস। তিনজনের মধ্যে মূর্তি ধরে ওঠে হতাশা।

পথের মাঝে বিগড়ে যাওয়া গাড়ির বেয়াকুব ড্রাইভারের মত অবাক ও মুগ্ধ হয়ে ওঠে অভয়।

কিন্তু এমনি করেই আড় ভেঙে যায়। খুলে যায় সেই রুদ্ধ দ্বার। বাধামুক্ত জোয়ার এগোয়। কখনও সতর্ক প্রহরা এড়িয়ে, কখনও এড়াবার সুযোগ পাওয়াও যায় না।

প্রথমেই তিন বোনের অসীম কৌতূহল, কোথায় বাড়ি, কে কে আছে ?

অভয় বলে, 'কে আবার থাকবে। ছোট ছোট ভাই বোন আর বিধবা মা। ছেলেবেলা থেকেই সবাই আমার পোষ্য।'

'আর বিয়ে ?'

'বিয়ে কে দেবে আর কে করবে ? কথায় বলে, নিজের জোটে না, আবার শঙ্করাকে ডাকে।'

তারপর এ পক্ষ থেকে প্রশ্ন ওঠে 'তোমাদের রোজগার কি রকম ?'

নিমি বলে, 'ছাই ! খেতে জোটে না।'

বিনি বলে, 'তিনজনের খাটনিতে রোজ কুল্লে দু-টাকার বেশি নয়।'

টুনি বলে, 'আর মা ঘুঁটের পয়সা জমিয়ে রাখে।'

'কেন ?'

'কেন ? আমাদের বিয়ে দেবে বলে।' বলে তারা তিনজনেই বিদ্রূপ ভরে হেসে ওঠে। হাসিটা অভয়ের মর্মস্থলে গিয়ে বেঁধে। কিছুক্ষণ কথা বেরোয় না তার মুখ দিয়ে। পরে বলে, যেন খানিকটা আপন মনে 'হবে না কেন, হবে।'

হবে ! যেন এমন বিচিত্র কথা তারা কোন দিন শোনে নি, এমনি উৎসুক স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তিন বোন তাকিয়ে থাকে অভয়ের দিকে।

একটু পরেই টুনিই বলে, 'আমরা তো শঙ্করা। নিজের না জুটলে কে আমাদের ডাকবে ?'

অভয়ের জিভ আড়ষ্ট, বুকে পাথর চাপা। সত্যি, কে ডাকবে, কেমন করে ডাকবে। এ বিশ্বসংসারে সকলে : গলা চেপে রেখেছে যেন কোন অদৃশ্য দানব। বুকের মধ্যে এত গুলতানি, মুখ দিয়ে ফোটে না।

ফোটে না, তবু ফোটে। রাত্রির নিরালা অন্ধকারে ফুল ফোটার মত সে নিঃশব্দে ফোটে। এখানে গড়ে ওঠে আর এক নতুন সংসার। তিন মেয়ে আর এক ছেলের বিচিত্র সংসার।

যাকে বলে ডেয়ো ঢাকনা, তাই একে একে জড়ো হয় অভয়ের ঘরে। আলগা উনুন আসে, কিনে আনে হাতা খুন্তি হাঁড়ি থালা গেলাস।

আর দশটা বাড়িতে যা সম্ভব হয়ে ওঠে না, এখানে তাই হয়। সকাল বেলাই ভাত খেয়ে কাজে যায় অভয়পদ। ভোর রাত্রে উনুন ধরে, মোটর মিস্তিরি কেন এ সব পারবে। পালা করে আসে তিন বোন। আসে ভোর রাত্রের আবছায়ায়, ধাসি খোঁপা এলিয়ে, বিচিত্র বিস্রস্ত বেশে, ঠোঁটের কোণে তাজা হাসি নিয়ে। আবার আসে সন্ধ্যাবেলা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে। এসে অভয়কে সরিয়ে

নিজেরা বসে রান্না করতে। একসঙ্গে নয়, পালা করে আসে। ঘরে নিজেদের কাজ আছে, তা ছাড়া সেই সতর্ক সন্ধানী দৃষ্টির খবরদারিও আছে।

তবু আজ আর বাঁধ মানে না। অভয়কে ঘিরে এ তিনজনের আর এক নতুন চেহারা প্রকাশ হয়ে পড়ে।

অবারিত হয়ে খুলে যায় চাপা প্রাণের দরজা। অভয়ের রান্না খাওয়া, আর জামাকাপড় পর্যন্ত নিজেরা কেচে দেয়। সবটুকু করেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না। এত আছে যে, দিয়েও প্রাণ ভরে না।

জাত-বেজাতের বাধা ডিঙিয়ে ভাত বেড়ে দিয়ে বসে খাওয়ায় তারা অভয়কে।

নিমি খেতে দিয়ে অভয়ের সর্বাঙ্গে আঁতিপাতি করে দেখে। চোখে তার মমতা, ঠোঁটের কোণে বেদনার হাসি। অভয় বলে, 'কি দেখছ ?'

নিমি বলে, 'দেখছি তোমাকে। জাত মারলুম মিস্তিরি, তবু তোমার শরীরটা ভাল করে তুলতে পারছি না।'

অভয় হেসে বলে, 'তোমার খালি ওই ভাবনা। আর কত হবে। ড্রাইভার কি দুধগেলা পুরুষ হবে।'

নিমিও হাসে। মন বলে, হ্যাঁ, দুধগেলা পুরুষই হবে। ঢলঢল কান্তি, গোরাচাঁদ হবে অভয়। আর নিমি সবই ফেলে দেবে সেই গোরাচাঁদের পায়ে।

ভাবতে গিয়ে নিমির বুকের শিরা-উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শূন্য কোলটাও হাহাকার করে।

অভয় সেই স্বপ্নাচ্ছন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেও স্বপ্নাতুর হয়ে ওঠে। বলে, 'কি হয়েছে নিমি ?'

নিমি মুখ নামিয়ে নিঃশব্দে হাসে।

এমনি বিনিও আসে। সে যেন একটু রহস্যময়ী। রান্নার ফাঁকে ফাঁকে সে কেবলই অভয়কে বলে, 'এটা দাও. সেটা দাও। তারপরে, 'আজকে বাজার থেকে এই এনো, সেই এনো।' খেতে গিয়ে, অভয়ের আপত্তি থাকলেও যা প্রাণ চাইবে, তাই দেবে। না খেলে মাথার দিব্যি দেবে আর আড়ে আড়ে চেয়ে নিঃশব্দে টিপে টিপে হাসবে। যেন মনের তলার গুরু কথা তার ঠোঁটের কোণে ঝিকিমিকি করে।

তা দেখে এই হাসিটার মতই অভয়ের বুকটা ধিকিধিক জ্বলে।

জ্বলুনিটা লাগে এসে রক্তস্রোতে। ডাকে, 'বিনি।'

বিনি তাকায়, তার অপলক হাসি হাসি চোখে বিচিত্র ইশারা। সুগঠিত ঘাড়ের কাছে মস্ত খোঁপা। চাপা গলায় বলে. 'বল।'

'কিছু বলছ ?'

তেমনি তাকিয়ে বিনি বলে, 'কি আবার।' একটু থেমে আবার বলে, 'তুমি না থাকলে বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।'

সেটুকু কান পেতে শোনে অভয়। শোনে, বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোলে পাড়চাপা গুমরানি।

অভয় বলে, 'আমার কাজে মন বসে না। মনটা যে কোথায় থাকে।' যেন না জানার জন্যেই দুজনে চোখে চোখ তাকিয়ে হাসে।

আর টুনি যেন এক দজ্জাল কিশোরী বৌ। তার ক্ষণে হাসি, ক্ষণে রাগ। তার হাসি অবাধ, আবার রাগও করবে। ছুটে ছুটে কাজ করবে। কাজের কি হল না হল তা দেখবে না। দিশেহারা কাজের মধ্যে সার হয় অভয়ের সঙ্গে খুনসুটি করা। মনের মতটি না হলে ধমকাবে।

অভয় তার কাছটিতে বসে বলে, 'এই তবে রইলুম বসে, থাকল মিলিটারি কারখানা আর চাকরি।' টুনি অমনি খিলখিল করে হাসে। কখনও এলোচুলে, কখনও খোঁপা নেড়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসবে। দেখবে আঙুলের ফাঁক দিয়ে আর থরথর কাঁপবে বাঁধভাঙা শরীর।

অভয়ও মেতে ওঠে তার সঙ্গে। হাসে, রাগ করে। হয়তো আলগোছে টুনির ঘাড়ের কাপড় মাথায় তুলে ঘোমটা করে দেয়।

টুনি অমনি যেন সত্যি তীব্র অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে চোখ বাঁকিয়ে চায়। চোখের কোণে বকুনি ও কান্নার ঝিলিমিলি খেলে।

অভয় বলে. 'কি হল টুনি?'

কি হল তাই ভাববার চেষ্টা করে টুনি। কিছু টের পায় না, শুধু চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে, অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর; নিজেকে দেখে, সে যেন অভয়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আছে।

ভাবতে গিয়ে হঠাৎ অসহ্য লজ্জায় বিচিত্র রূপে রূপবতী হয়ে ওঠে টুনি। বলে, 'কি জানি কি হয়, জানি নে ছাই।'

তারা কেউ জানে না তাদে. কি হয়েছে। চারজনে ডুবে আছে আকণ্ঠ। নতুন গড়া এক ভরা সংসারের তারা চারজন মানুষ।

অভয় না থাকলে সত্যি বাড়িটা খাঁ খা করে। সময় যেতে চায় না। তিনজনের বুকে একই তাল। চোখে একই জিজ্ঞাসা। তিনজনই সারাদিন কান পেতে শোনে পদশব্দ। এই সুযোগে তাদের চাপাপড়া প্রাণের অস্থিরতাটা যেন ফিরে আসতে চায়।

টুনি হয়তো গুনগুন করে ওঠে—

আর রইতে নারি হয়ে নারী,
তোমার বাঁশি শুনে গো।
আর চলতে নারি হয়ে নারী
এ কি বিষম দায় গো।

বিনি তাতে '.লা দেয়, নিমি সব ভুলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে।

তারপর আবার বেজে ওঠে সেই পদশব্দ। বাজে যেন হৃৎপিণ্ডের মধ্যে।

অভয় তিনজনকে আলাদা করে ভাবতে পারে না। একজনকে ভাবতে গেলে আর একজন আসে। কেউ কাউকে ছাড়া নয়। এর মমতা, ওর হাসি, তার অভিমান। তিনে মিলে যেন একটাই।

তবু একটা নয়। এ সংসারের বিচিত্র নিয়মের মত তিন বোনের আলাদা সত্তা যেন তলে তলে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। তাদের প্রাণের আর একটা গোপন দরজা ধীরে ধীরে খুলতে থাকে। অভয়কে তারা তিনজনে তিন রকমে টানে।

এমনি সময় একদিন বেলা দশটায় অসময়ে গলিতে বেজে উঠল বুটের শব্দ। অসময়ে কেন! একে একে সব ফেলে ছুটে এল তিন বোন। দেখল শিকল দেওয়া বন্ধ দরজায় হেলান দিয়ে অভয় যেন ভেঙে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তিনটে বুক উৎকণ্ঠায় ভেঙে পড়ে। কি হয়েছে, অসুখ? বাড়ির দুঃসংবাদ?

অভয় তাকায় তিনজনের দিকে। ফিক ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে যায় বুক। বলতে গিয়ে কথা ফোটে না মুখে। চোখের দৃষ্টি নেমে আসে। ভাবে, যাক বলব না। সব যায় যাক, তবু পারব না ছেড়ে যেতে, পারব না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে।

কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ। ওদের যে আর কেউ নেই। সে বলে, যেন চেপে আসা গলায় কোন রকমে বলে, 'ট্রান্সফার, মানে বদলি করে দিলে, পানাগড় ডিপোতে।'

বদলি! সামনে তিন মেয়ের মুখ নয়, তিনটি প্রাণহীন মৃত মুখ। শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ বন্ধ, চলৎশক্তিহীন। যেন বুঝেও বোঝে নি সমস্ত ব্যাপারটা।

হুহু করে হাওয়া এল গলিটার অন্ধ সুড়ঙ্গে। ফাল্গুনের মাতাল হাওয়া। কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতেই মেঘলাভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুক্ষতায়।

অভয় বলল, 'যেতে হলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই যেতে হবে। কালকেই জয়েন করতে হবে।'

যেতে হলে নয়, যেতে হবে। দুরন্ত হাওয়ায় সেই কথাটি যেন মর্মে মর্মে এসে বলে দিয়ে যায়।

নিমি, বিনি, টুনি—তিন বোন। ওদের চোখে বৈধব্যের গাঢ় হতাশা। রক্তক্ষয়ী চাপা কান্না থমকে রয়েছে চোখে। বুকের মধ্যে কি যেন ঠেলে আসছে।

অভয়ও আর তাকাতে পারে না। বুকটা মুচড়ে তারও গলাটা বন্ধ হয়ে আসে। কোন রকমে দরজাটা খুলে সে ঘরে ঢুকে পড়ে।

ফিরে আসে সেই অস্থিরতা। অদৃশ্যে সে যেন তীব্র যন্ত্রণায় ছটফট করে মরে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে।

সব গোছগাছ হয়ে যায়। সেই সুটকেস আর বিছানা।

তিন বোন বুক চেপে দেখে উনুন কড়া খুন্তি হাঁড়ি। সেগুলিও যেন তাদেরই মত রুদ্ধ যন্ত্রণায় নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে। তাদের গড়া ঘর। যাকে ঘিরে এই খেলাঘর সে চলে যায়, এগুলি পড়ে থাকে তাদেরই মত।

তারপর অভয় আবার দাঁড়ায় তিন বোনের মুখোমুখি। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, ঠোঁট বেঁকে ওঠে। খালি শোনা যায়ঃ 'যাচ্ছি, যাচ্ছি তবে।'

এই তিনজনের বুকের মধ্যেও হাহাকার করে উঠল বিদায় দেওয়ার জন্যে। ঠোঁট কাঁপল, বন্ধু বিদায়ের হাসি হাসতে চাইল। পারল না। হাত বাড়িয়ে বুঝি ছুঁতে চাইল, পারল না।

হাওয়া এল। শূন্য ঘর। ছড়ানো সংসার। ফুল নেই, শুকনো কাঠির মত শীর্ণ পাতাহীন কৃষ্ণকলির ঝাড়। কালকাসুন্দের বন। পোড়া পোড়া পাঁশুটে কচুরিপানা।

একদিন যেমন এসেছিল, আজ তেমনি পোশাকে, তেমনি ঠেকে ঠেকে হাতে আর ঘাড়ে বোঝা, চলেছে অভয়। কিন্তু চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সবই ঝাপসা।

মুচকুন্দ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে আবার তাকাল।

সেখানে এসেছে তিন বোন, ভাঙা পাঁচিলের ধারে। কিন্তু চোখ অন্ধ হয়ে এসেছে, সামনে অন্ধকার।

অন্ধকার কানা গলিটাতে ঢুকে পড়ল অভয়। মোড়ের বাতিটা তাকিয়ে আছে এই দিকেই, এক চোখে।

তারপর হঠাৎ একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখল, দেয়ালের নোনা ইঁটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ী মা। কেন, তা কেউ জানে না, বুঝবে না।

পাপ-পুণ্য

'একটা কি দুঃখু, কিছু বুইতে পারলাম না।

এ-কথা, সেই এক কথা। যে-কথা, যে-কথাখানি কেতু নিজে বলে না। গদাই এইরূপ ভাবে। যেন কেতু বলে না। সেই এক কথা, এই গাড়ির চাকা যেমনটা এক পাক ঘোরে, আর পথ-চলতি-পায়ের তলায় কাঁটাবেঁধার মত ককানি ওঠে, উহু! উহু! তেমনটা কেতুর ফেকো পড়া মুখ দিয়ে ফুটে বার হয়। কিন্তু, গদাই ভাবে, যেন কেতু বলে না। যেমন কি না, চাকায় তেল না থাকলে চাকা গোঙায, সেইমত কেতুব মনে বাতি নাই। মনে বাতি নাই কি যে দেখিযে দেয, 'ওহে দেখ, এই কারণে বিন্দু গলায দাঁড় দিয়েছে।' কেতুব 'মাহানিশা'র অন্ধকার থেকে তাই বারে বারে গোঙানি ওঠে, সেই এক কথা। যেন এই কেতু বলে না, যে-কেতু এখন গাড়িব উপবে গদাইযেব পিছনে বসে আছে। যে-কেতু পরশু রাত্রে ভৈরবের কোণের পুকুরধারে তালবনে বিন্দুর জন্যে হা-পিত্যেশ করে বসে ছিল, যোবা মরদটি অঢেল লাল চন্দন-গোলা মদ খেয়েছিল, পুরো একখান বোতল বিন্দুর জন্যে রেখে দিয়েছিল, কোঁচড়-ভরতি মুড়ি, কুচনো পেঁয়াজ, অই কি ধন গো, তাতে কযেক ফোঁটা সবষের তেল ইস্তক ছিল, লঙ্কার তো কথা নাই। যে-কেতু বিন্দুতে মনপ্রাণ, কত না জানি ছাযা দেখেছিল সেই রাত্রে, ভৈরবের কোণের পুকুরপাড়ে, অই বুঝি বিন্দু আসে গ, এই ভেবে-ভেবে গোটা রাতখানি প্রায ভোব হয়েছিল। কেন কি না, মেয়েটি তো হালছাড়া, স্বামীর ঘর সয নাই কপালে, ডাগর বটে, তায কেতু বউখেকো, মন রক্ত তাবৎ খাঁ খাঁ করে, মনের ঘরখানি ফাকা, তাই রাতভর পাগল হযে বসে ছিল।

তারপর ভোররাত্রে গদাইযের হাঁক শুনতে পেযেছিল, 'অই, মেয়েটা আমার গলায় দাঁড় দিযেছে গ।'

অয, হ্যাঁ, মেযেটা গদাইয়ের। তার হাঁক শুনে কেতু চন্দন-গোলা মদের বোতলের কথা ভুলে গিয়েছিল। আলগা কোঁচড়ের মুড়ি তাবৎ ঘাসের উপর পড়েছিল। আর সেই থেকে এক কথা 'বিন্দু গলায দাঁড় দিলে, কিছু বুইতে পারলাম না।' যে-কথা ওর 'মাহানিশা'র অন্ধকার থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু আলো পায় নাই। তাই কেবল পাক খেয়ে মরছে।

গদাইয়ের এক জবাব, 'অই।'

'বাবা হে।' কেতু ডাক দিয়ে বলে।

গদাই বলে, 'না, বাপ বলিস না আমাকে। আমি কারুর বাপ লয়।'

কিন্তু সে-কথায় কেতুর কান নাই। কেননা, কেতু যেন নিজে কথা বলে না। এই গাড়ির চাকা যেমন ঘোরে, তেমনি আবার গোঙানি ওঠে, 'রাতভর, ভৈরবের কোণের পাড়ে—'

কথা শিস হয় না কেতুর। সুর নাই গলায়। কথা ফোটে, কথা ডুবে যায়। কেতু ধুলা-মাখা মুখে, ধুলা-মাখা ভুরু দুটি কুঁচকে দূরে তাকিয়ে থাকে।

গদাইয়ের মনে হয়, সেও নিজে কথা বলে না। তার মনেও বাতি নাই। চাকা যেমনটা পাকে পাকে গোঙায় তেমনি শব্দ করে, 'অই।'

গাড়ি বলদের মর্জিতে চলে। ফাল্গুন মাসের রাস্তা শুকনো। কিন্তু বর্ষার ধকল সব কাটিয়ে উঠতে পারে নাই। এখনও খানা খন্দ উঁচা নিচা বিস্তর। চৈত্রে আরও সমান হবে। বৈশাখে আরও। তখন পায়ের পাতা-ডোবা ধুলা হবে। এখন মানুষ আর পশুর পায়ে পায়ে, গাড়ির চাকায় চাকায় সমান হতে চলেছে, ধুলা জমতে লেগেছে। তার পরে আবার—আবার বৃষ্টি, চাকা যেমনটা ঘোরে আর গোঙায়। গদাই ভাবে, অই, এ সকলই কি অন্ধকার ডাকে। বাতি নাই।

ফাল্গুন শেষ হয়ে এল, তাপ এখন বেজায়। এখনও ঘোর দুপুর আসে নাই, তাপে রোদ কাঁপতে লেগেছে। রোদ ছাড়া ছায়া নাই। যত দূরে চোখ যায়, মাঠের কোন বেশভূষা নাই, বৈরাগীর একরঙা আলখাল্লা তার গায়ে। ধুলা আর ধুলা। কেবলমাত্র মাঠের এপারে-ওপারে ছাড়া-ছাড়া, দূরে দূরান্তে গ্রামগুলো গাছের ছায়ায় ডুব দিয়ে আছে। কোন সাড়াশব্দ নাই। গদাইয়ের শরীরে তাপ বিঁধে না, শরীরে সেই চেতন নাই। কেতুরও না। কেননা, তার শরীরও অচেতন। রোদ-ঝলসানো মাঠে ঝিঁ ঝিঁ ডাকার একটানায় হঠাৎ-হঠাৎ মাছির ঝাঁক ভ্যানভেনিয়ে ওঠে, যখন উঁচা-নিচায় গাড়ি দুলে ওঠে। মাছি বলদের কাঁধের ঘায়ে, বেশি মাছি গাড়ির ওপর—যেখানে বিন্দুকে চাটাইয়ে বেঁধে শোয়ানো রয়েছে। পরশু রাত্রের মড়া, শেষরাত্রের মড়া। তবু তাপে মাছি ফাটছে, মড়া তো গলবেই বটে। পচন ধরেছে কাল বেলাবেলি থেকেই। কিন্তু অপঘাতে মরা, পুলিস সদরে টানাপোড়েন না করে ছাড়ল না। গাঁ থেকে সাত মাইল দূরে, বর্ধমানে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ের চৌকিদার কোমরের ফেত্তা কষে বলেছিল, 'তা বললে কি চলে, গলায় দড়ি বলে কথা।' লোকেরা বলেছিল, পুলিসের ডাক্তার বিন্দুর মড়া কাটাকুটি করবে, সব দেখবে। অই, বিন্দু গ, তোর শরীলের ভিতর কি দেখবার আছে। মানুষের শরীরে কি দেখবার আছে। শরীরের মন আছে। কিন্তু মন কি কেউ দেখতে পায়। তার কি শিরা-উপশিরা আছে, হাড়মজ্জা রক্ত আছে। বিন্দুর শরীরে কি দেখবার আছে। আইন মন মানে না,

সে কাটাকুটি করে দেখতে চায়। আপন মন মেরেছে না মানুষ মেরেছে। বিষ দিয়ে মেরেছে না গলা টিপে মেরেছে।

তবে ডাক্তারের চোখ, পুলিসের ডাক্তারের চোখ, ফাঁকিতে পড়ে নাই। বিন্দুর শরীর নিয়ে কাটাকুটি করে নাই। কেবল গদাইকে ডেকে জিগ্যেস করেছে, 'মেয়েটির বিয়া দিয়েছিলে হে?'

'আজ্ঞে।'

এখন যেমন, তখনও তেমনি ছিল, মুখের চামড়া অনড়। অই হে, গদাইয়ের মুখের চামড়ায় কি হল, পক্ষাঘাতের মতন তার নড়াচড়া নাই। ডাক্তারবাবু আর দারোগাবাবু তার মুখের দিকে খোকনের মতন তাকিয়েছিল। আহা, শিশুর মতন। তাদের চোখ-মুখ কি সুন্দর গ! গদাইয়ের মুখে ভাব ছিল না, চোখে পলক ছিল না, কালো তারা দুটি থির। বাবুদের কি শোক-লাগা মুখ।

দারোগাবাবু বলেছিল, 'তা ওহে গদাই বায়েন, মেয়েটির মনে কোন তাপ ছিল? কেউ দাগা দিয়েছিল নাকি? অমন আলটপকা আত্মঘাতী হল কেন?'

'আজ্ঞে বলতে পারি না, আবাগী—'

অই, ওহো গদাই, মন কেউ দেখতে পায় না। সকলই অন্ধকার। বাবুদের চোখ মুখ কি সুন্দর।

'যাও, লিয়ে যাও মেয়েকে, পোড়াবার ব্যবস্থা কর গা।' বলে বাবুরা একখানি কাগজ দিয়েছিল।

সদরেও সঙ্গে গিয়েছিল কেতু। ও যে বুঝতে পারে নাই বিন্দু কেন গলায় দড়ি দিয়েছে। অথচ, নিজের চোখকে তো গদাই ফাঁকি দিতে পারে না, সে যে দেখেছে, সোয়ামীর ঘর সইল না বিন্দুর। কাঁচা ঢলের খাত চাই। বউখেকো কেতুর সঙ্গে মেয়ের চোখে চোখে কথা, কথায় কথায় ইশারা। সাঁঝবেলার বাতাসে মদের গন্ধ টের পাইয়ে দিত, ঘরের কানাচে অন্ধকারে কেতুর নিশ্বাস পড়ছে। ঘর সমাজ আছে, দুটা কথা বলতে হত গদাইকে, চোটপাট করে হাঁকোড় পাড়তে হত। কেতু বলত, 'এ তোমার আইবুড়ো মেয়ে লয় হে, পাওয়ানা তোমার কিছু নাই। সাঙা করে ঘরে লিয়ে যাব, এই এক কথা।'

তা বললে কি হয়, কেতুর মন নাই কি। গদাইয়ের পায়ের কাছে আধখানা ভরতি বোতল বসিয়ে দিত। 'অই বাপ, বাপ বলি হে, এস খাই। দু-মুঠা মুড়ি দিতে বল, ঘর যদি আদা থাকে, দুখানা কুচি দিতে বল।'

সাত বিঘা জমি কেতুর, বায়েনের ঘরে। এ-কথা প্রত্যয় হয় না, কিন্তু ভৈরব জানে, সাত বিঘা জমি কেতুর, ওর বয়সে ঢাক কাঁধে করে নাই। পরের বলদ ধার করে না, নিজের জোড়া বলদ, এই যে চলেছে গাড়ি টেনে নিয়ে। এই বলদ, এই গাড়ি, সকলই কেতুর। বাপ বলত কেতু, এই এক কথা, বাপ বলত কেতু।

বউথেকো বোবা, ঘরে অন্ন আছেন, গদাই কি মানুষের মন নয়। সে বলতি, মেয়ে নারকেলের মালা এনে দিত, বাপের হুকুম শোনবার সময় কোথায় তার। মুড়ি এনে দিত, অই গ, আমার আদুরি হারামজাদী, বাপের মাথায় দেবার জন্যে তোর একটু সরষের তেল হাতে উঠত না, মুড়িতে তেলের বাস ছাড়ত। আদার কুচি ছুঁড়ি কোথায় পেত কে জানে। কেতুর দিকে চেয়ে বলত, 'আদা দেখে খেয়ো গ বাবা'। মদ মুড়ি গদাই খেত, কেতু বিন্দু আপনার তালে। তাদের কথার পিঠে কথা, হাসির পিঠে হাসি। কি বলবে গদাই। মাহাচান্দার ছেলে জামাইটার কথা মনে পড়ত। এ কাঁচা ঢলের স্রোতে মাটি আ-ফাটা থাকবে, তেমনটা সে নয়। অই হারামজাদী আমার, গদাইয়ের মা তুই, কেতু তোর কাছে সাঙা চায়। কেতুর ঘরে অন্ন, বলদ, গাড়ি। খুশির কথা মুখ ফুটে বেরুত না, চোখের জল হয়ে গড়িয়ে পড়ত। কেননা, বিন্দুর মায়ের কথা মনে পড়ে যেত। দশ বছর গত, মেয়ের বিয়ে দেখে যেতে পারে নাই। কেতুর অন্নের ঘরে যাবার রঙ্গ দেখতে পায় নাই। বিন্দুর মায়ের শোকে মদের ভারে গদাইয়ের যখন ভর হত, ওদিকে তখন কেতু-বিন্দুর কথার পিঠে হাসি, হাসির পিঠে ঝগড়া ইস্তক। মানুষের মন অই, কি অন্ধকার। তখন তেঁতুলতলার রাঁড়ি বেওয়া পচীর মুখখানি গদাইয়েরও মনে পড়ত। তবে কি না, সে-কথা এখন থাক।

এখন, তাই কেতু না এসে পারে নাই। সদরে গিয়েছিল গদাইয়ের সঙ্গে, বিন্দুর মড়া কাঁধে নিয়ে। আবার কাল রাতে রাতেই মড়া খালাস পেয়ে ফিরে এসেছে কাঁধে নিয়ে। গ্রামের আর কেউ যায় নাই। একে তো অপঘাতের মরণ, তায় পুলিসের টানাপোড়েন। চাটাইয়ে বেঁধে এক বাঁশে ঝুলিয়ে দুজনে কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছে, এসেছে। এখন চলেছে মহাশ্মশানে। গাড়ির ওপরে চাটাই জড়ানো, এক বাঁশে বাঁধা, যেমন ছিল, তেমনি শুইয়ে নিয়ে চলেছে। ভর দিন, ভর রাত্রির যাত্রা। কাল দুপুরতক পৌঁছুনো যাবে। গ্রামের কেউ শ্মশানযাত্রীও হয় নাই, কেতু ছাড়া। ওদের ঘরে, শরীরে অপদেবতার নজর লাগবে, তাই কেউ যাত্রী হয় নাই। দুজনে চলেছে। সকাল থেকে পাঁচ ক্রোশ পথ আসা গিয়েছে, সূর্য মাথার ওপরে। আরও বারো ক্রোশ, তার পর মাহাশ্মশান।

কেতু জিগ্যেস করেছিল, 'ক্যানে, কাঁদরের ধারে পুড়োবা না?'

গদাইয়ের মুখের চামড়া নড়ে নাই। বলেছিল, 'না, মাহাশ্মশানে যাব, নইলে মুক্তি নাই।'

কেতু গদাইয়ের কথাগুলোই বিড়বিড় করেছিল, 'মাহাশ্মশানে যাব, নইলে মুক্তি নাই।' তার পরে বলেছিল, 'কিন্তু কিছু বুইতে পারলাম না।'

গদাই যাত্রার আগে আপন ভিটের দিকে একবার ফিরে তাকিয়েছিল, তারপর চামুণ্ডার পুজারী মুখুজ্জে ঠাকুরের কাছে গিয়ে ভিটে-বাঁধা টিপসই দিয়ে চার

কুড়ি টাকা নিয়েছিল। কেতু সেই একবার, একবারের জন্যে নিজে কথা বলেছিল, 'অই ওহে, বাপ মা বলতে দাও, ভিটে ক্যানে যমের ঘরে দিচ্ছ। আমার কি টাকা নাই?'

গদাইয়ের বুকের ভিতরটা ধস্ নামার মতন দুলে উঠেছিল, কিন্তু মুখের চামড়া, চোখের তারা কাঁপে নাই। বলেছিল, 'না, মাহাশ্মশানে যাব কেতু, এখন তোর টাকা লোব না।'

তবু কেতু বলেছিল, 'ক্যানে, বিন্দুর গতি করতে আমার টাকা লিবে না?'

গদাই তেমনি করেই, যেন কিছুই চোখে পড়ে না, অথচ চোখ খোলা, স্থির চোখে তাকিয়ে সুরহীন গলায় বলেছিল, 'না, এ-যাত্রায় কারুর টাকা লোব না।'

কেতু আর কিছু বলে নাই। সে দরকারী জিনিসপত্র সব গাড়িতে তুলে নিয়েছিল। বিন্দুর মড়া গাড়িতে তুলে দুজনে যাত্রা করেছিল। বাথেনপাড়ার পুরুষেরা দূর থেকে দেখেছিল, মেয়ে-বউরা ঘরের আড়াল থেকে। গদাই দেখেছিল চাটাইয়ের বাইরে বিন্দুর মুখখানি বেরিয়ে রয়েছে। কালো তেলতেলে মুখখানি তখন আর তেলতেলে না। ফুলে উঠেছিল, রংটা যেন রোদে পোড়া মাটির মতন দেখাচ্ছিল। ডাগর চোখ দুটি খোলা। রোদ লাগবে, কড়া রোদ, গদাই হাত বাড়িয়ে কাপড় টেনে মুখখানি ঢেকে দিয়েছিল। চুলগুলো এলিয়ে পড়েছিল বাইরে, তখনও তেলের চকচকানি ছিল, অই কি পোড়া নাক গ গদাইয়ের, মসলা-মেশানো তেলের গন্ধও খানিক পেয়েছিল। চুলগুলো ঝুঁটি করে মাথার পিছনে ঘাড়ের কাছে গুঁজে দিয়েছিল। তবু, সিঁদুর মাখানো সিঁথেটি, এখনও দেখা যায়, মাথার খুলিখানি যে বেরিয়ে আছে। চাঁদিটি চকচক করে। ফাল্গুনের শেষ, এখন চোতখরা বলা যায়। বিন্দুর এখন চাঁদি ফাটবে না। কেননা, চাঁদিতে কি না সাড় নাই। তবু, অই আমার ঢলানী মা, সিঁথের সিঁদুর দেখে মনে হয়, জীবন্ত সধবার মাথা তোর।

গদাই যখন বিন্দুর মড়ার দিকে তাকায়, কেতুও তখন তাকায়। গদাইয়ের ইচ্ছা করে, একটা বড় নিশ্বাস ফেলবে, বুকখানি খালি করে হুসহুস করে নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু বড় করে নিশ্বাস পড়ে না। বুকের ঘরে যেন বাতাস নাই। বুকের ঘরে কেবল 'মাহানিশা'র অন্ধকার।

'ওহে, বাপ।' কেতু ডাকে।

গদাই মুখ ফিরিয়ে দূরে তাকায়, বলে, 'বাপ বলিস না কেতু, আমি কারুর বাপ লয়।'

কেতু সে-কথা কানে তোলে না, আপন মনে বলে, 'ভৈরবের কোণের পাড়ে রাতভর দুজনে থাকব, এই কথা ছিল।'

'অই।'

'দুজনায় শুবে, অয়, তুমি রাগ করতে পারো এই কথা ছিল।'

'অই।' কিন্তু এখন আর রাগ হয় না এ-কথা শুনে। পাঁচ ক্রোশের মধ্যে এই এক কথা কতবার বলল কেতু। যে কথা কেতু এখন আর নিজে বলে না।

'কিন্তু কি হল, আমি বুইতে পারলাম না।'

গদাই আর কোন শব্দ করে না। যেন শব্দ করার মত একটু বাতাস নাই বুকে। কেতু চুপ করে থাকে না, আবার ডাকে, 'ওহে বাপ।'

'বাপ বলিস না কেতু, সন্‌সারে কে কার বাপ।'

'বিন্দুর সঙ্গে কথা ছিল, তোমরা সবাই কিষ্টোদাসের মেয়ের বিয়েতে পাড়ায় মাতবে। আর বিন্দু ভৈরবের কোণের পাড়ে যাবে।'

কিন্তু গদাইয়ের কানে আর সে-কথা যায় না। তার মনে বাতাস নাই, বাতি নাই, কেবল একটা কথা বাজতে থাকে, 'সন্‌সারে কে কার বাপ।'

'তোমার পেটে দব্য পড়লে তুমি পচীর ঘরে যাবে, ভেবেছিলাম।' কেতু বলে।

গদাইয়ের কানে যায় না। তার মনের মধ্যে বাজতে থাকে, 'সন্‌সারে কে কার বাপ, কে কার মা, কে পুত্র, কে কন্যা, এ সবই 'মাহানিশার' অন্ধকারের মতন লাগে ···'

'বিন্দু এল না, আমার রাত কাবার হয়ে গেল।' ·

'সন্‌সারে একটা বাতি দেখি না হে···।' গদাইয়ের মনের মধ্যে, মনের অন্ধকারের মধ্যে এই কথা বিলাপের মতন বাজতে থাকে। তার মুখের অনড় চামড়ায় একবার, এক লহমা, একটা অন্ধের আর্তি ফুটে ওঠে যেন। কিন্তু সে-লহমা ধরা দেয় না।

দুজনকে প্রায় উলঙ্গই মনে হয়। ছোট ছোট ময়লা কাপড় দুটি দুজনের কোমরে গোঁজা, কোন রকমে লজ্জা নিবারণ করেছে মাত্র। কেতুর সকল লজ্জা-ভরসা ভৈরবের কোণের পাড়ে পড়ে রয়েছে। গদাই ভাবে, সংসারের কোন লজ্জা নাই। সংসারের কি কোন কালে লজ্জা ছিল, ওহে গদাই, একবার সত্যি করে বল। তেত্রিশ কোটি দেবতা থাকতেও তুমি কোথায় আপনাকে গতি করলে। দেবতারা লজ্জাকে কোথায় নিয়ে বসে রইল, মরা মেয়েকে তুলে দিল তোমার হাতে। তুমি মহাশ্মশানে চললে। সকল কিছু সকল নয়, সংসারে শ্মশান সকল হল। ·· লজ্জা নাই, যেন দুটি উলঙ্গ, কালো পুরুষ। গায়ের চামড়া দেখে তাদের যোবা বুড়া চেনা যায় না। জগতের দাগ কমবেশি আছে, আগে-পরের দাগ। যে আগে আসে তার গায়ে দাগ বেশি, পরে যে আসে তার দাগ কম। রোদে পোড়া, ধুলায় নাওয়া এই জগতে জীবের বয়স কিছু না। মানুষের বয়স মানুষকে চেনায় না।

বলদ দুটি নিজেদের মর্জিমতন দাঁড়িয়ে পড়ে। রোদ যার চক্রে, সে মাথার উপরে জ্বলছে। ঝুটিতে ঘা-ওয়ালা পশু দুটো, গায়ে গা জড়ানো গুটিকয় বটের

ছায়ার তলায় আপনি দাঁড়ায়। দুজনেই ছড়ছড়িয়ে শোতে। বিশ্রাম দরকার। রওনা হওয়া ইস্তক দাঁড়ায় নাই। জায়গাটাও সুবিধার, কেননা গ্রামের বাইরে। গ্রামের ভিতর দিয়ে মড়া নিয়ে গেলে, তায় বাসি মড়া, লোকেরা রাগ করত। দাঁড়ানো তো পরের কথা। এখানে, বটের গোড়ায়, মানসিকের মাটির ঘোড়ার স্তূপ, শীতলার থান বটে। অন্য গোড়ায় সিঁদুর মাখানো পাথর, মেলাই ঢিল জড়ো হয়েছে। ষষ্ঠীঠাকরুনের বাস।

গাড়ির নিচে খড়ের আঁটি বাঁধা, বিন্দুর শরীরের তলায়। কেতু দু-আঁটি নিয়ে বলদ দুটিকে খেতে দেয়। গদাই দূরান্তে মুখ ফিরিয়ে দেখে। সামনে মঙ্গলকোট। রাস্তা বীরভূম দিয়ে উত্তরে গিয়েছে। কাটোয়া শহর হয়ে যেতে ইচ্ছা করে না, লোকে দশ কথা বলবে, নাকে কাপড় চাপা দেবে, গালি পাড়বে। তার চেয়ে থুপেসরা, ব্যাংচাতরা, জলঙ্গী, বনগ্রাম, চারকলগ্রাম, পাকুড়হাঁসের পাশ দিয়ে, গঙ্গাটিকুরির উপর দিয়ে যাওয়া ভাল। কেতুগ্রাম হয়ে পাচন্দির উপর দিয়ে রেল-লাইন পার হলেই হবে। এখন তো পথের ভাবনা নাই, মাঠ খাঁ-খাঁ করে। রাত ভোর হয়ে যাবে গঙ্গাটিকুরি তক যেতে। তার পরে—তার পরে মহাশ্মশান আর দূরে নয়।

গদাই বিন্দুর মড়ার দিকে তাকায়। অই, হ্যাঁ বাতাসে পচা গন্ধ ওঠে, মাছি-গুলো চাটাইয়ের গা থেকে নড়তে চায় না। কোথায় যেন ছিল তখন গদাই, মনে করতে পারে না, পচীর ঘরে নয়, কোন ঘরে নয়। টালমাতাল হয়ে বাইরে, বাদাড়ে না মাঠে, কোথায় ঘুরে মরছিল। কিষ্টোদাসের বাড়িতে তখন নেত্য শুরু হয়েছিল। বর কনে বাপ মা চন্দন-গোলা মদের ঘোরে সকলেই চড়ে উঠেছিল। কেবল খাদন তার সানাই বাঁশিখানি বাজাচ্ছিলঃ 'মা আমার আনন্দময়ী…।' বিয়ের মজা, কোথায় বাজাবে 'মাথা খাও, যেও না, আলুভাতে ভাত খেয়ে যাও' তা নয়, মাতাল খাদন মায়ের গান ধরেছিল সানাইতে। এখন সুরটা গদাইয়ের ভিতরে যেন বাজছে, 'মা আমা-আ-আ-র আনন্দ-অ-অ-অ-ময়ী—' ধিন তাক্, এখানটায় আপনি তাল এসে যায়। কিন্তু ঢাকের পিঠে এ-বোল ফোটে না। যেমন কি না বাঁ হাতে কাঠি ধরে, ডান হাত খালি নিয়ে, ঢাকের পিঠে পরিষ্কার বোল তোলা যায়, 'ও নিতাই যাচ্ছ কোথা, ও নিতাই বস হেথা।'·· তখন ঘরে ফিরে গিয়েছিল গদাই। গলায় শব্দ ছিল না, তখনও বুকে বাতাস ছিল না। মনে করেছিল, ঘরের দরজা হয় বাইরে থেকে বন্ধ, নয় ভিতর থেকে বন্ধ থাকবে, কেন কি না, হয় বিন্দু ঘরে ফিরেছে, নয় বিন্দু বাইরে রয়েছে। কিন্তু হাত দিয়ে দরজা পায় নাই গদাই, কারণ দরজা খোলা ছিল, ভিতরে ঘোর অন্ধকার। বিন্দুকে সে ডাকে নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকে দু-পা গিয়ে বিন্দুর হাঁটু তার মাথায় ঠেকেছিল। 'ও মা, তুই চালের বাতায় দড়ি পরালি কেমন করে?' অত উঁচুতে বিন্দু কেমন করে দড়ি পরিয়েছিল, এ-কথাটা গদাই বুঝতে পারে নাই। হাঁটু মাথায় ঠেকতেই হাত দিয়ে

বিন্দুর পা ছুঁয়েছিল, পা বুলোছিল, ঠান্ডা পা। অই আঃ, সাঁঝবেলায় আলতা পরেছিল পায়ে, কেন কি না, কিষ্টোদাসের মেয়ের বিয়েতে গিয়েছিল সেরে।

'না, কিছু বুইতে পারলাম না।'

গদাই জবাব দেয় না, কারণ এ সময়ে গাছের ডালে ঝাপটা খেয়ে শব্দ হয়, আর গাড়ি থেকে একটু দূরে, একটা কালো ছায়া নেমে আসে। ছায়াটা তার পরে মূর্তি ধরে, দু-পাশে পাখা মেলে, চাটাইয়ে জড়ানো বিন্দুর দিকে পলকছাড়া গোল চোখে তাকায়। গৃধিনী! গলায় গলকম্বলের মতন লাল চামড়া ঝোলে, কাঁপে, চোখা শক্ত ঠোঁটের আর সাপের মতন চোখের পাশে লাল রং। গদাই কেতুর দিকে চায়, কেতু গদাইয়ের দিকে। চোখ ফিরিযে দুজনেই গাছের দিকে চোখ তুলে দেখে। কে জানে, আরও আছে কি না। ঝাড়ালো গাছের মাথায় কিছুই দেখা যায় না। মড়ার গন্ধ পাবার আগে মাছি গিয়ে শকুনকে খবর দেয়। বলা কি যায়, কখন পিছু নিয়েছে বা আকাশ দিয়ে উড়ে আগেই এসে বসে আছে।

আবার শব্দ হয় উঁচার ঝাড়ে, কালো মরদা নেমে এসে দাঁড়ায়। নজর বিন্দুর দিকে। শকুনটার পাখা গুটানো, গৃধিনীর ছড়ানো পাখা ঘেঁষে দাঁড়ায়। গদাই বিন্দুর মড়া-মোড়া চাটাইয়ে হাত রাখে। মহাশ্মশানের ভোগ, অই, তোরা চোখ ফিরিয়ে রাখ। কেতু গাড়ির তলায় খড়ের আঁটিতে গোঁজা বাঁশের লাঠি টেনে বার করে। অই, কেতুর বিন্দু না বটে। তবে, এই যে, আঃ বুকের অন্ধকার বড় তোলপাড় করে কেন গদাইয়ের।

বিন্দুর সিঁদুর-মাখা চাঁদিতে হাত বুলায় সে। মুখখানি একবার দেখতে ইচ্ছা করে। পরশু বিকালে না কত ধমক-ধামক করলি বাপকে, 'দেখ, আগে থাকতে বলি, মেলাই গিলে-কুটে লাচন-কোঁদন লাগিও না। রাত দুকুরে আমি তুলে লিয়ে আসতে পারব না।' তখন আঁট করে খোঁপা বেঁধে বিন্দু ফুল গুঁজেছিল। গলায় রুপার হার, পিতলের নাকছাবিটা বুঝি ছাই দিয়ে মেজে নিয়েছিল, বড় যে ঝিকমিক করছিল, পায়ে আলতা। গদাই কি ঘাস খায়, হারামজাদী, তোর কেন অমন সাজের ঘটা, বাপের চোখে কি ফাঁকি যায়।

গদাই বলেছিল, 'মারব মুখে দু ঘা, রাককুসি, দেখব কে লাচন-কোঁদন করে। তখন বাপকে ডাকলে ফেলে দিয়ে আসব কাঁদরে।' অই, ওহে গদাই, মুখের কথা কেন সত্যি হল না, মেয়েকে কেন কাঁদরে ভাসিয়ে এলে না। তাহলে আজ এই মহাশ্মশানে যাত্রা করতে হত না, কেন কি না, গদাই যদি রাগ করে নিজের হাতে মেয়েকে ডুবিয়ে মারত, সেটি ছিল পুণ্য, হ্যাঁ, সেই ছিল পুণ্য। আর এই, এই যে গলায় দড়ি, এই সকলই অন্ধকার। জল নাই হে গদাই তোমার চোখে, তোমার ভিতরের অন্ধকারে এক ফোঁটা জল ইস্তক নাই, 'মাহানিশা'য় পথ হাতড়ে হাতড়ে গলায়-দড়ি-দেওয়া মেয়ের হাঁটুতে তোমার মাথা ঠেকে যায়। অই, আহা, মাহা-চান্দার জামাইটাকে যবে ছেড়ে এল বিন্দু, গদাই না বলেছিল, 'ওলো মা-খাগী,

ভাতারত্যাগী, গলায় দাঁড়ি দি গা যা।' ওহে. আঃ, তখন যদি বিন্দু গলায় দাঁড়ি দিত, তবে গদাই ভাবত, সেই পুণ্য। কিন্তু সকলই অন্ধকার। তেত্রিশ কোটি দেবতা ছিল, তবু বাতি কোথায় ছিল, গদাই দেখতে পায় নাই।

'অই মা গ!' আবার চাটাইয়ে হাত দেয় গদাই। রস গড়ায়. চাটাই ভিজে উঠেছে।

'আই, হট্টা হট্টা! ওহে বাপ!'

'বাপ বলিস না কেতু। কেন কি না, গদাধর বায়েন কারুর বাপ লয়।'

কেতু সে-কথায় কান না দিয়ে বলে, 'গাড়ি চলুক. চল হেঁটে যারি. শকুনগুলোর গতিক ভাল না।'

আবার সেই সময় দু-বার গাছের ঝাড়ে শব্দ হয়. দুটো শকুন নেমে আসে। গাড়ি চলতে আরম্ভ করা দেখে পাখাওয়ালা রাক্ষসগুলো পাখা গুটায় না। মুখের ভোগ চলে যায় দেখে সাপের মতন চোখে আগুন জ্বলে। হাট থেকে ফেরা দুপহরের মানুষের মতন চেঁচায় একটা. যার ঘরেতে ভাত নাই, তার পরে পিছে পিছে পায়ে পায়ে আসে কয়েক পা।

যোবা মরদটির প্রাণে এখনও কি সাধ, লাঠি উঁচায়. ঢ্যালা নিয়ে ছুঁড়ে মারে। ওরা ডরায় না, মাথা নিচু করে, ঘাড় কাত করে ঢ্যালা সামলায়। রাস্তা বাঁক নেবার পর ওরা হারিয়ে যায়, আর দেখা যায় না। এতক্ষণে বোঝা যায় বলদ দুটো জোরে ছুটছিল, গায়ের চামড়া মাছি তাড়াবার মতন বারে বারে কেঁপে উঠছিল. কেন কি না, শকুনকে ওরা ডরায়. জীবন্তে ডরায়। তার পরে কেতু গাড়ির তলায় খড়ের আঁটির পাশ থেকে কাপড়ের পুঁটলি বার করে। চিড়া মুড়ি গুড় সঙ্গে নিয়ে এসেছে। বলে. 'দুটো মুখে দেবে না?'

অই. আঃ, কি কাল খাওয়া শিখেছিল গদাই, মানুষের সকলই শূন্য. কখনও ভরে না। তার সকলই অন্ধকার. কখনও ঘোচে না। সকলই শূন্য. কিন্তু তেত্রিশ কোটি দেবতা। না. মহাশ্মশানযাত্রায় আর ক্ষুধা নাই গদাইয়ের। মুখের দুই কষে সাদা ফেকো. তবু উপবাস তাকে কষ্ট দেয় না আর।

'না কেতু, তুই খা।'

'অই কি কার বল. পেট মানে না।'

আঃ, মানুষের কবে কি মেনেছে হে। মানুষের আহ্লাদ, সে সব মানিয়েছে. কেন কি না. মহানিশার অন্ধকারে তার চোখ সয়ে গিয়েছে। সে মনে করেছে. সকল-কিছুই তার নজরে ধরা।

আচমকা বাতাসের ঝাপটা সাঁ করে মাথার উপর দিয়ে চলে যায়, গায়ের উপর দিয়ে ছায়া উড়ে যায়। শকুন মাথার উপর দিয়ে উড়ে আসে, বড় করে পাক খায়। কেতু তাড়াতাড়ি মড়ার পাশে খাবারের পুঁটলি রেখে হাঁকোড় দেয়. 'হেই শালা, তোকে খাই।'

লাঠিটা উঁচিয়ে ধরে। গদাই দেখে, এক দুই তিন চার পাঁচ—পাঁচ, না, উই আর একটা, ছয়। পর পর ছয় শকুনে মাথার উপর ওড়ে, ছায়া ফেলে যায় ছায়ে। গায়ে, গাড়িতে, বিন্দুর উপরে। কেউ সঙ্গে সঙ্গে যায়, কেউ আগে উড়ে গিয়ে গাছে বসে। এদের বাতি নাই, অন্ধকারও নাই। মড়া, মড়া, মড়া, মড়া দাও হে, জগৎ জুড়ে সকলই মড়ায় ভরিয়ে দাও। মানুষ থাকুক না. তেত্রিশ কোটি দেবতা তার. অই তার কি অহংকার গো. সে খালি মড়া চায় না. ভোগ চায় না, সে সবই মানিয়ে নিয়েছে, তার বড় আহ্লাদ। অই, চোখে-সয়ে-যাওয়া কি পাপ হে। গদাই শকুনে প্রত্যয় যায়।

ছয় শকুনে পিছন ছাড়ে না। কেতুর খাওয়া হয় না। তার হাতে লাঠি উঁচানো, ঢ্যালা ছুঁড়েছে ছুঁড়তে চলে। ছয় শকুন পালায় না, হার মানে না, বিন্দুকে তারা ছাড়তে চায় না। তাই ছয় শকুন, এখন বিন্দু মড়া, এখন তোমাদের ঠোঁটের ধার আর কাটার জ্বালা দিতে পারবে না। ছয় শকুনকে কেতু মারতে যায়. অই, আর, তবু পেটে বড় ক্ষুধা ওর। না, ছয় শকুনে কিছু পাবে না, এ শরীর এখন মহাশ্মশানের ভোগ।

'আমি যাই বিন্দুর কাছে।' এই কথা গদাইয়ের ভিতরে কে বলে ওঠে। 'আমি যাই বিন্দুর কাছে।' মনের অন্ধকার থেকে অজানা কে কথা বলে যেন। গদাই গাড়িতে ওঠে. তারপর বিন্দুর মড়ার পাশে চিত হয়ে শোয়। রোদ তার চোখে পড়ে পায়ের বুড়ো আঙুল বরাবর সে দূরে চোখ রাখে। না, গন্ধ নাই, অশুচিতা নাই। কিন্তু বড় করে একটা নিশ্বাস কেন পড়ে না. আঃ. ওহে, সকল জল শুকিয়ে গিয়েছে।

'ওহে বাপ।'

'বাপ বলিস না কেতু।'

'ছয় শকুনে তোমাকে মড়া দেখবে গ।

গদাই সে-কথা শুনতে পায় না। অই মা. অন্ধকার সকল জল কি এমনি শুষে নেয়।

সাঁঝবেলায় নতুনহাট পেরিয়ে, গ্রাম ছাড়িয়ে মাঠের ধারে বলদগুলো আবার দাঁড়ায়। সাঁঝবেলার মধ্যে পাকুড়হাঁস ইস্তক যদি যাওয়া যেত, বিশ্রাম করে. তারপর সোজা পুবে কেতুগ্রাম মাঝরাত্রি বরাবর শেষরাত্রে গঙ্গাটিকুরি। তা হবে না মনে হয়. গঙ্গাটিকুরি রোদ দেখাবে।

এখন শকুনেরা হার মেনে কোথায় থেমে গিয়েছে, আর দেখা যায় না। কেতু বলদ দুটোকে জোয়াল-ছাড়া করে দেয়, ওরা গোবর চোনা ছাড়তে ছাড়তে আশপাশে ঘাসে মুখ দেয়। কেতু আবার মুড়ি-চিড়া নিয়ে বসে। তার আগে গাড়ির তলায় গলা-বেঁধে-ঝোলানো মেটে কলসী দেখে নেয়. জল কত আছে। আছে, রাত কাবার

[illegible]। [illegible] গাড়িটার ঘাড় নোয়ানো, বিন্দুর মাথা নিচের দিকে। মাথায় রক্ত উঠবে, ভয় নাই। গদাই তাকিয়ে দেখে, বিন্দুর চাঁদির কাছে একটা দরানি বেয়ে পড়ছে। কে জানে, কান থেকে না নাক থেকে দরানি গড়িয়ে পড়ে। মাছিগুলো এখনও যায় নাই, রাত্রেও কামড়ে পড়ে থাকবে।

কেতুর মুখ ভরতি মুড়ি। সে যে খায়, সে-কথা যেন মনে নাই, চোখ বিন্দুব দিকে। মোটা অস্পষ্ট মুড়ি-মুখে-নেওয়া গলাতেই বলে, 'কিন্তু এই দুঃখু, কি কিছু বুঝিতে পারলাম না।' ওর মন সেই ভৈরবের কোণের পাড়ে।

এই সময়ে গাঁয়ে-ফেরা দু-চার গৃহস্থের সঙ্গে ওদের দেখা হয়। তাদের চোখ আগে মড়ার দিকে, তার পরে জ্যান্তদের উপর। একটা অশুভ ভয়ে ভাল-মন্দ কিছু জিগ্যেস করে না। দূরে গিয়ে পিছু ফিরে তাকায়, আর চলে যায়।

তার পরে মাঠ থেকে অন্ধকার উঠে আসে, সেই দূরে আকাশ-ঠেকানো দাগেব কাছ থেকে, আর উপরেও উঠতে থাকে, যে-কারণে কি না, বিন্দুর গলায় দড়িব পরেও, শ্মশানযাত্রার পরেও আবার আকাশে তারা ফোটে। যেমন পরশু রাত্রে ফুটেছিল, কাল ফুটেছিল, আর মানুষেরা সংসারে তেলের বাতি জ্বালায়, কেন কি না, সেই তার বড় মজা, অমাবস্যার রাত্রে হ্যাজাক জ্বালিয়ে সে যাত্রাপালা করে, পাড়ার খাদন রানী সাজে, চামুণ্ডার পূজারী মুখুজ্জে রাজা সাজে, গদাই বায়েন তখন ঢং করে ঘণ্টা বাজাত, লোকেরা সাজঘরের দিকে ফিরে তাকায়। সাজঘরেব আঁতুড় থেকে, আসরের মাঝখানে তার জীবন-বৃত্তান্ত, মাথার উপরে হ্যাজাক, দিনের মতন আলো। এই কথা, মানুষের হাতে তেলের বাতি, বাতির ছায়ায় তার নজর নাই। গদাই ভাবে, আসার বাতি, অই বিন্দু, সকলই বড় অন্ধকাব। এই দেখ, কেতু বাতি জ্বলায়। কেতু কিছুই ফেলে আসে নাই।

বাতি জ্বলে, বলদের ঘাড়ে জোয়াল চাপে, তার পরে, 'আর কি-ই বা বাল, কিছু বুঝিতে পারলাম না। হট্ হট্টা!'······

গাড়ি চলবার আগেই কেতু জোয়ালের সামনে আগ বাড়িয়ে বাঁশ বেঁধে তাতে বাতি ঝুলিয়ে দেয়। সে সামনে বসে, পিছনে গদাই। গদাই বিন্দুর মড়া ছুঁয়ে থাকে। তেত্রিশ কোটি দেবতা কুললো না, তার ফাঁকে আবার অপদেবতা হে, মন জানো, গদাইয়ের তাতে প্রত্যয় নাই। কিন্তু এখন যে সেই ঘুঁটি-বাঁধা পায়ে-মল-ঝমঝমানো বায়েনের উঠানে তার ন্যাংটা খুকিটার মূর্তি ভাসে গ। মা বাপ নারকেলের মালায় চুকচুক চুমুক দেয়, বেটি ঘুরে ঘুরে নাচে, বাপের ঢাকের বোল বলে, 'নাই কুরকুর দাদাভাই, হাতায় মাথায় গজা খাই। ঢ্যামনা চলে দুই মুখে, ঢোঁড়া দেখে ব্যাঙ হাঁকে।' তারপর বাপের হাত খ্যানে মায়ের গায়ে, থপাস করে মাঝখানে ঝাঁপ, 'মাকে খালি আদর, আমাকে নাই, গদাই বায়েন দুরছাই।' তখন বিন্দুর মায়ের মুখে রোষ, 'আ মুখপুড়ি, মুখে নাতি, ভর সাঁজে দুরছাই

কল্লিস।' ভর সাঁজে ঘরের মানুষকে অমন বলতে নাই। অই, এই সকলই অন্ধকারের মজা, আহা, অবুঝ বায়েন সোহাগী পরিবার, অবোধ শিশু মা গ। আমি দেখতে পেলাম না, ঘরের বাতায় যখন দড়ি পরালি, তখন তোর চোখে কেমন ধকধকানি আগুন। অই বিন্দু, তখন তোর মনের ভিতরে বাতি জ্বলছিল কি না, আমি জিগেস করি। অ মা, মনে বাতি জ্বললে মানুষের কেমন হয়, আমি জানতে পেলাম না। আমার সকলই অন্ধকার।

'হো ই শালা!' কেতু গলা ফাটিয়ে, যেন ভয় পেয়েছে, ততটা জোরে হাঁক দেয়, আর হাতে লাঠি তোলে।

হ্যাঁ, গদাই আগেই দেখতে পেয়েছে, অন্ধকার ছায়া-ছায়া মূর্তি, চকচক চোখ জ্বলে। গন্ধে পিছন ছাড়তে পারে না, শিয়ালরা সঙ্গ নেয়। কিন্তু এ মহাশ্মশানের ভোগ, তোরা দূরে থাক গা। এ বিন্দুর মড়া, মনেতে যার বাতি জ্বলেছিল। তবে এই কথা, যার ভোগের হোক, আহার চায়, জীবসকল সরতে চায় না। শিয়ালের ক্ষুধায় প্রত্যয় যায, তার তেত্রিশ কোটি দেবতা নাই, তার উপাস নাই, 'মন তুমি কর দেবের অন্বেষণ, দেবে ভজে দেখ সকল জীবন' এইরূপ মজায় মজে না সে। ওহে মানুষ, তোমার হাতে কি ধন আছে, তোমার এত কেন অহংকার। তেলের বাতিতে তুমি শিয়াল দেখতে পাও, তাই কি হে।

'কতু বলে, 'শালাদের বড নোলা।'

গদাইযের গলায় সুর নাই। তবু গানের মতন করেই, জাতের গান বলে উঠল, কেন কি না, তাদের জাতে মরণে আনন্দ করা বিধি। কিন্তু তা হয় না, ছেড়ে গেলে দুঃখ হয়, তবু জাত গড়নদারের বিধি এমন, কেননা: 'ওহে, আজ কি সুখের দিন দেখ, পুণ্যমান আপন ঘরে যায়। জন্মিযে পাপ শত দুঃখ দেহে মনে নিরবধি রয়।'

কেতুর চোখে যেন খোয়ারির ভাব, একটা ভয অবুঝ মতন চোখে গদাইয়ের দিকে তাকায়। রক্তে ঝলক নাই, সমান চেতনও নাই, এমন ভাব কেতু বুঝি ভাবে, গদাই পাগল হয়েছে, তাই গান করে। ন অই গ, কি বলবে গদাই, তার যেন বুকের নাড়ি ছিঁড়ে পড়ছে, কেন কি না, মনে হয়, তার বুকে একটা বাতির আভাস। তার মনে যেন বাতি জ্বলবে, অই মা বিন্দু, বাতি আমি সইতে পারব ক্যানে?

এই সময়ে, দূরে, মাঠের অন্ধকারে, সেই ডাকিনীর হাসি বেজে ওঠে, খিলখিল খিলাখিল খিলখিল ··। উত্তর দিক থেকে পশ্চিমে যায়, পশ্চিম থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে পুবে, যেন এই মহাশ্মশানযাত্রাকে পাক দিয়ে-দিয়ে বাজে।'

'হে বাপ।' তবু বাপ বলে কেতু, সংসারের এক রব। ভয পায যোবা, গদাইয়ের গা ঘেঁষে আসে।

গদাই বলে, 'ভয় পাস না, ওরা শিযাল।'

'জানি, ভয় পাই না। শালারা কি খারাপ ডাকে, হুক্কা হুয়া দে না ক্যানে?'
ভয় পায় না কেতু। এই কথা বলে, হুক্কা হুয়া শুনতে চায়।
গদাই বলে, 'কাম।'
'কাম?
'অই, কাম। শরীলে কাম হলে অমন ডাকায়।'
'দেখ দিকি নি, ডাক বদলে যায় গা।'
মানুষের কি যায় না, গদাই ভাবে।
কেতু আবার বলে, 'অবিশ্যি, এক কথা, ওদের লজ্জা নাই।'

মানুষের আছে, মানুষের সংসারে লজ্জা আছে, অই আঃ, মানুষের সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখ একবার লজ্জার ভূষণ কেমন দেখ হে তার গায়ে। মানুষের কামে লজ্জা আছে, মানুষে বলে। ওহে কাম, তুমি সাক্ষী, তুমি মানুষকে চেনো। তার কি সওয়াল জবাব দেখ, হাকিমের এজলাসের বাইরে, তাকে দেখে আর চেনা যায় না বলে সে তোমাকে দমন করে। অই, সে দু দিন অন্ন ত্যাগ করে বলে, ক্ষুধাকে দমন করি হে। আঃ, মানুষের কত অহংকার গ। অ মা বিন্দু, আমার বুকে একটু হাওয়া নাই, আমি যে একটা বড় করে নিশ্বাস ফেলতে পারি না। আমার চোখের ভিতরে কি একটু জলের পাত্র নাই। তবে এক কথা, আমার কেন ভয় লাগে, কেন কি না, পাছে আমার মনে বাতি জ্বলে। মানুষের সে কেমন দশা আমি জানি না। আমার সকলই অন্ধকার।

কেতু আর গা ছোঁয়া থেকে সরে না। গাড়ি বলদের মর্জিমতন চলে, তবে মর্জি ওদের ভাল। শ্মশানযাত্রায় কোন বিঘ্ন নাই। দূরে, দূরান্তে, থেকে থেকে সেই খিলখিল হাসি বাজতে থাকে। কখনও বা ছোঁপিঠেও বেজে ওঠে। যেন দশ দিকে বেজে ওঠে, উর্ধে অধেঃও বাকি নাই। তবু, ভোজের গন্ধে কাতর, পেটে যাদের ক্ষুধা, তাদের ছায়া বাতির আলোয় আচমকা দেখা দেয়। অন্ধকারে চোখ জ্বলে চকচক করে। ক্ষুধা অবুঝ, সে কিছু মানতে চায় না। আহারের পিছন ছাড়তে পারে না। একদল পিছিয়ে যায়, আর একদল আসে। রাত্রি ক্ষয়ের দিকে যায়। গাড়ি এখন সোজা পুবে চলে, ওদিকে গঙ্গা, যার পাড়ে মহাশ্মশান বিরাজ করে। মহাশ্মশান, কেন কি না, তার আগুন কখনও নেভে না তার ভোগ কোন দিনের তরে বাদ যায় না।

আঃ, বিন্দু চলালি মা, অন্নের ঘরে তোর যাত্রা ছিল, আমার সুদের আশা মিটিয়ে গেলি না, নাতির মুখ দেখা হল না। অই, মা গ আঃ, আমার বুকে বড় ধোঁয়া, আগুনে কে উসকায়। আমার সকলই অন্ধকার।

'ও হে বাপ।'

ঘর করতে এক ডাক, কেতু ভুলতে পারে না। গদাই বায়েনের সকলই অন্ধকার। বাতি নাই, তাই বাপ মা পুত্র কন্যা, সকলই অসার।

'কোথা দিয়ে কি হল বুইতে পারলাম না গ। ভৈরবের কোণের পাড়ে আসবে বলেছিল।'

ভুলতে পারে না কেতু, কেন কি না, ভৈরবের কোণের পাড়ে উপাসী আত্মা পড়ে রয়েছে। মানুষের কি অহংকার, তার শোক উপাস ভাঙবার মুখ চেয়ে। সে সাঙ' কি বিয়া, গদাই জানে না, কেতু আবার ভৈরবের কোণের পাড়ে যাবে।

এখন রাত্রির ক্ষয় আকাশে, দেখ তার গাঢ় বর্ণ কেমন ফ্যাকাসে ধরে যায়, যেন মরে, আর দিনের রক্ত কেমন ফিনিক দেয়। জন্মের লগ্নে লাল, পরে প্রকৃত বরণ, এই নিয়মের ব্যত্যয় নাই। দিনমানের দেহ বড় হলে, সে রৌদ্রমান।

গদাই সেই গত সন্ধ্যা থেকে বিন্দুর পাশে, কাছ-ছাড়া হয় নাই। বলদ দুটোর দার্ঢ্য ভাল, অনেক পথ তারা ভেঙেছে, যে কারণে সকালে আর কেতু তাদের দাঁড় করিয়ে খেতে দেয় নাই। মাটিতে বালি চিকচিক দেখা দিয়েছে, গঙ্গা দূরে নয়, মহাশ্মশান কাছে। কেতু কথা বলে, অথচ তার চোখ কুঁচফলের মতন লাল আর পাতা ভারি, কেন না, যোবাটির ঘুম আসে। এখন তার কথার ভাষ্যি নাই, আড়মাতলার মতন বকে। কিন্তু গদাইয়ের কোন সাড়া নাই। গদাইয়ের নিজের মনে হয়, তার চেতন নাই। তার কি এক দশা হয়েছে, মনে হয়, তার চোখের স্থির তারা দুখানি এখন কিছু দেখছে, আর ভর হয়েছে। এখন তার ধুলামাখা ফাটা ঠোঁট দুখানি কেবল নড়ে ওঠে। বলে, 'এই দেখ হে, আমার বুঝি বাতির দশা।' কেন কি না, এখন মন আর চিন্তা করে না। এখন যেন তার লক্ষ্যভেদের নিশানা। বুকের ঘরে হাওয়া আছে কি নাই, চোখের পাত্রে জল আছে কি নাই, এই সব ভাবনা কোথায় হারায়, গদাই বুঝতে পারে না।

মহাশ্মশান দেখা দেয়, চরভাগা গঙ্গা ওপারে মুর্শিদাবাদ। শ্মশানের বাইরে গাড়ি দাঁড়ায়। মাছিরা আবার বিন্দুকে ঘিরে ধরেছে। অই, হাভাতেরা, আর কতক্ষণ। কেতু বলদ দুটোকে জোয়াল-ছাড়া করে। তাড়াতাড়ি খেতে দেয়। গদাই একবার বিন্দুকে ছেড়ে বলদ দুটোর গায়ে হাত বুলায়। শ্মশানবাসীরা আসে পায়ে পায়ে, খোঁজখবর নেয়, কে মরে, কে বয়ে নিয়ে আসে, মরে বা কেন। কেন কি না, তুমি আপন হাতের রক্ত লুকিয়ে কাউকে পুড়িয়ে যাও কি না, সে খবর কে রাখে। তবে কি না, সদরের বাবুরা একখানি কাগজ গদাইকে দিয়ে দিয়েছে, যদি পোড়াবার দিক হয়, তবে কাগজখানি দেখাতে হবে। গদাই তাই কোমরের কষি থেকে কাগজখানি বের করে। কেতু তাদের সকল ঘটনা ব্যক্ত করে। সে যে ভৈরবের কোণের পাড়ে বসে ছিল, সে-কথাখানিও বলে, আর, 'কি বলব, কিছু বুইতে পারলাম না' এ-কথা এখন আরও বেশি মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে বলে। শ্মশানের ঘরবাসী, ঘরনী, ডোম ডোমিনী, আঃ কি দেখ, হুস হুস নিশ্বাস ছাড়ে, চুকচুক আওয়াজ দেয়। আর কেতুর ঘাড় জোরে জোরে নড়ে, কেন কি না, এখন

আর প্রত্যয় হয়, 'আর বইতে পারব না হে।' তারপর কেতুর কোমরের গেঁজে থেকে পয়সা বার হয়, ডোমিনী হাত বাড়িয়ে নেয়, জিভে জল টানে, বলে, 'হঁ, দু-দিন হয়রান, টুকুস মদ না হল্যো কি চলে।'

গদাই বিন্দুর উপর থেকে চোখ সরাতে পারে না। রাতের ঠাণ্ডায় এক রকম ছিল, মড়া এখন চাটাই ফাটিয়ে ফেলতে চায়, এত ফুলেছে। তবু, অই দেখ, মাথাখানি তেমনি, সিঁথিতে সিঁদুর, সধবা মেয়েটি, পেটে কিছু ধরতে পারে নাই। কিন্তু এখন গদাইয়ের শোক নাই, কোন ভাবনা নাই, মন চিন্তা ছাড়া, এই কি বাতির দশা না কি গ। সে বিন্দুকে বুকে নিতে যায়। মা গ, এই দ্যাখ এখন আর কষ্ট নাই। কেতু এসে তাড়াতাড়ি গদাইয়ের সঙ্গে মড়া ধরে। ডোমিনীর গল্প তবু ফুরায় না, 'দ্যাখ ক্যানে, ই মহাশ্মশানে কত সাধুপুরুষ আছেন, উয়াঁরা কালীর সাক্ষাৎ ছেল্যা বটে, ডাকিনীর সঙ্গে কথাবাত্তা করেন।' অই, আঃ, মানুষের কি অহংকার, তেত্রিশ কোটির সঙ্গে তার ওঠা-বসা। ধুনুচিতে সে দিয়াশলাই জ্বালে, সেই তার বাতি। অ মা, আমার বাতির দশা অন্য রকম দেখি।

ডোমের সঙ্গে চিতা সাজায় গদাই। কৃপণতা যেন না হয় হে, আরও বেশি কাঠ দাও। কাঠওয়ালার কড়ি গদাই ভিটে বিকিয়ে এনেছে। কেতু বোঁচকা খুলে নতুন কাপড় বার করে, গদাই আপন হাতে বিন্দুকে পরায়। শাওনে ভিজা দিনে, একুশ বছর আগে, যেমনটি মেয়ে এসেছিল, তেমনটি সব মুক্ত করে নতুন কাপড় পরায়। নড়নড়ে গলাটি এখন অনেক ফোলা। তবু গলায় দাঁড়ির দাগে রক্তের রসানি। কেতু তখন মুখ ফিরিয়ে নেয়, আর-একবার বলে, 'কিছু বইতে…'

বিন্দুকে আপন হাতে চিতায় শোয়ায় গদাই, মহাশ্মশানের দিগন্তরে তার নজর নাই। ডোমিনী বুক খুলে ছেলেকে খাওয়ায়, লোহার বাটি মুখে তুলে মদে চুমুক দেয়। 'মায়ের মুখাগ্নি কর।' গদাই চিতায় আগুন দেয়, আর তার মুখখানি দেখ, মায়ের কোলে শোওয়ানো ছেলে।

কেতুর দু হাতে পাত্র, গদাইকে দেবে, নিজে খাবে। গদাই ডাকে, 'অই, কেতু, আয়।'

কেতু কাছে যায়, গদাই তার কালো বুকখানিতে হাত রাখে। কেতুর চোখে জল আসে, বলে, 'কিছু বইতে পারলাম না।'

গদাই বলে, 'আমি পেরেছি, কেন কি না, পাপ চাপা থাকে না।'

'পাপ!' কেতুর অবোধ শিশুর মতন চোখে আবার খোয়ারি ভাব দেখা যায়।

গদাই বলে, 'অই, হ্যাঁ।'

'কি পাপ?'

গদাই আগুনের বড় বড় জিহ্বার ভিতর দিয়ে বিন্দুর দিকে তাকায়। ফাগুনের কাঠ, তার ধোঁয়া, গড়িমসি নাই। তার ঠোঁট নড়ে, 'অ মা, দাঁড়া আমি যাই।' সে আগুনের জিহ্বার মধ্যে ঢুকে যায়, বিন্দুর পাশে শোয়।

কেতু চিৎকার করে, 'অই বায়েন হে, ই কি পাপ, তুমি কি কর গ?'

গদাই বলে, 'আঃ, অই আগুনে কি শীতল গ মা, বাতি কি সোন্দর।' তার সর্বাঙ্গে আগুন লাগে। কেতু, ডোম, ডোমিনীর ডাক তার কানে যায় না। বিন্দুর পাশে শুয়ে সে হাত বাড়িয়ে আগুন মাখে, যেমন জল ছিটিয়ে খেলা করে। বলে, 'আঃ, বাতি কি সোন্দর, মা, অন্ধকারে দেখতে পেলাম না, কিষ্টোদাসের ঘর থেকে অন্ধকার গিলে পচীর ঘরে গেলাম। পচীর আঁধার ঘরে তুই কেন ছিলি? আঁধার গিলতে গিয়েছিলি, আঁধারে তোকে খেয়েছিল, অ মা গ, বাপবেটিতে আঁধার খেয়ে মরেছি, আঁধারের সুখে আপন রক্ত চিনি নাই। পচী কোথায় গেছিল, কেতু ভৈরবের কোণের পাড়ে, আপন রক্ত চিনি নাই। ও বিন্দু, আঁধারের ঘোরে তুই ভৈরবের কোণের পাড়ে ছিলি, বাপ চিনিস নাই। আঃ গদাই যখন কালা সুখে পচীকে ডাকে, তখন সাপের ছোবল লাগে, বিন্দু বলে, "অই গ, তুমি বাপ!" আঃ কি আঁধার গ···। বিন্দু, এবার গলার দড়ি খোল।'···

গদাই এখনও টের পায়, চিতার আগুনের চারপাশে, মানুষের ছায়া পাক খায়, ডাক ছাড়ে। অই, আগুনের পাশে, পোকা ঘোরে নাকি। 'আঃ কি শান্তি, বিন্দু, এবার তুই বাবা বলে ডাকলি।' গদাই যেন শোনে 'বাপ গ, বাপ!'···গদাই সুখের আগুনে গলে।

ধরে নিতে পারো, আমি একটি কবিতা লিখতে বসেছি। যদিও, ভাষায় আমার সেই তীব্রতা নেই, অনুভূতির সেই অরূপ রূপের সঙ্গে আমার অবচেতন মনের কখনও মিলন হয় নি।

ভাবছিলাম, কি নাম দেব এই কবিতার। শূন্য বাগানের কান্না? না কান্নার ব্যাপারটা কেমন আমার অগোচরেই থেকে গেছে, ওটা আসলে আমাকে কল্পনা করে নিতে হচ্ছে। সুতরাং, কল্পনাটা থাক, কবিতাটাই লিখি।

কান্নাটা যদি তবু কোন ফাঁকে শোনা যায়, তবে আমার কবিখ্যাতির মার নেই।

আসলে, শূন্য বাগানের বেদনা কিংবা কান্না কথাগুলি কোথায়ও পড়েছিলাম, নয়তো শুনেছিলাম। সেজন্য অসংকোচে বলে ফেলেছি কথাটি।

যাক সে সব কথা।

বাসা ছিল আমার, মফস্বলের সেই গ্রামটার বাগদীপাড়ার মুখে। ধর, পাড়াটা লম্বা পুবে-পশ্চিমে। আমি ছিলাম পশ্চিম মুখে, যেখান থেকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বা পাড়াটার নাম সদগোপপাড়া। মনে হচ্ছে, পুব থেকে পশ্চিমে এসে এক যেন জাতে ওঠা যাচ্ছে। কিন্তু ব্যাপারটা খুবই গণ্ডগোলে। বাগদীপাড়া আসলে বাগদী নামে সাতঘর। বাকি সবাই যশোরের কুণ্ডু থেকে কোটালিপাড় সমাজের ভটচায পর্যন্ত। আর সদগোপ-পাড়াটাও তাই।

সুতরাং, আমি দুটি জাতের পাড়ার মাঝখানে ছিলাম সজাত অজাতের সাক্ষী হয়ে। আর দশজনের মত, নিতান্ত এক বাসাড়ে। তবে দুটি রাস্তার মাঝখানে থেকে আমার সঙ্গে আত্মীয়তা হয়েছিল দুটি পাড়ার সঙ্গেই। কাজের মধ্যে সারাদিন বাড়ি বসে থাকা আর পুলিশের লোক এলে জানান দেওয়া, আমি এখনও মৃত্যুবাণ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে যাই নি। কেননা, দিনে একবার অন্তত সেই সময়টা, পুলিশের লোক আসত। সরকার বিরোধী ব্যাপারে আমি কত দূর এগিয়েছি, জানতে।

যাক, সে সবও আলাদা কথা। যদিও পুলিশের কাছে তা আলাদা ছিল না। যে ঘরটায় বসে থাকতাম সারাদিন, সেটার ছিল রাস্তার দিকে দরজা। বলা বাহুল্য, দরজাটা বাগদীপাড়ামুখো। যে যাবে ওই রাস্তা দিয়ে, তার সঙ্গে একবার চোখাচোখি, একটু হাসি, কিংবা দুটি কথা—এ সব হবেই।

বুড়ো গোপাল বাগদী। গাছে উঠে নারকেল পাড়া আর গাছ ঝাড়ানোটাই ওর পেশা। বুড়ো যদি দেখত, বসে আছি গালে হাত দিয়ে, তবে অসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে, গাল থেকে হাতখানি নামিয়ে দিয়ে চলে যেত। বাইরে গিয়ে বলত, কদ্দিন বারণ করিচি অমনটি করোনি বাপু, তা ছেলের দেখছি কথা কানে যায় না। ও কি, ছিঃ! ওটা অলক্ষণ যে।

বলে চলে যেত। এ আত্মীয়তাটুকু ছিল আমার গোটা পাড়া, প্রায় পুরো গ্রামটির সঙ্গেই। বামুন, কায়েত, বদ্যি, জেলে, মালো, বাগদী, মুচি--সব মিলিয়ে ছিল প্রায় শ'দেড়েক ঘরের বাস। এখন সেখানে হাজার ঘরের বাস হয়েছে পূর্ব-বঙ্গের লোক নিয়ে।

আমি অনেক দিনের বাসাড়ে। সম্পর্কটা হয়েছিল অনেকের সঙ্গে।

বিলে ধরামির দিদিমা এসে বলত, নাও গো ছেলে, তোমার জন্যে আজ একপো দুধ এনেচি।

তারপর বাড়িয়ে দিত একখানি ফুলস্ক্যাপ কাগজ। নাতি বিলে থাকে চন্দন-নগরে, বাড়ি আসে না। কিন্তু দিদিমার সপ্তাহে একটি করে চিঠি দেওয়া চাই। এ-ও আজ নাগাড় তিন বছরের ঘটনা।

দশ সপ্তাহের চিঠির পরে, একপো দুধ আসে। সেটুকুও নির্জলা নয়। কিন্তু, ওটুকুও বুড়িকে দিতে হয়েছে কোন খদ্দেরকে না দিয়ে। ওটুকু ওর ভরণপোষণের একমাত্র মূলধন। যদি দুধ না নিতে চাই, তবে কান্নাকাটি শুধু বাড়াবে না, বুড়ি হলপ করে বলবে, তার এ সব নেকাপড়া জানা গুণধর ছেলেকে সে জল মিশিয়ে দুধ দেয় নি। আর চিঠির বক্তব্য যদি লিখতে যাই, সে আর এক কাহিনী। সেটা এখন মুলতুবী রাখলাম।

আর একজনকে আমার চিঠি লিখে দিতে হ'ত। তিনি ছিলেন এক ব্রাহ্মণ ঘরের বিধবা যুবতী। এখানে থাকেন দেওরের কাছে। দেওরটি চটকলের ডিপার্টমেণ্ট ক্লার্ক। মেয়েটি দেখতে ভাল, শুনেছি ভাল। কোন দুর্নাম তো শুনিনি না, মুখের কথাগুলি শোনাত করুণ আর মিষ্টি। বাপের বাড়ি বরিশালে। সেখানে চিঠি লেখবার জন্যে আমার কাছে আসতেন। লেখাপড়া নিজে জানেন না একেবারেই। দেওরের প্রতিও মন প্রসন্ন ছিল না। আর প্রতিটি চিঠির মধ্যেই একটি ভীষণ আকুতি থাকত, আমাকে এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি পারো, নিয়ে যাও। নইলে আমাকে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে হবে।

চিঠিতে এই সব কথা লিখে দিতে গিয়ে স্বভাবতই আমি বলতাম, সত্যি, আপনার তো বড় মুশকিল। সে রকম যদি বোঝেন, আপনার দেওর তো আপনাকে পৌঁছে দিতে পারেন।

বলতেন : দেবে না।

আমি : কেন ?

বলতেন : কি জানি ! ঠাকুরপো বলে, কে আমাকে রেঁধেবেড়ে খাওয়াবে।
সহসা একটি অসহায় মেয়ের দারুণ ভয়াবহ ও অপমানকর জীবনের ছবি ভেসে উঠত আমার চোখে। কিন্তু তিনি যদি এর বেশি আমাকে কিছু না বলেন, আমার বলাও সাজে না। সুতরাং নীরব থাকতে হত। অথচ, ওঁর দেওরকে দেখে যে খুব সাংঘাতিক একটা কিছু মনে হত, তা নয়। আর সত্যি, বউদি থাকতে কেনই বা সে হোটেল-মেসে খেতে যাবে।
অবশ্য যদি, এর মধ্যে আর কোন অন্ধকার-কাহিনী না থেকে থাকে।
যাক সে সব কথা। এ ও আমার বিষয়বস্তু নয়।
একদিন সকালবেলা ঘরে বসে, একটি তীব্র কান্নার চিৎকার শুনতে পেলাম। কোন মেয়ে-গলার কান্না। বাগদীপাড়া থেকে শোনা গেল।
রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল কেতু মুচি। ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, ব্যাপার কি? কাঁদে কে?
দুলালের বউ।
দুলালের বউ?
হ্যাঁ। দুলালটা যে ম'ল এখুনি।
ছোকরা মিস্তিরী দুলাল। বিয়ে করেছে এক বছরও হয় নি। জানতাম অবশ্য অসুখ করেছে। কিন্তু একেবারে মৃত্যু, ভাবতে পারি নি। এই তো সেদিন চন্দননগর থেকে বিয়ে করে নিয়ে এল। ভারী ভাব ছিল তার আমার সঙ্গে। যেমন ছিল কাজে দড়ো, তেমনি পারত হাসতে। বড্ডো হেঁকোডেকো ছিল।
কারখানায় কাজ করাকে ও বলত কল ঠ্যাঙানো। আট ঘণ্টা কল ঠেঙিয়ে এসেও, দুলালকে দেখেছি গাছে উঠে ডাব পেড়ে খেতে, চিৎকার করে গান করতে, পুকুরে মাতামাতি করতে। পাড়ার বুড়ো-জোয়ান, সবাই মনে-মনে ওকে একটু হিংসেই করত। একজন ছাড়া, সে দুলালের বন্ধু বিপিন। কারখানায় দুলালের 'বয়' অর্থাৎ হেল্পার হিসাবে কাজ করত। বয়সে প্রায় সমান-সমান জন্যে দুজনের ভারী বন্ধুত্ব।
দুলাল বলত, কথা শুনে মনে হয়, দাদাবাবু তোমরা আমার জন্যে লড়ো।
শুনে আমার মনের মধ্যে উঠত কেঁপে। বলতাম, ছি ছি দুলাল, কেউ কারুর জন্য লড়ে না ভাই। আমরা সবাই লড়ি নিজেদের জন্যে। যারা শুধু পরের লড়ে আর লড়িয়ে হয়, তেমন বীরদের আমার বড় ভয় হয়।
আরও নানান কথা বলত। সে সবও থাক। পাড়া ছেড়ে গ্রামে, দুলালকে চিনত সবাই। ও যে সব কিছুতেই আগে বেড়ে আছে।
কিন্তু সেই দুলাল, এই কদিনের অসুখে মারা গেল। সেই কালো কুচকুচে মুখ, এক মাথা কালো কোঁচকানো চুল, আর এক মুখ সাদা ঝকঝকে হাসি।

বিয়ে করে কত দিন বউ নিয়ে গেছে এখান দিয়ে। সে তখন নতুন বউ। আমি বসে কি লিখছিলাম। হঠাৎ দুলালের খ্যাঁকানি শুনলাম, আয় না। আহা হা, তোর আবার বেশি লজ্জা। জানিস আমাদের কত আপন মানুষ।

অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখি, ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। কত আর বয়স হবে। বছর ষোল-সতেরো। ওদের ঘরে একটু বেশি বয়স বৈকি। বললাম, কি দুলাল ?

এই দেখ না, বলছি, তোমাকে একটা পেন্নাম করে যাক, তা লজ্জায় বাঁচছেন না। সাধে আর মেয়েমানুষের উপরে মেজাজ বিগড়ে যায়।

ছি ছি, বোধ হয় দশ দিনও বিয়ে হয় নি। এর মধ্যেই কি রকম করছে দুলালটা। বললাম, কেন তুমি ওকে শুধু শুধু ধমকাচ্ছ। যাও, নমস্কার করতে হবে না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই, একরাশ সস্তা সিল্কের শাড়ি আমার পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল।

সময়ও পেলাম না বাধা দেবার। দেখলাম একটি পুষ্ট-বলিষ্ঠ দীর্ঘাঙ্গী কালো মেয়ের মুখ দেখা যাচ্ছে ঘোমটার আড়ালে। এমন কি লজ্জাচকিত দুটি বড় বড় চোখও। দুলাল হাতের সিগারেটটি নিয়ে যে কি করবে আমার সামনে, ভেবেই পাচ্ছে না! বিড়ি ও হরদম-ই খায় আমার সামনে। সিগারেট কি না! সিগারেট খাওয়ার মত করেই, লজ্জিত হেসে (দুলালের আবার লজ্জা, সে যে কি অদ্ভুত) বলল, একটু বাইস্কোপে যাচ্ছি দাদাবাবু।

এ রকম কয়েকবারই যেতে দেখেছি। বায়স্কোপে, সার্কাসে, মেলায়, সব বিশেষ বিশেষ ব্যাপারে।

পাড়ার মেয়েরা (রিপোর্ট পে·'ম বেশি বিলে ঘরামির দিদিমার কাছেই) বলত, দুলাল নাকি বেহায়ার মত বউকে সোহাগ করে। কারুর কি বউ নেই ঘরে, না সোহাগ করে না বউ নিয়ে। দুজনের পিরিতির জ্বালায় নাকি গোটা পাড়াটার গায়ে বিছুটির ছপ্‌টি পড়ছে। হাসাহাসি, ঢলাঢলি, ছিঃ! আর কি বউ বাবা! সোয়ামী না হয় একটু বেয়াড়া, তুই কি বলে পাল্লা দিস ওই মিনষের সঙ্গে। যে মিনষের নাম পাড়া ফাটানে দুলাল!

কেন জানি নে, দুলালের উপর ছিল আমার একটু পক্ষপাতিত্ব। মনে হত, প্রথম যৌবনের উচ্ছ্বাসটাই তো হবে একটু বোহিসেবী। সেটুকু যেমন না হলে নয়, পাড়ার এই কলঙ্ক রটনাটুকুও পড়ে গিয়ে যেন ওই বেহিসেবী রসের মধ্যেই। এটা ওটা দুটোই হবে, হয়তো হতেই থাকবে। বিশ বছর বাদে স্বয়ং দুলালই বলবে কোন পাড়ার ছেলেকে, ছোঁড়া বড় বেয়াড়া।

সেই দুলাল হঠাৎ মারা গেল। বেচারীর মা-বাবাও নেই। মা মারা গেছে বিয়ের বছর তিনেক আগে।

জামাটি গায়ে চাপিয়ে গেলাম। সেই মাটির দেয়াল, খোলার চাল। জানালা-হীন সুড়ংএর মত অন্ধকার ঘর। দরজার সামনে দুলাল। সেই মুখ, সেই চুল, তেমনি ঋজু শরীরটি। বুকে মুখ দিয়ে পড়ে আছে বউ সুবাসী। সেই ঘোমটা নেই, লজ্জা নেই। আঠারো বছরের মেয়েটা, কালো চুল এলিয়ে মাথা কুটছে দুলালের শক্ত কালো বুকে। পাড়ার মেয়েমানুষরাও এসেছে সবাই। বোধ হয় অনেকেই ভাবছিল, তাদেরই শাপমন্যিতে জলজ্যান্ত ছেলেটার এ রকম হল কিনা।

সুবাসী একবার আমার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর দুলালের থুতনিটি নেড়ে বলল, শুনছ, ওগো, তোমার সেই দাদাবাবু এয়েছেন।

মনে হল, আমার বুকের ভিতরে একটা ফানুস ফুলতে লাগল ফাটবার জন্যে।

সুবাসী তেমনি করেই বলল. এবার তুমি কার সামনে দিয়ে আমায় নে' যাবে. আর বলবে, আমাদের দাদাবাবু, বউ পেন্নাম কর।

তারপর চিৎকার করে উঠল, আমি আর কলের বাঁশী শুনব না গো।

কলের বাঁশী। ওই বাঁশী দুলালকে ডেকে নিয়ে যেত, আবার দিয়ে যেত ফিরিয়ে। সত্যি, আর ও সেই বাঁশী শুনবে কেমন করে।

জামরুল তলায় বিপিনকে বললাম, কি হয়েছিল বিপিন?

বন্ধুর শোকে ওর স্বর ফুটছে না। বলল, কি জানি, বুঝলাম না দাদাবাবু। তিন দিন ধরে বলল খালি বুকে ব্যথা। কাল রাত্রে ডাক্তারবাবু এসে বললেন, বুঝতে পারছি নে। বুকের একটা ফটো তোলাতে হবে। তারপরে. রাত না পোহাতেই, এই।

আশ্চর্য! দুলালের মত শক্ত ছেলের এমন মৃত্যু।

হঠাৎ বিপিন বলল. কিন্তু দাদাবাবু, এদিকে যে কিছুই নেই।

কিছুই নেই মানে?

পোড়াবার টাকাও নেই।

সে কি?

ওই, বলে কে। বউ বলছে, কার কাছে টাকা রেখে দিত। শ'চারেক নাকি ছিল। মরবার আগে বলে যেতে পারে নি। কোন দিন কাউকে বলেও নি।

ভয়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। তবে, এই মেয়েটার কি হবে।

যাক, সে পরের ভাবনা। পাড়ার সবাই মিলে টাকা সংগ্রহ করা গেল। তারপর শোনা গেল, দুলাল বাগদী নয়, হাড়ী।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত শ্মশানযাত্রা আটকাল না। ইতিমধ্যে চন্দননগর থেকে এসেছে সুবাসীর এক পিসী। শ্মশানেও গিয়েছিলাম। সেখানেই পিসীর কান্নার মধ্যে শুনতে পেলাম—

এই ভরা বয়সে আমার এ কি হল গো। আমি এখন কত খাব, পরব. দেখব-

'আমি'র এই প্রথম পুরুষ আসলে ভাইঝি সুবাসী।

দেখলাম, সুবাসী চিৎকার করে কেঁদে উঠে, আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে পিসীকে। —রাক্ষুসী, যা তুই আমার সামনে থেকে। যা… !

গতিক দেখে সত্যি পিসী সরে গেল।

ফোলা ফোলা লাল চোখ সুবাসীর। পিঠময় ছড়ানো চুল। ওর এত অসহায় কান্নার চারপাশেও কি এক দুর্দৈব আসছে ঘিরে। তাই আগুন জ্বলছে ধিকিধিক, সুবাসীর জলে ভেজা চোখে।

ব্যাপারটা তখনও বুঝি নি পরিষ্কার। চিতার জলে সব সাঙ্গ হল। সুবাসী সিঁদুর মুছে থান পরল। পরে যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল চিতাটার দিকে।

তারপর বাড়ি ফেরার সময়, পিসী বলে উঠল, আর ওপাড়ার দিকে যাওয়া কেন? গঙ্গা পার হয়ে ওপারেই চল। এপারে আর তোর কে আছে?

বটতলাটিতে দাঁড়িয়ে, আঠারো বছরের সদ্য বিধবা সুবাসী বলল, পিসী, পিসেকে নিয়ে কত বছর ঘর করেছিলি, তবু কি তুই বুঝিস নি? না বুঝেছিস তো পালা, নইলে মুখ বুজে সঙ্গে চল। থাকবি আমার সঙ্গে, যেমন করে হোক তোকে দুটো খাওয়াব।

এই জলে ভেজা কথাগুলির মধ্যে কি এক অসাধারণ তীক্ষ্ণতা ছিল। পিসী তো দূরের কথা, সুবাসীকে নতুন করে দেখলাম আমি। দেখলাম, নতুন করে দুলালের সেই হেঁকোডেকো ভালবাসা।

এবার আমাকে বললে সুবাসী, দাদাবাবু, পেটভাতায় একটা কাজ যোগাড় করে দাও, আর মাস গেলে দশটা টাকা। ঘরভাড়া, পিসী, সবই তো আছে।

কিছু দিন বাদে, কাজ হল। এক জায়গায় নয়, তিনটি বাড়িতে ঠিকা কাজ। মাস গেলে গোটা তিরিশ পাবে।

দুলালের মৃত্যুর পর, সেই বিধবা মহিলা চিঠি লেখাতে এসে, প্রথমেই বললেন, আপনি অনেক করলেন মেয়েটির জন্যে। আহা! ওইটুকু মেয়ে।

উনিও অবশ্য সুবাসিনীর চেয়ে খুব বেশি বড় হবেন না। যাই হোক, পরমুহূর্তেই বললেন, লিখে দিন, 'ছিচরণেষু, বাবা, বুঝলাম, আমার মা-বাপ নেই, আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। এই দেওরও ততদিন আছে, যতদিন বিয়ে না হয়। বিয়ে হলে তখন আমাকে দূর দূর করবে। আমার এই জন্মের সাধ-আহ্লাদ সবই ফুরিয়েছে। বাকি আছে পরের লাথি-ঝাঁটা খাওয়া ইত্যাদি।'

আমার হৃদয় ও মন বলে কিছু আছে কি না জানি নে। কথাগুলি লিখে দেওয়া ছাড়া আমার আর কিছু করবার ছিল না।

রোজ, দু'বেলা দেখি, সুবাসী যায় আসে আমার সামনে দিয়ে। সাদা থান পরে, ঘোমটা দিয়ে, মাথাটি একদিকে হেলিয়ে। এখন আর সে মুখ ঢাকে না ঘোমটায়।

পৌষের শীতে মারা গেল দুলাল। এখন বাতাস বইছে রোজ। ন্যাড়া গাছ-গুলি ভরে উঠছে কচি পাতায়। রোজ একটু একটু করে ছেয়ে যাচ্ছে সবুজে। পাখপাখালীরা শীতের আড়ষ্ট ডানা খুঁটে খুঁটে পুরনো পালক ঝাড়ছে।

আর দিনে দিনে কৃশ হচ্ছে সুবাসী। ও যে মাথা নিচু করে যায়, তবু বুঝতে পারি, একবার ওর মধ্যেই আড়চোখে তাকিয়ে যায় আমার দিকে। মুখটি রোগা হয়ে গেছে, চুলগুলি হয়েছে শণনুড়ি। সারা মুখের মধ্যে চোখ দুটি যেন ভরে আছে সবটা। হঠাৎ দেখলে আর বয়স বোঝা যায় না।

রোজই শুনি ঝগড়া হয় পিসীর সঙ্গে। পিসী বলে, কেন মরবি এমনি করে? সোমসারে কি ছেলে নেই। কত জনায় হাত বাড়িয়ে আছে পাবার জন্যে।

প্রথম প্রথম মারতে গেছে সুবাসী পিসীকে ধরে। তারপর গাল দিয়েছে, পিসী তোর মরণ আছে আমার হাতে।

পিসী বলেছে, তাই মার তবু তোর এই মরণ দেখতে পারি নে আর। এখন আর কিছুই বলে না সুবাসী।

তখন একদিন সেই বিধবা মহিলা আমাকে বলেছিলেন, জানেন, সুবাসীর পিসী বেটী অসতের শিরোমণি। অমন মেয়েটির মাথা খেতে চাইছে।

আমার যেন মনে হত, সুবাসী যখন যেত আমার সামনে দিয়ে, ওর চলার মধ্যে দিয়ে যেন বলে যেত আমাকে, দেখছ তো দাদাবাবু, কেমন করে পেছনে লেগেছে সব। ওরা জানে না, কার বিধবার সঙ্গে এমনি করছে। তুমি তো জানো সেই লোককে।

সত্যি একলা পিসী নয়, অনেকেই লেগেছে ওর পিছনে। সুবাসীর যৌবন, শ্রী, সবই চোখে পড়বার মত। কিন্তু সে সবই যে ছিল ওর দুলালের জন্যে।

তবু ওর ওপর যে লোকের টান, তার সবটুকুই আমার কাছে দোষের বলে মনে হয় নি। কিন্তু সুবাসীর মনের কথা মনে হলে, নির্বাক বেদনায় আমাকে শুধু চেয়ে থাকতে হত।

সুবাসী যে এখনও সেই ঘরেই থাকে। আজও শোনে সেই বাঁশী। বোধ হয়, ওই বাশী শুনেই ও এখন লোকের বাড়ি যায় কাজ করতে।

বিলে ঘরামির দিদিমা একদিন এসে বলে গেল, বাবাগো বাবা, দুলালটা মরেও বউটাকে ছেড়ে যায় নি।

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কেন?

বিলের দিদিমা ফিসফিস করে বলল, আতু ভট্‌চাযের বিধবা মেয়েটা কাল রাত্রে পেট খসিয়েছে, তাই নিয়ে এখন থানা-পুলিশ হচ্ছে, আর সুবাসীটা শুকিয়ে মরছে দুলালের জন্যে। বলে, দুলালকে নাকি সে দেখতে পায়। এও আবার ভাল নয় বাপু।

কিসে যে সুবাসীর ভাল, সেটাই আবিষ্কারের জন্য গোটা পাড়ার সবাই ভাবছে। কিন্তু সুবাসী কি ভাবছে, কেউ জানে না। আতু ভট্‌চাযের মেয়ের সঙ্গে যে তুলনা হয়েছে, তার কারণ আর কিছু নয়। দেখ, সুবাসী তার চেয়ে কত বড়।

সুবাসী যে ছোট নয়, তা আমি জানতাম। আতু ভট্‌চাযের বিধবা মেয়েটার অত বড় পাপের মধ্যেও ব্যথাটুকু তো আমি ভুলতে পারি নে।

একদিন গাল থেকে আমার হাত নামিয়ে দিয়ে বুড়ো গোপাল বলল, কি ভাবছিলে বল দিকি ?

সত্যি কথাই বললাম, তোমাদের সুবাসীর কথা ভাবছিলাম।

একগাল হেসে বলল গোপাল, যে গাছ নারকেল দেয়, তাকেও চোখে পড়ে, যে না দেয়, তাকেও পড়ে। কেন ? না, গাছটার হল কি ? এমন শুকোচ্ছে কেন ? অমনি তদ্দাবির আরম্ভ হয় গাছের। তোমরা যে সবাই ভাবছ, তা এই জন্যেই।

বললাম, গোপাল দাদা গাছ তো মানুষ নয়।

গোপালের বুড়ো চোখে অদ্ভুত তীক্ষ্ণতা। বলল, মনের কথা বলছ তো ? গাছের বুঝি মন নেই ? ভুঁই ফুঁড়ে সে দাঁইড়ে আছে. শিকড় বাড়িয়ে মাটির রস খেতে তারও মন চায়। নইলে সে গাছ কেন ? ওটা যে জীবের ধম্মো। তবে হ্যাঁ, যেমন জীব তার তেমনি পথ।

গোপাল বুড়োর কথার মধ্যে কি একটা অদৃশ্য সত্য ছিল, সে সত্যটার সামনে আমাদের গোটা জীবনটা বেঢপ বিরূত মনে হতে লাগল।

আবার বছর এসেছে ঘুরে। মাঘ মাস যাচ্ছে। শীতটা পড়েছে মন্দ না। গাছগুলির পাতা গেছে ঝরে। পুকুরের জলে ধরেছে টান। উত্তরায়ণের পথে দিনগুলি বড় হচ্ছে একটু একটু করে।

তিন দিন বাদে ফিরলাম কলকাতা থেকে।

সন্ধ্যাবেলা দেখলাম, সুবাসী এসে দাঁড়িয়েছে দরজায়।

অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, সুবাসীর কৃশ শরীরখানি আবার পুষ্ট হয়েছে। কালো রং হয়েছে চিকন কৃষ্ণ। চুলেও চিরুনি পড়েছে।

কত দিন যেন দেখি নি সুবাসীকে। জিজ্ঞেস করলাম, কি খবর সুবাসী ?

এ সেই শোকাচ্ছন্ন বিরহিণী সুবাসী নয়। একটু হেসে মাথা নিচু করে বলল, আপনার সামনে দু দণ্ড আসতে ইচ্ছে করে। নিজের কাজ, আপনারও কাজ, তাই আসতে পারি নি।

বললাম, তোমার যখন ইচ্ছে হয় এসো।

চলে গেল। অবাক হলাম, কষ্টও হল। হয় তো দুলালের কথা শুনতে চাইছিল আমার মুখ থেকে।

আর একদিন দেখলাম, সুবাসীর হাতে কাচের চুড়ি। আর একদিন, গলায় দেখলাম, দুলালের দেওয়া রুপোর হারখানি। তারপরে একদিন, পেতলের দুটি টব কানে।

সুবাসীর শ্রী ঢলঢল হয়ে উঠল। কালো রুপসীটির চলা-ফেরায়ও কেমন একটি বিচিত্র ছন্দ লেগেছে।

যত অবাক হই, তত ভাল লাগে। অথচ মনের মধ্যে একটা ভীষণ অস্বস্তিও বোধ করি।

বছর গেল ঘুরে। বাতাসে শুনি সাগরের গর্জন।

বিপিন এল একদিন। দুলালের হেল্পার, শাগরেদ, বন্ধু। বলল, দাদাবাবু, ওস্তাদের মিস্তিরির পোস্টটা আমি পেলাম।

খুশি হয়ে বললাম, বটে?

হ্যাঁ। তবে মনটা বড় খারাপ। দুলুদা থাকলে, ওর সবচেয়ে আনন্দ হত। হাতে করে মানুষ করেছে আমাকে।

কিছু না ভেবেই হঠাৎ বলে ফেললাম, ভাল হয়েছে বিপিন। একটি কথা, মাইনে তো বাড়ল?

হ্যাঁ, নতুন তো। এখন সতেরো টাকা হপ্তা।

বললাম, যদি অসুবিধা না হয়, দরকার পড়লে, সুবাসীকে তুমি দু-এক টাকা মাঝে মধ্যে সাহায্য কোরো।

বিপিন এক মুহূর্ত চুপ করে কি ভাবল। তারপর হঠাৎ বলল, ও সব সাহায্য-টাহায্য আমি কাউকে করতে পারব না দাদাবাবু, সোজা কথা। ও সব বাবুগিরি আমার নেই।

আমি রীতিমত ক্রুদ্ধ, বিস্ময়ে স্তব্ধ। আর বিপিন কয়েক মুহূর্ত ছটফট করল, কিছু একটা বলবার জন্যে। তারপর চলে গেল।

ভীষণ রাগ হল আমার। ওস্তাদের প্রতি কি ভক্তি, আহাহা। তারপর হঠাৎ সন্দেহ হল, বিপিন বোধ হয় কোন কারণে সুবাসীর প্রতি ঘৃণা পোষণ করছে। সাম্প্রতিক কালের সুবাসীকে দেখে আমারও যে বড় অস্বস্তি কিনা।

দিনে দিনে বদলাচ্ছে সুবাসী। আজকাল যেন লকলক ঢলঢল করছে। সুবাসীর এমন রূপ দুলাল থাকতেও দেখি নি।

হঠাৎ একদিন ছুটির বিকেলে বাগদীপাড়ায় অসম্ভব চিৎকার শুনতে পেলাম। প্রায় মার-দাঙ্গা আর কি।

বিপিনের বাবা কাঁড়ু বাগদীর গলাটা সবচেয়ে চড়া। বলছে, তোর মত ছেলেকে আজ আমি কচুকাটা করব রে, কচুকাটা। খবরদার, যদি আর ও-কথা মুখে আনবি—

শুনতে পেলাম বিপিনের গলা : মিছিমিছি চেঁচিও না বলে দিচ্ছি। তোমার ঘরে থাকব না। কোম্পানির লাইনে গে বাস করব।

কড়ি : চোপ, চোপ শুয়োরের ছেলে, আমাকে পিরিতি দেখাতে এসেছ?

মনে হল, ওদিকে সুবাসীর পিসীও মরাকান্না জুড়েছে। হঠাৎ হাসি শুনে চমকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার দরজায় গোপাল বুড়ো। বলল, কি শুনছ?

জিজ্ঞেস করলাম, কি ব্যাপার গোপালদাদা?

গোপাল হেসে বলল, ওই শুনছ না? গাছের শুকনো ডালপালা ঝড়াই হচ্ছে, তাই এত শব্দ।

শুকনো ডাল ঝাড়াই হচ্ছে?

হ্যাঁ গো! নতুন ডাল গজাচ্ছে, পাতা বেরুচ্ছে। শুকনোগুলোন ভাঙছে, ছুড়াচ্ছে। একটু শব্দাশব্দি, একটু নোংরা তো হবেই।

বলে গোপাল বুড়োর কি হাসি! ডায়লেক্‌টিকে বলে, আলো থাকলে আঁধার আছে। আমার মন ধাঁধিয়ে গেল সেই আলো-আঁধারিতে। বললাম, একটু খুলে বল গোপালদাদা।

আবার খুলে কি গো! তোমাদের বিপিন আর সুবাসী ঘর বাঁধছে একসঙ্গে।

সহসা যেন প্রচণ্ড চপেটাঘাতে পাংশু হয়ে গেলাম। বিপিন-সুবাসী।

গোপাল বলল, কি--খারাপ লাগছে?

খারাপ লাগছে কি না, বুঝছি নে। ভাল লাগছে না।

গোপাল বলল, ঘরের দাওয়া নিকিয়ে রাখ, কেউ কিছু বলবে না। ক্ষেত জমিন নিকিয়ে রাখে না কেন। সে কি তোমার দেখতে ভাল লাগে? না কি ভাল লাগে ঢ্যালা ছড়ানো মাঠ দেখতে। সোমসারের নিয়মে মানুষ গেরো বাঁধে ভালর জন্যে। কিন্তু মন্দও কম হয় না। তখন ফস্‌কা গেরো ছিঁড়ে যায়।

কেন জানি নে, শেষ পর্যন্ত সুবাসী আর বিপিনকে আমি আর আলাদা করে ভাবতে পারি নি। পরে বুঝেছিলাম, কেন বিপিন সাহায্য করতে চায় নি। তখন বোধ হয় সে শূন্য বাগানে ফুল ফোটাচ্ছিল। একজন দাবি করবে আর বিপিন দেবে সঁপে, সাহায্যটা এখানে অপমান বৈকি। শূন্য বাগানের কান্নাটা আমি শুনতে পাই নি। আসলে ওটা কান্না তো নয়, হরিতের অভিযান।

কিছু দিন পর। বসে লিখছিলাম। ছুটির দিনের দুপুর। হঠাৎ একটি মিষ্টি ধমক শুনতে পেলাম, আহা, তোকে যেন দেখে নি কোন দিন দাদাবাবু। আয় না।

তাকিয়ে দেখি বিপিন। পাশে ধবধবে সাদা কালোপাড় শাড়ি কুঁচিয়ে পরে দাঁড়িয়ে আছে সুবাসী। ঘোমটা তত নেই। পায়ে শিলপার।

বলতে যাচ্ছিলাম, থাক না। কিন্তু তার আগেই কালোপাড় শাড়িখানি লুটিয়ে পড়ল পায়ের কাছে।

বড় সঙ্কোচে আর লজ্জায় সরে গিয়ে তাকালাম সুবাসীর দিকে। সুবাসীকে যেন আরও বলিষ্ঠ সুন্দরী মনে হল।

বললাম, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?

দেখি, দুজনেই মিটমিট করে হাসছে। বিপিন বলল, বল না।

সুবাসী বলল, তুমি বল।

বিপিন বলল. বুড়ো বয়সে পড়তে যাচ্ছি দুজনে। আমাদের ইউনিয়নে একটা ইস্কুল হয়েছে, ছুটির দিনে লেখাপড়া শেখায়। তাই যাচ্ছি।

হঠাৎ আজ আবার আমার বুকটা ফুলে উঠল ফানুসের মত। হ্যাঁ, জলই আসছিল আমার চোখে।

পাশাপাশি চলে গেল দুজনে।

এলেন সেই বিধবা যুবতী ভদ্রমহিলা। হাতে কাগজ, চিঠি লেখাতে এসেছেন। এসেই বললেন ঠোঁট বেঁকিয়ে, দেখছিলাম জানলা থেকে। ছি! কি সাহস বিপিন-সুবাসীর! আবার আপনার কাছে এসেছে। অসভ্য কোথাকার!

তারপর--নিন, লিখে দিন, ছিচরণেষু -মা, আমি আর এ জীবনের ভার সইতে পারি নে—

পাড়ি

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এল হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মত নেমে এল জানোয়ারের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আপনি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরও বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মত বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস করে। বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তরতর করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইঁট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইঁট পোড়াবাব মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলেনৌকারও তেমন ভিড় হয় নি এখনও। তার মাঝে এ দুজন বসে ছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনও নরম রোঁয়াটে ভাব যায় নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানে নি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মত পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হাহা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল। এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই।

গাঁয়ের মানুষ ননকু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় গাঁয়ে ছিল দুটিতে। ননকু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপরে বাপ। ষাট টাকা! সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছ'মাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে কোন অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে ননকুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা। দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে।

দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। ননকুকে বলল, কেন কাজ নেই ?

ননকু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল। ওরা বলল, তবে কি হবে ?

কি হবে ! ননকু বোধ হয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গীদ্ধরের বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ্, রোহ্, তু তু তু, রোহ্ সর্দার, ন রো। তুমি ভাল মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেছল। ননকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাত দিন কোন রকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজ এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না। ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মত হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। তার গায়ে গা রেখে দুটিতে জীইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবাড় দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল। জল আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল ! ভেজা মাটি ফুঁড়ে-ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এল সেই জানোয়ারগুলি পুবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ কালির মত নেমে এল কালো, কুঁতকুঁতে চোখো, ছুঁচলোমুখ, মাদী-মদ্দা পশুর দল।

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে তারপর আবার ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পিছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। সামনের দুটি দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবৎ ধাঙড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা-টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এল। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরও খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হুঁ দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি?

কাজ! কাজ মানে খাওয়া। ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হল, পুরুষটি বলল, কি কাজ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ! ভরা দরিয়া, আরও বাড়ছে। ফুলছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে। ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনার মাকড়ি সেদিকে চুপচু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োরগুলির দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হল মরে থাকার মত। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। ঊনত্রিশ জানোয়ারের জন্যে উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু, কড়ুয়া তেল, দরিয়া থেকে উঠে গায়ে মাখার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী হয়ে গেল দুটোতেই? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনেরে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর হয়ে গেল।

ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল একটানা, উ-র্-র্-র্-র্-র্-আ--

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ···হুঃ! আ···হুঃ! যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোৎঘোৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চকচক করে উঠল কুঁতকুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এল সবাই। গায়ে গায়ে সবাই জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝখানে।

উ-র্ র্-র্-র্-আ -উ-র্-র্-র্-আ···

আ হু! আ···হুঃ!

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চকচকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ারগুলির মত গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হল হৃৎপিণ্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে ভাগ বাগ। চেনে না শুধু

দরিয়াটাকে। লাশ দরিয়া চলেছে খরবেগে তরতর করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ-পুঞ্জে।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে-গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, এক জায়গায় থুকথুকিয়ে উঠছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

তারা যত জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এল কাছাকাছি। মেয়েটি আড়-চোখে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া।…

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পিছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে। পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ণ চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে খালি, হা, বহুৎ বড়।

কথাটার মানে হল, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিরিশ আনা কত? পুরো রুপয়ার বেশি না কম?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরো দু রুপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধার একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এখন পার করছে কেন?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী। জানোয়ারের তখলিফ পরোয়া করে না। ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে গুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে। গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনটা পাঁচটা দেয়, কোনটা ছ'টা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো।

পাবে। নয়া গাভিন। এখনও হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকমফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর, এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা! এত বড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ণ বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ—ই—হা…

মেয়েটা টান দিল, উ-র্-র্-র্—আ,—উ-র্-র্-র্-আ…

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা—এ সবের মানে কি? গায়ে গায়ে ঘষার খস-খস শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মত।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোন খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আলতোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে ঊনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কলকল করে। বাড়ছে। আরও বাড়বে।

কালো-কালো খোচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে-থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?

পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহ্, আহ্, আহ্, উতরো উতরো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই…হা হা

উ-র্-র্-র্ —আ উ-র্-র্-র-আ…

মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিলহিল করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুঁতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।

হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্খনো যাব না!

যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা।

মেয়েটি হুতাশে পিছনে তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্ মত্।

কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সঙ্গে।

পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।

জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উরর-আ, আ-হুই। আ হুই।

শুয়োরীটা অনেক দূর গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।

এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিযে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিলপিল করে ছুটে এল দলের মধ্যে। চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!

মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিযে যাচ্ছে অনেকখানি।

শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হুঁ হুঁ! কোন ডর নাই। হুঁ হুঁ। আ-হুই! বলতে বলতে সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী। যেন খিলখিল করে হাসছে, কলকল করে কি সব বলছে। আর যেন চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস? আসবি? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি। এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি জন্ম আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মত সরল। শিশুর মত নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মত নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ়

মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। ঊনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ! দুটো মানুষ! হাই বাপ! জানোয়ারগুলোর কোন দোষ নেই। হেই মায়ী! দু দিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোন দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মত কলকল ঝুমঝুম করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলই সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষ দুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে। ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোন কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেরাতে হল জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবার দুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে।

পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পিছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এ রকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হত না। পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ, জলদি।

তখনও বুকজল। দুজনে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কি সব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। ঊনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মত ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে, গঙ্গার ওপারের দিকে। মেয়েটি পিছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ

দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই! হা—ই! পিছন থেকে মেয়েটি হুমহুম শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবি নে।

শুয়োরগুলি তখনও ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। এখনও বোধ হয় পিছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শঙ্কায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, অ্যাঁ? মরতে হবে? কি চায় এরা!

ওপারে নিয়ে যেতে চায়!

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পিছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরও উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল. ঠেলে থাক। জোরে ঠেলে থাক। খবরদার ইধারে আসিস নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পাগুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটোর জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হু হু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দু পাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাবভঙ্গি ভাল নয়। মেঘ তাতে আরও জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনও সেটুকু ভাববার, অনুভব করবার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে! ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়?

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোন ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মত লাফিয়ে উঠল জলে। কি হল?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁ পোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পূবে। যাবে না, কিছুতেই যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্ত আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পিছনে ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হল। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনও মানুষ চিনতে শেখে নি, বিশ্বাস আসে নি মনে।

পুরুষটার রাগ হল, আবার মায়াও হল। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মত। বলছে, আমি আছি না, হঁ্যা? হারামজাদী!

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হল। দুজনের চোখই শুয়োরের মত দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে। ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরও বাড়ছে। ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।

শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাসফ্যাস করছে জলের মধ্যে। গোঁ গোঁ করে কি সব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে।

আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনও মাঝামাঝিও আসা যায় নি। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টান টান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের গা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামেশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।

জল হাসছে কলকল করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস? আয়, আরও আয়। বলছে আর গঙ্গা কুল উজাড় করে খলখল করে আসছে।

হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে! অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোন দোষ নেই, কোন স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।

মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলই বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলই। হাত আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।

পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সকতি! আর পারছি নে। বিদায় দাও। বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে দুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।

আকাশ আরও নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় বুম শব্দ হল। অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।

আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।

মেয়েটাও লাফ দিল মস্ত বড় কাতলা মাছের মত। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার! কিছু ডর নেই, চল। যত জলদি পারিস চল।

যা দু-একটা জেলেনৌকা ছিল আশেপাশে, তারা সব পার ঘেঁষছে।

যত পশ্চিম, ততই স্রোত। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায়? শিউমন্দির? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনও অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মত ছটফটিয়ে উঠেছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মত।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষ দুটোর উপর। ওদের সবে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়ছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানি নে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মত রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবে নি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে। বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সর্পিল বিদ্যুৎ চিকচিক করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেকক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরও বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও।

মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আসকে পিটের মত ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মত ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর দিকে।

ওদের বিয়েতে কি বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—

চিকচিক দুম ! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল। পুরুষটি ঢোকে ঢোকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস ?

হাঁ। আছি। তারপর আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে থেমে থেমে, ঊনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না ?

হ্যাঁ।

গঙ্গা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠছে ওদের কথায়।

আবার ঃ আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায় ?

পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি ! সর্বনাশ ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে ! একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে ঊনত্রিশটা জানোয়ার।

পরমুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি !

জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সঙ্কেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।

পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই। উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।

বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ ! হেইশ্মায়ী।

আবার জোর ফিরে এল দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার ! খবরদার !

সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়ারগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হল, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল ? কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।

পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।

কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী ! সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায় ?

শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওই রকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সঙ্গে। কিন্তু উপায় ?

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এস। ওকে মরতে দাও।

মরতে দেব ? মরবে শুয়োরীটা ? এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে ?

বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এল খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এল শেষ পর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।

হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস তো ধর কামড়ে।

কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পিছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠেছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভাল করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।

পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। হঠাৎ লাঠিটা গেল ফসকে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।

মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেক দূর, দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।

শুয়োরীটা আরও জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।

আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ, চুপ, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।

দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এল, কি হ—ল?

পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।

বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘন ঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।

মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।

কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে! আর শুয়োরগুলি ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।

কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দু হাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।

মেয়েটায় তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও নিদারুণ ক্লান্তি। ফিসফিস করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া! আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও! বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এল জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এল সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আশে পাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারে নি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে।

পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, ন রো! কাঁদিস নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরশুদিনের রাত্রের মত ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্ত যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুনগুন করতে লাগল।

যুগ যুগ পর আয়ীলবনি পবন-সুত মহাবীর—হই রামা!

তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

মহাযুদ্ধের পরে

ঘটনার আগের দিনের রাত্রি এটা।

বৃষ্টিটা হবে কিনা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে আকাশ আর আবহাওয়াটা যেন সব দিক দিয়েই তৈরি আছে। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার, মেঘের ঘনঘটা, ভেজা ভেজা ভারী পূবে বাতাস, বায়ুকোণ থেকে আকাশের বহু দূর পর্যন্ত বিদ্যুতের হানাহানি, গুরুগুরু গর্জন, সব আছে। না বর্ষেও রাতটা যেন পুরোপুরি বর্ষার।

হাটের দিন নয়। বাজারের চালাগুলিতে ইতিমধ্যে বেচাকেনার পাট চুকিয়ে, বাতি নেভাবার পালা শুরু হয়ে গেছে। আরও একটু সময় হয়তো চলত হিসেব-নিকেশ, বাতি জ্বলত। কিন্তু আকাশে বড় ঘটা। বর্ষাকে ত্বরান্বিত করতে বোধ হয় ওইটুকুতেই মানুষের হাত আছে। মাথা মুড়ি দিয়ে অন্ধকারে একটা মেঘ-মেদুর অনুভূতি নিয়ে শুয়ে পড়া।

চালাঘরগুলির পূবে ইচ্ছামতীর জলও দেখা যায় না। অন্ধকারে মেশামিশি করে আছে। কেবল চিকুর ঝিলিক যখন তারও বুকে বসছে কেটে কেটে, তখন টের পাওয়া যায়, স্রোত পাক খাচ্ছে ওখানে। জোয়ার না ভাঁটা ঠাহর হয় না, শব্দ শোনা যাচ্ছে শুধু, ছল ছল ছলাৎ! তারও যেন বৃষ্টিরই প্রতীক্ষা।

ভারী বাতাসের ঝাপটা খেয়েও পুরুষ-জোনাকিগুলি মিটিমিটি বাতির ইশারায় ফুসলে বেড়াচ্ছে নিচের মেয়ে-জোনাকিদের। উচ্চকিত হচ্ছে ঝিঁঝির ডাক। সেটা মানুষকে শোনাবার জন্যে নয়। যে-বাসনায় জোনাকি জ্বলে ওঠে, সেই বাসনার উন্মাদনায় পুরুষ-ঝিঁঝিটা চেঁচিয়ে বীরত্বের ফাঁদ পাতছে মেয়েটার জন্যে।

অন্ধকার গাঢ় হচ্ছে ক্রমে। আর এই অন্ধকারে, মেঘলা রাতে, জলো বাতাসে তল্লাটের কুকুরগুলি পরস্পরের মধ্যে পাড়া ও আঁস্তাকুড় ভাগাভাগির সমস্ত চুক্তি, সন্ধি ও বন্ধুত্ব ভুলে গেছে। তারা লড়ছে, রক্তারক্তি করছে। ঋতু-কয়েদীগুলির রক্ত ছাড়া পেয়েছে এই বর্ষার মরসুমে। এখন আর কোন চুক্তি সন্ধি ওরা মানবে না।

নারকেল গাছের ভিড় বেশি চারদিকে। বাতাসে তাদেরই পাতার দোলানি আর ডাক।

বাজারটাকে দুভাগ করে পাকা রাস্তা চলে গেছে অনেক দূরে, ইছামতীর গা ঘেঁষে ঘেঁষে। শেষ হয়েছে গিয়ে ইছামতীর তটে।

আপ আর ডাউনের শেষ দুটো মোটর বাস-ই চলে গেছে কিছুক্ষণ আগে। একটা কলকাতায় গেছে, আর একটা কলকাতা থেকে গেছে ইছামতীর কূলে।

শেষ বাস দুটো দেখে ওরা দুজনেই নদী-কিনারের হোটেলে খেয়ে এসেছে চুক্তি অনুযায়ী। দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা বটা আর ব্যালাইণ্ডা সুলা। নামগুলি একটু অদ্ভুত। বিদেশী নয়। নিতান্তই দেশী নাম, আর এ অঞ্চলেরই কালো কালো দুটি পুরুষ। নাম বটা আর সুলা। বাকিগুলি বিশেষণ, দুজনের খ্যাতির ও খাতিরের বাহন। হোটেলের চুক্তিটা আর কিছু নয়, শেষ যা পড়ে থাকে, ওদেরই। অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ চুক্তি। যে দিন কিছু থাকে না সে দিন ওদেরও ফাঁকা।

খাওয়ার শেষে লাঠি ঠুকে ঠুকে দুজনে রাস্তাটা পার হয়।

বটা একটু লম্বা, ঘাড় অবধি সোজা খাড়া আর শক্ত, মাথাটা নোয়ানো। এলোমেলো, খাপছাড়া দাড়ি তার মুখে। সুলা চওড়া, পেটা শরীর, একটু বেঁটে।

সুলা এসেছে ইছামতীর ওপার থেকে। বটা এপারের। দুজনেই আছে এই বাজারের তল্লাটে অনেক দিন, অনেক বছর ধরে। কত বছর, সেটা ওরা জানে না, কারণ ওরা হিসাব রাখতে পারে না। দশ বছর হতে পারে, বিশ বছরও হতে পারে। নিজেদের বয়স ওরা জানে না। তিরিশ হতে পারে, চল্লিশ-পঞ্চাশও হতে পারে। দেখলে কিছুই প্রায় অনুমান করা যায় না।

কলকাতার বাস যায় এখান দিয়ে, আর বাজারটা আছে। এইটি দুজনের একমাত্র আকর্ষণ।

কে একটা বাস-যাত্রী দেশী সাহেব, অনেক কাল আগে, সুলাকে বলেছিল, তুম্ ব্লাইণ্ড আছে?

সুলা বলেছিল, ব্যালাইণ্ড? সেটা কি বাবু?

ব্লাইণ্ড, ব্লাইণ্ড! আন্ধা।

সুলার চোখ খোলা, ঘষা-ঘষা দুটি তারা, কিন্তু জন্মান্ধ। সাহেব তাকে অন্ধ বলে প্রথমে যেন বিশ্বাস করতে পারে নি।

সুলা সাহেবের মাথার উপর অন্ধ চোখ রেখে বলেছিল, হ্যাঁ, আমি কানা, ভিখ-মাগা কানা।

সাহেব ভিক্ষে দিয়েছিল। আর সুলা চিৎকার করে বলেছিল বটাকে, জাইনুলি রে বটা, অন্ধও না কানাও না, আমি ব্যালাইণ্ড। তুইও ব্যালাইণ্ড।

বাজারের সবাইকে ডেকে বলেছিল, আপনেরা সকলে শুইনে রাখেন গো ব্যাপারী মোহাজনরা, আমরা ব্যালাইণ্ড।

পরে সেটা ডাকাডাকি, হাসাহাসিতে 'ব্যালাইণ্ডা'য় দাঁড়িয়েছে।

বটার চোখে মণি নেই, পচা মাছের পটকার মত দুটো ড্যালা ঝুলে আছে। সেও জন্মান্ধ।

দুইই জন্মান্ধ, দুজনেই ভিক্ষে করে। বটা গান গেয়ে আর সুলা সুর করে কথা বলে ভিক্ষে করে।

লাঠি ঠুকে ঠুকে পার হয় দুজনে রাস্তাটা। ওপারে গিয়ে আরও খানিকটা দক্ষিণে যায়। বাজারের চৌহদ্দি পেরিয়ে—যেখানে পাটের খালি গুদামঘরগুলি রাস্তার দুপাশে একরাশ অন্ধকার গিলে গুহার মত দাঁড়িয়ে আছে। পাট এখন চাষ হচ্ছে মাঠে। পাইকাররা টাকা নিয়ে ঘুরছে চাষীদের কাছে। গুদামঘরগুলি এখন হাঁ-হাঁ করছে, পড়ে আছে বে-ওয়ারিশ। অধিকার আছে শুধু বুড়ি রোগা গরুর, কুকুরের আর ব্যালাইণ্ডাদের।

সুলা বলে, কোন্‌টায় যাবি? বড়টায় না ছোটটায়?

বটা জবাব দিল, বড়টায়। বিষ্টি হলি, জল পড়ে ছোটটায়।

বড়টায়ও পড়ে।

কিন্তুন জায়গা বেশি।

বটা নাক কোঁচকাল, উঁ, শেয়াল যায় ডাইনা দিয়া।

সুলা বলল, হুঁ!

সুলা হুঁ বলার আগেই কুকুর ডেকে উঠল সামনে। তারপরে ঝোপঝাড় মাড়িয়ে একটা ছুটোছুটির শব্দ। মদ্দা শেয়ালগুলিকে এই মরসুমে বিশ্বাস করা যায় না, কুকুরগুলিকে তো নয়ই। শেয়াল-কুকুরের জার জন্মাবে একগাদা।

চারিদিক থেকেই কুকুর ডাকতে লাগল। সামনে, পিছনে, কাছে ও দূরে।

তিনটে গুদামঘর পার হয় ওরা। প্রতিটি উঁচু-নিচু, পথের প্রতিটি গাছ, ঝোপঝাড় প্রায় অঙ্কের মত চেনা ও মাপজোখ করা আছে।

সুলা বলল, বিষ্টি লাইমবে মনে লয়।

বটা জবাব দিল, দেরি আছে। লোনা বাতাসে এখনও ম্যাঘ উড়ুয়ে নেচ্ছে। বাতাসটা জল জল।

সুলা বলে, হাঁকডাকও তো খুব।

ম্যাঘের?

হ্যাঁ। আবার বিজলি নাকি চমকায়।

হুঁ, মানুষে কয়, বিজলি চমকায়। কেমন কইরে চমকায়?

কি জানি! মানুষে দ্যাখে? বোধায়, মন যে রকোম চমকায়, সেই রকোমই হবি।

বটা হাসে, বলে, মনের মতন চমকায়?

সুলাও হাসে। হিঃ হিঃ হিঃ!—আবার বলে, সব কিছুর নাকি রঙ আছে।

হ্যাঁ, মানুষে দ্যাখে। লাল, সইবুজে, লীল, সাদা…

আর কালা? কালাটা কেমন?

আন্ধারের মতন।

আন্ধার?

হ্যাঁ, মানুষে কয়।

লোকে বলে, অন্ধকারটা কালো। ওরা কালো চেনে না, সাদা চেনে না। লাল চেনে না, নীল চেনে না।

সুলা বলে, পয়সা নাকি নাল আর সাদা।

বটা বলে, শুঁইক্‌লে মালুম দেয়, কোন্‌টা নাল আর কোন্‌টা সাদা। নালটার গন্ধ ঘামের মতন। সাদাটার গন্ধ নাই।

হুঁ। হাত দিলিও ট্যার পাওয়া যায়।

তা তো যায়ই।

গন্তব্যে এসে দাঁড়ায় দুজনে। সুলা বলে, এই দ্যাখ শালারা এইসে জুইটেছে। হুট হুট!

গোটা কয়েক কুকুর, ঘেউ ঘেউ করছে না কিন্তু গায়ে পড়াপড়ি, দাপাদাপি করে গরগর করছে। তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাল।

ওরা দুজনে লাঠি ঠুকে ঠুকে একটা কোণ-বরাবর চলে যায়। সেখানে পাতা চাটাইয়ের ওপর শুয়ে পড়ে দুজনেই।

আঃ!

আর একজন কাশে। তারপর দুজনেই তলপেটের কাছে হাত নিয়ে যায়। খরচ শেষে অবশিষ্ট পয়সা টিপে টিপে দেখে।

কোন্ গুদামঘরের চালের টিনের জোড় খুলে গেছে। বাতাসে টিনটা ঘা খেয়ে খেয়ে মেঘ ডাকার সঙ্গে তাল রাখছে মাঝে মাঝে।

বটা ডাকল, সুলা ব্যালাইন্ডা।

হুঁ।

রাইত-ব্যালাইন্ডা ডাকে না যে?

তাই ভাবতেছি।

সুলার কথা শেষ হবার আগেই পাখিটা ডেকে উঠল, পিক পিক পিকু পিকু!

বটা বলে উঠল, ওই, ওই, ডাক ছেইড়েছে রাইত-কানাটা।

কোথায় একটা কাঠের ফ্রেমের কানাচে বাসা বেঁধেছে পাখি। ওরা যখন আসে, দু-চারটে কথা বলে, তখন পাখিটা ডেকে ওঠে। ভয়ে ডেকে ওঠে শিস দিয়ে, পিক পিক পিকু পিকু। সাবধান। মানুষ এসেছে।

সুলা বলে, বড় তাজ্জব, না?

কেন?

দিনে নাকি দেইখতে পায়, রাইতে ব্যালাইন্ডা।

হুঃ! মানুষে কয়। তাই ডরায়।

কেন?

মানুষেরে নাকি ডরায়, মানুষে কয়। কুত্তারে ডরায় না, গরুরে ডরায় না, মানুষেরে ডরায়। ডিম নাকি পাড়ছে, বাচ্চা ফুইটবে, তাই ডরায়।

আবার ডেকে উঠল পাখিটা।

সুলা বলে, ডিম সামলায়। কিন্তুস দ্যাখে কেমন কইরে?

আন্দাজে সামলায়। দিনের বেলা দেইখতে পায়।

জন্মো-কানা লয়।

হুঃ! চোইখ আছে, রং চেনে, উইড়তে পারে।

একটু চুপচাপ। পাখিটা প্রতিদিনের অভ্যাস মত নির্ভয় হয়, শান্ত হয়। চুপ করে পড়ে থাকে। বৃষ্টি আসে নি, ঘটা আরও ঘোর হয়েছে তবু জোড়-খোলা টিনটা শব্দ করছে তেমনি।

সুলা বলে, পাখি কোন দিন দেখি নাই।

অর্থাৎ স্পর্শ করে নি কোন দিন।

বটা বলে, মানুষে দ্যাখে, কয়, দুইটা নাকি পা, আর দুইখান পাখা।

পাখা কেমন?

কি জানি! খুব নাকি লরম জীব। লদীর ওপার নাকি যায় উইড়ে উইড়ে, আবার এইসে পড়ে।

হ্যাঁ, মানুষে তো কয়।

ডিম ফুইটে নাকি বাচ্চা বারোয়?

মানুষে কয়।

মানুষের শুধু বাচ্চা হয়। কেমন কইরে হয়?

সুলা চুপ করে থাকে। গুদামের গুহায় ঢুকে পড়া বাতাস বেরুবার জন্য ছটফট করে। তার ঘষা মণি দুটি স্থির হয়ে থাকে এক জায়গায়।

বটার পটকার মত ড্যালা চোখ দুটি কাঁপে তিরতির করে।

সুলা হঠাৎ বলে, মানুষে কয় না?

তারপর ওদের অন্ধ চোখে ঘুম নামে। ঘটনার আগের দিন ঘুমোয় দুজনে।

ইতিহাসের আগে, আদিম যুগের গুহা-মানবের মত নিতান্ত গোষ্ঠীবদ্ধ দুটি জীব। শব্দ দিয়ে যারা রূপকে দেখতে চেয়েছে, স্পর্শ করে রঙকে চিনতে চেয়েছে। কীট আর পতঙ্গের চেয়েও যেন অসহায়। ক্ষুধার মত প্রাকৃতিক বোধ আর অসুখের অনুভূতি ছাড়া, মানুষ হিসেবে আর কোন দরকার নেই তাদের। কোন হিংস্রতা নেই, ইতিহাসের আলোক তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে বাতি জ্বালে নি।

কারণ, পৃথিবীতে তারা এসেছে, পৃথিবীর কিছুই তারা দেখে নি। মানুষের মধ্যে বাস করেও কিছু দেখে নি তারা মানুষের।

তবু ইতিহাস তাদের অন্ধ বুকে এসে মাঝে মাঝে দোলা দিয়ে গেছে। পাখি-রঙ-মানুষের বিষয় তারা ভাবতে চেয়েছে।

কিন্তু ইতিহাসের অকৃত্রিম বোধগুলি অচেনা থেকে গেছে তাদের। রাজ্য জয়, ভোগ, দখল, দাবি, ক্ষমতা, অধিকার আর হিংসা তাদের ইতিহাসের দাগের বাইরে রেখে দিয়েছে। ইতিহাস কোন দিন তাদের সেই টুঁটিটা খুলে দেয় নি, যেখান থেকে সে চিৎকার করে উঠবে, আমার! এটা আমার, ওটা আমার, আমি চাই। তাই দেড়ো-ব্যালাইন্ডা বটা আর সুলা ব্যালাইন্ডা অনৈতিহাসিক আদিম ভীরু অসহায় অন্ধকারে পড়ে আছে।

তবু ইতিহাস সেখানেও ছায়া ফেলে গেছে মাঝে মাঝে। যেমন, কুকুরের সঙ্গে ওরা শোয় নি, নিজেদের আস্তানা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভয় হয়, কেউ ওদের ভিক্ষের কড়ি মেরে কেড়ে নেবে কি না। খাবার নিয়ে ওদের পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হয়েছে।—কিন্তু সে ঝগড়া ওদের বেশিক্ষণ টেকে নি। যুগযুগান্ত ধরে পাশাপাশি দুটি রাজ্যের হত্যা ও বিদ্বেষের মত ঐতিহাসিক হয়ে ওঠা সম্ভব হয় নি ওদের, কারণ, পরদিন ওরা আবার খেতে পেয়েছে, কারুর ভাগে কম পড়ে নি। তখন ওরা আবার একত্র হয়েছে, কেননা, দুজনের অন্ধসমাজে আর কেউ নেই। সাধারণ মানুষের মত সাধারণ ভাবে ভালবাসাবাসি করেছে। বলাবলি করেছে, ভাত নাকি সাদা।

হ্যাঁ, মানষে কয়। এইটা সাদার গন্ধ।

দুধ নাকি সাদা।

মানষে কয়। দুধেরও গন্ধ সাদা।

আমি দুধ খেইছি, তিনবার।

আমি একবার।

মায়ের দুধ নাকি সাদা?

মানষে কয়। আমার মনে নাই।

আমারও না।

তারপর ওরা চুপ হয়ে গেছে। চুপ হয়ে, অনেক দূর পিছিয়ে গেছে অন্ধকারে অন্ধকারে। কল্পনা করার চেষ্টা করেছে, একটি মা-কে। একটি মা, নিশ্চয় সে ওদেরই মত ছিল। একটা মাথা, দুটো হাত, দুটো পা। আর মানুষের মত চোখ, যা দিয়ে দেখা যায়। কিন্তু দুধ? দুধ কোথায় ছিল? বুকে নাকি থাকত। বুকে? বুকের কোথায়?

যেন মা ঘুমোয় অঘোরে আর তার পাশে দিশেহারা সদ্যোজাত ছেলে বিস্ময়ে হাতড়ে ফেরে, দুধ, দুধ কোথায়?

দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা বটা চিৎকার করে গান ধরে, যে গান গেয়ে সে ভিক্ষে করে ঃ

হে ভগমান ! ভগমা—ন !

অন্ধজনে কর কর ত্রাণ ।

সুলো ব্যালাইণ্ডা ঘাড় নেড়ে বলেছে, হ্যাঁ ! মা দেখি নাই বাবা, বাবা দেখি নাই বাবা, হেই মা বাবা…

তারপর অন্ধত্ব ঘোচাবার জন্যেই যেন ওরা, গায়ে গা ঠেকিয়ে শুয়ে থেকেছে। তখন বোধ হয় শুধু মহাকালই চোখ মেলে তাকিয়েছিল, যে ওদের আয়ুষ্কালের শেষ দিগন্তে দেখছিল ত্রাণের নিঃশব্দ দিনটাকে ।

ওরা দুজনে ঘুমিয়ে পড়ল, বৃষ্টিটা তখন এল না। পুবে ভারী বাতাস আরও ভারী হয়ে উঠল। শুধু বিদ্যুৎ হানাহানি, মেঘ ডাকাডাকি এল কমে। প্রকৃতি যেন এবার চুপিচুপি কিছু সারবার তালে আছে। কারণ রাত্রিটা অন্ধ।

রাত পোহালে দেখা গেল বৃষ্টি হয় নি। কিন্তু মেঘ কাটে নি।

সুলো আর বটা শুয়ে শুয়ে শুনতে পেল, কলকাতার বাস চলে যাচ্ছে। এ সময়টা ভিক্ষে পাওয়া যায় না বড় একটা। সেই জন্যে ভোরের দিকে কয়েকটা বাস ওরা রোজই ছেড়ে দেয়।

সুলো বলে, রোদ ওঠে নাই।

বটা জবাব দেয়, ম্যাঘ আছে আকাশে।

ল্যাঠ ঠুকে ঠুকে, চেনা পথে বাজারের কাছে আসে দুজনেই ।

একটু পরেই দূর থেকে আপ-গাড়ির শব্দ ভেসে আসে।

সুলো বলে, সুলা ব্যালাইণ্ডারে ডাইক্‌তে ডাইক্‌তে আইসতেছে।

বটা বলে, তোর মুণ্ডু। ওই শোন দেড়ো-ব্যালাইণ্ডার নাম কর্‌তিছে।

অর্থাৎ, গাড়ির এঞ্জিন নাকি ওদের নাম ধরে ডাকতে ডাকতে আসে। গূঢ়ার্থ হল, ওদের ভিক্ষে পাওয়ার ভাগ্য নিয়ে একটু খুনসুটি।

তা ছাড়া, এঞ্জিনের শব্দটা ওদের কাছে শুধু একটি যান্ত্রিক শব্দমাত্রই নয়। আরও কিছু। রহস্য-ঘেরা এক বিচিত্র আত্মার মত, যার মধ্যে ওরা অনুভব করেছে ভয়ঙ্করের ভয়, ভরসার বন্ধু। মানুষ যেমন অলৌকিকের সঙ্গে সম্বন্ধ পাতিয়ে সত্য-মিথ্যার নানান খেলা করে, এঞ্জিনের শব্দটার সঙ্গে ওদের তেমনি একটি অলৌকিক সম্পর্ক উঠেছে গড়ে। পেট্রল কিংবা ডিজেলের গন্ধের মধ্যে তাকে ওরা আবিষ্কার করেছে ভয়ঙ্কর ও মহতের মত একটা কিছু।

গাড়িটা আসে। পরস্পরের চুক্তি অনুযায়ী দুজনে দাঁড়িয়ে যায় গাড়িটার দু-পাশে। বটা আর সুলা চিৎকার করতে যাবে, এমন সময় সেই শব্দটা শোনা গেল। ঘটনার সূত্রপাত হল। দুজনে ওরা দাঁড়িয়ে রইল স্তম্ভিত হয়ে।

ওরা স্তম্ভিত হল, কিন্তু চা ও খাবারওয়ালার চিৎকার চলতে লাগল সমানে। চলতে লাগল যাত্রীর ওঠা-নামা, হাঁক-ডাক। কোথাও কোন বিস্ময় নেই ; আর

কেউ স্তম্ভিত হয় নি। বাতাস ঠিক বইছে, আকাশ ঠিক মেঘলা আছে। বাজারের স্তিমিত কলরব শোনা যাচ্ছে ঠিক, ঠিক শোনা যাচ্ছে ইছামতীর খেয়ামাঝির হাঁক।

কেবল দেড়ো-ব্যালাইণ্ডা আর সুলা ব্যালাইণ্ডার ঘষা চোখের মণি স্থির, মাছের পটকা-জ্যালার টুকুস টুকুস লাফানি।

শুধু মহাকাল দেখল, অন্ধ ও আদিম জগতের একত্র বাস-গুহায় নতুন কালের আবির্ভাব হল। পদক্ষেপ করছে ইতিহাস।

বটা-সুলা নয়, বাসের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে একটি মেয়েমানুষ: দু-একখান পয়সা দিয়ে যান গো বাবা, জন্মান্ধ বাবা। সোয়ামী-পুত্তুর নেই, দেখবার কেউ নেই, আপনেদের দয়া। বলতে বলতে গান ধরে দিল:

ঠাকুর, কত কাল আর রাখবে নজর কেড়ে,
কবে জনম সাত্থক হবে তোমারে হেরে।

সুলা ঘুরে এসে বটার সামনে দাঁড়াল।—সুলা?

হুঁ।

আর এ্যাট্‌টা জুইট্‌ল?

ব্যালাইণ্ডানি।

চইম্‌কে গেছি।

বিজলির মতন।

জন্মান্ধ কয়।

মানুষে দেইখ্‌বে।

বটা সুলার দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, রাগারাগি করিস না ঝ্যানো।

সুলা বলল, দরদ আইসে না।

বটা প্রায় চাপা-গলায় হামলে উঠল, মাগ্‌, মাগ্‌, তাড়াতাড়ি সুলা। বলে সে নিজেই চিৎকার করে উঠল:

ভগমান! ভগমান!
অন্ধজনে কর ত্রাণ।

সুলার ভিক্ষে চাওয়ার রীতি একটু আলাদা। সে গাড়িতে উঠে নানা রকম শব্দ করে। বেড়াল ডাকে, কুকুর ডাকে, কোকিল ডাকে। তারপর বলে, সুলা ব্যালাইণ্ডারে দ্যান কিছু।

লোকে হাসে, খুশি হয়। যার সামর্থ্য থাকে, সে দেয় কিছু।

কিন্তু আজকে মনোযোগ দিতে পারল না সুলা।

ওদের দুজনের চিৎকার শুনে, মেয়ে-গলাটা স্তিমিত হয়ে এসেছে একটু। বুঝতে পারল, বিনা-ভাগের নিরঙ্কুশ রাজ্যে সে প্রবেশ করে নি।

গাড়িটা চলে যায়। সুলা আর বটা দাঁড়ায় পাশাপাশি। টের পায়, ভাগীদার পিছনেই দাঁড়িয়ে আছে।

তাই দাঁড়িয়ে ছিল। নাম ওর—কানী কুরাচি। এসেছে কলকাতার শহরতলি থেকে। চোখ বলে ওর কিছু নেই, দুটি অস্পষ্ট অন্ধকার গর্ত, চোপসানো দুটি চোখের পাতা পিটপিট করে তার ওপর। বয়সের দাগ পড়েছে সারা গায়ে। সেটা বয়সেরই কিংবা শুধু এই জীবনের দাগ, অনুমান করা যায় না। সেজন্যে বয়সটা তার গৌণ। তিরিশ হতে পারে, পঞ্চাশও হতে পারে। যৌবনের কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু মেয়েমানুষের চিহ্নটুকু আছে সর্বাঙ্গে—শণনুড়ি চুলে, জন্মান্ধের ছাপমারা মুখে, সেই প্রথম সন্ধিক্ষণের বেড়ে উঠে থমকে-যাওয়া শরীরে বয়সের বহুল রেখায়।

কুরাচিও থমকে আছে, টের পেয়েছে দুজনের দাঁড়িয়ে থাকা। মুখের ওপর তার শণ-পাঁশুটে চুল পড়েছে উড়ে। মুখে একটু তোষামোদের হাসি।

বলে, ক'জনা হে?

বটা-সুলাকে জিজ্ঞেস করছে, মোট ক'জনা অন্ধ আছে।

সুলা উল্টোমুখে হাঁটা ধরে লাঠি ঠুকে ঠুকে। বটাও। কুরাচি হাসিটুকু বিকৃত করে, মুখ ফিরিয়ে থাকে ওদের লাঠি-ঠোকার শব্দের দিকে। আপন মনে বলে, ঝগড়া করতে চায়। তারপর সেও অন্য দিকে যায় লাঠি ঠুকে ঠুকে।

সুলা আর বটা গিয়ে বসে একটি চালের আড়তের সামনে গাছতলায়। ভিক্ষে করে। ওইটি ওদের বসার জায়গা।

বটা বলে, আর এ্যাট্‌টা কানা ছাওয়াল জুইট্‌ছিল একবার, মইরে গেছে।

সুলা বলে, এইটাও মরবে।

রাগ করিস না সুলা।

দরদ আইসে না।

আপনে আপনেই পলাইবে।

একটু চুপচাপ। সুলা বলে, ভাগীদার।

বটা বলে, মানুষে কিছু কয় না?

মানুষে কিছু না বললে, ওদের বলার হক নেই। এই বাজারের এক মহাজনের খদ্দের আর এক মহাজন ভাঙিয়ে নিলে মারামারি হয়, পঞ্চায়েতের বিচার হয়। কিন্তু কানী কুরাচির ব্যাপারে সকলে নির্বিকার। পৃথিবীর কোথাও কিছু যায়-আসে না।

সুলা বলে, মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোন দিন।

অর্থাৎ স্পর্শ করে নি।

ব্যালাইণ্ডানি।

মানুষে দ্যাখে।

এয়াদের ছাওয়াল হয়।

দুখ হয়।

চুপ করে ওরা। আবার গাড়ি আসে। ভিক্ষে করে ওরা। বরং কানী কুরচিই আসর জমাতে পারে না। সময় লাগবে।

প্রত্যেকবার গাড়ি আসে, গাড়ি যায়। কানী কুরচি প্রত্যেকবারই খোশামোদ করে হাসে। ব্যালাইণ্ডারা চুপচাপ গাছতলায় চলে যায়।

কানী কুরচি বলে আপন মনে, ভাগাতে চায় আমারে। কানারে দয়া করতে চায় না! দু দিন কাটল এমনি। বাজারের কেউ-কেউ একটু-আধটু বলাবলি করল ওদের দুজনের সামনে, আর একটা কানী এসে জুটেছে।

দুই কানা এক কানী হল।

মেঘ কাটে নি দু'দিন। তিন দিনের দিন রাত পোহাতেই প্রবল বৃষ্টি এল। সুলা আর বটা বেরোয় নি। বসে ছিল গুদামঘরটার অন্ধকার কোণে।

টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ বেশি হয়। চুপচাপ বসে সেই শুনেছে দুজনে। মাঝে মাঝে মেঘের গর্জন শোনা যায়। মনে হয় চালের টিনের ওপর কেউ বাঁশ পিটছে থেকে থেকে।

পাখিটা বেরুতে পারে নি। বোধ হয় দুটি পাখি থাকে। কখনও কখনও সেই রকম মনে হয় বটা-সুলার। যেন দুজনে কথাবার্তা বলে। এখন একলা আছে পাখিটা নিশ্চয়। মেঘের গর্জন শুনলে ডেকে ওঠে একবার, পিক।

বটা সুলা দুজনেই গুদামের দরজার দিকে মুখ তুলল। শব্দ হল যেন কিসের? পাখিটা মহাকালের হয়ে যেন ভয়-চাপা গলায় ডেকে উঠল, পিক পিক পিকরুরুর, পিকরুরুর।— ব্যালাইণ্ডারা, দ্যাখ কে এসেছে।

জলে ভিজে প্রায় কাঁপতে কাঁপতে বলল কানী কুরচি, বাবা রে বাবা, কি বৃষ্টি। সমসারটা ধুয়ে নিয়ে যাবে গো।

কে? বটা জিজ্ঞেস করল।

কুরচি একটু চমকে উঠল। শব্দ-আসা কোণটার দিকে মুখ করে বলল, কানী কুরচি গো বাবু! হেই বাবা, কারুর ঘরে ঢুকে পড়ি নি তো!

কোন জবাব নেই। পাখিটা ডানা ঝাপটে আবার ডাকল, পিকরুরুর, পিকরুরুর! সে এসেছে, সে এসেছে। পিকু পিকু পিকচ্ পিকচ্।—ব্যালাইণ্ডারা, মহাকাল তোদের নতুন পথের মোড়ে এনেছে।

কানী কুরচির চোখের অন্ধকারে সন্দেহ ও কৌতূহলের ঝিকিমিকি। কোণ লক্ষ্য করে এক-পা দু-পা এগুতে-এগুতে বলল, সেই দুজনা নাকি হে ভাই?

সুলা আর বটা দুজনে নিঃশব্দে নিশ্বাসে-নিশ্বাসে যেন কথা বলে:

ব্যালাইণ্ডানি?

হুঁ। কি চায়?

সুলা জিজ্ঞেস করে মুখ ফুটে, কি চাই?

কুরচি এগুতে লাগল—এ্যাট্টা ডেরা-ডাণ্ডা খুঁজছি। সবাই এদিকটা দেখিয়ে বললে, মেলাই খালি গুদোমঘর নাকি পড়ে আছে। তা দরজাই খুঁজে পাই না। তা পরে এখেনটায় এসে মনে হল, গুদোমঘরের দরজা নেইকো।

মেঘ ডাকল। একটা দমকা বাতাস একরাশ জল নিয়ে গুদামঘরের অনেকখানি ভিজিয়ে দিয়ে গেল। কুরচি কেঁপে উঠে বলে, আ মা গো, জাড় নেগে গেল। গায়ের চামড়া থিক্‌থিকে কাদার মত নাগছে। তারপর হঠাৎ বলে ওঠে, তোমরা বাপু আমার পরে খুব গোঁসা করে আছ, না?

কানী কুরচির গলায় যেন সোহাগ-মাখা অভিমান।

দুই ব্যালাইণ্ডার যেন নিশ্বাস আটকে যায় বুকে। কি হল? কি যেন ঘটে গেল গুদোমঘরটার মধ্যে। যেন কিসের মায়া ছড়িয়ে পড়ল ঘরটার মধ্যে।

মহাকাল দেখছিল, গুদোমঘরে নয়, একটি মানুষিক মায়া এতদিনে ব্যালাইণ্ডাদের অনুভূতিতে প্রবেশ করেছে। মেয়ে-গলার সোহাগী অভিমানের সুরে কেমন যেন করে ওঠে বুকের মধ্যে। চমকে-চমকে ওঠে। বিজলির মতন কি না কে জানে।

সুলার নিশ্বাস পড়ে বটার গায়ে, বটার নিশ্বাস সুলার গায়ে। নিশ্বাসে-নিশ্বাসে নিঃশব্দে কথা বলে দুজনে ঃ

মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোন দিন।

মানষে দ্যাখে।

বটা বলে মুখ ফুটে, না গোসাব কি আছে।

সুলা বলে, হ্যাঁ তুমোও যা আমুও তা! হক্ আছে তোমার ভিক্কে কইরবার।

কানি কুরচির মুখে হাসি ফোটে। পুরুষের স্তুতি শোনা মেয়েমানুষের হাসি। যেন ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, পেথম-পেথম গোঁসা করেছিলে, জবাব কর নি কো। মনে বড় দুঃখু নেগেছিল।

এখন শুনে বড় দুঃখ পায় ব্যালাইণ্ডারা। কানী কুরচির ঠোঁট-ফোলানো সোহাগের সুরে জন্মান্ধ বুক টনটনিয়ে ওঠে। মনে মনে কথা বলে দুজনে ঃ

মেইয়েমানুষ।

দেখি নাই কোন দিন।

কাছে আইসতে চায়।

বুকটা বড় টাটায়।

সুলা আর বটা হাসতে চেষ্টা করে। অভিমানাহত মেয়েমানুষের কাছে আত্মসমর্পিত পুরুষের বিব্রত হাসি।

সুলা বলে মুখ ফুটে, দুঃখু পেয়ো না। আমরা কানা।

বটা বলে, হ্যাঁ, জম্মো-কানা। ব্যালাইণ্ডা।

কানী কুরচি তখন দুজনের একেবারে সামনে। তার হাতের লাঠি স্পর্শ করেছে দুজনের পায়ে। অবাক হয়ে বলল, কি বললে?

ব্যালাইণ্ডা।

ব্যালাইণ্ডা?

হ্যাঁ, কানারে ইঞ্জিরিতে তাই বলে। বলে সুলা হেসে ওঠে, হিঃ হিঃ হিঃ…

বটা হাসে, হেঃ হেঃ হেঃ…

কানী কুরচি ওদের গা ঘেঁষে বসে। মোটা গলার হাসির সুরে একটি মেয়ে গলার খুশির হাসি চড়া সুরে বেজে ওঠে বাজনার মত।

পাখিটা ডেকে উঠল, পিক।—কি হল? পরমুহূর্তেই ডেকে উঠল গলা ফাটিয়ে, ক্যা – ক্যা—ক্যা, পিচ্‌কা পিচ্‌কা।—কি মজা! কি মজা! মহাকাল একটা সুখী সংসার করে দিল গুদামঘরের মধ্যে।

অঝোরে বৃষ্টি ঝরছে। টিনের ওপর বৃষ্টি পড়ছে, বাজছে একটানা, ঝম ঝম ঝম। সেই শব্দে তাল রেখে তিনজনে কথা বলে। পরস্পরের পরিচয় পাড়া হয়। কে কোথা থেকে এসেছে, কোথায় কার ঘর ছিল।

তিনজনে বলে তাদের জীবনবৃত্তান্ত, একটানা গোঙানির মত। যেন কোন এক বিস্মৃতকালের অতীত থেকে তারা এতদূর এসে পৌঁছেছে।

কানী কুরচির অনেক অভিজ্ঞতা। অনেক দেশবিদেশ সে ঘুরে এসেছে রেলগাড়িতে করে, মানুষের কত রকম কথা সে শুনেছে। সে সব 'ইঞ্জিরি'র চেয়েও অদ্ভুত কথা। কুরচি বলে। বটা-সুলা সায় দেয়, মানষে কইত।

অর্থাৎ, এতদিন লোকে বলত, এবার একটা ব্যালাইণ্ডানি বলছে।

কুরচি বলে, কলকাতার কথা। আ! কি রাস্তা গো। পায়ের তলায় যেন পাকা ঘরের মেঝে। মনে হত হাত দিয়ে ধুলো ঝেড়ে দিই রাস্তার।

হ্যাঁ, মানষে কইত!

বটা-সুলা কথা শোনে আর নাকের পাটা ওদের ফুলে ওঠে।…গন্ধ নেয়, নতুন গন্ধ, ব্যালাইণ্ডানির গায়ের গন্ধ লাগে তাদের নাকে। এর আগে ওরা অনেক ভাল গন্ধ পেয়েছে। বাজারের কলা, কুল, তরি-তরকারি আর ফুলের গন্ধ। সে গন্ধ তাদের ভাল লেগেছে। কিন্তু ব্যালাইণ্ডানির গায়ের গন্ধ তাদের কেমন নেশা ধরিয়ে দেয়। এদিক-ওদিক করতে গিয়ে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়।

পাখিটা দুষ্টুমির সুরে যেন ডাকে, পিক?—কি হল?

কি হচ্ছে, ব্যালাইণ্ডারা তা বুঝতে পারে না। শুধু বুঝতে পারে, ওদের অন্ধ রক্তে কিসের মোচড় লাগছে। ওরা যেন কি দেখতে পায়। গোষ্ঠীবদ্ধ দুটি গুহাবাসীকে ধরে এনে কে যেন দাঁড় করিয়ে দিয়েছে আকাশের তলায়, বাতাস আর গন্ধের মাঝখানে। এবার কোন্ দিকে যেতে হবে? রাস্তার কোন্ দিকে? ওদের যাত্রা শুরু হয়েছে, ব্যালাইণ্ডারা পথ চায়। মনে মনে কথা বলে ওরা:

দেড়ো ব্যালাইন্ডা, আমার মন বড় আঁকুপাঁকু করে।

সুলা ব্যালাইন্ডা, আমাব মন ঝ্যানে কান্দে।

এইটে সুখ না দুঃখ?

মানুষে জানে।

কুরচি একরাশ ভেজা চিঁড়ে মুড়ি ভেলি গুড় আর মৌমাছির দলাপাকানো মিষ্টি বের করে কোঁচড় থেকে। বলে, আজ আর ভিখ মাগতে যাওয়া হবে না। এইস খাই।

তিনজনে হাত বাড়িয়ে খায়।

বিদ্যুৎ চমকায়, মেঘ ডাকে, বৃষ্টি পড়ে অঝোরে। ভেজা বাতাসে শিউরে-শিউরে ওঠে গায়ের লোমকূপ। ব্যালাইন্ডাদের পেটেয় খিদের জোর নেই, মন তাদের আনচান করে। এই বর্ষায়, মাতাল পুরুষ-ব্যাঙের মত ডাকতে ইচ্ছে করে, ক্যাঁ-কোঁ, ক্যাঁ-কোঁ। যেমন করে মেয়ে-ব্যাঙটাকে সে ডাকে।

কুরচির হাত উঠে যায় বটার গায়ে। বৃষ্টির মত ঝিমঝিম স্বরে বলে, দেখি এট্টু তোমাদের। অ, দাড়ি আছে তোমার?

বটা বলে, মানুষে দ্যাখে।

সুলার ঘষা মণি দুটি স্থির। বেঁটেখাটো কালো শক্ত শরীরটা যেন পাথরের মূর্তির মত। তার স্তব্ধ পেশী ও রক্তকোষে কে যেন শব্দহীন চিৎকার করে।

কুরচির একটা হাত উঠে আসে সুলার গায়ে। প্রতি রক্তবিন্দুতে সে-স্পর্শ অনুভব করে সুলা। কুরচি বলে, তোমার দাড়ি নেই গোঁফ আছে।

সুলা বলে, মানুষে দ্যাখে।

মাছের পটকার মত বটার চোখের ড্যালা কাঁপে তিরতিরিয়ে। তার বুকের মধ্যে যেন একটি চোখ-ধাঁধানো অন্ধ চিৎকার করে, আমার গায়ে—আমার গায়ে একটুখানি হাত দাও ব্যালাইন্ডানি।

লাঠি-ধরা কড়া-পড়া শক্ত শক্ত দু-হাত—দুজনেরই গায়ে হাত রাখে কানী কুরচি। বুলোয়।

সকাল গেছে, দুপুর গেছে, এবার বিকেলও গড়ায়। বৃষ্টি কখনও ধরব-ধরব করেছে, কখনও ফিসফিস করে ঝরেছে, আবার এসেছে মুষলধারে। থামে নি।

কানী কুরচি দুজনের মাঝখানে জায়গা করে নেয়।

তারপরে মহাকালের ইঙ্গিতে বটা-সুলার হাত উঠে আসে কুরচির গায়ে। ওদের বুকের ভিতর থেকে কিসের একটি প্রচণ্ড স্রোত নামতে লাগল কলকল করে। যেন অন্ধকার গুহা থেকে একটি তীব্র স্রোতধারা, ভয়ঙ্কর প্লাবনের মত ভাসিয়ে নিয়ে চলল অনেক দেশ, নদনদী, অরণ্য।

কুরচি হাসে খিলখিল করে। ব্যালাইন্ডাদের হাত তার শরীরে ঘুরে বেড়ায়। কানী কুরচি হাসে বৃষ্টির মত ঝিরঝির করে।

তারপর কুরচির গা বেয়ে, সুলো আর বটার হাতে হাত ঠেকে যায়। এক মুহূর্তের জন্যে থেমে যায় হাত দুটি। মনে মনে কথা বলে দুজনে ঃ

সুলো ব্যালাইণ্ডা, বড় সুখ লাগে।

বড় সুখ লাগে।

মনটা পাগল-পাগল করে।

আমারও করে।

কেন করে ?

মানুষে জানে।

কানী কুরচি মাতালের মত হাসে।

পাখিটা ডাকে গলা ফুলিয়ে, পিক পিকচা !—মন্দা পাখির মত কথা বলে ব্যালাইণ্ডারা।

কুরচির গা বেয়ে বেয়ে আবার হাতে হাত ঠেকে যায় বটা-সুলোর। এক মুহূর্ত। আবার সরিয়ে নেয়। আবার ঠেকে, আবার সরায়।

রুদ্ধশ্বাস, অপলক চোখ শুধু মহাকালের।

আবার ঠেকে যায়, আবার সরায়।

তারপর আবার ঠেকল। আর সেই মুহূর্তে একটা হাত আর-একটা হাতকে মুচড়ে, ঝটকা মেরে সরিয়ে দিল। পলকের স্তব্ধতা। আর একটি হাত কুরচিকে ডিঙিয়ে ঠাস করে মারল আর একজনকে।

শালা কানা।

কানার বাচ্চা কানা।

কুরচি লাফ দিয়ে উঠে বসে দুজনের মাঝখানে। তারপর বলে, দ্যাখ, দ্যাখ কি কাণ্ড। এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল গো, এই ধুকপুকুনি আমার মনে ছিল।

পাখিটা ডেকে উঠল, পিক্‌চ পিক্‌চ পিকরুরুরু।—হেই গো মহাকাল। এই ভয় আমার মনে ছিল, কানা দুটো ছবের মধ্যে ঘুরবে আর লড়বে।

কুরচি বলে দুজনের গায়ে দুটি হাত রেখে, এই দেখলাম জীবনভর। কি চোখ-ওলা কি অন্ধ, সবাই এক। সবাই আমার কাছে এসেছে, সবাই লড়েছে।

দুই ব্যালাইণ্ডা কুরচির দুপাশে মাথা নিচু করে বসে থাকে। দেখে মনে হয় তারা লড়ে নি, আর কেউ লড়েছে। তাদের ভাবলেশহীন মুখ দেখে মনে হয়, দুটি অনড় নিশ্চল পাথরের চাঁই।

কেবল মনে মনে বলে, আমরা ব্যালাইণ্ডা। আমরা কানা। আমরা মানুষের মতন কইরতেছি।

কুরচি সোহাগী সুরে অভিমান করে বলে, এই আমি জীবনভর দেখলাম। ভাগাভাগি চাস তোরা। তবে আমার হাত কেটে নে, পা কেটে নে, আমার শরীল কেটে নে।

ব্যালাইশ্ডারা নীরব। ঘষা চোখের মণি আর মাছের পটকা ড্যালা নাড়াচাড়া করে। কুরচি দুজনের গায়ে হাত বুলোয়, ঠোঁট ফুলিয়ে বলে, আমাকে কেন ভাগ করিস। আমি তো দুজনার কাছেই এসেছি, তোদের দুজনারে পাব বলে।

মাটি নয়, জল নয়, আকাশ নয় কুরচি। মেয়েমানুষ। কিন্তু কথা বলে অন্য রকম। যেন এই পৃথিবীর মানুষের মত কথা নয়। যেন আর এক পৃথিবী থেকে এসেছে সে।

ব্যালাইশ্ডারা মাথা নিচু করে বসে থাকে। কুরচি দুজনাকে কাছে টেনে বলে, আমরা ব্যালাইশ্ডা, আয় শুয়ে পড়ি, রাত হয়ে আসছে।

পাখিটা ডেকে বলে, ফিক ফিক ফিকুর।—ঠিক বলেছিস ব্যালাইশ্ডানি।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে বুঝি কখন বৃষ্টি ধরেছিল একবার। আবার ঝরতে আরম্ভ করেছে। তবে মুষলধারে নয়, টিপটিপ করে। বাতাসে ঝড়ের সংকেত। জোড়-খোলা টিনটা বড় বেশি গুমগুম করছে।

বাজারের কোলাহল এখান থেকে সামান্যই শোনা যায়। আজ সারাদিনই প্রায় স্তব্ধতা গেছে। সারাদিন ডেকেছে শুধু কুকুরেরা। ইছামতীর জল ঘোলা হয়েছে। সেই ঘোলা জলে হিংস্র কামট ঘুরছে খাবারের সন্ধানে।

রুদ্ধশ্বাস মহাকাল এসে দাঁড়িয়েছে গুদামঘরের মধ্যে। সুলা আর বটার হাত ধরে তুলে এনেছে সে কুরচির গায়ে।

কুরচি হাসে নিস্তব্ধ মধ্যরাতের টিপটিপ বর্ষার মত। একবার এর দিকে ফেরে, আর একবার ওর দিকে।

আকাশ বৃষ্টি ঢালে কোটি কোটি বছর ধরে, তবু আগ্নেয়গিরি কোন দিন নেভে না। গুদামের কোণে রক্তে রক্তে আগুন জ্বলছে দাউদাউ করে।

আবার হাতে হাত ঠেকে যায়। দ্বিতীয়বারের অপেক্ষা থাকে না আর। আগের চেয়েও প্রচণ্ড বেগে, দুজনে আঘাত ও প্রত্যাঘাত করে কুরচিকে ডিঙিয়ে।

কুরচি চিৎকার করে উঠে বসে, থাম। ওরে মরণেরা, আমার মরণেরা, তোরা থাম, থাম।

পাখিটা ডেকে ওঠে, পিকরর্‌র্‌ পিকরর্‌র্‌।—মহাকাল! আমার ভয় করছে।

ব্যালাইশ্ডারা থামে। থেমে হাঁপায় দুজনে। কিন্তু মনে মনে আর কথা বলে না। ভিতরে ভিতরে ওদের সমস্ত সন্ধি ভেঙে গেছে।

কুরচির আমন্ত্রণের অপেক্ষাও রাখতে চায় না দুজনে আর। আবার হাত বাড়ায় দুজনে। আবার ধুপধাপ শব্দ হয় মারামারির।

কুরচি লাঠি নিয়ে উঠে দাঁড়ায়। দাঁতে দাঁত চেপে কেঁদে কেঁদে বলে, এমনি করে মরিস তোরা চেরদিন। তবে মর, তোরা মর, আমি চলে যাই। কুরচি লাঠি ঠুকে ঠুকে বৃষ্টির মধ্যে বেরিয়ে যায় বকবক করতে করতে। লাঠি ঠুকে ঠুকে গিয়ে ওঠে রাস্তার ওপারে আর একটা গুদামে।

ব্যালাইণ্ডা দুটো দাঁড়িয়ে থাকে স্তব্ধ হয়ে। কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ব্যর্থ আক্রোশে সুলা বটাকে নিশানা করে হঠাৎ লাঠির খোঁচা মারে।

উঃ! চাপা আর্তনাদের সঙ্গে সঙ্গে বটা সামনের দিকে লাঠি দিয়ে আঘাত করে। অব্যর্থ সন্ধান অন্ধের। আঘাত খেয়ে সুলা চিৎকার করে সরে যায়। বটাও সরে যায়।

তারপর দুজনেই নিশ্বাস চাপবার চেষ্টা করে হাঁপাতে থাকে।

পাখিটা চিৎকার করে ওঠে, পিকচু পিকচু, পিক পিক, পিকসা।—মহাকাল, ওরা কানা, ওদের থামাও গো, থামাও।

মহাকাল মেঘস্বরে বলে, তা হয় না। কাল নিরবধি, সে থামে না।

রাত পোহায়। বৃষ্টি থামে। ব্যালাইণ্ডারা বেরোয় ভিক্ষে করতে। ওদের অন্ধ চোখে মুখে কোথাও নতুন কোন ছাপ চোখে পড়ে না। সেই একই অসহায়, করুণ, অন্ধ দুটি মানুষ।

কলকাতার গাড়ি আসে। দুজনে দুপাশ থেকে চিৎকার করতে যায়। তার আগেই কানী কুরচির সরু গলা করুণ সুরে বেজে ওঠে।

কিছুক্ষণ থেমে যায় দুজনেই। তারপর দুজনেই দুদিক থেকে মাগতে শুরু করে। চিৎকার করে মাগে বটা ঃ

ভগবান।
অন্ধজনে কর ত্রাণ।

সুলা বলে, এই বিড়ালটারে দ্যান. কুত্তাটারে দ্যান, শিয়ালটারে দ্যান. ব্যালাই ণ্ডারে দ্যান, হেই বাবা।

সারাদিন মেগে, দুজনে গাছতলায় যায়। কিন্তু কথা বলে না। ওদের কথা না-বলাটা লোকের চোখে পড়ে না একটুও। কারুর কোন কৌতূহল জাগে না। কানী কুরচি শুধু ওদের কাছে পেলে অভিমান করে বলে ওঠে, তোদের কাছে যেতে গেলাম, তোরা আমারে তাড়িয়ে দিলি। তোরা কানা. তবু তোরা পাষাণ।

সারাদিন পরে বাজার ঝিমিয়ে আসে। ছ'টার সময় বাস বন্ধ হয়ে যায়। বাতি জ্বলে এদিকে-ওদিকে।

তিনটে লাঠিরই ঠুক-ঠুক শব্দ গুদামঘরগুলির দিকে এগিয়ে যায় বাজার থেকে। ঠুক ঠুক—ঠুক ঠুক—ঠুক ঠুক। অনেকখানি দূরে দূরে ছাড়া-ছাড়া শব্দ। পাশাপাশি কেউ নয়।

সারাদিন বৃষ্টি হয় নি। দুপুরের দিকে রোদও উঠেছিল। এখন আকাশে ছড়ানো ছড়ানো মেঘ।

ইছামতীর জলে ভাঁটার ঢলের কলকল শব্দ।

কুরচি থামে। সুলা-বটার ঠুকঠুকুনিও থামে।

কুরচি মিষ্টি ব্যাকুলস্বরে বলে, কেন তোরা লড়িস। তোরা ব্যালাইণ্ডা, আমি তোদের দুজনকার, আমার কাছে আয়। তোদের মন যা চায়, আমার কাছে আছে। মন ঠাণ্ডা করে আয় আমার ঘরটায়। তোদের ঘরটায় আমি যাব না।

কুরচির কথায় যেন স্বপ্ন নামে। মোহাচ্ছন্ন করে রাত্রিটাকে। কানী একলা থাকতে চায় না।

কুরচি লাঠি ঠুকে-ঠুকে যেতে যেতেও ডাকে, আয়, মরণ দুটো আয়।

ব্যালাইণ্ডারা যুগপৎ লাঠি ঠুকে-ঠুকে আর একটা গুদামঘরে আসে।

কুরচি ডাকে, আয়, এই যে এদিকে, কাঠ পাতা আছে।

দুজনে যায়, আস্তে আস্তে, অনেকখানি দূরত্ব রেখে।

আসছিস? আয়, আয়।

কুরচি যেন খুশিতে হাসে চাপা গলায়। নাক-চোখ-মুখহীন দুটি বিচিত্র জীবের মত ব্যালাইণ্ডারা গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কাছে এগোয় কুরচির। কুরচির গন্ধ শোঁকে না, ব্যালাইণ্ডারা পরস্পরের গন্ধ শোঁকে। দূরত্ব আঁচ করে। শক্ত শরীরে টিপে টিপে যেন আক্রমণের ভয়ে এগোয় অন্ধ দুটো। অদৃশ্যেও যেন ব্যর্থ না হয় লক্ষ্য।

কুরচি হাত বাড়ায়। বাড়িয়ে দুজনকেই ধরে।—আয়, আয়, বোস।

ওপাশের ঘর থেকে পাখিটা ডেকে মরছিল, পিকচি পিকচি, পিকরুরুরু পিকরুরুরু!—মহাকাল, সর্বনাশের জন্য তুমি আমার চোখের সামনে থেকে ওদের নিয়ে গেলে।

মহাকালের শোনবারও সময় নেই আর। এখন তার সেই গতি, যে গতিকে মানুষ চেনবার আগে, বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার আগে, চলে যায় ঝড়ের বেগে।

সুলা দু হাতে সাপটে ধরল কুরচিকে। বটা কুরচিকে ধরতে গিয়ে, সুলার বাঁধন খুলে দিতে চাইল।

সুলা চিৎকার করে উঠল, না!

বটা মুহূর্তে 'না' শব্দটার মুখের ওপর সমস্ত শক্তি দিয়ে ঘুষি মারল।

সুলা চিৎকার করে উঠল, আ!

চিৎকার করতে করতেই সুলা কুরচিকে ছেড়ে কঠিন হাতে জড়িয়ে ধরল বটাকে। দুজনেই জাপটাজাপটি করে আছড়ে পড়ল মাটিতে। কতগুলি চাপা হুঙ্কার, আর মাঝে-মাঝে দুটি মত্ত হস্তীর মাটিতে আছড়ে পড়ার ধুপধাপ শব্দ। তার সঙ্গে কানী কুরচির আর্তনাদ, মরছে, হে ভগমান, কানা দুটো মরছে। আমি পালাই গো, আমি পালাই।

দুজনেই বেড়ার টিনে গিয়ে পড়ল হুড়মুড় করে। দুটো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে ছুটে এল গুদামঘরের দিকে। এসে, অন্ধকারে কানাদের লড়াই দেখে আরও জোরে ডাকতে লাগল, ঘেউ ঘেউ ঘেউ।

হঠাৎ দুজনে ছিটকে পড়ল দুদিকে পরস্পরের ধাক্কায়। তারপর স্তব্ধ। শুধু ঘন-ঘন নিশ্বাসের শব্দ।

মহাকাল নির্বিকার, নিয়মের দণ্ড সে নামায় না।

কানী কুরচি কাঁদছে গুঙিয়ে-গুঙিয়ে: ওরা বেশি কাছে-কাছে থেকেছে, তাই এক দণ্ডও সইতে পারছে না। হে ভগমান!

ওপাশের ঘর থেকে পাখিটা ডাকছে ভয়ে-ভয়ে, প্রিক প্রিক, মরবে, ওরা মরবে।

মরবে, তাই মারতেই চায়। অন্ধকারের মধ্যে কি একটা শক্ত জিনিস দুম্ করে পড়ল টিনের বেড়ায়। একটু পরে, আর এক দিকে আর একটা। অন্ধ দুটো পরস্পরকে গুদামে পড়ে থাকা ভারী কাঠের টুকরো ছুঁড়ে মারছে।

কুরচি চাপা কান্নায় ফিসফিস করছে, লড়ছে, এখনও লড়ছে, এবার মরবে। পালাই, আমি পালাই।

লাঠি ঠুকে-ঠুকে বেরিয়ে যায় কুরচি। তার লাঠি ঠোকার শব্দটা শোনার জন্যে এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায় ব্যালাইণ্ডারা। তারপর আবার ওঁত পাতে।

ইতিমধ্যে বাতাসটা একটু কমে এসেছে। মেঘ দল পাকাচ্ছে আবার।

রাত পোহায়। কলকাতার গাড়ি আসে। রাস্তার উপরে দেখা যায় দুই ব্যালাইণ্ডাকে। দেখে ওদের কিছু বোঝা যায় না। সেই চিরকালের অসহায় দুটি অন্ধ, দুটি কানা ভিখারী। লোকে চেয়ে দেখল না, কোথায় ওদের ঠোঁটের কষে কেটে গেছে, মাথা গেছে ফুলে।

ওরা মাগল, কানী কুরচি মাগল।

ব্যালাইণ্ডারা গাছতলায় গিয়ে বসল। কথা বলল না। কথা ওরা আর কোন দিন বলবে না। কিন্তু কানী কুরচি ওদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না আজ। একবারও অভিমান করল না।

সন্ধ্যা ঘনাল আবার। অন্ধকার নেমে এল গুঁড়ি মেরে, হিংস্র কামটসংকুল ইছামতীর কূল বেয়ে বন ও ঝুপসি-ঝাড়ের কোল ঘেঁষে ঘেঁষে।

কিন্তু কানী কুরচি আর সুলা-বটা আজ সরে গেছে পরস্পরের কাছ থেকে। ঘোর সন্ধ্যার অনেক আগেই কানী কুরচি সরে পড়েছে।

প্রথম চমক ভেঙেছিল সুলার। তা ছাড়া ওর ঝুলঝাপ্পা ছেঁড়া জামার ভিতরে, বুকের কাছে জ্বালা করছে বড়। বটা কামড়েছে, বোধ হয় মাংস তুলে নিয়ে গেছে। বটার কাছ থেকে এক সময়ে সরে গেল সে। আস্তে আস্তে লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলে গেল গুদামের কাছে। এসে চাটাইয়ের ওপর হাতড়াল। কুরচি নেই। ওপাশের ঘরটায় গেল। কাঠের পাটাতন হাতড়াল। কুরচি উধাও।

বাতাস নেই, শুধু মেঘ। অন্ধকারে জোনাকিরা ব্যাকুল হয়ে উড়ছে। শুধু ইছামতীর ছলছলানি আর পাখিটার ডাক শোনা যাচ্ছে, পিক পিক পিকচা পিকচা!—মহাকাল, ভয় করছে গো, আমার ভয় করছে!

এই অন্ধকারের মত অপলক-চক্ষু মহাকাল পল গুনছে। সময় নেই, সময় নেই, এই অন্ধলীলা ত্বরান্বিত করতে হবে।

আবার বেরিয়ে এল সুলা। কুরচি নেই। বটাকেও ফেলে এসেছে। বুকটা জ্বালা করে। সুলা এগিয়ে গেল আরও পুবে। আরও গুদামঘর বে-ওয়ারিশ পড়ে আছে। তারই একটার মধ্যে ঢুকে, সুলা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে।

তারপর আসে বটা। সুলা পলাতক। কুরচির কোন পাত্তা নেই। তলপেটের কাছে একটা ভীষণ ব্যথা তার। সুলা অনেকগুলি ঘুষি মেরেছে। একটু ঝুঁকে চলতে হচ্ছে বটাকে। কিন্তু আক্রোশে ও সন্দেহে জ্বলছে বটা। দুজনে পালিয়েছে?

প্রথমে নিজের ঘরটায় ঢুকল বটা। নেই সেখানে কেউ।

পাখিটা আতঙ্কে ডেকে উঠল, পিক পিক, পিকচা।—ব্যালাইণ্ডা যাস নে।

ওপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল বটা। কাঠের পাটাতন দেখল, কেউ নেই। বেরিয়ে এল বটা। ফিরে গিয়ে দাঁড়াল পুরনো ঘরটার কাছে। ঢুকতে গিয়ে থমকে গেল। ঠুক-ঠুক শব্দ শোনা যায়। শব্দটা এগিয়ে আসছে। দুটো ঘরের মাঝামাঝি এসে থামল শব্দটা।

বটার বিশ্বাস হল, কানী কুরচি। আক্রমণের ভয়ে যথেষ্ট শক্ত হয়ে সে বলল, কুরচি ব্যালাইণ্ডানি নাকি গো?

কানী কুরচিই। কিন্তু ঘৃণায় সে কোন জবাব দিল না। লাঠি ঠুক-ঠুক করে সে নিজের ঘরটায় গিয়ে ঢুকল।

দাঁতে দাঁত চাপল বটা। কথা যখন নেই, তখন সুলা-কানা নিশ্চয়। সেও আর কোন কথা না বলে, চাটাইয়ের ওপর গিয়ে বসল। কিন্তু বসতে পারল না, আবার উঠল। মহাকাল ওকে টেনে তুলল। সে-ই ব্যালাইণ্ডাদের বার করে এনেছে তাদের গোষ্ঠী-নির্ভর ভীরু অন্ধকার গুহা থেকে।

বটা আসে বাইরে। এসে দাঁড়ায় মেঘ-অন্ধকার আকাশের নিচে। শেয়াল একটা প্রায় শুঁকেই যায় ওকে। ক্রুদ্ধ মানুষের গায়ের গন্ধ পায় পশুরা। শেয়ালটা পালায়। জোনাকিরা গায়ে বসে তার।

মহাকাল নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে বটার দিকে।

পাখিটার স্বর যেন ভেঙে গেছে। মাঝে মাঝে ডাকছে, পিক···পিক···

হঠাৎ বটা মাথা ঝাড়া দিয়ে সোজা হবার চেষ্টা করল। তারপর লাঠি ফেলে ওপাশের ঘরটায় গিয়ে উঠল সে। হামা দিয়ে এগোল কাঠের পাটাতনের দিকে।

বটার রক্তে আগুনের দপ্‌দপানি। সমস্ত অনুভূতি হারিয়েছে তার। শুধু কানে শুনতে পাচ্ছে নিশ্বাসের শব্দ। সুলার নিশ্বাস। আরও কাছে এল, আরও। তারপর অন্ধের অব্যর্থ নিশানায় দু হাতে গলা টিপে ধরে নিশ্বাসটা বন্ধ করল—কুরচির। প্রচণ্ড শক্তিতে, শব্দের আগে, একবার নড়ে ওঠবারও আগে।

যখন বুঝল, সব শেষ হয়েছে, তখন আস্তে আস্তে হাতটা শিথিল করল বটা। শিথিল হাতটা সরাতে গিয়ে কুরচির বুকে হাত পড়ল বটার। আর একটা হাত তার শণনুড়ি চুলে।

আর নিজের গলায় দুটো হাত চেপে বটা চিৎকার করে উঠল, কথাহীন, সুরহীন, তীরবিদ্ধ একটা বুনো শুয়োরের মত। লাঠিটা কুড়িয়ে প্রায় হামা দিতে দিতে বেরিয়ে গেল বাইরে। ঘরের পিছনে, নদীর ধারে।

ঠিক একইভাবে, সুলা ফিরে এসেছে পুবের গুদামঘর থেকে। পা টিপে-টিপে গেছে পুরনো ঘরের চাটাইয়ের কাছে। কোন সাড়া পায় নি। শব্দ পায় নি কোন নিশ্বাসের।

ফিরে গেছে ওপাশের ঘরটায়। কোন শব্দ নেই। প্রায় হামা দিয়ে-দিয়ে গেল কাঠের পাটাতনের কাছে। হাতে ঠেকল দুটি পা। হাতটা পিল-পিল করে উঠল গা বেয়ে। যা সন্দেহ করেছিল। কুরচি! কানী কুরচি! ব্যালাইণ্ডানি! আরও ওপরে হাত তুলল। কুরচি। পুরোপুরি কুরচি।

এক মুহূর্ত সময় না দিয়ে দুহাতে সাপটে ধরে সুলা ঝাঁপিয়ে পড়ল কুরচির উপর। অন্ধকার ঝোড়ো-উন্মাদ কয়েকটা মুহূর্ত। পেয়েছি, পেয়েছি! সুলার রক্ত থেকে সেই উত্তেজিত রুদ্ধশ্বাস উল্লসিত দুর্জয় মুহূর্তটি কাটবামাত্র সে থমকে গেল। নাড়া দিল কুরচিকে। ফিসফিসিয়ে ডাকল, কুরচি, ব্যালাইণ্ডানি।

মরা ব্যালাইণ্ডানি অনড় নিঃশব্দ। সুলা কুরচির বুকে কান পাতল। ধুকধুকি বন্ধ। নাকের কাছে হাত নিয়ে গেল। উষ্ণ নিশ্বাস নেই। মুখে হাত দিল, কুরচির মুখ হাঁ করে আছে।

সুলা চাপা গলায় চিৎকাব করে উঠল, মরা, মরা।

সেও ছুটে গেল ঘরের পিছনে নদীর ধারে।

দুজনেই শুনতে পেল দুজনের চাপা চিৎকার। চিৎকার নয়, কান্না।

ভাষাহীন, সুরহীন কান্না। মহাকাল হাসল। পাখিটা চিৎকার করতে লাগল, পিক পিক, পিকরু।—মহাকাল, এ কি করলে গো, এ কান্না যে থামবে না।

থামল না সে কান্না কোন দিন। তারপরও ওরা ভিক্ষে করে। কুরচির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খুনীকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। জন্মান্ধদের কেউ সন্দেহ করতে পারে নি।

ওরা ভিক্ষে করে। তারপর রাত্রে ফিরে এসে কাঁদে ভাষাহীন, সুরহীন গলায়। পাখিটা কাঁদে, পিক পিক পিকু। এ কান্না কোন দিন থামবে না। কোন দিন না।

স্বীকারোক্তি

[১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত]

…তার পরে ওরা আমাকে এস বি সেল-এ এনে ঢোকাল। বাইশে ডিসেম্বরের বেলা দশটা হবে তখন। আমার কাছে ঘড়ি ছিল না। শীতের বেলা দেখে, আর লালবাজার থেকে লর্ড সিনহা রোড পর্যন্ত রাস্তার চেহারা দেখে আমার মনে হল, তখন বেলা দশটাই হবে, যদিও একটা আচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল। সারারাত্রি ঘুম হয় নি। লালবাজার হাজতের সেই ঘর, টিমটিমে অকম্পিত সেই আলো, চার দেওয়াল জুড়ে সেই সব বিচিত্র আঁকাজোকা হিজিবিজি লেখা, আর অর্ধোন্মাদ সেই বন্দী, যে আমার দিকে স্থির চোখে মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছিল, হেসে উঠছিল, বিড়বিড় করে বলছিল বা গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে-ভাঁজতে এমন করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন ওখানে কোন দেওয়াল নেই, একটা দরজা আছে, খোলা দরজা—যেখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। তার পরে আস্তে-আস্তে পিছন ফিরে অর্থাৎ হাজতঘরের দিকে ফিরে বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে হাত তুলে তর্জনীটা শূন্যে বিঁধিয়ে-বিঁধিয়ে ভুরু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বিড়বিড় করছিল। ও যে কে আমি তা জানতাম না। পোশাক-আশাক মোটামুটি ভদ্র রকমের হলেও ও রাজনৈতিক বন্দী কিনা আমি বুঝতে পারছিলাম না। চোর কিংবা ডাকাত বা পকেটমার সে রকম কাউকে আমার সঙ্গে একই হাজতঘরে পুরে দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কারণ ওরা জানত, তাতে আমার মনোবল আরও নষ্ট হবে, আমি আরও বেশি গ্লানি বোধ করব, মুক্তির ইচ্ছে আমার প্রবল হয়ে উঠবে। আর তা উঠলেই ওরা আমার কাছে যা জানতে চাইছে, ওদের ধারণা, তা সহজ হয়ে উঠবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরশু ওরা তা-ই রেখেছিল। তিনটি ছোকরাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যাদের দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওরা যেন হাজতে আসে নি, কোন চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে এসেছে। ওরা বকবক

করছিল, হাসাহাসি করছিল, খিস্তি করছিল, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করছিল, এবং সে সময়ে অশ্রাব্য উক্তিই শুধু করছিল না, কোমরের পরিধান শিথিল করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিম্নাঙ্গ দেখাচ্ছিল যাতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ফুটে উঠছিল। স্বভাবতই আমার খুব খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এটাও বুঝতে পারছিলাম, ওদের কোন দোষ নেই, ওরা ওদের স্বাভাবিক ব্যবহারই করছিল, এমন কি ওরা এও বুঝতে পারছিল আমি অত্যন্ত অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করছি, যে কারণে আমার দিকে তাকিয়ে আরও একটু সংকুচিত হচ্ছিল, আড়ষ্ট বোধ করছিল এবং আমাকেই সাক্ষী মানছিল, 'দেখুন না বড়দা…' ইত্যাদি। ওদের কথা থেকেই জানা যাচ্ছিল বন্দরের কাছাকাছি কোন জায়গা থেকে বে-আইনী আমদানী করা মালপত্র পাচার করার সময় ওরা ধরা পড়েছে। ইতিপূর্বেও ওরা কয়েকবার ধরা পড়েছে, কয়েক মাস করে জেলও খেটেছে। কোন-কিছুই নতুন নয়। তবু ধরা পড়ার কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়েই ওদের ঝগড়া হচ্ছিল। একটাই শুধু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কিছুই জিগ্যেস করে নি, আমি কে কি অপরাধে হাজতবাস করছি। প্রথম থেকেই ওরা আমাকে 'বাবু' বা 'বড়দা' এই রকম সম্বোধন করছিল। আমি কর্তৃপক্ষের কথা ভাবছিলাম, তারা কেন ছেলে তিনটেকে আমার ঘরেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় নি পুলিশের ওটা কোন অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, একটি সুচিন্তিত পরীক্ষা মাত্র। এটা যখন বুঝতে পারলাম তখনই মনকে প্রস্তুত করে নিলাম এইভাবে যে আমি যেন কোন রকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝখানে রয়েছি। ভীষণ ঝড় বা ভয়ংকর ভূমিকম্পের মত কোন দুর্যোগের মধ্যে নয়, যেন দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়ি-বাঁধের ওপর কোন গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশে পাঁক কাদা নোংরা পশুর মৃতদেহ জোঁক আর কেঁচো পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর আকাশ কালো, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। বৃষ্টির বা পাঁক কাদার বা জোঁক কেঁচোর কোন দোষ নেই, সবই স্বাভাবিক এবং যা কিছুরই দায়, সবই আমার জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত, যে গতি প্রকৃতির দ্বারা আমি লোকালয় বহিভূ'ত ভেড়িবাঁধের ওপরে একটি বিচ্ছিন্ন একক গাছের নিচে উপস্থিত। অতএব—

অতএব ছেলে তিনটির সঙ্গে হাজতে আমার সারাদিন ও রাত্রি একরকম ভাবে কেটে গিয়েছিল। তার জন্যে যে সব কষ্ট, গ্লানি ও পীড়া আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল, সে সব আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। ওদের খিস্তি-খেউড় অশ্লীল গল্প, পরস্পরকে নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন এবং রাত্রে আলোকিত হাজতঘরের মধ্যেই কম্বলের আড়াল রাখবার চেষ্টা করে ওদের সমকামী আচার আচরণ হাসি ইশারা গোঙানি এবং আর্তনাদ সবই একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের মত ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আর যেহেতু মন অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগের

মতই অধিকাংশ সময় কোন কিছু দর্শনে স্মৃতির অন্ধকার দেওয়ালে এক-একটা ঝলক দেখতে পায়, সেই রকম কোন-কোন সমকামিতার ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। যেমন আমাদের শহরের স্কুলের মাস্টার প্রিয়তোষ আর ছাত্র খোকন, কিংবা—থাক সে কথা, অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেই সব ঘটনা ও ঘটনার চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ছিল। এবং এক সময়ে অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে এসে যেমন হঠাৎ আলোর সামনে পড়া যায়, তেমনি ভাবে নীরাকে আমি আমার আলিঙ্গনে আবিষ্কার করেছিলাম—যে আলিঙ্গন আমার স্ত্রীকে, সমাজকে, পার্টিকে এবং গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে হয়। আর নীরাকে মনে পড়ায়, শেষরাত্রের দিকে যেটুকু বা আমার একটু ঘুমের আশা ছিল সেটুকু তিরোহিত হয়েছিল। যদিও তখন ছেলে তিনটি গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েছিল। দোতলার হাজতঘর থেকে লালবাজারকে স্তব্ধ মনে হচ্ছিল, তবু তখন আর একটা বন্দী জীবনের নানান পীড়া, গ্লানি, অস্বস্তি, অশান্তি আমাকে কাতর করছিল। এবং আবার নতুন করে একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের কথা আমার মনে হচ্ছিল, যে দুর্যোগ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে আর আমার নিজেরই জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দরুন নিরুপায় অবস্থায় দুর্যোগ পার হয়ে যেতে হয়।

রাজনৈতিক মতবাদ যেমন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নীরাকে ভালবাসাও তেমনি এবং পার্টিকে অন্ধের মত অনুসরণ করা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মত মেনে নেওয়া একটা অসৎ দুর্বলতা, ভীরুতা, তেমনি এই সমাজের বৈবাহিক বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণগুলোকেও মেনে নেওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে। তাই নীরার আর আমার মাঝখানেও শাসন, সন্দেহ আইন, জেলখানা, পুলিশ-সুপার, ইন্সপেক্টর, ইনভেস্টিগেশন, স্বীকারোক্তি, জিজ্ঞাসাবাদ, ভয় দেখানো, স্নায়ুকে খোচানো, সবই আছে। এবং সেখানেও নানান প্রক্রিয়ায় উত্ত্যক্ত করার ব্যবস্থা আছে। অতএব সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় আমার অস্তিত্ব নিয়োজিত, তাই বহুবিধ কল্পনা আমার আশ্রয়।

তার পরে গতকাল সকালবেলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অত্যধিক পান খেয়ে-খেয়ে ছুঁচলো মোটা ঠোঁট, দাঁত নোংরা হয়ে গিয়েছে, কালো মুখ, মোটা লেন্সের চশমা, এই রকম মাঝবয়সী একজন অফিসার কতগুলি মামুলি প্রশ্ন করেছিল যার জবাব আমি বহুবার দিয়েছি। নাম, ধাম, পেশা, পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয়, পার্টিতে কত সালে এসেছি (পার্টিতে কোন দিন আসিই নি, এই আমার জবাব ছিল), কোন্ কোন্ নেতাকে আমি চিনি, তারা কে কোথায় আছে (আমি জানি না, এই আমার জবাব) ইত্যাদি। কিন্তু অফিসারটি নিতান্ত যেন কর্তব্য করেই যাচ্ছিল, এমনি ভাবে প্রশ্ন করছিল, অন্যমনস্কভাবে ফাইল উল্টে পালটে দেখছিল, আর এক-একটা প্রশ্ন করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কন্যাদায়গ্রস্ত।

ঘণ্টা-দুয়েক পরেই আমাকে সেপ্টির পাহারায় আবার লক-আপে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখন সেই ছেলে তিনটে আর ছিল না। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। আধ-ঘণ্টা বাদেই তালা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, সেই অদ্ভুত চরিত্রের বন্দীকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল—যাকে আমার উন্মাদ বলেই মনে হয়েছিল, যদিও উন্মাদ অপরাধীদের জন্যে আলাদা গারদ আছে। লোকটার সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় নি। কথা বলবার যোগ্য পাত্র সে ছিল না। এমনও হতে পারে, পাগলামিটাই লোকটার ভান, হয়তো স্পাই, কাছে থেকে আমাকে নিরীক্ষণ করা বা অনুধাবন করাই তার কাজ। শুধু যে সরকারী গোয়েন্দাই হতে পারে তা নয়, পার্টির স্পাই হওয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো পার্টিই এই লোকটিকে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে আমার সান্নিধ্যে আসার নির্দেশ দিয়েছে, আমার গতিবিধি, মানসিক অবস্থা, স্বীকারোক্তি করি কিনা এই সব জানতে। কারণ পার্টির পরিচালকেরা জানে তাদের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমার মতভেদ আছে। সরকারীই হোক আর পার্টিরই হোক স্পাই মাত্রকেই আমার যেন সরীসৃপ জাতীয় জীব মনে হয়, আমি এদের কাছে কখনই স্বচ্ছন্দ বোধ করি নে, কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে, ঘৃণা হয়। আবার এমনও হতে পারে একটা পাগলকে সারা দিনরাত্রির জন্যে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করেই আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যে, আমাকে উত্ত্যক্ত করে মানসিক ভারসাম্য হারাবার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

লোকটার ভাবভঙ্গি ব্যবহার, মাঝে-মাঝে কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, ফিসফিস করা, বিড়বিড় করা, ধপাস করে আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়া এবং হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শের চেষ্টা করা, হঠাৎ হেসে ওঠা—সব মিলিয়ে বিশ্রী উত্ত্যক্ত করেছিল। আমি চোখ বুজতে পারি নি সারারাত। নানান রকম ভেবেছিলাম। লোকটা যদি আমাকে কামড়েই দেয় বা খামচে দেয়। কত কি-ই করতে পারত। গতকাল সন্দেহ আর উৎকণ্ঠায় আমার রাত্রি কেটেছে। মনে মনে একটা দুর্যোগের কল্পনা করেছিলাম।

আজ ওরা আমাকে এস বি সেল-এ নিয়ে এল। আজ বাইশে ডিসেম্বর। আসন্ন বড়দিনের উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে কলকাতায়, লালবাজার থেকে জীপে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল। যদিও কলকাতাকে আমার মোটেই ভাল লাগছিল না। এমনিতেই কলকাতাকে আমার নীরক্ত মনে হয়। তার ওপরে আমার মনের মধ্যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আমার দু-পাশে সশস্ত্র প্রহরী। ড্রাইভারের পাশে একজন যুবক অফিসার, যে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি, ভাল করে তাকিয়েও দেখে নি। সে লুব্ধ দু-চোখ ভরে চৌরঙ্গি এলাকাকে যেন গিলছে। আসন্ন বড়দিনের স্বপ্ন তার চোখে। আর, বিশেষ করে কলকাতার এই অংশটাকে আমার সব থেকে বেশি নীরক্ত ও প্রাণহীন বলে মনে হয়।

যদিও প্রশ্ন ও জবাব বিধি বহির্ভূত, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছি ?'

প্রায় এক মিনিট বাদে, যখন জবাবের প্রত্যাশা প্রায় নিঃশেষ, তখন অফিসার মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'এস বি অফিস।'

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস। জিগ্যেস করলাম 'আবার আমি ফিরে যাব ?'

জবাব 'না, এস বি সেল-এ থাকতে হবে।'

লালবাজারেরটা লক-আপ। সেল শুনে জিগ্যেস করলাম, 'সেখানেও কি লালবাজারের মতই ?'

রাস্তায় একঝাঁক মেয়ের দিকে অফিসার তাকিয়ে ছিল। অন্য সময় হলে হয়তো আমিও মেয়েদের তাকিয়ে দেখতাম, খুশি হতাম। মেয়েদের ঝাঁকটা হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে চলেছে। হয়তো বেড়াতে কিংবা বড়দিনের বাজার করতে চলেছে। কিন্তু ওদের নিয়ে আমার চিন্তা বিস্তৃত হল না। জবাবের প্রত্যাশায় অফিসারটির ঘাড়ের দিকেই আমার দৃষ্টি। মেয়েদের দলটা পার হয়ে যাবার পর জবাব এল, 'না, সেখানে এক-একজনের এক-একটা ঘর।'

কথাটা শোনামাত্রই মনটা খুশি হয়ে উঠল। এক-একজনের এক-একটা ঘর। সেখানে আর কেউ থাকবে না। কয়েকদিন লালবাজার লক-আপ-এ নানান ধরনের অচেনা লোকদের সঙ্গে থেকে, সব সময় বাতি জ্বালানো, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ আর দেওয়ালের অশ্লীল লেখা, 'ও ছুঁড়ি, তোর দাড়কাকে গাল খাবলে খাবে' (সম্ভবত এটা কোন গানের কলি , অনেক নাম, তারিখ, প্রধানত যৌন-বিষয়ক আনন্দের ব্যাখ্যা, অনেক গানের কলিও তাই এবং আনাড়ী হাতের একই বিষয়ের ছবি, দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, দেয়ালের অনেক লেখা এবং ছবিই পেন্সিলে বোলানো। অথচ পেন্সিল কোন কয়েদীর কাছেই থাকা উচিত নয়। হাজতে থাকার সময় লজ্জা নিবারণের জামাকাপড় ছাড়া বন্দীর কাছে আর কিছুই থাকবার নিয়ম নেই। ধূমপান নিষিদ্ধ। লক-আপ-এর বাইরে গিয়ে খেতে হয়। ভিতরে কিছুই থাকবে না। এমন কি নিজের ঘড়ি আংটি টাকা-পয়সা সবই জমা দিয়ে দিতে হয়। এক-টুকরো কাগজ থাকাও নিষেধ। বন্দী যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা না করতে পারে, সেজন্যেই নাকি এত বিধিনিষেধ। এ রকমই আমি শুনেছিলাম।

আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, সেই একলা ঘরটায় আমি ধূমপান করতে পারব কিনা, খবরের কাগজ দেখতে পাব কিনা,—নিদেন কোন বই, ছাপার অক্ষরে যে কোন জিনিস, যা পড়তে পারা যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের শাস্তি এবার শেষ হবে কিনা।

কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই গাড়িটা লর্ড সিন্‌হা রোডের একটা বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ল একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই আমাকে নামতে বলা

হল। নামতেই প্রকাণ্ড পুরনো ধরনের বাড়িটার ভিতরে আমাকে অফিসারটি নিয়ে গেল। দিনের বেলাও সব ঘরেই আলো জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যায়, দেয়াল খুব মোটা। উঁচু-ছাদ আর বড় বড় ঘর। বাড়ির ভিতরটা বেশ কর্মমুখর। য়ুনিফর্ম আর সাদা পোশাক পরা অনেক লোক চলাফেরা করছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছে বা বসে বসে কাজ করছে। কারুর হাতে ফাইল, কেউ খালি হাতে। কোথাও তেমন সাজানো-গোছানো কিছু নেই। নিতান্তই যেন কাজ চলা গোছের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ কোন কোন ঘরে রয়েছে। কোন কোন ঘর ফাঁকা। অবিশ্যি কোন কোন ঘরের দরজায় দামী পরদা, ভিতরে উজ্জ্বল আলোর ঝলকও দেখতে পেলাম। সম্ভবত বড় অফিসারদেব ঘর সেগুলো।

একটা বাড়ি পেরিয়ে আবার একটা বাঁধানো উঠোন এবং সেখানেও কয়েকটা গাছ। গাছে পাখিরা জটলা করছে। আমার ভাল লাগল। লালবাজারের সেই দোতলার হাজতঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে আমার মনটা খুশি হয়ে উঠল। সেখানে ঘরের ভিতর থেকে বারান্দার দিকে ঘিঞ্জি জালে ঘেরা ফাঁক দিয়ে একটা উঁচু বাড়ির মাথায় দু-তিন ফুট আকাশ দেখতে পেতাম মাত্র। ঘরের অন্যান্য বন্দীদের জন্যে সেই ছোট্ট জালের হিজিবিজি-আঁকা আকাশ দেখবার অবকাশও কম হত।

এখানে উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে-ওখানে পাখির বিষ্ঠা। আমি এ-সবই দু-চোখ ভরে দেখলাম। চোখ তুলে গাছের দিকে তাকালাম। শুধু কাক শালিক নয়,কয়েকটা পায়রাও রয়েছে। যদিও উঠোনের ওপারেই পুব দিকে আর একটা তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি মাথা তুলে দাড়িয়ে আছে, তবু নীল আকাশ অনেক-খানিই দেখা যায়। আর আকাশটার দিকে চোখ রাখতে আমার অবস্থা যেন ব্রীড়াময়ী সলজ্জ প্রেমিকার মত হয়ে উঠল। হয়তো আমার চোখে ঠাণ্ডা লেগেছে বা যে কোন কারণেই হোক, এত ঔজ্জ্বল্য আমার চোখে সইছে না, তাই চোখেব পাতা বুজে যাচ্ছে। অথচ প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এস বি সেল কি এই তিনতলা বাড়িতেই? আমি কি এখানেই থাকব?

এই দিকে। তিনতলা বাড়ির একটা দরজার কাছ থেকে অফিসারটি আমাকে ডাকল। বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম। এ বাড়িটাও পুরনো। হয়তো শতাধিক বছর বয়স হবে। ভিতরটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। মেঝের ঠাণ্ডা যেন আমার জুতোর সোল ফুঁড়ে স্পর্শ করছে। গায়ের চাদরটা আমি আর একটু ভাল করে জড়ালাম। প্রায় আধো-অন্ধকার এক-একটা ঘর দিয়ে অফিসারকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম।

এখানেও সশস্ত্র ও নিরস্ত্র, য়ুনিফর্ম ও সাদা পোশাক পরা কর্মচারীরা চলা-ফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। আগের বাড়িটার মত ভিড় এখানে নেই। আর

একমাত্র বৈশিষ্ট্য, এখানে কোন কোন ঘরের দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ দরজার সামনে একজন করে বন্দুকধারী প্রহরী। আগের বাড়িটাতে আমাকে কেউই তাকিয়ে দেখে নি। এখানে অনেকেই আমাকে তাকিয়ে দেখল। আমার মনে হল, এই তাকিয়ে দেখার মধ্যে একটা শিকারীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রয়েছে। আমাকে দেখার পর প্রত্যেকেই যুবক অফিসারটির সঙ্গে চোখাচোখি করছে। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে ওদের যে কি নিঃশব্দ কথার আদান-প্রদান হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না। একটা-কিছু কথা আদান-প্রদান হচ্ছে, সেটা অনুমান করা যায়।

এ-বাড়ির হাওয়া একটু যেন অন্য রকম। ঠিক নিশ্চুপ নয়, অথচ একটা স্তব্ধতা যেন বিরাজ করছে। এক-একজনের মুখ যেমন একটা ক্রূর উত্তেজনায় [illegible]। কেন, কে জানে। যেতে যেতে আমার সামনেই হঠাৎ একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে। সান্ত্রী দরজাটা টেনে দেবার আগেই চকিতে আমার চোখে পড়ল, ঘরের মাঝখানের টেবিলে একজন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু-হাত ছড়িয়ে, আর একটা কালো কম্বল টেবিলের ওপর থেকে মেঝেয় লুটোচ্ছে। আমি দরজাটা পার হয়ে যেতেই অন্য দিক থেকে আর একটি লোককে তাড়াতাড়ি আসতে দেখলাম। তার চোখে চশমা, [illegible] ওভারকোট, ট্রাউজারের পকেট দুটো যেন অনেক মালপত্রে মোটা হয়ে আছে। এক হাতে স্টেথোস্কোপ। মনে হল, লোকটি ডাক্তার। দেখলাম, সে ওই ঘরটাতেই গিয়ে ঢুকল।

আমার নিঃশ্বাস ভয়ে বন্ধ হয়ে এসেছিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। ধমক কানে এবং ঠেলা লাগতেই দেখলাম, অফিসারটি আমাকে আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিচ্ছে। [illegible] বিরক্তি তার মুখে।

আমি ওকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে টেবিলের ওপর সেই মূর্তিটা ভাসছে। আর ডাক্তারের দ্রুত আগমন ভুলতে পারছি না। কোন অসুখ-বিসুখের ব্যাপার না কি? না কি স্বীকারোক্তির জন্যে… দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া সেই লোকটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলাম। প্রকাণ্ড চেহারা উষ্ক-খুষ্ক চুল. হাতা গোটানো, লোমশ-বুকখোলা শার্ট, আর হাতে ঝোলানো কোট। লোকটা কি স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে ওকে মেরেছে? যাকে এক মুহূর্তের জন্যে খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে? বেত দিয়ে মেরেছে. না কি কম্বল চাপা দিয়ে ভারী রুল দিয়ে পিটিয়েছে? কারণ একটা কালো কম্বলও টেবিল থেকে মেঝেতে লুটোতে দেখলাম। আর কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি কলকাতা পুলিশের আছে। শুনেছি তাতে দেহে কোন দাগ হয় না। অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধে হয়। বন্দীর আঘাত কি খুব বেশি হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিল?

'দাঁড়ান'। আমাকেই বলা হল। ওপরে উঠেই বাঁদিকে টেবিলের সামনে চেয়ারে একজন ফর্সা মোটা মাঝবয়সী লোক বসে ছিল। আমাকে যে নিয়ে এল সেই অফিসারটি নিচু হয়ে নিচু গলায় কি যেন বলল মোটা মাঝবয়সীকে। মোটা মাঝবয়সী একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার হাতের পেন্সিল দিয়ে এক দিকে নির্দেশ করল। অফিসারটি আমাকে ডাকল, 'আসুন'।

অনুসরণ করলাম। সামনেই ডানদিকে পর পর কয়েকটি দরজা। একটা ভেজানো দরজা ঠেলে আমাকে ভিতরে যেতে নির্দেশ করে সে বলল 'আপনি একটু বসুন।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এটা কি সেল?'

'না।' বলেই সে চলে গেল।

একজন সান্ত্রী এসে দাঁড়াল এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। এটা সেল নয়। একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, এই মাত্র আসবাব। ঘরের মেঝে পুরনো, দেয়ালও তাই। ঘরের মধ্যে যেন দলা দলা শীত জমে ছিল। ঢোকা মাত্রই তারা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল, এবং হঠাৎ শিরদাঁড়া শিউরিয়ে ছলাৎ করে যেন এক ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মাথায়। স্বীকারোক্তি' আবার স্বীকারোক্তি।

এটা জিজ্ঞাসাবাদের ঘর। আবকলা সেই নিচের ঘরটার কথাই যে বলে সেই বন্দী পড়ে আছে। আমার শীতের কাঁপুনিটা বোধ হয় এই কারণেই ওই একটি মুহূর্তের দৃশ্যের জন্যেই। আমাকেও হয়তো স্বীকারোক্তির জন্যে

একটাই মাত্র জানালা আছে দরজাটিতে। দেয়ালের অনেক উঁচুতে আমার মাথা ছাড়িয়ে। শুধু আকাশই দেখা যায়। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। দাঁড়াতে পারছি না, ভীষণ শীত করছে, কাঁপুনিটা বুকের কাছে উঠে এসেছে। হাতে পায়ে তেমন যেন বল নেই। পা তুলে টেবিলটা চেপে ধরে, শক্ত হয়ে, গুটিশুটি হয়ে বসলাম।

তার পরে প্রথমেই আমার মনে পড়ল, আমার চুলের মুঠি আমার বাবার হাতে, ভীষণ লাগছে। গাল দুটো জ্বালা করছে থাপ্পড়ের ঘায়ে। বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলায় হিংস্র জিজ্ঞাসা: 'বল, ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকো বাইতে? মাছ ধরতে? বল বল বল। তা নইলে খুন করব আজ তোকে।'

তার পরেই মনে পড়ল, ঢাকা শহরের সেই প্রায়ান্ধকার গলিটার কথা, যেখানে মাত্র একটি কেরোসিনের লাইটপোস্ট ছিল, এবং তিনজন বন্ধু আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি। তিনজনেরই চোখ মুখ ভীষণ নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সকলেই আমরা সমবয়সী, ষোলো সতেরো আঠারোর মধ্যেই সকলের বয়স। বন্ধু

তিনজনের জিজ্ঞাস্য, আমি রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের বাড়ি যাই কি না, কেন যাই এবং বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে আমি সমিতির কথা বলেছি কি না।

'আমরা জবাব চাই।' ওরা তিনজনেই রুদ্ধশ্বাস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল।

বিরাজমোহনকে আমি কোন দিনই দেখি নি, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে যাই। এই যাওয়াটা নিষিদ্ধ, কারণ বিরাজমোহন পার্টির বিচারে বিশ্বাসঘাতক, শত্রু। আমি ওর কাছে যাই না তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে যাই, কারণ ভাল লাগে, ওরা সকলেই খুব ভাল। বিরাজমোহনের নাতি-নাতনী বলে তাদের কোন দোষ নেই তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। আর অলকার সঙ্গে আমার প্রেম (অন্তত সেই বয়সে, সেটাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। অলকার বয়স তখন বারো, দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, আমরা হাতে হাত ধরতাম, অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুনে নিয়ে খেলা'র নায়ক-নায়িকার মত চুমো খাবার চেষ্টা করতাম, ইত্যাদি), তাকে আমার জীবনের সব গোপনীয়তাই প্রকাশ করে দিই। বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। পার্টির বন্ধুরা ঠিক প্রশ্নই করেছিল তারা ঠিক সন্দেহই করেছিল। কিন্তু ওরা আমার এবং অলকাদের ওপর অবিচার করছে, অন্যায় করছে, তাই আমি অস্বীকার করলাম, 'এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।'

প্রথমে নরেশ দুম করে একটা ঘুষি মারল আমার চোয়ালে। বলল, 'এখন সত্যি কথা বল।'

'জানি না।'

সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই মারতে আরম্ভ করল। বলতে লাগল, 'ট্রেইটার। স্পাই। ওকে খুন করে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।'

আমার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এমন সময়ে কারা যেন গলিতে ঢুকল। লোকজনের সাড়া পেয়ে বন্ধুরা অন্ধকারে দৌড়ে কে কোথায় চলে গেল। আমি হাঁপাতে হাঁপাতে একদিকে চলতে লাগলাম। লোকজনের কাছে বাইরে আমি কিছু জানাতে চাই না। যদিও ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য রেখেছিল, আমি কোথায় যাই। আমি বুড়িগঙ্গার ধারেই গেলাম। কারণ জল দিয়ে মুখ-চোখ ধোওয়ার দরকার ছিল।

এর পরেই আমার মনে পড়ল, আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে। হিংস্র রাগে ওর চোখ মুখ জ্বলছে। আমি সিঁড়ির কাছে, অদূরেই বাড়ির ঝি ঘর মুছছে ন্যাতা বুলিয়ে, যদিও তার হাত ঠিক কাজ করতে পারছে না, নত মুখ, নত চোখের দৃষ্টি, এদিকে আমার মা ঘরের ভিতর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। স্বীকারোক্তির জন্যে ও আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠল, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওর চেহারাটা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাকে একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'বল, ওকে তুমি ভালবাস ? কেন ভালবাস ? বল বল বল।'

ওর কষ্ট, কষ্টের জন্যে হিংসা, হিংসা থেকে রাগ, রাগ থেকে ঘৃণা এ সবই আমি বুঝতে পারছি, এবং নীরাকে আমি ভালবাসি, নীরার সঙ্গে দেখাও করে থাকি। কিন্তু কেন, এর জবাব, ছেলেবেলায় ইস্কুল পালানোর মতই. অলকাদের সঙ্গে মেশার মতই, এবং আজকের এই বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেওয়ার মতই অপ্রতিরোধ্য ও কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমি চুপ করেই রইলাম, জামাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম।

ও একটা অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, আর দু-হাত দিয়ে আমার জামাটা ছিঁড়ে ফালা করে দিল।

এবার আমার মনে পড়ল, পার্টির লোকাল অ্যাকশন কমিটির তলব। মাত্র মাস-দুয়েক আগের কথা, অ্যাকশন কমিটি আমাকে ডেকে পাঠাল। অ্যাকশন কমিটি মানে, পার্টির আর্মস অ্যাম্যুনিশন যাদের তত্ত্বাবধানে, যারা শত্রুকে চিহ্নিত করে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় আর কর্মীদের অপরাধের বিচার করে।

সেই এক জনবিরল লোকালয়, পুরনো বাড়ির দোতলায় প্রায়ান্ধকার ঘর। পাথরের মূর্তির মত নিরেট শক্ত মুখ নিয়ে পাঁচজন বসে আছে। অ্যাকশন কমিটি। ক্যুরিয়র আমাকে পৌঁছে দিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। আমি অ্যাকশন কমিটিকে প্যার্টির নিয়মতান্ত্রিক অভিবাদন করলাম। কিন্তু কেউই প্রত্যভিবাদন জানাল না। আমাকে শুধু তাদের মুখোমুখি বসতে ইঙ্গিত করা হল।

মিহির, অ্যাকশন কমিটির নেতার এই ছদ্ম নাম, যার স্মার্টনেস. সাহস, চেহারা, বাক্‌ভঙ্গির খুবই নাম আছে পার্টির মধ্যে। বোনাপার্ট বলে সবাই যাকে আদর করে, কারণ তার চেহারার সঙ্গে নাকি নেপোলিয়ানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, এবং জিমনাসিয়ামের ক্রীড়ায় বেশ পটু ও স্বভাবতই তার শার্ট-খোলা বুকের ও চলা-বসার ভঙ্গি দৃষ্টি-মুগ্ধকর, যার চোখ তীক্ষ্ন ঈগলের মত, আর একদম হাসে না, যেটা নিয়ে সবাই বিস্মিত প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ, কারণ মিহিরকে কেউ হাসতে পর্যন্ত দেখে নি। আমার ধারণা, মিহির আত্মসচেতন. অনেকটাই ভঙ্গিসর্বস্ব অ্যাডভেঞ্চারার। সে-ই আমাকে জিগ্যেস করল, 'উম্‌-ম্‌ম্‌, হ্যাঁ, কমরেড। অ্যাকশন কমিটি আপনার কাছে জানতে চাইছে, ধ্রুবকে আপনি কোন শেলটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিনা। তার আগে জানতে চাই, পি সি এগারো-শো বাই বারো আট উনপঞ্চাশ নম্বরের সার্কুলার আপনাদের সেল-এ পৌঁছেছিল কিনা, এবং আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা।'

মিহিরের চোখ থেকে যেন একটি ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের ঝিলিক আমাকে হানল, এবং বাকি সকলেরই তাই।

মিহির যা-যা জিগেস করল, সবই সত্যি। গোপন সার্কুলারে ঘোষণা করা হয়েছিল : 'ধ্রুবকে কতকগুলি বিশেষ কারণে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পার্টির বিশেষ স্বার্থে কারণগুলি এখন ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সভ্যদের সবাইকে জানানো যাচ্ছে, ধ্রুবর সঙ্গে যেন কেউ কোন রকম সম্পর্ক না রাখেন, এমন কি বাক্যালাপ না করেন, করলে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে তাকেও শাস্তি পেতে হবে, ইত্যাদি।' আমি সে-সার্কুলার পাঠ করেছিলাম, কিন্তু ধ্রুবকে আশ্রয়ও সত্যি দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী সৎ পার্টিজান, চিন্তাশীল, বিবেকবান ধ্রুবর সঙ্গে জেলার একজন নেতা ও অ্যাকশন কমিটির মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে তাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। তাকে স্পাই আখ্যা দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছিল, এবং সেটা কার্যকরীও করা হয়েছে। অথচ ধ্রুব একজন আণ্ডারগ্রাউণ্ড কর্মী, পুলিশ তার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে। এ অবস্থায় তাকে পার্টি থেকে বের করে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে সে বেরিয়ে পড়ুক। অর্থাৎ পুলিশের হাতে চলে যাক। পার্টি থেকে বহিষ্কার মানেই আণ্ডারগ্রাউণ্ডের আশ্রয় তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলেই পুলিশ তাকে ধরতে পারবে, এবং ধরলেই, যেহেতু ধ্রুব একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হওয়ার আগে যে প্রকৃতই একজন জননেতা ছিল, তাকে পুলিশ নানান ভাবে পীড়ন করবে কথা আদায় করবার জন্যে। এক দিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার, অন্য দিকে পুলিশের পীড়ন, দুইয়ে মিলে স্বভাবতই মানসিক শক্তিতে ভাঙন ধরতে পারে, স্বীকারোক্তিও করে ফেলতে পারে।

এ অবস্থায় ধ্রুব আমার কাছে এসেছিল। পার্টির আণ্ডারগ্রাউণ্ডের আশ্রয় ছেড়েই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল, এবং বলেছিল, 'আমি আত্মহত্যা করতে পারি, তবু পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারব না। মিহির আর যতীন (জেলা কমিটির নেতা) প্ল্যান করে আমার এই সর্বনাশটা করছে, তারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছে। অথচ বিশ্বাস কর, কোন রকম নেতৃত্বের মোহ আমার নেই. আমি শুধু কোন-কোন ক্ষেত্রে ওদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছিলাম। ওরা সেটা সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাকে এভাবে বের করে দিচ্ছে।'

সৎ ধ্রুবকে আমি দেখলাম, সে অসহায়। আমি তাকেই বিশ্বাস করি। মিহিরের অতীতকে আমি জানি না, তাকে ওপর থেকে আমাদের এলাকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বাইরে থেকে এসেছে। আমি ধ্রুবকে চিনি, বুঝি, বিশ্বাস করি এবং তাকে এভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মুখে এক টুকরো মাংসের মত আমি ছুঁড়ে দিতে পারি না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু আমার উপায় নেই, অ্যাকশন কমিটির কাছে আমাকে অস্বীকার করতেই হবে। স্বীকার করলে আমার ওপর নির্দেশ অমান্যের শাস্তি নেমে আসবে তো বটেই, ধ্রুবকেও বাঁচানো

যাবে না। এখন এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললাম, 'সেই সার্কুলার আমি পড়েছি। ধ্রুবকে আমি আশ্রয় দিই নি।'

অ্যাকশন কমিটির নিরেট মুখগুলো পরস্পরের দিকে একবার চোখাচোখি করল। মিহির তার বাক্যবাণ প্রয়োগ করল। হেসে ঘাড় কুঁচকে বলল, 'আপনার মত একজন খাঁটি কমরেড পার্টির কাছে মিথ্যে বলবে এটা আশা করা যায় না!'

মিহির জানত তার এই ভঙ্গিটা অপরের পক্ষে খুবই ক্রোধের উদ্রেক করে। আমি শান্তভাবেই বললাম, 'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'যদি প্রমাণ হাজির করা যায়?'

'তাহলে তো কোন কথাই নেই।' আমি জবাব দিলাম।

অ্যাকশন কমিটির পাথুরে মুখগুলো তীক্ষ্ম ধারে ঝলকাতে লাগল, চোখগুলো অঙ্গারের মত জ্বলতে লাগল। ঘৃণায় হিংস্র দেখাল। সব থেকে কমবয়স্ক যে, যার টেক্ নাম পি পি, সে শাসিয়ে উঠল, 'প্রমাণ হলে মনে রাখবেন, আপনাকেও ধ্রুবর মতই পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

'জানি।' আমি দৃঢ়তা প্রকাশ করলাম।

বিকাশ (ছদ্মনাম) নিষ্ঠুর মুখে, কঠিন গলায় বলল, 'শুধু বের করেই দেওয়া হবে না, তার চেয়েও কঠিন শাস্তি—'

বাকিটা তার চোখের আগুনে ও দাঁতে দাঁত ঘষাতেই বোঝা গেল। ওরা অ্যাকশন কমিটির লোক, হয়তো ওদের প্রত্যেকের কাছেই রিভলভার রয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলে আমাকে---

'গত শুক্রুরবার --' মিহিরের দৃঢ় গম্ভীর ও নাটুকে গলা বেজে উঠল, গত শুক্রুরবার রাত্রি সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ধ্রুব আপনার কাছে যায় নি?'

কথাটা মিথ্যে নয় এবং খবরটা ওরা কমরেড রেবার। আমার স্ত্রী, পার্টির সভ্যা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্ত্রীলোক মাত্রেই যা হয়ে থাকে---ভালবাসা ও ধর্মের বিষয়ে যুক্তিতর্কহীন, যদি ধর্ম মানে, এবং বর্তমানে পার্টি, আমার মতে ধর্মীয় দল ও আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যুক্তি তর্ক বোধ-বুদ্ধিহীন অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মদানে উম্মুখ, আমার স্ত্রী একজন সেই রকম বিশ্বস্ত কমরেড, এবং বিশ্বস্ততার মূলেও ভালবাসায় যেহেতু আহত, সে ফণিনীতুল্য) কাছ থেকে শুনেছে।

আমি তবু বললাম, 'না।'

'তাহলে কমরেড রেবা মিথ্যে বলেছেন?' মিহির বলল বেশ বিদ্রুপের ঢেউ দিয়ে, একটু অ্যাসিড-হাসির জ্বালা ছিটিয়ে। যেন এর পরে আর আমার স্বীকারোক্তি না করে উপায় নেই। আমি অবশ্য রেবাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন সে এ খবর পার্টিকে না দেয়। কিন্তু দিয়েছে।

বললাম, 'যদি তিনি বলে থাকেন তবে মিথ্যেই বলেছেন।'

মিহির গর্জন করে উঠল, 'কমরেড, সাবধান, আপনি আর একজনকে মিথ্যেবাদী করছেন।'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'শাট্ আপ লায়ার।' পি পি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল, নিজের উরুতেই একটা ঘুষি মারল।

আর তার মাঝখান থেকে আহত বাঘের মত গর্জিত গোঙানি ভেসে উঠল মিহিরের গলায়, 'আপনি সেই রাত্রেই একটা চিঠি লিখে, টাকা দিয়ে ওকে কোথাও পাঠিয়ে দেন নি?'

'না।'

'এই ঘৃণ্য মিথ্যে বলার পরিণাম আপনি জানেন?'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

মিহির অসহায় আক্রোশে কি করবে ভেবে পেল না। তার সবল পেশল হাত, মস্ত বড় থাবা অন্ধশক্তিতে কয়েক মুহূর্ত মোচড়াল। তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ডিসল্‌ভ দিস মিটিং, একে আজ চলে যেতে দিন। আমাদের সিদ্ধান্ত একে পরে জানানো হবে।'

পি পি বা প্রকাশের চলে আসতে দেওয়ার ইচ্ছে ছিল না। তবু সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমি বললাম, 'যেতে পারি?'

মিহির বলল, 'নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত।

আমি চলে এলাম। তখনও আমার ছেলেবেলার কথাই মনে পড়েছিল, কৈশোরের যৌবনের ইস্কুল পালানো, অলকাদের সঙ্গে মেশা নীরাকে ভালবাসা, ধ্রুবকে আশ্রয় দেওয়া এবং—

দরজাটা খুলে গেল: স্বীকারোক্তি। কালো গগল্‌স্ পরা এ শভারি লোকটি পিছন ফিরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বগলে একটা ফাইল। এবার জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু সেই শিরদাঁড়া-শিউরনো শীতটা এখন আমার আর নেই। ঘাড়ে গর্দানে স্থূল পেশল লোমশ লোকটি একটানে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। ফাইলটা টেবিলে রাখল। মোটা স্বর শোনা গেল, এখানে এসে আপনার বডি সার্চ হয়েছে?'

'না।'

'দাঁড়ান।'

দাঁড়ালাম। লোকটা শূন্য আমার পকেটগুলো, কোমর, পেট, চাদর ঝেড়ে ঝুড়ে দেখে নিল।

'বসুন।'

বসলাম। গগল্‌সটা খুলল সে। চোখের পাতায় লোম নেই, কোলগুলো রক্তাভ, অনেকটা কাঁচা ঘায়ের মত। চেয়ারে বসে ফাইলের পাতা উলটে যেতে লাগল, আর মোটা স্বরে হুম হুম করতে লাগল। তার পরে আচমকা জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবেন, না বলবেন না ?'

'কোন্ বিষয়ে ?' আমি বললাম। লোকটা শব্দ করল, 'হুম !'

মোটা ঠোঁট দুটো চেপে বসল ওর। তার পরে সেই রক্তাভ চোখ দুটি তুলে নিষ্পলক তাকাল আমার দিকে। লোকটার মুখটা যেন ফুলে উঠছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ধলেশ্বরীতে ঝড় উঠব-উঠব করছে, আকাশ কালো হয়ে উঠছে, বায়ুকোণে চিকুরহানা বাজের দূর গর্জন। ছোট নৌকো, আমি আর মা যাত্রী, গন্তব্য মামাবাড়ি, একমুখ দাড়িওয়ালা মাঝি পবন। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে বুকের কাছে। চোখে আতঙ্ক।

পবন তখন হাঁক দিচ্ছিল, 'রও হে, আর দশ ঠেলা।'

সে ঝড়কে বলছিল, আর দশবার হাল ঠেললেই তীরে পৌছুবে। নৌকোটা অসম্ভব দুলছিল : বাতাসে নয়, পবনের হালের চাড়ে।

'গুরু গুরু গুরু।' মা বলছিল।

'কোন্ বিষয়ে, অ্যাঁ ?' লোকটা গোঙানো সুরে উচ্চারণ করল। ঘষে রক্তাভ চোখগুলো অপলক।

একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে এল ধলেশ্বরীর তীর [illegible], [illegible] গাছগুলো নুয়ে পড়ল। ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর আর্তনাদ ওই

'আর একটুখানি, এই দ্যাওনা !' পবন চিৎকার করল আবার।

লোকটা ভ্যা-ভ্যা করে হেসে ফেলল।

পবন ঝপাং করে লাফ দিল জলে। চিৎকার করল, '[illegible], এক জল।' নৌকোর কাছি পবনের হাতে।

লোকটা বলল, 'আমরা যেমন জিগ্যেস করি, আপনারা সবাই সে রকমই জবাব দেন। সত্যি বলছি, আমি টায়ার্ড, টায়ার্ড। কোন মানে হয় না, রোজ রোজ সেই একই কথা। জানা কথাই তো বাপু, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না। নিন, সিগারেট খান। কোন জীবনেই সুখ নেই মশাই। বিপ্লব করেই বা কি সোনার রাজত্ব তৈরি করবেন আপনারা। ইংরেজ আমলে আমরাও অনেক কিছু ভেবেছিলাম। বসুন, আসছি।' কোটটা তুলে নিয়ে ফাইলটা হাতে করে লোকটা চলে গেল। দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা দুর্যোগ গেল। হয়তো আর একটা দুর্যোগ আসবে, তার পরে আর একটা, তার পরে··· । জীবনব্যাপী দুর্যোগ। তাকে রোধ করা যায় না। যে বিশ্বে বাস, সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দুর্যোগের নানান কার্যকারণ ইন্ধন, এবং আমি কেন দুর্যোগের মাঝখানে, এর একমাত্র কারণ, আমি যে কারণে ছেলেবেলায় ইস্কুল

পালিয়েছিলাম, আরও কৈশোরে চোদ্দ বছর বয়স হবে তখন, বিধবা বীণাদির গোপন চিঠি অমরদাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম, সেই বিষণ্ণ যুবতী বীণাদি পাড়ার ক্লাবের নেতা লাইব্রেরি-স্রষ্টা অমরদাকে ভালবাসতেন, এবং দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ বারণ হয়ে গিয়েছিল, বীণাদির অভিভাবকেরা বীণাদিকে বেরুতে দিতেন না, পাড়ার সব বয়স্ক মানুষই যেন এই দুজনের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল. একটা ফ্রন্ট তৈরি করেছিল, পাহারা দেওয়া, গোয়েন্দাগিরি করা. নোংরা রসিকতা ও কুৎসিত কথা বলা, আর স্বভাবতই আমাদের অভিভাবকেরাও ক্লাবে যেতে নিষেধ করেছিল, অমরদার সংস্রব বিষবৎ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল, স্বাভাবিক ভাবেই আমরা সেটা অন্যায় মনে করেছিলাম. এবং ওই বয়সে হৃদয়ের সকল আবেগ ও সমর্থন অমরদা ও বীণাদির পক্ষে ছিল। আমি বীণাদির চিঠি অমরদাকে পৌঁছে দিয়েছিলাম এবং অমরদার চিঠি বীণাদিকে. আর সেই পৌঁছে দিতে গিয়েই ধরা পড়েছিলাম, যদিচ বামাল সমেত নয় তার পরেই আমি রক্তাক্ত, দাদার একটি ঘুষিতেই দাঁত নড়ে গিয়েছিল. বাবার ছড়ির দাগ আমার শরীরটাকে চিতাবাঘ করে তুলেছিল. আর মায়ের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন. এখন বল, অমরের চিঠি বীণাকে ?'

না।'

'উঃ ভগবান. এই ছেলেটাকে কেন আঁতুড়েই মুখে নুন পুরে দিই নি। দুঃসহ রাগে ও যন্ত্রণায় মা চিৎকার করে উঠেছিল।

তবু আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'হে ভগবান, বীণাদি আর অমরদা যেন ধরা না পড়ে।' এবং এখনও সেই একই প্রার্থনা

দরজাটা আবার খুলে গেল। অন্য একজন ঢুকল। সেই ফাইল হাতে। ধুতি পরা, শার্টের ওপরে কোট। চেয়ারে এসে বসল। পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বের করে দেখল। একবার আমাকে তাকিয়ে দেখে বলল. 'আমি যা পড়ে যাচ্ছি, সেগুলো আগে শুনে যান. কোথাও না মিললে আমাকে বলবেন। সালে পার্টিতে যোগ দেন, সময়ে লোকাল কমিটিতে উত্তীর্ণ সন্দেশখালির কৃষক সম্মেলনে যোগদান. মেটিয়াবুরুজে তারিখে উত্তেজক বক্তৃতাদান, গান ফ্যাক্টরিতে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা. রেলওয়ে ছাব্বিশ নম্বর গেটের ওপারে পার্টির আর্মস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া '

লোকটা একটা কথাও মিথ্যে বলছিল না, তারিখ বা সময়, একটাও ভুল বলছিল না। যেন আমারই কোন সহকর্মী, সর্বক্ষণের সঙ্গী. কতগুলো গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা বলে চলেছে। বলে চলেছে. 'অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল। ··তারিখে, এবং ··তারিখে. ও ··তারিখে···কমিটির সঙ্গে যোগা-যোগ হয়েছে,···তারিখে গণপৎ সিং-এর কাছ থেকে এক ব্যাগ ক্র্যাকার নিয়ে সাত নম্বর সেলকে দিয়েছেন (আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! লোকটা হয়তো এর পরে বলবে রেবার সঙ্গে আমার কবে ঝগড়া হয়েছে, নীরার সঙ্গে আমি কোথায় কখন দেখা করেছিলাম।.

প্রাদেশিক কমিটির আরতি দত্তকে নিয়ে ··তারিখে রাত্রে ফিটনে করে পার্কসার্কাস থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন। অসম্ভব ! এই বিষম সত্যি শুনে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করছে), এবং সেখান থেকে···ইত্যাদি।

লোকটা সত্যি ঘটনা বলে যেতে লাগল, আর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি সেই যে ভাবলেশহীন মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কথাগুলো শুনতে শুনতে আর আমার কোন ভাবের সঞ্চার হল না। বিস্ময়কে যথাসম্ভব রোধ করে আমি ধরেই নিলাম, আমার মুখের সামনে একটা আয়না ধরা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, দেখুন আপনার ঠোঁটের ওপর ডান দিকে একটা তিল, বাঁ কানের পাশে ছোট একটি কাটা দাগ, নাকটা চোখ দুটো ··ইত্যাদি। আর আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, না, না, না। ওটা আমি নয়, ওটা আমার মুখের ছায়া নয়। না না না।

'তাহলে সবই মিলছে, সবই সত্যি?'

'কিসের ?'

'এই আমি যা যা বললাম ? আপনি যখন কিছুই বললেন না, তখন সবই মিলে গেছে নিশ্চয়।'

আমি বললাম, 'এ সব আমি কিছুই জানি না।'

'লায়ার !' একটা আচমকা গর্জনের সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত পড়ল। মনে হল, গত শতকের পুরনো ঠাণ্ডা ঘরটা কেঁপে উঠল। একটা কালো মুখ, ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্ত। চোয়ালের হাড় কঠিন।

আমি অনেকটা অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। একটাই মাত্র মন্ত্র জপ করতে লাগলাম, না না না, না না না, না না না। এব লর্ড সিনহা রোডের এই ঘরে আমি ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেলাম।

ভীষণ স্তব্ধ মনে হল কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই লোকটির নিচু স্বর শোনা গেল। নিচু কিন্তু অনেক বেশি হিংস্র। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল সে, 'বাট আই উইল নট স্পেয়ার ইউ। আই উইল রীড এগেন, হিয়ার অ্যাটেনটিভলি অ্যান্ড দেন আনসার।'

লোকটা আবার সেই কাগজ পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবার আমি আর শুনছিলাম না। ওর পড়ার চেয়ে দ্রুত এলোমেলো বহু ঘটনা ও গলার স্বর আমাকে ঘিরে ধরল। অ্যাকশন কমিটি ; মিহির : 'এই দেখুন কমরেড রেবার চিঠি, তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ধ্রুব কি ভাবে, আপনার কাছে কখন এল, কি বলল, আপনি কি বললেন, কি করলেন। আপনি এখনও স্বীকার করুন।' ···রেবা : 'এই যে সেই চিরকুট, নাম না থাকলেও নীরার হাতের লেখা আমি চিনি। মিথ্যুক। এখনও বল, তাহলে তুমি ওর সঙ্গে বাসুলি বিলের ধারে দেখা করেছিলে ?' ছেলেবেলা ; বাবা : 'সত্যি কথা বল, ইস্কুল পালিয়ে নৌকা বাইতে

গেছিলি ?' কৈশোর ; সমিতির বন্ধুরা : 'বল, অলকাকে কি তুই সমিতির কথা বলেছিস ?'

'...অ্যান্ড দেন আনসার।'

'আনসার, আই স্যে আনসার।' আবার একটা ঘর-কাঁপানো ক্রুদ্ধ গর্জন এবং টেবিলের ওপর প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত।

আমি আমার সামনে দেখলাম, একটা রক্তাভ অঙ্গার মুখ, চিতার ক্রুদ্ধ চোখ। এবং আমি দেখলাম, ঘর কাঁপছে। ভেজা বিছানা থেকে আমি ঘুমন্ত লাফ দিয়ে উঠলাম। দশ বছরের আমি, জলে ভেসে যাওয়া মেঝেয়, অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বাবার চিৎকার শুনলাম, 'ঘরের বাইরে চল ফেলু (আমার মায়ের নাম), ছেলেদের নিয়ে ঘরের বাইরে চল, পশ্চিমের চাল উড়ে গেছে।'... আমার বুকের মধ্যে ভীষণ কাঁপছিল। ঝড়ের গর্জন আর তার দাপটে টিনের চাল যেন ভয়ে কঁকিয়ে কাঁদছিল। বিদ্যুৎঝলকে চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মায়ের আঁচল ধরে আমি খোলা দরজা দিয়ে নতুন পাকা ঘরের দিকে চললাম। মস্ত বড় উঠোনটা বাতাসে বৃষ্টিতে বিজলী-হানাহানিতে তোলপাড় হচ্ছিল। মায়ের একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল। সেইদিকে চোখ রেখে আমার সামনে আমি অঙ্গার-মুখ আর চিতা-চোখ ভেসে উঠতে দেখলাম। তার গর্জনের জবাবে, আমি ভিজতে ভিজতে নতুন পাকা ঘরের দিকে যেতে-যেতে বললাম, 'জানি না। আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

আমার মুখে থুতু ছিটবে লাগল, আর কানের কাছে গর্জন শোনা গেল, 'কি করে জানতে হয়, আমি শিখিয়ে দেব। আই উইল টীচ ইউ, ইউ লায়ার, কাওয়ার্ড! একটা সত্যি কথা যে বলতে পারে না, সে করবে বিপ্লব। কাপুরুষ দখল করবে রাষ্ট্র-ক্ষমতা! থু থু...'

সম্ভবত লোকটা পান খায়, আর সুগন্ধি জর্দা, কারণ ছিটকানো থুতুতেই তা অনুমেয়। আমার গা-টা ঘুলিয়ে উঠল। তবু হাত-পা শক্ত করে, ঝড়ের দাপটের মধ্য দিয়ে কাঁচা উঠোনের কাদা মাড়িয়ে, মায়ের হাতের স্পর্শে, নতুন পাকা ঘরের দিকে এগিয়ে চললাম।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার সামনের চেয়ারটা শূন্য। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভিতরটাও শূন্য বোধ হল। অবসাদের নিঝুমতায় যেন ডুবে গেলাম। কিন্তু শীতবোধ আর একটুও ছিল না। এবং হঠাৎ আমার হাসি পেতে লাগল গর্জিত গালাগালগুলোর কথা মনে করে, লায়ার, কাওয়ার্ড! তবু লোকটা আশ্চর্য রকম ভাবেই, সন্দেহজনক বিস্ময়কর ভাবেই আমার পার্টি-জীবনের গোপন খবরগুলো জেনেছে যা দিয়ে ভিতরের সত্যটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। ভিতরের সত্য যা আপেক্ষিক অথচ ধ্রুব, যা কোন নিয়মাধীন নয় অথচ একটা সুকঠিন নিয়মের প্রেমে আবদ্ধ, যা অথৈ, ছোঁয়া যায় না।

কতক্ষণ একলা বসে ছিলাম জানি না। আমার ভিতরে-ভিতরে একটা প্রতীক্ষা ছিল সেই লোকটা আবার আসবে।

দরজাটা খুলে গেল। আবার—। না, একজন য়ুনিফর্ম-পরা লোক। আমাকে ডাকল. 'আসুন।'

উঠে আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার চললাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্য দিকে গেল লোকটা। পুরনো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আবার একটা সুন্দর সাজানো বাগানে এসে পড়লাম। রঙিন ফুল সবুজ ঘাস খোলা আকাশ শীতের রোদ সব মিলিয়ে আমার সুধাত চোখ দুটি টনটনিয়ে উঠল। জল এসে পড়ল।

বাঁদিকের উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে আমি লোকটাকে অনুসরণ করছিলাম। সব দিকেই পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরে কাঁটাতারের ফেন্সিং, তাতে লতা জড়ানো। সবুজ ঘন লতায় কাঁটাতার ঢাকা। সত্যি, শিল্পীদের দোষ নেই, যারা কাঁটাতারকে বইয়ের মলাটে ফুলের মত আঁকে। ওতে বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত থাকলে লতাগুলো বোধ হয় মরে যেত। কিন্তু রোদটা কি নিবিড় সুখের মত গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতরে ঢুকছে। চাদরটা আলগা করে দিলাম, বুকে যদি একটু রোদ লাগে। আর এই সবুজ, এই ফুল, হোক পাঁচিলে ঘেরা পাঁচিল কোথায় নেই? একমাত্র সেই অর্থ সত্য ছাড়া, যে আমার অস্তিত্ব, যার বোধের কোন সীমা নেই, অথচ সীমাহীন স্বাধীন, তবু তাদের চরিত্র বদলায় নি।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়ালাম। বাগানটি শেষ, পাঁচিলটা কাছেই। দেখলাম, বাঁদিকের পাঁচিলের পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠে একটা গলি চলে গিয়েছে। বাইরে থেকে সহসা কিছুই বোঝা যায় না। সরু গলি, অন্ধকার. কিন্তু মাথা-ঢাকা ছাদে আলো জ্বলছে। দুটো ধাপের ওপরেই গলির মুখে লোহার গরাদের দরজা। দরজায় একজন বন্দুকধারী সান্ত্রী। আমার সঙ্গের লোকটির নির্দেশে সান্ত্রী লোহার গরাদ খুলে দিল। লোকটি আমাকে ভিতরে অনুসরণ করতে বলল। আমি ঢুকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র দিন অন্তর্হিত, আমি যেন রাত্রির বুকে প্রবেশ করলাম।

বাঁদিকে দেয়াল মাথাটা ছাদ-আঁটা, ডানদিকে লোহার গরাদ দেওয়া পর পর কয়েকটা খাঁচার মত ঘর। একেবারে শেষ ঘরটার কাছে গিয়ে আমার সঙ্গের লোকটি দাঁড়াল। সান্ত্রী আমাকে ডিঙিয়ে খাঁচার গরাদের তালা খুলল।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল আর গলিটার শেষ দেয়ালের গায়ে জলভরা চৌবাচ্চা দেখিয়ে বলল, 'এখানে চান করে নিতে হবে। সেলের মধ্যে খাবার দিয়ে যাবে। একটা সিগারেট যদি ইচ্ছে হয়—'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল সে। সেলে ঢোকবার আগেই ধূমপান করে নিতে হবে। বুঝলাম, এগুলো এস বি সেল।

সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে, আমি পিছন ফিরে গলির বাগানের দিকে তাকালাম। সবুজ, এখনও সিগারেটের নিবিড় নেশা। ভেবেছিলাম, লালবাজারের লক-অ। থেকে এস বি সেল ভাল হবে। ভাল হবে। কোথায় গেল সেই পাগলটা, সেই উদ্ধত ছেলেগুলো। ওরা এখানে আসবে না।

মনে হল, মুহূর্তেই সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সেলের গরাদ খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম। সান্ত্রী তালা বন্ধ করে দিল। তারপর দুজনেই চলে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল, গভীর নৈঃশব্দ্য।

সামনে দেওয়াল, পিছনে ডাইনে বাঁয়ে দেওয়াল। মাথার ওপরে একটি অকম্পিত স্থির আলো। লোহার খাট, একটা তোশক আর কম্বল। খাটের বাইরে ফুট-তিনেক ঠাণ্ডা মেঝে। চওড়ায় ফুট-তিনেক, লম্বায় আট কি দশ।

আমি খাটের ওপর বসলাম। কোন শব্দ হল না। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম কাত হয়ে। কোন শব্দ হল না। হলদে আলোয় তাকিয়ে থাকতে পারছি নে। চোখ বুজলাম। নৈঃশব্দ্য, গভীর গাঢ় নৈঃশব্দ্য আর অন্ধকার।

এ সবই আমার চেনা, আমার জানা, এই দুয়ারবন্ধ বন্দিত্ব এই একাকিত্ব এই নৈঃশব্দ্য, এই অন্ধকার। একমাত্র তফাত, এটা এস বি সেল। এ সব ঘোচাবার জন্যেই কি একদা ইস্কুল পালাই নি? ছেলেবেলায় এই বন্দিত্ব এই একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যেই কি দুঃসাহসী অবোধ মন নিয়ে ছোট ডিঙিতে করে বর্ষার দুরন্ত নদীর বুকে ভেসে যাই নি? তার পরে সমিতিতে অলকাদের সঙ্গে মিশতে যাই নি? তার পরে রেবাকে বিয়ে করি নি? তার পরে বিপ্লবী পার্টিতে আসি নি? তার পরে নীরার কাছে ছুটে যাই নি? সারাজীবন ধরে এই বোধই কি রূপান্তরের পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না?

আরও কি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে না। এই বোধই কি সমষ্টির সঙ্গে জীবনকে ভাগ করে ভোগ করার বাসনাকে বাধা করে নি? যার। কোথাও ঠেকে গিয়েছে তাদের বোধ একটা কোথাও নিঃশেষে মুছেছে। আর মিথ্যুকেরা উত্তরণের কথা বলে, কারণ একাকিত্ব কখনও নিষ্ক্রিয় থাকে না, বন্দিত্ব কখনও নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।

এই এস বি সেলের থেকে সেই একাকিত্ব কি আরও ভীষণ নয়? আরও ভয়ংকর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক নয়? এবং আরও সুন্দর ও মধুর? জ্ঞান মুক্তি ও মৈত্রীর নতুন-নতুন চাবিকাঠির সন্ধান যে দিয়েছে। এই তো আমার জপ আমার আহ্নিকের আচমন।

লোহার গরাদ ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি তাকালাম। সান্ত্রী। সে আমাকে নাইতে বলল। তালা খুলে দিল। স্নান করার দরকার ছিল কিন্তু কোন সরঞ্জামই ছিল না। অথচ নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন শুকিয়ে ড্যালা পাকিয়ে রয়েছে। স্নান না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া গলির বাইরে সবুজ লন আর ফুলের

বাগান দেখতে পাব স্নান করতে গেলে। তাই অগত্যা নগ্ন হয়ে চৌবাচ্চার কাছে গেলাম। জল তোলবার কোন পাত্র ছিল না। সান্ত্রী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আর খইনি বানাতে লাগল। আমি সেইদিকেই মুখ করে আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়ে মাথায় ঢালতে লাগলাম। নইলে বাইরেটা, দিনটা দেখা যেত না। দৈহিক প্রশান্তি আমার দেহে সংগীত করতে লাগল যেন।

আবার গরাদ বন্ধ। গা শুকোবার আগেই জামাকাপড় পরে নিলাম। একটা লোক এসে গরাদের নিচের কয়েক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে খাবার দিয়ে গেল। মাছ ভাত দই। বোধ হয় কাছেই কোন হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। এখানে যে-ক'জন বন্দী থাকতে পারে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই কোন রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই।

কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল এই গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কি-একটা শব্দের প্রতীক্ষা যেন আমার ভিতরে মাথা কুটছে। কি সেটা? গরাদের তালা খোলার শব্দ? আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকতে আসবে?

না। কেউ আর এদিকে অনেকক্ষণ এল না। আমি উঠে পায়চারি করতে যেতেই থমকে গেলাম। বাজছে, সেই শব্দটা বাজছে! যার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি—সেই ঝিঁঝিঁ ডাকছে। মানুষ যা-ই বলুক নিজের হৃদস্পন্দনের সঙ্গে বিশ্ব-নিরন্তরতার একটা সম্পর্ক সে খোঁজে।

পরদিন আমাকে সেই বাড়িতে দোতলার সেই ঘরটায় ডেকে নিয়ে গেল। সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চারজন জিজ্ঞাসাবাদ করল। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দুজন।

তার পরের দিন একই নিয়মে আটজন।

তারও পরের দিন, সারাদিন কেউ আমাকে ডাকতে এল না। অবাক হলাম ছুটিও অনুভব করলাম। সন্ধ্যা সাতটাতেই রাত্রের খাবার দিয়ে দেয়। আমি তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু গরাদের তালা খুলতে দেখে অবাক হলাম। কারণ খাবার তলা দিয়েই দেয়। তালা খোলার পর দেখলাম একজন য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার, কোমরবন্ধে রিভলভার। বাইরে থেকেই তর্জনী নেড়ে আমাকে মোটা গলায় ডাকল, 'আসুন।

আমি তাকে অনুসরণ করলাম। গলির বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার নেমেছে। বাগানে কোন আলো নেই। সবুজ লন বা ফুল বা কেয়ারি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সেই পুরনো দোতলা বাড়িটাকে অন্ধকারই মনে হল।

দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটায় স্তিমিত আলো দেখতে পেলাম। অফিসারকে অনুসরণ করে আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। সিঁড়িতেও তেমনি স্তিমিত আলো, নিজের ছায়াতেই অন্ধকার লাগে। ওপরের আলোও সেই রকম। এবং সেই একই ঘরের মধ্যে আমাকে ঢুকতে বলা হল। রাত্রে আমি

কখনও এই ঘরে ঢুকি নি। দেখলাম এই ঘরের আলো একটু জোরালো। আমাকে বসতে বলা হল। বসলাম। অফিসার দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসাবাদ। নতুন পদ্ধতি। এই কথা আমার মনে হল। কিন্তু আমার শীত করছে না একটুও। আমি প্রস্তুত হবার জন্যে বসলাম।

দরজা খুলে গেল। দেখেই চিনতে পারলাম সেই লোক। একটা কম্বল তার হাতে আর কম্বলের মধ্যে একটা কিছু, মোটা ডাণ্ডা হতে পারে, সবসুদ্ধই সে টেবিলের ওপর রাখল। ডান হাতে সেই ফাইল, রিপোর্টস। এ সেই লোক যাকে আমি প্রথম দিন একটা ঘর থেকে রেগে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, যে ঘরের মধ্যে একজনকে হাত ছড়িয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

পরমুহূর্তেই লোকটা আমার চোখে হারিয়ে গেল। অনেক দৃশ্য ও স্বর আমার দৃষ্টি ও শ্রবণকে ঘিরে ধরল। এবং অ্যাকশন কমিটির শেষ আহ্বানের দৃশ্য ও ঘটনা আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কখনও এক জায়গায় বারে-বারে দেখা করে না। সেই অন্য জায়গা। কমিটির সকলের চোখেই দেখলাম নিষ্ঠুর ক্রূর বিদ্রূপের হাসি।

মিহিরের হাসিটা প্রকৃতই নায়কোচিত। চেহারাটিও। আমি যদি ওকে না চিনতাম তবে সেদিনের মূর্তি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতাম। একাধারে বিজয়ী যোদ্ধা ও দার্শনিকের মত মনে হচ্ছিল ওকে। অথচ করুণা ও দয়া দেখাবার অঙ্গীকারও রয়েছে যেন চোখের হাসিতে।

ওর হাতে একটা চিঠি ছিল। বলল, 'আজ আমি শুধু এই চিঠিটাই পড়ব, তার পরে আপনার যা বলবার থাকে বলবেন।'

আমার মনে হল চিঠিটা ধ্রুব লিখেছে, সে স্বীকারোক্তি করেছে আমার সাহায্যের কথা। দেখলাম সকলের চোখগুলোই বিদ্যুৎঝলকে আমায় যেন তড়িতাহত করতে চাইছে। কিন্তু যদি ধ্রুব লিখেই থাকে—

মিহির বলল, 'পড়ছি।' বলে সে পড়তে আরম্ভ করল ঃ

মাননীয়েষু—

মিহিরবাবু, একটু ভেবে আপনাকে সব সত্যি কথা জানাতে পারব কিনা বলেছিলাম। যদিও আপনাকে আমি আগে কখনও দেখি নি, শুনেছি মাত্র আপনার কথা। আপনাদের পার্টি সম্পর্কে আমার তেমন কোন ধারণা ছিল না। একমাত্র অনলের (আমার নাম) মুখেই যা শুনেছি। সে একজন বিশেষ কর্মী তাও জানি। আপনার সঙ্গে রেবাদিকে (আমার স্ত্রী) দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভয় পেয়েছিলাম, রেবাদি বোধ হয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন।

যাই হোক আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছি। পার্টির প্রতি, তার বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাকে আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি অনল ভুল করেছে। সে আমাকে

ভালবাসে, তাই কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ধ্রুবর মত লোককে ক্ষমা করা যায় না। পার্টির বিপ্লবের এবং অনলের মঙ্গলের জনাই আপনাকে আমি তাই জানাচ্ছি অনল সত্যি ধ্রুবকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে অনল নিজেই সে কথা বলেছে। আমার সঙ্গে তার সব কথাই হয়। আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না কার আশ্রয়ে ধ্রুবকে ও পাঠিয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদে কোন বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছে এই পর্যন্ত মনে আছে। অনল ধ্রুবকে অনেক-গুলো টাকাও দিয়েছে। এবং একদিন পার্টির এই সন্ত্রাসবাদী নীতির পরিবর্তন হবে অনল এই বিশ্বাসেই ধ্রুবকে আবার ফিরিয়ে আনবে বলেছে।

আপনার কথায় আমার সম্যক উপলব্ধি হয়েছে। অনলকে আমার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি—

নীরা

নীরা, নীরা লিখেছে। চিঠিটা আমার হাতে নেবার দরকার ছিল না। ওই কাগজ এবং হাতের লেখা আমার রক্তের সঙ্গে পরিচিত।

চিঠিটা পড়ার পর অ্যাকশন কমিটি নিষ্পলক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল। মিহির একটু হেসে বলল, 'বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি এ সবের কিছুই জানি না।'

বোধ হয় বজ্রপাত হলেও ওরা এত চমকাত না। মিহির বলে উঠল, 'আপনি নীরাকেও অস্বীকার করছেন? সে আপনার —'

আমি চুপ করে রইলাম। আর আমার প্রেমে আদুরে হয়ে ওঠা সেই মুখখানি মনে পড়ল।

মিহির গর্জে উঠল, 'আপনি নীরাকে এ সব বলেন নি?'

'না।'

'তাহলে নীরাও মিথ্যে বলছে?'

'তাই দেখছি।'

মিহিরের 'লাগাও' চিৎকারটা আমার কানে বেজে ওঠবার আগেই টেবিলের ওপর কম্বলটা নড়ে উঠল, ভিতরের ডাণ্ডাসহ সেটা একটা মোটা থাবায় উঠল এবং মোটা গোঙানো স্বরের কি-একটা কথার সঙ্গে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কি শুনতে পেলাম বুঝলাম না, খালি বললাম, 'আমি জানি না।'

তারপর······

'শালাদের খালি গান, ফূর্তি, গল্প, ঝগড়া। নিকুচি করেছে তোর—'

ফুঁসতে ফুঁসতে ঘরের নিরালা কোণের অন্ধকার ছেড়ে প্রায় একটা ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত এসে নারাণ বেমালুম দুই থাপ্পড় কষালে গাইয়ে বেচনের গালে।

বেচনের সঙ্গে সমস্ত আসরটাই হাঁ করে তাকিয়ে রইল ক্ষ্যাপা নারাণের দিকে। একে শনিবারের সন্ধ্যা, তায় কাল কারখানায় রবিবারের ছুটি। আসরের আর দোষটা কি?

দোষ নারাণেরও বা কোথায়? একে লোকজনই সহ্য হয় না, তায় আবার গান, বাজনা, ঢলাঢলি, হাসাহাসি।

এই আধো অন্ধকারে নারাণকে একটা সাংঘাতিক কিছু মনে হয় না। মনে হয় যেন একটা ভূতে পাওয়া মানুষ। চোখে তার ক্ষিপ্ততা নেই, আছে অসহ্য চাপা যন্ত্রণার ছাপ। গোঁফ জোড়া অনেক দিন কাটছাঁট না হওয়ায় অসমান ভাবে ঝুলে পড়েছে। মুখের হাড় বেরিয়ে, বাঁকাচোরা অনেকগুলো রেখা সুস্পষ্ট হয়ে তাকে একেবারে বুড়ো করে ফেলেছে এ বয়সেই।

সে চাপা গলায় প্রায় টেনে টেনে আর্তনাদ করে উঠল, 'শালার জগতে লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া, কল-কারখানা, গান, সোহাগ আর কাঁহাতক সওয়া যায়? পঙ্গপালের জাত এ মানুষগুলোন, শালা একদিনে সাবাড় হয় না কেন? অ্যাঁ, কেন হয় না?'

কিন্তু বেচনও ছেড়ে দিলে না। সে প্রায় লাফ দিয়ে উঠে সজোরে এক ঘুষি মারলে নারাণের মুখে।—'শালা, তবে যা না, সাধু হয়ে বনে বনে ঘোরগে! এখানে কেন?'

সবাই ভাবলে, এখুনি একটা মারামারি শুরু হয়ে যাবে এবং একটা শোরগোল উঠল সেই রকমের। কিন্তু কিছুই হল না। কারণ, নারাণ একেবারে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল মুখে হাত দিয়ে।

আসলে সে তো মারামারি করতে আসে নি। এসেছে, আর চুপ করে থাকতে না পেরে। মানুষের কোন কিছুই যে তার আর সহ্য হয় না। কোন বন্ধুর দুটো কথা বল, মেয়েমানুষের একটু হাসি মস্করা বল, ছানা-পোনার একটু সোহাগ বল, মায় কারখানা, কাজ, বস্তি কিছুই তার ভাল লাগে না। মানুষের সমাজ তার

কাছে বিষের মত লাগে। অথচ সে একটা কাজের মানুষ। বনস্পতি ঘিয়ের কারখানায় সে কাজ করে। হাঁকে, ডাকে, হাসিতে, গানে সেও কিছু কম ছিল না।

তবে হ্যাঁ, তখন তার বউ ছিল, তিনটে ছেলে-মেয়ে ছিল। আর বউটা ছিল যেমনি চেহারায় শক্ত, তেমনি এক মুখেই কত কথা, ঝগড়া, হাসি, সোহাগ। তিনটে ছেলে-মেয়ে কাছে কাছে ঘুরত, যেন ধাড়ি শুয়োরের পায়ে-পায়ে ফেরা বাচ্চাগুলো।

সেগুলো বছর ভরে ভুগল, প্যাকিয়ে-প্যাকিয়ে গেল। তারপর মরল একটা-একটা করে। আগে যেমন রাগলে নারাণ বলত, 'তোরা মলে আমার হাড় জুড়োয়', ঠিক তেমনি করে মরল। কিন্তু একে ঠিক হাড় জুড়োনো বলে কিনা, সেটা ঠাউরে উঠতে পারল না সে।

সেই থেকে মানুষই যেন তার কাছে বিষ হয়ে উঠল। মানুষকে সে ঘৃণা করে। গান বাজনা তো দূরের কথা, কোন বউ-সোয়ামীকে একরাত্তি হাসতে দেখলে তার ঠ্যাঙাতে ইচ্ছে করে। আসলে, এ সবই তার কাছে মিথ্যে, ভাঁড়ামি, শয়তানি।

কে নারাণের নাম ধরে ডাকতেই সে আসরের সকলের দিকে তাকিয়ে দেখল। এর মধ্যে অনেকেই তার প্রাণের বন্ধু, বেচনও তাই। আর সকলেই তার দিকে করুণাভরে তাকিয়ে আছে, যেন সে কেমন অসহায় অস্বাভাবিক একটা জীব। ঝি-বউরা এমন ভাবে তাকিয়ে আছে, যেন দরদ নারাণের সব শোক পারলে ওরা তখন হরণ করে নিত।

এতগুলো চোখকে তাকিয়ে থাকতে দেখে ঘৃণায় ও যন্ত্রণায় রি-রি করে উঠল তার গায়ের মধ্যে। এখনই হয়তো সবাই তাকে সান্ত্বনা দিতে আসবে, যেন কতই ভালবাসে।

পিশাচ-তাড়িতের মত সে সেখান থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সর্বত্রই মানুষের ভিড়, হাসি, গান, কান্না, মারধোর, হল্লা। যেন, প্রেতের তাণ্ডবলীলা, জানোয়ারের সংসার।

শেষটায় সে গেল বাবুসাহের দীনদয়াল সাহুর কাছে তার ধাপার মাঠের কাজের জন্য। সে জানত, বাবুসাহের এক জোড়া লোক খুঁজছে, স্বামী আর স্ত্রী। নারাণ জোর দিয়ে বলল, সে একলাই সব কাজ করতে পারবে, তবু মাঠের কাজটা তার চাই-ই। যতই অল্প পয়সা হোক, একটা পেট তো। দুনিয়াতে সে কার ধার ধারে? দীনদয়াল ভারী অবাক হলেও কাজটা তাকেই দিয়ে দিল।

পরদিনই নারাণ তার খুঁটিনাটি জিনিসপত্র নিয়ে, ইয়ার-বন্ধুদের হাজার অনুরোধ-উপরোধ ঠেলে, অমন একটা ভাল কাজ ছেড়ে চলে গেল পুবের জন-মানবহীন শূন্য মাঠে।

শহর ছাড়িয়ে রেললাইন। এপারে ময়লা বিশুদ্ধীকরণের যন্ত্রঘর, ওপারে চারটে বড় বড় পুকুর, তাতে চালান যায় যন্ত্রের ভেতরের সব নির্দোষ শেষাংশটুকু। তারপরেই মাঠ, লোকে বলে ধাপা।

তারপর তার পূবে সীমানায় একখানি মেটে ঘর। আর খানিক পূবে মিউনিসিপ্যালিটির সীমান্ত ধরে সুদীর্ঘ গভীর খাদ কাটা। তার ধারে কতগুলো মরকুটে খেজুর আর কুলগাছের ধানক্ষেতের সীমানা। সেটাও পূবে আর উত্তর-দক্ষিণে দিগন্তবিস্তৃত, তার ওপারে ধূ-ধূ করে একটা গাঁয়ের কালচে রেখা।

দীনদয়াল সাহু এবার মাঠের ডাক নিয়েছে, উদ্দেশ্য তরকারি ও পুকুরে মাছের চাষ। চাষ বলতে বেগুন, কপি ইত্যাদি।

এখানে এসে বিস্ময়ে ও আনন্দে নারাণ যেন মাতাল হয়ে উঠল। তার ছোট্ট ঘর, পাশে বিস্তৃত একটি মাত্র পিটুলি গাছ। তারপর যেদিকে চাও শুধু মাঠ আর মাঠ। লোক নেই, জন নেই, নিঃশব্দ, বিস্তৃত, উদার অসীম আকাশ। সেই শূন্যতাকে দু হাতে সাপটে ধরে সে যেন শিশুর মত বিচিত্র ভাবে হেসে উঠল, অসীমের মাঝে সে একান্ত হয়ে গেল যেন নির্জনতার মধ্যে একটানা ঝিঁঝির ডাকের মত।

কোন ভিড় নেই, কোলাহল নেই, মানুষের সামান্যতম চিহ্ন নেই. এখানে শুধুই সে। নিশ্বাসের পর নিশ্বাসে বুকটা তার খালি হয়ে গেল। ঝড়ের পর এক মহাপ্রশান্তির শব্দহীন নিস্তব্ধতা। সেই শৈশবের কল্পনায় মনে হল, আকাশের অশরীরীরা এখানে এই ঘরেরই আনাচে-কানাচে চলাফেরা করেন। আহা! জীবনটাকে যেন ফিরে পাওয়া গেল।

হেমন্তকাল। নারাণের কাজ শুরু হয়ে যায়। অনেকখানি জায়গা জুড়ে প্রথমে আরম্ভ হয় বেগুনের চারা বোনা, আর একদিকে ফুলকপি। আরও খানিক দীর্ঘ জায়গা তৈরি করে রাখল বাঁধাকপির জন্যে। পশ্চিম ঘেঁষে দিল গাজরের বীজ ছড়িয়ে, ঘরের পাশে করল বিলিতি বেগুনের ক্ষেত।

কোন্‌খান দিয়ে সময় কাটে, নারাণ যেন চোখের পলকে ঠাওর পায় না। সেই ভোর থেকে কাজ শুরু হয়। দেখতে দেখতে বেলা হয়। তখন সে রান্না করে। খেয়ে খানিকক্ষণ খাটিয়াটাতে শুয়ে মুখে গামছা চাপা দিয়ে থাকে। তারপরেই আবার কাজ। সন্ধ্যা নেমে আসে, তারই মাথার উপর দিয়ে নানান পাখির দল বাড়ি ফিরে যায়। সে রেললাইনের ওপারের কল থেকে জল নিয়ে আসে, রান্না করে। তারপর কোন কোন দিন বসে থাকে তার ঝকঝকে উঠোনে খাটিয়া পেতে, নয়তো 'তালা-চাবি-কারিগরি' বা 'স্বাধীন ব্যবসা' নামের বই, অথবা কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ খুলে বসে। তারপর খেয়ে দেয়ে ঘুমোয়। মাসখানেক পরে কাজ একটু কমে এল তার। যা চাষ হয়েছে এখন তাকে বাঁচানোই সবচেয়ে বড় কাজ। পোকা মারা, আগাছা বাছা, জল নিকাশের পথটা পরিষ্কার করা। জায়গাটাই সারের জমি, তবুও সে নানা রকম সার নিজে তৈরি করে।

এই অখণ্ড নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কোন কোন সময় সে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। হেমন্তের আকাশে থেকে থেকে সাদা মেঘ কেমন করে আকৃতি

বদলে ধীরে ধীরে উড়ে যায়, তাই দেখে তার সময় কেটে যায়। কখনও শালিকের ঝগড়া ও ঝুটোপুটি খেলা দেখে হেসে ওঠে। পায়রার ঝাঁক উড়ে আসে, ধাপার মাঠের পোকার লোভে আসে বকের দল। কাঠবেড়ালি এলে তাড়া করে, ওরা কচি পাতা পেলেই সাবড়ে দেয়।

রোজ ভোরবেলা ওই পিটুলি গাছটায় অসংখ্য পাখির কাকলীতে আগে তার ভারী বেজার লাগত। ভেবেছিল ওটার ডালপালাগুলো কেটে দেবে, যাতে আর পাখি বসতে না পায়। পরে সে পাখিদের এ দাবিটা মেনে নিয়েছে।

সকালবেলায় পশ্চিমের ময়লা-বিশুদ্ধির যন্ত্রটার ওদিকে কিছু কথাবার্তা শোনা যায়, কোন-কোন সময় পুবের মাঠ থেকে ভেসে আসে হাঁকডাকের শব্দ, গোরু-বাছুরের হাম্বা রব। তার ছোট ঘরটাকে কাঁপিয়ে এবেলা ওবেলা যায় অনেকগুলো রেলগাড়ি। তার এ জনহীন প্রান্তরে আগে এ সব বিরক্তির কারণ হলেও এখন আর তার তেমন কোন কৌতূহল নেই, এ সব কানেও তেমন যায় না।

এর মধ্যে বার দু-তিনেক দীনদয়াল এসেছিল। কিন্তু নারাণ এমন ভাবে কোন কথার জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকত যে, দীনদয়ালের বিস্ময় আর বিরক্তির সীমা থাকত না। তবু কিছু বলত না, কারণ, সত্যি একলা মানুষটা কি করে মাটির বুক এত সম্ভারে পরিপূর্ণ করে তুলেছে ভাবতেও অবাক লাগে। নারাণের মাথাটা খারাপ বলে সে ধরে নেয়। কিন্তু লোকটার আগমনে নারাণের বিরক্তি আরও বাড়ে।

প্রায় রোজই একটা হলদে কুকুর কোত্থেকে সকালবেলা এসে তার গা শুঁকতে আরম্ভ করে, খেলার ভঙ্গি করে, ছুটে দাওয়ায় ওঠে। রাগে তার সর্বাঙ্গ জ্বলে যায়। মারলে ধরলেও আবার ঠিক আসে।

গৃহস্থের কোন পোষমানা প্রাণীও এখানে তার অসহ্য লাগে।

শুধু মনটা নয়, চেহারাটাও নারাণের কেমন বদলে গেছে। মুখটা যেন ভাবলেশহীন বোবার মত, সমস্ত নৈঃশব্দ্য যেন সেখানে এঁটে বসেছে। সে নিজে একটি কথাও বলে না, এমন কি একটু গুনগুনও পর্যন্ত করে না। তবু এ মাঠ ও আকাশের সঙ্গে যেন তার একটা নিয়ত বিচিত্র ধারার বিনিময় চলেছে, তার কোন শব্দ নেই।

কেবল ভর দুপুরবেলা যখন মাঠ ও আকাশ কেমন ঝিম মেরে থাকে তখন ওই আকাশের বুক থেকে চিলের তীক্ষ্ম চিঁ-চিঁ আর্তস্বরে বুকের মধ্যে কেমন ধক করে ওঠে। মনে হয় যেন কোন শিশু মৃত্যুযন্ত্রণায় চিৎকার করছে।

এমনি রাতেও যখন কোন পাখি বিলম্বিত সুরে ডেকে ওঠে, তার বুকের মধ্যে যেন দম আটকে আসে। মনে হয়, বুঝি কোন বউ কাঁদছে ক্ষুধা ও রাগের যন্ত্রণায়। তখন সে একটা নিশাচর প্রেতের মত সারা মাঠে প্রায় দাপাদাপি করে ফেরে। মাঠটা যেন তাকে গিলতে আসে।

এই সঙ্গেই কতগুলো ছবি পর-পর তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তার ফেলে আসা জীবন, তার পরিবেশ, সে জীবনের ঝড়ো বেগ, তার কলকোলাহল, তার কাজের উদ্দামতা। এক কথায় একটা বন্যার পাগলামি।

কিন্তু আবার তার মনটা ঠাণ্ডা হয়ে আসে। সে নতুন করে সীম, লাউয়ের মাচা বাঁধতে আরম্ভ করে, তে-কোণ জমিটাকে তৈরি করে মটরশুঁটির জন্য।

হেমন্ত গিয়ে শীত এসে পড়ে।

পাতাল থেকে কচি শিশুর মুখের মত যেন একটু-একটু করে ফুলকপি তার পাতার আড়াল মেলে দেয়। বড়-বড় নধর বেগুন উঁকি দেয় বড়-বড় পাতার আড়াল থেকে। অনুক্ষণ সতর্ক থাকতে হয় ইঁদুর আর বেজীর জন্য। সোনার মত গাজরগুলোর জন্যে ওদের নোলা ছোঁক-ছোঁক করে।

তারপর কাজের শেষে সেই আকাশের মুখোমুখি বসে থাকা, এই প্রকৃতিরই একজনের মত মিশে যাওয়া। এ কি জীবনের গা মেলে দেওয়া, শূন্যের মাঝে হারিয়ে যাওয়া বোঝা যায় না।

আরও একটা মাস কেটে গেল।

এমনি একদিন সকালবেলা বাঁধাকপির গোড়াগুলোতে সে মাটি তুলে দিচ্ছে। এমন সময় দেখল, ধাপা ও ধানক্ষেতের সীমানায়, যেখানটায় খাদ খুব সরু এবং ঝোপঝাড়শূন্য খানিকটা ফাঁকা সেখান দিয়ে একটা মেয়েমানুষ কোলে একটা বছর দু-তিনেকের বাচ্চা ও মাথায় একটা শাকের চুবড়ি নিয়ে লাফ দিয়ে তার সীমানায় এসে পড়ল। নারাণের মনে হল, লাফটা যেন তার বুকেই পড়েছে। অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ চোখে সে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

মেয়েমানুষটি নারাণকে দেখতেই পায় নি। সে তার কালো শক্ত পুষ্ট শরীরে দৃঢ় পদক্ষেপে ডাগর-ডাগর চোখে কিছুটা বিস্ময় কিছুটা কৌতূহল ও সংকোচ নিয়ে সোজা নারাণের উঠোনে গিয়ে প্রথমে ছেলেটাকে নামাল, তারপর শাকের চুবড়িটা। সেয়ানা বয়স, কপালে সিঁদুর নেই। সে কয়েকবার উঁকি-ঝুঁকি দিল, ভ্রূ টেনে আপন মনে বুঝি একটু হাসল, তারপর এই মাঠের সমস্ত নৈঃশব্দ্যকে যেন মুহূর্তে ঝংকৃত করে তার সরু মিষ্টি গলায় ডেকে উঠল, 'কই গো, কেউ নাই নাকি ?'

সে শব্দে যেন মাঠটা হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে উঠল।

নারাণ তো ক্ষেপে বারুদ। দীনদয়ালই যেখানে পাত্তা পায় না সেখানে কিনা একটা মেয়েমানুষ, একেবারে বাচ্চা নিয়ে! সে রাগে খ্যাঁকখ্যাঁক করতে-করতে একেবারে হামলে পড়ল এসে, 'কেন, কেন ? কাউকে দিয়ে তোমার কি দরকার ?'

খ্যাঁকানি শুনে বাচ্চাটা চমকে মাকে জাপটে ধরল। মেয়েটিও একেবারে ভড়কে গিয়ে প্রায় ডুকরে উঠল, 'ও মা! এ কেমন মিনসে গো বাবা!'

নারাণও যেন স্বপ্নের ঘোরে এক যুগ পরে নিজের গলার স্বরে চমকে গেল। তবুও খিঁচিয়ে উঠল, 'যেমন হই। তোমার দরকারটা কি ?'

কিন্তু সেই ডাগর চোখে ও মিঠে গলায় ভয় ফুটল না যেন তেমন। বলল, 'দরকার আবার কি, বাজারে যাব এট্টু শাক-মাক বেচতে, এখান দিয়ে অল্পে হুস করে যাওয়া যায়, তাই।'

কর্কশ গলায় ভেংচে উঠল নারাণ, 'আর হুস করে যায় না, ওই ঘুর পথেই এট্টু ঠায়ে যেও।'

মেয়েটি ভ্রূ তুলে বাঁকা চোখে এক মুহূর্ত নারাণকে দেখে, এক হ্যাঁচকায় চুবড়িটা মাথায় তুলে সটান হয়ে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'এ ঘরে একদিন আমিই ছিলুম, ছিলুম আমার সোয়ামীর সঙ্গে। তার আবার অত কথা কি? মানুষটা মল, তাই, নইলে···' মনে হল ওর গলার স্বরটা যেন ভেঙে আসছে, 'এখন শাক, ঢেরোশ বেচে খাই···'

'থাক।' চেঁচিয়ে উঠল নারাণ, 'এখন পথ দেখ। শালা যত ঝুট ঝামেলা···।'

মেয়েটি আর একবার তার ভেজা চোখে নারাণের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হেনে ছেলে কোলে নিযে ফরফর করে চলে গেল পশ্চিমে।

নারাণের গায়ে যেন বিষ ছড়িয়ে দিয়েছে ওই আপদটা, এমনি করে গা ঝাড়তে লাগল সে। মনে হল তার সমস্ত মাঠটা যেন লণ্ডভণ্ড করে দিযেছে একেবারে, এমনি ভাবে সে ঘুরে-ঘুরে তার বেগুন, কপি দেখতে থাকে। দীর্ঘ দিন পরে তার নিঝুম শান্তিকে ছরকুটে দিয়ে গেল মেযেমানুষটা।

কিন্তু একটু পরেই আবার তার সে প্রশান্তি নেমে এল, নিস্তরঙ্গ হযে এল সমস্ত কিছু। দিনের শেষে সন্ধ্যা আকাশ নেমে এল হাতের কাছে। আর মৌন সন্ধ্যায রোজক র সেই বিট্‌লে পাখিটা ডিগবাজি খেযে ডেকে হেঁকে চলে গেল। ঝরে পড়ল পিটুলির পাতা।

আশ্চর্য! পরদিনও সকালে মেয়েটা এল এবং পূবপ্রান্তে সীমের মাচার কাছেই একেবারে নারাণের মুখোমুখি দেখা। আর যায় কোথায়। নারাণ খ্যাঁক করে উঠল, 'ফের?'

মেযেটাব চোখে প্রায হাসিই ফুটে ওঠে বুঝি। বলে, 'এই মবেছে। তা চটো কেন?'

নারাণ আরও জোরে চেঁচিয়ে উঠল, 'চটি কেন?'

ছেলেটা মায়ের কোলে কুঁকড়ে যায়। মেয়েটাও হাঁপায। পথের আলে শিশিরে ভেজা পা দুখানি ধুযে গিযেছে। মুখ চোখও যেন ভেজা ভেজা। গায়ে জামা নেই, শাড়িটাই জড়ানো। তাতেই যেটুকু শীত মানে। গলায আবার একটা পেতলের হার। বলে, 'তা অতটা ঘুরে যাওয়ার চেয়ে—'

'সবাই যায়।' ধমকে ওঠে নারাণ।

'তা বলে আমিও যাব?' ভ্রূ তুলে কথাটা বলেই ছেলেকে নামিয়ে, মাথার বোঝাটা নামায়। কোমরে হাত দিয়ে বলে, 'বাব্বা। কম পথ? কোমর ধরে

যায়। পথে একটু জিরনোও হয়। আর···এলে পরে এখানটায় না এলে মনটা কেমন করে।'

নারাণের বুকের মধ্যে কেমন যেন ধক-ধক করে। যেমন চিলের ডাকে করে ওঠে। কার কথা যেন তার বারবারই মনে আসতে থাকে আর রাগে বিরক্তিতে তার মেজাজ চড়ে যায়।

মেয়েটা বলেই চলে, 'তা-পরে জানো, মিনসেটা ভারী বোকা ছেল। পশ্চিমে দিলে উনুনের জায়গা করে। তা সে বোশেখী রাত ঝড় জল মানবে কেন? আবার আমি উত্তুরে উনুন পাতি, তবে না তুমি ওখানে খুন্তি নাড়তে পারো। তা তোমার বুঝি বউ-টউ—'

'দুত্তেরি তোর বউয়ের নিকুচি করেছে!' রাগে চিৎকার করে ওঠে নারাণ, তুমি ভাগবে কি না। শালা যত আপদ এসে জুটবে এখানে।'

অমনি মেয়েটার চোখে-মুখেও রাগ ফুটে ওঠে। বলে, 'অমন মানুসের মুখ দেখতে নেই।' বলে সে ছেলে আর চুপড়ি নিয়ে ফরফর করে চলে যায়। খানিকটা গিয়ে কুঁদুলে মেয়েমানুষের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, 'আমি রোজ যাব, দেখি কি কর তুমি।'

নারাণের ইচ্ছে হল ছুটে গিয়ে ঠেঙিয়ে দেয়। কিন্তু যায় না।

সকালের ছড়ানো সোনার রোদ যেন কালো হয়ে ওঠে, মেয়েটার গোমড়া মুখের মত মাঠটার সমস্ত নীরবতা ও সৌন্দর্য যেন কোথায় উবে যায়। আজ এ মাঠের সঙ্গে মনটাকেও তার লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গিয়েছে, এমনিভাবে সে অনেকক্ষণ ছটফট করে ঘোরে। শহরের সেই ঘুপচি ঘরটায় একপাল ছেলেমেয়ে আর একটি বউয়ের কথা বারবার তার মনে আসে আর বলে, 'ভ্যালা আপদ এসে জুটেছে। উকের জ্বালায় পালিয়ে এলুম, তেঁতুলতলায় বাস। শালার দুনিয়ায় কি কোথাও শান্তি নেই?'

কিন্তু একটু পরেই আবার তার শান্তি নেমে আসে। সীমাহীন নৈঃশব্দের মাঝে আবার নিজেকে হারিয়ে ফেলে, নিজেকে ছড়িয়ে দেয় সারা মাঠে। দাঁড়ায় আকাশের মুখোমুখি, চুপচাপ রাঁধে খায়। পিটুলি ঝরা পাতাগুলো তুলে রাখে। গাছটা ন্যাড়া হয়ে যাচ্ছে।

পুবের দিগন্তবিস্তৃত মাঠটা ফাকা, ধান কাটা হয়ে গিয়েছে। সেখানে আর কাউকে দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে অনেক ফুলকপি আর বেগুন নিয়ে গিয়েছে দীনদয়ালের লোক। নারাণ যেন কোলের শিশুকে দেওয়ার মত করে সেগুলো ছড়িয়ে দিয়েছে। আবার সেখানে ভরে দিয়েছে নটে পালং।

এ মাঠের কোথাও শস্যহীন শূন্য থাকবে এটা যেন সে ভাবতেই পারে না। শরতের শুঁয়োপোকার রুদ্ধশ্বাস বেদনার ভেতর দিয়ে আদায় করেছে নবজন্ম। নতুন পালকে তারা প্রজাপতি হয়ে ভিড় করেছে সীম-লাউয়ের মাচায়।

মৌন রাতের তারাভরা আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবে নারাণ, সে ফুলের বাগান করবে এখানে। অজস্র সাদা আর লাল ফুল। তারপর তার ঘুমন্ত চোখের পাতায় কারা এসে যেন নাচানাচি করে। কয়েকটি শিশু, একটি সলজ্জ হাসিমুখ, ঢাক, ঢোল, কাঁসি, বিয়ে, কারখানা, বস্তি, মৃত্যু আর শ্মশানের চিতার লেলিহান শিখা।

পরদিন সকালবেলা মেয়েটি আবার এল এবং রোজই আসতে থাকে। আর রোজই চলে সেই চেঁচামেচি, খেঁচাখেঁচি। যত না খিঁচোয় নারাণ, তত জবাব দেয় মেয়েটা। মেয়েটি এ ধাপার মাঠে কিছুতেই তার অধিকারকে ক্ষুণ্ন হতে দেবে না। আর নারাণের পক্ষে এ ঝামেলা প্রাণান্তকর।

কিন্তু মেয়েটির ভাব দেখে এখন মনে হয়, নারাণের তর্জন গর্জনকে সে যেন তেমন আমলই দিতে চায় না। শুনুক, বা নাই শুনুক, সে নিত্য নতুন প্রসঙ্গ পেড়ে বসে। কোন দিন বলে, 'তা-পরে জানো, একে বর্ষার রাত, তায় ধাপা, মিনসে আর রাতে ফিরল না। আমি তো ব্যথায় উলটি পালটি খাচ্ছি। ভোর রাতে বিয়োলুম এ ছেলে। তাই না এর নাম রেখেছি 'ধাপা'। ও যে ধাপার ছেলে।'

কোন দিন বা কুকুরটাকে দেখিয়ে বলে, 'গাঁয়ের থেকে নিয়ে এসেছিল মিনসে, এই এতটুকুন। নাম ওর রাঙা।' আর কুকুরটারও আজকাল আস বেড়ে গিয়েছে। ধাপা আর তার মায়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে খেলা করে। মেয়েটি সারা মাঠে চোখ বুলোয় আর বলে, 'তা বাপু সত্যি, তুমি একটা মিনসে বটে। একলাই যা ফলিয়েছ, চারজনে তা পারে না।'

তারপর একটু বা উৎকণ্ঠাভরেই বলে, 'এ তোমার কি ভুতুড়ে বাই বাপু, ঠাণ্ডার মধ্যে খালি গায়ে কাজ কর। একটা কিছু জড়িয়ে নিতে পারো না।'

ধাপার ভয়টাও আজকাল কমে গিয়েছে। সে বেমালুম টলতে-টলতে গিয়ে কখনও নারাণের ঘরে ঢুকে পড়ে, কিংবা বড়-বড় রক্তহীরের মত বিলাতি বেগুন-গুলো ছিঁড়তে যায়।

অমনি নারাণ তেড়ে গিয়ে শক্ত হাতে ছেলেটাকে আছাড় দিতে গিয়েও না দিয়ে ওর মায়ের কোলের কাছে বসিয়ে দিয়ে যায়, আর গালাগালি দিতে থাকে।

তাই দেখে মেয়েটি খিলখিল করে হেসে ওঠে। হাসিতে এ নির্জন প্রান্তর যেন শিউরে ওঠে আচমকা। ফেরাত পথেও এখানে হয়ে যায়। আপন মনেই বলে, 'সেই কখন বেরিয়েছি। দুকুরে দুটো মুড়ি খেয়েছি, এখন গিয়ে রাঁধব, তবে খাব। মোড়লের বাড়িতে ধান ভানা থাকলে তো কথাই নেই। সেই রাত দু-পহরে খাওয়া।'

তারপর পিটুলি তলায় শুকনো পাতার উপর ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে এলো চুল আঁট করে বাঁধে। ঘুমন্ত ধাপাকে হয়তো মাটিতেই শুইয়ে দেয়। তখন যেন তারও নীরব হওয়ার পালা আসে। নারাণের বিরক্তি-রাগকে তুচ্ছ করে হঠাৎ মিহি ভরাট

গলায় বলে ওঠে, 'আর পারি নে এ জীবনের ভার বইতে। মনে হয় এখেনে··· এমনি করে সারাটা রাত কাটিয়ে দিই। এই এখেনে···'

তারপর হঠাৎ নারাণের কাছে ঝুঁকে পড়ে ফিসফিস করে বলে, 'তা বাপু বলে রাখি, এ ধাপার ব্যামো বড় বিদ্‌ঘুটে। কেমন হাত পায়ের শির টেনে, বেঁকে দুমড়ে মানুষ মরে যায়।' এক মুহূর্ত যেন সে মৃত্যুকে দেখে হুতোশে বলে ওঠে, 'এট্টো সাবধানে থেকো বাপু।'

নারাণের মনে হয় কে যেন তার শ্বাসনলিটা চেপে ধরেছে। মেয়েটির গরম নিশ্বাস আর বিচিত্র ছবি ও কথার গোলমালে তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। সে হঠাৎ তেপান্তর কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠে, 'যাও যাও···যাও এখান থেকে!'

ধাপার মা চমকে ওঠে, 'আ মলো! এটা কে রে!'···বলে তাড়াতাড়ি ধানকাটা মাঠের ওপর দিয়ে চলে যায়। উত্তরের হিমেল চাপ ঠেলে হুস করে বা একটু দক্ষিণে হাওয়া আসে। পিটুলির পাতা উড়িয়ে, লাউ-সীমের মাচা সরসরিয়ে, নটে-পালং এর মাথা দুলিয়ে দিয়ে যায়।

'তালা কারীগরী' আর 'স্বাধীন ব্যবসার' বই খোলাই থাকে কোলের উপর। প্রদীপের শিখা পুড়তেই থাকে। অসীম রাত্রি আর মহাকাশ, মাঠ আর ঘর সব একাকার হয়ে যায়। সংসার নিশ্চল, নিঃশব্দ। এই ভাল, এই শান্তি।

তবু, ধাপার মা-ই বল, আর মেয়েই বল, সে রোজই যায় আর আসে। সেও যেন দক্ষিণ হাওয়ার মত একটু-একটু করে উত্তরে চাপ ঠেলে আসছে। রোজ যেন একটা নতুন উপসর্গের মত।

হয়তো ঠাট্টা করে বলেই ফেলে, 'আজকের রাতটা থেকেই যাব।' কিংবা 'তা-পরে জানো, তোমাকে এ ধাপায় দেখে আমার ভারী ভাল লাগে। তবে মানুষটা তুমি ঠিক নও।'

পুঁচকে ধাপাটাও কখন নিঃসাড়ে এসে কৌতূহল বশতঃ নারাণের পায়ের লোম ধরে টান দেয়।

নারাণ দাঁত খিঁচিয়ে ভাবল, শালা তেল দেও, সিঁদুর দেও, ভাব ভোলবার নয়। আচ্ছা। রাত করেই সে খাদটা যেখানে খুবই সরু, সেখানে হাত পাঁচেক লম্বা একটা খুঁটির বেড়া করে দিল। তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমালো।

পরদিন মেয়েটি এসে বেড়া দেখে অবাক হয়ে গেল। যেন বিশ্বাসই করতে পারে নি, এমনি ভাবে বড় বড় চোখে মাঠের চারদিকে নারাণকে খুঁজতে লাগল।

নারাণ লাউমাচাটার পিছনেই কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল কিছু ধনে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্যে। জেনেও সে ফিরে দেখল না।

মেয়েটি বারকয়েক ডেকে-ডেকে চেষ্টা করল ছেলেটাকে বেড়া টপকে এপাশে দিতে। না পেরে আপন মনেই হেসে ফেলল। আবার খানিকটা ডাকাডাকি করেও যখন ফল হল না, তখন নারাণকে যা-তা বলে গালাগালি দিতে লাগল।

নারাণ লাউপাতার আড়াল থেকে দেখল, জলভরা দুই ডাগর চোখে মেয়েটা এদিকেই দেখছে কটমট করে, আর বলছে, 'ধাপার ভূত কমনেকার, ওকে যেন চেরকাল মাঠে মুখ দিয়েই পড়ে থাকতে হয়।'

তারপর সে ছেলে আর চুবড়ি নিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে হন হন করে চলে গেল ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে।

নারাণের মুখে হাসি ফুটে উঠল। সে ওদের চলার পথের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

অনেকক্ষণ পর নিজেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে নারাণ দেখল, বেলা অনেক হয়ে গিয়েছে, ধান কাটা মাঠটা ফাঁকা।

যাক! যেন একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে সে নিজের কাজে মন দিল। সেই একই কাজ, একই রকম। কেবল নৈঃশব্দ্য যেন আরও ভারী হয়ে এল।

পরদিন নারাণ কাজে হাত দিতে যায় আর চমকে-চমকে ওঠে। চোখ দুটো বার-বার গিয়ে পড়ে বেড়ার গায়ে। ধেনো মাঠটা দুলে ওঠে চোখের সামনে। তাকিয়ে দেখে বেলা কোন্‌খান দিয়ে চলে যাচ্ছে, অথচ কাজ কিছুই হয় নি।

হঠাৎ হাওয়া আসে হু হু করে। পিটুলি গাছটায় আর একটাও পাতা নেই। রুক্ষ, রিক্ত।

মাঠটাও কেমন ছন্নছাড়া হয়ে গিয়েছে। দীনদয়ালের লোক এসে রোজই শাক, তরকারি, সীম, লাউ নিয়ে যায় বাজারে। এই নিয়ম- যত ফলন, তত বিক্রি।

রাত্রি আর আঁধার যেন বড় তাড়াতাড়ি নেমে এসে সব কিছু গ্রাস করে ফেলে। কেবল বোবা রাত্রির চোখে ঘুম নেই।

পরদিনও কাজের মাঝেই দিন কেটে যায়। মরশুম শেষ। মাঠ খালি হয়ে আসছে। কেবল অসহ্য যন্ত্রণাভরা একটা পরীক্ষার মধ্যে প্রাণটা দুমড়ে যেতে থাকে। ওই বেড়াটা যেন মাথার মধ্যে খাঁচার মত ঘুরতে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা নারাণ নিঃসাড়ে গিয়ে বেড়াটাকে কেটে ভেঙে খুলে ফেলে দিল। দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে আবার শুয়ে পড়ল। যেন লুকিয়ে-চুরিয়ে সে একটা বন্দী-শালার দরজা ভেঙে দিয়ে এসেছে। এসে নিশ্চিন্ত হয়েছে।

পরদিন পলে-পলে বেলা গেল। খাদের ধারে বেড়াহীন কুল-খেজুরের ফাঁকা জায়গাটা যেন খাঁ-খাঁ করতে লাগল। নিঃশব্দ, শূন্য। কেবল কুল-খেজুরের মাথা দুলল হাওয়ায়। নারাণের চোখ দুটো টনটন করে উঠল। তবু কেউ এল না সেখানে চোখ জুড়োতে।

তেপান্তরের রাত্রি যেন দু হাতে জাপটে ধরল নারাণকে। অসহ্য ছটফটানিতে একটা বোবা পশুর মত সে অন্ধকারে মাঠ আর ঘর করে বেড়ালো।

তার পরদিন দূর আকাশে লেপটানো চিমনির দিকে তাকিয়ে সে স্থির করে ফেলল, শহরে যাবে। শহরে…তার বন্ধু আর পড়শীদের কাছে।

তাড়াতাড়ি একটা চুবড়ি নিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটা ফুলকপি থেকে একটা তুলে নিল। একটা বাঁধাকপি, কয়েক সের বেগুন, মটরশুঁটি, কিছু সীম, একটা কচি লাউ, কিছু নটে পালং।

তারপর স্নান করে, কাপড় পরে, ধোয়া জামাটি গায়ে দিয়ে, মাথায় গামছা জড়িয়ে ঘরে শিকল তুলে দিল। তরকারির চুবড়িটা মাথায় নিয়ে উঠোনে এক মুহূর্ত ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে একেবারে পুবের খাদের মুখে গিয়ে দাঁড়াল।

কিন্তু শহর যে পশ্চিমে। তা হোক।

ধাপার মা যেমন করে লাফ দিয়ে এপারে পড়ত, তেমনি করে মাথায় বোঝা নিয়ে নারাণ ওপারে লাফ দিয়ে পড়ে একেবারে সিঁটিয়ে গেল। মনে হল, কে যেন হেসে উঠল তার পেছনে। সন্তর্পণে চোখ ঘুরিয়ে এদিকে ওদিকে দেখল,—কেউ নেই।

দেখে সে হনহন করে ধান কাটা মাঠের উপর দিয়ে চলল দূরের ওই গাঁয়ের রেখাটার দিকে। গাঁয়ে যখন পৌঁছুল, তখন অনেক বেলা। ভাবল, কি করে ধাপার মা যেত এত পথ—? কিন্তু কোথায় বা তার ঘর, গায়ের কোন্ সীমানায়? অনেক ঘোরাঘুরির পর এক কিষাণ দেখিয়ে দিল, গাঁয়ের বাইরে মাঠের ধারে ধাপার মায়ের ঘর। নারাণ দেখল ঘর তো নয়! উঁচু ভিটের একটা বিচুলির ছাউনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। উঠোনের খুঁটোয় একটা রোগা ছাগল বাঁধা। ক'টা পায়রা যেন কি খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে। আর ধাপা, কালো ন্যাংটা ছেলেটা পায়রাগুলোর সঙ্গে আবোল তাবোল বকছে।

কিন্তু নারাণকে দেখেই তার চক্ষু চড়কগাছ। সে টলতে-টলতে 'হে মা হেই মা' করতে-করতে ঘরে ঢুকে কি একটা কথা বার-বার বলতে লাগল।

তার মায়ের ভারী গলা শোনা গেল, 'কে রে?'

নারাণ একেবারে দরজার কাছে এসে মাথার চুবড়িটা নামিয়ে একটু হাসতে চেষ্টা করল। মেয়েটার দিকে একবার চোখ পড়তেই বলে ফেলল, 'এলুম।'

ধাপার মা কাঁথা ঢাকা দিয়ে শুয়ে ছিল। এক মুহূর্ত নারাণের মুখের দিকে দেখে ঝাজ দিয়ে বলল, 'আদিখ্যেতা! কে বা আসতে বলেছে!'

নারাণ চুবড়ি হাতায়, মাটি খোঁটে। খালি বলে, 'এসে পড়লাম।'

কি বলতে গিয়ে আটকে গেল ধাপার মা'র গলায়। তাড়াতাড়ি মুখটা ঢেকে ফেলে কাঁথার তলায়। কেবল কাঁথার সঙ্গে যেন শরীরটাও ফুলে-ফুলে ওঠে।

অনেকখানি সময়ে চলে যায়। ধাপা হা করে বসে-বসে দুজনকে দেখে।

হঠাৎ নারাণ জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে?'

জবাব আসে চাপা গলায়, 'জ্বর।'

'তা হলে—'

'থাক।' বাধা দেয় ধাপার মা। বলে, 'ও সব বারোমেসে, সেরে যায় আবার।'

আবার অনেকক্ষণ চুপচাপ।

থেকে-থেকে থাপ্‌চি কেটে-কেটে নারাণ বলে, 'এই···এট্টু সব্বজি! ধাপা খাবে। তা—তুমি··· ··আর তো তুমি যাও-টাও না······'

'থাক', রুদ্ধ গলায় কথাটা বলে মুখের ঢাকনাটা খুলতেই দেখা যায় মেয়েটার ডাগর-ডাগর জলভরা চোখ দুটো কান্নায় লাল হয়ে উঠেছে। বলে কান্নাভরা গলায়, 'কেন ·····কেন? এমন শেয়াল কুকুরের মত তাড়ানোই বা কেন, আবার ' বলতে পারে না আর।

নারাণ বলল, তেমনি থেমে-থেমে, 'পারলুম না আর থাকতে।···চলে এলুম।'

তেমনি ফুঁপিয়ে বলে মেয়েটি, 'কেন—কেন এ আদিখ্যেতা?'

নারাণের ঠোঁট নড়ে, থুতনিটা কাঁপে। হঠাৎ ধাপাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে মোটা গলায় বলে ওঠে, 'ফাঁকা মাঠ ···· আর কেউ নেই। লোক নেই ·· জন নেই··· সাড়া শব্দ নেই শুধু ·শুধু ···' থেমে গিয়ে আবার বলে, 'কাঁহাতক পারা যায় বল?'

মেয়েটা মুখ ফিরিয়ে ফিসফিস করতে থাকে 'কে বলেছে পারতে · কে বলেছে?'

নারাণ তবু বলতে থাকে, 'আমি আমি যেন পালিয়ে আছি। হা শুধু মাঠ···ফাঁকা···'

বলতে বলতে একটা নিঃশব্দ অসহ্য গুমোট যন্ত্রণাকে ভেঙে চুরে, লেদ মেশিনের বিরাট পালিশ করা চাকা যেন বনবন করে তার চোখের সামনে ঘুরতে লাগল। যন্ত্রের ঘর্ ঘর্ শব্দে যেন চাপ পড়া প্রাণের অসীম নৈঃশব্দ্য ও বোবা নিস্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে হেসে উঠল। একটা বিচিত্র ঝোড়ো বেগে লোকজন, গাড়ি ঘোড়া, ধুলো ধোঁয়া, হাসি গান কান্না হল্লা তার লুকানো প্রাণটা উড়িয়ে নিয়ে গেল। সেখানে জীবনের ঝড়। বস্তি, বস্তি, মহল্লা অষ্টপ্রহর—কেবলই বাঁচতে চাওয়া।

নারাণ আপন মনেই বড়-বড় চোখে ফিসফিস করে উঠল, 'যাব, চলে যাব সেখানে।'

ধাপার মা গালে হাত দিয়ে বলল, 'কোথা?'

'শহরে··· ·কাজে।' বলে ধাপার মুখটা তুলে বলে, 'যাবি তো রে ধাপা?'

ধাপা জবাব দিল, 'মার সঙ্গে।'

ধাপার মা মুখ টিপে বলল, 'মরণ।' বলে চুবড়িটা টেনে নিল কোলের কাছে। বিচুলির ছাউনিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল হাওয়া।

আইন নেই

বাসকের ঝাড়টা যেখানে স্থানীবড় হয়ে ঘন অরণ্যের রূপ ধরেছে, সেখানে বড়-বড় গামিবল আর মুচকুন্দ চাঁপাগাছ কয়েকটার কোমর-ধরা ধুতুরার বন বিস্তৃত, সেখানেই ঝোপের একটা ফাঁকে লক্ষ্য করলে, খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে, সেই অপলক চোখ দুটি দেখা যায়। সেই রক্তাভ ছোট গোসাপের মত পলকহীন তীব্র চোখ দুটি। আর ঠিক তার একটু নিচেই প্রায় এক ইঞ্চি গোল লোহার নলটাও দেখা যেতে পারে। যে নলটার সরু গর্তের দূর অন্ধকারে যেন ভয়ংকর একটা কিছু লুকিয়ে আছে মনে হয়। যার লেলিহান জিহ্বা কয়েকবার নলের মুখটা লেহন করে পোড়া পাশুটে দাগ ধরিয়ে দিয়েছে।

আর হাল্কা হলেও বারুদের ঝাঁজালো গন্ধ যেন লেগে রয়েছে বাসক ও ধুতুরার লেপটালেপটি ঝাড়ে।

জায়গাটা একটি গ্রামের প্রায়-শেষ, আর মাঠের প্রায়-শুরু। পশ্চিমে আশে-পাশে আম-জাম-নারকেল ছাড়াও নানান গাছের ভিড়, আসসেওড়া-কালকাসুন্দি-বাসক-ধুতুরার জঙ্গল। কাছেই একটা পুকুর দক্ষিণ ঘেঁষে। আর পুবদিকে দিগ্‌বিসারি শস্যের ক্ষেত।

মাঘ মাস। বেলা এগারোটার রোদে এখনও সোনার আভাস। চকচকে নীল আকাশের তলায়, সুদূর দিকচক্রবালে গিয়ে ঠেকেছে রাবশস্যের সবুজ মাঠ। মুক্ত অবাধ একটি মাঠ যেন ঠিক স্বপ্নের মত দিগন্ত ছুঁয়ে পড়ে আছে। তবু কি একটা আশংকায় যেন তার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে, শিউরে সচকিত হয়ে উঠছে।

সূর্য ক্রমেই মাঝ-আকাশে উঠতে লাগল। ছায়া ক্রমেই ছোট হতে লাগল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড়ে সেই গোসাপের মত অপলক চোখে পলক পড়ল না। তীক্ষ্ণ হল আরও। আরও সতর্কভাবে চারিদিক ছুঁয়ে ছুঁয়ে এল। পোড়া পাশুটে অন্ধকার নলটা নিঃশব্দে রইল প্রতীক্ষা করে।

পুকুরে এসে মেয়েরা জল নিয়ে গেল। হেসে হেসে অনেক কথা বলে চান করে গেল। দুজন কিষাণ এসে দাঁড়াল বাসক-ঝাড়ের সেই নলটার মুখ বরাবর। কি যেন বলাবলি করল, তারপর চলে গেল মাঠের দিকে। একটু পরে সেখানে এসে দাঁড়াল একটি আদিবাসী যুবতী মেয়ে, কৃষিমজুরণী। তার পিছন-পিছন

একটি লোক। গলায় কণ্ঠি, গায়ে ফতুয়া। দোকানদার কিংবা মহাজন হবে।

মেয়েটার চোখে ভয়। ভয় চাপার হাসিটাও আছে ঠোঁটে। মেয়েটা সরে দাঁড়াল পথ ছেড়ে, বাসকের ঝাড়ে প্রায় নলটা ঘেঁষে। লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়ল। মেয়েটার মাথা নিচু। লোকটা চোখ দিয়ে যেন চাটছে ওর পুষ্ট শরীরটা। লোকটা বলল, কি হল্য, দাঁড়িয়ে পড়লি যে?

মেয়েটা ভীরু চোখে গ্রামের পথের দিকে দেখল তাকিয়ে। কেউ নেই। তবু সরোষেই বলল, তু যা না।

লোকটা লাল দাঁত বের করে হেসে বলল, আমি তো যাবই। তুই যে বাজারে যাচ্ছিলি? চল।

মেয়েটা তবু বলল, তু যা না কেনে?

আমি তোর সঙ্গেই যাব—বলে পকেট থেকে দুটি টাকা বের করল। বলল, নে, তেল কিনিস সাবান কিনিস। লাগলে আরও দেব'খনি···

ততক্ষণে মেয়েটা হনহন করে গ্রামে ঢোকার পথ ধরেছে।

লোকটাও পিছন নিতে গিয়ে থমকে গেল। চিৎকার করে ডাকল, এই এই রে, অই ছুঁড়ি, শোন না লো।

মেয়েটা প্রায় ছুটতে-ছুটতে গ্রামে ঢুকে গেল। লোকটা দাঁতে দাত ঘষে টাকা দুটি পকেটে রাখল। বলল, উঁহুঁ। ছুঁড়ির দেমাক দেখ্যে বাঁচি না। বলে, তোর মত কত এল, কত গেল। বলে ধুলো উড়্যে চলে গেল।

বাসক-ধুতুরার ঝাড় অনড়। রক্তাভ পলকহীন চোখ দুটি, চলে-যাওয়া লোকটার দিক থেকে মাঠের ওপর গিয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই একটি আমগাছের পাতা নড়ে উঠতেই চোখ দুটি সেদিকে গেল। দুটো ডাকপাখি উড়ে গেল। এক ঝাঁক শালিক উড়ে এসে বসল বাসক-ঝাড়টার কাছে। বসতে না বসতেই হঠাৎ যেন কি টের পেয়ে থমকে গেল সবাই। বোধ হয় বারুদের গন্ধটা টের পেল। কিংবা আগুনের ঝাপটা-খাওয়া মারণ-নলটা পেল দেখতে। চোখের নিমিষে উড়ে গেল সব। মুচকুন্দ চাঁপার মাথায় মরশুমের অগ্রিম কোকিল সবে একটা ডাক ছেড়েছিল। সেও পালিয়ে গেল। আবার নিস্তব্ধ ঝিঁঝির ডাক।

সূর্যটা টাল খেয়েছে পশ্চিমে। হঠাৎ অনেকগুলি ছোটবয়সী ছেলের চিৎকার শোনা গেল। চিৎকারটা গ্রামের ভিতর থেকে ছুটে আসছে এই দিকেই।

বাসকের ঝাড় এবার দুলে উঠল। সে চোখ দুটি নিয়ে একটা মুণ্ডু উঠে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে। আর নলের পিছনে, লোহার বাকা আংটায় মোটা তর্জনী বসেছে চেপে। নজর ওঠানামা করছে মাটিতে ও গাছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, একটা বক্‌নার পিছনে ছুটেছে একদল ছেলে। ছুটতে ছুটতে চলে গেল বাসকের ঝাড় ঘেঁষে।

ঝোপের ভিতর থেকে অপলক রক্তাভ চোখ আর নল দুই-ই বেরিয়ে এল এতক্ষণে। একটি লোক, হাতে গাদা-বন্দুক। চেহারা দেখে লোকটির বয়সের হিসাব পাওয়া দুরূহ। সেই সঙ্গে বন্দুকটারও।

এক রকমের লোক আছে, কখনও মোটা হয় না কিন্তু সুস্থ এবং শক্ত, লোকটিও সেই রকম। রোগা, লম্বা কিন্তু শক্ত। শুধু হাড়ের ওপর চামড়া মনে হলেও, সে হাড় চওড়া। এবড়ো-খেবড়ো একটি লম্বা কালো রঙের পাথরের মত শরীরের গা বেয়ে মোটা-মোটা স্ফীত শিরাগুলি হাত-পায়ে-কপালে যেন শিকড় ছড়িয়েছে। চেহারাটি তাতে রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর মনে হয়। মাথার চুল শক্ত খোঁচা-খোঁচা উস্কো-খুস্কো, তেল পড়ে নি বোধ হয় অনেক দিন। চোখ দুটি প্রায় গোল, ছোট। হয়তো রাত জাগতে হয়েছে, তাই লাল। লাল আর সাপের মত অপলক শুধু নয়। একটি তীক্ষ্ণ শ্বাপদ অনুসন্ধিৎসায় যেন সব সময় চকচক করছে। তার সঙ্গে খাপ খেয়ে গেছে তার চ্যাপ্টা নাক আর স্ফীত পাটা। যেন পাটা ফুলিয়ে সব সময়েই কিছু শুঁকে বেড়াচ্ছে।

এক মুখ খোঁচা-খোঁচা দাড়ির সঙ্গে হাতা-ছেঁড়া হাফশার্ট। সেইটি যেমন তেলাচটে, তার ওপরে মান্ধাতার আমলের একটি বগল-কাটা সোয়েটারও তেমনি। তেলাচটে তো বটেই, রঙটা যে কিসের বোঝবার সাধ্য নেই। ময়লা কাপড়টা হাঁটুর কাছাকাছি উঠেছে। কোমরে অন্ততঃ গুটি দুয়েক মাঝারি পুঁটলি ঝুলছে। তার ওপর দিয়ে একখানি শুকনো গামছা জড়ানো।

বন্দুকের বাঁটের কাঠের একটি কোণ ভাঙা। ব্যারেল অর্থাৎ নলটিতে মরচে পড়া দাগ দেখা যায়। একটি পাটের দড়ি দিয়ে কাঁধে ঝোলাবার বেল্টের অভাব মেটানো হয়েছে।

ঝোপের বাইরে এসে প্রথমে তার লক্ষ্য পড়ল, গামছায় পিঁপড়ে ধরেছে। লাল-ডোল বিষাক্ত পিঁপড়ে। বোধ হয় কামড়েছেও কয়েকটা। মুখের বিরক্তি ও যন্ত্রণা দেখে তাই মনে হয়। তাড়াতাড়ি গামছা খুলে, কোমর থেকে একটি ছোট পুঁটলি বার করলে। বলল, উরে শালা।

ওই পুঁটলিতেই পিঁপড়ে ধরে আছে। পুঁটলি ঝাড়া দিল। একটা উৎকট পচা দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

আবার বলল মোটা ঠোঁট কুঁচকে, বড় নোলা না?

হবারই কথা। কারণ, ও রকম গন্ধজাত কোন দ্রব্যে পিঁপড়েদের একচেটিয়া অধিকার মানবজাতি মেনেই এসেছে। এক্ষেত্রে অবশ্য অনধিকার চর্চাটাই ধরা পড়েছে, নইলে এ রকম টিপে টিপে পিঁপড়েগুলিকে মারবে কেন লোকটি?

পিঁপড়েগুলি মেরে পুঁটলিটা আবার সযত্নে কোমরে গুঁজল সে। দেখা গেল পুঁটলি দুটি নয়, তিনটি। একটি বেশ বড়। সেটি কোমরে ঝুলছে। আসলে দড়ি দিয়ে ঝোলানো আছে কাঁধে, যে কাঁধে দড়িতে ঝোলানো আছে বন্দুকটা।

আর একটি ছোট পুঁটলিতে হাত ঢুকিয়ে, একমুঠো চিঁড়ে বার করে মুখে ফেলল লোকটা। আবার পুঁটলি হাতড়ে ছোট এক টুকরো পাটালি গুড় তুলে কামড়ে নিল একটুখানি।

তারপর চিঁড়ে চিবোতে-চিবোতে চারপাশে বারকয়েক তীক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসু চোখে তাকাল। মাঠের দিকে গিয়ে, এইভাবে চারদিক দেখতে-দেখতে খানিকক্ষণ চিঁড়ে চিবিয়ে নিল পাটালির টাকনা দিয়ে। আপন মনেই বলল, গেল কই?

তারপর এগিয়ে গেল সোজা দক্ষিণ দিকে। ওই রকম সতর্ক তীক্ষ্ম নজরে দেখতে-দেখতে, লম্বা-লম্বা ঠ্যাং ফেলে চলল।

পথে লোক প্রায় নেই। এই সময়টাই পাড়াগাঁয়ের ঠিক দুপুর। সূর্য বেশ খানিকটা হেলে পশ্চিমে। অচেনা দু একজন যারা দেখল, তারা তাকিয়ে রইল হাঁ করে। আধাচেনারা বলল, সেই লোকটা না?

একজন চাষী গোরু নিয়ে ফেরবার পথে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলে, পাওয়া গেল?

জবাব দিল বন্দুকওয়ালা, উঁহুঁ।

চাষী বলল, শুনলাম আমোদগঞ্জের দিকে বড় দল নাকি এট্টা দেখা গেছে।

গেছে?

শুনলাম।

বন্দুকধারী মাঠের ওপর দিয়ে এবার ফিরে তাকাল পূর্বদিকে। যেন তিন ক্রোশ দূরের আমোদগঞ্জকে দেখে নিল। তারপর একটা হুঁ দিয়ে এগুলো আবার।

চাষীটা অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল লোকটার দিকে, যেন পাগল দেখছে। দেড় মাইল পথ হেঁটে লোকটি মোটরবাসের পথের ধারে হাটের পিছনে একটা মান্ধাতার আমলের একতলা বাড়ির সামনে এসে দাড়াল। দরজার সামনে অশোকস্তম্ভ আঁকা সাইনবোর্ড ঝুলছে। লেখা আছে, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি-বিভাগ, মহকুমা অফিস।" ছোট-ছোট হরফে আরও যা লেখা রয়েছে, তার মূল কথা হল, সর্বপ্রকার উৎকৃষ্ট বীজ ও কৃষি-বিষয়ের সাহায্য এখানে পাওয়া যাবে।

লোকটা উঁকিঝুঁকি মেরে ঘরে ঢুকল। কেউ নেই, অফিস ফাঁকা। টেবিল চেয়ার আলমারি সবই আছে। পলেস্তারা-খসা দেয়ালে নানা চারা আর বীজের ছবি টাঙানো। কৃষি উপদেশাবলী লেখা ছাপানো পোস্টার।

বন্দুকধারী ডাকল, ছোটবাবু?

পাশের ঘর থেকে জবাব এল, কে?

বলতে-বলতেই মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক এলেন। পরনে কোটপ্যান্ট। ময়লা হলেও পাড়াগাঁয়ের পক্ষে ওতেই অনেকখানি সাহেবিয়ানা হয়েছে। এসেই মুখটা বিকৃত করলেন। বললেন, এই যে, এসেছ বাবা কুতুবলাল?

এতক্ষণে বোঝা গেল, লোকটার গলার স্বর অসম্ভব মোটা। দৃষ্টির তীক্ষ্মতা নেই, কিন্তু পলক কখনই পড়ে না। শুকনো গালে যে কয়টি ভাঁজ পড়ল আর

বড়-বড় কয়েকটি খোঁচা দাঁত দেখা গেল, তাকে বোধ হয় হাসিই বলা যায়। বলল, এঁজ্ঞে, কুতুবনাল নয়, কুঁচনাল। মানে, কুঁচফল আছে না? কুঁচ? নাল কুঁচ—

ভদ্রলোক থমকে উঠলেন, আর থাক, ওই হল। কিন্তু কোন্ নিশ্চিন্দিপুরে ছিলে সারাদিন?

তেমনি মোটা স্বরে, প্রায় যেন গুঙিয়ে-গুঙিয়ে বলল কুঁচলাল, এঁজ্ঞে, নিশ্চিন্দপুরে নয়। বন্দাগাঁয়ে শুনলাম একদল এয়েছিল। তাই সাঁইপাড়ার জঙ্গলে—

বুঝেছি।

ছোটবাবুর খিঁচুনি আর বন্ধ হয় না, বললেন, ওদিকে ওমরাহ্‌পুর থেকে সংবাদ এসেছে—বিশ বিঘা জমির যাবৎ ছোলা আর মটরের চিহ্নও নেই। ওখানকার লোকেরা বলে গেল, বিরাট একদল গোটা ওমরাহ্‌পুর, আমোদগঞ্জ, শেরপাড়া সুদ্ধু এদিকে উত্তরে বন্দাগাঁ, দক্ষিণে নাজনা পর্যন্ত পাক দিয়ে ঘিরেছে। যে কোন সময়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সবাই লাঠিসোটা নিয়ে তৈরি হয়ে আছে—

ছোটবাবুর কথার মাঝেই কুঁচলালের লাল চোখ দুটি আরও গোল হয়ে উঠল। তার মোটা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে প্রায় ঝরে পড়ল, নাজনা?

হ্যাঁ, নাজনা। সব লাঠিসোটা দা কুড়ুল নিয়ে—বলতে-বলতে থেমে গেলেন ছোটবাবু, আর সহসা একটা কুটিল সন্দেহে তার চোখ দুটি কুঁচকে উঠল। কুঁচলালকে একবার খুঁটিয়ে দেখে বললেন নাজনা তোমার গ্রাম, না?

এঁজ্ঞে।

সেইজন্যে টনক নড়েছে, না?

এঁজ্ঞে।

তোমার মুণ্ডু। ছোটবাবু খ্যাকখ্যাক করেই বললেন, নিজের গাঁয়ের নাম শুনেছ, অমনি টনক নড়েছে। এতগুলো গাঁয়ের যে নাম করলাম, তা কিছু নয়। ভাবলাম কোথায় লোকটার যা হোক তবু একটা বন্দুক আছে, চালাতেও জানে, তাগ-বাগও আছে। লাঠিসোটার সঙ্গে একটা বন্দুক থাকলে জানোয়ারগুলো ভয়ও পায়, মরেও দু-চারটে। আর মারলে যা হোক কিছু পয়সাও পায়। তা নয়—যাক গে, আমার কি? মরবে, নিজেরাও মরবে।

কুঁচলালের এত কথা শোনবার অবসরই ছিল না। সে ততক্ষণে পুঁটলি খুলতে আরম্ভ করেছে। পুঁটলি খুলে সে টেবিলের ওপর রাখতে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু ডাকাত পড়ার মত চিৎকার করে, নাকে রুমাল চাপা দিয়ে পিছিয়ে গেলেন কয়েক হাত।—এই, এই ব্যাটা পিশাচ, মাটিতে রাখ, মাটিতে রাখ।

পুঁটলিটা খুলে মাটিতেই রাখল কুঁচলাল। আর ভীষণ পচা দুর্গন্ধে সমস্ত ঘরটা ভরে গেল।

ছোটবাবু উঁকি দিলেন। জিজ্ঞেস করলেন, ক'টি?

পাঁচখানা বাবু।

ছোটবাবুর মুখে তেমনি বিরক্তি। বললেন, ক'দিন ধরে সেই পাঁচটিই? তা এই লক্ষ্মণের ফল কি অঙ্গে-অঙ্গেই ছিল ক'দিন?

কুঞ্চলালের অপলক রক্তাভ চোখে বিস্ময় দেখা গেল। বলল, তা বাবু, কোথাও কি রাখবার যো আছে? বেড়ালে খাবে কি পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাবে, সেই ভয়। শত হলেও হাতের নক্সী।

ছোটবাবু প্রায় ভেঙচে বললেন, হাতের নক্সী? দেখি, তুলে-তুলে গোন।

কুঞ্চলাল প্রত্যেকটি বাঁদরের কাটা-ল্যাজ তুলে-তুলে দেখাল ছোটবাবুকে। এক. দুই, তিন··

ছোটবাবু বললেন, হুঁ, বেড়ালের কিংবা আর কোন জানোয়ারের ল্যাজ-ট্যাজ মিশেল নেই তো?

কুঞ্চলালের গালে ভাঁজ পড়ল. দাঁত দেখা গেল। এবার চোখের কোলেও ভাঁজ পড়ে তার চোখ দুটি বুজে এল প্রায়। খুবই হাসল কুঞ্চলাল। বলল. কি যে বলেন বাবু। কিসে আর কিসে? দেখেন না একবার?

চেয়ে দেখলেন না ছোটবাবু। ভাউচারের প্যাড টেনে নিয়ে লিখলেন কুঞ্চলাল দাস, পাঁচটি বাঁদর মারার পারিশ্রমিক দশ টাকা।

এইটি কৃষিবিভাগের ঘোষিত নিয়ম। পুরস্কার ঘোষণাও বলা যেতে পারে। প্রতি বাঁদর হত্যা পিছু দু'টাকা দেওয়া। চুক্তি অনুযায়ী অবশ্যই জমা দিতে হবে প্রত্যেকটি ল্যাজ, প্রমাণের জন্য।

সম্প্রতি এ অঞ্চলে বানর-নিধন যজ্ঞ শুরু হয়েছে। এ সব অঞ্চলে বাঁদর চিরকালই শস্য নষ্ট করে। কোন-কোন বছর একেবারেই সর্বনাশ করে দেয়। বিশেষ করে, এই যাযাবর শাখামৃগবাহিনী যে বছর দলবদ্ধ সৈনিকের মত রীতিমত যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে, সে বছর তো কথাই নেই। বন্যা কিংবা পঙ্গপালের আক্রমণের চেয়ে সর্বনাশটা কোন অংশে কম মারাত্মক নয়। সুদূর অঞ্চল ঘিরে, কোন্‌খান দিয়ে যে তারা সেতুবন্ধ রচনা করে অগ্রসর হচ্ছে কিংবা আলেকজাণ্ডারের বাহিনীর মত কোন্ ঝিলমের তীরে এসে ভিড়েছে, টের পাওয়া যায় না। সজাগ এবং সতর্ক তাদের আক্রমণ। সহসা ঝাঁপিয়ে পড়ে দলে-দলে। শস্য খায়, খাওয়ার চেয়ে তছনছ করে, নষ্ট করে বেশি।

এ বছর তো বটেই, কয়েক বছর ধরেই এ আক্রমণ চরমে পৌঁচেছে।

বিশেষ করে রবিশস্য। ছোলা, মটর, কলাই। তা ছাড়া বেগুন, মুলো, সীম তো আছেই। কলা আর পেঁপের চিহ্ন পর্যন্ত রাখে না। পেঁপে গাছের মুণ্ডুটি ভেঙে তার নরম শাঁসটি খেয়ে, গোটা গাছটিকে ধ্বংস না করে রেহাই নেই।

তাই দিকচক্রবাল-ছোঁয়া সুদূর প্রান্তরে সবুজের সফল স্বপ্ন-গুঞ্জন মাঝে-মাঝে এক গভীর শঙ্কায় আড়ষ্ট হয়ে যায়। শিউরে-শিউরে ওঠে! কখন, কখন সেই বর্গীরা আসবে! তাই, সরকারী এগ্রিকালচার বিভাগের এই ঘোষণা। আর এ

অঞ্চলে তার প্রধান পুরোহিত বলা হয় কুঁচলালকে। কেননা, লাঠি-সোটা, দা-কুড়ুল, অগুন নয়। তার একটি গাদা বন্দুক আছে।

ছোটবাবু বললেন, নাও, পুঁটলিটা বেঁধে বাগানের ঘরটায় রেখে এস।

কুঁচলাল যাকে ছোটবাবু বলে, তিনি হলেন আসলে এগ্রিকালচার ইনস্ট্রাক্টর। তার ওপরে আছেন, কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও। কুঁচলালের ভাষায় যে বড়বাবু। এস-ডি-ওকে ল্যাজগুলি চাক্ষুষ দেখাবার জন্যেই বাগানের ঘরে রাখতে বলেন ছোটবাবু।

কুঁচলাল সেটা হিসেব করেই বলল, বড়বাবুকে দেখাবেন তো? কিন্তু ছোটবাবু, বাগানের ঘরে ভামে-টামে খেয়ে ফেলে যদি?

খেয়ে ফেলবে। তা বলে তোমার ও হাতের লক্ষ্মী আমি অফিস ঘরে রাখতে পারব না।

যদিও খুবই অনিচ্ছা, তবু কুঁচলালকে পুঁটলিটি বেঁধে সেইখানেই রেখে আসতে হল। তারপর ছোটবাবু যখন স্ট্যাম্প-প্যাডটি এগিয়ে দিলেন টিপসইয়ের জন্য, তখন বড় দোয়াতের মধ্যে কলমের অর্ধেক প্রায় ডুবিয়ে তুলেছে কুঁচলাল। আর নিবের ডগা দিয়ে টপটপ করে কালি পড়তে আরম্ভ করেছে।

ছোটবাবু ভ্রূকুটি করে সবই দেখলেন চুপচাপ। কিন্তু কুঁচলালের সেদিকে খেয়াল নেই। যখন নিবের চড়চড় শব্দে কোয়ার্টার ইঞ্চি হরফে নাম সই শেষ করল, তখন গোটা হাতটি তার কালিতে ভরে গেছে। ভাউচারেও পড়েছে কয়েক ফোঁটা। মোটা হাড়সার থ্যাবড়া আঙুলগুলি সে মাথার চুলে ঘষে নিল।

ইতিপূর্বে যতবার সে টাকা নিয়েছে, ততবারই এ রকম অঢেল কালি মেখে সই করে নিয়েছে। কথাটা ছোটবাবুর মনে থাকে না। বিনা বাক্যব্যয়ে দুটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিলেন ছোটবাবু।

টাকা দশটি নিল কুঁচলাল।

কিন্তু কাঁধে বন্দুক, বারুদের গন্ধ, শক্ত কালো মূর্তি আর গোসাপের মত অপলক চোখে এতক্ষণ যে কুঁচলালকে নিষ্ঠুর মনে হচ্ছিল, সেই কুঁচলালকে হঠাৎ যেন বড় অসহায় মনে হল। কিংবা তার উদ্দীপ্ত লাল চোখে, তাগ-কষা বানর হত্যার বাসনাই দপদপ করে উঠল বা। টাকা দশটির ওপর থেকে অনেকক্ষণ তার নজর সরল না। তারপর পাঁচ ছয় ভাঁজে নোট দুটিকে একেবারে একটুখানি করে সোয়েটারের মধ্যে ছেঁড়া কামিজের পকেটে রাখল।

কি ভেবে ছোটবাবু বললেন—মারো, মারো, বাঁদরের গুষ্টিকে যত পারো মারো, বুঝলে হে কুতুবলাল।

কুঁচলাল বলল, এঁজ্ঞে। এবার ছোটবাবুকে নাম শুধরে দিল না সে। বলল, পন্দ্রাদিন আগে দেখেছিলাম ছটা, এই পাঁচটা।

ছোটবাবু বললেন, পাঁচটা-ছটাতে কি হবে। শয়ে-শয়ে মারো, শয়ে-শয়ে।

কুঁচলালের গলার স্বর কেমন বসে গেল. শুয়ে শুয়ে বাবু ?

হ্যাঁ।

মোটা কালো ঠোঁট দুটি জিভ দিয়ে চেটে বলল কুঁচলাল, একশো মারলে, দুশো টাকা হয় ছোটবাবু।

তাই হয়। একশোতে দুশো, দুশোতে চারশো, হাজারে দু-হাজার। এক হাজার মারো না তুমি—বারণ করেছে কে ?

ভাবশূন্য অপলক চোখে কুঁচলাল ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। আর বন্দুকের ভাঙা বাঁটের ওপর তার কালো মোটা থাবাটা যেন নিসপিস করতে লাগল। বলল, এক হাজার ?

ঢোঁক গিলে বলল আবার, একশো একাশি টাকা তিন আনা পাওয়া যায় কত-গুলান মারলে ছোটবাবু ?

ছোটবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, একাশি টাকা তিন আনা বাঁদর মারার হিসেব হয় না বাবা। ওটাকে বিরাশি করতে হবে। করলে পঞ্চাশ আর একচল্লিশ, একানব্বইটা বাঁদর মারতে হবে।

মোটা ঠোঁট নেড়ে বোধ হয় মনে-মনে হিসেব করল কুঁচলাল একানব্বুই কাকে বলে। তারপর বন্দুকটার দিকে তাকিয়ে বলল, কি করব বাবু, গাদা বন্দুকে সুবিধে করা যায় না। বাপ রেখে গেছল।

ছোটবাবু বললেন, জানি।

কুঁচলাল সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বলল, পঞ্চাশ বছরের কথা বাবা ডাকাত মেরেছিল, তাই পেয়েছিল। তখন মহকুমা হাকিম নিজে—

ছোটবাবু এবার চেঁচিয়ে বললেন, অনেকবার শুনেছি।

কুঁচলাল বলল, অ।

তারপর গামছাখানি কোমরে জড়িয়ে কুঁচলাল বেরিয়ে গেল। গিয়ে হাটের সীমানা পেরিয়ে পড়ল মাঠের সীমানায়। তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসায় তার অপলক চোখ আবার দপদপ করে উঠল। বাতাসের বুকে নাকের পাটা ফুলিয়ে শুঁকল গন্ধ।

গতি তার দক্ষিণে। কিন্তু বন্দুকের কথাটা সে ভুলতে পারে নি। বাপ তার ডাকাত মেরেই খালাস হয়েছিল। মহকুমা হাকিম তাই এই গাদা বন্দুকটি দিয়েছিল তার বাপকে। কিন্তু বন্দুক কোন দিন কাজে লাগে নি আর। অ-কাজে লেগেছিল কুঁচলালের। বয়সের একটা গরম নাকি আছে। সেই গরমে সে ওমরাহপুরের বিলে যেত পাখি মারতে। পাখি মেরে-মেরে হাত পাকাবার পর, ডাক এসেছিল বাঘ মারার। আমোদগঞ্জে একটা চিতাবাঘ দৌরাত্ম্য করছিল। মিছে বলবে না কুঁচলাল, বেজায় দমে গিয়েছিল প্রাণটা। মনে শুধু একটি কথাই গেঁথেছিল, বয়সটা জোয়ান, বিয়েটাও হয় নি। মরে গেলে আর একদিন হবেও না। লোকে বোঝে না, পাখি মারলেই বাঘ মারা যায় না।

কিন্তু বন্দুকের একটা মান আছে। যেতে হয়েছিল কুঁচলালকে। আর সাতদিন পরে, বাঘটাকে সে সত্যি মেরেছিল। তবে পুরোপুরি বন্দুকে নয়। অর্ধেক বন্দুকের গুলিতে, অর্ধেক পিটিয়ে।

তবে, এও মিথ্যে বলবে না কুঁচলাল, বাবু-সাহেবদের মত শিকার করে বাঘ মারে নি সে। ভয়ে মেরেছিল? প্রাণের ভয়ে যেমন মানুষ সবকিছু করতে পারে, সেই রকম। আমোদগঞ্জের বিল-ঘেঁষা জঙ্গলে, এমন নিঃসাড়ে এসে বাঘটা তার সামনে দাঁড়িয়েছিল, মনে করলে এখনও থমকে যেতে হয়। তবে, কুঁচলালের মনে হয়, তারা দুজনেই সমান ভয় পেয়েছিল। হাতে যে বন্দুক আছে, সেটাও ভুলে গিয়েছিল সে। লাঠি মনে করে, সেইটি দিয়েই প্রথম আঘাত করেছিল। একবার নয় তিনবার। বাঘটা তার উরুতে থাবা বসিয়েছিল। তারপর গুলি মেরেছিল কুঁচলাল। সেই সময় বন্দুকের বাঁটটা ভেঙেছিল, আর মহকুমা হাসপাতালে তাকে থাকতে হয়েছিল একমাস। মহকুমা-হাকিম শুধু দেখতে আসেন নি, পঁচিশটা টাকা তাকে বখসিস্‌ও দিয়েছিলেন।

উরুর এক খাবলা মাংস গিয়েছিল বটে, তেমনি আমোদগঞ্জের কুসুমকে পাওয়া গিয়েছিল। কুসুমের বাপ এসে তার বাপকে ধরেছিল,—ওই কুঁচলাল বাঘের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চাই। ছেলের জমিজমা তেমন নেই সত্যি, তবে বীর, হ্যাঁ বীরপুরুষ।

হ্যাঁ, বীরপুরুষ। গোটা মহকুমার লোক তখন কুঁচলালকে কুঁচবাঘ বলত।

কুসুমের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল কুঁচলালের। তারপর যুদ্ধ লেগেছিল। সরকার বন্দুকটি নিয়েছিল। তাদের নাজুনা থানাতে নাকি ছিল।

যুদ্ধ শেষের চার বছর বাদে ফিরে পাওয়া গিয়েছিল বন্দুকটি। কিন্তু বন্দুক হাতে করার সাধ ঘুচে গিয়েছিল তখন।

লাঙল ধরার জন্যে জন্মেছিল কুঁচলাল। বলদের অভাবে জোয়াল কাধে করার ভাগ্য নিয়ে বাঁচবার কথা ছিল তার। সেইভাবেই বাঁচছিল।

কিন্তু বাচা বড় দায়। দেখে শুনে কুঁচলালের মনে হয়, সব মানুষও কোন দিন বঁদর বনে যাবে। লুটেপুটে খেয়ে তছনছ করবে।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। তা ছোটবাবু নাকি শুনেছেন সে-কথা। হবে হয়তো, কুঁচলাল বলেছে সে-কথা ছোটবাবুকে।

সেই থেকে বন্দুক বেড়াতেই ঝুলছিল। নলের মধ্যে আরশোলায় ডিম পাড়ছিল, মাকড়সা জাল ফাঁদছিল, টিকটিকি তার গা বেয়ে-বেয়ে শিকার ধরছিল।

মিছে কেন বলবে কুঁচলাল, বন্দুকটার কথা মাঝে-মাঝে তার মনে হয়েছে। সেই যেবারে তার পশ্চিমের মাঠের সাতবিঘা জমি চরণ ঘোষ দলিলের অভাবে নিজের বগলদাবা করলে, বিলপারের সাড়ে তেরো বিঘা জমি নিয়ে নিলে মহাজন সাঁপুই ওর বাপের হাতের টিপসই-দেওয়া ঋণের মচলেখা দেখিয়ে, সাত শত সনের আগের

সনে যখন সরকারী বীজধানের ঋণ পাওয়া নিয়ে সরকারীবাবু তাকে ধাক্কা দিয়ে বার করে দিয়েছিল। গত সনের ভাদ্রে সরকারের খয়রাতি ধান দিলে না তাকে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট সেই বামুনটা, বললে, 'বউ ছেলে বেচে খেগে যা', তখন বন্দুকটার কথা তার মনে হয়েছে। রক্তে তার আগুন লেগেছে, বুক জ্বলেছে, বড় ঘেন্নায় তখন বন্দুকটায় ঠেসে-ঠেসে বারুদ গেদে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছে করেছে।

কিন্তু আইন নেই। তাই পারে নি।

আইনের মারপ্যাঁচটা কোন দিন বুঝল না কুঁচলাল। কিন্তু সেই মারপ্যাঁচের বাঁধন গলা অবধি বেঁধে ঝুলিয়েছে। বাকি আছে, নিদেনের ঘাড় মটকানোটুকু।

এই কথাগুলি বলতে চেয়েছিল সে ছোটবাবুকে। গত বছর এমন সময়ে যখন সরকারী চাষের দপ্তর থেকে বাঁদর পিছু দু'টাকা মজুরী ঢ্যাঁট্রা দিলে, সে সময় সে বেড়া থেকে বন্দুকটা পেড়ে নিয়েছিল আবার। পরিষ্কার করে, ধুয়ে-মুছে তেল মাখিয়ে আবার সে বন্দুক নিয়ে বেরিয়েছিল। কিন্তু তখন ছিল জ্যৈষ্ঠ মাস থেকে খোরাক যোগাবার একটা প্রেরণা। পাঁচ মাসের চেয়ে বেশি খোরাকি পাবার জমি তার নেই।

কিন্তু আশ্বিন মাসে কোর্ট থেকে সমন এসেছে, জমিদারীপ্রথা নাকি উঠে গেছে, কিন্তু খাস আছে। পাঁচ বিঘার মালিক কুঁচলাল খাসের প্রজা। জমিদার নয়, 'খাসদারের' পাওনা নাকি একশো একাশি টাকা তিন আনা, আইন-করা হিসেব। হুজুরে নালিশ হয়েছে। অনাদায়ে জমি নীলাম হবে। নীলাম রদের দরখাস্ত করে প্রজা মামলা লড়তে পারে। কিংবা টাকা মিটিয়ে সুখে ঘর করতে পারে। এখন প্রজার মর্জি, কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

কেন? না, আইন তৈরি হয় প্রজার মুখ চেয়ে। এই টাকাটা শোধ হলে, কিংবা মামলা লড়ে জিততে পারলে কুঁচলাল সরাসরি সরকারের প্রজা হয়ে যাবে। জমিদারকে পাঁচ বিঘের জন্য তেরো টাকা খাজনা দিতে হত। সরকারকে দিতে হবে তেরো টাকা সাড়ে পনেরো আনা। কেন? না জমিদারী উচ্ছেদ হয়েছে।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কুঁচলাল বন্দুকটা টেনে নামাল কাঁধ থেকে। ওগুলি কি দেখা যায় ক্ষেতের মধ্যে? ছোট-ছোট জীবগুলি পিলপিল করে ঘুরছে মাঠের মধ্যে? বন্দুক তুলে নিয়ে অপলক চোখে সে নজর করল।

তারপর বোকা-বোকা মুখে হাঁ করে রইল! বাঁদর নয়, গাঁয়েরই কিছু কুচো ছেলেপুলে। আলে খেলে বেড়াচ্ছে। তার মধ্যে গুটি তিনেক হাত তুলে দৌড়ে এল কুঁচলালের দিকেই। ওই তিনটি তার নিজের। এসে ঘিরে ধরল। প্রশ্ন তাদের একটিই, অই গো বাবা, বাবাগো, কটা মারলে এবারে?

কুঁচলাল বলল, হিসেব পরে হবে, এখন বাড়ি চল। গোসাপ নয়, ক্ষুধার্ত বাঘের মত অপলক রক্ত-চোখে শিকার খুঁজছে কুঁচলাল। নাকের পাটা ফুলিয়ে

গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। কোথায়, কোথায় তারা?—যারা দেবে তাকে একশো একাশি টাকা তিন আনা? নীলাম-রদের দরখাস্ত করেছে কুঁচলাল। সময় চেয়েছে। আর মরণপণ করে, নিরুপায় হয়ে, এই পাচ বিঘেতেই কড়াইশুঁটি আর আলু করেছে। সংসারের যেমন কতগুলি অমোঘ নিয়ম আছে যে, মানুষ মরে, ফতুর হয়, ঝড় ভূমিকম্প হয়, তবু দিন যায়, রাত্রি আসে, তেমনি করেই কুঁচলাল ওই পাচ বিঘেতে লাঙ্গল দিয়েছে, বীজ ছড়িয়েছে। উত্তর পশ্চিম ঘেঁষা এই দেশের মাটিতে রবি-শস্যের অনেক আশা। ফসল বাঁচিয়ে তুলতে পারলে আবার আউস ও আমনের জন্যে বেঁচে থাকা যায়।

কুঁচলালের যত কলকাটি সব মাটি। ঐ বস্তুটি থাকলে সে কিছু সৃষ্টি করতে পারে। কিন্তু তার কাচারি নেই, কর্মচারী নেই, দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে আইনের মুলুক সন্ধান করে টাকা তৈরি করতে পারে না। আর খাসের মালিক তৈরি করে উশুল চাইলে, তাকে হাতে পায়ে ধরতে হয়।

নীলাম রদ হয়েছে তবে মাঘ পর্যন্ত। মাঘ মাসের আর তিনদিন বাকি। পরদিনে ফাল্গুন। ইতিমধ্যেই মাঠের কোথাও-কোথাও পাঁশুটে ছোপ দেখা যায়।

কিন্তু একশো একাশি টাকা তিন আনা। কুঁচলালের সর্পচক্ষু দপদপিয়ে ওঠে। মাঠের আনাচে কানাচে গাছগাছালির ঝুপসিঝাড়ে ও তীক্ষ্ম চোখে দেখে। খোঁজে যেন শ্বাপদ বুভুক্ষু লালসায়। আর শক্ত করে চেপে ধরে বন্দুকটাকে।

আর একমাস সময় চাইলে পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে একানব্বইয়ের ঘরে বাদে এখনো চার কুড়ির হিসেব-নিকেশ করতে হবে।

খেয়াল নেই, ছেলেদের সঙ্গে কখন বাড়ির উঠানে এসে দাঁড়িয়েছে। সম্বিত পেল কুসুমের ত্রস্ত উৎকণ্ঠিত গলায়, ও কি, অমন করে কি দেখছ তাকিয়ে তাকিয়ে?

কুসুমের দিকে ফিরল কুঁচলাল। চোখের নজর যেন ঠাণ্ডা হল একটু। গালে কয়েকটি ভাঁজ পড়ল। হাসল কুঁচলাল।

কুসুম জানে, কি দেখে আর কি ভাবে অমন করে কুঁচলাল। তাই কুসুমের দুটি ডাগর চোখ ভরে ঘনিয়ে ওঠে অভিমান। বন্দুক কাঁধে কুঁচলালের এই মূর্তি দেখলে তার নাকি বুক কাঁপে, মনটা নানা রকম কু গায়। কুসুম এসে ইস্তক কোন দিন পাখি মারতে দেয় নি তাকে।

কিন্তু আজ আর কুসুম আটকাতে পারে না। পাখি নয়, আজ যাকে মারে কুঁচলাল, তাতেও খুনেরই নেশা। কিন্তু খুন না করলে নাকি বাঁচা দায়। তাই কুসুমের বুকের কাঁপুনি, নীরব বকুনি, ঘরের কোণে মুখ গুঁজড়ে পড়ে থাকে। কুঁচলাল চলে যায়।

তবে কি না, মিছে বলবে না কুঁচলাল, কুসুমের মন বুঝে তারও মনটা একটু খারাপ হয়। আমোদগঞ্জের সেই ছেউটি কুসুমের এখন বয়স হয়েছে, পাঁচটি

ছেলেপুলের মা হয়েছে। শরীরে পড়েছে বয়সের ছাপ কিন্তু মুখখানি এখনও যেন টসটসে। চোখ দু'টি এক রকম, তার আর বয়স বাড়ে নি। ঐ মুখের দিকে তাকিয়ে কুসুমের কাছে বসে এখনও কাঁচলাল গান গাইবার আপ্রাণ চেষ্টায় তাই হেঁড়ে গলার চিৎকার থামাতে পারে না।

কুসুমের কথার জবাব না দিয়ে কাঁচলাল বলল, ঠাণ্ডা পড়ছে, খালি গায়ে বাঁদরগুলোন ও পাড়ার মাঠে—

কথা শেষ করতে পারল না কাঁচলাল। কুসুম শিউরে উঠে বলল, কি? কি বললে তুমি?

কাঁচলাল থতিয়ে গিয়ে বলল, কি বললাম আবার?

কুসুমের চোখে তখন জল এসেছে। ছেলেমেয়ে কটিকে বুকের কাছে টেনে রুদ্ধ গলায় বলল, যাদের তুমি নিষ্টেপিষ্টে গুলি বিঁধে মারো, তা-ই বলে তুমি গাল দিলে ছেলেমেয়েগুলোনকে?

কাঁচলাল বলল, এই দ্যাখ—

কুসুম তেমনি কান্না-ভয়ার্ত স্বরেই বলল, আজও এসে ফটিকেব মা বলে গেল, দ্যাখ অমুকে যে প্রাণীগুলোনকে মারছে, শত হলেও তানারা ভগমানের বাহন বাপু। মারলে পরে ভগমানের প্রাণে দুঃখু নাগে। ছেলেপুলে নিয়ে ঘব, বড যে পাপ হবে।

কাঁচলাল যেন শুনতেই পায় নি কোন কথা। কোমরের পুঁটলিটা খুলে একবার দেখল। তারপর আবার কোমরে গুঁজে, পকেট থেকে টাকা দশটি হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধর।

টাকা নিল কুসুম। কাঁচলাল বলল, যত্ন করে রাখিস। নসু খুড়কে রাতে শুতে বলিস। বলে, হনহন করে মাঠের পথ ধরল কাঁচলাল।

কুসুম বলল, কি হল?

কাঁচলাল তখন অনেক দূর। বলল, কিছু না।

কুসুমও বুঝল, কি হয়েছে। কাঁচলালও বুঝল। বুঝল, মেয়েমানুষের খালি ওই এক কথা। দিন বোঝে না, ক্ষণ বোঝে না, মন বোঝে না। সংসার বোঝে না। খালি আনকথা, যে কথায় চিঁড়ে ভেজে না। এদিকে ভগবানের সুপুত্তুরেরা গোটা চাকলা ঘিরে বসে আছে। তখন আর 'ভগবানের প্রাণে দুঃখু লাগে না।'

শক্ত চোয়ালে ছুঁচলো ঠোঁটে কালো এবড়ো-খেবড়ো মুখটা কাঁচলালের আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল। একশো একাশি টাকা তিন আনার কথা কুসুমের কেন মনে থাকে না?

অনেকখানি এসে থমকে দাঁড়ায় কাঁচলাল। তীক্ষ্ম চোখে তাকায় দক্ষিণে ও পুবে। কোন দিকে যাবে। নাজনার দক্ষিণে জুড়ান গাঁ। কিন্তু ওদিকটার

কোন খবর নেই। পূবে—ওমরাহ্‌পুর, আমোদগঞ্জ দিয়ে উত্তর বাঁকে শেরপুর ধরে রুদ্দাগাঁ—এই ভাবে নাকি ছড়িয়ে আছে বড় দলটা।

দূর আকাশের কোল দিয়ে নজরটাকে ঘুরিয়ে আনতে গিয়ে কুঁচলাল যেন দিশেহারা হয়ে পড়ে। মনে হয় তার চারিদিক ঘিরে ছোট-ছোট পিটপিটে গোল চোখ পাঁশুটে জানোয়ারগুলি ঘাপটি মেরে আছে। সতর্ক চতুর চোখে দেখছে তাকেই, আর দূরে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে—পালাচ্ছে।

দক্ষিণ-পূব ঘেঁষে এগুলো কুঁচলাল। নাজনার সীমানা দিয়ে ওমরাহ্‌পুরে হয়ে এগুবে সে। এগুতে গিয়ে আর-একবার থমকাল কুঁচলাল। ছায়াটা দেখে পশ্চিমে ফিরল সে। সূর্য ডুবুডুবু। আকাশ রাঙাবরণ হয়েছে। দিন শেষ হতে আর বেশি দেরি নেই।

না থাক, রাতটা ওমরাহ্‌পুরে কাটাতে হবে। খোঁজ নিতে হবে। সেখানকার লোকের কাছে থেকে।

জমিটা নাবালের দিকে। সামনে একটা খাল আছে। সাপুইদের সর্ষে ক্ষেত অনেকখানি। মুসুরির ফাঁকে-ফাঁকে সর্ষে মাথা তুলেছে অনেকটা। হলুদের গোলা ছিটিয়ে দিয়েছে যেন কেউ এত সর্ষে ফুল। মৌমাছিগুলি এখনও চাকে ফেরবার নাম করছে না। মধু খেয়ে কূল পাচ্ছে না তাই।

খালের সাঁকোর কাছে এসে দেখা হল দুজনের সঙ্গে। নাজনার লোক।

একজন বলল, আই গো কুঁচোদাদা, চললে কোথায়?

ওমরাহ্‌পুর।

একজন বলল, গাঁ ছেড়ে চললে? ব্যাপার যা শুনছি, গতিক বড় সুবিধাব না। বন্দুকখান নিয়ে তুমি থাকলে তবু এ্যাট্‌টা বল থাকে।

বল পায় লোকে, কুঁচলাল বন্দুক নিয়ে থাকলে। কুঁচলালও বল পায় মনে। আশা হয়, কিন্তু দাঁড়ায় না কুঁচলাল। যেতে যেতেই বলে, ওমরাহপুর যাচ্ছি পটল। যদি দেখ সুমুন্দিরা এযেছে, তবে ধাওয়া করবে পূব দিকে। ওদিক পানেই থাকব।

লোক দুটি যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর বোকার মত চোখাচোখি করে চলে গেল। মানুষটিকে তাদের কেমন বেঢপ লাগল। যেন নিজের মধ্যে নিজে নেই।

তা নেই। ক্রমেই একটা হত্যার নেশাই যেন চড়ছে কুঁচলালের।

নাজনার সীমানা পেরিয়ে, ওমরাহ্‌পুরের মাঠে পড়ল সে। আকাশটা এখনও লাল। উঁচু জায়গায় দাঁড়ালে সূর্যটা বোধ হয় এখনও দেখা যায়।

হঠাৎ থমকে দাঁড়াল কুঁচলাল। পায়ের কাছে একটা আধখাওয়া বেগুন। একটু দূরে আরও কয়েকটা। তারপরে আরও। আর সামনেই বেগুন ক্ষেতটা। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কাদের আক্রমণ হয়েছিল। আব বেশিক্ষণ আগের ঘটনাও

নয়। আততায়ীর ছায়া দেখে সাপের ফণা তোলার মত মাথা তুলল কুঁচলাল। বন্দুক নিল ডান হাতে।

কিন্তু আশেপাশে সব নিথর। সামনে একটা বাঁশঝাড়। আশেপাশে অনেকগুলি বড়-বড় গাছ গায়ে-গায়ে জড়াজাপটি করে আছে। কিন্তু একটি পাতাও নড়ছে না। এ সময়ে পাখিই বড ডাকে না এমনিতেও। যেন রাত্রি আসার আগে কি ভাবে চুপচাপ। পাখি ডাকছে না, দেখাও যাচ্ছে না বিশেষ।

তবু নিঃসাড়ে এগুলো কুঁচলাল, সেই চিতাবাঘটার মত। কিন্তু তাদের ছায়াও নেই কোথাও। হয়তো এ তল্লাটেই নেই।

গাছগুলি পেরিয়ে খানিকটা জঙ্গল। জঙ্গলের ওপারে রাস্তা। জঙ্গল চার পাশেই। সামনে একটা ডোবা। ডোবাটার ডানপাশে একটা উঁচু ঢিবি।

ঢিবিটাকে ডানদিকে রেখে, ডোবার পাশ দিয়ে ওমরাহ্‌পুরের গোরুর গাড লার সড়ক ধরে এগুলো কুঁচলাল। হঠাৎ ছোট একটি শব্দে কান খাড়া করে থামল সে। সামনের তেঁতুল গাছটির দিকে দেখল। ফাকা গাছ।

কিন্তু দৃঢ় সন্দেহে নাকের পাটা ফুলে উঠল কুঁচলালের। সূর্য ডুবছে. এইটা একটা সময়। পা টিপে-টিপে তেঁতুল গাছের আড়ালে গেল সে। আর যা ভেবেছিল তাই। ঢিবিটার পশ্চিম-ঢালুতে ধাড়ি আর বাচ্চায় প্রায় সাত আটজনের একটি দল। ডোবার জল খেয়ে পশ্চিম দিকেই তাকিয়ে আছে। আর চুপচাপ মাথা চুলকোচ্ছে, গায়ের উকুন খাচ্ছে।

ওদের মত অস্থির প্রাণী কেন এ সময়ে শান্ত হয়ে যায়? কেন হয়ে যায়? কেন তাকায় সূর্যের দিকে? নাম জপ করে নাকি?

মিছে বলবে না কুঁচলাল, তার মনটা একবার যেন কেমন করে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বন্দুকটা তুলে ধরে সে। আঙুলটা চেপে ধরে ট্রিগারের ওপর। পাচবিঘা জমিতে কুঁচলালের কড়াইশুঁটি আর আলু আছে। খেয়ে তছনছ করবে যেদিন, সেদিন ও জানোয়ারগুলি এমনি করেই সূর্য-ডোবা দেখবে। কিন্তু তাড়া খেয়ে কোন দিকে যাবে বাঁদরগুলি? সামনে না অন্য দিকে? কুঁচলালকে টের না পেলে, এদিকেও আসতে পারে। আর একটা সুযোগ নিতে হবে।

কুঁচলাল দেখল জানোয়ারগুলো হঠাৎ যেন অস্বস্তিতে কেমন করছে। মরণের গন্ধ পাওয়া যায় বোধ হয়।

কুঁচলাল তাগ করে গুলি ছুড়ল। লহমায় একবার মাত্র দেখল. একটা বাঁদর প্রায় পাঁচ-ছ হাত শূন্যে লাফিয়ে উঠে, পড়ে গেল। ততক্ষণে কুঁচলাল পুটলি থেকে বারুদকাঠি দিয়ে. বারুদ আর গুলি পুরতে-পুরতেই ঘন গাছগুলোর দিকে অগ্রসর হয়েছে। এত দ্রুত এবং ক্ষিপ্র যেন একটা কালো বেড়াল।

গাছগুলির জটলার দিকেই কয়েকটা বাঁদর দৌড়েছিল চিৎকার করতে-করতে, একটু ঘুরে হঠাৎ গাছের ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই. আর একটা গুলি করল সে।

কাক-শালিকের দল চিৎকার জুড়ে উড়তে লাগল। কিন্তু আর একবার গুলি পুরে প্রস্তুত হতে না হতেই বাঁদরের চিহ্ন পর্যন্ত আশেপাশে আর নেই, এটা অনুভব করল কুঁচলাল। তাছাড়া গাছের কোলগুলিতে ছায়া ঘন হয়ে উঠেছে, সহজে টের পাওয়া যাবে না।

পুঁটলি হাতড়ে একটা পুরানো ক্ষুর বার করল সে। তারপর গাছের ওপরের মরা বাঁদরটাকে আগে খুঁজে বার করল। পাশ ফিরে শুয়ে ছিল বাঁদরটা, হাত-পা ছড়িয়ে। আর বাঁদর মরে গেলেই কেমন যেন নরম হয়ে নেতিয়ে যায়।

গোড়ার কাছ থেকে ল্যাজটা কেটে নিয়ে, রক্তটা মাটিতে ঘষে নতুন পুঁটলি করে তাতে রাখল। ঢিবির মরাটার ল্যাজও কেটে নিয়ে পুরল পুঁটলিতে। হয়তো মরা বাঁদর দুটিকে রাত্রে শেয়ালে খাবে। আদিবাসীরা পেলে হয়তো নিয়ে যেত।

কুচলালের হাতে রক্ত লেগে গেছে। সে মাথা তুলে এদিক-ওদিক তাকাল। পশ্চিম দিকে তাকিয়ে দেখল, সূর্য ডুবে গেছে। কালচে হয়ে গেছে আকাশ।

ঢিবিটার ঢালুতে দাঁড়িয়ে কুঁচলালও যেন সূর্যডোবা দেখছে। পাখিগুলি নিশ্চিন্ত হয়ে চুপ করেছে এবার। কুঁচলাল মনে-মনে বলল, চার কুড়ির মধ্যে মাত্র দুই হল।

জুড়নগাঁয়ের দিক থেকে একটা গোরুর গাড়ি এল। জিজ্ঞেস করল কুঁচলাল, কোথা যাবে গো?

ওমরাহ্‌পুর।

নিয়ে যাবে?

গাড়োয়ানটা কেমন ভয়-ভয় চোখে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে দেখল কুঁচলালকে। যেন ডাকাত দেখছে সামনে। প্রায় নিরুপায় হয়েই বলল, চল।

গাড়িতে উঠল কুঁচলাল। খানিক পরে গাড়োয়ান বলল, কোথা যাওয়া হবে?

ওমরাহ্‌পুর।

নিবাস?

নাজনা।

গাড়োয়ান এতক্ষণে ফিরল। বলল, তাইতো বলি, কুঁচলাল না?

হুঁ?

হাতে রক্ত কিসের?

বাঁদরের।

তাই তো বলি, ব্যাপারখানা কি?

নিশ্চিত হয়ে লোকটা এবার রামসেনানীর কীর্তিকাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করতে লাগল। কোথায় কি কি ফসল নষ্ট হয়েছে। গাড়োয়ান নিজে একজন চাষী। কুঁচলালদেরই জাতের লোক। রাতের থাকা-খাওয়াটা আজ তার ওখানেই সারুক কুঁচলাল। কেননা শত্রু হলেও কাজটা তো সকলেরই।

রাত্রিটা কাটিয়ে বেরুল কুঁচলাল। গ্রামের পুবে আর পশ্চিমে শস্যের মাঠ। আগে পশ্চিম দিকটা ঘুরে, পুবদিকে গেল সে। পুবদিকে বিলটা দক্ষিণে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলে গেছে। ওদিকটায় লোকজনের চলাফেরা কম।

কিন্তু রাগে মাথায় আগুন জ্বলে গেল কুঁচলালের। একগাদা কুচো লেগে গেছে পিছনে। আর চিৎকার করছে. বাঁদরমারা, বাঁদরমারা।

বারণ করলেও শোনে না। যেন পাগল পেয়েছে। বাচ্চাদের এই দলবাধা চেঁচামেচিতে বাদর দূরের কথা, কুঁচলালকেই ভেগে পড়তে হবে যে। গাঁয়ের বড়রা বললেও ছানাগুলি শুনতে চায় না। ক্ষেপে গিয়ে ভাবে, দেবে নাকি একটাকে দুড়ুম করে?

কিন্তু কুঁচলালের গালে ভাজ পড়ল। মিছে বলবে না সে, নিজের রাগ দেখে তার নিজেরই লজ্জা হল আর নিজের ছেলেমেয়েগুলির কথা তার মনে পড়ল। ছানাপোনাদেব এটিই নিয়ম। তাদের মন মানে না'

তাই কুঁচলাল হঠাৎ দৌড়াতে আরম্ভ করল। এ-পথে সে-পথে দোড়ে-দৌড়ে পথ ভুলিযে দিল বাচ্চাগুলিকে। কিন্তু বিপদ হল অন্য দিক থেকে। গাঁযের যত কুকুর লেগে গেল তার পিছনে।

শালারা পাগল করে মারবে।

একটি বাডিতে ঢুকে খানিকক্ষণ বসে রইল সে। কুকুরগুলি যখন গেলে আবার বেরুল। বেরিযে সোজা চলে গেল আগে পুবে, তারপর দক্ষিণে। জুড়ন গাঁযের সীমানা থেকে আবার উত্তরে। দুপুর গডিযে যাবার পর আমোদগঞ্জে এসে শুনল, কিছুক্ষণ আগেও একটা দলকে দেখা গেছে।

একটি মুদি-দোকানে বসে কিছু চিঁডে আর জল খেযে নিল কুঁচলাল। আবার বেরুল। বেরিয়ে গ্রামের মধ্যে ঢুকে, পুবের বাইরেব সডক ধরবে বলে এগুলো। তার আগেই দাঁড়াতে হল তাকে। বাঁদর।

বাদর নয়, বাদরী। তিনটে বাঁদরী তিনটেই মা, তিনটেরই পেটে বাচ্চ ঝুলছে। সারা দনেব ক্ষুধ হতাশা এবার রুদ্র হযে উঠল কুঁচলালের। গোসাপ-চোখ যেন শিকারকে নজরবন্ধ করল গাছের ডালে।

মিছে বলবে না কুচলাল, ছেলেমেয়েগুলিকে বুকে আগলানো কুসুমের কথাটা তার একবার মনে পড়ল। তবুও সে একটা গাছের আড়ালে লুকিযে বন্দুক তুলল আর ঠিক সেই সময়ই কয়েকটা লোকের কথাবার্তার স্বরে বাঁদরীগুলি এদিকে ফিরতেই উদ্যত শমনকে দেখতে পেল। দেখে, অন্য গাছে লাফিয়ে পড়ার উদ্যেগ করতেই গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল।

কেউ পড়ল কিনা, না দেখেই, গাছের দোলানি কোন্ দিকে সেটা লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি বারুদ গেদে ছুটে গেল। একটা বাঁদরী একটি বটগাছে উঠে পড়েছে, যেখানে অন্য কোন গাছ কাছে নেই লাফিয়ে পড়ার। নামলে মাটিতেই নামতে

হয়। বাঁদরীটা তাই ত্রাহি চিৎকার করে পেটে বাচ্চা নিয়ে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল ডালে-ডালে।

বন্দুকটা নিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কুঁচলাল। বাঁদরীটার কোথাও যাবার উপায় নেই। বাচ্চাটা তীক্ষ্ণ গলায় চিঁ চিঁ করছে। লোক জড়ো হয়ে গেছে কুঁচলালকে ঘিরে। সবাই হাসছে, চিৎকার করছে, কলা দেখাচ্ছে বাঁদরীটাকে।

বাঁদরীটা কাঁদছে আর আশেপাশে দেখছে। আর আগের চেয়ে স্থির হয়ে এসেছে। কিন্তু যেদিন খাবার থাকে না সেদিন কি রকম কাঁদে কুসুম ছেলেমেয়ে নিয়ে, সেটা কুঁচলালের মনে আছে। তাই বাদরীর কান্না সে শুনবে না।

কে একজন বলল, নীলপুরে একজন ফাঁদ পেতে বারোখানি বাঁদর মেরেছে।

কুঁচলাল শুনল, নীলপুরের একটা লোক চব্বিশ টাকা পেয়েছে। সে গুলি ছুঁড়ল। বাদরীটার সঙ্গে বাচ্চাটাও পড়ল। সেটা মল্ল শুধু আছাড় খেয়ে। দুটো ল্যাজই খুর দিয়ে কাটল সে। ধাড়ি আর বাচ্চার গড়পড়তা দু'টাকাই হিসেব। এর আগের বাঁদরীটাও পড়েছে। ভেগেছে বাচ্চাটা।

লোকেরা বাদরকে মারতে চায়। তবু যেন কুঁচলালকে তাদের নিষ্ঠুর বলে মনে হল। তাই খানিকটা যেন ভয় ও ঘৃণা নিয়ে তাকিয়ে রইল সবাই তার দিকে।

ভীড়ের মধ্যে থেকে কে একজন বলল, আমোদগঞ্জের বাঘমারা জামাই শেষে বাঁদরমারা হল?

কুঁচলাল শুধু নির্বিকার নয়, নীরবও। কাছেই কুসুমের বাপের বাড়ি। সবাই তার চেনা। কিন্তু সেখানে যাবে না কুঁচলাল। কুসুমের ভাইয়েরা তাকে ভাত খাওয়াতে চাইবে আর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকবে। এদেরই মত ভাববে, সে কসাই। কেন না কুঁচলালের মনটা কেউ বুঝবে না।

উত্তর দিকে এগুলো সে। গুলির শব্দে ও ছটকে-যাওয়া বাঁদরীটার কাছে সংবাদ পেয়ে, এতক্ষণে জানোয়ারগুলি এ তল্লাট ছেড়ে সরে পড়েছে।

শেরপুরে এসে যখন পৌঁছল তখন বিকেল হয়েছে। শুনল, আছে তার চিহ্নও রয়েছে। প্রায় সাত-আট বিঘা ছোলা-মটর-মুলো ধ্বংসেছে শেরপুরে। গোটা পঞ্চাশ নাকি দল বেঁধে আছে।

কিন্তু তিন দিন ঘুরেও দলটার সন্ধান করতে পারল না কুঁচলাল। তবু তিন দিনে পাঁচটা ছুটকো বাঁদর মারা পড়েছে।

চার দিনের দিন মনে হল, এ তল্লাটে আর একটা বাঁদরও নেই, যেন এ পৃথিবীতে নেই। চার দিনে দু'বার ভাত খেয়েছে কুঁচলাল। বাদবাকি চিঁড়ে-মুড়িতেই কেটেছে। পুকুর আর ডোবার অভাব হয় নি। জলে নেমে ডুব দেওয়া গেছে। কিন্তু তেলহীন রুক্ষ চেহারাটা আরও ভয়ংকর হয়েছে। আজ নিয়ে সে সাত দিন বাড়ির ভাত খায় নি, বাড়িতে থাকে নি।

সে যেখান দিয়ে যায়, সেখানে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। তার গায়ে পচা গন্ধ, ল্যাজের মাংসগুলি পচছে তার পুঁটলির মধ্যে। এখন তাকে দেখলে একটা ভবঘুরে পাগল বলে দিব্যি মনে করা যেত। কিন্তু কাঁধের বন্দুক আর অপলক রক্তাভ চোখ দেখে, সবাই যেন সভয়ে হতবাক হয়ে চেয়ে থাকে।

দিনের হিসেব ভুলে গেছে বুঝি কুঁচলাল। ল্যাজের হিসেব ঠিক আছে। তবু বাতাস যেন একটা অশুভ বার্তা নিয়ে তার কানের কাছে গুঞ্জন করে ফেরে ফাল্গুন পড়ে গেছে, ফাল্গুন পড়ে গেছে। তখন মহকুমা-হাকিমের মুখখানি মনে পড়ে তার। খাস-মালিকের আমলার মুখটা মনে পড়ে, যে মুখটাতে কি এক মস্ত ধাঁধা যেন ঝিকমিক করে। মনে হয় লোকটার ছায়া পড়ে না মাটিতে, আর সেই দূর নাজনাতে দাঁড়িয়েও তাকে দেখতে পাচ্ছে সব সময়।

মানুষ ভয় পেলে যেমন ভক্তিতে হঠাৎ নমস্কার করে, কুঁচলাল তেমনি হঠাৎ মনে-মনে নমস্কার করে বসে সেই মুখটাকে।—হেই দেবতা, হেই দেবতা গো।

আর সঙ্গে-সঙ্গে তার চোখের সামনে যেন বাঁদরের দল পিলপিল করে। বস্তা বাঁধা একটা মোটা ল্যাজের গাঁটরি সে দেখতে পায় যেন ছোটবাবুর অফিসে।

তারপর আরও পুবে, নীলপুর ছাড়িয়ে, গাদিগড়, কুঁদপাড়া, মেযাপুরের দিকে যেন কোন এক অদৃশ্য ইশারায় পা চলে তার। পর-পর কয়েকদিন বন্দুকের শব্দে মরণের বিভীষিকা দেখে বেশ একটা ভেবেচিন্তে যোগসাজস করেই যেন জানোয়ারগুলি পালিয়েছে।

কিন্তু আদিগন্ত ফসলের ক্ষেতের এই নিশ্চিত ফাঁদ ছেড়ে যাবে কোথায়। সংসারে এই তো সবচেয়ে বড় ফাঁদ সকলের,—জীবেরা খেতে চায়, বাঁচতে চায়।

কুঁদপাড়ার এক কলাবাগানের পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে, দৃশ্যটা দেখতে পেল কুঁচলাল। মিছে বলবে না সে, কুসুমকে বুকে ধরে সোহাগ করবার কথা তার মনে পড়ল। মনে পড়ল, কুসুম রাত জাগে নসুখুড়ির পাশে শুয়ে-শুয়ে। বাচ্চাগুলি থাকে তার পাশে, পুরুষ ধাড়িটার জন্য মন পোড়ে কুসুমের।

তবু জোড়-খাওয়া জোড়াটার দিকে গুলি ছোঁড়ে কুঁচলাল। আর মুহূর্তে গোটা কলাবাগানটা আন্দোলিত হতে থাকে। বোঝা গেল বড় একটি দল বাগানের মধ্যে ছিল। পালাচ্ছে খোলা মাঠের দিকে। কিন্তু কলাবাগান যেন একটা দুর্ভেদ্য বেড়ার মত, আরও তিনবার বারুদ গেদে গুলি ছুঁড়ল কুঁচলাল। শেষ পর্যন্ত মারা গেল দুটো।

ফ্যাসাদ করল সে মায়াপুরে এসে। একটি পাকা বাড়ির ছাদের কোণে-বসা বাঁদরকে গুলি করার পরেই ভীষণ একটা হৈ-হৈ পড়ে গেল। দিন দুপুরে ডাকাত ধরার লাঠিসোটা নিয়ে সেই বাড়ির লোকেরা বেরিয়ে এল।

ব্যাপার এমন কিছু নয়। ছাদের নীচেই, জানালার কাছে নাকি একটি মেয়েমানুষ দাঁড়িয়ে ছিল, গুলির শব্দে সে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

বাঁদরটা মরেছিল ছাদেই। তার ল্যাজ তো পাওয়া গেলই না, এক গুরুতর অপরাধের দণ্ড হিসেবে তাকে গ্রাম থেকেই তাড়িয়ে দিল লোকগুলি। কেননা, বাঁদর মারার অছিলা করে বেড়ানো এ রকম অনেক শয়তান নাকি তারা দেখেছে। কেননা, অছিলা করলেও, চেহারাটা তো গোপন নেই।

তা বটে, মিছে বলবে না কুঁচলাল, চেহারাটি তার রাজপুত্তুরের মত নয়। মেয়াপুরের ভদ্রলোকদের চেহারাও তো রাজপুত্তুরের মত নয়। কিন্তু সে শয়তান হল কেন?

মেয়াপুরের মাঠে নেমে পিছন ফিরে সে গ্রামটাকে দেখল একবার। জিভটা তার শুকনো লাগছে। সারাদিন কিছু পেটে পড়ে নি তার আজকে। কেমন একটি অসহায় বোবা জীবনের মত খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল মাঠে। ছাদের ওপর পড়ে থাকা বাঁদরটার কথা মনে পড়ল তার। পেলে ঊনিশটা হত। কিন্তু আর মেয়াপুরে ঢোকা যায় না।

বড় রাস্তার ওপর দিয়ে শামলা মাথায় একটি লোককে সাইকেলে চেপে যেতে দেখে, চমকে উঠল কুঁচলালের মনটা। ইনি হয়তো ডাক্তারবাবু, কিন্তু মহকুমা হাকিমের মুখখানি মনে পড়ছে তার। আর মনে পড়ছে আমলার মুখখানি যে লোকটি শুধু দলিল দস্তাবেজ দেখে টাকা তৈরি করতে পারে।

ফাল্গুনের কদিন আজকে? মনে নেই, একেবারেই স্মরণ হচ্ছে না কুঁচলালের। তার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে মেঘ ডেকে উঠল যেন। একটা ভয়ংকর দুর্যোগ যেন তার বুকে এসে ধাক্কা মারছে। বন্দুকটা শক্ত হাতে ধরে তাড়াতাড়ি উঠল কুঁচলাল। একুশ মাইল পাক দিয়ে আবার দক্ষিণে-পশ্চিমে পিছুতে লাগল সে। উঠবে গিয়ে জুড়নগাঁয়ের বিলের কাছে। মাঝে পড়বে আগনগাছি, নৈরা, ঝিঙেদল, মনসাতলি। রাত্রিটা কাটাতে হবে বোধ হয় নৈরাতেই। ইতিমধ্যে সূর্য হেলে গেছে পশ্চিমে। পা চালিয়ে যাবার যো নেই। নিঃসাড়ে পা টিপে-টিপে, ওৎ পাততে-পাততে যেতে হবে তাকে।

আগনগাছি পার হয়ে, নৈরার বোমর-জল যমুনার উঁচু পাড়ের কাছে জঙ্গলের পথে থামতে হল কুঁচলালকে। সতর্ক তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল চারদিকে। কিছু নেই, তবু একটা তীক্ষ্ণ খ্যাকানি শুনতে পেয়েছে সে। মানুষের? কিন্তু গন্ধ পাচ্ছে কিসের?

চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল কুঁচলালের। আবার একটা তীব্র হুংকার শুনতে পেল সে। তাদেরই হুংকার।

গাছের আড়ালে-আড়ালে খানিকটা উত্তরে যেতেই, চোখে পড়ল তার।

উঁচু পাড়ের ওপর প্রায় বারো তেরটি বাঁদরী, সারি-সারি বসে আছে নির্বিকার হয়ে। আর তাদের সামনেই, দুটি বড়-বড় হুলো, পরস্পরে চোখে চোখ রেখে পাক খাচ্ছে আর আক্রমণের ছল খুঁজছে।

যেন দুই বাদশা লড়ছেন, আর বেগমেরা গা চুলকে আরাম করে উকুন চিবোচ্ছেন। যিনি জিতবেন, তার হাত ধরে সব বেগমেরা হারেমে গিয়ে উঠবেন। রাজ্য নয়, বাদশারা প্রেমের লড়াই করছেন।

এইভাবেই বাঁদরের বিয়ে হয় আর খাঁটি কুলীনের মত একাধিক পত্নী নিয়েই তাদের সংসার। শক্ত হাতে বন্দুকটা ধরেও, লড়াইটা দেখতে লাগল কুঁচলাল। বীরভোগ্যা বসুন্ধরার বীরদের এমন লড়াই আর বীর্যশুল্কাদের এমন খাঁটি প্রেম দেখতে (মিছে বলবে না কুঁচলাল) ভালই লাগল তার।

কিন্তু কোন্‌টাকে মারবে সে ? যে জিতবে ? না, তাকে নয়, যে হারবে।

কারণ, হেরে যাওয়াটা সবচেয়ে বেশী বদমাইশি করবে, ক্ষতি করবে। কারণ, বন্ধু আর বউ থাকবে না, ওর মেজাজ সব সময় খিঁচড়ে থাকবে, ক্ষেপে থাকবে।

লড়াই নিশ্চয় অনেকক্ষণ ধরে চলেছে, কারণ দুজনেরই চোখেমুখে গায়ে রক্তের দাগ। গায়ের জায়গায়-জায়গায় লোম উপড়ে ফেলা হয়েছে।

হঠাৎ দুটিতে ঝাঁপিয়ে ঝুটোপুটি লাগাল। বন্দুক তুলে ধরল কুঁচলাল। কিন্তু ওরা ফারাক হয়ে পাক দিতে লাগল।

কুঁচলাল গুনল। তেরটা বাঁদরী দুটো মদ্দা। তিরিশটা টাকা তার চোখের উপর। কিন্তু একটাকেও মারতে পারবে না হয়তো কুঁচলাল. থোক তিরিশ টাকা তো অনেক, অনেক দূর।

আবার ঝুটোপুটি লাগল, আর তীক্ষ্ন চিৎকারে আকাশটা যেন ফেটে গেল। ট্রিগারে হাত দিল কুঁচলাল, আর মুহূর্তে মতের পরিবর্তন হল তার। সে দেখল, একটা হুলোর বুকের চামড়া চিরে দিয়েছে অন্যটা, লাল মাংস দেখা যাচ্ছে। কিন্তু তখনও ছাড়ান পায় নি। ওটা মরবেই। জিতে যাওয়াটাকেই তাগ করলে সে। গুলি ছুঁড়ল।

দিশেহারা বাঁদরীগুলি পাড়ের দিকে নেমে প্রথমে নদীর দিকে গেল। ক্ষিপ্র-বেগে বারুদ আর গুলি গেদে প্রায় পাগলের মত জলের দিকে ছুটে গেল কুঁচলাল। গুলি ছুঁড়ল।

জলের কাছে গিয়ে ওরা ছত্রভঙ্গ হল। কুঁচলাল পিছন ছাড়ল না। ছুটতে-ছুটতে আরও তিনবার গুলি করল। তখন সে প্রায় আধ-মাইল দূরে চলে এসেছে।

পথ থেকে দুটিকে ল্যাজ ধরে টানতে-টানতে ছুটে এল আবার সেখানে। জলের ধারে একটা বাঁদরী আর পাড়ের ওপর দুটো মদ্দা।

ল্যাজগুলি কেটে, মাথায় পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে কোমর-জল যমুনা পার হল কুঁচলাল। নৈরাতে রাতটা কাটল একজনের বাড়িতে। দুটি ভাত পেল খেতে। কিন্তু ভাতগুলি বমি হয়ে যাবার দাখিল। ফাল্গুন মাসের নাকি সাত-দিন আজ ? ভোর-ভোর উঠে জুড়নগাঁয়ের দিকে চলল সে। কিন্তু টিপে-টিপে ঝিণ্ডেল আসতেই দুপুর হয়ে গেল। কিছু পাওয়া গেল না।

কিন্তু শীত লাগছে কেন কুঁচলালের ? গায়ে হাত দিয়ে সে বুঝতে পারে না। তবে বাতাস হঠাৎ বেড়েছে। লোকে বলে, এটা 'সমুদ্দুরের বাতাস' শুকনো মিঠে বাতাস, তাপ আছে বেশ। কদিনের মধ্যেই সমস্ত মাঠগুলি যেন পাশিুটে রঙ ধরে গেছে। কুঁচলালের পাঁচ বিঘেও পেকেছে নিশ্চয়। মন বড় আনচান করে। নাজ্‌নায় যাবে কুঁচলাল, নাজ্‌নায় যাবে।

কিন্তু বাতাসটা গায়ে লাগলে এমন কেন হয় ? শীত নয়, কেমন যেন ভয়-ধরা কাঁটা-লাগা ভাব।

বাতাসটা যেন একটা পাগলা ঠাকুরের মত, কিসের ভয় দেখায় কুঁচলালকে।

মনসাতলিতে এসে তিনটিকে মেরে, জুড়নগাঁয়ে আসতে রাত হল তার।

সকালে তার ঘুম ভাঙল বাড়ির লোকের চিৎকার চেঁচামেচিতে। যার বাড়িতে শুয়েছিল সে চেঁচিয়ে ডাকল, অই গো বন্দুকওয়ালা, এস, তাড়াতাড়ি এস, ক্ষেতে বাঁদর পড়েছে।

পুঁটলি আর বন্দুক নিয়ে লাফিয়ে উঠল কুঁচলাল। জিজ্ঞাসা করল, কোন্ মাঠে ?

পুবের মাঠে।

বেরিয়ে এসেই আগে মাঠের দিকে গেল। তারপর চিৎকার করে বলল সবাইকে, গোল হয়ে ঘেরো। ঘিরে জোড়াপুকুরের দিকে তাড়া দাও।

সারা গ্রামের জোয়ানরাই প্রায় লাঠিসোটা নিয়ে প্রস্তুত। একদলকে নিয়ে জোড়া-পুকুরের দুই ধারে ছড়িয়ে দিল কুঁচলাল। পাগলের মত চিৎকার করে বলল, খবরদার, এক শালাও যেন পালাতে না পারে। ওরা পাছ দিয়ে আসছে, তোমরা দুপাশে, আমি একলা এখানে।

তার চিৎকারে সবাই যেন তটস্থ। যেন সৈনিকদের হুকুম করছে সেনাপতি।

আর ব্যাপারটা ঘটলও তাই। লুভিষ্টর দল তিন দিক থেকে ঘেরাও হয়েছে। যদিও কাছেপিঠে গাছগুলিই একমাত্র পালাবার রাস্তা, তবে সেগুলি ছাড়া-ছাড়া। পিছনের তাড়া খেয়ে বাঁদরগুলি সামনে আসতেই পুকুর পড়ল, আর দুদিকে সবাই চিৎকার করতে লাগল।

পিছনের লোকগুলি পুকুরের ওপারে না এসে পড়া পর্যন্ত নিশ্চিন্তে গুলি চালিয়েছে কুঁচলাল। এবার তাকে সাবধান হতে হল।

কিন্তু গুলির ভয়ে পিছন দিকের সবাই সরে পড়তে লাগল। কুঁচলাল চিৎকার করে উঠল, খবরদার, মাঠের পথ ছেড়ো না।

পিছনের লোকেরা আবার ফিরল, কিন্তু প্রত্যেকটি গুলির শব্দে ছত্রভঙ্গ হতে লাগল তারা। সেই ফাঁকেই জানোয়ারগুলি মরিয়া হয়ে পালাতে লাগল।

শেষে সব স্তব্ধ হল। তখন গোটা গ্রামটা ভেঙে পড়েছে জোড়াপুকুরের ধারে। শত্রুর মরণোৎসব দেখছে সবাই।

কুঁচলাল ক্ষিপ্র হাতে ন্যাজ কাটতে লাগল। এক দুই, তিন…বারো। বারোটা। দুই হাত তার রক্তাক্ত। পুঁটলি তার ভরতি, কিন্তু এখনও অনেক বাকি।

তবু আগে যেতে হবে ছোটবাবুর কাছে। জমা দিতে হবে। উনচল্লিশটা ন্যাজ। টাকা নিতে হবে, আমলার কাছে যেতে হবে। টাকা দিয়ে, বাকী টাকার সময় নিতে হবে, হাতে-পায়ে ধরতে হবে।

কিন্তু মিছে বলবে না কুঁচলাল, মানুষ দেখে তার বড় অবাক লাগে।

খুনী। যেন সে একটা সর্বনেশে ভয়ংকর।

তাড়াতাড়ি পথ ধরল সে উত্তর-পশ্চিম কোণ নিয়ে। রন্দাগাঁয়ের হাটের ধারে, ছোটবাবুর দপ্তরে যাবে সে। কিন্তু সবাই হেসে, চিৎকার করে, বিদ্রূপ করতে লাগল তাকে। করুক। মুখ খুলবে না কুঁচলাল। সে একটা পাখি, ঠোঁটে তার খাবার। মুখ খুললেই যেন পড়ে যাবে।

দূর থেকে নাজ্‌নাকে দেখতে পেল সে। নাজ্‌নার মাঠের ওপর দিয়েই তার পথ। নাজ্‌নার দিক থেকে কারা যেন আসছে এদিকে। হাত তুলছে, ডাকছে বোধ হয় কাউকে।

কুঁচলালকেই! ছুটতে-ছুটতে যে কাছে এল, সে গাঁয়ের বুড়ো ভবখুড়ো। ভবখুড়োর গলায় ত্রাস, কিন্তু বড় রাগ, বলল, এই আরে এই বদ, শোন।

কুঁচলাল দাঁড়াল না। মিছে বলবে না, এ সময়ে ভবখুড়োর গাল তার ভাল লাগছে না। মন্দ কিছু করে থাকলে পরে বলতে পারে। কুঁচলাল বলল, সময় নাই ভবখুড়ো, পরে শুনবখানি।

ভবখুড়ো এবার চেঁচিয়ে উঠল, থাম রে ম্যাড়া থাম, কোর্টের লুটিশ এয়েছে, প্যায়দা এয়েছে, আমলা এয়েছে।

থতিয়ে গিয়ে, ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল কুঁচলাল, কিস্তুন গুনতি পোরে নাই যে? পরমুহূর্তেই চমকে উঠে বলল, তারা এসে পড়েছে! কি বলছে তারা?

ভবখুড়ো ঢোক গিলে বলল, সেটা গিয়ে দেখবি চল।

ভবখুড়োর মুখ থেকে, বাতাসটা যেন জোর ধাক্কা দিল তার গায়ে। কাঁটা দিল যেন। চোখে তার পলক পড়ল একবারের জন্য। ভবখুড়োর পিছন ধরল সে।

তার পাঁচ বিঘার কাছে এসে, আর একবার পলক পড়ল তার। তারপরে, অপলক চোখ দুটিতে, ভয়ংকর আক্রোশের আগুনে উঠল দপদপিয়ে। বন্দুকের উপর থাবাটা শক্ত হয়ে উঠল। দেখল, তার জমিতে নীলামী নিশান উড়ছে, ট্যাং-ট্যাং করে ঢাক বাজছে, আমলা আর কোর্টের পেয়াদা খাড়া। চারটে অচেনা লোক তার কড়াইশুঁটি উপড়াচ্ছে, আলু তুলছে।

ছেলেমেয়েগুলি কোত্থেকে এসে কোমর জড়িয়ে ধরল তার। এই দুঃসময়ে বাপের জন্যে হাহাকার করছিল ওদের প্রাণগুলি। ঘোমটা টেনে তার কুসুম এসেছে, পায়ে পায়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু কুঁচলাল দেখতে পেল না। সে যেন বন্দুক-ধরা হাতটাকে তোলবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে, পারছে না। একটা পচা দুর্গন্ধ তার গা থেকে সারা জায়গাটায় ছড়িয়ে পড়েছে।

কুসুম গায়ে হাত দিয়ে বলল, অগো এই, অমন করে কি দেখছ ?

কুঁচলাল বলল, 'বাঁদর'।

কুসুম চমকে বলল, অ্যাঁ।

হ্যাঁ, মিছে বলবে না কুঁচলাল, সে দেখছে, বাঁদরে তার ফসল খাচ্ছে, তছনছ করছে। কিন্তু বাঁদরগুলির লাটিশ আছে, ড্যাট্‌রা আছে, আইন আছে।

কুসুম দুহাত দিয়ে কুঁচলালের হাত ধরে টান দিল। ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে ডাকল, অই গো, অমন করছ কেন ?

কুঁচলালের গলার শিরাগুলি যেন ছিঁড়ে গেল। আর গোসাপের মত অপলক চোখ দুটিতে অকূলের বান। ভাঙা-ভাঙা দাঁত-পেষা গলায় বলল, বাঁদর দেখ লো বউ। কিন্তু বাঁদরগুলানরে মারবার আইন নাই।

কঠিন প্রাণ কুঁচলালের চোখে জল দেখে কুসুমের 'হায়া' গেল। লোকজনের সামনে তাকে জড়িয়ে ধরে বলল, হেই গো ভগমান, তুমি কেমন কর ?

কিছু না বউ, ছোটবাবুর কাছে যাই। কামটা পাকা করতে হবে।

বিবেক

বিভূতি এখন গ্রামের বাড়িতে, নিজের ঘরে একা। নিজের ঘর মানে, শোবার ঘর না। একটা ঘরের একই খড়ের চালের নিচে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ভাগাভাগি করা। ঘরের তিন ভাগের দু ভাগ অংশ ভিতর বাড়ির উঠোনের দিকে। বাকি এক ভাগ বাইরের দিকে। সেই হিসাবে এটাকে এ বাড়ির বাইরের ঘর বলা যায়। দেওয়ালের ওপাশের ঘরটা শোবার ঘর। ভিতরে আরও ঘর আছে। একটা মাটির দোতলা ঘর, খড়ের চাল। এককোণে চওড়া কাঠের মই বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা। চাল বেশ উঁচু, দোতলার মাটির মেঝেয় দাঁড়িয়ে মাথা ঠেকে না। পাশেই রান্নার চালা, ঢেঁকিঘর। উঠোনের কোণাকুণি, পাশাপাশি দুটো মরাই। মরাইয়ের গা ঘেঁষে আর একটি ছোট ঘর, যার চালার মাথায় একটি ত্রিশূল রয়েছে। ওটা ঠাকুরঘর। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভূতির ঠাকুরদা। ও-ঘরে থাকবার মত জায়গাও আছে।

বিভূতি যখন ছোট ছিল, তখন এই বাইরের ছোট ধরটায় ওর বাবা তক্তপোশের ওপর বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন। বর্গাদার, কৃষি মজুরদের সঙ্গে চাষ-আবাদের বিষয়, দর কষাকষি, সবই এ ঘরে হত। বিভূতির মনে আছে। যথার্থ অর্থে ওর বাবা সুদের কারবারি ছিলেন না, তবে নিতান্ত কেউ দায়ে পড়লে, সোনা আর জমি বাঁধা রেখে টাকা দিতেন। জমি বাঁধা রাখতে বিক্রি কোবালা লিখে দিতে হত, কারণ বিভূতির বাবার মহাজনী তেজারতি কারবারের কোন লাইসেন্স ছিল না। তখন এক কাকাও ছিলেন। পরে আলাদা হয়ে পাশের জমিতে ঘর তুলে চলে গিয়েছেন। বিভূতি তখন ইস্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাবার সঙ্গে কাকার বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। এমন কি হাতাহাতি, লাঠিসোঁটা নিয়ে মারামারির উপক্রমও হয়েছিল। তারপরেই একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, জমি ভাগাভাগি। বাবা না কাকা, কার দোষ বেশি ছিল, বিভূতি তখন ঠিকমত বুঝতে পারে নি। তবে ও মনে-মনে বাবার সপক্ষেই ছিল। মারামারি লাগলে ও কাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক করেই রেখেছিল। পরে আরও বড় হয়ে ওর মনে হয়েছে বাবাই কাকাকে ঠকিয়েছিলেন। যে কারণে, বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কাকার বাড়ি যাতায়াত করত। বিভূতি

তখন জেলা শহরের কলেজে পড়ে। বাবা মুখ ফুটে কখনও কিছু বলেন নি। না-বলা-ভাব দিয়েই অনেক কিছু বোঝানো যায়। বাবাও বিভূতিকে সেই রকম বুঝিয়ে দিতেন। শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, কথা বন্ধ, বিদ্বেষভরা চোখের কোণ দিয়ে বিভূতির দিকে দেখতেন।

বিভূতি বুঝতে পারত বাবার দম্ভে আঘাত লাগে। তিনি যে ভাইয়ের মুখ দেখতেন না, তাঁর একমাত্র ছেলে—তাও যে-সে ছেলে না, শিক্ষিত ছেলে, গ্রামের নাম করা ছেলে, বাপের গৌরব, বংশের গৌরব, সে কি না তাঁর সেই ভাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করে? স্বভাবতই তিনি অপমানিত বোধ করতেন। এক দূর পল্লীর গণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে বিভূতিই একমাত্র ছেলে যে জেলা শহরে অনার্স নিয়ে কলেজে পড়ত, থাকত জেলা শহরে। ওদের পরিবারের জমিজমা, চাষবাস, কিছু সুদের কারবার ছাড়াও, বাবা কাকা পুরোহিতবৃত্তিও করতেন। জমিজমা বা মহাজনী কারবার এমন ছিল না, যা ঠিক জোতদারের পর্যায়ে পড়ে। কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বলা যায়। বিভূতির ভাষায় মাঝারি কুলাক। কিন্তু ব্রাহ্মণ, নানা যাগযজ্ঞে পুজাপাটের পুরোহিত, অতএব সেই হিসাবে সম্মান এবং প্রতাপ কম না। বিভূতির বাবার এ সব বোধ খুব প্রবল ছিল। এতই প্রবল, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগীদার নিজের ছোট ভাইকেও নিকৃষ্ট ভাবতেন, আর সুযোগ পেলে হেনস্থা করতে ছাড়তেন না। অতঃপর তাঁর ছেলে, সেই ছোট ভাইয়ের বাড়ি যাতাযাত করলে অপমান অভিমান বোধ স্বাভাবিক।

বিভূতি বাবার মনের অবস্থা বুঝেও গায়ে মাখত না। এমন ভাব করত যেন বাবার মনের অবস্থা ও বুঝতে পারে না। ও জানত, বাবার আচরণের মধ্যে বিভূতিকে প্ররোচিত করার একটা ভঙ্গি ছিল। বিভূতি প্ররোচিত উত্তেজিত হয়ে যদি বাবাকে কিছু বলে এই রকম একটা ভঙ্গি করতেন। অবিশ্যি বিভূতি উত্তেজিত বা প্ররোচিত হলেই যে তিনি ফোঁস করে উঠতেন, তা মনে হত না। হয়তো উনি ছেলের কাছে দুঃখে আর অভিমানে ভেঙে পড়তেন। বিভূতিকে ওর কাকার বাড়িতে না যেতে অনুরোধ করতেন তা হলে সেটা হয়ে উঠত একটা সঙ্কটের বিষয়। বিভূতির অবস্থা হয়ে উঠত কুল রাখি না মান রাখি। সেই জন্যেই ও বিশেষ করে, এই একটি বিষয়ে বাবার মনের অবস্থা না বোঝার ভান করত। ওর অন্তরে একটা শক্তি আর যুক্তিও ছিল।

ও যে কাকার বাড়ি যেত তাতে ওর মায়ের নীরব সায় ছিল, তিনি খুশি হতেন। এটা বোঝা যেত তাঁর কথাবার্তা থেকে তিনি প্রায়ই জিজ্ঞেস করতেন কাকা কাকীমার সঙ্গে ওর কি কথা হল, ভাইবোনেরা কেমন আছে, ইত্যাদি এবং তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়ত। অথচ আশ্চর্য, বিভূতির দুই বিবাহিতা দিদি যখন বাপের বাড়ি আসত তখন কখনই কাকার বাড়ি যেত না। দিদিরা পুরোপুরি বাবার সমর্থক ছিল।

চরিত্রের দিক থেকে বাবা আর কাকার মধ্যে বিশেষ কোন তফাত ছিল না। তফাত একটাই, কাকা বিভূতিদের থেকে গরীব, আর তাঁর - অর্থাৎ বিভূতির খুড়তুতো ভাইবোনের সংখ্যাও অনেক বেশি। ভূমিনির্ভর গ্রামীণ নিম্নমধ্যবিত্ত। কাকার প্রতি বিভূতির সমবেদনা নিতান্ত মানবিক কারণে না। সমবেদনার অনেকটাই ছিল ওর শহুরে ছাত্রজীবনের রাজনীতি ভাবনার প্রতিফলন। জেলা শহরে বিভূতি সেই সময়ে রীতিমত নাম করা ছাত্রনেতা। অবিশ্যি ওর মস্তিষ্কটা ছিল যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, লেখাপড়াটা মাটি হয় নি।

বিভূতির রাজনীতি করাটাও ওর বাবার আদৌ পছন্দ ছিল না। বরং একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ তাঁর আর কোন বংশধর ছিল না। তিনি মারা গেলে কি হবে? তাঁর জমি চাষ-আবাদ ফসল পুকুর গোয়াল - তাঁর প্রাণ, কে সে-সব রক্ষা করবে? ও সব ভেবে কোন লাভ ছিল না। গলদ তো গোড়াতেই ছিল। ছেলে শহরে লেখাপড়া শিখে গ্রামে ফিরে মাঝারি কুলাকের জীবনযাপন করবে তা হয় না। হয়ও নি। বিভূতির জীবনধারণের কোন বাধা বা পিছু টান ছিল না, বাবার উদ্বেগের বিষয় ওর চিন্তায়ও আসে নি। জেলা শহরের কলেজ থেকে ও যখন কলকাতার ইউনিভারসিটিতে পড়তে গিয়েছিল তখন ওর রাজনৈতিক জগৎ আরও বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু পার্টিতে তখন মরা গাঙের শুকো ভাঁটার টান। ও যখন কলকাতায় থেকে এম. এ পড়ছিল, অখণ্ড পার্টি তখন আদর্শ আর নীতিগত দ্বন্দ্বে ভাঙনের মুখে।

বিভূতির মনেও দ্বন্দ্ব জেগেছিল। দক্ষিণপন্থী শাসকদল পর্যন্ত বিভূতিদের পার্টির ধিক্কারে আর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। পার্টির অনিবার্য ভাঙনের দুটো স্লোগানের মুখে তখন বিভূতি দাঁড়িয়ে—জনগণতন্ত্র আর জাতীয় গণতন্ত্র। পার্টির আদর্শ গ্রহণ করার আগে সকলেরই একজন গুরু থাকে। বিভূতিরও ছিল। ওর জেলা শহরের কলেজের এক অধ্যাপক গদাধর রায় ওকে প্রথম পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। বিভূতি ওর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানিয়ে গদাধরবাবুকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে একটিই সঙ্কেত ছিল, 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া পথ নেই।' পত্রপাঠ বিভূতির দ্বন্দ্বের নিরসন হয়েছিল। ইউনিভারসিটিতে নিজের দলের সীমানায় গিয়ে দাঁড়াতে সময় নেয় নি।

দল ভাগাভাগির মধ্যেই বিভূতি এম. এ. পাস করেছিল। কিছুকাল আগেও যাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করেছে, তখন তাদেরই অনেকের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার লড়াই চলছিল। ছাত্র ফ্রন্টে তো বটেই, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট থেকে ক্রমে তা গ্রামের কৃষক ফ্রন্টের দিকেও এগিয়েছিল। কিন্তু এম. এ. পাস করে বিভূতি গ্রামে গিয়ে কৃষক আন্দোলনের কথা ভাবে নি। শহরে যুব ফ্রন্ট গঠনের দিকেই ওর ঝোঁক ছিল। কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি যাতায়াত চলছিল প্রায়ই। অঢেল না হলেও, টাকার টানাটানি তেমন ছিল না। বাড়ি থেকে

চাইলেই কিছু না কিছু পাওয়া যেত। বেকার জীবনের জ্বালাটা কখনই তেমন করে ওকে বুঝতে হয় নি। বাবা মা বিয়ের তাগাদা দিচ্ছিলেন।

বিভূতির মনে কোন ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না। ইউনিভারসিটির করিডোর থেকে কফি হাউস পর্যন্ত কোন-কোন ছাত্রী বান্ধবীর পাশে চলতে-চলতে মনে যে কখনই কিছু কিঞ্চিৎ রঙ ধরে নি, তা ঠিক না। কিন্তু বিভূতির আজন্ম পরিবেশ আর গ্রামের কথাও মানতে হবে। বেশির ভাগ ট্রেন দাঁড়ায় না, এমন একটা নিঝুম খাঁ-খাঁ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাসে চেপে পাচ মাইলের স্টপ। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে গ্রাম। তার মধ্যে গ্রাম থেকে টানা তিন মাইল শালবন। ছেলেবেলায় সেই শালবন পেরিয়ে স্কুলে পড়তে যেত। নতুন হাইওয়ে থেকে গ্রামের দূরত্ব দশ মাইল। যে-কোন বাস স্টপ থেকেই সাইকেল রিক্‌শায় গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের জন্য। বছরের বেশির ভাগ সময়েই কাঁচা রাস্তায় সাইকেল রিক্‌শা চলে না। চলাচলের প্রধান যান এখনও গরুর গাড়িই। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে গ্রামের বাইরে কে-ই বা যায়।

বিভূতি যতই জেলা শহরের কলেজে পড়ুক আর কলকাতার হোস্টেলে থেকে ইউনিভারসিটিতে পড়ুক, কখনই তেমন শহুরে হয়ে উঠতে পারে নি। কোন মেয়েকে প্রেম নিবেদন করতে হলে শহুরে হতে হয় নাকি? হয়তো না। কিন্তু ওর যে বন্ধুরা প্রেম করত ও তা কখনই পারে নি। বন্ধুদের ঠাট্টার জবাবে ওর মত শক্তপোক্ত একটা বলিষ্ঠ ছেলেকে হেসে বলতে হত, 'ও ব্যাপারে আমি ডিসকোয়ালিফায়েড।' অথচ মনে-মনে কোয়ালিফায়েড হবার ইচ্ছা ছিল। কারণ, বয়স আর মনের দিক থেকে ওর কোন অস্বাভাবিকতা ছিল না। আর সেটা প্রমাণ করতে পেরেছিল সাতষট্টি সালের নির্বাচনের পরে, প্রথম বামফ্রণ্ট সরকারের আমলে। যে কংগ্রেস ওদের দু পক্ষকে সংশোধনবাদী আর নৈরাজ্যবাদী বিপথগামী বলে হেয় প্রতিপন্ন করছিল, ভাঙন ধরেছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও। যার থেকে প্রসব হয়েছিল 'বাংলা কংগ্রেস'।

কংগ্রেসের পতন, বামফ্রণ্টের মন্ত্রিত্ব, এরা গাঁঙে যে জোয়ার এসেছিল, তা বিভূতিকে প্রেমের সাহস যোগায় নি, কিন্তু বিয়েটা করে ফেলেছিল। বাবা মায়ের পছন্দ, ওর অপছন্দ লাগে নি। জ্যোতি—জ্যোতির্ময়ী জেলা শহরের স্কুল ফাইনাল পাস করা মেয়ে। স্বাস্থ্য আর লাবণ্য মিশিয়ে ওর নামের মতই একটা অকৃত্রিম উজ্জ্বলতা ছিল। চোখের দ্যুতিতে বুদ্ধি ছিল, আর ছিল পরিবেশ, পরিবেশের মানুষদের ভাষা ও ভাব হৃদয়ঙ্গম করার স্বাভাবিক অনুভূতি। সব মিলিয়ে বিভূতির ভাল লেগেছিল জ্যোতিকে। জ্যোতির যে বিষয়টা বিভূতিকে সব থেকে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হল ওর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। জ্যোতি খুব অনায়াসেই বিভূতির রাজনৈতিক ধারণাকে উপলব্ধি করেছিল আর বিভূতির সহধর্মিণী হয়ে ওঠার মত একটা উৎসাহও ছিল।

সাতষট্টি সালের সেই সময়টা সব দিক থেকেই বিভূতির জীবনে একটা খুশির জোয়ার এনেছিল। গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের আন্দোলনের থেকে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে চাইছিল। তখন ওর রাজনৈতিক বিচরণ ক্ষেত্র জেলা শহর, কলকাতা আর নিজের গ্রামে। জ্যোতির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ও বিভূতির সঙ্গে ঘরের বাইরে আসতে পারে নি। বাবা মা থাকতে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্যোতির সঙ্গে পার্টি আর অনেক কমরেডের সঙ্গে একটা মোটামুটি যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল।

কিন্তু রাজনীতি কি নানী আর পানীর প্রবাদের মত? প্রবাদের আইডিয়াটা নিঃসন্দেহে রিঅ্যাকশনারি। নানী মানে মেয়ে—মেয়েদের মন আর মেঘের মতিগতি কিছুই বোঝা যায় না, কখন কোন্ দিকে মোড় নেবে, ঢল নামবে। অন্তত রাজ নীতির ক্ষেত্রে ঘটনাটা সেই রকমই ঘটেছিল। প্রথম বামফ্রণ্ট সরকারের পতন হয়েছিল। বিভূতির মনে আবার দ্বিধা আর সংশয় জেগেছিল। তার চেয়ে যেটা খারাপ, হতাশা ওকে গ্রাস করছিল। সময়টা সব দিক থেকেই খারাপ চেহারা নিয়েছিল। বাবা সেই সময়েই মারা গিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সাংসারিক এবং বৈষয়িক কর্তব্যের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বিভূতির ছিল না। অবিশ্যি সেদিকটা ও ভাবেও নি। তখন আবার সেই কলেজের অধ্যাপক কমরেড গদাধর রায়। তিনি নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আর সেই প্রথম বিভূতি চারুবাদের কথা শুনেছিল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রণ্ট সরকারের প্রতি বিভূতির আর কোন মোহ ছিল না। তার আগেই ও চারুবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ধিক্কার দিচ্ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধুয়াকে। উত্তরের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। গদাধর নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রামে ফিরে যাও, শ্রেণীশত্রু খতমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়। পার্লামেণ্টের আর এক নাম শুয়োরের খোঁয়াড়। নির্বাচন নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই।

বাম সরকার গঠনের মোহমুক্তি আর হতাশা থেকে এক নতুন উত্তরণ। চোখে আগুন জ্বলেছিল, বুকে রক্তের তৃষ্ণা। অনেক কালের পুরনো ঘুণ ধরা নীতির পরিবর্তে, একটা তাজা টাটকা আর নিশ্চিত নীতির সন্ধান মিলেছিল। বিভূতি একলাই ওর গ্রামে ফিরে যায় নি। জেলা শহর আর কলকাতা থেকে কয়েকজন তাজা জোয়ান কমরেড ওদের সুদূর অরণ্যঘেরা গ্রামে এসে আস্তানা নিয়েছিল। গদাধর রায় রাতারাতি আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গিয়েছিলেন। সকলেই তখন আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে। শক্তির একমাত্র উৎস রাইফেলের নল।

সেই সময়ে জ্যোতি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। ও যেন যথার্থ নীতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। ওদের বাড়ি, গ্রাম আর গ্রামের চারপাশের চেহারাটাই আস্তে-আস্তে বদলিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতিও বদলিয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশের গ্রামের

যতগুলো বাড়িতে বন্দুক ছিল, সবই ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। শুরু হয়েছিল খতম অ্যাকশন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও তখন শ্রেণী শত্রুর পর্যায়ে।

অন্য দিকে কংগ্রেসের নবজাগরণ ঘটছিল। ওদের বিবদমান মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশে মেঘ কেটে, ধীরে ধীরে এশিয়ার মুক্তি সূর্যের উদয় হচ্ছিল। তাদের পোষা সশস্ত্র পুলিস বাহিনী নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। থাকতেও পারে না। বিভূতিদের খতমের পাল্টা আরও ভয়াবহ আর বিশাল সশস্ত্র খতমবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল গোয়েন্দারা, নব জাগরিত মস্তানবাহিনী।

গ্রামের বাইরে তিন মাইলব্যাপী শালবনে বিভূতিদের আস্তানা ছিল। দেড় বছর পরে, জঙ্গল ঘিরে পুলিস ওদের আক্রমণ করেছিল, আর পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে, বিভূতি আহত অবস্থায় ধরা পড়েছিল।

বিভূতি সাত দিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়ে প্রথমে বাড়ি এসেছিল। পরশু কলকাতা গিয়েছিল, পার্টি লিডার গদাধর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল রাত্রে আবার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে ছ' বছরে, রাজনীতির হাল আবার সেই নানী আর পানীর প্রবাদের মত, ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। আর চারুবাদ নয়, খতম নয়, সশস্ত্র বিপ্লব নয়। জনগণের সমর্থনবিহীন ও-পথ ভুল। কমরেড গদাধর রায় প্রথম আণ্ডারগ্রাউণ্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করে এ-কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিভূতিকে জেলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বিভূতি জেলের মধ্যে তখন একটা নৈরাশ্যে ভুগছিল। গদাধরের চিঠি পেয়েই তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছিল জেল থেকে। তারপরেই পার্টির নির্দেশ, জেলের ভিতরে থেকেই বিভূতিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ-গুলো খণ্ডনের জন্যে আগে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর কেন্দ্রে জনতা সরকারকে সমর্থনের দরকার ছিল।

বিভূতিদের পার্টির মধ্যে আবা' নতুন ফ্যাকশন। জেলের মধ্যেই দল ভাগা-ভাগি হয়ে গিয়েছিল। একদল স্পষ্টই বলেছিল, 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে আর কখনই যাব না।' কিন্তু বিভূতির চিন্তায় কমরেড গদাধরের সিদ্ধান্তই যথার্থ মনে হয়েছিল। 'আমরা জনসাধারণের দ্বারা পরিত্যক্ত। এ ভুল পথে আর নয়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করে, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।'...অতএব বিভূতি জেলের ভিতর থেকেই নমিনেশন ফাইল করেছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অবিশ্যি হেরেছিল, কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। প্রায় সব পার্টি, এমন কি নির্দল প্রার্থীও ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ও খুব অল্প ভোটে হেরেছিল, ওর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সি পি এম-এর ক্যাণ্ডিডেট।

নির্বাচনে হেরে যাবার পরে বিভূতি কি মনে-মনে আবার নৈরাশ্যের শিকার হয়েছিল? প্রথমত জেলের ভিতর থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অথচ যতগুলো

পার্টি বন্দীমুক্তি আর বন্দীদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেবার জন্যে বাইরে আন্দোলন করছিল, তারা সবাই বিভূতির বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। ঐক্যের কোন প্রশ্নই ছিল না, বা বামপন্থী নীতিগত কোন আদর্শ। কেন্দ্রের জনতা সরকারের উদারতা আর রাজ্যে নিতান্ত নামেই মার্কসবাদী লেনিনবাদী এক আধটা পার্টির সমর্থন।

বিভূতি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, জেলা শহরের আর গ্রামের আশেপাশের কিছু পরিচিত এবং অপরিচিতের দেখা পেয়েছিল, যারা ওকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। বিভূতি যেন এতটা আশা করে নি। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানিটা তখনও কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তবু খুশি হয়েছিল। দু-একজন সাংবাদিকও এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে, বিভূতির নতুন করে কিছু বলার ছিল না। ওর বলবার একটা কথাই ছিল, 'আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। আমাদের পার্টি সেক্রেটারি কমরেড গদাধর রায় সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।'

একজন সাংবাদিক হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রায় ছ' বছর বাদে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়ে কেমন লাগছে?'

জিজ্ঞাসাটা ছিল এতই আচমকা, বিভূতি হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারে নি। কিন্তু চোখের সামনে বাড়ির ছবিটা ভেসে উঠেছিল। মা আর জ্যোতির মুখও। ও জবাব দিয়েছিল, 'একটা নতুন জগতের স্বাদ পাচ্ছি।'

সাংবাদিক একটু অবাক হয়েছিল, 'নতুন জগৎ?'

বিভূতি বলেছিল, 'মানে নতুন করে আন্দোলনের পথে যাচ্ছি তো, সে-কথাই বলছি। এ বিষয়ে যা বলবার, তা তো জেল থেকেই বলেছি।' বলে ও হেসেছিল।

আর এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন কোথায় যাবেন—মানে, আপনার কর্মসূচী জানতে চাইছি।'

'আগে বাড়ি যাব।' বিভূতি জবাব দিয়েছিল, 'চারদিন পরেই কলকাতায় হাজির হব, কমরেড গদাধর রায় আমাদের রাজ্য কমিটির জরুরী সভা ডেকেছেন।' ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে করমর্দন করেছিল। কেউ-কেউ ওকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল। অপরিচিতেরাও ছুটে এসে ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল। সকলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে-যেতে, ক্রমেই ওকে ঘিরে আরও অনেক মানুষের ভিড় জমে উঠেছিল। অনেকের চোখেই অবাক কৌতূহল। জেলের একশো চুয়াল্লিশ ধারার সীমানা ছাড়িয়ে, হঠাৎ কারা স্লোগান দিয়ে উঠেছিল, 'কমরেড বিভূতি মুখার্জি, জিন্দাবাদ!'

কমরেড বিভূতি মুখার্জি জিন্দাবাদ! বিভূতি নিজেও মনে-মনে উচ্চারণ করেছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি, ভিতরের নৈরাশ্যের মেঘ কেটে গিয়ে, প্রাণে একটা আলোর ঝলক লেগেছিল কি? একটা আবেগ আর উচ্ছ্বাসের জোয়ার উথলিয়ে উঠেছিল যেন। বন্ধু আর জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ওকে

অভিভূত করেছিল। বিভূতি এতটা আশা করে নি। বিরাট এক জনতা ওকে স্টেশন অবধি পৌঁছে দিয়েছিল, স্লোগান দিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে, বিদায় জানিয়েছিল। সেই জনতা কি বিভূতিদের পার্টির সমর্থক? ওদের নতুন পথ আর কৌশলকে কি তারা স্বাগত জানাচ্ছিল?

বিভূতির সঙ্গে অনেকে ট্রেনের যাত্রীও হয়েছিল, ওদের গ্রামে যাবার সেই নিকটে স্টেশন অবধি অনেকে এসেছিল। তারপরেও একটা ছোটখাটো দল ওর সঙ্গে গ্রামে, গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। ও বাড়ি পৌঁছুতেই প্রতিবেশীরা অনেকেই বাড়ির সামনে এসে ভিড় করেছিল। বিভূতি বাড়ি ঢুকতেই, প্রথমে ওর মা ছুটে এসেছিলেন, 'বিভু এসেছিস, আমার বিভু! আয় বিভু, আমার কাছে আয়।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে ছুটে এসে, দু হাত বাড়িয়ে কোন্ দিকে ছুটে যাবেন, যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। কেবল ব্যাকুল স্বরে ডাকছিলেন, 'বিভু আমার বিভু!'

বিভূতির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, মায়ের চোখে ছানি পড়েছে। মা দেখতে পান না। মনে পড়তেই ও মায়ের সামনে ছুটে গিয়েছিল, নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, 'এই যে মা আমি, এই যে!'

মা বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে, কেঁদে উঠেছিলেন, 'সকলে বলত তোকে আর কোন দিন ফিরে পাব না। হা, ওরে বিভু, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বিভূতির বুকের মধ্যে টনটনিয়ে উঠেছিল। এতটা আবেগপ্রবণ ও ছিল না। ভয় পাচ্ছিল, চোখে জল এসে পড়বে। বলেছিল, 'দেখতে পাবে মা। আমি শীগ্‌গিরই তোমার ছানি কাটাবার ব্যবস্থা করব। তুমি সবই আবার দেখতে পাবে।'

'না না, বিভু, আমি সব দেখতে চাই না।' থানের ঘোমটা খোলা, পাকা চুল মাথা নেড়ে মা বলেছিলেন, 'শুধু তোকেই একটু দেখতে চাই। এ জীবনে আমার আর কিছু দেখবার নেই, শুধু তোকে, তোকে একবারটি দেখতে চাই।' মা বিভূতির সারা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন।

পাশের বাড়ি থেকে কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। ভাই-বোনেরা এসেছিল। প্রণাম করা আর প্রণাম নেবার জন্যে একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। কাকা বিভূতির হাত ধরে, মাটির দোতলা ঘরের দাওয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন 'আয়, আগে একটু বোস।' মাকে ডেকে বলেছিলেন, 'বোঠান এসো।'

মাকে উঠোনে তাঁর সমবয়সী প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'আর তোমার দুঃখ কি? তোমার মানিককে ফিরে পেয়েছ গো।'......

বিভূতি কাকার সঙ্গে দাওয়ায় উঠে, পাশাপাশি একটা বেঞ্চিতে বসে ছিল। জ্যোতি কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছিল না। লজ্জা পাচ্ছিল নাকি বিভূতির সামনে আসতে? কাকা স্বর তুলে বলেছিলেন, 'কই গো বউমা, বিভূতির জন্যে একটু চা কর। চা জলখাবার খেয়ে একটু জিরোক, তারপরে নাইবে খাবে।'

বিভূতির একটি খুড়তুতো বোন রান্নাঘরের কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, 'বউদি চা জলখাবার করছে বাবা, হলেই আমি নিয়ে আসছি।'

জ্যোতি তাহলে বিভূতির চা জলখাবারের জন্য ব্যস্ত ছিল? উঠোনের ভিড় অনেকটাই পাতলা হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের এক পাশে বড় একটা আতাগাছের ছায়ায় মা তাঁর প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বসে বকবক করছিলেন। একটু পরেই খুড়তুতো বোন চা আর জলখাবার নিয়ে এসেছিল। কাকাকেও চা দিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি? বিভূতি মনে-মনে ভেবেছিল, জ্যোতি কখন আসবে? এতক্ষণে ওর চেহারাটাও দেখা হল না যে।

জ্যোতি এসেছিল অনেক পরে। কাকা-কাকিমা, বাইরের লোকজন প্রায় সবাই চলে যাবার পরে সামনে এসেছিল। বিভূতি তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে, কাঁধের ব্যাগটা এক পাশের তক্তপোশের ওপর রেখে, সবে মাত্র সিগারেট ধরিয়েছিল। জ্যোতি ঘরে ঢুকে আগেই নিচু হয়ে বিভূতির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। বিভূতির অবাক চমকানোর মধ্যে খুশির ঝিলিক ছিল, 'আরে, এটা আবার কি হচ্ছে?' ও জ্যোতির একটা হাত ধরেছিল।

'ধর্ম'। জ্যোতি হেসে বলেছিল। ওর বেগুনি রঙের পাড়, বেগুনি ডোরা শাড়ির ঘোমটা খসে গিয়েছিল।

বিভূতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ধর্ম'?'

'তা হলে কর্ম'।' জ্যোতি আবার হেসেছিল, 'তুমি যেমন মাকে প্রণাম করলে, কাকা-কাকিমাকে করলে। আর আমি স্বামীকে প্রণাম করব না?'

বিভূতি কৌতূহলিত উৎসুক আবেগে জ্যোতির দিকে তাকিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছ'বছর না, তারও অনেক কাল আগে থেকেই যেন জ্যোতিকে দেখা হয় নি। ভাবনাটা একেবারে মিথ্যা না। জঙ্গলের গভীরে আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থাকাকালীন জ্যোতির সঙ্গে বারকয়েক মাত্র দেখা হয়েছিল। বাড়ি আসবার উপায় ছিল না। সব সময়েই নজর রাখা হত। খুব সাবধানে, আগে থেকে খবর নিয়ে যে-কয়েকবার বাড়িতে এসেছিল, সে সময় জ্যোতির দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখা হয় নি। তাই মনে হয়েছিল, ছ' বছর না, তারও অনেক আগে থেকে জ্যোতিকে যেন দেখা হয় নি। তবু বিভূতির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জ্যোতির এমন একটা সহজ আর অনায়াস যোগসূত্র ঘটেছিল, ও রকম ভাবে স্বামীকে প্রণাম করা যেন ওকে মানাচ্ছিল না। অবশ্য বিভূতি মনে করতে পারছিল, সশস্ত্র বিপ্লব আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সময়টায়, জ্যোতির চোখে মুখে সব সময়েই যেন একটা আকস্মিকতার ঘোর ছিল। দুজনের রাজনৈতিক যোগসূত্রের কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতার ছায়া পড়েছিল। কিসের ছায়া সেটা? জ্যোতি বিভূতিকে সমর্থন করতে পারছিল না? না কি ভয়ে আর উদ্বেগে ও রকম মনে হত?

'কি দেখছ অমন করে?' জ্যোতি হেসে মাথায় অল্প ঘোমটা টেনে দিয়েছিল।

বিভূতি বলেছিল, 'তোমাকে!' এবং বিভূতি সত্যি জ্যোতিকেই দেখছিল। জ্যোতি লাবণ্য হারিয়েছে, এমন মনে হয় নি, কিন্তু কিছুটা যেন শীর্ণ হয়েছে। যে-শীর্ণতাকে যথার্থ স্বাস্থ্যহানি বলা যায় না, বরং অতি ব্যবহৃত, ক্ষয়প্রাপ্ত ধারালো কাস্তের মত। হাসিটা ওর তেমনি ঝকঝকে আছে, তবু কেমন যেন একটু বদলিয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কালো তারা দুটোয় বরাবরই একটা দীপ্তি ছিল। কিন্তু এখন যেন সেই কালো চোখের গভীরে কোথায় একটা রহস্যের অতলতা। অথচ ওকে আশ্চর্য আকর্ষণীয় লাগছিল।

জ্যোতি যেন লজ্জা পেয়ে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'ও রকম করে দেখো না, লজ্জা করছে।'

'কিন্তু আমার ভাল লাগছে। বিভূতি জ্যোতির হাতটা আর একটু জোরে চেপে ধরেছিল।

জ্যোতি কেমন হালকাভাবে হেসেছিল, 'জেলে কেমন ছিলে, শুনি আগে।'

'কেমন আবার? প্রথমে কিছু দিন খুবই টর্চার করেছিল।' বিভূতি বলেছিল, 'কিন্তু জেলের কথা বলতে এখন ভাল লাগছে না। তোমাদের—তোমার কথা বল। তোমাকে যে আমি লিখেছিলাম, শহরে বাপের বাড়ি গিয়ে আবার লেখাপড়া শুরু কর, তা তো কর নি। কোন জবাবও দাও নি।'

জ্যোতি তেমনই হেসে বলেছিল, 'ও-কথার কি জবাব আর দোব? আমার শাশুড়ীকে এখানে ফেলে রেখে, বাপের বাড়ি গিয়ে আমি কলেজে ভর্তি হব? তাই কখনও হয়?' একটু থেমে, একটু গম্ভীর হয়ে, আবার হেসে বলেছিল, 'তা ছাড়া, এ সব লেখাপড়ার কি মূল্য আছে? চারপাশে তো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলে-মেয়ে দেখছি। কি দাম আছে ও সবের?'

বিভূতির বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যেন হঠাৎ বিজলী হেনেছিল। জ্যোতি এমন একটা কথা বলেছিল, যার কোন জবাব বিভূতির সেই মুহূর্তে জানা ছিল না।

ও কিছু বলবার আগেই, জ্যোতি বাইরের দিওয়ার দিকে তাকিয়ে, চলে যেতে-যেতে বলেছিল, 'মা আসছেন, কথা বল।'

মা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

কলকাতা যাবার আগে, তিন দিন জ্যোতির সঙ্গে এই রকম টুকরো-টুকরো কথা হয়েছিল। যে সব কথার মধ্য থেকে অন্য এক জ্যোতিকে বিভূতি দেখতে পেয়েছিল। প্রথম দিনই বিকালে পুরনো একটি খবরের কাগজের একটি সংবাদের দিকে আঙুল দেখিয়ে জ্যোতি জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যি এ কথা বলেছিলে নাকি?'

বিভূতি ছোট হেডিংটার দিকে তাকিয়েছিল: 'আমি আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করি না।—নকশাল নেতা বিভূতি মুখার্জি।'

বিভূতির বুকের ভিতরে যেন একটা অন্ধকার পর্দা দুলে উঠেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, জেল থেকে বলেছিলাম। আমাদের পার্টি তখন অলরেডি এই লাইন নিয়েছিল। কেন বল তো?'

'এমনি।' জ্যোতি হেসেছিল, 'খবরের কাগজে তোমার নিজের কথা এইটাই প্রথম বেরিয়েছিল।' বলতে-বলতে ও রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।

বিভূতি কাগজ ছেঁড়বার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তার মানে, তিন মাস রেখে দেওয়া খবরের কাগজটা জ্যোতি ছিঁড়ে ফেলেছিল। যেন বিশ্বাস করতে পারে নি, বিভূতি ও-কথা বলেছে। তার মুখ থেকে শোনবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাই কি? তা না হলে জিজ্ঞেস করার অর্থ কি, ছিঁড়ে ফেলারই বা কারণ কি?

বিভূতি পরে এক সময়ে জ্যোতিকে বলেছিল, 'আমরা ভুল পথে চলেছিলাম। জনসাধারণ আমাদের ত্যাগ করেছিল। হঠকারিতা বলতে পারো। আমাদের নতুন আন্দোলন কি ভাবে শুরু হবে, কলকাতার রাজ্যকমিটিতে সেই আলোচনা হবে। মূলত গ্রামে-গ্রামে কৃষক আন্দোলনকেই আমরা সংগঠিত করব।'

জ্যোতি বিভূতির চোখের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো শুনেছিল, আর কেবল একটি মাত্র শব্দ করেছিল, 'ও।'

বিভূতি বুঝতে পেরেছিল, শব্দটার মধ্যে নির্লিপ্তির সামান্য সুরও ছিল না। জ্যোতি আবার হালকাভাবে হেসে যেন খুবই আলগোছে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আন্দোলন করলে, জনতা সরকার কিছু বলবে না?'

বিভূতির প্রথমে মনে হয়েছিল, জ্যোতি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ওর চোখে ঠাট্টার লেশ ছিল না। বিভূতি বলেছিল, 'বলতে পারে, তা বলে আমরা আন্দোলন থামাতে পারি না। আমরা জনতা সরকারকে কোন মুচলেকা লিখে দিই নি।'

'তা বটে।' কথাটা বলে জ্যোতি সামনে থেকে চলে যাবার উপক্রম করেছিল।

বিভূতি তাড়াতাড়ি ডেকে বলেছিল, 'জ্যোতি, এবার থেকে আমি গ্রামেই আন্দোলন শুরু করব। এখন আমার সঙ্গে আন্দোলনে নামতে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।'

জ্যোতি হতচকিত বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, 'আমি? আন্দোলনে নামব?' তারপর হঠাৎ হেসে উঠে মাথা নেড়েছিল, 'না না, আমি ও সবে নেই। আমার সংসার আছে, শাশুড়ী আছেন, তুমি আছ। এ সব ছাড়া আমি এখন আর অন্য কিছু ভাবতেই পারি না।'

বিভূতি আহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমাদের পার্টিতে আসতে চাও না?'

'আমি কোন পার্টিতেই যেতে চাই না।' জ্যোতি আলগাভাবে হেসে বলেছিল, 'আমি একেবারে সাধারণের দলে। আমার বাপু কোন পার্টি-টার্টির দরকার নেই। তোমার জন্যে একটু চা করে নিয়ে আসি।' জ্যোতি সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

বিভূতির বুকে সেই অন্ধকার পর্দাটা দুলে উঠেছিল। জ্যোতির চলে যাওয়াটা অসামান্য মনে হয়েছিল। ওর হাসিটা কি সত্যি নেহাত আলগা? বিভূতি তো চায়ের তৃষ্ণাবোধ করে নি।

কলকাতা যাবার আগের দিন বিকালে, জ্যোতি হঠাৎ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস কর না, কিন্তু যে নিরপরাধ লোকগুলোকে তোমরা খুন করেছ, তার কি হবে?'

বিভূতি অবাক হয়ে বলেছিল, 'নিরপরাধ জেনে তো আমরা কাউকে মারি নি।'

'তবু তো অনেকে নিরপরাধ ছিল।' জ্যোতির মুখে সেই আলগা হাসি লেগে ছিল। চোখের কালো তারায় কি কৌতুকের ছটা?

বিভূতি বলেছিল, 'আমরা তো বলেছি, সেগুলো আমাদের ভুল হয়েছিল।'

'তা বটে।' যেন খুব তুচ্ছভাবে হেসে বলেছিল জ্যোতি।

বিভূতি চুপ করে থাকতে অস্বাস্তিবোধ করেছিল, 'আমরা ভুল করেছি, আবার তা সংশোধন করব। কিন্তু আমাদের থেকে পুলিস আরও অনেক বেশি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে।'

'পুলিস!' জ্যোতি যেন অবাক হেসে কথাটা উচ্চারণ করেছিল, 'ওদের সঙ্গে তোমাদের আমি মেলাতে পারি না। পুলিস তো পুলিসই। ইদানীং দেখছি, তারাও বাড়াবাড়ির ভুল স্বীকার করছে। অদ্ভুত, না?' যেন নেহাত কৌতুকোচ্ছলে শব্দ করে হেসে উঠেছিল।

বিভূতির বুকের ভিতরের সেই অন্ধকার পর্দা দুলছিল, আর অস্বস্তি বাড়ছিল এবং কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে নি। জ্যোতির হাসিটা অসাধারণ মনে হয়েছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি কিছু বলতে চাও?'

জ্যোতি ওর হাসির সরসতা হারায় নি, ওর অনায়াস ভঙ্গিতে বলেছিল, 'না। মাঝে-মাঝে গোপালদার কথা আমার খুব মনে হয়।'

বিভূতি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'কে গোপালদা?'

'একজন ফেরিওয়ালা।' জ্যোতির সরস হাসিতে একটু যেন ছায়া ঘনিয়েছিল, 'এই গ্রামের বাইরে তোমরা যাকে শেষবার খতম করেছিলে।'

বিভূতি অধিকতর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফেরিওয়ালা? হ্যাঁ, কিন্তু সে গোপালদা কি করে হল?'

'গোপালদা শহরে আমার বাপের বাড়ির পেছনে তাঁতীপাড়ায় থাকত।' জ্যোতি মুখের হাসি বজায় রেখে বলেছিল, 'পরে জেনেছিলাম, আমার ভাইয়ের কাছে, সেই ফেরিওয়ালা আমাদের তাঁতীপাড়ার লোক। লোকটা খুব রগুড়ে ছিল, অনেক মজার-মজার ছড়া কাটতে পারত, কোমর ঘুরিয়ে নাচত—লোক হাসাবার জন্যে—আসলে মাল বিক্রির ফিকিরে।' জ্যোতির মুখ রক্তের ছটায় যেন দপদপ করছিল, কিন্তু হাসছিল, 'আমরা ছেলেবেলা থেকে গোপালদাকে চিনতাম, অনেক পুঁতির

মালা আর কপালের টিপ তার কাছ থেকে কিনেছি। তার বউ আর তিন চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। বউটিকেও দেখেছি—ভারি মিষ্টি—কিন্তু আশ্চর্য, গোপালদাকে এ গ্রামে কোন দিন মাল ফেরি করতে আসতে দেখি নি। শহর থেকে অন্য এক ফেরিওয়ালাই তো এ গ্রামে আসত।'

বিভূতির চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভাসছিল, গলা কাটা ফেরিওয়ালাটা শালগাছের গোড়ায় ছিটকে পড়ল। রক্তাক্ত ছুরিটা ওর নিজের হাতে। মাথার বেতের গোল চুপড়িটা আর কাঁধে ঝোলানো, সেপ্টিপিন, চুলের ফিতের ব্র্যাকেটটাও দু পাশে পড়েছিল। সিঁদুর, আলতা, সস্তা সাবান, স্নো, পাউডার, গোল চৌকো ছোট-ছোট আয়না, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বাঁধানো দেবদেবীর ছবি, এমন কি খানকয়েক সিনেমার চটি ম্যাগাজিনও। জ্যোতি বলছিল, আর সেই ছবিটা বিভূতির চোখের সামনে ভাসছিল, একটা খতমের ছবি। কিন্তু ওর বুকের অন্ধকারে বিজলী হানাহানি করছিল। মনে হচ্ছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ঘেমে উঠেছিল। প্রায় ফ্যাসফেসে স্বরে বলেছিল, 'লোকটা আমাদের সাসপেক্টের তালিকায় ছিল, আগে থেকেই খবর ছিল, ও একজন স্পাই। আসলে শহর থেকে আসা নতুন মুখ কি না, তাই—' বিভূতি জ্যোতির দিকে চোখ তুলতে গিয়েছিল।

জ্যোতি তখন সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

পরের দিন ভোরবেলার ট্রেনেই বিভূতি জেলা শহরে গিয়েছিল। আগে ঠিক ছিল, রিকশায় হাইওয়ে পর্যন্ত গিয়ে, টানা বাসে কলকাতায় যাবে। কিন্তু ও মতের পরিবর্তন করেছিল। শহর হয়ে কলকাতা যাওয়া স্থির করেছিল। শহরে গোপাল ফেরিওয়ালার বিধবার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছা হয়েছিল। জ্যোতিকেও বলেছিল সে-কথা। জ্যোতি অবাক হয়ে বলেছিল. 'গোপালদার বউকে তুমি কোথায় পাবে ?'

'কেন, তাঁতীপাড়ার বাড়িতে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি যেন জোর করে হেসেছিল, 'সে কি আর সেখানে আছে ?'

'কোথায় যাবে ?'

জ্যোতি ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'কি জানি।'

'তোমার ভাই হয়তো বলতে পারে।'

'তা হয়তো পারে।' জ্যোতি হেসেছিল, 'কিন্তু কেন, কি হবে দেখা করে ?'

'তা জানি না। একবার দেখতে ইচ্ছা করছে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি হেসে বলেছিল, 'ভুল তো ভুলই। সব ভুলের কি সংশোধন হয় ?'

হয়তো হয় না, তবু বিভূতি গিয়েছিল। জ্যোতির হাসিটা খুব সহজ মনে হয় নি। শহরে পৌঁছে ওকে আগে জ্যোতির বাপের বাড়ি যেতে হয়েছিল। জামাই আপ্যায়নকে সে মোটেই আমল দেয় নি। জ্যোতির ভাই টুপান, কলেজে পড়ে।

টুপানকে ও বলেছিল, 'আমাকে একবার গোপাল ফেরিওয়ালার বাড়ি নিয়ে যেতে পারো ? আমি তার বিধবার বৌয়ের সঙ্গে একবার দেখা করব।'

টুপান হতচকিত বিস্ময়ে বলেছিল, 'সে তো আর তাঁতীপাড়ায় থাকে না।'

'কোথায় থাকে ?'

বিভূতির কথার জবাব, টুপান হঠাৎ দিতে পারে নি, কেমন যেন থতিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতি আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দূরে কোথাও চলে গেছে ?'

টুপান মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, এ শহরেই আছে।'

'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো ?' বিভূতি ব্যগ্র ভাবে জিজ্ঞেস করেছিল।

টুপান বলেছিল, 'পারি।'

'তবে চল।' বিভূতি বলেছিল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই, কলকাতায় যেতে হবে।'

বিভূতিকে নিয়ে টুপান সাইকেল রিক্‌শায় চেপে শহরের এক অংশে গিয়েছিল। যে রাস্তায় গিয়ে ঢুকেছিল, বিভূতি দেখেই চিনতে পেরেছিল, অঞ্চলটা শহরের বেশ্যাপল্লী। শহরের সব থেকে শ্রীহীন দুর্ভাগা অঞ্চল। অধিকাংশই মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। দোকানপাট বলতে চা, তেলেভাজা, পান-বিড়ি-সিগারেট সবই বিবর্ণ। কাছে একটা পুকুরে পাড়ার মেয়েদের উদাস আর নির্লজ্জ অবগাহন, বাসন মাজা, কাপড় কাচার সঙ্গে উৎকট আলাপ। পাশাপাশি কয়েকটা ঘিঞ্জি ঘরের সামনে টুপান রিক্‌শা দাঁড়াতে বলেছিল।

বিভূতি যেন স্বগতোক্তি করেছিল, 'সে এখানে থাকে ?'

টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

বিভূতি এক মুহূর্ত ভেবেছিল, রিক্‌শা থেকে আদৌ নামবে কি না। ওর চোখের সামনে, শালগাছের গোড়ায় ছিটকে পড়া সেই রক্তাক্ত চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গোপালের ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে ?'

'এখানেই।' টুপান নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'কোথায় আর যাবে ?'

বিভূতি রিক্‌শা থেকে নেমেছিল। তারপর টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ঠিক জানো, সে এ বাড়িতেই থাকে ?'

'কুসুমদিকে এখানেই অনেক দিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।' টুপান সহজভাবে বলেছিল।

কুসুমদি! বিভূতি মনে-মনে উচ্চারণ করেছিল। ইতিমধ্যে কৌতূহলী দু-একজন ওদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। টুপান একটি ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডেকেছিল, 'কুসুমদি আছ নাকি ?'

ভিতর থেকে গোঙানো স্বরে জবাব এসেছিল, 'কে ?' তারপরে আলুথালু বেশে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের একটি স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছিল। উস্কখুস্ক চুল, গায়ে জামা নেই। গলায় আর গালে ধুলো। চোখ দুটো লাল। তার সারা গা থেকে

মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধ হয় কাঁচা মাটির মেঝেয় শুয়ে ছিল, গত রাত্রের খোয়ারি মেটে নি। লাবণ্য না থাক, সদ্য তাতানো বাসি ব্যঞ্জনের মত একটা ঝাঁজ ছিল শরীরে। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল—হ্যাঁ, এক সময়ে সত্যি মিষ্টি দেখতে ছিল। বিভূতি ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

কুসুম অবাক চোখে টুপানের দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'টুপান না কি ? তুই হেথাকে ক্যানে ?' বলে বিভূতির দিকে একবার তাকিয়ে, গায়ের কাপড় ঠিক করেছিল।

টুপান বিভূতির দিকে একবার তাকিয়েছিল, 'কুসুমদি, ইনি আমার জামাইবাবু, তোমার কাছে এসেছেন।'

'আমার কাছে ?' কুসুম যেন অবাক আর শশব্যস্ত হয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা করেছিল, যদিও দিতে পারে নি, বরং নিজেকে আরও অবিন্যস্ত করে তুলেছিল, 'জ্যোতিনের বর আমার কাছে ? ক্যানরে টুপান ?'

হ্যাঁ, জ্যোতিকে ওর বাপের বাড়িতে, পাড়ার প্রতিবেশীরা জ্যোতিন বলেই ডাকে। টুপান তাকিয়েছিল বিভূতির দিকে। বিভূতির বুকের ভিতরে অন্ধকার পর্দাটা যেন বাতাসের ঝাপটায় বাড়ি খাচ্ছিল। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, ফ্যাসফেসে স্বরে বলেছিল, 'আচ্ছা, একটা কথা, আপনার মনে আছে কি, আপনার—'

কুসুম ফেসো গলায় হেসে উঠে, মুখে আঁচল চেপেছিল। লাল চোখে বিভূতিকে একবার দেখে, টুপানের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'অই মা, কোথা যাব গ' জ্যোতিনের বর আমাকে আপনি আজ্ঞা করছে যে ?'

বিভূতি একটু থতিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনি সম্বোধন করা ছাড়া, ওর কোন উপায় ছিল না। ও খুব তাড়াতাড়ি ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার স্বামী তো কখনও সেই গ্রামে ফেরি করতে যেত না। আমি তো সেই গ্রামের ছেলে কখনও দেখি নি। অন্য এক ফেরিওয়ালাকে দেখতাম।'

'হুঁঃ কেতু যেত, উদিককার দূরের গাঁগুলোতে কেতু ফিরি করতে যেত।' কুসুম যেন একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল, 'তা সে ও কপালের নিকন। কেতুটা মাসভর জ্বর জ্বালায় ভুগছিল। আমার সোয়ামীকে বলেছিল, 'নইলে আবার কোন্ নতুন নোক হোথাকে বাজার জমিয়ে বসবে, তাই যেতে বলেছিল। মানুষের মন তো, দুদিন না দেখলে ভুলে যায়। তাই আমার নোক কেতুর মাল নিয়ে গেছল। কপালের নিকন, আসলে যমে টেনেছিল যে গ !'

যমে টেনেছিল ! বিভূতির চোখে ওর নিজের চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। হাতে ছুরি, দাঁতে দাঁত পেষা। অন্যান্য কমরেডরা আশেপাশে গাছের আড়ালে। বিভূতি বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেরিওয়ালার ওপর, আর বাঘের মতই টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাছের গোড়ায়, আর ছুরির একটা নির্ঘাত ফালাতেই টুঁটি দুই টুকরো। কুসুমের সামনে দাঁড়িয়ে বিভূতি ওর দুটো হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে

দিয়েছিল। টুঁটি কাটার অনুভূতিটা যেন হাতে স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। হাত দুটো ঘেমে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল, আর বিকৃত গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর তারপরেই আপনি এ পথে চলে এলেন? এই জীবনে?'

কুসুম হেসেছিল, 'এমনি কি আর এইচি। ছেলেমেয়েগুলানকে নিয়ে ধান্দা তো মেলাই করেছিলাম—তা সে তোমাকে আর কি বলে বুঝাব গ, ভাতার মরা, ক'ড়ে রাঁড়ি, নুকব কোথা? পেটের শত্তুরগুলানকে বাঁচাই বা কি করে? তাই এক ভাতার হারিয়ে বারোভাতারি হইচি।'

বিভূতির চোখে সেই অবাক আর ভয়ার্ত চোখ দুটো ভাসছিল, আর সেই অস্ফুট গোঙানি কানে বাজছিল, যে গোঙানিতে আর্ত আর অবাক জিজ্ঞাসা ছিল।

কুসুমের লাল চোখে কৌতূহল ফুটেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হ্যাঁ রে টুপান, জ্যোতিনের বর জেলে ছিল না?'

টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ, কয়েকদিন হল ছাড়া পেয়েছেন।'

'অ।' কুসুম বিভূতির দিকে তাকিয়েছিল. 'তা, জামাই, তুমি আমাকে এ সব কথা জিগেস করছ ক্যানে?'

কেন, কেন জিজ্ঞেস করছিল বিভূতি? তৎক্ষণাৎ কোন জবাব দিতে পারে নি। বলতেও পারে নি, সে-ই সেই কপালের লিখন, সে-ই সেই যম। একটু পরে তার গলার স্বর যেন কোলা ব্যাঙের মত শুনিয়েছিল, 'আমি বলতে এসেছিলাম, আপনার স্বামীকে ভুল করে মারা হয়েছিল।'

'অহ্, এই কথা!' কুসুম হেসে তুচ্ছভাবে বলেছিল 'তা হবে। ও-কথায় আর কি দরকার. সব তো চুকেবুকে গ্যাছে। খুনের খবর যখন পেথাম পেইছিলাম, তখন মনে-মনে বলতাম, ও তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা গ। দেশে গাঁয়ে এত যে শত্তুর, সব লাট বেলাটি করে বেড়াচ্ছে, উয়াদের মুণ্ডুগুলোন কাটে নাই ক্যানে?' কুসুম টুপানের দিকে যেন লাল চোখে রেগে তাকিয়েছিল, 'ওই উয়াদের, জামাইকে যারা জেলে পুরেছিল. উয়াদের মুণ্ডুগুলোন কাটা যায় নাই ক্যানে?' সে ঘাড়ে ঝটকা দিয়েছিল, দিয়ে হেসেছিল 'ত বুঝি!'

উয়াদের মুণ্ডুগুলোন! বিভূতি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল, আর জ্যোতির মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বুকের অন্ধকার পর্দাটা ঝাপটায় ফালা-ফালা হচ্ছিল, আর আগুনের হল্কা ছিটকে আসছিল। রাগে না, ভিতরের একটা অবাধ্য আবর্তকে রোধ করার জন্যেই যেন দাঁতে দাঁত চেপে বসছিল। ঘামে গায়ের জামাটা সপসপে হয়ে যাচ্ছিল। কুসুমের দিকে তাকিয়ে কোন রকমে উচ্চারণ করে-ছিল, 'চলি।' বলেই রিক্‌শায় উঠেছিল।

বাইরের ঘরে অন্ধকার নেমে আসছে। বিভূতি যেন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এখনও দু-একটা পাখির ডাক শোনা যায়। ও কিছুক্ষণ আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকেছে, ভিতরে যায় নি। রাজ্য

কমিটির সভায় আলোচনার মোট বক্তব্য সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলোর ঐক্যসাধন, শহরে গ্রামে যুগপৎ তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে তোলা। এ রকম একটা বক্তব্য বিভূতির জানাই ছিল, কিন্তু এই প্রথম পার্টির সভা ওর মনে তেমন কোন দাগ কাটে নি, কারণ মস্তিষ্কের কোষে-কোষে সমস্ত সীমান্ত জুড়ে কেবল কুসুমের কথাই বেজেছে। এখনও বাজছে।

জ্যোতি একটা ছোট লণ্ঠনের আলো নিয়ে ঘরে ঢুকল। না, বিভূতিকে দেখে সে অবাক হল না বরং সহজ ভাবেই বলল, 'কলকাতা থেকে ফিরে বাড়ি ঢোক নি কেন? অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছ?'

বিভূতি জ্যোতির দিকে ফিরে তাকাল, 'হ্যাঁ, অন্ধকার। তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। জ্যোতি, আমি গোপালদার বউ কুসুমের সঙ্গে দেখা করেছি।'

জ্যোতি আলগাভাবে হাসল 'তাই নাকি? কুসুমদি তো শুনেছি—'

'হ্যাঁ, উনি—' বিভূতি জ্যোতিকে বাধা দিয়ে কুসুমের বেশ্যা জীবনযাপনের কথা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। ও দেখল, লণ্ঠন হাতে জ্যোতির চোখ দুটো প্রতিমার প্রদীপ্ত অপলক চোখের মত আকর্ণ বিস্তৃত দেখাচ্ছে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ বিভূতির চোখের দিকে।

বিভূতির ছায়া মাটির দেওয়ালে। জ্যোতির ছায়া ঘরের মেঝেয় দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। বিভূতির স্বর যেন দৈববাণীর মত শোনাল, 'কুসুমদি বললেন, দেশে গাঁয়ে এত যে সব শত্রু লাটবেলাটি করে বেড়াচ্ছে, আমাদের যাঁরা জেলে পুরেছে, তাদের মুণ্ডুগুলো কাটা হয় না কেন?'

জ্যোতির অপলক চোখ যেন আরও দীপ্ত দীর্ঘ হল। প্রতিমার মুখে ঘাম তেল মাখানো। দৃষ্টি বিভূতির চোখের প্রতি। আলগা হাসিটা এখন আর নেই। ও লণ্ঠনটা রাখবার জন্যে বিভূতির সামনে এগিয়ে গেল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপরে লণ্ঠনটা রাখল। ওর ছায়াটা এখন বিভূতির পাশে মাটির দেওয়ালে উঠে এলো।

বিভূতি মুখ ফিরিয়ে জ্যোতির দিকে তাকালো। জ্যোতির মুখ নিচু। বিভূতির মনে হল ওর গলার কাছে কিছু ঠেলে আসছে, কোন কথা—অথচ উচ্চারিত না হয়ে কেবল শক্ত আর ভারি হয়ে উঠেছে।

জ্যোতি মুখ তুলে বিভূতির দিকে তাকাল। জ্যোতি হাসছে। অনেক দিনের পুরনো জ্যোতিকে যেন চেনা যাচ্ছে। এ হাসি আলগা না, এ হাসি জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতি ওর আপন রূপে চেনা হয়ে উঠছে, চোখের দুই কোণে দুটি বিন্দুর কিরণে।

মান

সুখবতীর বড় ছেলে বেরজো অর্থাৎ ব্রজ এ সংসারের এক মহাবিস্ময়। বলতে কি, এমনটি এ কালিকালে দেখা যায় না। লোকে বলে, ছেলে তো নয়, রতন। সে তুলনায়, ব্রজবিহারীর পর বনবিহারী, অর্থে বুনো। নামে, কামে, স্বভাবে, ও বুনোই। বিধবা সুখবতীর আর-তার ছোট ছেলেমেয়েদের এখনও বিচারের সময় হয় নি। সুখবতীর আসল নাম বেরজোর মা।

ছিল জাতে মালা, এখন জাত নেই। জাতের কাজ থাকলে তো জাত। তা-সে মালার ডিঙিনৌকোও নেই, নেই জাল ঘুনি আটোল। সে সব ঘুচেছে সুখবতীর শ্বশুরের আমল থেকেই, তারা এখন কারখানার মজুর। ব্রজর বাপ মরেছে কারখানার তেলা মেঝেয় পিছলে গড়িয়ে, মেশিনের তলায় পা কোমর গুঁড়িয়ে।

বড় রাস্তার ধারে আবর্জনা-ভরা পুকুর। তার ধার দিয়ে যে সরু গলিপথটা আরও তিনটে ছায়াঘন অর্ধ কানাগলির মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে, সেই পথের ধারে ছিটেবেড়া আর খোলার ছাউনির, নসিরামের বস্তি। বারমুখো ঘরের নিচে, স্যাঁতানো সরু পথে যখন ব্রজর মরা বাপকে, সুখবতীর সোয়ামীকে, এনে শোয়ালে, তখন সুখবতী বুক চাপড়ে চুল ছিঁড়ে কেঁদে চেঁচিয়ে আর বাঁচে না।

ভোরবেলা উঠে ব্রজ মাকে প্রণাম করে যখন বললে, 'মা, তোমার বেরজো রয়েছে, ভাবনা কি', তখন যেন সুখবতীর পাষাণভার অনেকখানি নেমে গেল।

হ্যাঁ, এমনি ব্রজ, জাতে মালা, থাকে বস্তিতে, তবু এক মহাবিস্ময় সে। হিরণ্য-কশিপুর ঘরে প্রহ্লাদ, অসুরের ঘরে দেব-সুত। সে ভোরবেলা উঠে ভগবানকে স্মরণ করে মায়ের পাদোদক খায়, গঙ্গায় যায় নাইতে ; ফোঁটা দেয় কপালে গঙ্গামাটির, জল দেয় তুলসীতলায়, দিয়ে আবার মাকে প্রণাম করে। সুখবতী মরমে মরে যায়। ভাবে, এ ছেলের মায়ের যুগ্যি নয় সে। নিজেদের জাত বংশে দূরে থাক, এ যেন বামুন কায়েতকেও হার মানায়।

ব্রজর নেই নেশাভাঙ, নেই মুখে দুটো কটু কথা। ছেলে মুখ তুলতে জানে না, হাজার চড়ে সুখবতীর এ ধর্মিষ্টি ব্যাটার মুখে রা নেই। বোলতার ঠাস বুনোন চাকের মত এ বস্তিতে হাজারো ইতরের বাস, হাঁকাহাঁকি, খিস্তিবাজী, নোংরামি, ঝগড়া, যেন গুলজার করা নরক। কিন্তু কেউ কোন দিন এদের সঙ্গে

একটা কথা বলতে দেখেছে ব্রজকে ? নাওয়া-খাওয়া, শোয়া, এ ছাড়া ব্রজ এ তল্লাটে থাকে না। তার বন্ধুবান্ধব সব ভদ্রপাড়ায়। বামুন-কায়েতের লেখাপড়া-জানা অবস্থাপন্নদের সঙ্গে তার বন্ধুত্ব।

বস্তির সবাই সসম্মানে ব্রজর কাছ থেকে দূরে থাকে, হিংসে করে সুখবতীর পুত-ভাগ্যকে। মায়েরা বলে ছেলেদের, 'ব্রজর পাদোদক খেয়ে তোরা মানুষ হ।'

পাওয়ার হাউসের সি. এ. পার্সেনের কণ্ট্রাক্টরের আণ্ডারে কাজ করে ব্রজ। বাঙালি ফোরম্যান সাহেবও বড় ভালবাসেন ব্রজকে। খালাসী তার ডেজিগনেশান, কিন্তু কাজের বেলায় ফাইল খাতা বাছগোছ করা, মেশিনের নম্বর টোকা। একটু-আধটু লিখতে-পড়তেও জানে সে। তার অমায়িক ভদ্রতায় ফোরম্যান খুশি, প্রতিদানে মর্যাদাও দিয়েছেন, আশাও দিয়েছেন ভবিষ্যতে তাকে বাবু করে দেওয়ার, মানে কেরানি।

পার্সেনের খালাসী মজুররা এতে অস্বাভাবিক কিছু দেখে না ব্রজর। সত্যি, ব্রজ তাদের তুলনায় বড়ই। সে ভদ্রলোক। ফলে তাদের সঙ্গে পোট খায় না।

ব্রজ অজাতশত্রু। এক কথায়, দেশে এমন গুণে ছেলে আর হয় না।

সুখবতী নাম সার্থক এ-সৌভাগ্যে। আবার দুর্ভাগ্যজনিত অশান্তির অন্ত ছিল না তার ছোট ছেলে বুনোকে নিয়ে !

বুনো তার শক্ত রুক্ষ মস্ত শরীরটা নিয়ে দুমদাম করে আসে, গুপগাপ করে খায়, ঘরে-বাইরে গলাবাজী করে ঝগড়া করে, মারামারি করে, গলা ফাটিয়ে হাসে. গান করে, মুখ খারাপ করে। তার কোন কিছুতেই ঢাকাঢাকিও নেই, চাপাচাপিও নেই। উদ্ধত অবিনয়ী। তার মা-ডাকে মধু ঝরে না, যেন মাকে খেঁকিয়ে ওঠে। তেলচিটে এক মাথা চুল নিয়ে, মুখে বিড়ি নিয়ে সে কারখানায় যায়, তারপর এখানে সেখানে ঘোরাফেরা। বস্তির সকলের সঙ্গে তার এ-বেলা ঝগড়া, ও-বেলা ভাব। মর্জিমত ছোট-ভাইবোনদের কখনও ঠ্যাঙাচ্ছে, কখনও আদরের ঠেলায় অন্ধকার। সুখবতীর সুখ নেই, সারাদিন 'বুনো রে, বুনো রে' করে তার পিছে-পিছে ফিরছে. কখন কি অনাছিষ্টি বাধিয়ে বসে সেই ভয়ে। হারামজাদা যে যমেরও অরুচি !

কপালগুণে দোষ পায়। একই পেটে তার দেবাসুর ঠাঁই পেল কেমন করে ! সুখবতীর চেঁচামেচির, গালাগালির অন্ত নেই বুনোকে ঘিরে।

বুনোর বন্ধুরাও সব ডাকাবুকো। তাদেরও আচার-বিচার নেই। কেউ-কেউ নেশাভাঙে সিদ্ধহস্ত। ভদ্রপাড়ায় মান দূরে থাক, আনাগোনাও নেই।

সেও খালাসীর কাজ করে পার্সেনে। ব্রজর মত তার খাতির নেই। কি গ্রীষ্মের পোড়া দুপুরে আর কি শীতের ভোরের তুহিন ঠাণ্ডায় সে টুকটাক করে বেয়ে ওঠে ইমারতের লোহার ফ্রেমের উপর। ছ' ইঞ্চি রেলিং-এর উপর সমস্ত শরীরের ভার দিয়ে পাঁচ পাউণ্ড ওজনের রেঞ্চ দিয়ে স্ক্রু আঁটে আর হেঁড়ে গলায় চেঁচিয়ে গান গায়, 'দেখে তোমার চাঁদ মুখ, পরাণে ধরে না সুখ।'

নিচে থেকে ব্রজ অবাক মানে। এই অবস্থায় সে গান গায় কি করে। আবার মানও যায়। এ-সব যে অসভ্যের অনাচার।

ব্রজ বাবু হবে। বুনোর কাছে সেটাও বিস্ময়। বলে—'আমার পেটে বোমা মারলেও নম্বর টোকা-ফোকা হবে না বাবা। আমি হব ফিটার।'

ব্রজর পাদোদক খাওয়ার কাহিনী এ-অঞ্চলে বিখ্যাত। বুনোকে কেউ যদি বলে, 'তুইও কেন খাসনে?'—খিলখিল করে হেসে বুনো বলে, 'আমার মাইরি লজ্জা করে।' বলে, 'শালা সং-এর ঢঙ।'

মাসের শেষে ব্রজ মাইনে পেয়ে সব মায়ের হাতে তুলে দিয়ে পরে হাত পেতে চেয়ে নেয়, 'মা দুটো টাকা দেবে গো?' বুনোর ও-সব নেই। সে টাকা দুটি পকেটে রেখে বাকিটা মায়ের হাতে ফেলে দেয়। দিয়ে বলে, 'কিপটেমি কোরো না। আজ এট্টুস মাছ খাইও।'

সে খালি সইতে পারে না বজ্রের তুলনা। কিন্তু তার মা সারা দিন তার পিছনে খালি থোক কাটবে, 'ব্রজ এই, ব্রজ সেই, আর তুই হারামজাদা—'

বাস, আর বলতে হবে না। আরম্ভ হয়ে যাবে বুনোর বুনো ঝগড়া আর গালাগাল। আর ঝগড়ায় তো সুখবতীও কম নয়। সোয়ামী বেঁচে থাকতে রোজ ঝগড়া ছিল, এখন সেটা বুনোর সঙ্গে। এ ড্যাকরা যে বাপের মত কুচাল পেয়েছে।

আর সইতে পারে না বুনো ব্রজর শাসন। ব্রজ যদি বলে, 'বুনো এটা করিস নে', বুনো সটান জবাব দেবে, 'তোর নিজের চরকায় তেল দি'গে যা।'

এই সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। পার্সেনের কণ্ট্রাক্টরি কাজ মানেই হল পাওয়ার হাউসের মত ও-সব রাক্ষুসে কারখানা তৈরি করা। আর যত ওঁচা কাজ হল খালাসীদের। সেদিন একটা খালাসী কি কথায় ফোরম্যানকে বলেছে, শরীরটা তার খারাপ, আজ সে ওপরে উঠতে পারবে না। অমনি ফোরম্যান খিঁচিয়ে উঠল, 'হারামজাদা, পারবি নে তো চাকরি ছেড়ে দে।'

সামনে ছিল বুনো। সে হেঁড়ে গলায় গাক করে উঠল, 'গালাগাল দিচ্ছেন কেন মশাই?'

ফোরম্যান তো থ। ছোঁড়া বলে কি? মুখের পরে কথা? সে-খালাসীটাকে উপরে উঠতে হল না বটে, কিন্তু বুনোর চাকরি যায়-যায়।

ব্রজ এসে ভাইকে বুঝিয়ে বললে, 'দ্যাখ ভাই, ওদের মুখে সব মানায়, তোর মুখে নয়। মাফ চেয়ে নে।'

বুনো এ কথায় বললে, 'দ্যাখ বেরজা, আর একটা কথা বলবি কি ঠেঙিয়ে তোর খুপড়ি ওড়াব।'

সে-যাত্রা ব্রজর ভাই বলেই বোধ হয় বুনোর চাকরিটা গেল না। কাটা গেল সাতদিনের রোজ আর জন্মের মত সুখবতীর মুখে রপ্ত হয়ে গেল তার প্রতি এ খোঁটা। তাও খেতে শুতে বসতে।

ভোর হয় হয়। আকাশে ফুটেছে নীলের আভাস। তা বলে নসীরামের বস্তিতে অন্ধকার ঘোচে না। আর ঘরের ভেতর তো অমাবস্যা। দুপুরবেলা কয়েক ঘণ্টা একটু আলো। তারপরেই আবার যে-কে সেই।

ব্রজই সকলের আগে জাগে। ডাকে, 'মা, মাগো।'

গলা যেন মধুভরা। আর কি মিষ্টি ডাক। সে-ডাকে সুখবতী জাগে। ব্রজ ঘটির জলে মায়ের পা ছুঁয়ে খায়, তারপরে চলে যায় গঙ্গায়।

আগে আগে সুখবতীর লজ্জা ও ভয় করত এমনি করে জলে পা ছুঁইয়ে দিতে। এখন অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। মনে পড়ে যায় শ্বশুরের কথা। ব্রজর ঠাকুর্দা। ব্রজ তার প্রথম নাতি, আদরেরও বটে। সে-ই ব্রজকে হাত ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছে সাধুসন্তদের আড্ডায়, বাবু ভদ্রলোকদের সৎ মজলিসে, কথকঠাকুরের সভায়। সেই আস্তে আস্তে দেখা দিল ব্রজর এমনি মতিগতি। ভয়ও হয় সুখবতীর, ছেলে না তার আবার বিবাগী হয়।

না, ভাবলে চলে না। সে ডাক দেয় বুনোকে। 'এক ডাকে তো এ অনামুখো একদিনও জাগবে না। যেন কুম্ভকর্ণের ঘুম।' অনেক ডেকে ডেকে যখন সুখবতী খেঁকিয়ে উঠল, 'ওরে হারামজাদা লবাবপুত্তুর, তোর কোন্ কেনা বাঁদী আছে রে ডেকে দেওয়ার?'

অমনি লাফ দিয়ে উঠল বুনো। যেন এই কথাগুলো না হলে তার ঘুমন্ত মরমে পশে না। উঠল হাসিখুশি মুখ নিয়ে। কিসের যে এত খুশি তা সে-ই জানে। হয় তো নিদ্রাটি বেশ জমাটি হয়েছে।

ও মা! তারপরে কথা নেই বার্তা নেই, পা ছড়িয়ে বসে গান ধরল:

'আমার সুখ হল না দুখে মরি, ওগো, তোমার ঘর করে।'

উনুন ধরাতে গিয়ে সুখবতীর পিত্তি জ্বলে যায়, পিত্তি জ্বলে যায় আশেপাশেব ঘরের লোকের, এ-ঘরে ছোট-ছোট ভাইবোনগুলোর ঘুম ভেঙে যায়।

সুখবতী চেঁচিয়ে ওঠে, ওরে 'হারামজাদা, তোর গানের নিকুচি করেছে। সকালবেলা—'

তাতে বুনোর আবেগ বাগ মানে না, হাত জোড় করে গায়:

'সখী, তুমি আগ কোরো না।'

সুখবতী রাগে ঘৃণায় অন্ধ হয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'শুয়োর, আমি তোর সখী হলুম?'

বুনো তাড়াতাড়ি নিজের মুখে চাঁটি মেরে বলে, 'থুড়ি থুড়ি, তুমি আমার মা।' আবার, 'মা গো, তুমি আগ কোরো না।'

ততক্ষণে সুখবতী একটানা বলে চলেছে, 'তুই মর মর মর—'

বুনো বলে সুর করে:

'ঘুম যে তোমার চোখ-খেগো গা—'

পরমুহূর্তেই তেলের বাটিতে কোন রকমে আঙুলটা ছুঁইয়ে, সেটুকুন মাথায় ঠেকিয়ে চলে যায় পুকুরের দিকে। কিন্তু রাস্তা দিয়ে যায় না। যায় বস্তির পিছন দিকের ঘাটে ; যায় না, তাকে টানে ওই ঘাট।

পুকুরের ধারে, যেখানে বস্তির পিছনটা বেঁকে পড়েছে, সেখানে একটা ঘরে থাকে মাদ্রাজী খ্রীস্টান পরিবার। মা বাপ আর বড় মেয়ে কারখানায় কাজ করে। মেজ মেয়েটা সাহেব বাড়ির ঝি। সেই মেয়েটা, কালো বটে, তবু ভারী সুন্দর। আর কাজকর্ম করে বটে, কিন্তু সব সময়ই থাকে বেশ পরিষ্কার ধবধবে হয়ে। মেয়েটা বুনোর দিকে ঠেরে-ঠেরে তাকিয়ে না-হক্ কেবলই মুখ টিপে-টিপে হাসে। বুনো প্রথমে চটত, ভাবত বুঝি অবজ্ঞা করে বিবিগিরি দেখাচ্ছে তাকে।

কিন্তু এখন, বুনো মনে-মনে বলে, এ আবার শালার কি ফ্যাসাদ, তবু ওই না-হক্ হাসি না দেখতে পেলে তার প্রাণ মানে না। আর মেয়েটাও ভোলে না ওই এঁদো পুকুরের পাড়ে হাজিরা দিতে।

বুনোর পক্ষে হৃদয়ের এ আবেগ চাপা মুশকিল। কিন্তু ব্রজর কাছে এ-ব্যাপার অকল্পিত। একে তো সে এ-যুগের বিত্তহীন, তার আশাটা হল এ-সমাজের মধ্য-জীবীর ভদ্র জীবনযাত্রা ও ধর্মের একনিষ্ঠতা। তার চারপাশে ভয় ও সংশয়ের প্রাচীর খাড়া, প্রতিটি পদক্ষেপ নিঃশব্দ নম্র সন্ত্রস্ত।

ব্রজ এল চান করে। তাদের উঠোন নেই, আছে রান্না করবার একফালি বারান্দা। সেখানেই ব্রজ রেখেছে তুলসীগাছের টব। সে এসে জল দিল তুলসীতলায়। প্রণাম করল মাকে। তারপর চা খেতে-খেতে বলল. 'হ্যাঁ মা. তুমি নাকি ঘোষ কর্তাদের দোকানে গে ঝগড়া করে এসেছ ?'

সুখবতী কথাটা বোধ হয় চাপতে চেয়েছিল। বলল, 'তা করেছি বাবা। করব না ? ছ প'সায় তেল, তাও ওজনে মারবে ?'

'মারুকে, ওদের ধম্মো ওদের কাছে .'

কথাটা সুখবতীর মনঃপূত নয়। তবু ব্রজ যখন বলছে। বলল, 'কিন্তু গাল দিলে যে ?'

'দিক, তাতে কি।' নির্বিরোধ ব্রজ, নির্বিকার তার গলা। তার জীবনের কোথাও প্রতিবাদ নেই, আছে মানিয়ে চলা। সুখবতী চুপ করে থাকে।

বুনো নেয়ে আসতেই ব্রজ বলল, 'হ্যাঁ রে বুনো, কাল তুই মিত্তির -ডাক্তারের সঙ্গে ঝগড়া করেছিস।'

বুনো বলল গা মুছতে মুছতে, 'হুঁ, ঝগড়া আবার কি! পরের পেছনে কাটি দেওয়া কেন ?'

'কেন, তোকে কি বলেছে ?

বুনো বলল, 'কি আবার। কাল সন্ধ্যেয় কারখানা থেকে আসছি, বাড়ির সামনে চার মণ কয়লা দেখিয়ে বললে, হেই বুনো, কয়লাগুলো এটুস বাড়িতে তুলে

দে তো। যেন আমি ওর বাপের চাকর। বললুম, নিজেরা তুলে লাও না মশাই। তো ডাক্তার বললে আমাকে, তোর তো হারামজাদা খুব তেল হয়েছে। হাঁকাতুম এক ঘুষি। খালি বলে দিলুম, আবার যদি হারামজাদা বল, তোমার ওই মুখ থুবড়ে দোব।'

কথাটা শুনে যেন আঁতকে উঠল ব্রজ। বুঝি সুখবতীও। ব্রজ বলল, 'তা কয়লাটা তুলে দিলেই হত। আমাদের বাপ দাদা ও-রকম কত দিয়েছে।'

'দিয়েছে তো দিয়েছে। ও-সব ভদ্দর পীরিত তুই কর গে যা।'

ব্রজ বলে, 'তোর মাপ চাওয়া উচিত।'

'তোর কথায়।' ভেংচে উঠল বুনো, 'দ্যাখ বেঙ্গজা, মন্তর দিস নে। তোর কাজ তুই কর।'

মন্তর মানে উপদেশ। ব্রজ তাকে ছেড়ে মাকে ধরল, 'ডাক্তারবাবু কত কথা বললেন। তা সে একটা মিলের ডাক্তার। আজকেই ফোরম্যানকে বলে তোর চাকরি খেয়ে দিতে পারে। গরীবের ছেলেকে কত সইতে হয়।'

এ-সব কথায় বুনোর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। সে চেঁচিয়ে উঠল, 'গরীব বলে কি মান নেই? এতে যদি চাকরি যায় তো যাক। তবে তোর ফোরম্যানকেও দেখে লোব। আর তুই যদি ফের আমাকে তাতাবি—'

এবার হামলে পড়ে সুখবতী। চাকরি যাওয়ার কথাটা শুনে, ভয়টাই তার রাগের চেহারায় দেখা দিল, বলল, 'তাতে তোর কি আছে রে ড্যাকরা।' তোর জ্বালায় কি আমাদের মরতে হবে? চাইবি, ক্ষ্যামা চাইবি পায়ে পড়ে।'

উভয় পক্ষ থেকেই নিরাশ হয়ে বুনো তার মেজাজের শেষ সীমায় পৌঁছুল। চিৎকার করে উঠল, 'তোমাদের দায় থাকে তো তোমরা চাও গে ··আর রইল শালার সংসার আর চাকরি আর ভদ্দরের কুটুম্বিতে।' বলে সে দুম-দুম করে ঘরে ঢুকে জামাকাপড় পরে হনহন করে বেরিয়ে গেল।

ব্রজ কারখানায় এসে দেখল, বুনো সত্তর ফিট উঁচুতে নতুন চিমনির গায়ে বলটু ঠুকছে।

এই নিয়েই বারোমাস অশান্তি। ব্রজ রোজ এসে বলে, আজ ফোরম্যান এই বলেছে, কাল কারখানায় এই হয়েছে, বাইরে সেই হয়েছে। আর সুখবতী রাতদিন বুনোকে খিঁচোয়।

বুনো মাথা নোয়ায় না। সে যেন তাদের খালাসীদের শক্তিতে তোলা ওই একশো ফিট উঁচু চিমনিটার মত সটান ও উদ্ধত। মেঘ ঝড় বৃষ্টিতে সে অবিচল। বলে, 'খাটব—খাব; যেমন আয়নাটি দেখাবে, তেমনি মুখটি দেখবে কাজ শিখেছি ফিটারের, তুমি বলবে মাইনে বাড়াব না, ফিটারের কাজ কর। কেন? সে হবে না।'

সে হবে না ঠিক, কিন্তু মনের কোথায় যেন খচ করে ওঠে। ভাবে, ফোরম্যান শোধ তুলতে পারে। তবু ভাবে, ও যদি শোধ তোলে, আমরা প্রতিশোধ নিতে পারব না?

ব্রজর উন্নতি হয় কাজে। সে সত্যি কেরানির কাজ পায়। তার মান বাড়ে। বাড়ে সুখবতীরও। সে যে বাবু ছেলের মা। এতে বোধ করি বুনোরও একটু গোপনে গৌরব বোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সে-বোধের অধিকার নেই। নিজের বিবেকের বিরুদ্ধে আপসহীনতা যেন তার কলঙ্ক। ব্রজ যে তার গৌরবের ভাগ তাকে দিতে রাজী নয়।

এরপর থেকে বুনোকে নিয়ে অশান্তি আরও বাড়ে, ব্রজর দাবি তার চেয়েও বেশি। পাড়া বয়ে লোক শোনাতে আসে ব্রজর কথা। সেই সঙ্গে বুনোর কথাটা বলতে কেউ ভোলে না।

একদিন সেই মাদ্রাজী খ্রীষ্টান মেয়েটি ভাঙা বাংলায় বললে, 'তুমি বড় গোঁয়ার।'

বুনো অমনি হাসি ভুলে মাথা সটান করে দাঁড়াল। এ-মিথ্যে অপবাদ সে মানতে রাজী নয়। বললে. 'আ ম'লো, গোঁয়ার কোথা দেখলে?'

মেয়েটি বোধ হয় তার প্রেমের অধিকারেই বলল, 'সবাই বলে। তোমার দাদা কেমন ভদ্র, কারুর সঙ্গে—'

ব্যস, বলতে হল না। বলে দিল, 'তা হলে দাদার সঙ্গে পীরিত করলেই পারো।' বলে গামছাটা কোমরে কষে বাঁধতে-বাঁধতে সে আপন মনেই বলতে লাগল, 'রইল শালার পীরিত, নিকুচি করেছে তোর ভালর। এ মেয়ের জন্যে শালা আমি রোজ এঁদো পুকুরে ডুবতে আসি!'

সে হনহন করে চলে গেল বড় রাস্তার মিউনিসিপ্যালিটির জলকলের দিকে। মেয়েটা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরল। তার দাক্ষিণী টানা চোখে বড়-বড় ফোঁটায় জমে উঠল প্রেমের প্রথম অশ্রু।

সারাদিন বুনোর মনটা দমে রইল কারখানায়। বুকের ভিতরটা কেন যে এ-রকম করছে, সে বুঝল না। ভেবে পেল না, এ সংসারে কি ব্যতিক্রমটা সে করেছে। বিকেলে ব্রজর পিছন-পিছন বাড়ি এল।

বাড়ি আসতে না আসতেই মিত্তির ডাক্তার প্রায় আধন্যাংটো হয়ে কোমরে কাপড় গুঁজতে-গুঁজতে রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এল।

ব্যাপার হয়েছে, তার বাড়ির সামনেই মুখুজ্জেদের দুই পুরুষ আগের একটা ভাঙা ভিটা পড়ে আছে। কিছুই নেই, আছে শুধু ইঁট বের-করা গোটা দুই ঘরের দেওয়াল, তাতে ইঁদুর আর সাপের বাস। সেটা মিত্তির কিনেছে। সুখবতীর অপরাধ, সেই দেয়ালে সে ঘুঁটে দিয়েছে, দেয়-ও রোজ। বোধ করি দু একদিন বারণও করেছে। কিন্তু সুখবতী জানে, পড়ো দেয়াল, সে না দিলেও অন্য কেউ দেবেই।

কিন্তু মিত্তির একবারে উগ্র মূর্তিতে চিৎকার করতে-করতে ছুটে এল, 'কোথায় সে হারামজাদা ছোটলোক মাগী, তাকে একবার দেখি।'

ভীত সন্ত্রস্ত ব্রজ একেবারে মিত্তিরের পায়ে গিয়ে পড়ল, 'কি হয়েছে কাকাবাবু, আমাকে বলুন।'

বুনো চমকে বন্য বরাহের মত কাত হয়ে মিত্তিরের দিকে তাকাল। সুখবতী ভয়ে বিস্ময়ে নির্বাক।

মিত্তির কোন রকমে তার বক্তব্য বলে আবার চেঁচিয়ে উঠল, 'এত বড় সাহস ছেনাল মাগীর, আমি বারণ করেছি তবু—'

এই অভাবনীয় ব্যাপারে ব্রজ অসহায়ের মত বলে উঠল, 'এবারটা ছেড়ে দেন, ক্ষমা করেন। মা আমার বুঝতে পারে নি।'

সুখবতী শুধু বলল, 'ভাঙা পড়ো দেয়াল বাবু, তাই—'

মিত্তির রুখে উঠল, 'হাজার ভাঙা হোক, তোর কি? কথায় বলে, ছোটলোক কখনও—'

বুনো আর চুপ করে থাকতে পারল না। বলে ফেললে, 'ওই ভদ্দর গালাগাল-গুলোন আর দেবেন না মশাই।'

ব্রজ বলে উঠল, 'বুনো, চুপ!'

কিন্তু মিত্তিরের রাগ চড়ল। সে চেঁচাতে লাগল, 'কেন দেব না। যার যেমন, তার তেমন। ছেনালকে ছেনালই বলব।'

ব্রজ দুই হাত জোড় করে বলল, 'আর নয়, কাকাবাবু, আমি মাপ চাইছি এদের হয়ে, আমি মাপ চাইছি।'

মিত্তিরের এত রাগের অন্তঃস্রোত ধরা মুশকিল ছিল। সে বুনোর দিকে একবার দেখে যেন জেদ করে ব্রজকেই বলল, 'আমি বলছি, তোর মা—ছেনাল।'

ব্রজ আবার হাত জোড় করার উদ্যোগ করতেই বুনো চকিতে ছুটে এসে ব্রজর ডান হাতটা মুচড়ে ধরে একেবারে তার পায়ের কাছে আছড়ে ফেলল। হিসিয়ে উঠল সে, 'তুই হতে পারিস ছেনালের ছেলে, বুনো নয়, বুঝলি!'

তারপর চোখের পলক না পড়তে সবাই দেখল, মিত্তিরের সামনের দাঁত দুটো নেই, আর তার মুখ দিয়ে ভলকে-ভলকে রক্ত পড়ছে। মৃত্যু-চিৎকার জুড়েছে সে। তার সামনে ক্ষিপ্ত নির্বাক যমদূতের মত দাঁড়িয়ে বুনো।

তারপর সে এক কাণ্ড। সুখবতীর চিৎকার, বস্তির হট্টগোল ও হা-হুতাশ, এক এলাহি ব্যাপার।

ঘণ্টাখানেক পরে, ভাঙা আসর থেকে বুনোকে ধরে নিয়ে গেল পুলিস। মামলা পরে, এখন হাজত-বাস তো হোক। সুখবতী যদি পারে, জামিনের যেন চেষ্টা করে।

সুখবতী উঠল। বুঝল, বুনোকে ছাড়াতে অক্ষমতা তার কতখানি। তবু ভাঙা গলায় খালি বলল, 'কত দিন, তোকে কত দিন বলেছি।'

ব্রজ একবার ফিরল। ব্যাপারটা যেন এখনও তার কাছে পুরো বোধগম্য হয় নি। কেবল বুকের ভিতরটা কেমন করতে লাগল মায়ের দিকে ফিরে। কথা বলল না, কেবলই বুকটার মধ্যে কি হতে লাগল, তবু অনুশোচনার কোন কারণ নিজের মনে সে খুঁজে পেল না।

কেবল সেই মাদ্রাজী মেয়েটি ভাবল, আমিই ওর মনটা আজ ভেঙে দিয়েছি, তাই। দক্ষিণের সমুদ্রের অথৈ জোয়ার ওর চোখে।

ভোর হব হব। আকাশে আলো দেখা দেবে-দেবে করছে। রাস্তার আলো নিভে গিয়েছে। নসীরামের বস্তি জাগছে।

ব্রজ জেগেছে। ডান হাতটা তার সত্যি ভেঙে গিয়েছে। সে মাকে ডাকতে গিয়ে থেমে গেল। দেখল, মা জেগেই আছে। জেগে বসে আছে চুপচাপ।

ব্রজ রোজকার মত জলের ঘটি নিয়ে এল। পা ছোঁয়াতে গেল মায়ের।

হঠাৎ সুখবতী ঘটিটা নিয়ে মেঝেয় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'ছেনালের পা ধোয়া জল খাবি তোর মান যাবে না? তোর লজ্জা করে না? আমি যে ছেনাল।'

ব্রজ অবাক। আশ্চর্য, তার মা-ও সত্যি ছোটলোক, সেই মালা-ঘরানি বস্তি-বাসিনী সুখবতী।

সুখবতী তার রাতজাগা চোখ দুটোতে জল দিয়ে বাইরে এল। গলির মোড়ের দিকে মুখ করে খালি বলল, 'এ সংসারের ধারা বুঝিস নে,...তোকে কত দিন বলেছি, কত দিন...'

ব্রজ অপ্রতিভ নেংটি ইঁদুরটার মত অন্ধকার ঘরের মধ্যে চোখ পিটপিট করতে লাগল।

কেবল সেই মেয়েটি এঁদো পুকুরের ধারে গিয়ে নির্জন বড় রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু পরেই ওই খালি রাস্তাটাতে কারখানাগামী লোকের আনা-গোনা শুরু হবে।

সাধ

নমিতার স্বরে কান্না থমকানো, কিন্তু ঝাপটার মত ধিক্কার আর ঘৃণায় ফুঁসে উঠে বলে, 'ও মেয়ের মুখ দেখতে চাই না, ও মেয়ে মরুক।'

গোপীনাথ নমিতার পাশে শোয়া। ঘর অন্ধকার। মাথার টালির ওপরে টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ। কাছের জলা থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসে। সঙ্গে ঝিঁঝির ঝংকার। টালির মাথায় খুটখাট শব্দ, বোধ হয় ইঁদুর ছুটোছুটি করে। গোপীনাথ নির্ভুলভাবে অন্ধকারে নমিতার বুকে একটি হাত রাখে। নমিতার বুকে আঁচল সরানো, গায়ে জামা নেই। গোপীনাথের হাত পড়ে নমিতার বুকের মাঝখানে, জেগে ওঠা হাড়ের ওপরে। অতি স্পষ্ট না, তবু হাড় টের পাওয়া যায়। পার্শ্বে আর নিচের দিকের নাভিতে শিথিল বুক, স্বাভাবিক গরম। গোপীনাথ নমিতার বুকের স্পন্দন টের পায়, কিন্তু স্বাভাবিক নিশ্বাসে ওঠানামা করে না। গোপীনাথ বোঝে, নমিতা বুকে কান্না আটকে রেখেছে। সে বলল, 'কেঁদো না।'

'কাঁদব? আমার মরণ নেই, ও মেয়ের জন্যে আমি কাঁদব?' নমিতার মরণই ভাল, এ কথা বলতে গিয়েই রুদ্ধ কান্না স্বরে স্ফুরিত হল, 'আগে জানলে এই মেয়ে আমি পেটে ধরি?' যেন দুরন্ত যন্ত্রণা আর অনুশোচনায় তার স্বর ডুবে যায়।

এ কান্না বিগলিত না, প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাস ধরে রাখবার চেষ্টা। গোপীনাথ টের পায়। সে জানতো, সারা দিনের মত রাগ ঝামটা, এইভাবে ফেটে পড়বার অপেক্ষায় ছিল। সে জানতো, নমিতা আর কেবলমাত্র রাগের দ্বারা দুঃখ আর যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে পারছে না। গোপীনাথ বউয়ের বুকে হাত চেপে-চেপে বুলিয়ে দিতে লাগল। কান্না থামাতে চাইছে না, সান্ত্বনা দিতে চাইছে। কিন্তু বলার কিছু নেই। সে বুক থেকে হাত তুলে নির্ভুলভাবে একবার নমিতার চোখের কোলে ছোঁয়াল। ভেজা, গরম জলের ধারা। নমিতা হাত দিয়ে গোপীনাথের হাত সরিয়ে দিল।

গোপীনাথ জানে, নমিতার এ স্নেহ সান্ত্বনা সহে না। তার চেয়ে ওর দুঃখ আর যন্ত্রণা গভীর। কারণ দুঃখের থেকে বড় যে অপমান প্রাণে লাগে তা অতি নিষ্ঠুর। গোপীনাথ উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপে। তার আর একটি হাত,

পাশেই অঘোর ঘুমে শায়িত মেয়ের গায়ে। মেয়ের বয়স চার পেরিয়ে পাঁচ। দু বছরের ছেলেটি নমিতার বাঁদিকে ঘুমোচ্ছে। মেয়ে গোপীনাথের ডানদিকে। নমিতা এই মেয়ের কথাই বলে। নরম কৃশ ছোটখাটো একটি প্রাণী। পরম নিশ্চিন্তে বাবার গা ঘেঁষে কাত হয়ে গুটিসুটি ঘুমোচ্ছে। বাবার অন্য পাশে শুয়ে মা ওর মৃত্যু কামনা করছে, ও কিছুই শুনতে পারে না, জানতে পারে না। সংসারের যেটুকু যা কিছু বোঝে বা জানে, এখনও কথায় তা প্রকাশ করতে শেখে নি। হাসি পেলে হাসে, কান্না পেলে কাঁদে, রাগ হলে রাগ দেখায়, খিদে পেলে খেতে চায়, পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে, খেলার সময় খেলা করে। ওর মত একটি মেয়ে-শিশুর পক্ষে যা-যা করণীয়, তা-ই করে। হৃদয়ের অনুভূতিসমূহে যখন যা প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার যেটুকু অবচেতনে ডুবে যাবার ডুবে যায়। যা ভেসে ওঠার, তা ওঠে, আর শিশুর মতই তা প্রকাশ করে। মালিন্য কি, কি-ই বা মাধুর্য, সম্যক কোন জ্ঞান জন্মায় নি। সংসার কি, কি তার নিরন্তরতায় বাধার সৃষ্টি করে, বাজে বা আঘাত করে, সে শিক্ষা কে ওর কাছে আশা করে? বাতুল ছাড়া কেউ করে না।

কিন্তু নমিতা বাতুল না, গোপীনাথ জানে। নমিতা কলির মা, একান্ত মা। মেয়ের কাছে তার কোন দাবি নেই। কে-ই বা করে, এইটুকু মেয়ের কাছে। কেবল আশা পোষণ করা যায়। নমিতাও আশা পোষণ করে, তার মেয়ে কলি কেমন হবে। যেমনটি সে চায়, মেয়ে যেন তেমনটি হয়, এ আশা করে। সব মা-ই করে।

নমিতার সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। ওর কোন দোষ নেই। আশাহত হলেও এত যন্ত্রণা হত না। বড় অপমানিত হয়েছে। তাই ও এমন করে বলে। অতি আদরের মেয়ের মৃত্যু কামনা করে। গোপীনাথের বাঁ হাত নমিতার অপুষ্ট বুকে, ডান হাত দিয়ে জড়ানো কলির গুটিসুটি নরম শরীর। ইজের পরা খালি গা। মশার ভয় নেই, একটা মোটা জালি কাপড়ের মশারি টাঙানো। চারজন এক মশারির নিচে। গোপীনাথের দুদিকে দুই রকমের গন্ধ। নমিতার গায়ে এ সংসারের যাবতীয় কাজ, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্না করা, ছেলেমেয়ে খাওয়ানো, দেখাশোনা, স্বামীর সান্নিধ্য ও সহবাস, সব মিলিয়ে একটি গন্ধ। আর একদিকে মৃদু সুগন্ধ, পাউডারের, গন্ধ তেলের। মেয়ের গন্ধ। এই দুই গন্ধে মাখামাখি গোপীনাথ, স্বামী ও পিতা, নিজের বাহির জগতের শ্রমের গন্ধ টের পায় না।

গোপীনাথ টের পায়, নমিতার বুক হঠাৎ অতিরিক্ত ফুলে ওঠে, তারপরেই গলা থেকে ছিটকে আসা কান্নার স্বর শোনা যায়, 'গলায় দড়ি এমন ভদ্দরলোক হবার। গলায় দড়ি আমার, এমন মেয়ের মা হবার। মরণ হোক আমার!'

গোপীনাথ নমিতার বুকে হাত চেপে ধরে, বলে, 'চুপ কর, ওরা উঠে পড়বে।'

নমিতা বলে, 'উঠুক, উঠে পড়ুক। ওই কালামুখীটা উঠে পড়ুক, চুলের মুঠি ধরে ওকে আমি এই মাঝরাত্রে ঘরের বাইরে বিদেয় করে দেবো।'

গোপীনাথের অজান্তেই মেয়ের গায়ের ওপর হাত আরও নিবিড়ভাবে চেপে বসে। ভয় পায়, মেয়ের ঘুম না ভাঙে। জেগে উঠে এ সব কথা যেন শুনতে না পায়। নমিতার গায়ের ওপরও তার হাত নিবিড়তর হয়ে সান্ত্বনায় বাহিত করে। বুকের পাশ থেকে ডানা চেপে ধরে। চুপ করাতে চায়।

'তা তুমি কিছুই পয়সা কাড়ি দিতে না পারলে, পোয়াতি বউকে এখানে নিয়ে এসেছ কেন?' নার্সিং হোমের লেডি ডাক্তারের এই কথাটা, গোপীনাথের মনে পড়ে যায়।

নমিতার পেটে তখন তার প্রথম সন্তান, এই মেয়ে। এই কলি। নমিতা তখন আসন্নপ্রসবা, পেটে ব্যথা উঠেছে। গোপীনাথ তখন মফঃস্বল শহরের অভিজাত অঞ্চলের কিণ্ডারগার্টেনের মাইনে-করা সাইকেল রিকশাওয়ালা হয় নি। একজন মালিকের রিকশা চালাতো। মালিককে রোজ দিতে হত পাঁচ সিকা, সারা দিনে যাত্রী জুটুক না জুটুক। কিন্তু সেই কাজটাকে বলা যেতো স্বাধীন ব্যবসা, যদিও যার অনিশ্চযতার কোন সীমা পরিসীমা ছিল না। কারণ স্টেশন একটা, বাজার একটা, রিকশা শত-শত—যার কোন নির্ধারিত সীমা ছিল না। প্রতিযোগিতা আর ভাগ্যের ওপর স্বাধীন রিকশাওয়ালার জীবিকা নির্ভর করে।

স্বাধীন রিকশাওয়ালাদের জগৎ আর পরিবেশটাও গোপীনাথের তেমন পছন্দ ছিল না। বিকশা চালাতে গিযেছিল অভাবের তাড়নায়। ইস্কুলে ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। তার বাবার অভাব যেমন ছিল, সেও তেমনি লেখাপড়ায় একটুও মনোযোগী ছিল না। বখাটে ছেলে বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল। দেশ বিভাগের আগে, ওদের পরিবারে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রতার একটা নামাবলী ছিল। এদেশে এসে, কলোনীর জীবনে তাও গিয়েছিল। এক সময়ে গোপীনাথ ভাবতো, ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোক হয়েই জীবনটা কাটবে। তারপরে গায়ে হাতে পায়ে বড় হয়ে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল, কলে-কারখানায় একটা ভাল কাজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। তখন বিড়ি টেনে, তাস খেলে, রকবাজি করে কাটছিল। নাথতলার বস্তির এক তরকারির ফড়িয়ার মেয়ে নমিতার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করত। নমিতার বাবা ভদ্রলোক ফড়িয়া, ক্রেতাবাবুদের নমস্কার করে কথা বলত। বাবুরা তাকে 'আপনি' করে বলত।

গোপীনাথের চটকলে একটা কাজ হয়েছিল, বদলি কাজ। পঁচিশ টাকা হপ্তা। নমিতাকে বিয়ে করতে কে আর তখন আটকাচ্ছিল? নমিতাকেই বা আটকাচ্ছিল কে? চিরদিন কি বদলি থাকতে হবে নাকি। পাকা হবেই, দুদিন আগে আর পরে। কিন্তু চটের হালহদিস অন্য রকম ছিল সে সময়টায়। পূর্ব

পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দুটো বছর খুব খারাপ চলছিল। বর্ডার তো দূরের কথা, প্রায় প্রত্যেকটা চটকলেই ছাঁটাই হয়েছিল।

গোপীনাথ চটকলের বিজ্ঞপ্তি শুনেই রিকশা চালাতে আরম্ভ করেছিল। মদ গাঁজা জুয়া যে ওকে আরও অনেক রিকশাওয়ালার মত আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরতে পারে নি, সেটা নমিতার জন্য। নমিতা গোড়াতেই কালসাপের কোমরে ঘা মেরেছিল। ফুঁসলেও সে আর উঠতে নড়তে পারে নি। রিকশা চালাতে গেলেই যদি নেশা ভাং করে জুয়া খেলতে হয়, নমিতারই বা ঘরে ব্যবসা খুলে বসতে অসুবিধা কিসের ?

এত বড় কথা ? হ্যাঁ, এত বড় কথা। ব্যবসা না করতে পারে, নমিতা শহর জুড়ে হুজ্জোত বাধিয়ে দিতে পারে। এত বড় কথা ? হ্যাঁ, এত বড় কথা। পরিণামে ঝগড়া বিবাদ থেকে গায়ে হাত তোলাও বাদ যায় নি। কিন্তু গোপীনাথকেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে নমিতার গর্ভসঞ্চারও হয়েছিল।

নমিতা ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলে, পাড়ারই এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এসেছিল প্রসব করাতে। সে কোথায় কি সব হাত-টাত দিয়ে দেখে বলেছিল, 'সুবেধের বুঝছি নে, পেটের বাচ্চার মাথা খুব বড় ঠেকছে, তুমি বাপু হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

শহরে কোন হাসপাতাল নেই, নার্সিং হোম আছে। গোপীনাথ সাত-পাঁচ কিছু না ভেবে সোজা সেখানেই নমিতাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। সব শুনে লেডি ডাক্তার সেই কথা বলেছিলেন। গোপীনাথ বলেছিল, 'দিদিমণি যখন ডাকবেন, ছুটে আসব, মিনি মাগনায় আপনাব সওয়ারি বইব, যা কাজ বলবেন করে দেবো। আমাকে উদ্ধার করুন।'

লেডি ডাক্তার বিবাহিতা মহিলা। কয়েকটি সন্তানের জননী। নমিতার দিকে তাকিয়ে বোধ হয় করুণা হয়েছিল। যদিও গোপীনাথকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের আবার কথার ঠিক। কাজ হয়ে গেলে আর তোমার পাত্তা আমি পাব ?'

পেয়েছিলেন। গোপীনাথের এই কৃতজ্ঞতাবোধ মহিলাকে খুশি করেছিল। নমিতার স্বাভাবিক প্রসব হলেও তিনি বিনা পয়সায় অনেক দিন ওষুধ দিয়েছেন। গোপীনাথের মেয়ের ওজন হয়েছিল আট পাউন্ড। তাতেও তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। নমিতাও প্রায়ই নার্সিং হোমে গিয়ে কিছু কাজকর্ম করে দিত। একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গোপীনাথের মেয়েটা যত বড় হয়েছিল, তত কলকল করে পাকা-পাকা কথা বলত। লেডি ডাক্তার নিজে নাম দিয়েছিলেন, কলকলি। তারপরে কলি। কলি দাস।

কলি যখন তিন বছরের, তখন গোপীনাথের একবার অসুখ করেছিল। তখনও ওষুধ দিয়েছিলেন সেই মহিলা ডাক্তার। নমিতা তখন দ্বিতীয়বার গর্ভবতী।

গোপীনাথ ভাল হবার পরে কিণ্ডারগার্টেনের রিক্‌শাওয়ালার কাজটা পেয়েছিল। সামনে পিছনে তিনটি শিশু মুখোমুখি বসে। হালকা ওজন, টানতে কষ্ট হয় না। বেতন একশো টাকা। দুপুরে টিফিন। সকাল ন'টা থেকে এগারোটা, বেলা একটা থেকে দুটো রিক্‌শা টানা। শিশুদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা, বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ যাত্রী নয়, যথেষ্ট দায়িত্বের কাজ। শিশুদের নিয়ে সাবধানে তাকে চলাফেরা করতে হয়।

তারপরে বেতন বেড়ে হল একশো পঁচিশ টাকা। দিদিমণিদের ছোটখাট ফাইফরমায়েশ খাটার দরুন। মাঝে-মাঝে কিছু উপরি জোটে শিশুদের অভিভাবক-দের কাছ থেকে। গোপীনাথের জীবনটা সাধারণ রিক্‌শাওয়ালাদের তুলনায় বদলিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা কলিকে নিয়ে পড়াতে বসত। নিজেও নানান বইপত্র যোগাড় করে পড়াশোনা করত। কলিকে দেখা গেল, লেখাপড়ায়ও কলকলিয়ে উঠছে। মনোযোগ আছে, মনে রাখতে পারে।

গোপীনাথ আর নমিতার সাধ হল, কলি কি কিণ্ডারগার্টেন ইস্কুলে পড়তে পারে না? কলির মত মেয়েদের গোপীনাথ যখন কোলে করে রিক্‌শায় তোলে, সাবধানে নিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে গল্প করে, গল্প করে ভুলিয়ে রাখে, কান্না থামায়, রাগ অভিমানে সান্ত্বনা দেয়, সামলায়, তখন নিজের মেয়ে কলির কথা বড় মনে পড়ে। ইচ্ছা করে কলিকেও তেমনি করে নিয়ে যায়। দেখতে ইচ্ছা করে, ইস্কুলের মাঠে কলিও ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটে-ছুটে খেলা করুক। দৌড়ঝাঁপ করুক, দিদিমণিদের আদর আর বকুনি খাক, লেখাপড়া শিখুক।

গোপীনাথের মনের কথাটি শোনা মাত্র, নমিতার প্রাণটাও উছলিয়ে উঠেছিল। আহা, কেন নয়? অতএব গোপীনাথ প্রথমে—আর সেই শেষ, এক ছোট দিদি-মণিকে মনের কথা বলেছিল। দিদিমণি অবাক আর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এ কথা বলছ কি করে গুপী? শহরের নাম করা বড়লোক ভদ্রলোকদের ছেলে-মেয়েরা যে কে. জি. ইস্কুলে পড়ে, তোমার মেয়ে সেখানে পড়বে? শোনা মাত্রই তো ওঁরা ক্ষেপে যাবেন। ওঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা রিক্‌শাওয়ালার মেয়ে পড়বে, এ কি ভাবা যায়?'

গোপীনাথ কেন্নোর মত গুটিয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে চলে এসে-ছিল। নমিতা শুনে প্রথমে রেগে উঠেছিল, তারপরে কেঁদেছিল, 'বড় অপরাধ করেছি।'...কিন্তু গোপীনাথের চিত্ত অশান্ত হয়েছিল। কথাগুলো শেলের মত বিঁধেছিল। কেন? কলি আমার মেয়ে বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে নয়? গরীব হতে পারি, না হয় মাসে স্বামী-স্ত্রী চারবেলা খাব না। না হয় আট বেলা। বড়-লোক না হলে কি, ওখানে মেয়েকে পড়ানো যাবে না? গোপীনাথ তো সব শিশুকে ভালবাসে। তাদের কারোর শরীর খারাপ হলে, ইস্কুল কামাই করলে, মন খারাপ হয়। কাজের অবসরে, বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে, কেমন আছে।

তা না হলে মন খচখচ করে। আমার কলি কি এমন দুর্ভাগী, আমি নিজে তাকে নিয়ে যেতে পারব না?

স্বামী-স্ত্রীতে মন্ত্রণা সভা হয়েছিল। খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল এক বিধবা মহিলার, গোপীনাথদের বস্তির কাছেই দোতলা বাড়িতে থাকেন। তাঁর নামে নানান দুর্নাম, তবু শহরের সম্পন্ন ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসা। বয়স হয়েছে, তাঁর চারটি মেয়ে আছে। দুজনের বিয়ে হয়েছে, দুজনের হয় নি। বিবাহিতা মেয়েরাও মায়ের কাছেই থাকে। মেয়েদের ঘিরেই দুর্নাম।

গোপীনাথ এবার অনেক ভেবেচিন্তে মা ঠাকরুণের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল। মা ঠাকরুণ রাজী হয়েছিলেন। কলিকে নিজের দৌহিত্রী বলে পরিচয় দিয়ে, কে. জি. স্কুলে ভরতি করাতে সম্মত হয়েছিলেন। গোপীনাথ আর নমিতা, কলিকে ওর মিথ্যা পরিচয়টা পাখির মত পড়িয়েছিল। কলকলানি কলি তা বুঝতে পেরেছিল। ফিক করে হেসে, বাবার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'তুমি এখন থেকে আমার রিকশাওয়ালা গুপীদাদা?'

কলির ইস্কুলের বেতন মাসিক আট টাকা গোপীনাথ খরচ করতে দ্বিধা করে নি। মাসিক রিকশা ভাড়া দশ টাকাও। বড় গোপন ব্যাপার। কাজটা খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছিল। ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গোপীনাথের তেমন ভয় ছিল না। কলিকে কেউ তাঁরা গোপীনাথের মেয়ে বলে চিনতেন না। অন্য কোন রকমের খোঁজ-খবরের দরকারও বিশেষ হত না। গোপীনাথের ভয় ছিল ওর নিজের বস্তি-বাসীদের নিয়ে, নিজের মেয়েকে নিয়ে, নিজের আবরণকে নিয়ে। সে যেন কখনও না কলিকে নিজের মেয়ে বলে ভুল করে। কলি না করে নিজের বাবাকে দেখে। বস্তিবাসীদের অবিশ্যি এমন একটা ধারণা হয়েছিল, গোপীনাথ স্বতন্ত্র, তার মেয়ে ভদ্রলোকের মত মানুষ হবে, সেটা এমন আশ্চর্যের কিছু না।

এক বছর ধরে সমস্ত ব্যাপারটি এমনভাবে চলছিল, গোপীনাথের চোখেও আর কোন রকম অস্বাভাবিক ঠেকছিল না। মেয়ে বাড়ি থেকে ইস্কুলের য়ুনিফর্ম পরে চলে যেতো দোতলা বাড়ির ভিতর উঠোনে। গোপীনাথ রিকশার ভেঁপু ফুঁকলেই কলি চলে আসত। কলি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গল্প করত। দিদিমণিদের সঙ্গে কলকল করত। আদর খেত, দুষ্টুমি করলে চোখ পাকানো মিষ্টি বকুনি। মাথার চুলের ঝুঁটিতে বাঁধা রঙিন ফিতে উড়িয়ে মাঠে সকলের সঙ্গে খেলা করত। গোপীনাথ দূর থেকে লুকিয়ে দেখত। মনটা ভরে উঠত এক অনির্বচনীয় সুখে। মনে হত, বাগানে ফুলের খেলা দেখছে, তার মধ্যে একটি তার নিজস্ব। তার আত্মজা।

কলি লেখাপড়ায় ভাল। অন্য বাড়ির শিশুদের মায়েরা ওর গাল টিপে আদর করত, 'মেয়েটি ভারি মিষ্টি।' গোপীনাথ রিকশাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে থাকত। বুকে সুখের ঢেউ খেলত, এমন কি চোখে জল এসে পড়ত। কোন কোন শিশু

ছাড়তে চাইত না, কলিকে জোর করে বাড়িতে নামিয়ে নিত। খেলনা খাবার দিত। ফিরে এসে বলত, 'চল গোপীদাদা।' ব্যথা কি একটু বাজত না? কিন্তু সে ব্যথার মধ্যে সুখ ছিল আরও গভীর।

কলি না সত্যি মিষ্টি। নমিতার মনেও একই সুখের প্রস্রবণ। মেয়ের সঙ্গে কথায় পারে না। কলির কচি মুখে আবার ইংরেজি বুলি! মাগো! নমিতার হাসতে-হাসতে চোখে জল। স্বামী স্ত্রী, দুজনেরই গর্ব।

একটা বছর কাটল। কলি কে. জি. ওয়ানে উঠল, ভেরি গুড মার্ক পেয়ে। গোলমালটা হল আজ সকালে। গোলমালটা পাকাচ্ছিল কিছু দিন ধরেই। কলির প্রায়ই থেকে থেকে মন খারাপ। মুখ গম্ভীর। কথা বলে না, হাসে না। সব সময়েই কেমন ছিটকে-ছিটকে যায়। কি হয়েছে তোর? কোন কথা নেই। ঠোঁট টিপে থাকে। মুখ গোঁজ করে থাকে। এ আবার কেমন ধারা?

আজ রবিবার। আজ সকালে আসল কথা জানা গেল। নমিতা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোর হয়েছে কি? প্যাঁচার মত মুখ করে থাকিস যে সব সময়?'

কলি ফুঁসে রুখে কলকলিয়ে উঠল, 'প্যাঁচা আমি, না তুমি আর বাবা? আমি আর তোমাদের মেয়ে থাকতে চাই না।'

নমিতা প্রথমে যেন কথাটা বুঝতেই পারে নি। বলল, 'কি বললি?'

কলি বলল, 'তোমরা তো ছোটলোক। আমি রিক্‌শাওয়ালার মেয়ে হতে চাই না।'

নমিতার সহ্যের সীমা শেষ, কষাল এক থাপ্পড়। তারপরে দুই থাপ্পড়, 'মুখপুড়ি, তুই রিক্‌শাওয়ালার মেয়ে না তো কোন্ রাজার বেটি? কোন্ মন্ত্রী তোর বাপ, অ্যাঁ?'

গোপীনাথ এসে না পড়লে, মেয়ে আরও মার খেয়ে মরত। কিন্তু কলির মুখ শক্ত, ঠোঁটে ঠোঁট টেপা, চোখে জল। তবু মেয়ে কাঁদল না, বলল, 'আমি তোমাদের মেয়ে নই।'

সকাল থেকে বলতে গেলে, রান্না খাওয়া বন্ধ। গোপীনাথ কলিকে আদর করে সোহাগ করে অনেক বুঝিয়েছে। তারপরে বলেছে, 'আচ্ছা, তুই আমাদের মেয়ে নোস, হল তো?'

কলি বলেছে, 'ইস্কুল থেকে এ বাড়িতে আমার আসতে ইচ্ছে করে না।'

গোপীনাথের বুকটা বড় টনটন করেছে, বলেছে, 'কোথায় যাবি?'

কলি ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, 'জানি না। তোমাদের ভাল লাগে না।'

গোপীনাথ বলেছে, 'বেশ, আর একটু বড় হ, আরও পড়াশোনা করেনে, তারপরে চলে যাস।'

কলি আর কিছু বলে নি। কিন্তু নমিতার পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব ছিল না। রেঁধে বেড়ে সবাইকে খাইয়েছে, নিজে খায় নি। এখন বুকের মধ্যে পুড়ছে, জ্বলছে আর মুচড়ে উঠছে, আর এই সব কথা বলছে।

গোপীনাথ শেষ কথা বলল, 'ঘুমোও। ছেলেমানুষের মন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সকালবেলা কলি তেমনি গম্ভীর, মুখ অন্ধকার। মায়ের মুখের দিকে তাকাল না। গোপীনাথ নিজে কালকে ইস্কুলের জন্যে তৈরি করে, রিক্শার হাজিরা দিতে চলে গেল। ইস্কুল থেকে রিক্শা নিয়ে দোতলা বাড়ির সামনে এসে ভেঁপু ফুঁকতে লাগল। কিন্তু কলি আর বেরোয় না। গোপীনাথ নিজে যখন রিক্শা থেকে নামতে উদ্যত হল, তখন কলি কাঁদতে-কাঁদতে চোখ লাল করে বেরিয়ে এল।

গোপীনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আবার কি হল ?'

কলির রুদ্ধ স্বর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়ল, 'মা আমাকে আজ আদর করে নি।'

গোপীনাথের মনটা হুহু করে উঠল, বলল, 'তাতে কি হয়েছে ? আয়, আমি তোকে আদর করি।'

কলি কাঁদতে-কাঁদতে বলল, 'না-না, আমি ওই ইস্কুলে যাব না। আমার মিছে কথা বলতে ভাল লাগে না।'

গোপীনাথ বলল, 'কেন ?"

কলি ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল, 'সকলের বাবা মা আছে। আমার নেই।'

গোপীনাথ কিছু বলতে গেল। কলি বলল, 'না-না, আমি আর তোমাকে গুপীদাদা বলতে পারব না। আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।'

বলেই কলি বস্তির দিকে ছুটতে লাগল। ওর মাথার ঝুঁটিতে ফিতে উড়ছে। হাতে বইয়ের ব্যাগ। গোপীনাথ তাকিয়ে রইল। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠল, আব সকালের রোদ টলটল করে দুলতে লাগল।

শোভাবাজারের শাইলক

শোভাবাজারের শাইলক, এই নামেই তাকে সবাই চিনত নয়, এখনও তাই চেনে। আর যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিনই চিনবে।

কারণ, এই নামটাই তার আসল পরিচয়। তার চরিত্রের ভিতর এবং বাইরের, সবটুকু মিলিয়েই এই সার্থক নামটা লোকে তাকে দিয়েছে। লোকেরা তাদের অভিজ্ঞতা থেকেই দিয়েছে।

কারণ তারা দেখেছে, শেক্‌সপিয়রের নাটকের চরিত্র ইহুদী শাইলক, যেমন তার খাতকের দেহের মাংস দাবি করেছিল পাওনা টাকার জন্যে, আমাদের শোভা-বাজারের শাইলকের চরিত্রেও সেই নিষ্ঠুরতাই বর্তমান। যদিও পাওনা টাকার জন্যে সে খাতকের মাংস আর দাবি করতে পারে না, কেননা, যুগটা বদলে গিয়েছে। তবু এটা ঠিক যে, পাওনা টাকার বদলে টাকা না পেলে মাংসতেও সে নারাজ নয়।

শোভাবাজারে অবশ্য একে আপনারা বড় একটা দেখতে পাবেন না। সেখানে কোন একটি কানাগলির সুড়ঙ্গের মধ্যে মান্ধাতা আমলের মস্ত বড় রাক্ষুসে বাড়িতে সে রাত্রিবাস করে শুধু। যে বাড়িটার ঘরগুলি এখন অজস্র অন্ধ-গহ্বর বলে মনে হয়, আর সব তছনছ করা উচ্ছৃঙ্খলতার মত যার গায়ে বট অশ্বত্থেরা মাথা তুলেছে, একই পায়রারা বংশপরম্পরা যার খিলানে-কোটরে জন্ম-মৃত্যুর লীলাখেলা করে।

কিন্তু যেহেতু সে শোভাবাজারের বাসিন্দা, সেই হেতু তাকে শোভাবাজারের শাইলক বলা হয়। যদিও সে শোভাবাজারের আদি বাসিন্দা নয় এবং তার আদি যে কোথায়, সে-বিষয়েও সঠিক কোন সংবাদ কেউ জানে না। তবু শোভাবাজারের সবাই তাকে চেনে। আর চেনেও অনেক দিন থেকেই; যখন সে বাঁক কাঁধে করে গঙ্গার জল সরবরাহ করত বাড়িতে বাড়িতে।

তখন এ অঞ্চলের প্রায় সব বিধবা এবং বুড়ী সধবা গিন্নীরাই তাকে চিনতেন। বিশেষ, যারা ঠাকুরঘরের বাইরের জগৎকে চিনতেন না। আর যেটুকু চিনতেন সেটুকু গঙ্গাজলের ছিটে দেওয়া চৌহদ্দিটাকেই চিনতেন।

তখন তাদের মুখে একটা কথা শোনা যেত প্রায়ই, এই মুখপোড়া 'ঘটে' ছি-চরণের পাঁকগুলো ধুয়ে বাড়ি ঢুকতে তোর কি হয় রে, অ্যাঁ?

এই 'ঘটে' থেকে তার একটা পুরো নাম আবিষ্কার করা যদিও খুবেই মুশকিল তবু আমার মনে হয়, তার নাম ঘটোৎকচ হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ, এখন যেখানে সে চাকরি করে সেখানে, অবিশ্বাস্য হলেও তার নাম লেখা আছে, রাবণ হালদার। এই নাম এবং পদবী, দুটি জিনিসই অবশ্য খুব গোলমেলে। এইজন্যেই গোলমেলে যে, সে নিজেকে পোদ্ জাতের লোক বলে পরিচয় দেয়, যাদের আর যা-ই হোক, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের হালদার পদবীটা হওয়া অস্বাভাবিক। আর নাম? সে বিষয়ে সবাইকে এই ভেবেই নীরব থাকতে হয় যে, পৃথিবীতে কত বিচিত্র নামই না আছে!

কিন্তু বেছে-বেছে, আমাদের শোভাবাজারের শাইলকেরই কি এই নামটা রাখা হয়েছিল? কি বিচিত্র।

চাকরির কথাটা বলে নেওয়া দরকার। কেননা প্রশ্ন উঠতে পারে, সুদখোরের আবার চাকরি কিসের? চাকরি একটা সে করে, সেটা তাকে তার আসল ব্যবসায়ে অনেক এগিয়ে দিয়েছে।

কাছাকাছি একটি হাই-স্কুলের সে বেয়ারা। গঙ্গাজলের পুণ্য-ব্যবসা করতে করতেই এই চাকরিটা সে কোন এক কালে পেয়েছিল। সেটা এখন কোন এক কালেই পৌঁছেছে এই জন্য যে, পঁচিশ বছরের ওপর সে একই স্কুলে আছে। ইতিমধ্যে তিনবার প্রধান শিক্ষক বদল হয়েছেন। অনেক নতুন শিক্ষক এসেছেন, পুরনো শিক্ষক গেছেন। মারাও কিছু কম যান নি।

তার আগে সে গঙ্গাজল দিত বাড়ি-বাড়ি। আর সেই গঙ্গাজলের পুণ্যের ব্যবসার সময়েই সে প্রথম একজনকে ধার দেয়। সেটাও খুব অদ্ভুত ব্যাপার, অন্তত শাইলক-জীবনের প্রথম অঙ্কুরোদ্গমের কাহিনী জানা যায়।

সে যে বাড়িটায় তখনও ছিল, এখনও আছে, সেখানে অনেকেই তার মত। নানান ফিকিরেই তাদের পেট চলত।

শাইলকের, হ্যাঁ শাইলক বলাই ভাল ; শাইলকের হাতে সেদিন একটি মাত্র টাকা আছে, সেটা ভাঙিয়ে তাকে খেতে হবে।

ওই বাড়ির পরিচিত একজন তার কাছে একটা টাকা ধার চেয়েছিল। কিন্তু টাকা মাত্র একটি। দেওয়া যায় না। তা ছাড়া টাকা ধার দেবার কোন ইচ্ছাই তার ছিল না।

লোকটা তবুও বিরক্ত করছিল, কারণ, তার একটু নেশা ভাং-এর ব্যাপার ছিল। লোকটা প্রায় পায়ে পড়ে বলেছিল, চার পয়সাটা বেশি হয়, কিন্তু রাত পোহালেই টাকার সঙ্গে পুরো দুটি পয়সা সুদ দেবে।

কথাটা তার মনে ধরেছিল এবং মনে-মনে ভয় থাকলেও টাকাটা দিয়েছিল সে তাকে। যদিও রাত্রে সে তার জন্যে উপোস করেছিল, তবু দেখতে চেয়েছিল, পুরো টাকাটার সঙ্গে তার অতিরিক্ত দুটি পয়সা আসে কি না।

এসেছিল। পুরো এক ইঞ্চি ডায়মেটারের রাজা-মার্কা তামার নতুন দুটি পয়সাই পেয়েছিল সে। সেই দিনটা এবং পয়সা দুটি যে কত বড় ঐতিহাসিক ব্যাপার, সেদিন সেটা বোঝা যায় নি। কেউ জানেও না।

শাইলকের বাড়ি কোথায়, আছে কে কে, বিয়ে-থা হয়েছিল কি না, মেয়েছেলে আছে কি না, এ সব প্রশ্ন শাইলকের জীবনে মৌন সমুদ্রের মতই নীরব। সেখানে কোন দিন বুড়বুড়ি কাটার মত একটি দুর্বোধ্য শব্দও শোনা যায় নি।

তার এখনকার পরিচিতদের ধারণা, লোকটা আবহমান কাল ধরেই এক রকম দেখতে। রোগা নয়, পেটা-পেটা গড়ের একটি শক্ত কালো মানুষ, বয়সের যার গাছপাথর নেই। বয়স পঞ্চাশ হতে পারে, পঁয়ষট্টি হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নয়! ধূসর বর্ণের ছোট ছোট খোঁচা খোঁচা চুল, যার কখনই বাড় নেই, পরিবর্তন নেই। মোটা স্ফীত নাক, ছোট চোখের ওপরে মোটা লোমশ ভ্রূ-জোড়া হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন। মার্কিন কাপড়ের হাফশার্ট আর আট হাত মিলের ধুতি কোঁচা দিয়ে পরা। পায়ে সে কোন দিনই জুতো দেয় নি। নেশার মধ্যে শুধু চা।

স্কুলের অধিকাংশ মাস্টারমশাই তাকে খাতির করেন। মনে-মনে রাগ এবং ঘৃণা থাকলেও ভয়ও করেন। কারণ, তাঁদের মাসের শেষ থেকে নয়, গোড়া থেকেই ধার দেবার লোক এই শাইলক। তাঁদেরই বেয়ারা।

কবে থেকে তার শাইলক নাম হয়েছে সেটাও এখন অতীত কালের ঘটনা। সবাই তাকে এই নামেই ডাকে। সে কিছু মনে করে না।

কেবল হেড-মাস্টারমশাই তাকে রাবণ বলে ডাকেন। শাইলকের নিজেরও ওই নামটা মনে থাকে না, তাই জবাব দিতে ভুল হয়ে যায় মাঝে-মাঝে। হেড-মাস্টার রাবণ বলেন এই জন্যে যে, অন্তত শাইলক তাহলে তাকে খাতির করবে। আর বোধ হয় সেই জন্যেই শত প্রয়োজনেও তিনি কখনও শাইলকের কাছে ধার করেন না।

শাইলক মাস্টারমশাইদের সব সময়েই প্রায় ধমকে কথা বলে। সে অধিকার তার আছে এবং তার ধমকটা সবাই মেনেও নিয়েছেন।

যেমন, বাংলার মাস্টার হরেনবাবু, হয় তো ক্লাসে না গিয়ে তখনও বিড়িতে সুখ টান দিচ্ছেন, ঘণ্টা বেজে গিয়েছে পাঁচ মিনিটের ওপর।

শাইলক বলে উঠল, কই হরেনবাবু, বিড়ি তো অনেকক্ষণ ধরে খাচ্ছেন, এদিকে এইটের বাঁদরগুলি যে লঙ্কাকাণ্ড করছে। তাড়াতাড়ি যান।

হরেনবাবুর রাগ হবার কথা। হেড-মাস্টার কিছু বলছেন না। আর বেয়ারা এসে হুকুম করবে? কিন্তু হরেনবাবু রাগ করবেন কেমন করে? আসল দূরের কথা, এ মাসের সুদটা পর্যন্ত দেওয়া হয় নি এখনও।

কিংবা, ইংরেজী মাস্টার অনিলবাবুকে ডেকে শাইলক হয়তো বলল, ও অনিল-বাবু শুনুন, কোঁচাটা মাটিতে লুটোচ্ছে মশাই। ওই বরেই ওই কাপড় ছেঁড়েন, আর মাসে-মাসে ধার করে তাই কাপড় কিনতে হয়!

অনিলবাবুর মনের অবস্থা বর্ণনা নিষ্প্রয়োজন।

কিন্তু তিনি শাইলকের একজন খাতক।

এ সব তো খুবই ভাল কথা। এর চেয়ে অনেক খারাপ-খারাপ কথাও সে বলে। অঙ্কের মাস্টারমশাই রামকৃষ্ণবাবুকে তো রীতিমত অঙ্কই শিক্ষা দিয়ে দেয় সে অনেক সময়। বলে, দেনার হিসেব এত ভুল করেন, রামকেষ্টবাবু, ছাত্রদের আপনি যা পড়াবেন তা আমার জানা আছে। যাক, ভুল করুন আর যা-ই করুন, আমার দু টাকা তের আনা এক পয়সা সুদটা দিয়ে যা খুশি তাই করুন গে।

প্রায় অধিকাংশ মাস্টারের ওপরেই তার খবরদারি চলে, হেড-মাস্টারকে ছাড়া। তিনি শাইলকের কাছে ঋণ করেন না।

তবু মাস্টারমশাইদের ওপর খবরদারি করে-করে, সকলের সঙ্গে সমান-সমান কথা বলে, এমন একটা পর্যায়ে এসে পড়েছে যে, মনে হয় স্কুলে ওর ওপর কেউ নেই। আর যা খুশি তাই করতে আর বলতে পারে ও।

এই তো গত মাসে স্কুলের ইনস্পেক্টর এলেন। শাইলক তো অনেক মাস্টার-মশাইকেই সেদিন ধমকালে। তারপর ইনস্পেক্টর যখন এলেন, শাইলক আগে বেড়ে পরিচয় করিয়ে দিল। এই যে, ইনিই আমাদের হেড-মাস্টারমশাই। ইনস্পেক্টর নমস্কার করলেন, হেড-মাস্টারও। কিন্তু রাগে হেড-মাস্টারমশাই-এর গা জ্বলতে লাগল। তখন কিছু বলতেও পারলেন না।

শুধু তাই নয়, শাইলক সব মাস্টারের পরিচয় করিয়ে দিলে। ইনি অঙ্কের মাস্টারমশাই রামকৃষ্ণবাবু, ইনি বাংলা···ইত্যাদি।

সবশেষে, এই কুদর্শন, উঁচু করে কাপড় পরা হাফশার্ট গায়ে, খোঁচা-খোঁচা চুল শাইলককে ইনস্পেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, আপনার পরিচয়টা তো দিলেন না?

শাইলক খুব গম্ভীরভাবেই জবাব দিলে, আমি এ স্কুলের বেয়ারা।

ইনস্পেক্টর অবাক হয়ে তাকালেন হেড-মাস্টারের দিকে। হেড-মাস্টারের মুখ তখন লাল। খালি বললেন, রাবণ, তুমি বাইরে গিয়ে বস।

শাইলক বাইরে গিয়ে বসল।

ইনস্পেক্টর চলে যাবার পর হেড-মাস্টার তো প্রায় মারতেই যান শাইলককে, গেট আউট, এখুনি বেরিয়ে যাও স্কুল থেকে।

অপরাধটা যে গুরুতর হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে, নরম করে জবাব দিলে শাইলক, আলাপ করিয়ে দিলে যে অপরাধ হয়, তা জানতুম না। ঠিক আছে, আর এ রকম হবে না কোন দিন।

এমন কিছু হাতে পায়ে ধরে বলে নি শাইলক, কিন্তু ওইটুকু বলাই তার পক্ষে যথেষ্ট।

শুধু সেই দিনটাই কোন মাস্টারমশাইকে আর সারাদিন সে ধমকায় নি।

কিন্তু এ জায়গাটা শাইলকের আসল ব্যবসার স্থান নয়। সেটা অন্যত্র এবং সেখানেই তাকে সবচেয়ে ভাল করে চেনে সবাই। আর সেখানে কেউ মাস্টারমশায়ও নয়। সকলেই নিচু শ্রেণীর লোক।

তাই, স্কুলের শেষ ঘণ্টা বাজিয়ে, দারোয়ানের ওপর সব ভার দিয়ে সে গিয়ে বসে খালধারের সেই চায়ের দোকানটায়।

সেখানে তার একটি নির্দিষ্ট আসন আছে। চায়ের গেলাস নিয়ে সেখানে বসে, তার মোটা ভ্রূর তলায় প্রায় ঢাকা ছোট-ছোট চোখে তাকিয়ে থাকে পশ্চিমাকাশের দিকে।

জায়গাটা সে ইচ্ছে করেই ওখানে বেছে নিয়েছে। কারণ পশ্চিম দিকটা অনেকখানি খোলা, আর গঙ্গাকে দেখা যায়। গঙ্গার ওপার পর্যন্ত। সেখানে বসে-বসে সে সূর্যাস্ত দেখে।

না, কোন বিশ্বরহস্যের অনির্বচনীয়তাকে প্রত্যক্ষ করার জন্য এই সূর্যাস্ত দেখা নয়। তার খাতকের দলেরা দেনা মেটাতে আসবে এবং সূর্যাস্ত হলেই সুদ এক পয়সা করে বেড়ে যাবে।

তার এই আসল খাতকেবা সকলেই বাজারের ফড়ে। আশেপাশে অনেকগুলি বাজারের ফড়েরাই তার দেনাদার। যারা টাকা পিছু প্রতিদিন এক পয়সা করে সুদ দেয়।

সন্ধ্যাবেলা টাকা নেবে. পরদিন সূর্যাস্তের আগেই সুদসহ টাকা শোধ না হলেই আবার সুদ। ঘড়ি ধরে এখানে কারবার চলে না। গঙ্গার ওপারে. গাছের আড়ালে সূর্য হারিয়ে যাওয়া মনেই দিন শেষ। অতএব এক টাকার শোধ, আর এক টাকা এক পয়সা নয়—দু পয়সা।

ফড়েরা অধিকাংশই রাত্রে পাড়াগাঁয়ের দিকে, দূর গ্রামের হাটে তরিতরকারি কিনতে যায় পাইকারি দরে। তখনই তাদের টাকার প্রয়োজন হয়। পরদিন বাজারের বিক্রি-বাটা শেষে লাভ লোকসানের বরাত দেখে তারা।

যারা শাইলকের কাছে ঋণী, তারাও বেলা চারটে থেকেই আকাশের দিকে ঘন-ঘন তাকাতে থাকে। একবার সূর্য পাটে গেলেই হয়, দশ টাকার সুদ পাঁচ আনা দিতে হবে।

অবশ্য এর মধ্যে কতগুলি ফাঁক আছে। যথা, খাতকের ভিড় হয়েছে, সকলের সঙ্গে হিসেব মিটমাট করতে-করতেই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। যারা তখনও বাকি, তাদের বাড়তি সুদ দিতে হবে না, কারণ তারা সূর্যাস্তের আগেই এসেছে। এসেছে কি না সেটা অবশ্য লক্ষ্য রাখে সে।

বেলা দুটোর আগে ব্যাংকে চেক জমা দেবার মত। এটা শাইলক ওখান থেকে শিখেছে। এই সব খাতকদের মধ্যে মেয়ে-পুরুষ সব রকমই আছে। আর শাইলকের ব্যবহার সকলের সঙ্গেই সমান।

তাই সে বেলা চারটের সময় এসে, খালধারের চায়ের দোকানে বসে। কোলের ওপরে থাকে তার সেই ময়লা মোটা খাতা, আর সুতো দিয়ে বাঁধা পেন্সিল। যে পেন্সিলের শিসটা খাতায় লেখার চেয়ে, জিভে ঠেকিয়ে ঠেকিয়েই বেশি ক্ষয়েছে।

খাতা খুলে প্রত্যেকের হিসেব দেখে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে। লেখাগুলি তার নিজেরই এবং সেগুলি সে নিজে ছাড়া কেউ পড়তে পারে না। হিসেবের পাশে নানা রকম সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিও সে ছাড়া আর কেউ বুঝবে না।

প্রত্যেকটি পয়সা সে গুণে নেয়, থুথু দিয়ে খাতার পাতা উল্টে বকেয়া সুদের হিসেব দেখে নেয়। আর ঘন-ঘন আকাশের দিকে তাকায়।

আকাশের দিকে চেয়ে চোখ ফিরিয়ে, খাতকের দিকে তীক্ষ্ম অনুসন্ধানী দৃষ্টি মেলে ধরে। কে কে আসে নি তখনও। মনে থাকে ঠিক। অভ্যাসও হয়ে গেছে।

রেহাই বলে কোন কথা নেই। মাফ বলে শব্দটা নেই শাইলকের অভিধানে।

যদি কেউ বলে, দেখ শালিকখুড়ো—

সেটাও আবার একটা কথা। এই সব খাতকেরা তাকে শালিক বলেই ডাকে। শাইলক কথাটার মানে তারা জানে না। কিন্তু শব্দটা শুনে-শুনে, 'শাইলক' তাদের ধারণা ও উচ্চারণে 'শালিক' হয়ে গেছে।

তাতে শাইলক কিছু মনে করে না।

যদি কেউ বলে, শালিকখুড়ো, আজকে যদি একটু মাফ করে দাও, অবিশ্যি কালই দিয়ে দেব, তবে আজকের রাতটা ছেলেমেয়ে নিয়ে খেয়ে বাঁচি।

তোমার খেয়ে বাঁচার জন্যে আমি টাকা দিই নে।

তা বটে। সূর্যাস্তের পরমুহূর্তে এসে হাতে-পায়ে ধরেও ডবল সুদ থেকে কেউ রেহাই পায় না। দৈবাৎ কারুর বাড়িতে যদি কেউ মারা যাবার জন্যেও না আসতে পারে, তাকেও ছেড়ে দিতে দেখা যায় নি শাইলককে। মৃত খাতকের পয়সাও সে আদায় করে ছাড়ে। অবশ্য মৃত্যুর পর প্রতিদিনের বাড়তি সুদটা শাইলক আর ধরে না। একবার পাঁচী ফড়েনী দুটি আস্ত ফুলকপি দিয়েছিল শাইলককে। পাঁচীর দেনাটা একটু বেশি ছিল। সুদটাও বেশি। এবং আসতে রাত হয়েছিল। তাই বোধ হয় পাঁচীর ফুলকপির উপহার। ফুলকপি নিলেও সুদের একটি আধলাও ছাড়ে নি সে।

মৃত্যু শোক দুর্ঘটনা, কোন কিছুই এই শোভাবাজারের শাইলককে কোন দিন টলাতে পারে নি। সূর্যাস্ত দেখতে ভুল করে নি সে কোন কারণেই কোন দিন এবং সূর্যাস্তের পর হিসেবের কড়ি একটিও ছাড়ে নি।

যারা তার খাতক, তাদের কোন উপায় নেই তার কাছে না এসে। কেন না প্রতিদিনের প্রয়োজন মেটাবার মত লোক পাওয়া বড় কঠিন। তাও আবার ভাল লোক। কিন্তু মনে-প্রাণে সবাই তাকে ঘৃণা করে। পয়সার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও

তার মৃত্যু কামনা করে সবাই। এবং সকলের দৃঢ় বিশ্বাস, লোকটা মরলে, শকুনে ছিঁড়ে খাবে তাকে। আর খুব সম্ভবত লোকটা গলায় রক্ত উঠেই মরবে।

তার সেই মৃত-চেহারাটা ভাবতেও অনেকের ভাল লাগে বোধ হয়।

এ-হেন শোভাবাজারের শাইলক এক অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল।

হাতিবাগান বাজারের তরকারিউলী বিধবা সুখদার বয়স বছর বিয়াল্লিশ হবে। দেখতে সে তেমন ভাল নয়, তবে এ বয়সেও তার দেহের বাঁধুনিটা ছিল ভালই। মুখখানি মোটামুটি যদিও, তবু একটা চটক ছিল। রাস্তা দিয়ে গেলে একবার তাকিয়ে দেখবে সবাই তাকে।

শাইলকের সে খাতক। যদি বা কোন দিন সুখদা ভ্রূ নাচিয়ে থাকে শাইলকের দিকে চেয়ে, একটু বেশি হেসে-টেসেও থাকে, তাতে কোন দিনই তার কিছু যায় আসে নি। এবং সে সব দেখেও একটি আধলাও মাফ করে নি।

সুখদা একদিন তার ষোল বছরের মেয়েটিকে নিয়ে এসেছিল সঙ্গে। আর সুখদা সেইদিন লক্ষ্য করে দেখেছিল, 'শালিক' তার মেয়ে ময়নাকে বারে-বারেই দেখছে।

ময়না বয়সে ষোলই বটে। কিন্তু একটু বড়সড় হয়ে পড়েছে। যে পাড়ায় তারা থাকে, সেটাও ভাল নয়। মেয়েটিকে নিয়ে নানান দুর্ভাবনা সুখদার। শিস দেওয়া, গান গাওয়া তো অষ্টপ্রহর আছেই। মেয়েকে কাছে-কাছে নিয়ে না ঘুরলে, এক মুহূর্ত সে স্থির থাকতে পারে না। এক মিনিট কারুর দিকে বেশি তাকিয়ে থাকলে, ময়নাকে চিমটি কেটে তার সংবিৎ ফেরায় সুখদা: ওদিকে কি দেখছিস?

ময়না সুখদার গলার কাঁটা। তার বিয়ে দেবার ক্ষমতা নেই সুখদার।

কথাটা শাইলকেরও অজানা নেই।

কিন্তু, 'শালিকে'র দৃষ্টি দেখে সুখদার মনে বিচিত্র ইচ্ছা জেগেছে। শাইলককে জামাই করলে মন্দ হয় না। রূপকথার মতই যার টাকার আণ্ডিল, তাকে বাঁধবার তবু একটি রাস্তা আছে তার। বয়স? টাকার কাছে কিছু নয় ওটা। পুরুষের আবার বয়স!

একদিন সে বলেই বসল, মেয়েটাকে আর ঘরে রাখতে পাচ্ছি নে শালিক-দা।

শাইলক বললে, বে' দাও।

টাকা?

কত টাকা?

সুখদার বুকের মধ্যে বুঝি কাঁপছিল। এ রকম জিজ্ঞেস করার মানে? বিনা সুদে তাকে ধার দেবে নাকি?

সুখদা বলল, তা, একটা বে-থা দিতে গেলে আজকালকার দিনে পাঁচশো তো লাগেই।

হুঁ। কথার ফাঁকে একবার সুর্বাঙ্গ দেখে বলল শাইলক, মেয়ের বে' দিতে চাও? ওই ময়নার? ছেলে দেখেছ?

দেখা ছিল সত্যি। ভাল পাত্র, শিয়ালদহ বাজারের বেশ ভাল দরের দোকানদার। কিন্তু শাইলক যে তাকে ছলনা করছে না, তার প্রমাণ কি? সুখদা কি বোঝে না, ছেলে সে নিজেই হতে চায়। তবু একবার চাবুকে দেখতে আপত্তি কিসের?

বলল, দেখেছি।

ভাল?

খুব ভাল।

হুঁ। মেয়েটি তোমার ভাল সুখদা। দেখতেও ভাল। মেয়েটিকে আমার ভাল লেগেছে।

কেমন ভাল। সেইটিই জানতে চায় সুখদা। বলল, সে তোমার দেখবার চোখ শালিক-দা।

হুঁ। মেয়েটি তোমার সুখী হোক, এটা আমি চাই সুখদা।

কারুর সুখ চায় শাইলক!

শাইলক হঠাৎ বলল, টাকা তোমাকে দেব সুখদা।

এত টাকা ধার, শুধব কেমন করে শালিক-দা?

শাইলক পশ্চিমাকাশের দিকে তাকাল। ভ্রূ দুটি তার উঠে গেছে, চোখ দুটি শান্ত আর বড় দেখাচ্ছে। গম্ভীর গলায় বলল, ধার নয়। তোমার মেয়ের বে-র জন্যে দেব। পাঁচশো টাকাই দেব। ছেলেকে পাকা দেখে বে-র দিন ঠিক কর। এই জ্যৈষ্ঠতেই লাগাও।

সুখদা হাঁ করে তাকিয়েছিল শাইলকের দিকে।

শাইলক বলল, তোমার আজকের টাকা আর সুদটা দাও।

সুখদা টাকা আর সুদ দিয়ে বলল, ময়নার বে-র কথাটা মিছিমিছি নয় তো শালিক-দা?

শাইলকের মুখটা ভীষণ দেখাল ঝেঁজে উঠে বলল, মিছে কথা কোন দিন বলতে শুনেছ শালিককে?

সুখদা ব্যবস্থা করলে মেয়ের বিয়ের। দিন ঠিক হল।

পাঁচশো টাকা নিজের হাতে রেখে, শাইলক প্রতিদিন সুখদার দরকার অনুযায়ী টাকা দিতে লাগল।

কেউ সুখদাকে ভয় দেখাতে লাগল। কেউ-কেউ খারাপ কথাও বলতে কসুর করল না। আর সেই কলঙ্কের হাত থেকে মা-মেয়ে, কেউই বাদ গেল না।

তবু, মেয়েমানুষ পাওয়াটা এমন আর কি কঠিন ব্যাপার ছিল শাইলকের পক্ষে? কিন্তু পাঁচশো টাকা?

শাইলকের দিকে সবাই অবাক চোখে তাকাতে লাগল।

তারপরে এল সেই বিয়ের দিন। পাঁচশোর সব টাকাই শাইলক দিয়ে দিলে সুখদাকে।

বিয়ে হল। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সুখদা তার চেনাশোনা অনেক ফড়েকেই নিমন্ত্রণ করেছে। আর তারা সকলেই শাইলকের খাতক।

বিস্ময় ও সন্দেহের নানা রকম ভ্রূকুটি চারদিকে। শাইলককে ঘিরেই। শুধু সুখদা আর ময়নার বিস্ময়েরই সীমা ছিল না।

সকলের সঙ্গে বসে খেল শাইলক। তারপর একখানি শিল্কের শাড়ি বের করে দিল ময়নাকে। বললে, নাও-মা।

সুখদা কেঁদেই ফেললে। ময়না নমস্কার করল।

যাবার আগে, সুখদাকে আড়ালে ডেকে শাইলক বলল, তিন দিন ধরে তোমার বকেয়া সুদ বাকী রয়েছে কিন্তু, সেই সাড়ে সাত টাকার, মনে আছে?

অবাক হয়ে সুখদা বলল, হ্যাঁ।

দেরি করছ কেন? সুদ রোজ বাড়ছে। কাল দিয়ে দিও।

লোকটা কিছু ভোলে না; যে পাঁচশো টাকা দিয়ে সুখদার মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেয়, সেই লোক সাড়ে সাত টাকার সাড়ে সাত আনা সুদের তাগাদা দিতে ভোলে না।

শাইলক বেরিয়ে যাবার পরেই, কয়েকজন ফড়েও বেরিয়ে গেল।

তারপর সুখদার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরে, অন্ধকার খালের ধারে, একটি পুলের তলায়, হঠাৎ কারা যেন আক্রমণ করল শাইলককে। প্রচণ্ডভাবে মারল তারা লোকটাকে, আর শুধু এইটুকু শোনা গেল. শালা এতদিনে বুঝেছি, কেন তুমি মাগীর পেছনে টাকা খাটাও, গরীবের টাকা মারো।

পরদিন কথাটা রাষ্ট্র হয়ে গেল ঝড়ের বেগেই যে, শাইলককে নাকি কারা মেরেছে।

স্কুলের মাস্টারমশাইরা দেখলেন। শাইলকের ফোলা ক্ষত-বিক্ষত মুখ। সে মরে নি। তাঁরা হাসলেন ঠোঁট টিপে!

সেদিন খালের ধারে চায়ের দোকানে তার খাতকের দলও বিশেষ নজরেই তাকিয়ে দেখল তার দিকে।

কিন্তু শাইলকের ব্যবহারে কোন তফাত দেখা গেল না। কেবল জনা পাঁচেক ফড়েকে সে বলল, দ্যাখ, সংসারের পাপ এখনও আছে। তোরা কখনও মুক্তি পাবি নে, আমারও মুক্তি নেই।

এ ছাড়া আর কিছু সে বলে নি।

তারপরে পাঁচ বছর কেটে গেল, সেই একই লোক রয়ে গেছে শাইলক। কোন পরিবর্তনই হয় নি তার।

শুধু সুখদা এবং সকলের কাছেই, ময়নার বিয়ে দেওয়াটা শাইলকের জীবনের মৌনসমুদ্রে কয়েকটি দুর্বোধ্য বুদবুদের মতই রয়ে গেল। তবু এক বুদবুদ উঠেছিল।

কথা চোখে চোখে। ত্যাবড়া চোখের তারা উলটে খানিকটা শিবনেত্র ভঙ্গি করল। মনা ওর দিকে চেয়ে, নিচের ঠোঁট দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, পঁক পঁক করে হর্ন বাজিয়ে দিল। যেন একটা জন্তুর খুশির ডাক। পুনিয়া তখন ওর সামনে দাঁড়িয়ে, তলপেটের নিচে রঙ ওঠা ময়লা চাপা প্যাণ্ট, পা দুটো অনেকখানি ফাক করা। হাত দুটোও ওপর দিকে তুলে দুদিকে ছড়ানো। সরু গলার ওপরে রুক্ষু ঝাঁকড়া-চুলো মাথাটা না থাকলে, রোগা শরীরটা পুরো ইংরেজী এক্স অক্ষর। শরীরটাকে দুলিয়ে, মনাকে চোখ টিপল। সোতে, ওদের তিনজনের দিকেই তাকিয়ে, চোখের কোণে বাঁ দিকে ইশারা করল। তারপরে লাফ দিয়ে রিকশার সিটের ওপর উঠে উলটো দিকে প্যাডেল ঘুরিয়ে দিল বনবনিয়ে। পথ চলতি এক মহিলাকে ডেকে, চেঁচিয়ে বলল, 'রিকশা নিয়ে আসব দিদিমণি?'

দিদিমণি ওর দিকে চেয়ে, হেসে বললেন, 'এখন না।'

সোতে মুখের ভাব করল, যেন হতাশ হয়েছে। মাথাটা নিচু করে হাত ঝুলিয়ে দিল। তারপরেই আবার চারজনে, চারজনের দিকে তাকাল। আবার কথা চোখে চোখে। ত্যাবড়া এমন ভাবে ঘাড় কাত করে, জিভটা এক পাশে বের করে ঝুলিয়ে দিল, মরা মানুষের মুখের কথা মনে হয়। সেই সঙ্গে আবার চোখ ওলটানো, আর ঘাড়ের একটা ইশারা। মনা মাথা নেড়ে কয়েকবার খাবি খাওয়ার ভঙ্গি করল। পুনিয়া ঠোঁট টিপে, ভুরু কুঁচকে, ঘাড় নেড়ে মনাকে সায় দিল। সোতে এমন মুখ-চোখ করল, আর শক্ত হাতে হর্ন টিপল, যেন কারোর গলা টিপছে। তাছাড়া ঠোটের কোণে হেসে বলল, 'ভাগ সালা।'

সোতে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'আমার সালা আর দেরি সইছে না।'

এই সময়ে গণেশ ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। পরনে লুঙ্গির মত করে ময়লা কাপড় দু-ভাঁজ দিয়ে পরা। গায়ে একটা সাবানের কোম্পানির ছাপ মারা, বিনা পয়সায় পাওয়া ধবধবে সাদা গেঞ্জি। মফস্বলের রিকশাওয়ালাদের গেঞ্জি দান করে কোম্পানিগুলো এভাবে বিজ্ঞাপন করে। ওর চোখের দৃষ্টি

তীক্ষ্ণ, সন্দেহে ভরা। চারজনের দিকেই তাকিয়ে, রাস্তার আশেপাশে একবার দেখে নিল। ইস্টিশনের দিকেও একবার দেখল। তারপরে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার রে তোদের ?'

ত্যাবড়া সমস্ত দাঁতগুলো বের করে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ক্যানারে গণিশ ?'

বলে, চারজনে আবার চারজনের দিকে তাকাল। চারজনেই হাসল। মনা আর সোতে জোরে জোরে হর্ন বাজাতে লাগল। সেপাই লাঠি তুলে ছুটে এসে বলল, 'এই শালারা, শুধু শুধু হল্লা করছিস কেন ?'

ঠিক এ সময়েই, কুড়ি হাত দূরে স্ট্রিট-কর্নার মিটিং শুরু হয়ে গেল,— 'বন্ধুগণ, মহকুমার আসন্ন ছাত্র ও যুবকদের যে সম্মেলন হতে যাচ্ছে, সেখানে বিপ্লবী মোর্চায় দীক্ষিত...'

ওরা চারজন বা গণেশ সেদিকে ফিরে তাকাল না। কানও নেই। গণেশের সন্দিগ্ধ চোখ দুটো যেন দপ দপ করে জ্বলে উঠল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। সে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'ফট্‌কে, অ্যাই ফট্‌কে।'

যার নাম ফট্‌কে সে একটা হুডতোলা রিক্‌শার মধ্যে ঠ্যাঙ ছড়িয়ে আয়েস করে বসে ছিল। গণেশের ডাক শুনে লাফ দিয়ে নেমে বলল, 'কি বলছ গুরু ?'

গণেশ আবার ওদের চারজনের দিকে চোখ বুলিয়ে নিল। বলল, 'এরা একটা মতলবে আছে মনে হচ্ছে। আমি যেন কি রকম একটা গন্ধ পাচ্ছি। দ্যাখ্ তো, ইস্টিশনে একটা পাক মেরে আয়। সব ভাল করে দেখে আসবি।'

ফট্‌কেও গণেশের মতই সন্দিগ্ধ চোখে চারজনের দিকে একবার দেখে দৌড় দিল। বলে গেল, 'এখুনি দেখে আসছি গুরু।'

মনা ঘাড় কাত করে গণেশের দিকে তাকাল। চোখ আধবোজা করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হল রে গণিশ ?'

গণেশ একটা বিড়ি কামড়ে ধরে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'তোদের পোল্ খুলব।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। কেউ খ্যালখেলিয়ে, কেউ কিতকিতিয়ে। আর ঢলে ঢলে পড়তে লাগল। পুনিয়া বলল, 'খালি পোল্ কেন বে, বল্ আমাদের সব খুলে নিবি।'

ত্যাবড়া ওর কোমরের প্যাণ্টটা টেনে দেখিয়ে বলল, 'ইস্তক এটা।'

সোতে তাড়াতাড়ি ওর পাছায় দু হাত চেপে ভয়ে ভয়ে বলল, 'উ রে সালা, ফাদ্‌রাফাই করে দেবে, গণিশ মরদ বলে কথা!'

বলেই, আবার একটি সাজগোজ করা, কালো ঠুলি পরা যুবতীকে ডেকে চেঁচিয়ে উঠল, 'রিক্‌শা নিয়ে আসব দিদিমণি ?'

মেয়েটি ফিরে তাকাল না। মনা বলল, 'সালার খালি দিদিমণি দেখলেই

ডাকাডাকি। মা-ঠাকরুণ বাবুদের ডাকতে পারিস্ না?'

সোতে হাত নেড়ে বলল, 'ও সব তুই বুঝবি না। প্যাসেঞ্জার হালকা হবে, দানাদ্দান চালাব, পয়সাও বেশি, ওদিকে নজরেও মেজাজ।'

'· সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মুখোশ আমরা টেনে ছিঁড়ে ফেলব···'

মাইকে গলা শোনা যাচ্ছে। এ সময়েই একটা ট্রেন এল। রাস্তার ওপরে জলের স্রোতের মত প্যাসেঞ্জার নেমে এল। একসঙ্গে বোধ হয় পঞ্চাশটা রিক্‌শাওয়ালা হর্ন বাজিয়ে প্যাসেঞ্জার ডাকতে লাগল। মাইকের শব্দ একটু সময়ের জন্যে চাপা পড়ল। ফাঁকা হতেও সময় লাগল না।

ওরা চারজন তেমনি দাঁড়িয়ে। গণেশ প্যাসেঞ্জার ধরবার জন্যে যেতে গিয়েও থমকে গেল। ওর চোখের পাতা কুঁচকে উঠল। নাকের পাটা আবার ফুলল, সন্দেহের সঙ্গে উত্তেজনায় চোখ ঝকঝকিয়ে উঠল। বলল, 'উ রে সালা, প্যাসেঞ্জার ধরার তাল নেই তোদের?'

মনা বললে, 'সালা এমন লক্ষী গাড়ি না, দেখবি প্যাসেঞ্জার নিজেই এসে গেছে।'

গণেশের উত্তেজনা আর দুশ্চিন্তা বেড়ে উঠল। বলল, 'নির্ঘাত তোরা কিছু পেয়েছিস, না হলে—'

ফট্‌কে ফিরে এসে বলল, 'না গুরু, ইস্টিশনে প্যালেটফর্মে কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।'

'ঝাড়ুদারনিটাকে জিজ্ঞেস করেছিলি?'

'হ্যাঁ, বললে কিছু দেখতে পায় নি।'

এই সময়েই পুনিয়ার রিক্‌শায় গাদাখানেক কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে একটি গরীব বউ উঠে পড়ল।

পুনিয়া খে কিয়ে উঠল, 'আরে আরে কোথায় যাবে?'

বউটি ব্যস্ত। কোলে একটি, কোলের নিচে একটি কোল ধরে, পাশে দুটি। বলল, 'জোড়া তালাও।'

পুনিয়ার মুখ বিকৃত। বলল, 'বারো আনা লাগবে।'

বউটি প্রতিবাদ করে বলল, 'কেন? ছ' আনা ভাড়া তো।'

পুনিয়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'হবে না, অন্য রিক্‌শা দেখ।'

গণেশ ইতিমধ্যে ওদের আরো কয়েকবার দেখে সরে গেল। যাবার আগে বলে গেল, 'আচ্ছা, আমিও দেখছি।'

ত্যাবড়া বলল, 'দ্যাখ দ্যাখ, দেখে লে গণিশ।'

ওরা চারজনেই আবার হেসে উঠল। হাসির মধ্যেই মনা পুনিয়ার রিক্‌শার যাত্রী বউটিকে জিজ্ঞেস করল 'দশ আনা দেবেন দিদি?'

বউটি বলল, 'না ভাই, আট আনা দিতে পারি।'

'পাঁচজন যাবেন তো।'

'সব তো ছেলেমানুষ বাপু।'

মনা রাজি হয়ে গেল, 'আসুন, দিনের বেলাটা চালাতে হবে তো।'

বউটি বাচ্চাদের নিয়ে হুড়মুড় করে পুনিয়ার রিক্‌শা থেকে নেমে মনার রিক্‌শায় এসে উঠল।

পুনিয়া বলল, 'বা রে সালা।

মনা বলল, 'তোমার সালা এখন গরম বেশি। সকালেই লম্বা টিরিপ মেরেছ, দেড় টাকা করকর করছে।'

ওরা চারজনে আবার চোখাচোখি করল। আবার ইশারা, চোখে চোখে কথা। বোঝা যায় তার সঙ্গে ভাড়ার কোন ব্যাপার নেই। ত্যাবড়া বলল মনাকে, 'যাচ্ছিস, একটা টাকা ছেড়ে যা, জিনিস কিনতে হবে না?'

'ঘুরে আসি।'

ত্যাবড়া ঘাড় ঝাকিয়ে বলল, 'না না, ঘুরে এলে হবে না। রেডি করতে হবে।

মনা মুখ বিকৃত করে প্যান্টের পকেট হাতড়াল। একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'এখন এটা রাখ ফিরে এসে বাকীটা দিচ্ছি।'

ত্যাবড়া আধুলিটা নিয়ে বলল, 'থাকলেও দিবি না, খচ্চর। আচ্ছা শোন

ও রিক্‌শা সারির সকলের মুখের দিকে একবার দেখে নিল। গণেশ ওর দিকেই তাকিয়ে ছিল। মনার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ওদিকে যাচ্ছিস, একবার দেখে আসিস।

মনা জিজ্ঞেস করল, 'পটল তোলা হয়ে গেলে নিয়ে আসব?'

ত্যাবড়া নেতার মত মুখ করে বলল, 'না, একলা আনিস না। আমাদের কাউকে ডেকে নিয়ে যাস। আমার সালা খুব ভয় লাগছে।'

'কেন?'

'গণেশ ফট্‌কেরা না টের পেয়ে যায়।'

মনা একবার গণেশের দিকে দেখল, বলল, 'সালা খট্টাসের মতন চেয়ে রয়েছে। তবে কিছু আনজাদ করতে পারছে না। আচ্ছা আমি ঘুরে আসি।'

ওরা চারজনেই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ছিল। মনা যাত্রী নিয়ে চলে গেল। আর দুটি কলেজের মেয়ে সোতের রিক্‌শার কাছে এসে বলল, 'ভাড়া যাবে?'

সোতে তড়াক করে রিক্‌শার কাছ ঘেঁষে বলল, 'কোথায় যাবেন?'

'লক্ষ্মীপুর।'

'বসুন।'

'ভাড়া কত?'

'আপনাদের আবার ভাড়া বলব কি, উঠুন না। যা ভাড়া তা-ই দেবেন।

মেয়ে দুটি ওঠবার সময়েই ত্যাবড়া ডেকে উঠল, 'সোতে—'

সোতে হাত তুলে ওকে থামিয়ে দিল। প্যান্টের হিপ পকেট থেকে একটা টাকা বের করে ত্যাবড়ার হাতে দিয়ে বলল, 'সতীশ দাস ওসব ভোলে না।'

বলেই রিকশাটাকে নিয়ে দৌড়ে ছুটে গেল রাস্তার ওপর। লাফ দিয়ে সিটের ওপর উঠতে উঠতে কপালে পড়া চুলে একটা ঝাপটা মারল, হর্ন বাজাল।

পুনিয়া বলল, 'সালার কপাল দেখালি। ঠিক দিদিমণি মিলে গেল।'

ত্যাবড়াও সেই দিকে চেয়ে কবুল করল, 'হ্যাঁ, ওর কপালে দিদিমণি আছে।'

কথা বলতে বলতেই ত্যাবড়া আর পুনিয়া আবার চোখে চোখে তাকাল।

'…আজকের যুবক আর ছাত্রেরা সংগ্রামী জনতার এক বিরাট অংশ, তারা অতন্দ্র প্রহরীর মত…'

'ওই দ্যাখ, গণশা সালা ফটিকের কানে কানে কি বলছে।' পুনিয়া বলল।

ত্যাবড়া বলল, 'দেখছি। সালারা থেকুরে শকুন হয়ে আছে। এর আগেরটাও ওদের হাত ফসকেছিল। এটাও — '

'ভাড়া যাবে ?'

ত্যাবড়া বললে পুনিয়া যাত্রীর দিকে দেখল। ভোদকা মোটা, পাতলুন কোট পরা, হাতে ব্যাগ। জিজ্ঞেস করল 'কোথায় যাবেন ?

'বৌজাস্টি আপিস।'

'আট আনা।'

'চার আনা'।

পুনিয়া গণেশকে দেখিয়ে বলল, 'ওই রিকশায় যান।

লোকটা একটু অবাক হয়ে গণেশের দিকে এগিয়ে গেল। কি দু একটা কথা হল। গণেশ চেঁচিয়ে খিস্তি করে উঠল 'সালা ইয়ে মজাকি হচ্ছে আমার সঙ্গে, অ্যা ? প্যাসেঞ্জার নিয়ে ইয়ারকি। খুপরি খুলে নেব।'

পুনিয়া ত্যাবড়ার দিকে চেয়ে ওর পাকানো শরীর কাঁপিয়ে নিঃশব্দে হাসতে লাগল। ত্যাবড়া বলল, 'পেছুতে লাগিস না, বুড়ো এমনিতেই বমকে আছে।'

গণেশের সঙ্গে লোকটার ভাড়ার রফা হয়ে গিয়েছে। যাত্রী তুলে নিয়ে যাবার আগেও সে দপদপে চোখে পুনিয়ার দিকে চেয়ে খেউড় করে গেল।

ত্যাবড়া বলল, 'দে, তোর টাকাটা ছাড়।'

পুনিয়া বলল, 'এখনই ?'

'হ্যাঁ, দে, মালপত্তর রেডি রাখি।

পুনিয়া টাকাটা বের করে দিতে গিয়ে দেরি করল। তার আগে বলল, 'আগে যেয়ে একবার দেখে আসব, মাল মজুত আছে, না হাপিস হয়ে গেল।'

ত্যাবড়া ধমকে উঠল, 'ধ্যাৎ সালা, বলছি টাকাটা দে। হাপিস হবে কেন ?'

পুনিয়া একটা টাকা দিল ত্যাবড়াকে।

ত্যাবড়া বলল, 'তুই থাক আমি আসছি।'

পুনিয়া তবু বলল, 'আমি একবার দেখে আসি না।'

'ফটকেরা টের পেয়ে যাবে।'

'বাজারের পেছনকার গলি ঘুরে যাব। বুঝতে পারবে না।'

ত্যাবড়া একটু ভেবে বলল, 'যা তবে।'

পুনিয়া চলে গেল। ত্যাবড়া দাঁড়িয়ে রইল। আড়চোখে ফটককে দেখল। তারপরেই হঠাৎ মেয়ে গলার খলখলে হাসি শুনে পিছন ফিরে তাকাল। রিকশা-সারির পিছনে দেখল দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে জগা ঠ্যাঙ ছড়িয়ে বসে আছে। পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে মেয়েটার দিকে চেয়ে হাসছে। ত্যাবড়ার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। মেয়েটাকে দেখলে ওর গা জ্বালা করে। বছর দুই তিন আগে কোথা থেকে ছুঁড়ি এল। তখন গায়ে গতরে একফোঁটা মাংস নেই। গায়ে একটা বুকখোলা ফ্রক, তলায় একটা ইজের। আর এখন দেখ একটা ধুমসী মাগী হয়ে উঠেছে। ভিক্ষের বহর বজায় রেখেছে, কিন্তু জগাদের একটা গ্রুপের সঙ্গে মেয়েটার কারবারের কথা জানতে কারোর বাকি নেই। রাত্রের অন্ধকারে আনাচে কানাচে আরো উটকো প্যাসেঞ্জার কি না আছে।

ইস্টিশনের সেপাইরাও নিশ্চয় ছেড়ে কথা কয় না। মেয়েটার নাম, কে জানে সত্যি না মিথ্যে, যমুনা। দুই ঠ্যাঙের ফাঁকের মাঝখানে কাপড় উঁচু করে তুলে ধরে যেভাবে খলখলিয়ে হাসছে মনে হয় যেন এখনই একটা কাণ্ড করবে। অনেকেই এখন ওদের দিকে তাকিয়ে আছে। পথ চলতি ভদ্দরলোকেরাও ছেড়ে দিচ্ছে না। মেয়েমানুষ এর নাম।

'খচড়ি।' ত্যাবড়া মনে মনে বলল। কিন্তু যাই হোক গিয়ে, ওর কিছু যায় আসে না। জগা এখন বসে বসে মজা মারছে কেন। বলেছিল, শরীর খারাপ, জ্বর হয়েছে, আজ এ বেলা গাড়ি চালাতে পারব না। ও দলের লোক, এক টাকা ওর দেবার কথা। খাটতে না পারলে কথা ছিল না। যমুনার আঁচে বসে গা গরম করবে, আর দু চারটে টিরিপ মারতে পারে না। ও জগার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। যমুনা বলল, 'এই যে ত্যাওড়া দাদা।'

ত্যাবড়া খিস্তি করে, তাকে অন্য ভাবে উচ্চারণ করল, তারপর বলল, 'ত্যাওড়া তোর বাপের নাম।'

যমুনা খলখলিয়ে আগের মতই হাসতে লাগল। জগা বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ত্যাওড়া আমার শ্বশুরের নাম। খবর কি ওস্তাদ, ফট্ না খাবি?'

ত্যাবড়া বলল, 'সে যাই হোক গে, একটা টাকা ছাড়, মজাকি করলে হবে না।'

জগা নরম স্বরে বলল, 'নেই মাইরি, বিশ্বাস কর।'

'তবে খাটতে যাও না। কাল রাত্রে তো সালা বেশি মাল খেয়ে, সকালে পড়ে আছ। জ্বর না হাতি।'

জগা বলল, 'যাব যাব, বেলা দুটো থেকে গাড়ি চালাব।'

যমুনা জিজ্ঞেস করল, 'কিসের টাকা ?'

জগা বলল, 'সে খোঁজে তোর দরকার কি। টাকা আছে ? দিবি ?'

যমুনা নাচবে কি না কে জানে, একটু একটু কোমর দুলিয়ে, ভুরু কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চোখ ঘুরিয়ে বলল, 'দিতে পারি, সুদ কত দেবে ?'

জগা যমুনার সারা গায়ে চোখ বুলিয়ে বলল, 'যত চাস।'

যমুনা ঠোঁট উলটে বলল, 'মুরোদ দেখবখনি ! টাকা একটা দিচ্ছি। কিন্তু তোমাদের মতলব কি বল তো ?'

বলতে বলতে যমুনা, কোমরের কষি ঢিলে করে, ভিতরে হাত ঢোকাল। ত্যাবড়া আর জগা চোখাচোখি করল। ত্যাবড়ার চোখে সাবধানের ইশারা। বলল, 'খুব হুঁশিয়ার। গণেশ সালা একটা কিছু আন্‌জাদ করেছে। ফট্‌কেকে ইস্টিশনে পাঁতি পাঁতি করে খুঁজতে পাঠিয়েছিল। আমাদের ওপর ওদের নজর আছে।'

যমুনা ছোট একটা গেঁজে থেকে, ছোট করে পাকানো এক টাকার নোট জগার কোলের ওপর ছুঁড়ে দিল। বলল, 'তোমাদের মতলব তো ? পরে ঠিক জানতে পারব।'

জগা বলল, 'সে টাইম হলে দেখা যাবে।'

ত্যাবড়া জগার কোল থেকে টাকাটা কুড়িয়ে নিতে নিতে খ্যাঁক করে উঠল, 'না, মেয়ে-মানুষের ও-সবে দরকার নেই। এসব তোদের রাত্রের কারবার না।'

যমুনা শরীর দুলিয়ে হি হি করে হাসল. বলল, 'কারবার করলে আর এ-সব বলতে না ত্যাওড়া দাদা।'

ত্যাবড়া হাত তুলে খেঁকিয়ে উঠল. 'ভাগ বলছি।'

যমুনা হাসতে হাসতে দৌড় দি । যাবার আগে বলে গেল, 'জগা, আমার টাকা যেন ফাঁকি না যায়। তাহলে তোমাকে চিবিয়ে খাব।'

যমুনার দৌড়ে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সারে সারে রিক্‌শাগুলো থেকে আওয়াজ উঠল, 'উই উই উই।'…'ধর ধর ধর।'…'খা খা খা' এবং অনেক গলার হাসি।

'…অতএব বন্ধুগণ, স্থানীয় জনসাধারণের কাছে আমাদের আবেদন, এই সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য…'

ত্যাবড়া চারদিকে একবার দেখে নিয়ে জগাকে বলল, 'শোন, আমি জিনিসপত্তর সব নিয়ে আসি। পুনিয়া কাট পুলের ওখানে গেছে। ফিরে এসে যেন চেঁচামেচি না করে, সালাকে বিশ্বাস নেই। গাড়ি রইল।'

জগা বলল, 'যা ওস্তাদ যা, আমি সব দেখছি।'

দেওয়ালের ধারে নর্দমা, নর্দমার ধারে পাতা চটের থলের ওপর, জগা এলিয়ে পড়ল দেওয়ালে হেলে। ওর ঢুলু ঢুলু চোখে খুশির চকচকানি।

বলল, 'যাক, অনেক দিন বাদে—'

ত্যাবড়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে চোখের কোণে এদিক ওদিক দেখে বাজারের রাস্তায় চলে গেল। ঠোঁট নেড়ে, বিড়বিড় করে, আঙুলের কড় গুণে কি হিসাব করল। তারপর রাস্তার ধারেই একটা ছোট কাপড়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। আবার কি ভাবল। ভেবে, মাথা নাড়ল। মিটারের হিসাবে, দু মিটার সাদা কাপড় চাইল।

দোকানদার জিজ্ঞেস করল, 'কোরা না ধোলাই ?'

'কোরা। সব থেকে সস্তাটা দিন বাবু।' কাপড়ের প্যাকেট নিয়ে, মুদি দোকানে গেল। সব থেকে সস্তা ধূপকাঠি কিনল এক বাক্স। তারপরে গেল ফুলের দোকানে। গাদা ফুলের দিন চলে গিয়েছে, মালার বাহার নেই। যে-সব মালা দেখে চোখ টানে, সে-সব পড়তায় আসবে না। এমনি বাজে ফুলের দাম শুনে, ত্যাবড়ার মনে হল, ফুল না, সব আগুনের ফুলকি। দাম শুনলে ছ্যাঁকা লাগে। তবু পাচ-পাপড়ি টগরের একটা মালা কিনতে হল পনেরো পয়সা দিয়ে। পাঁচ পয়সা দিয়ে একটা জবাও তার সঙ্গে গেঁথে নিল। মনে মনে বলল 'যাক গে সালা, আফসোস রেখে লাভ কি।'

ফুলওয়ালা মালাগাছি কাগজে মুড়তে মুড়তে, এতক্ষণে যেন ত্যাবড়াকে চিনতে পারল। জিজ্ঞেস করল. 'মালা দিয়ে কি হবে ?

ত্যাবড়া বলল. 'হবে।

দোকানদার হেসে জিজ্ঞেস করল, 'বিয়ে করতে যাবি নাকি ?'

ত্যাবড়া পয়সা দিয়ে, মালা নিয়ে বলল, 'জম্‌মো দিতে যাব।'

সব জোগাড় করে ত্যাবড়া যখন ইস্টিশনের কাছে এসে দাড়াল, দেখল পুনিয়া হাত পা নেড়ে জগাকে যেন কি বলছে। জগার সঙ্গে ত্যাবড়ার চোখাচোখি হতেই জগা একটা ইশারা করল। পুনিয়া দৌড়ে এল ত্যাবড়ার কাছে। ওর চোখে মুখে উত্তেজনা। ত্যাবড়ার কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'ফিনিস্‌।'

ত্যাবড়া সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রের সেনাপতির মত খাড়া হয়ে উঠল। যেন একটা কি ঘটে গেল। দৌড়ে জগার কাছে গিয়ে প্যাকেটগুলো সব দিয়ে দিল। ফিরে, দৌড়ে ওর রিকশার সীটে লাফ দিয়ে উঠে বসল। চিৎকার করে হুকুম করল, 'পুনিয়া, গাড়িতে ওঠ্‌।'

গণেশও এবার চিৎকার করে উঠল, 'ফট্‌কে. জল্‌দি। আমার গাড়িতে উঠে বস।' ত্যাবড়া ততক্ষণে রিকশা চালাতে আরম্ভ করেছে। পুনিয়া লাফ দিয়ে উঠে বসল। বলল, 'মনা জোড়া তালাওয়ের প্যাসেঞ্জার ছেড়ে আসছিল। ওকে পুলের ওখানে যেতে বলেছি '

ত্যাবড়া বলে উঠল. 'ফাস্‌কেলাস। সালা এ না হলে বুদ্ধি। দ্যাখ্‌তো গণেশ সালা আসছে নাকি ?'

পুনিয়া পিছন ফিরে দেখল, গণেশ ফট্‌কেকে রিক্‌শায় চাপিয়ে নিয়ে চালিয়ে আসছে। বলল, 'আসছে।'

ত্যাবড়া বলল, 'সালাকে এবার একদিন এ্যায়সা ঝাড়ব, বাপের নাম ভুলিয়ে দেব মাইরি। ও কি ভেবেছে, বেওয়ারিশ মাল, ছিনিয়ে নেবে?'

পুনিয়া বলল, 'আসতে দে না, চেয়ে দেখুক আর জ্বলে মরুক।'

কাট পুলের সিঁড়ির কাছে, রাস্তার ধারে, মনার গাড়িটা দেখা গেল। তার পিছনে ত্যাবড়া ব্রেক কষল। পুনিয়া লাফিয়ে নেমে সিঁড়ির পাশ দিয়ে রেল লাইনের দিকে গেল। ত্যাবড়াও গেল। লাইনের কাছাকাছি একরাশ বুনো ঝাড়ে বুনো কুল। পাশেই কয়েকটা খাড়া বাঁকা বুড়ো কাঁটামনসা। তার পাশে খানিকটা খোলামেলা জায়গা। সেই জায়গায়, একটা লোক শোওয়া। কাছে পাশে মনা দাঁড়িয়ে।

ত্যাবড়া আসতেই মনা প্রায় চমকে উঠে বলল, 'এসেছিস? ওই দ্যাখ মাইরি, আর উইদিকেও দ্যাখ। আমি ভয় পাচ্ছিলাম।'

দেখা গেল রেললাইনের ওধারে দুটো শকুন এসে বসেছে। মাথার ওপরে, বেশ নিচের দিকেই, মাটিতে ছায়া ফেলে কয়েকটা উড়ে বেড়াচ্ছে। লক্ষ্য, শোওয়া শরীরটার ওপরে। মরা শরীর।

এই সময়ে, ওদের পিছনে, গণেশের গলা শোনা গেল, 'দ্যাখ ফট্‌কে, বলেছিলাম কি না, জরুর কোন মতলব আছে ওদের।'

ত্যাবড়া মনা আর পুনিয়ার দিকে একবার তাকাল। তারপরে মনার দিকে ফিরে বলল, 'আরে তুই আমাকে ও-সব কি দেখাচ্ছিস। আসল শকুন দুটো তো আমাদের পেছনে।

পুনিয়া খ্যাক খ্যাক করে হেসে উঠল। পিছন ফিরে তাকাল। মনাও দেখল। গণেশ আর ফট্‌কে, মরা শরীরটার দিকে চেয়ে রয়েছে, গণেশের চোখ দুটো দপদপ করছে। মার খেয়ে, রাগ হলে যেমন হয়, সেই রকম ওর মুখের ভাব। বাঁশচেরা গলায় বলল, 'শকুন কারা দেখাই যাচ্ছে। আমরা মড়া খুঁজে ফিরি না। চলে আয় ফট্‌কে।'

মনা আর পুনিয়া হ্যা হ্যা করে হেসে উঠল। মনা বলে উঠল, 'সালা, ইমলি ইমলি, থুঃ।'

'আচ্ছা রে সালা, এর পরে আমরাও দেখে নেব, কোথা থেকে—'

গণেশের কথা শেষ হবার আগেই মনা বলে উঠল, 'যা, হাসপাতাল থেকে মড়া নিয়ে আসবি।'

এবার ত্যাবড়া সুদ্ধ হেসে ফেলল। গণেশরা রাস্তার দিকে চলে গেল। ওরা তিনজনেই মরা মানুষটার আরো কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল। কালো, রোগা একটি বুড়ো। মুখে কোন বিকার নেই। বয়স হয়ে গেলে, মানুষ যেমন ঘুমোয়, চোখ বুজে,

মুখটা একটু হাঁ করে, তেমনি দেখাচ্ছে। মুখের ভিতর জিভটা দেখা যাচ্ছে। মুখে কিছু পাঁশুটে গোঁফ দাড়ি। মাথার পাতলা চুলও সেই রকম। এই বয়সে আর এ অবস্থায়, লোকের চুল দাড়ি আর তেমন গজায় না। তবে মরবার পরে যেন লোকটার মুখ বেশি চকচক করছে। নাকটা তো বটেই। গায়ে দু তিনটে ছেঁড়া-খোড়া জামা। হাঁটুর ওপর অবধি ময়লা ন্যাকড়া জড়ানো। চিত হয়ে, প্রায় সোজা শুয়ে আছে। বাঁ পা-টা একটু বেঁকে রয়েছে, পাতাটা কাত করা। মাথার কাছে একটা পুঁটুলি।

কাছে পিঠে লোকালয় তেমন নেই। রেললাইনের ওপারে, খোলা মাঠের ওপারে কয়েকটা খোলার ঘর। এপারে, বড় রাস্তার দিকে মুখ করা বাড়িগুলোর পিছন দিক। রেললাইনের দিকে কেউ আসে না।

ত্যাবড়া বলল, 'লোকটা মনে হয় ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মরে গেছে। এর আগেরটা যে রকম ছিল সে রকম না, চোখের পাতা খোলা, মুখটা রাক্ষসের মত হাঁ করা, যেন গিলতে আসছিল।'

পুনিয়া বলে উঠল, 'মাইরি।'

ওরা তিনজনে আবার মরা মানুষটাকে দেখতে লাগল। ত্যাবড়া ঝোপের নিচে, কাঁটামনসার গোড়ার কাছে পরিষ্কার জায়গাটার দিকে তাকাল। বলল 'লোকটা ওখানে থাকত। আমি পরশু একদিন মার্ক করেছিলাম, পুলের ওপর থেকে। তখনই ঠিক করে রেখেছিলাম।'

মনা বলল, 'তবে একটাই বাঁচোয়া, লোকটার গায়ে ঘা পাঁচড়া পুঁজ রক্ত নেই।'

পুনিয়া বলল, 'আর হেগে মুতে মাখামাখিও করে রাখে নি।'

ত্যাবড়া বলল, 'লোকটা বোধ হয় কিছু পুণ্যি করেছিল।'

মনা বলল, 'আমাদেরও পুণ্যি বল্।'

ত্যাবড়া ঘাড় ঝাঁকাল। মরা মুখের দিকে চোখ রেখে বলল, 'লোকটা ভাল মানুষ ছিল মনে হয়, না?'

পুনিয়া বলে উঠল, 'হ্যাঁ, আমারও তাই মনে হচ্ছিল। কোথা থেকে এসেছিল লোকটা?'

ত্যাবড়া বলল, 'মানুষ আবার কোথা থেকে আসে। সবাই যেখান থেকে আসে, সেখানে থেকেই এসেছে।'

পুনিয়া অবাক হয়ে মনার দিকে তাকাল। মনা বলল, 'বাঃ, তা বলে একটা জায়গা, ঘরবাড়ি—'

ত্যাবড়া ভুরু তুলে, ঠোঁট বেঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোথায় থাকিস, তোর বাড়ি-ঘর কোথায়?'

মনা বোকার মত শব্দ করল, 'অ্যাঁ?'

'বল্ না।'

মনা বলল, 'আমি তো ইস্টিশনের এক দিকে—'

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'অই রকম, সব অই রকম। এক জায়গা থেকে এলেই হল। তুই মরে যাবার পরে যখন কেউ খোঁজ নেবে—'

মনা খেঁকিয়ে উঠল, 'খচ্চর সালা, তোর খোঁজ নেবে লোকে।'

ত্যাবড়া শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হেসে উঠল। বলল, 'নে, বুড়োর হাঁ মুখটা বুজিয়ে দে তো।'

কিন্তু মনার কানে কথাটা সেই মুহূর্তে গেল বলে মনে হল না। মরা মুখটার দিকে চেয়ে, ও কেমন যেন আনমনা। এ সময়ে শেষ মাঘের দক্ষিণা বাতাস বইছিল। হঠাৎ একটা ছোট ঝাপটা মত এল, ধুলো আর পাতা উড়ে, একটা ঘূর্ণীর মত হল। দুটো ছায়া, মরা শরীরের ওপর দিয়ে সাঁ করে চলে গেল। তিনজনেই দেখল, কয়েকটা শকুন, উড়তে উড়তে আরো নিচে নেমে এসেছে। ওপারে লাইনের ধারে, আরো দুটো নেমে বসেছে।

ত্যাবড়া নিচু হয়ে, মরা মানুষটির হাঁ মুখ বন্ধ করে দিল। কিন্তু পুরো বন্ধ হল না। আস্তে আস্তে খুলে, অল্প একটু ফাঁক হয়ে রইল। ওইটুকু আর বন্ধ করার চেষ্টা না করে ত্যাবড়া পুঁটুলিটা খুলল। একটু আধটু ছেঁড়া থাকলেও, প্রায় ফরসা একটা জামা। একটা চশমা, একদিকে কাচ নেই। একটা চিরুনি। কয়েক মুঠো শুকনো মুড়ি একটা ঠোঙায় দলা পাকানো। কিছু শুকিয়ে যাওয়া ফুল বেলপাতা। ছোট রুদ্রাক্ষের মালা। পুঁটুলিতে আর কিছু নেই।

তিনজনেই মুখ চাওয়াচায়ি করল। ত্যাবড়া মরা মানুষটির কোমরের কাছ থেকে জামা তুলে. হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখল। ছেঁড়া-খোড়া জামার বুকের কাছে, পিঠের নিচে, সব জায়গায় হাতড়াল। ঠোঁট উল্টে বলল, 'সালা, একটা ঘষা লোহাও নেই।

মনা বলল, 'এ রকম হয় না। ইস্টিশনের কাছে সেই যে পাগলিটা পচে গলে মরেছিল, তার পুঁটুলিতেও কিছু পয়সা ছিল।'

পুনিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময়ে পিছন থেকে মোটা আর ভরাট গলা শোনা গেল, 'কে রে তোরা, কি করছিস?'

ওরা তিনজনেই ফিরে দেখল। চিনতে পারল, বড় রাস্তার ধারে বাবুর বাড়ি। ত্যাবড়া বলল, 'দেখুন না বাবু, বুড়ো মরে গেছে ভাবছি পুড়িয়ে দেব।'

ভদ্রলোক মৃতদেহ দেখলেন। নাকে কাপড় চাপা দিলেন। চোখে খুশির ভাব ফুটে উঠল। ঘাড় নেড়ে বললেন, 'খুব ভাল, খুব ভাল। তোদের চেনাশোনা ছিল বুঝি?'

ত্যাবড়া বলল, 'না না, কে কার চেনাশোনা। দেখলাম মরে পড়ে আছে, আপনাদের ঘর-দোরের সামনে, ভাবলাম দিই গে পুড়িয়ে।'

ভদ্রলোক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'বাহ্‌বা, বাহ্‌বা, এই তো চাই, এই তো—'

ত্যাবড়া ফিসফিসিয়ে বলল. 'সালা দায়ে পড়ে বলছে।' গলা তুলে বলল, 'কিছু সাহায্য করুন বাবু। খরচ-টরচ আছে তো।'

ভদ্রলোক ভাবতে পারেন নি, কথা কত দিকে গড়াতে পারে। বললেন, 'অ্যাঁ। তারপরে ঘাড় নেড়ে বললেন. 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বটে, তা বটে।'

পকেট থেকে গোটা একটি টাকার নোট তুলে ধরলেন। মনা এগিয়ে হাত বাড়িয়ে নিল। ভদ্রলোক যেন পালক ঝাড়া দিয়ে চলে যেতে যেতে বললেন, 'তা হলে নিয়ে যাস বাবা।'

ত্যাবড়া শ্লেষ্মা জড়ানো গলায় হাসল। বলল 'সালা বাঁশ কেন ঝাড়ে··· খবরদারি করতে এসে একটা টাকা দণ্ড, বউনিটা ভাল, কি বলিস ?'

পানিয়া বলল 'মাইরি মাইরি।'

'লে ধর, তুলে নিয়ে যাই। দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে আর দেরি করব না।'

ত্যাবড়া ধরল দুটো হাত। মনা ধরল দুটো পা। চ্যাংদোলা করে তুলে ধরতে, মাথাটা পড়ল ঝুলে। ত্যাবড়া পানিয়াকে হুকুম করল 'পুঁটুলিটা নে আর এক হাতে মাথাটা তুলে ধর।

পানিয়া হুকুম পালন করল। তিনজনে মিলে, মরা শরীর নিয়ে রাস্তায় এসে উঠল। ত্যাবড়া মনার রিকশার ওপরে তুলতে যেতে মনা খেঁকিয়ে বলল, 'না, তোর গাড়িতে নে।

ত্যাবড়া মড়াটাকে ঝাঁকানি দিয়ে বলল, 'আবে ধ্যাৎ তোল না।'

ও মনার রিকশায় অর্ধেকটা শরীর তুলে দিল। দিয়ে, আরো খানিকটা টেনে সীটের গায়ে ঠেকনো দিল।

মনার চোখ দপদাপিয়ে উঠল। 'সালা, নিজের বেলায় আঁটিসুটি—'

ত্যাবড়া বলল. লে লে, হাঁটু দুটো একটু ভেঙে তুলে দে। আরে বাবা একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিলেই হবে।

'সে তো তোর গাড়িতেও দেওয়া যেত।'

ত্যাবড়া সে কথার কোন জবাব না দিয়ে. মড়ার পা দুটোকে একটু ভেঙে, যতটা সম্ভব রিকশার পা রাখবার জায়গায় তুলে দিল। আবার ছায়া উড়ে গেল মরা শরীরের ওপর দিয়ে। তিনজনেই আকাশের দিকে তাকাল। শকুনগুলো এখনো উড়ছে। পানিয়া কাঁচকলা দেখিয়ে বলল. 'এই প্যাঁচ।'

ত্যাবড়া মরা লোকটির দিকে তাকিয়ে ছিল। ও যেন হঠাৎ খুব অবাক হয়েছে, চোখের পলক পড়ছে না। মনা বিরক্ত হয়ে বলল 'কি হল কি ? যেন বাপের মুখ দেখছিস সালা।'

ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'আমার বাপ ? এ রকম ভাল মানুষ হতে হলে আমার বাপকে আবার জন্মাতে হবে। সে সালার কথা ছেড়ে দে, কিন্তু মাইরি

আমি এই লোকটার কথা ভাবছি। এ নিৎঘাত খুব পুণ্যি করেছে, চেহারা দেখেছিস। তাই তো বলি।'

বলে ঘাড় নাড়তে লাগল। মনা পুনিয়া চোখাচোখি করল। ত্যাবড়া ওদের দিকে চেয়ে বলল, 'ভেবে দ্যাখ, মাসের এখন পয়লা হপ্তা যাচ্ছে, অ্যাঁ? কাল চটকলে হপ্তা হয়ে গেছে, কেমন? আর আজ শনিবার—শনিবারের দুপুরে লোকটা মরল। উরে শালা, কপাল কাকে বলে। এ নিশ্চয় কোন সাধক টাধক হবে। এর আগের দুটোর একটাও এ রকম হয় নি।'

মনা পুনিয়াও এবার অবাক হয়। মনা বলল, 'ঠিক বলেছিস তো।'

ত্যাবড়া আদরের ভঙ্গিতে, চুমকুড়ির শব্দ করে, মৃতের মরা চিবুকে হাত বুলিয়ে দিল। বলল, 'বাবা, বরাবর যেন তোমার মত পাই।'

বলে ত্যাবড়া সীটের ওপর উঠে বসতে বসতে পুনিয়াকে বলল, 'তুই আমার গাড়িটা চালিয়ে চল্। পুঁটুলিটা বুড়োর কোলে রেখে দে।'

এ সময়ে মনা গাড়িতে উঠতে গিয়ে টের পেল, তিনটে চাকার হাওয়া নেই। ও চিৎকার করে উঠল, 'এ সাল নিগ্ঘাত গণশা আর ফট্‌কের কাণ্ড।'

ত্যাবড়া বলল, 'যা ছাড়া। কিন্তু আগে চল্, গাড়ি হাঁটিয়ে নিয়ে চলে যাই, দু মিনিট লাগবে। ওরা স্বীকার যাবে না, তুই সবাইকে শুনিয়ে, আচ্ছা করে খিস্তি দিবি।'

দেবে না, দেওয়া শুরু হয়ে গেল।

॥ ২ ॥

ওরা যখন মড়া নিয়ে ইস্টিশনে এল, সোতে আর জগা বাকী ব্যবস্থা করে রেখেছে। বাকী ব্যবস্থা আর কি, নতুন কোরা কাপড়টা দু-ফালি করে কেটে রেখেছে। ওরা আসতেই, সোতে ইস্টিশনের রোয়াকে ওঠবার সিঁড়ির এক ধারে এক টুকরো কাপড় পেতে দিল। ত্যাবড়া আগে পুঁটুলিটা খুলে রুদ্রাক্ষের মালাটা বুড়োর গলায় পরিয়ে দিল। পুঁটুলিটা রাখল শিয়রের দিকে, বালিশের মত করে। তারপরে সবাই মিলে যখন মরা মানুষটাকে শুইয়ে দিল, চারপাশে তখন লোকের ভিড়।

সোতে বলে উঠল, 'ভিড় হটাও ভাই, ভিড় হটাও, মড়া কথা বলে না।'

জগা ওর জায়গায় বসেই ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিল। ত্যাবড়া আর এক টুকরো নতুন কাপড় দিয়ে বুড়োর শরীর বুক অবধি ঢেকে দিল। পাঁচ-পাপড়ির টগরের মালাটা বুকের ওপর ছড়িয়ে দিল। শুকনো জবাফুলটা একদলা বাসি রক্তের মত দেখাচ্ছে। মনা তৎক্ষণে চিৎকার করে খিস্তি শুরু করে দিয়েছে। যে ও ' চাকার হাওয়া খুলেছে, তার মা বোন কারোর বিষয়েই,

ওর কোন বাছ বিচার নেই, এই কথাটাই, রাগে আর অনেক কথায় বলে চলেছে। আশেপাশের দোকানদারেরা ব্যাপার দেখে হাসাহাসি রাগারাগি করছে। 'শালারা যমের অরুচি।' 'এদের কি মশাই ধর্মজ্ঞান নেই?' 'দেশটা রসাতলে গেল।' 'কি রকম মজার ব্যবসা দেখেছেন।' 'আজ শালাদের ফলার হবে।' কিন্তু পথচারীরা বা রেলের যাত্রীরা, রাস্তার ধারের দোকানদার না। তাদের কাছে, সব মিলিয়ে এটা একটা নিখুঁত দৃশ্য। একটি মৃতদেহ, নতুন কাপড়ে ঢাকা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, বুকে ফুল, ধূপকাঠি জ্বলছে।

পুনিয়া বলে উঠল, 'মড়া পোড়ানোর জন্যে কিছু দিয়ে যাবেন দাদারা।'

সোতে ধমক দিয়ে উঠল, 'চুপ কর সালা। সুসমরদা কি বলে দিয়েছিল মনে নেই? "সৎকারের জন্য কিছু সাহায্য করুন দাদা" এ কথা বলতে হবে।'

ত্যাবড়া পুনিয়াকে খিঁচিয়ে বলল, 'তা না সালা, মড়া পোড়ানোর জন্য বলছে।'

মনা তখনো চাকার হাওয়া খুলে দেওয়ার রাগ সামলাতে পারে নি। নাগাড়ে খিস্তি করে যাচ্ছিল। গণেশ ফটকেরা প্রথম প্রথম হাসছিল। খিস্তিগুলো শুনতে শুনতে ক্রমে ওদের মুখ শক্ত হয়ে উঠছিল। মনা তা-ই চাইছিল। এই সময়ে ত্যাবড়া ধমকে বলল, 'এই মনা, এবার থাম. কুত্তাদের কামড়াতে যাস নে। সালারা কি জ্বালায় জ্বলছে, জানিস না? যা. চাকায় হাওয়া দিয়ে নিয়ে আয়।'

ইতিমধ্যে জগাও চটের থলি ছেড়ে উঠে এল। ত্যাবড়া একটা টাকা আর কিছু খুচরো পয়সা মড়ার বুকের ওপরে রাখল। তাছাড়া পাঁচ দশ কুড়ির মুদ্রা দু চারটে পড়তে আরম্ভ করেছে। এই সময়ে সেপাই এসে দাঁড়াল। মড়ার দিকে তাকাল না, ত্যাবড়াদের দিকে নজর। বলল, 'কি হচ্ছে এ সব?'

জগা বলল, 'ওই হচ্ছে, মড়ার ওপরে তো কথা নেই।'

সেপাই ভুরু কোঁচকাল, চোখ ছোট করল। বলল, 'খুব বেড়েছিস। যা খুশি তাই? মড়া পোড়াবার নামে টাকা তুলে মদ মাগীবাজী আর মাংস—?'

সোতে ওর কালো ঠোঁটের ফাঁকে সমস্ত শাদা দাঁতগুলো দেখিয়ে বলল, 'ওটি বলবেন না সেপাই দাদা। নাম করে না, যা করি পুড়িয়ে করি।'

গণেশ কখন এসে দাঁড়িয়েছিল কারোর খেয়াল হয় নি। সে বলে উঠল, 'মিছে কথা বাবু, সালারা মিছে কথা বলছে।'

ওরা শক্ত মুখে ঝটিতি ফিরতে সেপাই নিজেই হাতের ডাণ্ডা তুলে খেঁকিয়ে উঠল, 'সালা, তোকে মোড়লি মারতে কে বলেছে। তুই যখন এর আগে…'

পিঠে এক ঘা পড়ার আগেই, গণেশ হাত তুলে চাটুকারের মত হাসল। হাসতে হাসতে দৌড়ে চলে গেল।

ত্যাবড়া সেপাইকে বলল, 'যান না, যান না, নিজের কাজ করুনগে দাদা, দেবতার পুজো হবে।'

সেপাইটা একগাল হাসল। জগার দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'একটা সিগারেট দে।'

সোতে একটা সিগারেট দিল। সেপাই অন্যদিকে গেল। তিনজনেই মুখ বিকৃত করে বলল, 'সালা মড়া দেখলেই সব্বার নোলায় জল।'

ঠিক এ সময়েই শোনা গেল 'হুঁ হুঁ হুঁ, হে হেঁ হেঁ, কি রে ত্যাবরা, র‍্যালের জায়গায় হালায় মরা শোয়াইছিস ?'

দেখা গেল, মড়ার মাথার কাছে, রোয়াকের ওপরে জি আর পি-র সেপাই দাঁড়িয়ে। মুখের হাসিতে রোখপাক নেই বরং বেশ অমায়িক। সোতে বলে উঠল, 'আবার এক সালা।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমরা নিমিত্ত দাদা, সব পাবালকের ব্যাপার। ফেলে দিন, পাবলিককে বলুন।'

সেপাই হ্যা হ্যা করে হেসে বলল, 'আইস্‌সা আইস্‌সা, আইজকাল পাবলিক দেখাইতে শিখছ হালায় তোমরা, অ্যা।'

জগা যেন বিরক্ত অথচ মেজাজের মাথায় জঘন্য এক রকম হাসি হেসে চোখ মারল, বলল, 'কেন দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন, অন্যদিকে যান না।'

সেপাই এবার হি হি করে হাসল। আশ্বস্ত হয়ে চলে যেতে যেতে অনেকটা আদরের স্বরে বলল, 'খুব পাজী হইছস তোরা।'

পুনিয়া রেগে উঠে বলল, 'সালা মড়াখেকো সব।'

ভর দুপুরে রাস্তাটা একটু ফাঁকা হয়ে আসে। এ সময়ে ট্রেন কম, যাত্রীর আনাগোনা তেমন নেই। রিকশাচালকেরা কেউ কেউ খেতে গিয়েছে, যাচ্ছেও। মাঘের শেষের দুপুরটা অকালের উত্তাপে ঝাঁঝালো। রোদে বেশ তেজ। থেকে থেকে দক্ষিণা বাতাস দিচ্ছে। এ সময়েই মাছি ওড়ে, ভ্যান ভ্যান করে, আর দুর্গন্ধ ছড়ায় সবখান থেকে। খোলা নর্দমাগুলো থেকে, আর প্রস্রাবের গন্ধ যেখানে সেখানে। বাতাসে গন্ধ ছড়ায়, ধুলো ওড়ে, আর কুকুরগুলো বাতাসে নাক তুলে শুঁকতে শুঁকতে যেন কোন মড়ার খবর পায়। শোকে মড়াকান্না জুড়ে দেয়।

ত্যাবড়া সোতে জগা আর পুনিয়া, মরা শরীরটার কাছাকাছি দাঁড়িয়ে। মনা গিয়েছে চাকায় হাওয়া ভরতে। খাওয়ার কথা ওদের মনে নেই। ভাড়া খাটবার চিন্তাও মাথায় নেই। একটা মরা মানুষের শরীর ওদের চোখে মুখে নতুন ঝলক এনে দিয়েছে। থেকে থেকে ওদের চোখ পড়ছে মরা শরীরটার দিকে। আর চারজনেই কি করবে এখন ঠিক করতে পারছে না। অথচ কেউ কারো দিকে তাকাচ্ছে না। কেউ দু পা হেঁটে চলে যাচ্ছে। রিকশা হাতড়াচ্ছে, না হয় তো হর্নটাই টিপে দিচ্ছে। পুনিয়া একবার বলেই উঠল, 'আজ সালা—'

কথা শেষ হল না। বাকী তিনজনে ওর দিকে ফিরে তাকাল। পুনিয়া ঝোল টানার শব্দ করল। সোতের আবার ডান হাতে ঘড়ি। সেই হাতটা

তুলে ও বলল, 'অনেক দিন শরীরের জাম ছাড়ে নি। আজ জাম ছাড়াতে হবে।'

জগা জিজ্ঞেস করল, 'ক বোতল টানবি ?'

'তা জানি না। যতক্ষণ হুঁশ থাকবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'খাওয়াব সালা। তারপরে, তিন দিন গাড়ি চালাতে পারবে না, তখন আমার কাছে খালি টাকার হিসাব চাইবে।'

'সে তো আগেই ভাগাভাগি হয়ে যাবে ওস্তাদ।'

'হলেও, সালা তোমাদের চিনি না ? পরে বলবে, ত্যাবড়া সালা বেশি মেরে দিয়েছে।'

এই সময়ে মনা চাকায় হাওয়া দিয়ে ফিরে এল। আর সোতের নজর খাড়া হয়ে উঠল। ইস্টিশনের রোয়াক থেকে নেমে এল সাজগোজ করা তিন যুবতী। সোতে এগিয়ে গিয়ে বলল, 'গাড়ি নিয়ে আসব দিদিমণি ?'

পুনিয়া চিৎকার করে বলল, 'আমি আনছি দিদিমণি।

দিদিমণিদের একজন সোতেকে বলল, 'তিনজনকে নিতে পারবে ?

সোতে বলল, 'চারজন হলেও পারব দিদিমণি। কোথায় যাবেন ?'

'রূবি সিনেমা।'

কোন জবাব না দিয়ে, সোতে রিকশাটা তিনজনের সামনে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে এক দিদিমণি প্রায় আঁতকে উঠে বলল, ও মা, এটা কী ?'

ত্যাবড়া বলল, 'মিতদেহ দিদিমণি।'

সোতে বলল, 'সুসৎকারের জন্য কিছু সুসাহায্য করে যান দিদিমণি।'

তিনজনেই খানিকটা সরে গেল। দুই দিদিমণি ব্যাগ খুলে পয়সা ফেলল। একজন বলল, 'মড়া দেখলে যাত্রা শুভ। তারপরে রিকশায় কে কার কোলে বসবে, তাই নিয়ে কথা আর হাসির মধ্যে, কোলে বসতে হল সব থেকে ছোট দিদিমণিকে, যার পরনে আঁট পায়জামা আর পাঞ্জাবি। রিকশা চালাবার আগে, সোতে একবার সঙ্গীদের দিকে আড়চোখে তাকাল। হাত তুলে নমস্কার করল মরা মানুষের দিকে চেয়ে। দৌড় দিল রিকশা নিয়ে। পিছন থেকে ত্যাবড়া বলল, দুপুরের খাওয়া মিটিয়ে আসিস।'

এই মুহূর্তে সবাই সোতের চলে যাওয়া রিকশার দিকেই তাকিয়েছিল। মনা বলল, 'সালার কপালটা সত্যি দিদিমণি ছাপা।

পুনিয়া বলল, 'তাও এই ভর দুপুরে। এখনো ম্যাটিনি শো-র কত দেরি।'

ত্যাবড়া বলল, 'কেন বল তো ?

'কেন ?' সবাই ওর দিকে তাকাল।

ত্যাবড়া আঙুল তুলে মরা মানুষটাকে দেখিয়ে বলল, 'এর জন্যে। মুখখানা দেখেছিস। সেই যাদের ফটো দেখে লোকে পুজো করে, সেই রকম দেখাচ্ছে, তাই না ?'

সবাই মরা মুখের দিকে তাকাল। সকলেই যেন অবাক, আবিষ্ট হয়ে কয়েক মুহূর্ত সেই মুখের দিকে চেয়ে রইল। কালো চোখ বোজা শান্ত লম্বাটে একটা মুখ। অল্প অল্প ধুসর গোঁফ দাড়ি। হাঁ মুখটা সামান্য একটু ফাঁক। গলায় রুদ্রাক্ষের মালা।

জগা বলে উঠল, 'সত্যি। লোকটার কি নাম ছিল কে জানে।'

ত্যাবড়া বলল, 'নাম ছিল জগার বাপ।'

জগা ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। মনা আর পুনিয়া হেসে উঠল। মনা বলল, 'ত্যাবড়ার বাপ।'

ত্যাবড়া বলল, 'মনার বাপ।'

জগা বলল, 'পুনিয়ার বাপটা আর বাদ যায় কেন?'

পুনিয়া বলল, 'তা হলে সোতের বাপও নাম হতে পারে।

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, আমাদের সকলের বাপ, বাপ চোদ্দপুরুষ। এখন সর তো এখান থেকে, একটু ফারাকে থাক। লোকজন যাবে, দেখবে, তবে তো পয়সা দেবে।'

পয়সা ইতিমধ্যেই কিছু পড়েছে। পড়ছেও। ওরা সবাই একটু সরে গেল। জগা বলল, 'তোর চোখ বটে ত্যাবড়া। পুলের ওপর থেকে দেখতে পেয়েছিলি?'

ত্যাবড়া বলল, 'দেখেই আমার কেমন খটকা লাগল। তখুখুনি নেমে কাছে গেলাম। যা ভেবেছি, সনসারের মায়া কাটাবার তালে আছে। তবে এমন জায়গা, যদি রাত্তিরে পটল তুলত তা হলে আর খুঁজে পাওয়া যেত না। শেয়াল কুকুরে খেয়ে ফেলত।'

মনা বলল, 'আর ভাব, কাল থেকে খাবি খেতে খেতে মরল আজ দুপুরে। শালা টাইম জ্ঞান দেখেছিস, রেলগাড়ির মতন।

'রেলগাড়ি?' বিটকেল মুখ করে জগা বলল, 'রেলগাড়ির মতন টাইমে মরলে আর দেখতে হত না। কোন্ গাড়িটা শালা টাইমে চলে রে?'

ত্যাবড়া বলল, 'যা বলেছিস। আমাদের বাবার টাইম অন্য জিনিস। মুখ দেখছিস না?'

আবার সবাই মরা মুখটার দিকে ফিরে তাকাল। খানিকক্ষণ পরে সেই দিকে চোখ রেখেই জগা বলল, 'এর আগেরটা প্রায় চার মাস হয়ে গেল, না?'

ত্যাবড়া বলল, 'তা হবে।'

'চার মাস পরে, আবার আজ!'

পুনিয়া গান গেয়ে উঠল, 'কঁহা গয়ে হো—'

ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'চুপ কর, গিলে আয় না; মনাও খেয়ে আয়। তোরা এলে আমি আর জগা খেতে যাব।'

পুনিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'চল্ দোস্ত।'

ও আর মনা চলে গেল। জগা তখনো মরা মুখের দিকে চেয়ে। ডাকল, 'ত্যাবড়া শোন।'

'কি।'

'আট আনা পয়সা দে তো, এ মুখটার ওপরে একবার ঝেঁকে আসি।'

ত্যাবড়া একটা খিস্তি করে বলল, 'এই দেব। খাটবার নাম নেই. তুমি এখন জুয়া মারতে যাবে।'

জগা বলল, 'দে না, দে, না। ওবেলা খাটব। এ মুখ আমি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি, তুই আট আনা দে, আধঘণ্টা বাদে তোকে ফেরত দেব।'

মুখের কথায় ত্যাবড়া একটু দুর্বল হল। তবু বলল, 'কেন. তোর সেই ছুঁড়ি কোথায় গেল ?'

'সে এখন কোথায় জোড় হয়ে বসে আছে কে জানে। তুই দে না।'

ত্যাবড়া প্যাণ্টের পাছার পকেট থেকে একটা আধুলি বের করে দিয়ে বলল, 'আধ ঘণ্টা বাদে ফেরত না দিলে কিন্তু দোস্তি থাকবে না বলে দিলাম।'

জগা কথা না বলে আধুলিটা নিয়ে ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর উঠে গেল। রোয়াকের শেষ প্রান্তে পান বিড়ি সিগারেটের গুমটি ঘরের পিছনে গেল। সেখানে তখন জমজমাটি আসর। সামনের দিক থেকে কিছুই দেখা যায় না। পুলিশের সঙ্গে ব্যবস্থা আছে। রিকশাচালকদের খেলার জায়গা এটা। এখন দুটো দলে খেলা হচ্ছে। একদল খেলা দেখছে। জগা দেখল, যমুনা একপাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। হীরা তার ঘাড়ের ওপর একটা পা তুলে দিয়ে খেলা দেখছে।

জগা মনে মনে বলল, 'তা-ই। না হলে এতক্ষণ যমুনার দেখা পাওয়া যেত। ও গিয়ে হীরার পাশে বসল।

এক পাত্র, দু পাত্র, তিন পাত্র। তারপরে মাতাল যেমন তার নিজস্ব মূর্তি পায়, ছোট মফস্বল শহরটা তেমনি পেতে আরম্ভ করে। বিশেষ করে ইস্টিশনের সামনে, শহরের এই সদর অংশে। যতই বেলা গড়িয়ে যায়, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে, ভিড় ততই বাড়তে আরম্ভ করে। ট্রেন মোটরবাসের যাত্রী ছাড়াও কলকারখানার ছুটির ভিড়। সন্ধ্যার ঝোঁকে পতাকা ফেস্টুন সহ মিছিলটা চলে যাবার পরে ভিড়টা নতুন করে বেড়ে উঠল। বাতিগুলোও জ্বলতে আরম্ভ করল।

সোতে ইতিমধ্যে দুটো দিদিমণি ট্রিপ দিয়েছে। পুনিয়া একটা ট্রিপ দিয়েছে। মনা যাত্রী পায় নি।

জগা ত্যাবড়াকে আট আনা পয়সা ফেরত দিয়ে আবার সেখানেই ফিরে গিয়েছে। ত্যাবড়ার নড়াচড়া নেই। ওর লক্ষ্য, মরা মানুষ। মরা মানুষ শোয়ানো, নতুন কাপড়ের আর মরা শরীরের দিকে। অজস্র পয়সা পড়েছে। ত্যাবড়া কয়েকবার কাপড় তুলে তুলে পয়সাগুলো এক জায়গায় জড়ো করে দিয়েছে। কিছু কিছু তুলে টাকার নোট করে নিয়েছে। চোখে দেখা

গুনতি যদি ঠিক থাকে, তবে প্রায় সত্তর টাকার মত উঠেছে। রাত্রি দশটার আগে মড়া গোটানো হবে না। শনিবারের বাজার, মাসের প্রথম সপ্তাহ। ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে মনে মনে বলল, 'বাবা, আজ তোমার দিন, আমাদেরও দিন।'

এ সময়েই ঘটনাটা ঘটল। গণেশের দল অনেকক্ষণ থেকেই অনেক রকম টীকাটিপ্পনি কাটছিল। এরা বিশেষ কিছু জবাব দেয় নি। এ বেলার দিকে প্রথম মনার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার জুটল, স্বামী-স্ত্রী। দুজনে উঠতে যাবে, গণেশ চেঁচিয়ে বলল, 'ও গাড়িতে উঠবেন না বাবু, ওই মড়াটা ওতে বই করেছে।'

স্বামী-স্ত্রী একবার মড়ার দিকে তাকিয়ে তৎক্ষণাৎ পিছিয়ে গেল। মনার গলায় একটা গর্জন শোনা গেল, 'তবে রে শুয়োরের বাচ্চা!'

তারপরেই ও একটা উড়ন তুবড়ির মত ঝাঁপ দিয়ে পড়ল গণেশের ওপর। গণেশকে নিয়ে একেবারে মাটির ওপরে আছাড়, আর একটি বিরাশি সিক্কা ওজনের ঘুষি বসালো চোয়ালে, 'শালা, সেই থেকে পেছুতে লেগে আছ, এখন প্যাসেঞ্জার ভাগাচ্ছ?'

গণেশও সমানে খিস্তি চালাচ্ছে আর ওঠবার চেষ্টা করছে। একটা দল হাত দেগে সবাইকে আগলে রাখছে আর চেঁচাচ্ছে, 'চালাও হারকিলিস্—এস্পার কি উস্পার।'

হাততালি আর কান-কাটানো শিস্ বাজল। গণেশ কায়দা করে মনাকে কাত করে পেটে একটা ঘুষি মারল। মনা গণেশের চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ঠুকে চেপে ধরল।

ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'মনাকে অসুরের শক্তি দাও বাবা।'

ঠিক এ সময়েই ফট্‌কে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। ও ঝাঁপিয়ে পড়ল গিয়ে মনার ঘাড়ের ওপর। দেখেই পুনিয়া গিয়ে পড়ল ফট্‌কের ওপর। জগারা গুমটির পেছন থেকে খেলা ছেড়ে এসে পড়ল। চারটে মানুষ দলা পাকিয়ে আছাড়িপিছাড়ি মারামারি করছে। হার জিত বোঝার উপায় নেই, আর ওদের ঘিরে এক দলের চিৎকার শিস্ হাসি।

জগা বলল, 'ত্যাবড়া, হুঁশিয়ার, তাল বুঝে সব এখানে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।'

ত্যাবড়া বলল, 'জানি, সে মতলবও কয়েকজনের আছে। এদিকে দঙ্গল এলেই গুটিয়ে ফেলব।'

তারপরেই রিক্‌শার ওপরে ঝপাঝপ লাঠি পেটাবার শব্দ শোনা গেল। চিৎকার শোনা গেল, 'হঠাও সালা, ভাগো হিঁয়াসে।'

সেপাই ছুটে এসে চারজনের ওপরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। লাঠি চালাল অন্ধের মত, বাছবিছার না করে। নিজেদের মারামারি এক রকম, রাগে আর জেদে সেটা চালিয়ে যাওয়া যায়। বাইরে থেকে লাঠি পড়লেই মুশকিল। প্রথমে দু দিকে ছিটকে গেল পুনিয়া আর ফট্‌কে। তারপরে মুখোমুখি দাঁড়াল গণেশ আর

মনা। দুজনেরই গাল কপাল ফোলা, ঠোঁটের কষে রক্ত। দুজনে দুটো মোষের মত রক্তচোখে দুজনের দিকে তাকিয়ে হাঁপাচ্ছে।

ত্যাবড়ার পাশে জগা বলল, 'গণেশটা খুব বাড়িয়ে তুলেছে।'

ত্যাবড়া বলল, 'জ্বালায়। এখন কিছু বলিস না। দেখিস, সোতেটা না ক্ষেপে যায়। তুই পুনিয়ার গাড়িতে প্যাসেঞ্জার নিয়ে এই তালে কেটে পড়।'

জগা তা-ই করল। পুনিয়ার গাড়িটা এগিয়ে নিয়ে এসে দুজনের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'চলুন বাবু, আপনাদের আমি পৌঁছে দিচ্ছি। ও সালারা ছোটলোক।'

ভদ্রলোক খুশি হয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ চল, সব ডাকাত আর গুণ্ডা।'

স্ত্রীকে নিয়ে ভদ্রলোক উঠে পড়লেন।

সেপাই প্রথমেই গণেশকে ধাক্কা মারল, 'যা শালা ভাগ, এই তল্লাটে থাকবি না।'

গণেশ বলল, 'আমি কি মিছে বলেছি, ওর গাড়িতে- '

সেপাই ওকে জোরে ধাক্কা মারল, 'চুপ, বাত নেই মাংতা, যা এখান থেকে।' বলেই পাশে ফটকেকে দেখে ওকেও ধাক্কা মারল। দুজনকেই ধাক্কাতে ধাক্কাতে দূরে নিয়ে গেল। ফিরে এসে মনাকেও ধাক্কা মারল, 'যা, সরে যা এখান থেকে।

মনা ঠোঁটের কষ থেকে রক্ত মুছতে মুছতে বলল, 'আপনি জানেন না সেপাইদা—'

'আমি জানতে চাই না। বড়বাবু দেখতে পেলে সব কটাকে হাজতে পুরবে।'

পুনিয়া আগেই সরে গিয়েছে, মনা ওর রিকশার গদিতে উঠে বসল। সোতে এসে ওর মুখের দিকে দেখল। বলল, 'মুখটা জল দিয়ে ধুয়ে আয়। কপালটায় লাগল কি করে?'

মনা কপালে হাত দিয়ে বলল, 'কি জানি, সেপাইটার লাঠি হবে বোধ হয়। একটু মাল টানতে হবে।'

সোতে বলল, 'হবে। আজ আর আমরা কেউ গাড়ি চালাব না। যা, মুখ ধুয়ে আয়।'

মনা ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। সোতে ত্যাবড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'কাল আমি গণশা সালাকে একবার দেখব।'

ত্যাবড়া বলল, 'ওর প্যাসেঞ্জার জগাকে দিয়ে পুনিয়ার গাড়িতে তুলে ভাগিয়ে দিয়েছি।'

সোতে হেসে বলল, 'ফাসকিলাস। তবে গণেশ সালাই বেশি প্যাঁদানি খেয়েছে। ঠোঁট কপাল দু জায়গায় ফেটে রক্ত বেরিয়ে গেছে। মাথার সামনের দিকে সব চুল তুলে নিয়েছে।'

'সালা।'

দুজনেই হাসতে লাগল। হাসতে হাসতে মনা মুখের দিকে তাকাল। মুখ

থেকে, কাপড়ে আর সারা শরীরে ছড়ানো পয়সাগুলোর দিকে। ত্যাবড়া বলল, 'সব এর জন্যে। মড়া হলেই হয় না, এ সালা মড়া দেখেছিস। এখনো মনে হচ্ছে বেঁচে থেকে ঘুমোচ্ছে। আমার মনে হয়, লোকটা বোধ হয় সব জানত।'

'কি ?'

'ওকে দিয়ে আমাদের একদিন হবে।'

'কি করে বুঝলি ?'

'মুখের দিকে চেয়ে দ্যাখ না।'

সোতে মরা মুখের দিকে আবার তাকাল। কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পরে ও হঠাৎ সরে গেল। বলল, 'দূর, ও সব কথা আমার ভাল লাগছে না। টাকা দে, একটা পাঁট নিয়ে আসি, মনা খাবে।'

ত্যাবড়া ঘাড় নেড়ে বলল, 'এখন যে যার পকেট থেকে নিয়ে আয়, পরে শোধ দেওয়া হবে।'

সোতে চলে যাচ্ছিল। ত্যাবড়া ডাকল, 'শোন, কমলা কেবিনের ব্যাচাদাকে বলবি আড়াই কেজি মাংস রান্না করে দিতে হবে, আর ভাত।'

'আগাম টাকা দিতে হবে না ?'

'তুই আমার নাম করে বলবি। আর বলবি নাড়িভুঁড়ি যেন না দেয়।'

'আর মিষ্টি ?'

রাজভোগ কেনা হবে।'

'আর মাল ?'

'সে হবে এখন।

সোতে মুখ শক্ত করে বলল, 'অই সালা তোর দোষ, সব তাতে কত্তামো করবি।'

ত্যাবড়া ওর লাল দাঁত বের করে হাসল, বলল, 'সালা, যত খুশি টেনো, টেনে পড়ে থেকো, চিতেয় তুলে দিয়ে আসব। আগে সব টাকাটার হিসাব হোক না।'

সোতে আর কথা না বাড়িয়ে চলে গেল। ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে ফিরে তাকাল। পয়সা না গুণেও আধুলি, সিকি, কুড়ি, দশ, পাঁচ, তিন, দুই-এর ঘিঞ্জি, পায়ের ওপরে, গায়ে ছড়ানো চেহারা দেখেই ও অনুমান করতে পারে আশির ওপরে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হিসাবে তিনটে দশ আর একটা পাঁচ টাকার নোট, ওর নিজের পকেটেই আছে। এখন প্রায় সাতটা বাজে। আরো ঘণ্টা অনেক কম করে সময় হাতে আছে। এখনো বাইরের প্যাসেঞ্জার বিস্তর। দুটো সিনেমা হলে দুটো শো ভাঙবে, আবার শুরু হবে। শনিবার মাসের প্রথম…আর এ যা মুখ, এমন নিপাট ভাল অঘোর ঘুমে নিরীহ মানুষের মত, এ আব দেখতে হবে না। একশো ছাড়িয়ে কুড়ি পঁচিশে নির্ঘাত দাঁড়াবে। ত্যাবড়ার বিশ্বাস, লোকটা ওকে ডেকেছিল। না হলে পোলের ওপর দিয়ে যেতে যেতে নিচে পিছনের দিকে ঝোপের পাশে লাইনের ধারে হঠাৎ কারোর নজর

টানে। 'অনেক দিন তো আধপেটা ছাড়া ভাল-মন্দ খাস নি, প্রাণভরে মাল টানিস নি। আমাকে দিয়ে খাস, জানিয়ে দিয়ে গেলাম।' প্রথম দেখে এ কথাই ওর মনে হয়েছিল। গোটা শীতকাল ধরে প্রতিটি ছুটির দিনে গাড়িতে লরিতে কত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েরা ফিস্টি করতে যায়। গান করতে করতে, টুইস্ট নাচতে নাচতে যায়, মাইকে গান বাজাতে বাজাতে যায়, রাস্তায় মেয়ে দেখলে শিস্ দেয়, ইশারা করে। এই শহরের ছেলেমেয়েরাই কত রকম করে। কি ফুর্তি!

ত্যাবড়া ভাবে, তা এও এক রকমের ফিস্টি। এও এক রকমের চাঁদা। সব জাতের মানুষদের তো আর এক রকমের হয় না। খাওয়া ফুর্তি হলেই হল, ওটা সবাই বোঝে।

এই সময়ে পুনিয়া এল একদিক থেকে। আর এক দিক থেকে যমুনা। পুনিয়ার মুখটা একদিকে খামচানো। ত্যাবড়া ওর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'ওখানে কি হয়েছে?'

পুনিয়ার মুখে এখনো খামচানো আর রাগের জ্বালা। বলল. 'ফটকে সালা, খামচে দিয়েছে। শুয়োরের বাচ্চাকে কাল আমি দেখাব।'

যমুনা মরা মানুষের ধার ঘেঁষে ত্যাবড়ার গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ত্যাবড়া রুক্ষু মুখে ভুরু কুঁচকে তাকাল। যমুনা দেখছে মরা মুখ আর একটু একটু কোমর দুলিয়ে মিটিমিটি হাসছে। কোমর নাচানো মেয়েটার একটা অভ্যাস। মরা মুখের দিকে চোখ রেখেই বলল, 'আগেই বলেছিলাম তোমাদের মতলব ঠিক জানতে পারব। রতন আমাকে দুকুরেই বলেছে।'

ত্যাবড়া মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'বেশ করেছে। কোথা থেকে তেতে এলি?'

'তেতে আবার আসব কোত্থেকে? আমি তো গুমটির পেছনে সারা দিন শুয়ে কাটালাম গো।'

'কেন, পেট বাধিয়েছিস নাকি?'

যমুনা সারা গায়ে ঢেউ দিয়ে খিলখিল করে হাসল। রিকশাচালকদের শিস্, আর রকমারি আওয়াজ শোনা গেল। কে যেন ডাকল, 'এই যমুনা, ইদিকে আয়।'

যমুনা সেদিকে তাকাল না। হাসতে হাসতে প্রায় ত্যাবড়ার গায়ে ঢলে পড়ার যোগাড় করল। মরা মানুষের আরো কাছে সরে গেল। ত্যাবড়া খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে, আরে, তুই ও মড়া ছুঁস্নি, কাট এখান থেকে।'

যমুনা হাসি থামিয়ে ঘাড় কাত করে ত্যাবড়ার দিকে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'কেন. আমি এ-মড়া ছুঁলে মড়ার জাত যাবে?'

'তা যাবে না? কোত্থেকে কি করে এসেছিস, যা এখান থেকে।'

এবার পুনিয়া হেসে উঠল। ও সরে এসে যমুনার কাছাকাছি দাঁড়িয়েছে। যমুনাও হাসল। বলল, 'ত্যাওড়াদাদার যে কথা। মাইরি বলছি, কিছু করে

আসি নি, পেটও বাধে নি। আমার সালা বাঁজা পেট, দেখলে না, ইস্টিশনের খুঁড়িটা, পেট বাধিয়ে মরে গেল। বেঁচেছি বাবা। রতনটা কোথা গেল ?'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই খোঁজেই এসেছিস। সেজন্যেই তো বলছিলাম, কোথা থেকে তেতে এলি।'

এই সময়ে যমুনা পুনিয়ার দিকে ফিরল। পুনিয়ার খামচানো মুখে হাসি। নজর যমুনার জামার বোতামছাড়া অনেকখানি খোলা বুকের দিকে। অন্য দিকে যমুনার দিকে কথা ছোড়াছুড়ি শিস্ চলছিল।

যমুনা পুনিয়াকে বলল, 'কি রে মড়া, তুই কি দেখছিস ?'

পুনিয়া হেসে বলল, 'মড়া।'

যমুনা বলল, 'সালা, সকুন কমনেকার।' তারপর ত্যাবড়ার দিকে ফিরে বলল, 'একটা টাকা দিয়েছি—'

যমুনা কথা শেষ করবার আগেই, ত্যাবড়া বলে উঠল, 'রতনের কাছ থেকে রাত্রেই নিয়ে নিস।'

যমুনা মাথা নেড়ে বলল, 'টাকা আমি নেব না, তোমাদের দলে থাকব।'

'ভাগ্, মেয়েমানুষ-টানুস আমাদের দলে নিই না।'

'আমি ঠিক থাকব।'

বলেই যমুনা মরা মানুষের মাথার কাছে বসে পড়ল। বলল, 'ই কি গো, ধূপকাটি নিবে গেছে কখন, দ্যাখ নি। দাও, সালাইটা দাও।' বলে, ধূপকাঠির বাক্সটা হাতে তুলে নিল।

ত্যাবড়া হুমকে উঠল, 'অ্যাই, অ্যাই, মড়া ছুঁসনি বলছি।'

যমুনা বলল, 'মড়া ছুঁচছি না বাবা, সালাইটা দাও, ধূপকাটি জেলে দিচ্ছি।'

ত্যাবড়া দেশলাইটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'সালা, আচ্ছা আপদ জুটেছে তো।'

যমুনা হাসতে হাসতে দেশলাই জ্বালিয়ে জোড়া ধূপকাঠি ধরাল। কাদা মাটির ড্যালায় পুঁতে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। ত্যাবড়াকে দেশলাই ফিরিয়ে দিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে গলা নামিয়ে বলল, 'যে কথা বলতে এয়েছিলাম, শোন। তোমরা যখন মড়া নিয়ে বেরোবে তখন রাস্তায় তোমাদের আটকাবে।'

'কারা ?'

'গণশা ফট্‌কেরা তো থাকবেই, শিবে লাট্টুরাও ওদের সঙ্গে থাকবে, ছিনতাই করবে টাকা।'

ত্যাবড়ার মুখ শক্ত হয়ে উঠল। পুনিয়ার সঙ্গে ওর চোখাচোখি হল। পুনিয়ার চোখ ছোট হল, রাগ ফুটে উঠল। ত্যাবড়া মরা মুখের দিকে তাকাল, তারপরে হিপ পকেট থেকে টেনে বের করল একটা ছুরি। ছুরির ফলাটা খুলে বোতাম টিপে আটকে মরা মানুষটাকে দেখাল। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'তোমার জন্যে আজ জ্যান্ত খাব, কিন্তু তোমার দিন আমাদের দিন পাক্কা, পাই পয়সা কাউকে ভাগ দেব না।'

পুনিয়া বলল, 'সালাদের ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখব !'

যমুনা বলল, 'আমি বলেছি ওদের, তোরা যখন মড়ার পয়সায় খেয়েছিলি রতনদের ভাগ দিয়েছিলি ? আমাকে গণশা সালা বললে, "চোপড়া ভেঙে দেব।" আমি বলেছি, "তোর ইয়ে মুচড়ে দেব।"

এই সময়ে মনা আর সোতে একসঙ্গে এল। সোতের প্যাণ্টের পকেট দেখেই বোঝা যায়, একটা পাঁট নিয়ে এসেছে। দুজনেই ওদের পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সোতে যমুনার পাছায় একটা চাঁটি মারল। যমুনা প্রতিবাদে কোমরটা দুলিয়ে দিল। ওরা দুজনে রিক্‌শা সারির পিছনে নর্দমার ধারে গিয়ে দেওয়াল ঘেঁষে চটের ওপর বসল।

যমুনা আবার ত্যাবড়াকে বলল, 'আমি কিন্তু দলে রইলাম।'

ত্যাবড়া ধমক দিল, 'ভাগ।'

যমুনা হাসতে হাসতে ইস্টিশনের দিকে চলে গেল। সোতে মনার দিকে একবার তাকিয়ে পুনিয়াকে বলল, 'শোন পুনিয়া, একবার গুমের ডিপোর কাছে যাস। একটু এগিয়ে গেলে দেখবি, রেললাইনে ঢোকবার গলির মধ্যে একটা বাঁশ পড়ে আছে। ওটা নিয়ে চলে আয়।'

পুনিয়ার চোখে মুখে অনিচ্ছা। বলল, হ্যাঁ, সালা কার বাঁশ, দেখবে তারপরে তাড়া করবে।'

'আরে কেউ দেখবে না, তুই যা না।'

'আমার সঙ্গে কেউ চলুক।'

'সঙ্গে আবার যাবে কি, তুই দ্যাখ না যেয়ে।'

পুনিয়া যাবার আগে বলল, 'তুমি সালা আমাকে দিয়ে বেশি খাটাচ্ছ।

ত্যাবড়া হেসে বলল, 'দু টুকরো মাংস বেশি খাস।'

পুনিয়া হাসল না, চলে গেল।

রাত যত বাড়তে লাগল, ইস্টিশনের সামনেটা তত ফাঁকা হতে লাগল। তবে শনিবারের রাত। অন্যান্য দিনের তুলনায় এখনো ভিড় কম না। আইন আছে, রাত আটটার পরে দোকান বন্ধ। এ শহরে আইন নেই। দশটা বাজছে, দোকান সবই হাট করে খোলা, আলোয় ফটফট করছে। পকেট যাদের ভরবার তাদের ঠিকই ভরছে।

মাঘের শেষ, কিন্তু দিনের বেলার মতনই এখনো দক্ষিণা বাতাস ছাড়ছে। শীত তেমন নেই, বসন্তকালের মত আবহাওয়া। পুনিয়া বাঁশটা ঠিক আনতে পেরেছে। সেটাকে দু টুকরো করে কেটে মোটামুটি একটা চালি বানানো হয়েছে। সোতে মনা আর জগাই করেছে। তবে ইতিমধ্যে পাঁচজনে দু পাঁট খেয়েছে। কিন্তু যে কারণে ওরা খায়, খেয়ে বলে, 'শরীরের জাম ছাড়াচ্ছি', এখন সে অবস্থা নয়। যমুনার সংবাদের পরে ভিতরে ভিতরে ওদের এখন লড়াইয়ের প্রস্তুতি। সকলেরই

শক্ত মুখ, চোখে চোখে নজর হানা। গণশাদের দলটাকে কাছে পিঠে দেখা যাচ্ছেনা। তবে মদ খাওয়ার পরে সবাই একবার মরা মানুষের গায়ে হাত বুলিয়েছে। ত্যাবড়া মড়ার ঠাণ্ডা কনকনে চিবুকে হাত দিয়ে চুমকুড়ি শব্দ করে বলেছে, 'আসিরবাদ কর, নিজের বাপকে যেন তোমার মতন এখানে এনে শোয়াতে পারি।'

জগা বলেছে, 'নিজের বাপকে শোয়াবি?'

'শোয়াব না? ওটাই তো একমাত্তর হকের ধন। বাপ পুড়িয়ে আবার একদিন আশ পুরে খাব।'

সোতে বলেছে, 'আর সেই ছেরাদ্দটেরাদ্দ কি সব বলে, সে-সব করবি না?'

'ধু-সালা, ছেরাদ্দ আবার কি। চিতেয় গঙ্গাজল ঢেলে দেব, ওতেই ছেরাদ্দ হয়ে যাবে।'

বাকি চারজন চুপ করে ছিল খানিকক্ষণ। তারপরে জগা বলেছে, 'আমার তো বাপই মরে গেছে।'

মনা সোতেও তাই বলেছে, ওদের বাপও মরে গেছে। পুনিয়া বলেছে, 'আমাকে সেই বাচ্চা বয়েসে ছেড়ে দিয়ে বাপটা যে কোথায় ভেগে গেল, কোন দিন জানতে পারলাম না।'

ত্যাবড়া বলেছে, 'কোথায় যেয়ে মরে গেছে, কারা হয়তো পুড়িয়ে আমাদের মতন খেয়েছে।'

পুনিয়া সামনের মরা মানুষের মুখের দিকে ফিরে তাকিয়েছে। ওর আনমনা চোখে বাবার ঝাপসা মুখটা ভেসে উঠছিল। গালের খামচানো ক্ষতের জায়গাটা কেমন যেন কুঁচকে উঠছিল।

দু পাঁট মদ খাবার পরে এই সব কথা ওরা বলাবলি করছে। তারপরে কারখানায় রাত্রি দশটার ভোঁ বেজে যাবার পরে ত্যাবড়া মরা মানুষের শরীর আর কাপড় থেকে সব পয়সা তুলে নিয়ে গুনল। যা ভেবেছিল তা-ই, প্রায় একশো পনেরো টাকা উঠেছে। সোতে আর মনাকে ডেকে বলল, 'ভাত আর মাংসের আগাম টাকা দিয়ে আয়। রাজভোগের হাঁড়িটা ওখানেই জমা করে দিস। মালের বোতলের কথা বলে রেখেছিস?'

সোতে বলল, 'পাঁচ বোতল পুরো।'

ত্যাবড়া বলল, 'খেয়ে যদি পড়ে থাকিস কোন সালাকে টেনে তোলা হবে না।'

মনা বলল, 'তোকেও সালা তুলব না।'

ত্যাবড়া টাকা দিয়ে বলল, 'যা, মিটিয়ে আয়, এবার বেরুব। আমরা মড়াটা বেঁধে ফেলছি।'

জগা বলল, 'সাড়ে-দশটার মধ্যে? আরো দুটো গাড়ি দেখে নে।'

ত্যাবড়া বলল, 'যোগাড় যন্তর করতে করতে হয়ে যাবে।'

সোতে মনা চলে গেল। ত্যাবড়া মড়ার কাছে উপুড় হয়ে খাঁজে ভাঁজে

অগলে বগলে হাঁটকে দেখল, পয়সা আরো পড়ে আছে কি না। তিনটে দশ পয়সা পাওয়া গেল আরো। এ সময়েই একটা হাসির রোল আর মার মার শব্দ শোনা গেল। কোথায় কি ঘটছে বোঝবার আগেই নর্দমায় বড় বড় ইঁট পড়তে লাগল। সেই সঙ্গে একটা জন্তুর গলা ফাটানো চিৎকার। তারপরেই নর্দমা থেকে শব্দ দিয়ে উঠল নোংরা মাখা একটা শুয়োর। মরা মানুষটার ওপর দিয়ে মাড়িয়ে চলে গেল। ত্যাবড়া ছিটকে সরে যাবার আগেই ওর গায়েও নর্দমার দুর্গন্ধ ময়লা লেগে গেল।

কয়েকজনের একটা দল খ্যাল খ্যাল করে হাসতে লাগল।

ত্যাবড়া চিৎকার করে উঠল, 'জগা, মড়াটা আগলে দাঁড়া তো। একটা কুত্তার বাচ্চা এদিকে এলে মাথা দু ফাঁক করে দিবি।'

হাসিটা তাতে আরো জোর হল। জগা চেঁচিয়ে বলল, 'কুত্তার বাচ্চা দেখছিস কোথায়, সব তো শোরের বাচ্চা। সালাদের জন্মের ঠিক থাকলে সামনে আসুক।'

পুনিয়া ততক্ষণে ওর রিক্‌শায় যাত্রী বসবার সীট তুলে ভিতর থেকে একটা সাইকেলের চেন বের করে নিয়েছে। চাবুকের মত ধরে চিৎকার করল, 'সব বেজন্মার চামড়া খুলে নেব।'

এ সময়ে যমুনা এসে দাঁড়াল। আবার হাততালি, হাসির রোল, শিস্ বেজে উঠল। সেই সঙ্গে খিস্তি। যমুনাও কোমর দুলিয়ে কাঁপিয়ে হাততালি দিয়ে উঠল। চেঁচিয়ে বলল, 'কি রে মড়ারা, হল কি তোদের, তোরাও চালিতে উঠবি নাকি?'

ফট্‌কের গলা শোনা গেল, 'না, তোর ওপরে।'

যমুনা বলল, 'মুরোদ জানা আছে রে। রিক্‌শা চালিয়ে চালিয়ে তো সালা তোদের মাজা ভেঙে গেছে।'

সেপাইটা এবার এগিয়ে এল। এতক্ষণ ছিল না। ডিউটি শেষ করে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। এসেই হাঁক দিল, 'অ্যাই, গোলমাল কিসের, ঝামেলা হটাও।'

বলতে বলতে সে মারমুখী হয়ে লাঠি উঁচিয়ে গণেশদের দিকে এগিয়ে গেল। ওরা সব এদিক ওদিক দৌড় দিল। ত্যাবড়া নিজের গায়ের ময়লা মোছার আগে, ন্যাকড়া দিয়ে মড়ার শরীর পরিষ্কার করতে লাগল। মরা মানুষটার মুখের ওপরে ময়লার ধ্যাবড়া, শুয়োরের পায়ের আঁচড়ে গালের খানিকটা চামড়া খসে গিয়েছে।

সেপাইটা ওদের দিকে এগিয়ে এসে সিঁড়ির ধারে যমুনাকে দেখল। দেখলেই বোঝা যায়, নজরের ঠেক কোথায়। দাঁতচাপা স্বরে বলল, 'তুই এখন এখানে কেন, তোর জায়গায় যা।'

যমুনা হেসে বলল, 'আমার আবার জায়গা কোথায় গো সেপাইদা ?'

সেপাই আবার লাঠি তুলে এগোল, 'তোমার জায়গা চেনো না হারামজাদি।'

যমুনা 'বাবা গো' বলে ঢঙ করে হেসে দৌড় দিল। আর তখুনি ওর ডানা মুচড়ে ধরল রেলের সেই সেপাই, 'গায়ের উপার পরস ক্যান্ ডেকরি, গতরে পোকা পরছে নাকি ?'

যমুনা ব্যথার শব্দ করল, 'উঃ উঃ লাগে।'

রিক্শাচালক, ভিখিরি আর একশ্রেণীর যাত্রীরা হেসে উঠল। ত্যাবড়ার সামনে থানার সেপাই নিচু হয়ে বলল, 'অনেক রাত হল রে ত্যাবড়া, এবার বাড়ি যাব।'

ত্যাবড়া তখন মড়ার গালের উঠে যাওয়া চামড়াটা লেপটে দেবার চেষ্টায় ছিল। পকেট থেকে তিনটে টাকা বের করে, সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই খেঁকিয়ে বলল, 'ভাগ হারামজাদা, আর দুটো টাকা দে। দেড়শো টাকা তো তুলেছিস।'

'মাইরি না সেপাইদা, একশোও পুরো হয় নি।'

'ভাগ, পাঁচটা টাকা ছাড়।'

ত্যাবড়া মনে মনে বলল, 'শুয়োরের বাচ্চা।'

বলে আরো দুটো টাকা দিয়ে দিল। জগা বলল, 'আর এক সালা তাকিয়ে আছে রে।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, জলের কুমিরটা গেল, এখন ডাঙার বাঘ। রেল সেপাই দেখতে পেয়েছে কত দিলাম।'

'সালা যমুনার গায়ে খিমচে ধরে খপিসের মত এদিকে নজর রেখেছিল। ওকে যা দিয়েছিস, ওকেও তাই দিতে হবে। বুড়ো মানুষটার দেনা মিটছে।'

ত্যাবড়া মাথা ঝাঁকিয়ে পকেটে হাত দিল। বলল, 'আমাদের দেনা বল। মানুষটাকে দিয়ে নিজেদের দেনা মেটাচ্ছি।

ভরুর আর ঠোঁট ফোলা মনা বলল, 'হ্যাঁ, রিক্শাওলা হলেই পুলিসের কাছে চোদ্দ পুরুষের দেনা থাকে। আর ইস্টিশনের ধারে হলে রেল পুলিসের কাছেও। মিটিয়ে দে সালা।'

ত্যাবড়া রতনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে দিল। রতন ইস্টিশনের রোয়াকে উঠে রেল সেপাইয়ের হাতে গুঁজে দিল। সেপাই প্যাণ্টের পকেটে হাত গুঁজে তৃপ্ত হেসে বলল, 'এইবার মরা লইয়া যা গিয়া, গন্ধ ছারব।'

সোতে ফিসফিসিয়ে মনাকে বলল, 'এখন যা, পাঁচ টাকা নিয়ে বুড়ি মাগের কাছে শুতে যা সালা।'

যমুনা ছাড়া পেয়ে একদিকে পালিয়েছে। বাতাসটা কমের দিকে না, রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যেন। কয়েকটা কুকুর দৌড়াদৌড়ি কামড়াকামড়ি খেলা জুড়ে দিয়েছে, আর এমন ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ করছে, যেন চুপিচুপি কিছু কথা বলছে।

পুনিয়া ইঁট নিয়ে তৈরি, কুকুরগুলো মড়ার ঘাড়ের ওপর এসে পড়তে পারে। বলল, 'সালারা হঠাৎ খেলা জুড়ে দিল কেন বল তো?'

সোতে বলল, 'কুত্তার মর্জি', কে বুঝবে।'

যে দুটো গাড়ির অপেক্ষা ছিল, তাও এসে গেল। মড়ার চাদরে আরো কিছু পয়সা পড়ল। দোকানপাটও কয়েকটা বন্ধ হতে আরম্ভ করল। আর দু একটা আপ ডাউন গাড়ি আছে। তার অনেক দেরি। ত্যাবড়া বলল, 'নে, এবার চালিটা আন, বেঁধে ফেলা যাক।'

সোতে মনা পিছনের দেওয়ালের কাছ থেকে চালিটা নিয়ে এল। সবাই মিলে মরা মানুষটাকে চালিতে তুলল। মুখটা বের করে রেখে, জড়িয়ে বাঁধবার সময় গণেশরা চিৎকার করে 'হরিবোল' দিল, তারপরে লাট্টুর গলা শোনা গেল, 'পাঁচ ব্যাটার বাপ মরেছে।'

ওরা কেউ সে সবে কান দিল না। ত্যাবড়া বলল, 'পুনিয়া, তোর গাড়িটা নিয়ে চল্। সীটের নীচে, মালের বোতলগুলো নে। আড়াইশো চানাচুর নিবি, খালি মুখে চলবে না।'

সোতে বলল, 'তোকে বলতে হবে না, নেওয়া হয়েছে।'

পুনিয়া বলল, 'গাড়ি চালাবে কে?'

'তুই।'

'না, আমি মড়া বইব।'

'আচ্ছা চল, গাড়ি আমি চালিয়ে যাব।'

গলা শুনে সবাই ফিরে তাকাল। যমুনা কোমর দুলিয়ে হাসছে। ত্যাবড়া জগার মুখের দিকে তাকাল। শক্ত মুখে খেঁকিয়ে উঠল, 'না, মেয়েমানুষ-টানুষ যাবে না।'

জগা সোতে আর মনার দিকে তাকাল। সোতে বলল 'যেতে চায়, চলুক না।'

মনা বলল, 'চলুক। একটা টাকা দিয়েছিস তো?'

ও যমুনার দিকে তাকাল। ত্যাবড়া খিঁচিয়ে উঠল, 'অ সালা, তোমরা মাল খেয়ে মেয়ে নিয়ে র‍্যালা করতে যাচ্ছ? আমি ও সবের মধ্যে নেই।'

জগা বলল, 'আরে, র‍্যালা করার কি আছে। আমরা থাকব আমাদের মনে, ও থাকবে ওর মনে।'

ত্যাবড়া মুখ বিকৃত করে বলল, 'যা খুশি করগে সালা। একটা ভাল মানুষের মড়া, আর সঙ্গে দিন ভর কি না কি করছে ছুঁড়ি।'

যমুনা ঘাড় দুলিয়ে নিল, 'মাইরি, আজ সারাদিন কিছু—'

'চোপ, আমার সামনে থেকে যা।'

যমুনা যেন ভয় পেয়েই একটু সরে গেল। আর পুনিয়া যমুনার দিকে চেয়ে,

হেসে বলে উঠল 'তা হলে আমিই গাড়ি চালাব।'

কথাটা শেষ হবার আগেই ত্যাবড়া ওর কোমরে লাথি কষিয়ে দিল, 'সালা।'

পুনিয়া হেসে, লাফ দিয়ে সরে গেল। নান্টা এসে দাঁড়াল ওদের সামনে। নান্টাকে দেখেই ওরা পাঁচজনে নান্টার দিকে ফিরে তাকাল। নান্টা একবার চালির দিকে দেখল, আর একবার ওদের দিকে।

সোতে জিজ্ঞেসে করল, 'কি হল রে নান্টা, তুই আবার কেন এখানে?'

নান্টা বলল, 'তখন থেকে দেখছি, কেউ কিছু বলছিস না। এখন কেটে পড়বার তালে আছিস। এ কি সেপাইয়ের পাওনা? যেচে দিতে পারিস না?'

ওরা পাঁচজনে চোখাচোখি করল। মনা বলল, 'ইউনিয়নের চাঁদা চাইছিস?'

নান্টা বলল, 'তবে কি মাল খাব বলে?'

নান্টা ইউনিয়নের লিডার। ত্যাবড়া বলল, 'এর আগে তো মড়ার টাকা থেকে চাঁদা নেওয়া হয় নি।'

নান্টা বলল, 'সে হয় নি, হয় নি। ফোকটে পেয়েছ, ইউনিয়নকেও দিতে হবে।'

ত্যাবড়া বলল, 'ফোকটে বলিস না। চাঁদা দিতে বলছিস দিচ্ছি। কিন্তু কার নামে বিল লিখবি? পাচজনের নামে?'

নান্টা ভুরু কুঁচকে বলল, 'তোদের নামে লিখব কেন? মড়ার চাদা বলে লিখব।'

ত্যাবড়া বলল, 'সেই ভাল।'

ও পাচটা টাকা এগিয়ে দিল। নান্টা খেঁকিয়ে উঠল, 'ভাগ সালা, সেপাইদের পাচ টাকা করে ঘুষ দিতে পারো, ইউনিয়নকে দশটা টাকা দিতে পারো না? নিজেরা তো সালা ডেঁড়েমুষে মাল আর মাংস মারবে।'

মনা হাত তুলে বলল, 'একটা তো দিন, ও সব খোঁটা দিস্ না নান্টা। ত্যাবড়া কথা বাড়াস নি, মিটিয়ে দে।

ত্যাবড়া দশটা টাকা নান্টার হাতে তুলে দিল। আর তখনই দক্ষিণ দিকে, একটু দূরে রাস্তার ওপরে দুম্ করে একটা শব্দ হল। আগুন ঝলকে উঠল। তারপরেই কতগুলো গলার চিৎকার। নান্টা ছুটে গেল। ওরা পাঁচজন সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

জগা বলে উঠল, 'বেজাদের ছিনতাই পার্টির মধ্যে লাগল বোধ হয়।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, পর পর আবার দুটো বোমা ফাটল। একদল ভয় পাওয়া লোক ইস্টিশনের দিকে ছুটে এল। দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হতে লাগল। দক্ষিণ দিকের রাস্তাটা হঠাৎ একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেল। রাস্তার আলোগুলো নিভে গেল। জগা বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, তা-ই।'

একটু দূরেই অন্ধকারের মধ্যে, কিছু লোকের ছোটাছুটি মারামারি দাঙ্গা হচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে। ব্যাপারটা এদিকে এগিয়ে আসবে কি না, বোঝা যাচ্ছে না।

দোকানঘরগুলো দু মিনিটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেল। ফলে, ইস্টিশনের সামনেটাও অন্ধকার হয়ে এল। ইস্টিশনের রোয়াকের ওপর লোকের ভিড় বাড়তে লাগল। বাজার রাস্তা আর সমস্ত পটি থেকে লোকজন এখানেই জড়ো হল। এখন ইস্টিশনই তাদের কাছে একমাত্র নিরাপদ জায়গা।

ত্যাবড়া ভয়ে আর উত্তেজনায় বলে উঠল, 'আমাদের এখুনি কেটে পড়া দরকার।'

সোতে বলল, 'কিন্তু যাবি কোন্ রাস্তা দিয়ে? আমাদের যাবার রাস্তার ওপবে তো লেগেছে। টাকা আর মড়া সব ছিনতাই হয়ে যাবে।'

পুনিয়া বলে উঠল, 'চল, মড়া নিয়ে রেললাইন দিয়ে কেটে পড়ি।'

জগা ভেংচি কেটে বলল, 'হ্যাঁ, আর পোটেকশন পুলিস সব কেড়ে নিক।'

ওর কথা শেষ হবার আগেই, আবার কয়েকটা বোমা ফাটল। একটা বোমা ইস্টিশনের কাছাকাছি। তৎক্ষণাৎ একদল রিক্শা নিয়ে, উল্টো দিকে ছুটল।

ইস্টিশনের রোয়াকের ভিড় ওভারব্রিজের দিকে ছুটল। ত্যাবড়া চিৎকার করে বলল, 'ওরা মারামারি করতে করতে এদিকে আসছে, শীগগির চালি ঘাড়ে কর।'

মনা বলে উঠল, 'ওস্তাদ এক কাজ কর। চল, মড়া নিয়ে বাজারের পেছু দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যাই। গঙ্গার ধার দিয়ে দিয়ে শ্মশানে যাব।'

জগা বলল, 'কিন্তু বড় নর্দমার খালটা পেরোবি কি করে? গঙ্গায় জোয়ার থাকলে বুক সমান জল হবে।'

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'সে তখন দেখা যাবে। তোল তাড়াতাড়ি।'

এ সময়েই দক্ষিণের অন্ধকার থেকে একটা প্রচণ্ড চিৎকার শোনা গেল। তারপরেই একজনের গলা শোনা গেল, 'ওরা হেবোর পেট ফাঁসিয়ে দিয়েছে।'

তারপরেই অনেকগুলো গলার চিৎকার। পর পর কয়েকটা বোমা ফাটাতে ফাটাতে ইস্টিশনের দিকে একটা দল আর একটা দলকে হটিয়ে নিয়ে এল। ইস্টিশনের সামনের রাস্তা রোয়াক সব ফাঁকা।

ত্যাবড়া চিৎকার করে বলল, 'সালারা তোল না মড়াটা।'

সোতে মনা জগা ত্যাবড়া মড়া তুলে ঘাড়ে ফেলে উল্টো দিকে দৌড় দিল। যমুনা পুনিয়ার রিক্শায় লাফ দিয়ে উঠল। পুনিয়া রিক্শা চালিয়ে দিল। এ সময়ে একটা পুলিসের জীপ আর ভ্যান আলো জ্বালিয়ে, উত্তর দিক থেকে ছুটে এল। পুনিয়া বলল, 'যাক, এসে গেছে।'

॥ ৩ ॥

মড়া নিয়ে, প্রায় দশ মিনিটের মধ্যেই, ওরা গঙ্গার ধারে এসে পড়ল। পিছনে পিছনে, যমুনাকে নিয়ে পুনিয়া, রিক্শা চালিয়ে। কিন্তু গঙ্গার ধারে এসেই ওরা থমকে দাঁড়াল। রাস্তায় আলো নেই, অন্ধকার। এমন থাকবার

কথা নয়। গঙ্গার বুকে, স্রোতের বাঁকা ঘূর্ণিতে কয়েকটা লম্বা ঝিলিক মাত্র। ছোট ছোট ঢেউয়ের মাথায়, হঠাৎ যেন এক আধটা জোনাকি জ্বলে ওঠা। আর সবই অন্ধকার, উঁচু রাস্তা, নিচের পাড়, নদী। দক্ষিণের দূর বাঁক পর্যন্ত অন্ধকার। ওপারের আলো কিছু দেখা যায়। সব যেন কেমন থমথম করছে।

ত্যাবড়া নিচু স্বরে বলল, 'রাস্তায় একটাও বাতি নেই কেন?'

মনা বলল, 'কেমন যেন লাগছে। কিছু হয়েছে নাকি?'

খানিকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। ইস্টিশনের ওদিক থেকে আর একবার একটা বোমা ফাটার শব্দ শোনা গেল। দু-একটা গাড়ির গর্জন, একটা ট্রেন আসার শব্দ। তা ছাড়া শহরটা নিঝুম. যেন নিঃশ্বাস বন্ধ, চুপ করে এক কোণে লুকিয়ে আছে।

সোতে বলল, 'আমরা তো মড়া নিয়ে বেরিয়েছি। চল না, হরিবোল দিতে দিতে চলে যাই।'

ত্যাবড়া বলল, 'হ্যাঁ, তারপরে চিনতে পারলে মড়াশুদ্ধ সব ছিনিয়ে নেবে।'

জগা বলে উঠল, 'তা'লে এক কাজ কর।'

'কি?'

'ঝামেলায় যেয়ে দরকার কি, চল গঙ্গায় ভাসিয়ে দিই।'

ত্যাবড়া নিচু স্বরে গর্জে উঠল, 'সালা বেইমান! তারপরে তুমি মদ মাংস খেয়ে, ছুঁড়িটাকে নিয়ে কোথাও পড়ে থাকবে।'

মনাও অনেকটা গর্জনের স্বরে বলল. 'সালা! খালি আমাদের ফিস্টি গেলাবার জন্যে লোকটা মরেছে, না?'

সোতে বলল, 'হ্যাঁ. না পোড়ালে মাইরি শাপ লাগবে।'

জগা বলল, 'যা বাবা, আমি ভালর জন্য বললাম, আর —'

যমুনা রিক্‌শা থেকে বলে উঠল, 'সব ভাল ভাল না জগা। তোমার মনে অধম্মো আছে। লোকেটা চিতেয় পুড়বে বলেই না ত্যাওড়াদার নজর টেনেছিল।'

কয়েক মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না। মনে হল মরা মানুষটার মুখটা ওদের সকলের চোখের সামনে জেগে উঠল। পুনিয়া পিছন ফিরে যমুনাকে একবার দেখতে চেষ্টা করল। সোতের গলা শোনা গেল, 'হ্যাঁ, পুড়িয়ে যাব, ভাসিয়ে যাব না। পুনিয়া, একটা কাজ কর তো। একটা বোতল বের কর, এক ঢোক করে মাল টেনে নিই।'

মনার গলা, 'মাইরি।'

পুনিয়া রিক্‌শা থেকে নামল। যমুনার গায়ে হাত দিয়ে বলল, 'নাম।'

যমুনা ওকে সরিয়ে দিয়ে বলল, 'তুই যা, আমি দিচ্ছি।'

যমুনা নিজেই. সীটের তলা থেকে একটা দেশী মদের বোতল বের করল। গালার সীল ভেঙে ছিপি খুলে, আগে ত্যাবড়ার হাতে দিল। ত্যাবড়া প্রথমটা

একটু থমকে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে মরা মুখটা একবার দেখবার চেষ্টা করল। তারপরে বোতল উপুড় করে গলায় ঢালল। দমবন্ধ গলায় বলল, 'তাড়াতাড়ি কর, বেরিয়ে যাই।'

যমুনা তারপরে সোতেকে বোতল দিল। যমুনার গলা শোনা গেল, 'আঃ, ছাড়।'

গলায় মদ ঢালার শব্দ হল। মনা বলল, 'সোতেটা সালা মড়া কাঁধেও খচড়ামি করছে।'

সোতে মদ গিলে নিয়ে বলল, 'একটা কথা হঠাৎ মনে হল মাইরি। আমরা পাঁচ জন পাণ্ডব, আর যমুনা দ্রুপদী।'

পুনিয়ার হাসি শোনা গেল। যমুনা বলল, 'ঠাকুর দেবতা নিয়ে ইয়ারকি ভাল না।'

ত্যাবড়া হঠাৎ অনেকটা চিন্তিত সুরে বলল, 'হুঁ্যা, এবার বুঝেছি, গঙ্গার ধারটা কেন অন্ধকার করে রেখেছে। সালারা লড়াইয়ের ময়দান সাজিয়ে রেখে গেছে, বুঝলি? বড় রাস্তায় ফয়সলা না হলে, এখানে আসবে।'

সোতে বলল, 'তা হলে তাড়াতাড়ি চল।'

জগা বলল, 'দাঁড়া বাবা, ঢোকটা মেরে নিই।'

বাহকদের পরে, যমুনা পুনিয়াকে বলল, 'হাঁ কর, তোর গলায় ঢেলে দিচ্ছি।'

পুনিয়া বলল, 'তুই খাবি না?'

'না।'

'কেন, খাস না নাকি?'

'তা বলে, তোদের মতন? মড়া নিয়ে যেতে যেতে খাব? নে নে, হা কর।'

পুনিয়া হাঁ করল। যমুনা মদ ঢেলে দিল। আর পুনিয়ার হাতটা উঠে এল যমুনার কাঁধে। যমুনা বলল, 'নে হয়েছে, চালা।'

ওরা চারজন আগে আগে মড়া নিয়ে, নিঃশব্দে চলেছে। হরিধ্বনি উচ্চারণ করতে পারছে না। পিছনে পিছনে, রিকশার ঝন্-ঝন্ শব্দটা সকলেরই খারাপ লাগছে, ভয় পাচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার, একটা লোক নেই। গাছের ঘন ঝোপ থেকে ভয় পাওয়া পাখি, হঠাৎ এক-আধবার ডেকে উঠছে। থমথমে অন্ধকারের মধ্যে প্রতি মুহূর্তেই যেন একটা কিছু ঘটবার আশঙ্কা। একটা বোমা ঝটিতি এসে ফাটা, বা একটা দল এসে ঝাঁপিয়ে পড়া।

হলও তাই। দূর থেকে, ওদের ওপরে একটা চড়া আলো এসে পড়ল। ছুটে ওদের দিকে আসতে লাগল।

ত্যাবড়া উত্তেজিত হয়ে, হিপ পকেট থেকে ছোরাটা বের করে খুলে ফেলল, 'যা থাকে বরাতে, লড়ে যাব।'

মনাও ছোরা বের করে বলল, 'আমারও আছে।'

পুনিয়া বলল, 'যমুনা, শীগগির সীটের নীচে থেকে সাইকেলের চেনটা দে।'

আলোর পিছনে কি আছে, কে আছে, প্রথমে বোঝা গেল না। আরো খানিকটা কাছে আসতেই বোঝা গেল, প্রাণপণে কেউ সাইকেল চালিয়ে আসছে। সামনে ডায়নামোর আলো। কাছাকাছি আসতেও যখন সাইকেলের গতি কমল না, তখন ওরা একটু নিশ্চিন্ত হল। কাছাকাছি হতে, ওরা দেখল, সামনের রডের ওপর আর একজন ঝুঁকে বসে আছে। তার মাথা মুখ বেয়ে রক্ত পড়ছে। ওদের গা ঘেঁষে, সাইকেলটা সাঁ করে বেরিয়ে গেল।

ত্যাবড়া বলে উঠল, 'যা বলেছিলাম, এবার সব এদিকে আসবে। দৌড়ো।'

ওরা মড়া কাঁধে দৌড়তে লাগল। সোতে বলল, 'কোন রকমে একবার খাল নর্দমার ধারে পৌঁছুতে পারলে হয়, তারপরে সব ঠাণ্ডা।'

পৌঁছল তা-ই, ধুক ধুক প্রাণে, কিন্তু নিরাপদেই। কেবল অন্ধকার আরো ঘন হয়ে উঠল। খাল নর্দমা মানে, শহরের ময়লা জলের একমাত্র আউট-লেট। গঙ্গায় এসে মিশেছে। আসশ্যাওড়া আর কালকাসুন্দের জঙ্গল পায়ের নিচে। খালের দিকে ঢালু জমি নেমে গিয়েছে।

পুনিয়া বলল, 'রিক্‌শা পার করব কি করে?'

ত্যাবড়া বলল, 'রিক্‌শা পার করা যাবে না। মালপত্তর সব বের করে ঝোলায় নে, গাড়ি জঙ্গলের মধ্যে ঢুকিয়ে দে, কেউ দেখতে পাবে না।'

পুনিয়া বলল, 'হ্যাঁ, কেউ দেখতে পাবে না। যদি কেউ দেখতে পায়, আর মেরে নিয়ে যায়, গাড়ির মালিক সালা আমাকে ফাটকে পাঠিয়ে দেবে।'

মনা বলল, 'তুই আমার ওপর ছেড়ে দে। এমন জায়গায় ঢোকাব, কাকপক্ষীও দেখতে পাবে না।'

মড়াটা ওরা আর একবার নামাল। যমুনা সীটের তলা থেকে মদের বোতল-গুলো, চানাচুরের ঠোঙা নামিয়ে নিল। মনা ঢালু জমির ঘন জঙ্গলের একদিকে তিন চাকার গাড়িটা নামিয়ে নিয়ে গেল। মড়মড় করে কয়েকটা আসশ্যাওড়া গাছ ভেঙে গাড়িটাকে ঢেকে দিল। ত্যাবড়া নর্দমার ধার থেকে উঠে এসে বলল, 'জোয়ারটা নেমে গেছে, কিন্তু হাঁটু-ডোবা পাঁক জমেছে। সাবধানে যেতে হবে। চল বেরিয়ে যাই।'

চারজনেই আবার মড়া কাঁধে তুলে নিল। পুনিয়া বোতলের ঝোলা কাঁধে নিল। যমুনা ওর পাশে পাশে। নর্দমার ময়লার ওপরে, পলিমাটির আস্তরণের ওপর দিয়ে সবাই সাবধানে পা টিপে টিপে নামতে লাগল। ময়লায় পা পড়তেই, এমন দুর্গন্ধ বেরোল নাড়িভুঁড়ি উঠে আসবার যোগাড়। যমুনাই প্রথম শব্দ করে নাকে আঁচল চাপা দিল। নর্দমার মাঝামাঝি আসতে, হাঁটুর বেশি ডুবে গেল।

ত্যাবড়ার গলা শোনা গেল, 'হুঁশিয়ার।'

যমুনা পুনিয়ার ঘাড়ে হাত রাখল। পুনিয়ার এখন মজা নেই। পাঁকের মধ্যে ডুবে যাওয়ার ভয় করছে। তথাপি যমুনার ছোঁয়া পেয়ে, একটু যেন ভরসাও পেল। কিন্তু ওর গায়ে হাত দেবার সাহস পেল না। একটা ঝুঁকে পড়া গাছের ডালের সঙ্গে, মড়ার ধাক্কা লাগল। ওরা খুব আস্তে আস্তে পার হল। নর্দমার পাঁক ওদের উরুতে ছাড়িয়ে উঠতে লাগল। যমুনার গলা শোনা গেল, 'আমার কোমর ধরেছে।'

সোতে শব্দ করল, 'স্‌স্‌স্‌, উ'ম্‌!'

সকলেই প্রায় কোমর অবধি ময়লা আর দুর্গন্ধ মাখামাখি করে পার হয়ে এল। ওপরে উঠে বাঁদিকে ফিরে খানিকটা যাবার পরে গঙ্গার ধারের রাস্তা পেল। আলোও পাওয়া গেল। নিজেদের দিকে সবাই তাকিয়ে দেখল। কোমর অবধি রঙ বদলে গিয়েছে।

জগা এতক্ষণে কথা বলল, 'একেবারে পুড়িয়ে চান করব।'

এক দিকে গঙ্গা, আর এক দিকে চটকলের লম্বা পাঁচিল। তারপরে একটা গরীবদের পাড়া। সেই পাড়াটা পেরিয়ে গেলেই শ্মশান। মনা বলল, 'হরিবোল দেব?'

ত্যাবড়া বলল, 'থাক সালা, যা দিন আজ, বলা যায় না। চুপচাপ চলে যাই।'

সোতে বলল, 'লোকটা বোধ হয় চুপচাপ থাকতে ভালবাসত।'

অর্থাৎ মরা মানুষটি। পুনিয়া বলল, 'আস্তে আস্তে একটা গান গাইব?'

কেউ জবাব দিল না। পুনিয়া সকলের সম্মতি আছে ভেবে নিচু গলায় গান ধরল, 'আমরা রিকশা চালাই, আমরা রিকশা...'

সোতে বলল, 'ভাগ্‌ সালা, আর গান খুঁজে পেল না। শুনলে সালা আমার চিত্তির জ্বলে যায়।'

মনা বলল, 'আমারও মাইরি। গাড়ি চালাই আমরা, আর সালা ওরা গান করে, তাল মারে।'

সোতে বলল, 'সালা মাক্ষীচুষ জাত। সবখানে চুষে খায়।'

পুনিয়ার আর গান গাওয়া হল না। ও মুখ ফিরিয়ে যমুনার দিকে তাকাল। যমুনা এ সব কথা শুনছিল না। ও গঙ্গার দিকে তাকিয়ে হাঁটছে। বাতাসে ওর চুল উড়ছে। পা থেকে কোমর পর্যন্ত মাটি দিয়ে গড়া প্রতিমার মত দেখাচ্ছে। কালো ময়লা আর পলিমাটির জন্যে ওদের সবাইকেই এক রকম দেখাচ্ছে। যমুনা মেয়ে বলে অন্য রকম।

ত্যাবড়া হঠাৎ মোটা গলায়, নিচু সুরে গেয়ে উঠল, 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব...'

সোতে হেসে উঠল, তারপরে সবাই হেসে উঠল। সোতে বলল, 'সালা আর গান খুঁজে পেল না। মড়া বইছে কি না!'

যমুনা বলল, 'তোমার আবার সখি কে গো ত্যাওড়াদাদা ?'

ত্যাবড়া ধমক দিয়ে বলল, 'তুই চুপ কর।'

বোঝা গেল, ত্যাবড়ার মনটা এখন বেশ খুশি আর নিশ্চিন্ত, এবং সকলেরই।

গরীবপাড়ার পরে, ছোট একটা মাঠ। তারপরে শ্মশান। শ্মশানে ঢোকবার আগে, ওরা এবার গলা ফাটিয়ে হরিধ্বনি দিল। যমুনার গলাটা ওদের সঙ্গে মিশে হরিবোল ধ্বনিটা কেমন একটা নতুন সুরে বাজল।

শ্মশানটা ফাঁকা, একটাও চিতা জ্বলছে না। মনা বলল, 'সত্যি, লোকটা ঝামেলা পছন্দ করত না। আজ মড়ার ভিড় নেই।'

কাঠের চালাঘর পাশে টিমটিমে বিজলি আলোর নিচে চণ্ডী এসে খালি গায়ে দাঁড়াল। পাশেই তার নিজের থাকবার ঘর। সেখানে তার বউ ছেলেমেয়েরা আছে। চণ্ডী শ্মশানের ডোম। সে এসে দাঁড়াতে, গঙ্গার ধারের ছাইগাদা থেকে তিনটে কুকুরও তার পাশে এসে দাঁড়াল। কান খাড়া, ল্যাজ ঝোলা, লাল ঢুলুঢুলু চোখ কুকুরগুলো বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে কাঁধের মড়াটা দেখল। ওরা চারজন শ্মশানের কাঁচা উঠোনে মড়া নামাল।

উঠোনের একপাশে কয়েকটা দরজাবিহীন চালাঘর। একটাতে টিম টিম করে কুপি জ্বলছে। গায়ে গেরুয়া জামা পরে, চুল দাড়িওয়ালা এক বুড়ো গালে হাত দিয়ে বসে রয়েছে। আর একটা ঘরে অস্পষ্টভাবে দেখা যায়, দু তিনজন ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে আছে।

চণ্ডী এসে মড়ার সামনে দাঁড়াল, দেখল, তারপরে সকলের দিকে ফিরে তাকাল। রোগা লম্বা কালো চণ্ডী কলসীতে জল ভরার মত বগ্‌বগ্ করে হেসে উঠল। বলল, কার মড়া ? নিজেদের কারোর ? নাকি জুটেল ?'

ত্যাবড়া বলল, 'জুটেল।'

চণ্ডী বলল, 'বাহ্, তোমাদের কপালটা বেশ ভাল। তা কেমন পেলে ?'

'মন্দ না, মাখো মাখো করে ভালই।'

'মাখো মাখো ? গড়িয়ে পড়বে না ?' বলে চণ্ডী বগ্‌বগ্ করে হাসল। যমুনার দিকে তাকাল, জিজ্ঞেস করল, 'আর ইটি ?'

সোতে বলল, 'জুটে গেল।'

চণ্ডী আবার হাসল। ত্যাবড়া বলল, 'নাও দাদা, সাজিয়ে ফেল, জিনিস তৈরি।' বলে পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে দিল।

চণ্ডী বলল, 'চার মাস আগের হিসাবে দিলে। আরো দেড় টাকা দাও, লকড়ির দাম বেড়েছে।'

ত্যাবড়া মুখ বিকৃত করল। মনা বলল, 'কমছেটা কী, তা তো বুঝি না।'

চণ্ডী বলল, 'মনা। মাইরি, বডড কমে গেছে।'

ত্যাবড়া আরো দেড় টাকা দিল। চণ্ডী এবার পুনিয়ার হাতের ঝোলার দিকে

তাকাল। বলল, 'চিতের কাছে নিয়ে যেয়ে মড়ার ধরাচূড়া খোল। আমি সাজিয়ে ফেলছি।'

চারটি চিতা, পাঁচিল ঘেরা। চিতার ঘেরাও থেকে জমি ঢালুতে নেমে 'গঙ্গায় গিয়েছে। ওরা একটা চিতার সামনে মড়াটা নামাল। ত্যাবড়া বলল, 'এখন ধরাচূড়া খোলার দরকার নেই। আগে কাঠ ফেলুক।'

জগা বলল, 'তা হলে গলাটা একটু ভিজিয়ে নিই। ট্যাড লাগছে।'

সোতে মনাও সায় দিল। জগা বলল, 'যমুনা, তুই মড়ার কাছে থাক, আমরা ঢালুতে নেমে যাচ্ছি।'

যমুনা বলে উঠল, 'না না, আমি একলা মড়া আগলাতে পারব না।'

জগা হঠাৎ ধমকে উঠল, 'পারবি। আমরা তো পাঁচ হাত দূরেই থাকছি। ন্যাকামো হচ্ছে।'

যমুনার ভুরু কুঁচকে উঠল। হঠাৎ ওর শরীরটা বেঁকে যেন ধারালো হয়ে উঠল। বলল, 'বড় যে মেজাজ দেখাচ্ছ?'

জগা হাত তুলে, খেঁকিয়ে উঠল, 'এক থাপ্পড় মারব বেশি কথা বললে, খালি কচর কচর।'

জগার ব্যবহারে সবাই অবাক হল। যমুনাও। কিন্তু যমুনার চোখ ধক্‌ধক করে উঠল। কিছু বলবার আগেই ত্যাবড়া বলে উঠল, 'সালা মাগভাতারি ঝগড়া।

জগা তেমনি গর্জে বলল, 'মুখ সামলে কথা বলবি ত্যাবড়া।'

ত্যাবড়াও একই ভাবে বলল, 'এক ঝাপ্পড়ে দাঁত তুলে নেব।'

দুজনেই মারমুখী হয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে গেল। বাকীরা ওদের ঘিরে। মনা বলল, 'আ রে, আপসে লড়ছে দেখ। কি হল রে জগা?'

জগা চেঁচিয়ে বলল, 'ত্যাবড়া কেন সব সময়ে লিডারি মারবে? তখন দেখতাম, গঙ্গার ধারে বোমাবাজী হলে, মড়া গঙ্গায় না ফেলে কি উপায় ছিল? তা সালা আমাকে শোনালে, আমি মদ খেয়ে মাগীবাজী করতে যাব। আর এই মাগী—'

যমুনার দিকে তাকাল ও, 'বলে কি না, আমার মনে অধম্মো। সালা আমার ধম্মের বকনা গাই।' বলেই ও গঙ্গার ধারে নেমে গেল। বাকীরা সব মুখ চাওয়াচায়ি করল, যমুনা ছাড়া। যমুনা ঠোঁট বাঁকিয়ে জ্বলন্ত চোখে জগাকে দেখছিল।

সোতে হেসে বলল, 'সেই থেকে সালা মনে মনে ফুঁসছে। ত্যাবড়া তুইও খচ্চর আছিস। খালি খোঁটা দিয়ে কথা বলিস কেন?'

যমুনা বলল, 'না না, তোমাদের ওপর চটে নি, আমার ওপর গরম হয়েছে। অই যে, ত্যাওড়াদাদাকে সাপোর্টি দিয়ে, অধম্মো বলেছি।' বলেই, ও গঙ্গার ধারের দিকে চেয়ে, কোমরে একটা হ্যাঁচকা দোলা দিয়ে চেঁচিয়ে বলল,

'ইস্টিশনে ভিক্ষে করে খাই, যমুনা কারোর তোয়াক্কা করে না।'

সোতে বলল, 'লে লে, তুই আর শুরু করিস না।'

এই সময়ে চণ্ডী কাঠের বোঝা এনে চিতার পাশে ফেলল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হল?'

ত্যাবড়া বলল, 'কিছু না। চণ্ডী তো এখন কাঠ সাজাবে, যমুনাকে একলা থাকতে হবে না।'

চণ্ডী বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি আছি, তোমরা চালাও গে।'

ওরা সবাই নেমে গেল। গঙ্গার ধারে ছাইয়ে ভরতি। ছাইগাদার পরে, পলি পড়া ভিজে পাড়। ছাইয়ের ওপরেই ওরা চেপে বসল। বাতাসে ছাই উড়ল। চুপচাপ সবাই, খোলা বোতলটা হাতে হাতে নিয়ে শেষ করে দিল। তারপরে চানাচুর চিবোতে লাগল।

পুনিয়া হঠাৎ বলল, 'আমি চিতা সাজানো দেখিগে।'

মনা বলল, 'হ্যাঁ, পোড় গে সালা।'

পুনিয়া চলে গেল। সোতে বলল, 'যমুনার কাছ থেকে নড়তে চাইছে না।'

ত্যাবড়া হাসল। আর একটা নতুন বোতল বের করে ছিপি খুলে গলায় ঢালল। একে একে সবাই ঢালল। ত্যাবড়ার গোঙানো স্বর শোনা গেল, 'লোকটার মুখটা আমার মনে পড়ছে।'

মনা বলল, 'আমার মাংস দিয়ে ভাত খেতে ইচ্ছা করছে।'

সোতে বলল, 'ধু—। দে, মাল খাই। আমার বাবা এই ভাল।'

জগা হেসে বলল, 'হ্যাঁ, দিদিমণি তো আর কোন দিন জুটবে না, খালি বয়েই বেড়াতে হবে।'

সোতে বলল, 'দিদিমণি জুটে আমার দরকার নেই। মেয়েমানুষ সব এক, কোন সুখ নেই।'

জগা বলল, 'সুখ নেই?

'না। আমার সালা কোন কিছুতে সুখ নেই, আমি বুঝতে পারি না মাইরি।'

কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। কেবল মনার চানাচুর চিবানোর মচ্‌মচ্ শব্দ শোনা গেল।

জগা বলল, 'মাল খেলে আমার এ রকম মনে হয়।'

সোতে বলল, 'তুই তো যমুনাকে নিয়ে বেশ আছিস।'

'যমুনা কি আমার একলার?'

'একলার হলে খুশি হতিস?'

জগা জবাব দিল না। মনা বলল, 'রিক্‌শাওলার আবার খুশি। খেটে খেটে মরে যাব, ফিনিস্।'

ত্যাবড়ার গোঙানো স্বর আবার শোনা গেল, 'এই দ্যাখ্, আমি মরলে তোরা

ফিস্টি করবি তো ?'

সবাই ওর দিকে ফিরে তাকাল। ত্যাবড়া আবার বলল, 'আমি নিশ্চয়ই ইস্টিশনেই মরব।'

জগা বলল, 'আমরা সবাই ইস্টিশনে মরব। আমাদের কার ঘর আছে ?'

ত্যাবড়া বলল, 'কিন্তু দেখিস, আমাদের মড়া যেন সালা গণেশ ফট্‌কেরা না নিয়ে যায়।'

মনা বলে উঠল, 'তাহলে সালাদের কাঁচা খেয়ে ফেলব।'

এই সময়ে চণ্ডীর গলা শোনা গেল, 'কই গো, এস সব, চাপাতে হবে।'

বোতলের ঝোলা রেখেই ওরা সবাই উঠে গেল। ত্যাবড়া নিজের হাতে মড়ার গায়ের কাপড় খুলতে গিয়ে দেখল নতুন কাপড়ের টুকরো নেই। জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কাপড় কোথায় গেল ?'

চণ্ডী বগ্‌বগ্‌ করে হাসল। যমুনা বলল, 'এক টুকরো এ নিয়েছে। আর এক টুকরো ওই সাধু নিয়েছে।'

সবাই তাকিয়ে দেখল, গেরুয়া জামা গায়ে, চুল দাড়িওয়ালা সাধু একটু দূরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঘাড় নেড়ে হেসে বলল, 'এমন একটা লোক মরল, সবায়েরই তো কিছু পাওয়া চাই।'

চণ্ডী সায় দিয়ে বলল, 'সত্যি কথা। নাও, বাকী জামা কাপড়গুলো খুলে দাও। ঘি এনেছ ?'

ত্যাবড়া বলল, 'কি হবে ?'

'মড়ার গায়ে মাখাতে হয়।'

'ও সব ছাড়।'

'নিদেন একটু দাল্‌দা আনলেও পারতে। যাক গে, আন নি যখন···'

ত্যাবড়া মরা মানুষটির গা থেকে জামা কাপড় খুলতে খুলতে বলল, সব খুলে নেব ?'

'না, কোমরের কানিটুক রাখ, বাকী খুলে দাও।'

তা-ই করা হল। তারপর চারজনে ধরে চিতার কাঠের ওপরে মড়া শুইয়ে দিল। হাত দুটো গুটিয়ে দিতে গিয়ে দেখা গেল, ভীষণ শক্ত হয়ে গিয়েছে। শরীরের একটা জায়গাও বাঁকাবার উপায় নেই।

চণ্ডী বলল, 'ছেড়ে দাও, এমনি থাকুক।'

সে মড়ার ওপরে কাঠ সাজিয়ে দিতে লাগল। ওরা সবাই ঘিরে দাঁড়িয়ে রইল। ত্যাবড়া মড়ার মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'দেখো বাবা, কোন দোষ নিও না। এই চেয়েছিলে তো ?'

বুড়ো সাধুটা ঘড়ঘড়ে স্বরে বলল, 'আর আবার কি চাইবে। মরার পরে চিতায় উঠে পুড়তে যাচ্ছে, মানুষের আর কি চাইবার আছে।'

কথাটা সবাই শুনল, কেউ ফিরে তাকাল না। কাঠ সাজাবার পরে চণ্ডী নিজের হাতে কয়েকটা প্যাঁকাটি জ্বালিয়ে বলল, 'নাও, কে মুখে দেবে, দাও।'

ত্যাবড়া বলল, 'আমিই দেব।'

জগা বলল, 'তোর না বাপ বেঁচে আছে, তুই মুখে আগুন দিবি কি?'

ত্যাবড়া বলল, 'এ বাপ বাপের থেকে বেশি।'

জগা বলল, 'তবে আমিও দেব।'

সোতে মনা পুনিয়া সবাই বলল দেবে। সবাই একসঙ্গে বুড়ো মানুষটার মুখে আগুন ঠেকিয়ে দিল। যমুনা পলকহীন চোখে দেখছিল। চণ্ডী হেসে বলল, 'মন্দ না, লতুন এক রকম হল।'

সে চিতায় আগুন ধরিয়ে দিল। বাতাস থাকায়, একটু পরেই ভালভাবে আগুন জ্বলে উঠল। সোতে বলল, 'যাই, ছাইগাদায় বসি গে'।'

জগা যমুনার দিকে ফিরে ডাকল, 'আয়, ওখানে যেয়ে বসি।'

যমুনা আগুনের দিকে চোখ রেখে বলল, 'যাও, যাচ্ছি।'

ওরা সবাই গিয়ে আবার ছাইগাদায় বসল। যমুনাও আস্তে আস্তে এসে বসল। চণ্ডীও এল। বগ্‌বগ্ করে হেসে ত্যাবড়ার পাশ ঘেঁষে বসল। বোতল হাতে হাতে ঘুরতে লাগল, গলায় ঢালা চলল।

চণ্ডীও হাতে বোতল তুলে নিয়ে বলল, 'মাগীটা ঘুমোচ্ছে।'

অর্থাৎ ওর বউ। না ঘুমোলে মদ খেতে পারত। সোতে বলল, 'যমুনা একটু খা না।'

যমুনা বলল 'না, ভাল লাগছে না।'

যমুনার একদিকে জগা আর একদিকে পুনিয়া। হাঁটুর কাছে সোতে, একটা পা ঢুকিয়ে দিয়েছে যমুনার ঠ্যাঙের তলায়। পুনিয়া বলল, 'তোর কোলে একটু মাথা রাখতে দিবি যমুনা?'

যমুনা বলল, 'রাখ, তোমার মরণ ধরেছে জানি।'

চণ্ডী বগ্‌বগ্ করে হাসল, 'সেই কথা, মরণ না ধরলে চলবে কেন।'

পুনিয়া যমুনার কোলে মাথা রাখল। যমুনা পুনিয়ার মাথার চুলে হাত দিল। সোতে একবার যমুনার ঘাড় আস্তে টিপে দিয়ে, পুনিয়াকে চোখের ইশারায় দেখাল। মনা এগিয়ে এসে যমুনার পিঠে আস্তে হেলান দিয়ে বসল।

নতুন বোতল খোলা হল। এমন সময়, সেই দাঁড়িওয়ালা বুড়ো এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞেস করল, 'কি, কারণ পান হচ্ছে? এ তো বড় ভাল জিনিস।'

ত্যাবড়া বলল, 'চলবে?'

বুড়ো বলল, 'তা আর না চলবে কেন। অমন মানুষের মড়া। লোকটা পুণ্যিমন্ত ছিল।'

সে কাছে এসে বসল। ত্যাবড়া বলল, 'কিন্তু খাবে কিসে বাবা?

আমাদের পাত্তর-টাত্তর নেই, বোতল থেকে চুমুক মারতে হবে।’

বুড়ো হে হে করে হেসে বলল, ‘এখানে আবার এঁটোকাঁটা কি আছে। বোতল ধরেই খাব।’

বুড়ো গাঁজার কলকেটিও এনেছে। সেটা বাঁ হাতে নিয়ে, ডান হাতে বোতল ধরে চুমুক দিল। দাড়ি বেয়ে কয়েক ফোঁটা পড়ল। তারপরে কলকের ভিতরে আঙুল টিপতে লাগল। এখন সকলেই চুপচাপ। কেউ কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। সকলেরই চেহারাগুলো যেন কেমন বদলে গিয়েছে। সেই দুপুরের মানুষগুলোকে আর চেনা যায় না। পুনিয়ার একটা হাত মায়ের কোলে শিশুর মত যমুনার বুকের কাছে নড়ছে। যমুনা নির্বিকার, গঙ্গার দিকে তাকিয়ে আছে। বাতাস বইছে। কয়েকটা কুকুর ওদের আশেপাশে এলিয়ে শুয়ে আছে।

ত্যাবড়া হঠাৎ বলে উঠল, ‘মানুষ যে কি, তা বুঝলাম না।’

কেন কথাটা বলল, বোঝা গেল না। কেবল সোতে সায় দিতে গিয়ে, শুধু উচ্চারণ করল, ‘হ্যাঁ, সালা মানুষ— ’

দাড়িওয়ালা, সাধু বুড়ো, গাঁজার কলকে টিপতে টিপতে, ঘাড় নেড়ে হাসল। তারপরে কেশো ঘড়ঘড়ে গলায় সুর করে গাইল—

‘মানুষ মানুষ করলি— মানুষ
রতন চিনলি না।’

তারপরে বলল, ‘মান চাই. হুঁশ চাই, মানে হুঁশে মানুষ।’

তার এ সব কথার কেউ কোন জবাব দিল না।

আবার নতুন বোতল খোলা হল। তার থেকে দু ঢোক খেয়ে চণ্ডী উঠে বলল, ‘যাই, একটু খুঁচিয়ে দিয়ে আসি।’

ত্যাবড়া, বলল, ‘চল, আমিও যাই।’

সবাই উঠল। সবাই গেল। মড়া পুড়ছে, মুখটা পুড়ছে, আর ঠোঁট পুড়ে গিয়ে, দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ছে। মাথার চুল পুড়ে, চামড়া উঠে, সাদা খুলি দেখা যাচ্ছে।

ত্যাবড়া বলল, ‘আমার মনে হচ্ছে, হাসছে।’

চণ্ডী বলল, ‘হ্যাঁ, এখনই তো যত রঙ্গ।’ বলে বগ্‌বগ্‌ করে হাসল।

মনা বলল, ‘ধু—ছাইগাদাতে যেয়ে বসি।’

সোতেও সায় দিল। সবাই সায় দিল। আবার সবাই ছাইগাদায় গেল। বুড়ো সাধুও গেল। গিয়ে কলকেয় আগুন দিল।

জগা বলল, ‘সব হল, কিন্তু মানুষটার জন্যে কাঁদা হল না।’

সোতে হেসে বলল, ‘ঠিক বলেছিস। এর আগেরবার বেগা সালা কি রকম কেঁদেছিল, মড়াটার জন্যে।’

মনা বলল, 'যমুনা, তুই মেয়েমানুষ, তুই কাঁদ।'

যমুনা ঝংকার দিল, 'আমার বয়ে গেছে।'

সোতেও বলল, 'কাঁদ না যমুনা, তুই একটু কাঁদ।'

যমুনা গায়ে মোচড় দিয়ে বলল, 'ভাগ্, কাঁদবে না হাতি।'

সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'কাঁদ না যমুনা, কাঁদ কাঁদ, তুই কাঁদ।'

ওরা যেন যমুনাকে সবাই পাগল পেল। যমুনা হাসতে লাগল। কিন্তু ওরা যেন ক্ষেপে উঠতে লাগল, জেদ করতে লাগল, 'কাঁদ না, কাঁদ যমুনা, তুই কাঁদ।'

ওরা যমুনাকে ধাক্কা মারতে লাগল, আর ওদের কেমন ক্ষ্যাপা ক্ষ্যাপা দেখাতে লাগল। যমুনা ছিটকে উঠে দাঁড়াল, চেঁচিয়ে উঠল, 'না না না।'

বলে ও গঙ্গাধারের দিকে চলে গেল। খানিকটা গিয়ে হঠাৎ দাঁড়াল, তারপরেই হঠাৎ সবাই শুনতে পেল, যমুনা হা হা করে কাঁদছে, আর বলছে, 'অ গো বাবা গো, বাবা গো…বাবা, আমার বাবা, সেই রাস্তার ধারে তুমি মরে পড়ে রইলে গো, বাবা গো। তোমার টেঁপিকে দেখলে না—আঁ আঁ আঁ…।'

ওরা সবাই শুনল, আর সকলেরই যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল। কিন্তু ওরা নিজেদের দিকে কেউ তাকাল না। তারপরেই হঠাৎ ত্যাবড়া ফুঁপিয়ে উঠল। তৎক্ষণাৎ ওরা এ ওর দিকে একবার তাকাল, এবং সঙ্গে সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে নিল। যেন ওরা কেউ কারোকে আর চিনতে পারছে না। তারপরে পুনিয়াও তেমনি হঠাৎ ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠল।

মনা বলল, 'ধ্যাত্, ভাল লাগে না। খাটব খাব… '

ওর কথা শেষ হল না, গলার কাছে শব্দটা আটকে গেল, যেন স্বরটা ভেঙে গেল। সোতে দাঁতে দাঁত টিপে, চোখের জল মুছতে লাগল। ওর নিচু চাপা স্বর শোনা গেল, 'সুখ নেই সালা—'

যেন পাথর সরে গেল, বানের জল ভাসল কলকলিয়ে।

চণ্ডী বোতল তুলে চুমুক দিল। যমুনা এখনো কাঁদছে। চণ্ডী বলল, 'কাঁদ, সবাই কাঁদ। কাঁদলে জ্বালা জুড়োয়। যাই, আবার একটুক খুঁচিয়ে দিয়ে আসি।'

চণ্ডী চিতার দিকে এগিয়ে গেল।

শুভ বিবাহ

শুভ বিবাহ কথাটি খুবই চলিত। আমি যে বিয়ের কথা বলতে যাচ্ছি, সেটা ঠিক আপনাদের মতে শুভ বিবাহ না-ও হতে পারে। মনে হতে পারে খানিকটা অভিনব। অভিনব বিয়ে।

বেশ কিছু দিন আগের কথা বলছি। একটি ছোটখাটো বেকারী ফ্যাক্টরীর হিসাবরক্ষকের কাজ করতুম। আসলে, হিসাবরক্ষা মালখানা পাহারা দেওয়া এবং সাপ্লায়ার—এই ত্রিবিধ কাজই আমাকে করতে হত। মাইনে পেতুম গোটা তিরিশ। আমার মালিকের এক শালা ছিল, কলকাতা থেকে প্রায় ষাট বাষট্টি মাইল দূরে, ছোট মফঃস্বল টাউনে। মনোহারী দোকান ছিল তার। আমাকে মাঝে মাঝে মাল নিয়ে, সেইখানে পৌঁছে দিয়ে আসতে হত। সেই সময়টাতে ময়দা পুরো র‍্যাশনিং। পারমিট ছাড়া এক চিমটি ময়দাও পাওয়া যায় না। সেই জন্য, আমার মালিক দূরে মালটা পাঠিয়ে বেশ ভাল রোজগার করছিল।

কিন্তু কাজটা বড় বিশ্রী। অবশ্য মালটা বহন করবার জন্যে আমায় কুলির পয়সা দেওয়া হত। তবু, এত দূরে গিয়ে মালটা দিয়ে আসতে হত যে, আমার ধৈর্য থাকত না এক একদিন। দায়িত্বও ছিল কম নয়। মালের দায়িত্ব, তা ছাড়া পাই পয়সাটি পর্যন্ত গুণে গুণে হিসাব দেওয়ার দায়িত্ব সবই করতে হত। তারপর মালিকের শালাটি পয়সার ব্যাপারে—

যাক্‌গে ও সব কথা। সেখানে যাওয়ার সারাদিনে তিনটি গাড়ি আছে। তার মধ্যে একটি আমাদের শহরতলির স্টেশনে দাঁড়ায় না। সকালের গাড়িটি ফেল করলে, রাত্রি সাড়ে সাতটায় আর একটি। সেইটিতে গেলে, মালিকের শালাকে ঘুম থেকে তুলতে হয়। অবশ্য শ্যালক যদি ঘরে থাকে। তার বসতবাড়ি আবার সে শহর থেকে মাইল তিনেক দূরে। কোন কোন দিন সে সেখানে যায়। কোন দিন বা সেই শহরেরই মেয়েমানুষের পাড়ায়—

যাক্ সে কথা। আমাকে নানান রকম ভোগান্তি পোয়াতে হত প্রায়ই। তবে মাগনা নয়, তিরিশটি টাকার বিনিময়ে। আর খুব খিদে পেলে, রুটি থাকলে কারখানার ছাড়্‌ অর্থাৎ খারাপ কিংবা ভাঙাচোরা রুটি বিস্কুট খেতে পাওয়া যেত। এইটি বিনা পয়সায় পাওয়া যেত। একমাত্র উপরি রোজগার।

একবার আমাকে যেতে হল সেই সাড়ে সাতটার গাড়িতে। সেদিন আকাশের অবস্থাটা ভাল নয়। শ্রাবণ মাস। জলটা ঠিক জোরে হচ্ছে না। হাওয়াও নেই। সারাটি দিনের মুখ ভার হয়েছিল মেঘ অন্ধকারে। বৃষ্টি হচ্ছে ফিস্‌ফিস্‌ করে। যেমন রাস্তার অবস্থা, তেমনি গাড়িগুলির তৃতীয় শ্রেণীর অবস্থা। তার উপর ছিল সেদিন বিয়ের লগনসা—বর আর বরযাত্রীরও ভিড় ছিল। বাজার গাড়িগুলির তো কথাই নেই। হয় আঁশটে, নয় ছানার বোটকা গন্ধে ভরা। তার উপরে অন্ধকার। যেন ওই গাড়িগুলিতে বাতি জ্বলতে নেই। ভাল কামরাতেই জ্বলে না। আমার সঙ্গে ছ'টিন মাল। এস, পাপা, লেড়ো, নানান্‌ রংমের দেশী বিস্কুট, রুটি, কেক্‌ভরা। আমাকে বাজার গাড়িতে উঠতে হল। থার্ডক্লাসের যাত্রীরা এত মাল নিয়ে উঠতে দিতে চান না।

বেরুলাম, সেখানে পৌঁছিলুম প্রায় রাত্রি এগারোটার সময়। সেই একই ফিস্‌ফিসে বৃষ্টি, আর গুমোট। মাঝে মাঝে চোখ ঝলসে দিচ্ছে বিদ্যুৎ। সারা স্টেশনে কুলি নেই একটিও। মালটা নামালুম নিজের হাতেই। মাগনা নয়। কুলির পয়সাটা লাভ হল ।

স্টেশনটা নদীর পারে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হয় অনেকখান। নামি কি করে এত মাল নিয়ে। নিচে উঁকি দিয়ে দেখলুম, রিকশাওয়ালা নেই একটিও। টিকেট কলেক্টর চিনতেন আমাকে। মালগুলি রাতের মত অফিসে রাখতে দিলেন। টিনগুলি অবশ্য তালাবন্ধ ছিল।

বসে বসে কি করি। নিচে নেমে গেলুম, যদি কোন দোকানে চা পাওয়া যায়। টিকিট কলেক্টর বললেন্‌ 'কি, শহরে রাতটা কাটিয়ে আসা হবে বুঝি?'

বলার ভঙ্গিটি খুব স্পষ্ট। বললুম 'দেখি কি হয়।'

উনি হাসলেন। আমি নেমে এলুম। ইস্‌! কি বিদ্যুৎ। যেন নিঘাত বাজ পড়বে মাথায়।

স্টেশনটা অনেক উঁচুতে। নিচের জমির সঙ্গে গিয়ে মিশেছে প্রায় এক মাইল দূরে। স্টেশনের লাইনের তলা ইট সিমেণ্ট দিয়ে জমানো। যেন উপরে ব্রীজ আর নিচে রাস্তা। কিন্তু রাস্তা ঠিক নয়। তলা দিয়ে সরু সরু নালা ঢাকা গলির মত হয়েছে এক একটি খিলানের তলায়। চামচিকের বাস। ইঁদুর, আরশোলা, সাপখোপ, সবকিছুরই যাতায়াত আছে এই সুড়ঙ্গগুলিতে।

নিচে নেমে দেখি, চায়ের দোকান খোলা নেই। শহরটা গুটিসুটি হয়ে ঘুমোচ্ছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে খানিকটা উত্তরদিকে একটু আলোর আভাস চোখে পড়ল। এগিয়ে গেলুম।

দেখলুম আলো জ্বলছে স্টেশনের নিচের একটি সুড়ঙ্গের মধ্যে। তার মধ্যে কিছু লোক! তা বেশ কিছু, প্রায় জনা চোদ্দ পনেরো হবে। গোটা দুয়েক সাইকেল রিক্‌শাও দাঁড় করানো রয়েছে।

আমাকে দেখে সবাই তাকাল। আলো বলতে সাইকেল রিকশার দুটি আলো। বসানো হয়েছে খিলানের দেয়ালে ছোট ছোট খুপরির মধ্যে। একটি চামচিকে নরকে আবদ্ধ আত্মার মত এপাশে ওপাশে ছটফট করে উড়ছে। আর মানুষগুলিকে ঠিক মানুষ মনে হচ্ছিল না। যেন কতগুলি কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি এক ভিন্ন ভয়াল অন্ধকার রাজ্যের কোণে বসে কিসের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত ছিল, একটি নতুন জীব দেখে চমকে উঠেছে। মুখগুলি যেন অদ্ভুত রং মাখা, বাঁকাচোরা ভাঙা, নাকমুখহীন দলা দলা। শরীরগুলিও সেই রকম। নিজেদের ছায়ার সঙ্গে মিলেমিশে আর একটি প্রাকৃতিক রূপ যেন।

এক মুহূর্ত পরেই নজর করে দেখলুম, সবাই ঘিরে বসেছে দুজনকে মাঝখানে রেখে। একজন পুরুষ আর একজন মেয়েমানুষ। একমাত্র তাদের দুজনেরই নতুন কাপড়।

পুরুষটি কালো, রোগা। খোঁচা খোঁচা চুল, খালি গা। বয়স অনুমান করা যায় না। মেয়েমানুষটির ঘোমটা আছে, তবু মুখ দেখা যায়। সেও কালো, চুলগুলি জট পাকানো। চোখগুলি কোটরে ঢুকে গেছে, দৃষ্টি একটু রোখা। গায়ে জামা নেই। শরীরের পুষ্টতা চোখে পড়ে। তবে বয়স বলা কঠিন।

আমার মনে হল, এদের অনেককেই আমি চিনি। কিন্তু কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি নে। আশ্চর্য! তা হলে কি জন্মান্তর বলে কিছু আছে নাকি? এরা কি আমার গতজন্মের চেনাশোনা, নাকি আগের মৃত্যুর পর পৃথিবীর কোন এক অদৃশ্যলোকে এদের দেখেছিলুম?

হঠাৎ একজন বলল আমাকে, 'কে? কি চাই?' যে বলল, সে একজন আধবুড়ো। তাকেও আমি যেন চিনি চিনি মনে হচ্ছে। বললুম 'কিছু চাই নে। একটু চায়ের দোকানের খোঁজে এসেছিলুম।'

একটি বুড়ির খনখনে গলা শোনা গেল, 'চা তো এখেনে পাবেন না গো বাবু-মশাই। এখেনে একটা শুভ কাজ হচ্ছে এখন।'

বলেই বুড়ি হেসে উঠল কেশো গলায়। আরে, বুড়িটা তো চেনা। ও হো! হ্যাঁ, ঠিক মনে পড়েছে। এই বুড়িটা তো, এই স্টেশনের সিঁড়িতে ভিক্ষে করে।

একজন জিজ্ঞেস করল, 'নিবাস কোথায়? কোথায় যাওয়া হবে?'

যে জিজ্ঞেস করল, তাকেও এবার চিনতে পারলুম। সে এখানকার একজন রিকশাওয়ালা। অনেকবার আমার মাল বয়েছে। বললুম, 'যাব তো শ্রীহরির মনোহারী স্টোর্সে। কিন্তু রাত হয়ে গেছে—

রিকশাওয়ালা বলে উঠলে, 'ও হো! আপনি? সেই রুটি বিস্কুটওয়ালা বাবু তো! সাঁতরাবাবুর দোকানে তো অনেকবার আপনাকে নিয়ে গেছি। তা এত রাতে আর কোথায় যাবেন রুটিওয়ালা বাবু, বসে যান না এখানেই।'

আরো কয়েকজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, বসে যান।'

কিন্তু বসব কোথায় ? জলের ছাঁট অবশ্য লাগছে না, লাগবার কোন সম্ভাবনাও নেই। যে কোন ভাল বাড়ির থেকে এ আশ্রয়টি খারাপ নয়। আর বসতে যাবই বা কেন ? জিজ্ঞেস করলুম, 'ব্যাপারটা কি হচ্ছে ?'

জবাব দিল সেই রিক্‌শাওয়ালাটিই। বলল, 'আপনি অনাথকে চেনেন তো ? অনাথ আর কালার বউকে ?'

অনাথ আর কালার বউ ! কই, মনে পড়ছে না তো। তারপরে বুঝলুম, অনাথ আর কালার বউ, দুজনেই ভিক্ষুক। এই শহরেই ভিক্ষে করে। স্টেশনটা তাদের কেন্দ্রস্থল। অনাথ নিতান্তই অনাথ। সে নাকি নদে জেলার কোন গ্রামের খাঁটি ব্যাঘ্রক্ষত্রিয়দের পুজোরী বামুন ছিল। কপালগুণে এখানে এসে ভিক্ষুক হয়েছে। এমন কি, তার নাকি ভিটেমাটিও ছিল এককালে। বিয়ে থা আর হয় নি। কেউ ছিলও না দেবার। এখন 'দরিদ্দর বেরাম্ভনের ছেলেকে একটি পয়সা দিন' বলে ভিক্ষে করে। বয়স দেখায় প্রায় চল্লিশ-বিয়াল্লিশের মত। কিন্তু সে বলে, একুশের বেশি নয়।

আর কালার বউ যে কোন্ কালার বউ, তা কেউ জানে না। বৃন্দাবনের কালা নয়, এটা সবাই জানে। গত মন্বন্তরের সময় থেকে এ শহরে আছে। কালা বলে তার এক স্বামী ছিল। সে মারা গেছে। ছেলেমেয়ে ছিল কয়েকটি। তারাও মরে গেছে।

কিছু দিন থেকে অনাথ কালার বউয়ের কাছে প্রেম নিবেদন করছে। এ নিয়ে, রাস্তাঘাটে কালার বউ অনাথকে গুষ্টিশুদ্ধ উদ্ধার করেছে। এখনো তার গতর আছে, ভিক্ষে করতেও পারছে। শুধু শুধু অনাথের কাছে থেকে আবার একগাদা বিয়োবে কেন ? অনাথ তাকে খাওয়াবে পরাবে কি ? ছেলেপুলে হলে কি পুষবে ? ন্যাড়া বেলতলায় যায় কবার ! অতই যদি দুঃখ সইতে পারবে কালার বউ, তবে এই শহরে অনেক বাবুর কাছেই সে যেতে পারত। পয়সাও মিলত। কিন্তু রেলপুলের তলায় বিয়োতে হত—

যাক্। কিন্তু অনাথ ভিক্ষে বন্ধ করে দিয়ে অনশনে মরতে বসল। কালার বউকে সে ভালবেসেছে, তাকে না পেলে নাকি মরবে।

মরুক। কালার বউ বলেছে, যদি তাকে পেতে হয়, তবে বিয়ে করতে হবে, দরকার হলে খাওয়াতে পরাতে হবে। অনাথ তাইতেই রাজী। মিছিমিছি নয়। ফাঁক হলে তাকে কালার বউ এ শহরছাড়া করে ছাড়বে। মেরে ধরে তুলোধোনাও করতে পারে।

স্টেশনকেন্দ্রের ভিক্ষাজীবী মেয়ে-পুরুষেরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে ব্যাপারটি ভেবেছে। তারপর একবাক্যে রায় দিয়েছে, ভিক্ষুক বলে কি তারা মানুষ নয়, না, তাদের আর বিয়ে-থা বলে কিছু নেই ! সুতরাং বিয়ে সাব্যস্ত হয়েছে। সকলে ভাগ্যে রুজির পয়সাও দিয়েছে বিয়ের খরচের জন্যে। এখানে

একটি মন্দিরের সামনে, কপালে সিঁদুর লাগিয়ে আর গলায় রুদ্রাক্ষ দিয়ে একজন ভিক্ষে করে। সে ব্রাহ্মণ। বিয়ের মন্ত্র পড়ার পুরোহিত সে। রিক্‌শাওয়ালা দুজন আছে, তাদের আর কোথাও যাবার জায়গা নেই রাত্রে। মালিকের ঘরে রাত্রে ফিরে না গেলেও ক্ষতি নেই। তারাও বিয়েটা দেখে যাবে। তাছাড়া স্টেশনের লাইসেন্স-বিহীন দুজন কুলি আছে এই বিয়ে বাসরে। গুটি অনেক কুকুর। তারপরে আমি এসে হাজির হলাম আর একজন বাইরের লোক।

এতক্ষণে আমি ভাল করে সকলের মুখের দিকে তাকালাম। চোখাচোখি হতেই অনাথ সলজ্জ হেসে মাথা নিচু করল। কানার বউ ঘোমটা টেনে দিল।

শুনলুম মন্ত্র পড়া হয়ে গেছে। এবার সাতপাক ঘোরা হবে। এমন সময়ে আমি এসেছি। দেখলুম, শালপাতায় ঢাকা রয়েছে কি সব। বোধ হয় কিছু তেলেভাজা জাতীয় খাবার আনা হয়েছে। কেননা কুকুরগুলি ওই দিকেই চোখ পিটপিট করে তাকাচ্ছে।

এখন তর্ক হচ্ছিল বিয়ের অনেক নিয়ম কানুন নাকি ঠিক হয় নি। এখানকার অনেকেই এ বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং রীতিমত বিবাহিত। সাতপাকের আগে সেইটার বিহিত হোক।

বসতে পারলুম না। দাঁড়িয়েই রইলুম। জীবনে যে এমন বিয়ে দেখতে হবে, কোন দিন ভাবি নি। এমন বিয়েও যে আবার হয়, তা জানতুম না। এখানেও যে নিয়ম-কানুন নিয়ে আবার বাক্‌বিতণ্ডা হতে পারে, সেটাও কল্পনাতীত ব্যাপার।

এবার একটি আধবুড়ি বলে উঠল, 'আমার কাছে চালাকি চলবে না। সন্তাগণ্ডার দিনে আমার বাপ একশো, এক-আধ টাকা নয়, একশো টাকা খরচ করে বিয়ে দিয়েছিল। ও সব বিয়ের-আচার-বিচার আর আমাকে শিখতে হবে না।'

খনখনে গলা বুড়ি, সনসুড়ি চুল দুলিয়ে দুলিয়ে বলল, 'সে কি তোর একলার। আমার বে-তে একশোটা নোক খেয়েছিল। ঢাক ঢোল কাঁসি বাদ্যি বাজনা, সে একেবারে কি কাণ্ড।'

রিক্‌শাওয়ালাটা এবার চটে উঠে বলল, 'আরে দুত্তোর নিকুচি করেছে বাদ্যি বাজনার। আমি এবার আমার গাড়ির বাতি নিয়ে চলে যাব কিন্তু। বলছি তখন থেকে যে, এটা বেওয়ারিশ বিয়ে, চালিয়ে নেও যা হোক করে, তা নয়, এখন আবার আচার বিচার।'

একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, সময়মত আমার ভোরবেলা গিয়ে কাচারীর কোণটাতে আমাকে বসতে হবে। নইলে গাঁয়ের বুড়ো কানাটা এসে বসে পড়বে।'

একটি খোঁড়া ভিখারী বলে উঠল, 'ওদিকে তেলেভাজাগুলি চুপসে জল হয়ে গেল।'

বসন্তের দাগ ধরা ভয়ঙ্কর মুখো একটি লোক বলে উঠল, 'অমনি নোলা দিয়ে

জল ঝরছে। শালা ভিখিরী কোথাকার!'

উপযুক্ত গালাগাল। কিন্তু খোঁড়া গেল ক্ষেপে। বলল, 'কি! জাত তুলে গালাগাল! জানিস, ও কথা বললে বাবুদেরও ছেড়ে দিই নে?'

রিকশাওয়ালা আমার দিকে ফিরে হেসে বললে, 'দেখছেন তো শালাদের কাণ্ড। ভেবেছিলাম আজ এট্টু বায়স্কোপ দেখব। তাপ্পর ভাবলাম যে, না, এ ব্যাটাদের বিয়েটাই দেখে যাই। তা কি ঝগড়াটাই লাগিয়েছে তখন থেকে।'

কিছু বলতে পারলুম না। হাসতেও পারলুম না। যদি কিছু মনে করে বসে। এরা সকলেই নিজেদের মধ্যে জানাশোনা। আমি অজানা। তা ছাড়া সবটা মিলিয়ে, এদের সেই করুণ, দয়াভিক্ষা করা কাঁদা কাঁদা ভিখারী মনে হচ্ছিল না এখন। বরং রাগে বিদ্রূপে এই অদ্ভুত পরিবেশে এক অন্য জগতের মানুষ মনে হচ্ছিল। দেখাচ্ছিল আরো ভয়ঙ্কর।

ইতিমধ্যে দুই বুড়িতে তর্কাতর্কি জমে উঠেছে। পুরোহিত হাঁ করে দেখছে সব। কালার বউয়ের চোখে রাগ। অনাথের ব্যস্ত অস্থিরতা।

তারপর অনাথের আর সহ্য হল না। সে প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, 'বে-টা হতে দেবে, না উঠে পড়ব? এ তো আর গাঁয়ে ঘরে বিয়ে হচ্ছে না যে নিয়ম কানুন সব মানতে হবে। আর যদি বাগড়া দাও তো বল, উঠে পড়ি।'

সব চুপ। কেবল একজন বলে উঠল, 'হ্যাঁ, এবার ঘুরিয়ে দেও, ঘুরিয়ে দেও সাতপাক। রাগারাগির দরকার নেই।'

হঠাৎ একটা বাতি নিভে গেল। তেল নেই আর। আরো অন্ধকার হল। একটি বাতির আলোয় আরো ভয়ঙ্কর হল মূর্তিগুলি। আমার ছায়াটা আলাদা করে খুঁজলুম, পেলুম না।

খনখনে গলা বুড়ি বলল, 'কত আলো জ্বলেছিল আমার বিয়েতে —'

আধাবুড়ি বলল থেমে থেমে, 'আমার সময়ে আটটা হ্যারিকেন জ্বলেছিল।'

এক চোখ কানা একজন মোটা গলায় বলে উঠল, 'আঃ, এবার থামাও ওই কথাগুলো। আমি আর সহ্য করতে পারি না ··'

'আচ্ছা, আচ্ছা ঘোরাও। কালার বউকে তুলতে হয় যে। কে কে তুলবে?'

রিকশাওয়ালা বসে ছিল রিকশার উপরেই। হঠাৎ সীটটা চাপড়াতে আরম্ভ করল। বাজনা বাজাচ্ছে।

খোঁড়া উঠল আগে। কালার বউকে তুলবে।

কিন্তু আবার গণ্ডগোল। কনে কালার বউ বলল, 'সাতপাক হবে না, বে হবে না। আমার মন নেই।'

এক মুহূর্ত সব চুপ। অবাক গুলতানি। কেন, কি হল! সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে এখন সীতা কার বাপ!

কালার বউ নীরব। কিন্তু তার রাগ নেই, চোখা চোখা কথা নেই। খালি

নীরব। ঘোমটা খসে পড়েছে, জট পাকানো চুলগুলি ছড়িয়ে পড়েছে ঘাড়ে। মুখের একদিকটা দেখা যাচ্ছে না একেবারে। আর একদিক ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা। মানুষ বলে মনে হয় না।

তার পাশে অনাথের অবস্থা কহতব্য নয়। তিন ভাগ অন্ধকার, এক ভাগ আলোয়, অনাথকে ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল। তার সারা মুখে বোবা অস্থিরতা ও যন্ত্রণা। সে প্রায় ছেলেমানুষের মত চিৎকার করে উঠল, 'ওলো কেন বল ·· তোর পায়ে পড়ি।'

মনে মনে বললুম, ঠিকই বলেছে। এ ছাড়া, বরোচিত কথা আর কি বলতে পারত অনাথ।

কালার বউ পরিষ্কার বলে দিল, 'আমি বে করে আর ভিক্ষে মাগতে পারব না। আর, কারুর ভিক্ষের ভাতও খেতে পারব না। তা এখন যাই বল।'

সবাই তো হাঁ। তবে কি করতে হবে?

কালার বউ বললে, 'সোম্‌সারে যা করে নোকে। কাজ করে, সোম্‌সার করে। ভিক্ষেই যদি করব, তবে আবার এ সব কেন। না বাপু না, এই নেও তোমাদের নতুন শাড়ি—' বলতে বলতে সে তার ছেঁড়া ধোকড়া ন্যাকড়াটা টেনে নিল পরবে বলে। এখনো পরনে তার সকলের দেওয়া লালপাড় শাড়ি।

সবাই স্তম্ভিত। অনাথ দেখছে সকলের মুখ। আমার পাশে রিক্‌শাওয়ালাটিও গম্ভীর হয়ে উঠেছে।

কালার বউ আবার বলল, 'সব গেছে বলেই না আজ ভিখিরী হয়েছি। যদি থাকত! আর আবার যদি হবেই '

থেমে হঠাৎ ফোঁসফোঁস করে উঠল, 'পেথম যখন বে হয়েছিল···

রিক্‌শাওয়ালা আরো গম্ভীর; কিন্তু চাপা খুশি চোখে সে কালার বউকে দেখছে। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব বিজ্ঞের মত মাথা ঝাঁকাতে লাগল; অর্থাৎ, দেখছেন তো?

আমার মেজাজ খারাপ হয়ে উঠেছিল। তিরিশ টাকা আর ছাড়া মাল খেয়ে আমি বিয়ে করি নি। ভিক্ষুকের বিয়েতে কোথায় একটু মজা দেখছিলুম, তা নয় ভিখারী বেটির আবার মান। আসরটাকে দিলে জুড়িয়ে।

কালার বউ কাপড় খুলতে যাবে, রিক্‌শাওয়ালা তার গাড়িতে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'দ্যাখ অনাথ, তুই কাজ করতে পারবি?'

অনাথের চোখে আলো দেখা দিল, বললে, 'পারব।'

'চুরি করবি নে?'

'আমি বেরাম্ভনের ছেলে—'

'থাক, ঢের বেরাম্ভন দেখেছি। ঘর ঝাঁট দিতে পারবি?

'পারব।'

'বাবুর সঙ্গে কলকাতা থেকে মাল বয়ে নিয়ে আসতে পারবি ?'

'খুব খুব।'

'বেশ, আমাদের রিক্শা-মালিকের গদিতে কাল তোকে নিয়ে যাব। কাজ মিলিয়ে দেব।'

এবার আমারই হাঁ হওয়ার পালা। অন্যান্য লোকগুলি পাথর। তারপর হঠাৎ সবাই একসঙ্গে বলে উঠল, 'তাহলে অনাথ আর ভিখিরী নয় ?'

রিক্শাওয়ালা বলল, 'হ্যাঁ, এখনো ভিখিরী। সাতপাকটা দেও ঘুরিয়ে।'

'তাহলে ? কি বলিস কালার বউ ?'

কালার বউ ঘোমটা টেনে বললে, 'তা হলে হোক।'

অনাথের আর হাসি ধরে না মুখে। খোঁড়া উঠল সকলের আগে, তারপরে এক চোখ কানা।

সাতপাক ঘোরানো হচ্ছে আর সবাই চিৎকার করছে, 'এবার আমরাও একটা করে বে করব মাইরি-ই-ই···।' তারপর শুভদৃষ্টি।

আমি ততক্ষণে বেরিয়ে এসেছি। কেননা, বিয়ে বাসরটা কেমন যেন ভিজে গেছে। ভিজে ভিজে, কান্না মাখা। একটা অন্য রকমের চাউনি সকলের চোখে। ঠিক ভিক্ষুকের আসর আর নেই।

রিক্শাওয়ালাটি পিছন পিছন এসে বলল, 'সাঁতরাবাবুর দোকানে যাবেন ?'

বললুম, 'হ্যাঁ।'

ওরা তখন খাচ্ছে আর কুকুরগুলি করুণ গলায় কোঁ কোঁ করছে।

উরাতীয়া

যখন বেলা পড়ে আসত, সারাদিনের রোদজ্বলা আকাশটায় ছড়াত রঙের তীব্র ছটা, জনহীন হয়ে আসত মাঠ ও বন, তখন মনে হত রেললাইনের উঁচু জমিটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। যেন সারাদিন পরে নুয়ে পড়া মাথাটা আড়মোড়া ভেঙে তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। আর গাঢ় বর্ণের আকাশটা যেন নেমে আসত একটু একটু করে। আকাশটাই ঘিরে থাকত উঁচু জমিটাকে।

তখন, দূর থেকে মনে হত দুটো অতিকায় দানব নেমে এসে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ঐ উঁচু জমিতে। বিশ্ব সংসারের এ নির্জনতার সুযোগে তারা নেমে এসেছে ধরাতলে। আকাশের অনেকখানি জুড়ে থাকত তাদের বিশাল দেহ। তাদের স্ফীত সুগঠিত মাংসপেশীর প্রতিটি সুস্পষ্ট রেখা ঢেউ দিয়ে উঠত আকাশের বুকে। তারপর, যখন তারা হঠাৎ খানিকটা সরে গিয়ে, ঝুঁকে পড়ে দাঁড়াত মুখোমুখি, এবং পরস্পরকে আচমকা আক্রমণ করে উঠত পড়ত, তখন শক্তি প্রয়োগে মাংসপেশীগুলি আরও উদ্দাম হয়ে উঠত। আকাশের বুকে ছিটকে যেত ধুলো মাটি। উঁচু জমিটা যেন থরথর করে কাঁপত তাদের দেহ ও পায়ের চাপে। তখন প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা ভয়ঙ্কর দৃশ্যের অবতারণা হত সন্ধ্যাকালের এ জমিটার উপরে।

তারপর এ লড়াই চলতে চলতে রঙে রঙে আকাশটা যখন কালো হয়ে আসে, জমি আর আকাশ হয়ে যায় একাকার, তখন তারা দুজনেই আকাশ মাটির সঙ্গে একাত্ম হয়ে হারিয়ে যায়।

এমনি ঘটে রোজই। লড়িয়ে দুজন দুই মস্ত মল্লবীর। লাখপতি আর ঘামারি। তারা দুজনেই রেলওয়ে গেটম্যান।

মফঃস্বল শহর থেকে মাইল সাত আটেক দূরে, স্থানীয় স্টেশন থেকেও প্রায় দু মাইল দূরে, মাঠের মাঝে এই ক্রসিং গেট। লাইনের পূব দিকের গ্রামটা কিছুটা কাছে। পশ্চিমের গ্রামটা একটা ঝাপসা কালো রেখায় মিশে থাকে আকাশের গায়ে। গেটের দুদিকে দুটো ঢালু সড়ক নেমে গেছে এঁকে বেঁকে, হারিয়ে গেছে মাঠ ও গ্রামের মধ্যে। চওড়া সড়ক। গরুর গাড়ির চাকার দাগে দুপাশে গভীর রেখা পড়েছে। আর চারপাশে সবুজ ফসলের ক্ষেত।

ক্রসিং-এর দুপাশে ঢালু জমিতেই গেটম্যানদের ঘর। এমনভাবে ঘর দুটো তৈরি হয়েছে, রেললাইনের উপর থেকেই লাফিয়ে ঘরের ছাদে চলে যাওয়া যায়। এপার থেকে ওপারের ঘর দেখা যায় না, ওপার থেকে এপারের না।

কাছাকাছি কোন বড় গাছপালা নেই। পাখির জটলা বড় একটা শোনা যায় না। এখানে সারাদিন প্রজাপতি ফড়িং রঙিন পাখা মেলে অবাধে উড়ে বেড়ায়। ঝিঁঝির গলা ফাটানো ডাক আরও ভারি করে তোলে নৈঃশব্দকে।

সারাদিনে লোকেরও যাতায়াত কম এই পথে। সকালে আর বিকালে দেখা যায় কিছু লোককে যেতে। হয়তো যায় কয়েকটা গরুর গাড়ি সারাদিনে। তাও গরুর গাড়িগুলোকে অধিকাংশ দিনই বেশ খানিকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কেননা এই সীমান্তের যারা প্রহরী, লাখপতি আর ঘামারি, তাদের যতক্ষণ দয়া না হবে, ততক্ষণ সীমান্তদ্বার খোলার কোন উপায় নেই।

তারা অবশ্য লোক খারাপ নয়। কিন্তু এই নির্জন গ্রামের সীমানায় চাকরি ছাড়া জীবন ধারণের যে আর মাত্র একটি দিক তাদের আছে, তা হল মল্লযুদ্ধ। সেজন্য দেহ তৈরি কাজটি তাদের সর্বাগ্রে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা যখন তাদের তৈল মর্দনের সময় কিংবা সকালের বুকডন বৈঠকের উত্তেজনায় চোখ লাল, মাথাটা অবসাদগ্রস্ত আর দেহের শিরায় শিরায় রক্তপ্রবাহ পাগলা গতিতে থাকে লাফাতে, তখন পাচনবাড়ি হাতে কোন গাড়োয়ানের 'খোলেন গো পবন-পো' শব্দ তাদের কানেই ঢোকে না।

পবন-পো কথাটি খুব শ্রদ্ধা ও ভয়ের সঙ্গেই গাঁয়ের লোকে তাদের বলে। তারাও সাগ্রহে ও আত্ম সন্তোষের সঙ্গে এই সম্মান গ্রহণ করে। কেননা পবন-পুত্র বলতে ভীম এবং হনুমানকেই নাকি বুঝিয়ে থাকে। লাখপতি আর ঘামারি, পরস্পরকে তারা ঐ শক্তিমান বীর দুজনেরই অংশ বিশেষ বলে মনে করে। আর দুই বীরেরই পূজারী তারা। বজরংবলী তাদের দেবতা। অর্থাৎ বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান।

কথাটা মিথ্যে নয়।

এই নির্জন পরিবেশে, লোকালয়ের বাইরে, দূর প্রান্তরে তারা দুই বন্ধু যেন গহন অরণ্যের দুটি জীব। এখানে এই পরিবেশে তারা একাত্ম ও মুক্ত।

লাখপতি এখানে এসেছিল তার বিশ বছর বয়সে। ঘামারি তার চেয়ে বড় বছর দুয়েকের। আজ দশ বছর ধরে তারা একত্র রয়েছে। এই দশ বছরের মধ্যে তারা কখনও ফারাক হয় নি। এই দশ বছরের মধ্যে পৃথিবীতে হয়েছে অনেক ওলটপালট। অনেক রাজ্য ভেঙেছে গড়েছে। অনেক মানুষ বেঁচেছে মরেছে। নদী ভিন্ন পথ ধরেছে, নতুন স্থলভূমি দেখা দিয়েছে, ঘটে গেছে ভৌগোলিক পরিবর্তন। এমন কি ঐ দূরের গ্রামগুলিতেও পরিবর্তন হয়েছে কিছু কিছু। কিন্তু এখানে কোন পরিবর্তন নেই। উদার আকাশের তলায় এই নির্জন লেভেল ক্রসিং-এর দুপাশে যেন পৃথিবীর কোন দুর্গম অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিকতা বিরাজিত।

পরিবর্তন যেটুকু হয়েছে, সেটুকু লাখপতি আর ঘামারির দেহে ও রক্তে। দিনে দিনে তাদের দেহের রূপ বদলেছে। সঞ্চিত হয়েছে রক্ত, স্ফীত হয়েছে মাংসপেশী। এখন ক্রমে বাধাহীন হয়ে উঠেছে যেন তাদের রক্তপ্রবাহ। দেহের মধ্যে সে অস্থির, প্রতি মুহূর্তে একটা ভয়ঙ্কর বন্যতা ফেটে পড়তে চাইছে। ক্রমশঃ অধ্যবসায়ে একদিন যা ছিল কোমল, সুন্দর ও সুগঠিত, আজ তা বন্য পাহাড়ের মত খোঁচা খোঁচা পাথর। তাদের প্রেম, ভালবাসা, তাদের হাসিখুশি, আলাপ আলোচনা সব এই দেহকে ঘিরে। এই দেহ ও পরস্পরের সঙ্গে মল্লযুদ্ধই বন্ধুত্ব। আর দিনে দিনে পরিবর্তন হয়েছে রেললাইনের তারের বেড়ার বাইরে তাদের মল্লভূমির প্রশস্ত স্থানটুকু। সেই মাটিটুকুকেও তারা দেহের মত ভালবাসে, দেহের মতই তার সেবা করে, তার প্রতিটি কণাকে তৈরি করে। এই মাটিতে তাদেরই গায়ের গন্ধ, তাদেরই ঘামে তাদেরই উত্তাপে শুকনো ও ঝুরঝুরে।

এবেলা ওবেলা দিনে ও রাত্রে কয়েকবার করে নিশান দেখানো, দেখানো নীল আলো, তাদের কাছে কোন কাজই নয়। মাসে তারা একবার করে সাত আট মাইল দূরের জংশন স্টেশনে যায় মাইনে আনতে। খোরাকি ও দরকারী বস্তু কিনে নিয়ে আসে তখনই। বাদবাকী দরকার দিনে একবার করে গাঁয়ে গেলেই মিটে যায়। তাদের দুজনের দুটো গরু আছে। কিনতে হয় নি, দিয়েছে পুষতে না পারা হা-ভাতে গাঁয়ের লোকেরা। গরু পুষতেও তাদের ভাবতে হয় না। লাইনের ধারে বেঁধে দিলেই জীব দুটির পেট ভরে। রাত্রে কিছু জাব আর জল। তাইতেই দুধটা তাদের লাভ। সকালের দুধটা একজন এসে নিয়ে যায়। বিকালের দুধ তারা তাদের কুস্তির পর, জলের মত কাঁচাই পান করে। রাঁধে খায় একসঙ্গে, রাত্রে শোয় আলাদা।

সকাল থেকে রাত্র পর্যন্ত, এই কাজগুলি সামান্য। কিন্তু এই নির্জন পরিবেশে যা একদিন প্রয়োজনের জন্য তারা আরম্ভ করেছিল আজ তা দারুণ নেশার মত জড়িয়ে ধরেছে রক্তের মধ্যে। অসামান্য হল দেহচর্চা। রাত পোহালেই রক্তপ্রবাহে জাগে কলরোল। দেহের মধ্যে আছে তাদেরই অপরিচিত আর একটা খ্যাপা জীব। সময়ের একটু এদিক ওদিক হলে, প্রতিটি ধমনীতে সে পাগলের মত খোঁচাতে থাকে, ছুটোছুটি করে।

তখন আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। তখনি ল্যাঙট এঁটে তুলসীমঞ্চের গর্তে সযত্নে রক্ষিত হনুমানের ছোট্ট মূর্তিটিকে নমস্কার করে বুকডন বৈঠকে মেতে যায় তারা। বিকাল না হতেই আবার সেই বজরংবলীর পূজা, তৈলমর্দন, ব্যায়াম ও মল্লযুদ্ধ। মল্লযুদ্ধের শেষে দুধের মধ্যে বাটা সিদ্ধি মিশিয়ে খায়। খেয়ে গরিলার মত রক্তবর্ণ দুটো চোখে স্নেহ ও সোহাগ ভরে দেখে শুধু নিজেদের দেহ। যেন তাদেরই পোষা দুটি অতি স্নেহের জীব এই দেহ দুটি।

এই সময়ে তাদের অতি ভয়ঙ্কর দেখায়। মাথা আর ঘাড় তাদের সমান হয়ে

উঠেছে। কোথাও যেন উঁচু নিচু নেই। কান দুটোও আঘাতে আঘাতে দুমড়ে চেপ্টে যেন অনেকখানি মিশে গেছে। মল্লবীরদের নিয়ম তাই। কান পিটিয়ে পিটিয়ে একটা ড্যালা ডুমড়ি গোছের করে ফেলতে হয়। সেই কানে আবার অতি যত্নে পরানো আছে সোনার মাকড়ি। নাকগুলো চেপটে এঁকে বেঁকে গেছে। চোখের কোল ও গালের মাংস শক্ত ও ফোলা, চোখ দুটো ঢাকা পড়ে গিয়েছে কোটরে। ঘাড়ের মাংসপেশী যেন নিয়ত আক্রমণোদ্যত ভল্লুকের মত ঠেলে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে সামনের দিকে।

তারা ব'সে থাকে মুখোমুখি। আর তাদের মুখোমুখি হাঁ করে চেয়ে থাকে মাঠ, বন, সর্পিল সড়ক আর আকাশ। তাদেরই ক্লান্তি ও অক্লান্তিতে বিরতি দিয়ে দিয়ে ডাকে ঝিঁঝি।

তখন ঘামারি হয়তো বলে, 'আচ্ছা লাখুয়া, ভীমের চেহারাটা কি রকম ছিল বলতে পারিস ?'

কথাটার মধ্যে কোন ঠাট্টার আভাস নেই। লাখপতি একটু ভেবে বলে, 'ঠিক বলতে পারছি না। তবে শুনেছি দৈত্যের মত। তা নইলে আর হিড়িম্বা রাক্ষসীকে মেরে ফেলেছিল ?'

ঘামারি বলে, 'হুঁ, ঠিক।'

ভীম হনুমান, এদের নিয়ে প্রায়ই তারা এ রকম আলোচনা করে। ইচ্ছে করে নয়। আপনি ও সব কথা তাদের মনে আসে।

কোন সময় হয়তো লাখপতি বলে, 'জানিস ঘামারি, আমার মনে হয় মহাবীর হনুমান আমাদের জরুর দেখ্‌ভাল্‌ করে, আসে এখানে।'

অমনি ঘামারির ভাং নেশাচ্ছন্ন লাল চোখ দুটো ওঠে চকচকিয়ে, বলে, 'হ্যাঁ রে, আমারও শালা ও রকম মনে হয়।'

বলতে বলতে আপনা আপনিই তাদের বিশাল দেহের মাংসপেশীগুলি নাচতে থাকে। তখন ঘামারি বলে, 'আমার কি মনে হয় জানিস। এ রেললাইনের জমিটা আমি একলাই সিরিফ গর্দানের ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতে পারি। কেন বল তো ?'

লাখপতি বলে, 'কি জানি মাইরি। আমারও শালা ও রকম মনে হয়। মনে হয়, দুনিয়াটা বেমালুম হালকা। ঘাড়ে করে নিতে পারি।'

সত্যি, দেহে তাদের এত শক্তির প্রাচুর্য যে, শুধু নেশা নয়, এমনি একটা অপরিসীম ক্ষমতা অনুভব করে তারা। এই প্রচণ্ড শক্তি একসঙ্গে জমাট হয়ে যেন আগুনের মত ঠিকরে পড়ে তাদের চোখে। দেহ তাদের গৌরব, তাদের সব।

তখন হয়তো ঘামারি বলে, 'আয়, আর একবার লড়ি।'

লাখপতি বলে, 'সেই ভাল।'

কিন্তু আবেগবশত যেদিন লড়ে, সেদিন সময়ের কোন স্থিরতা থাকে না। অন্ধকারে শুধু দুপদাপ, হঠাৎ চাপা হুঙ্কারের তীক্ষ্ন শব্দ, জন্তুর নিঃশ্বাসের

ফোঁসফোঁসানি রাত্রিটাকে চমকে দেয়। বিমূঢ় অন্ধকার ও নক্ষত্রখচিত আকাশ চেয়ে থাকে হাঁ করে। আর অন্ধকারেও তাদের ঘর্মাক্ত শরীরে এমন একটা চমকানি দেখা যায় যেন, পাথরের ঘর্ষণে জ্বলে ওঠে আগুনের ঝিলিক। কখনো শুধু মাথা ঠোকাঠুকি করে পরস্পর। তখন মনে হয়, লেঠেলদের লাঠি ঠোকাঠুকি হচ্ছে।

এই দৈহিক শক্তির খেলাই তাদের নেশা। তাদের মাতামাতিতে রাত্রিচর বাদুড়-গুলিও দূর দিয়ে উড়ে যায়, জানোয়ারগুলি ফারাক দিয়ে পাশ কাটায়। কারণ প্রকৃতির গড়া ভয়ঙ্করের মতই তাদের তখন দেখতে হয়।

এই দশ বছর কেউ তাদের কোথাও যেতে দেখে নি। গায়ের লোক জানত তাদের কেউ নেই। তারাও সেই রকমই জানত বোধ হয়। কেননা তাদের মুখে কেউ কখনো অন্য কথা শোনে নি। গাঁয়ের সঙ্গে তাদের সম্পর্কও কম। কেবল মাঝে মাঝে গাঁয়ের ছেলেরা আসে তাদের কুস্তি দেখতে। তাও ভয়ে ভয়ে। তাদের এই নীরস দেহ সাধনা মানুষের কাছ থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে। নীল পুজোর দিন, গাঁয়ের মেয়েরাও আসে। আর সপ্তাহে একদিন, শুক্রবার কিছু ভিড় হয়। ওইদিন হাটবার, ক্রসিং পেরিয়ে যেতে হয় হাটে, সেইজন্যই ভিড়।

লোকে যেমন জানত, তাদের কেউ নেই, তারাও সেই রকম বিশ্বাস করত। কেননা, ঘামারির বউ মরে গেছে দেশে থাকতেই। তার আর কেউ নেই। তারপর থেকে সে এখানে আছে।

লাখপতিও পিতৃমাতৃহীন। ভাইবোনও নেই। ভগবান জানে, তার বাপ মা কি ভরসায় তার নাম রেখেছিল লাখপতি। পাঁচ বছর বয়সে তার বিয়ে দিয়ে দশ বছর বয়সে বাপ মা তাকে সংসারে একাকী করে রেখে গেছে। না ঘর, না ক্ষেতি জমি। ভাগ্যি ভাল, খুড়ো ছিল শিয়ালদহ লোকোর কুলি। সে বেঁচে থাকতেই জুটিয়ে দিয়েছিল কাজটা। পাঁচ বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল। নিয়ম হচ্ছে বর কনে বড় হলে, জোয়ান হলে গাওনা হয়। ওইটিই আসল বিয়ে। তখন থেকে স্বামী স্ত্রী একসঙ্গে ঘর করে। কিন্তু লাখপতির ভাগ্যে তাও ঘটে ওঠে নি। কি দিয়ে গাওনা হবে, বউ আসবে কোথায়?

তারপরে কাজ জুটেছে এই বাংলাদেশে। কেউ তাকে দেশে আজ অবধি ডাকে নি, সে-ও যায় নি। বউটাকে হয়তো আর কেউ ঘরে তুলেছে, কিংবা বাপ-মা বিক্রি করে দিয়েছে কাউকে। কিন্তু সে-কথা দশবছরে দশবারও তার মনে পড়েছে কিনা সন্দেহ। এমন কি পাঁচ বছরের সেই স্মৃতির কণাও নেই তার মনে।

নারী সংক্রান্ত কথাবার্তা তাদের আলোচনায় খুব কম। ওদিক থেকে তারা নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। গাঁয়ের কোন মেয়ের সঙ্গে দেখা হওয়া ও মেশার অবসর নেই তাদের। তারা আছে তাদের কাজ, দেহচর্চা ও মল্লযুদ্ধ নিয়ে। তারা শোনে শহরের মল্লযোদ্ধাদের কথা। তারা শহরে গেলে শহরের লোকেরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে।

তবু তাদের এই অসীম শক্তি ও বিশাল দেহটার মধ্যে কি যেন আটকা পড়ে আছে। যেন একটা খাঁচায় পোরা পাখি ছট্‌ফট্‌ করছে সব সময়েই মুক্তির জন্য। কিন্তু এই পরিবেশ ও দেহ ভেদ করে সে কখনোই বাইরে আসতে পারে না। এ যে কিসের বন্ধন, তারা জানে না। তবু একটা দুর্বোধ্য আবেগ আসে তাদের মনে। তা-ও এতই ক্ষণস্থায়ী যে, আবার তারা মল্লভূমিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ক্লান্ত হলে পড়ে ঘুমিয়ে। ঘুম ভেঙেই গর্ব ও আনন্দভরে তাকায় পাহাড়ে বুকের দিকে, নাড়া দেয় মাংসপেশী। যেন পাথর কাঁপছে। তারপর আধ-ঘুমন্ত, আড়-মাতালের মত কাজে হাত দেয়।

দেহ প্রধান। মস্তিষ্ক যেন কোন কুলুপ কাঠি দিয়ে আটকানো, অবসাদগ্রস্ত নিষ্ক্রিয়। হৃদয়টাও কেমন যেন আবদ্ধ অন্ধকার। এই তাদের জীবন।

এমনি অবস্থায় একদিন, হেমন্তের মাঝামাঝি এক দুপুরে গাঁয়ের ডাকঘরের পিয়ন এসে ডাকল, 'কই গো পবন-পো দাদারা।'

জবাব এল, 'এখুন দরজা নাই খোলা যাবে গো।'

পিয়নটাও অবাক হয়েছিল। চিঠি দেখে হাঁক দিল আবার, 'লাখপতি চামারিয়া কে আছেন গো আপনাদের মধ্যে?'

লাখপতি চামারিয়া? দুই মল্লবীরই উঠে এল দিবানিদ্রা ছেড়ে। তারাও ভারি অবাক।

লাখপতি বলল, 'কি হয়েছে?'

'আপনার নাম লাখপতি চামারিয়া?' এ গ্রাম্য বাঙালী পিয়ন চামারিয়া পদবীটা একটা বর্ণহিন্দুর পদবী ঠাউরেছে বোধ হয়।

লাখপতি ঃ 'হাঁ। হাঁ।'

'আপনার একটা চিঠি আছে।'

'ইংলিশ চিঠি?'

'না। হিন্দি।'

বোঝা গেল অফিসের নয়। লাখপতি আর ঘামারি মুখ চাওয়াচাওয়ি করে, মাটি কাঁপিয়ে গিয়ে চিঠিটা নিল। পড়বে কে? ঘামারি সামান্য পড়তে জানে। তবে দেহাতী অক্ষর। সৌভাগ্যের বিষয় চিঠিটা ধুলোকাদামাখা দোমড়ানো হলেও দেহাতী ভাষায় লেখা।

পিয়ন বলল, 'ছ'মাস আগে চিঠিটা আপনাদের হেডঅফিসে এসেছে, এখানকার ঠিকানা নাই কি না। তা কি বিত্তান্ত?'

দুজনেই তাড়াতাড়ি খাটিয়া পেতে পড়তে বসল। প্রথম অক্ষরটি পড়তে প্রায় পাঁচ মিনিট লাগল। পিয়ন বিদায় হল হতাশ হয়ে।

বিকালের দিকে চিঠি শেষ হলে তারা অবগত হল, চিঠিটা দিচ্ছে লাখপতির বিধবা খুড়ি। বক্তব্য, সে এবার মরবে। আশা করছে, এতদিনে লাখপতি গুছিয়ে নিয়েছে। সে যেন তার বউকে এবার নিয়ে যায়। বউ খুড়ির কাছেই আছে। তাই উপদেশ হচ্ছে, জোয়ান আওরৎ, খর নদীর নৌকা। মাঝি হাল না ধরলে এবার তরী যাবে। অতএব আর দেরি নয়।

দুজনেই তারা তাদের এবড়ো-খেবড়ো মুখ দুটো আরও ভয়ংকর করে বসে রইল। জীবনে একটা বাধা এসে উপস্থিত হয়েছে। নিতান্ত আচমকা। হোক দেহের মধ্যে সীমিত তবু জীবন তাদের ওখানেই পরিপূর্ণ। দেহের নানা স্থানে কতগুলি মাংসপেশী ফুলে উঠে অস্বস্তিতে থমকে রইল।

ঘামারি বলল, 'আওরৎ ?'

লাখপতি বলল, 'এখানে ?'

একটা ধিক্কার দেখা দিল তাদের চোখে, কিন্তু এদিকে বিকালের অস্থিরতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল তাদের রক্তধারায়। কথা অসমাপ্ত রেখে নেশার ডাকে সাড়া দিতে চলল তারা। দুজনেই ঝাঁপিয়ে পড়ল নরম মল্লক্ষেত্রে।

তারপর রাত্রে যখন দুধ সিদ্ধি খেয়ে বসল দুজনে, তখন এই ভাবনা ঘিরে এল আবার তাদের মনে। দেহকে ঘিরে তাদের ঘোর স্বার্থপরতা, পৃথিবীর সাব সর্বদিক থেকে এমনই ভাবে বিমুখ করে রেখেছে চোখ ও মন। তাদের দেহ সাধনার যে পরম আনন্দ, তাতে নিরানন্দের অন্ধকার ঘন হয়ে আসছে। এই দেহ• থাকলে তার সুখ, পরমায়ু ও ভগবান। আওরৎ তো তাতে শুধু ক্ষয় ধরিয়ে দেবে।

অন্ধকারের মধ্যে পরস্পরকে একবার দেখল। তারপর স্থির হল, এটা নিশ্চয়ই মহাবীরের ইচ্ছা। সুতরাং আনতেই হবে। তবে লাখপতি তার এই দেহের ভাগ তাকে দেবে না। দুই বন্ধু এই স্থির করল। বউ থাকবে নিজের কাজ নিয়ে।

তারপর ছুটি নিয়ে লাখপতি দেশে গেল। নিয়ে এল বউ।

ছাব্বিশ বছরের এক মেয়ে, নাম তার উরাতীয়া। খুড়ি শাশুড়ীর ঘরে ক্রীতদাসীর মত খেটে খাওয়া মেয়ে। স্বাস্থ্য ও যৌবনে পূর্ণ তার সুগঠিত দেহ। বেশ আঁটো, সামান্য খাটো, রংটা আধা ফরসা। রূপসী বলা যায় কিনা জানি নে। তার নিরাভরণ শরীরের পুষ্ট হাত পায়ের গোছায় একটা বিহারী রুক্ষতা, কিন্তু চোখ দুটি ভরা কালো দীঘির মত ভাসা ভাসা অথচ গভীর। আর হয়তো প্রথম স্বামী সাক্ষাতের গোপনলীলায় একটা দুর্বোধ্য হাসি তার গালের টোলে।

একটা হলদে শাড়ির ঘোমটা টেনে সে এল লাখপতির সঙ্গে, হাতে পুঁটুলি ঝুলিয়ে। এল নির্জন মাঠের বুকে, লেভেল ক্রসিং-এর ঢালু জমির কোলে গেটম্যানের ঘরে। একদিন যাদের পদক্ষেপে ঘরটা কাঁপত, আজ আর একজনের পদসঞ্চারে সেই ঘর নিঃশব্দ, কিন্তু বিচিত্র শিহরণে, পুলকে ভরে উঠল। মল্লবীরের সাজানো গোছানো গুমোট ঘরে আলো এল, হাওয়া বইল।

ঘামারি এসে দাঁড়াল। লাখপতি দু হাতে জড়িয়ে ধরল তাকে। বুকে বুক ঠেকল। কয়েকদিনের যন্ত্রণাকাতর চাপা পড়া রক্তধারায় জোয়ার এল আবার। তারপর দুই মল্লবীর চোখ দিয়ে চেটে চেটে দেখল দুজনকে। উজ্জ্বল হয়ে উঠল দু জোড়া চোখ।

লাখপতি বলল, 'চল, একবার দেখা যাক।'

ঘামারি বলল, 'তুই দেখিস নি?'

লাখপতি বলল, 'ধু-স্ শালা, মনেই হয় নি। চল্ একসঙ্গে দেখিগে।'

ঘামারি: 'কি আর দেখব? আওরৎ আওরৎ।'

লাখপতি: 'তবু একবার—'

দুজনে হাত ধরে ঘরে ঢুকল। উরাতীয়া বসে রয়েছে ঘোমটা টেনে। তারা দুজনে বসল অদূরের খাটিয়ায়। উরাতীয়াকে দেখে আর চোখাচোখি করে।

একটু পরে উরাতীয়া ঘোমটা তুলে খুব ধীরে ধীরে মুখ ফিরিয়ে তাকাল তার কালো চোখে। দুজনের সঙ্গে তার চোখাচোখি হতেই শান্ত অথচ মিঠে হাসি চমকে উঠল তার চোখে ও গালের টোলে। মাথাটি গেল নেমে। রুক্ষ খোঁপাটা ভেঙে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে।

হাসি দেখে অবাক বিস্ময়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল মল্লবীরেরা। আবার উরাতীয়ার চোখ উঠল, দূরে মেঘে যেন হালকা বিদ্যুৎ চমকালো মিঠে হাসির। বিশাল দেহ বন্ধু আবার মুখ চাইল পরস্পরের।

তারপর হেসে উঠল। হাসতেই লাগল উচ্চরোলে। যেন এক রুদ্ধধারা হঠাৎ মুক্ত হয়ে অনর্গল বয়ে চলল অট্টরবে। আর সেই অট্টরবের সঙ্গে এক বিচিত্র সুর যোজনা করল নূপুর নিক্কণের মত চাপা গলার খিলখিল হাসি। থরথর করে কেঁপে উঠল উরাতীয়ার শরীর ও ভাঙা খোঁপা।

এমনই অভাবনীয়, অচিন্তনীয় এই বিচিত্র হাসির রোল যে, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ক্রসিং গেটের এই চারপাশের সীমা, তার বনপালা সড়ক ও আকাশ থমকে রইল এ মুহূর্তে। পরমুহূর্তেই হেমন্তের অপরাহ্ন নেচে উঠল হাওয়ায়। ইতিহাসের যুগ ফিরে এল যেন সমস্ত পরিবেশটায়।

আজ এল মাঠের পাকা আমনের গন্ধ, গাভীর হাম্বা রব, মাঠের মানুষের হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি। আর আশ্চর্য! এই কান পেটানো, নাক থ্যাবড়ানো, চাঁছা মাথা, এবড়ো খেবড়ো মুখ এই পাহাড়ে মানুষ দুটোকে দেখে একটুও ভয় পেল না গেঁয়ো উরাতীয়া। সে সমান তালে হেসে হাসিয়ে এক নতুন রং ছড়িয়ে দিল এখানে। তারপর খুলে ফেলল তার পুঁটলি।

কণ্ঠরোল থামল। কিন্তু যেন যুগ যুগান্তরের চাপা পড়া হাসি কাঁপতে লাগল মল্লবীরদের পেশীতে পেশীতে, হাসতে লাগল গর্তে ঢোকানো চোখ। নিজেদের হাসিতে তারা নিজেরাই বিস্মিত। কৌতূহলিত হয়ে তারা দেখল

আবার উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া পুটুলি খুলে বার করেছে বাঁকমল। পরেছে পায়ে। এইটুকু তার বাপের বাড়ির সম্বল। লুকিয়ে রেখেছিল খুড়ি শাশুড়ীর ঘরে এসে। আসল লোকের ঘরে এসে একদিন সে পরবে, এই ছিল সাধ। আজ তা পূর্ণ হল।

মল পায়ে উঠে দাঁড়াল সে। অসঙ্কোচে ঘুরল সারাটি ঘর। আপন মনে হেসে হেসে দেখল চারদিক। রাবণের লঙ্কা পোড়ানো, গন্ধমাদন বহন, বুক চিরে দেখানো রামসীতা, এমনি ছ'সাত রকমের শুধু মহাবীর হনুমানের ছবি টাঙানো আছে ঘরটায়।

তারপর বাইরে এসে দাঁড়াল উরাতীয়া। দুই মল্লবীর বন্ধুও উঁকি মেরে দেখতে লাগল এই অদ্ভুত ব্যাপার। উরাতীয়া গিয়ে দাঁড়াল তুলসীমঞ্চের কাছে। নীচু হয়ে দেখল মহাবীর হনুমানের মূর্তি। সেখানে গড় করল। মল্লক্ষেত্রের চারপাশে দুই বন্ধু লাগিয়েছে বেল ও গাঁদার চারা। সৌন্দর্যের জন্য নয়। মল্লক্ষেত্রের পবিত্রতার জন্য। হনুমানজীর পুজোর জন্য। কয়েকটা গাঁদা ফুল ফুটেছে এর মধ্যেই।

উরাতীয়া টপাস করে ছিঁড়ল একটি ফুল। আড় চোখে দেখল দুই পুরুষকে। তারপর লাইন পেরিয়ে নেমে গেল ওপারে। গিয়ে খোঁপায় গুঁজে দিল ফুলটি।

দুই বন্ধু এগিয়ে উঁকি দিল। দেখল, উরাতীয়া ঘামারির ঘরটিও •দেখছে ঘুরে ঘুরে। তার ঘোমটা গেছে খসে। বাইরে এসে দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই লজ্জার বিচিত্র রাগে হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

আর একটা হাসির উচ্চরোল পড়ল ফেটে। কেন, তারা নিজেরাই জানে না। কেবলই হাসি আসছে, হাসি পাচ্ছে। প্রাণ চাইছে, ভাল লাগছে।

তারপর দেখা গেল তাদের গায়ে আঁচলের হাওয়া দিয়ে উরাতীয়া দুলে দুলে চলে গেল পুবের সড়কের পাশে ছোট্ট পুকুরটিতে। স্নান করে এসে, কাপড় পরে খুঁজে পেতে বের করল দুধের বালতি। গাইয়ের বাট দেখে সে টের পেয়েছে সময় হয়েছে দুইবার। মরদগুলোর সে খেয়াল নেই, কোন দিন ছিল নাকি।

একটা নয়, ঘামারির গরুরও দুধ দুইল সে। দুয়ে অবাক-মুগ্ধ মল্লবীর পুরুষদের সামনে এসে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'উনুন কোথায়? আগুন দেব।'

দুই বন্ধু বিস্ময়ে চোখাচোখি করল। চোখে চোখেই তাদের কথা। পরস্পরের চোখের দিকে তাকালেই তারা মনের ভাব বুঝতে পারে। মল্লক্ষেত্রে ঐ শিক্ষাটি তারা আয়ত্ত করেছে। তাদের চোখ বোবা জানোয়ারের মত বলাবলি করছিল, 'এ সব কি হচ্ছে? সত্যিই কি আমাদের জীবনে একটা নতুন কিছু ঘটতে বসেছে? একটা কোন সর্বনাশ কিংবা সুখের ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে?' তবু

তাদের মস্ত বুক দুটিতে একটা খুশির বন্যা পাক দিয়ে উঠছে।

ঘামারি বলল, 'তোর উনুনটা বের করে দে।'

লাখপতি, বলল 'কেন? তোরটা কি হল? তোরটাই দে।' বলেই আবার কি হল তাদের, তারা হেসে উঠল। এক নাম না জানা মদির রসে আকণ্ঠ ভরে উঠেছে তাদের। একটা মাতলামির ঘোর লেগেছে মনে।

শুধু তাদের মাঝে হাসি উচ্ছল উরাতীয়ার গা বেয়ে যেন একটা মানুষিক মোহের ঝরণা পড়তে লাগল গড়িয়ে গড়িয়ে।

উনুন ধরল। ঘামারির ঘরে রান্না হত এতদিন দুজনের। এবার তিনজনের রান্না চাপল লাখপতির উঠোনে।

ঘামারি তেল আর ল্যাঙট নিয়ে এল। লাখপতির চাপা রক্তে লাগল ঢেউ। দুজনে ঝাঁপিয়ে পড়ল মল্লক্ষেত্রে। এতদিন শুধু মল্লযুদ্ধের জন্য মল্লযুদ্ধ হয়েছে। এতদিন শুধু নানান কায়দা ও চাপা হুংকার উঠেছে ভয়ংকর শক্তির ঘোরে। আর থমকে থেকেছে চারিদিকের পরিবেশ।

আজকের লড়াই উল্লসিত। আজ প্রাণখোলা উল্লাসের বান ডেকেছে মল্লক্ষেত্রে। রান্না চাপিয়ে থেকে থেকে এসে দাঁড়াচ্ছে উরাতীয়া। কখনো বাঁকা হয়ে, সোজা দাঁড়িয়ে, ঘোমটা তুলে ও খুলে, চোখ বড় বড় করে নয়তো খিলখিল হাসির বাজনা বাজিয়ে দেখছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই অসংকোচে দিয়ে উঠেছে হাততালি।

মাঝে মাঝে শঙ্কিত হয়ে লক্ষ্য করছে কার ক্ষমতা বেশি। আশ্চর্য! কেউ কাউকে আঁটতে পারছে না। ঘামারিকে ফেলে লাখপতি তার ঘাড়ে মাটি ফেলছে আর হাঁকাচ্ছে রদ্দা। তারপর বগলের তলায় হাত দিয়ে চেষ্টা করছে উল্টে ফেলতে। পারছে না। আবার পাল্টা লাখপতিকে নিয়ে চলল চেষ্টা। হল না।

তখন আবার হাসি। তিনজনের হাসি। এতদিন এই সন্ধ্যাবেলার উঁচু জমিটার উপরে, আকাশের কোলে দেখা যেত দুটি দানবের মূর্তি। আজ একটি বিচিত্র রূপের দ্যুতি মূর্তি ধরে দাঁড়িয়েছে তাদের মাঝখানে। আজ তারাও যেন ধরেছে মানুষের মূর্তি। মানুষিক স্বপ্নের ঘোর লেগেছে আজ এখানে।

তারপর দিন চলে গেল। একটা নতুন যুগের নবরূপায়ণের সূচনা ঘটল।

উরাতীয়া ছোট ঘরের মেয়ে ও বউ। ক্রীতদাসী ছিল খুড়শাশুড়ীর ঘরে। নিষিদ্ধ যৌবন বাসর থেকে নিয়ত হাতছানি দিয়ে ডেকেছে তাকে। যেমন ডাকত আরও অনেককে। যেতও অনেকে। সে প্রতীক্ষা করে ছিল একজনের জন্য।

এখানে এসে তার ছাব্বিশ বছরের পিপাসিত যৌবন প্লাবিত হল। সেই প্লাবনের ধারায় পলি পড়ল এখানকার মাটিতে, দুটি মল্লবীর মানুষের হৃদয়ে।

সে একজনকে দিয়ে খুশি, পেয়ে খুশি আর একজনকে। লাখপতি তার ষোল আনা জীবন ও যৌবনের দেবতা। ষোল আনার হিসেবের পর যেটুকু মানুষকে করে নিঃশঙ্ক, বুকে আনে বল, তার সেটুকু হল ঘামারি। ঘামারি তার সহচর। তারা তার প্রেম ও প্রীতি, ভালবাসা ও সৌহার্দ্য, সুখ ও দুঃখ।

দেবতা ও সহচর, দুই মল্লবীরের মনে সে বোধ ছিল না। অবোধ খুশিতে রচিত হয়েছে তাদের নতুন জীবন। তারা এতদিন শক্তি অনুভব করেছে মাংস-পেশীতে। এবার হৃদয়ে হৃদয়ে। তাদের বিশাল শক্তিশালী শরীরের মধ্যে যে বন্দী বিহঙ্গটা এতদিন ছটফট করেছে, সে অকস্মাৎ মুক্ত হয়ে ঝাঁপ দিয়ে স্নান করে নিল এক মুক্ত ফল্গুধারায়। জানত না, বন্দীর এই মুক্ত ফল্গুধারা হল উরাতীয়া।

এখন কুস্তির শেষে, যখন তারা দুজন দুধ সিদ্ধি খেয়ে হাওয়ায় বসে দোলে, তখন তাদের মাঝখানে এসে বসে উরাতীয়া। আগে তাদের মস্তিষ্ক থাকত অবসাদগ্রস্ত আর শরীরে বইত রক্ত। এখন মস্তিষ্কের একটা নতুন টঙ্কার অনুভূত হয়।

উরাতীয়া বলে ঘামারিকে, 'তারপর সে-কথাটা বল। তোমার বউ কেমন করে মরল ?'

মহাবীর, ভীম নয়, কুস্তি কায়দা নয়, বউয়ের কথা। ঘামারি বলল, 'কি আর বলব।'

লাখপতি বলে, 'বল না। আমি তো কোন দিন শুনি নি ?'

উরাতীয়া ব্যথা পায়, অবাক হয়। বলে, 'সচ্। ও মা এত বন্ধুত্ব আর এ কথাটা কোন দিন বলা কওয়া হয় নি ?'

তারপরই ঠোঁট ফুলিয়ে অভিমান ভরে বলে উরাতীয়া, 'যাও। তোমরা যেন কি ?'

বলতে বলতে চোখ ছলছলিয়ে ওঠে তার। আর ওই কথা, ওই জলটুকু তাদের গলায় একটা বিস্মিত ব্যথা ও আনন্দের গোঙানি এনে দেয়। সত্যি তারা অনেক কথা এতদিন বলেছে, হেসেছে। কিন্তু এমন বিচিত্র হাসি ব্যথা ও আনন্দ, এত অজানিত সুখ দুঃখ হৃদয়ের ছোটখাটো অসামান্য বিষয়ের আদান-প্রদান হয় নি।

অনেক কথা, অনেক হাসি, এমন কি কোন কোন রাতে মোটা ও হেঁড়ে গলায় বেসুরো গান পর্যন্ত শোনা যায়।

ধোকে কে নিউ' পর
ইমারৎ নহি বনতে ॥

অর্থাৎ মিথ্যার ভিতে সত্য দাঁড়ায় না। এ গানটা লাখপতি শুনেছিল কোন্ কালে মাইনে আনতে গিয়ে জংশন স্টেশনে। হনুমানের কীর্তিগাথা নয়,

হিড়িম্বা বধের কাহিনী নয়, একেবারে সত্য কথা। তাও এতদিন পরে।

বেসুরো ও হেঁড়ে গলার জন্যেও তাদের তিনজনের হাসির অন্ত ছিল না। কখনো ঘামারি সব উদ্ভট হাসির গল্প করে। ছেলেমানুষের মত উৎকট অঙ্গ-ভঙ্গ করে নাচে। কোন কালে দেখা এক সিনেমার নায়ক নায়িকার অভিনয় করে দুজনে দেখায় উরাতীয়াকে।

উরাতীয়া হেসে বাঁচে না। বলে, ছি ছি! দূর দূর। তারপর আদুরে মেয়ের মত বলে, 'আবার দেখাও না?'

আর দুই মল্লবীর তাই করে। পবন-পোয়েরা যে এত সরল ও হাসি উচ্ছল, তা জানত না গাঁয়ের মানুষেরা। রাক্ষসের মূর্তির মধ্যে মানুষের দেখা পেয়ে, তারাও যাওয়া আসা করতে থাকে।

কিন্তু তাদের দশ বছরের ঘুণধরা রক্তে লুকিয়ে ছিল এক ভয়ঙ্কর বিষধর। লুকিয়েছিল নিতান্ত দেহসাধক, সংসার ও ভালবাসা বিমুখ মল্লযোদ্ধাদের মনের অগোচরে। সুযোগ বুঝে সে কুণ্ডলীর পাক খুলতে লাগল।

এত সুখ কথা ও হাসি। এত বন্ধুত্ব। তবুও মল্লযোদ্ধাদের কোথায় চাপা ছিল আগুন. সে এবার থেকে থেকে জ্বলে জ্বলে উঠল আড় কটাক্ষে, শুধু চোখে চোখে। চোখে চোখে ভাব বিনিময়ে ছিল তারা দুরন্ত ও অভ্যস্ত আজও তার ব্যাতিক্রম হল না।

যে মুক্ত ফল্গুধারায় স্নান করে তারা দু দিন হেসেছিল অনর্গল, সে হাসি আড়ষ্ট হয়ে গেল। ওই মুক্ত ফল্গুধারাটা তাদের কাছে শুধু ছাব্বিশ বছর বয়সের একটি যৌবন ঝলকিত দেহ। মুক্ত আনন্দ, পাশব কামনার একটি যন্ত্র। দশ বছর ধরে তারা শুধু দেহের সেবা করেছে, দেহকে ভালবেসেছে। দেহাশ্রিত প্রবৃত্তি বার বার তাদের ওই দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কবে ছিঁড়ে গেছে টেরও পায় নি। যে ভয়ঙ্কর দৈহিক শক্তি তাদের মিলনের সূত্র ছিল, আজ তা পরস্পরকে আক্রমণে উদ্যত করল।

তারা মুখে কিছু বলল না। কিন্তু একজনের চোখে, 'খবরদার! এদিকে নয়।' আর একজনের, 'নয় কেন?'

কিন্তু তারা লড়ে রোজ। খায় একসঙ্গে, গল্প করে। তবু যেন জমে না। হাসিটা যেন ধাক্কা খেয়ে খেয়ে বেরোয় গলা দিয়ে।

অবাক হয় উরাতীয়া। সব না বুঝলেও এটা বোঝে অদৃশ্যে কি যেন ঘটছে। ওরা হঠাৎ এমন হচ্ছে কেন? জিজ্ঞেস করলেই ওরা দুজনেই বোকার মত হেসে ফেলে। আসর জমে উঠতে চায়। উঠতে পারে না।

সেই প্রাগৈতিহাসিকতা আরও নিষ্ঠুর রূপে যেন ফুটে উঠছে। অবাক হয়ে চেয়ে দেখে উরাতীয়া। বোঝে না। বোঝে না, কেবল আড়ালে নিঃশব্দে

কেঁদে মরে। ওরা আমার দেবতা ও সহচর। ওরা দু দিন হাসল। কিন্তু আমি আসার আগেও কি ওরা এমনিই ছিল? মনে হয় নি তো? তবে?

ঘরের মধ্যে রাত্রে লাখপতির চেহারাটা বদলে যেতে লাগল। তার সোহাগ হয়ে উঠল নিষ্ঠুর। আদর হয়ে উঠল ভয়ঙ্কর। অসহ্য আদরে সোহাগে উরাতীয়ার দেহটার উপরে একটা ভয়ঙ্কর প্রতিশোধের আকাঙ্খা যেন তার।

আর ঘামারি সেই সময়, অনেক রাত্রে ঢালু সড়কের পাশ থেকে উঠে আসে একটা ক্ষিপ্ত ভল্লুকের মত। দাঁড়িয়ে দেখে লাখপতির বন্ধ ঘরটার দিকে। যন্ত্রণা কাতর জানোয়ারের মত বুক থেকে ফেটে পড়া শব্দটাকে চেপে ধরে কণ্ঠ-নালিতে। কান পাতে দেয়ালে।

কোন শব্দ নেই। মাঘের উত্তুরে হাওয়া তার গায়ে ও দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে যায়।

শুকিয়ে উঠল উরাতীয়া। লাখপতিকে তার কিছু অদেয় ছিল না। ঘামারির একাকী জীবনের বেদনাই ছিল তার প্রীতি ও সৌহার্দের গৌরব।

আড়ালে যদি সে জিজ্ঞেস করে লাখপতিকে, 'কি হয়েছে তোমাদের?' লাখপতি শুধু চেয়ে থাকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গ, তারপর হঠাৎ খপ্ করে উরাতীয়াকে ধরে ভয়ঙ্কর আদরে দলা পাকিয়ে ফেলে। সে আদরে শুধু একটা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় রক্তের মধ্যে।

ঘামারিও যেন তেমনি। জিজ্ঞেস করলে তেমনি করে চেয়ে থাকে। কিন্তু গায়ে হাত দেয় না। দিতে চায় যেন উরাতীয়া ভয় পায়।

একই রকম দুজন। একই চাউনি ও চেহারা। কাছাকাছি থাকলেও এক সময় আলাদা করা যায় না ওদের। একই চালে ওরা দুজন চলেছে।

তবু ওরা লড়ে। শুধু লড়ে। মহাবীরকে প্রণাম করে হাত মেলায়, তারপর লড়ে। তবু ওদের চোখে চোখ মিললেই, পাথরের ঘর্ষণে যেন আগুন ঠিকরোয়। লড়তে লড়তে ক্ষিপ্ততা দেখা দেয়, মুহুর্মুহু নতুন নতুন আক্রমণ চালিয়ে যায়।

উরাতীয়া যেন কেমন করে বুঝতে পারে, লড়াইটা অন্য পথ ধরছে। এই কয়েক মাসের মধ্যে বুঝেছে। সে বাধা দেয়, থামতে বলে।

ওরা থামে। ছেড়ে আসে মল্লক্ষেত্র। কিন্তু ওদের ভেতরে দুটো জানোয়ার ফুঁসতে থাকে। উরাতীয়াকে মাঝখানে রেখে অনেকক্ষণ ধরে তারা শান্ত হতে থাকে।

কিন্তু এই অবস্থাও আর রইল না। হঠাৎ লাখপতি একদিন ঘামারির উনুনটা লাথি মেরে ভেঙে ফেলল।

ঘামারি বলল, 'ভাঙলি যে?'

লাখপতি জবাব দিল, 'ওটা পুরোনো হয়ে গেছে।'

ঘামারি খেতে এল না। লাখপতি বলল, 'খাবি নে?'

ঘামারি জবাব দিল, 'না। তোদের রান্না ভাল লাগে না। নিজে রাঁধব।'

আশ্চর্য শান্ত তাদের কথাবার্তা। বিকেলবেলা দুধ দুইতে গিয়ে উরাতীয়া দেখল ঘামারির গরু নেই। জিজ্ঞেস করল, 'গাই কোথায় ?'

'মাঠে।'

'দুইতে হবে না ?'

'না।' বলেই হঠাৎ ঘামারি দু'হাত বাড়িয়ে দিল উরাতীয়ার দিকে। এই প্রথম। উরাতীয়া দেখল, রাত্রের বন্ধ ঘরের ক্ষিপ্ত স্বামী লাখপতি যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে। এতদিন ছিল চাপা বেদনা ও অপমান। আজ তার চোখে দেখা দিল রাগ ও ঘৃণা। নিঃশব্দে পালিয়ে এল সে। নইলে ঝাঁপিয়ে পড়বে এখুনি।

তারপর এপার ওপার হল। দুটো স সার হল। কেবল দেখা হয় মল্লক্ষেত্রে। এসে দেখে উরাতীয়া। বসে হাসে, কথা বলে, কিন্তু একটা রুদ্ধশ্বাস গুমসোনি নিয়ে নেমে আসে আকাশটা।

লড়াইয়ের শেষে উরাতীয়া দেয় দুধ আর সিদ্ধি। ওরা খায়।

হয়তো লাখপতি বলে, 'হিড়িম্বাকে কি ভাবে মেরেছিল ভীম ?'

ঘামারি ঃ 'টুটি ছিঁড়ে।'

উরাতীয়া কেঁপে উঠে বলে, 'ও সব কথা থাক।' শঙ্কিত অথচ আদুরে গলায় বলে, 'গান গাও তোমরা একটু, আমি শুনি।'

'গান!' বিদ্রুপের মত শোনায় যেন কথাটা। আর উরাতীয়ার দুই চোখ বেয়ে জল পড়ে।

কিন্তু জগৎবিমুখ, দেহাশ্রিত এই মল্লযোদ্ধাদের বুকে জেগেছে যে অজগর, সে ফুঁসছে দিবানিশি। মুক্ত ফল্গুধারা স্নান করেই শেষ হয়েছে। মুক্তিটাকে দেহের মত লুফে নিতে চাইছে তারা।

শীত গেছে। বসন্ত এসেছে। রাত এসেছে। ঢালু সড়কে ধুলো উড়ছে। গাছগুলি পাগল হয়েছে।

সেদিন শেষ গাড়িটা যায় নি তখনো। লড়াই শেষ করে বসেছে দুজন। পরস্পরকে বার বার আক্রমণ করেছে তারা। এমন কি, আইনভঙ্গ করে আঘাত করেছে। সেজন্য ঘামারির কপাল উঠেছে ফুলে আর লাখপতির ঠোঁটে রক্ত।

উরাতীয়া নিয়ে এল দুধ সিদ্ধি। বুক ফেটে যাচ্ছে এই দুই বন্ধুর লড়াই দেখে। তার জন্য ওরা আজ পরস্পরকে ঘৃণা করছে, লড়ছে। কিন্তু কেন, কেন ? সে ওদের বুক ভরে নিয়েছে, ওরা কেন পারছে না। তবু সে হাসতে চাইল, আর চোখ ফেটে জল এল। 'ভগবান। ওরা মানুষ চেনে না। ভালবাসে না, হাসে না। আমি হাসতে হাসতে এলাম, ওরাও দু দিন হাসল। তারপরে এই যন্ত্রণা। সে কি শুধু আমি ? তবে ক্রীতদাসী আমি ছিলাম ভাল।'

দুধের পাত্র এগিয়ে দিল লাখপতির দিকে। কিন্তু চকিতে কি ঘটে গেল,

গেলাসটা নিয়ে লাইনের উপর ছুঁড়ে ফেলে দিল লাখপতি। মুহূর্তে কিসের এক সংকেত, দুই মল্লযোদ্ধাই চকিতে উঠে দাঁড়াল। পরস্পরকে দেখল কয়েক মুহূর্ত। তারপর দুজনেই দু'দিক থেকে গিয়ে দাঁড়াল মল্লক্ষেত্রে।

উরাতীয়া ব্যাকুল গলায় বলল, 'আর না, আর লড়ো না।'

কিন্তু ততক্ষণে একটা আচমকা রদ্দা মেরে ঘামারিকে ছিটকে ফেলেছে লাখপতি। কিন্তু চকিতে ঘামারি লাফ দিয়ে উঠেছে। তারপর পরস্পর ঝুঁকে দুজন কয়েকবার নিঃশব্দে পাক খেল চারপাশে। অন্ধকারেও তাদের জ্বলন্ত চোখ দেখছিল পরস্পরকে।

উরাতীয়া ছুটে এল মল্লক্ষেত্রের মাঝখানে, 'পায়ে পড়ি, ওগো পায়ে পড়ি, থামো।'

কিন্তু তাকে এড়িয়ে বনবেড়ালের মত নিঃশব্দ উল্লম্ফনে ঘামারি লাখপতির পা দুটো ধরে, তাকে নিয়ে সশব্দে পড়ল মাটিতে। আর তাদের দেহের ধাক্কায় লাইনের তারের কাছে ছিটকে গেল উরাতীয়া। চিৎকার করে উঠল, 'থামো।'

থামবে না। প্রাগৈতিহাসিক সেই জানোয়ার দুটো আজ ইতিহাসের যুগকে তরান্বিত করার জন্য নিজেদের বোধ হয় শেষ করবে। দেখা গেল, লাখপতির পা ধরে পাক দিচ্ছে ঘামারি, শূন্যে তুলে আছড়ে ফেলতে চাইছে। কিন্তু লাখপতি আঁকড়ে ধরে আছে মাটি। পরমুহূর্তেই আবার দেখা গেল, দুজনেই জাপটা জাপটি করে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হুংকার ছাড়ছে, পরস্পরের গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। তারপর দেখা গেল, একজনকে চিৎ করে ফেলে গলা টিপে ধরেছে একজন। আর অন্য একজন দুপায়ের মাঝখানে চেপে ধরেছে গর্দান। আর একটা গোঙানি।

দূর থেকে একটা আলো এসে পড়েছে মল্লক্ষেত্রে। কিন্তু আমৃত্যু এই হিংস্র লড়াই। সেই আলোয় উরাতীয়া দেখল, পাথরে পাথরে ঘর্ষণ হচ্ছে। রক্ত ঝরছে পাথরের গায়ে।

আলোটা ক্রমে তীব্র হচ্ছে। শেষ গাড়িটা আসছে। উরাতীয়া মরিয়া হয়ে ওদের দুজনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, তার নরম হাতে আঘাত করল, চিৎকার করে উঠল, 'থামো, থামো বলছি।'

কিন্তু তাদের পরস্পরের পেষণে শুধু তীব্র গোঙানি। ছিটকে যাচ্ছে মাটি। খাদ হয়ে যাচ্ছে মল্লক্ষেত্র।

উরাতীয়া অস্থির অসহায়ভাবে উঠে দাড়াল। মরবে, হয়তো দুজনেই মরবে তার চোখের সামনে। শুনবে না, কিছুতেই শুনবে না।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে সে অপলক দীপ্ত চোখে তাকিয়ে রইল দ্রুত এগিয়ে আসা আলোর দিকে। অসহ্য ঘৃণায় অপমানে, বেদনায় ও অভিমানে অভিশাপ দিতে চাইল সে। দিতে গিয়ে আরও জোরে কেঁদে উঠল। আর একবার ওদের দিকে দেখে চোখে হাত দিল। গাড়ির শব্দটা কানের কাছে বেজে

উঠে মাটি কাঁপিয়ে তুলতেই ঝাঁপিয়ে পড়ল সে লাইনের উপর।

তারপর একটা তীব্র চিৎকার, এঞ্জিনের গায়ে ধাক্কা খেয়ে চূর্ণবিচূর্ণ মাথাটা নিয়ে সে আবার ছিটকে পড়ল মল্লক্ষেত্রের সামনে। গাড়িটার শব্দের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেল পিছনের রক্ত ক্রুদ্ধ চোখের মত লাল আলোটা।

হয়তো উরাতীয়ার মৃত্যু চিৎকারটা তাদের পাশবিক মল্লযুদ্ধের চেয়েও তীব্র ও ভীষণ জোরে বেজে উঠেছিল। হঠাৎ মল্লযোদ্ধাদের দুজনেরই হাত শিথিল হয়ে এল। দুজনেই তারা ছেড়ে দিল পরস্পরকে। দুজনেই উঠল, দুজনেই ফিরে তাকাল উরাতীয়ার শরীরের দিকে। মুহূর্তে চমকে, দুজনেই টলতে টলতে এসে বসল উরাতীয়ার দু পাশে। তাদের মত ভয়ঙ্কর মানুষরাও দারুণ আতঙ্কে যেন শিউরে ডুকরে উঠল।

কে লাখপতি, কে ঘামারি, আর তাদের চেনা যায় না। তারা এক রকম দেখতে, একই তাদের কণ্ঠস্বর। একজনেই দুজন।

একজন যেন দূর থেকে চাপা গলায় ডাকল, 'উরাতীয়া।'

অন্ধকারে চকচক করছে উরাতীয়ার সর্বাঙ্গের রক্ত। সে নিঃশব্দ, নীরব। সে মারা গেছে।

আর একজন ডাকল, 'উরাতীয়া।'

কোন শব্দ নেই। তারা আবার দেখল পরস্পরকে, আবার উরাতীয়াকে। তারপর ভূমিকম্পের পাথরের মত কেঁপে উঠল তাদের বিশাল শরীর দুটো। বোবা করুণ অসহায় জীবের মত কাঁপতে লাগল। আর রক্তের ও চোখের জলের নোনা স্বাদে ভরে উঠতে লাগল মুখ। তারা আবার ডাকতে চাইল, 'উরাতীয়া।' কিন্তু পারল না। শুধু বুকে বাজতে লাগল, উরাতীয়া! উরাতীয়া!

একদিন তারা দেহাশ্রিত বদ্ধ জীবন বোধে আশ্রয় নিয়েছিল এখানে। তারপর মুক্তি এসেছিল, তারা হেসেছিল, গান করেছিল। তাদের ঘাম ঝরেছিল একদিন। আজ রক্ত পড়ল, চোখের জলে ভিজল মাটি।

শুধু নিথর পড়ে রইল সেই মেয়ে উরাতীয়া। বুকে বাজল তার নাম। বাজতে লাগল, বাজতে থাকবে হয়তো চিরদিন যত দিন না সে আবার এসে হাসবে, কথা বলবে। তেমনি বাজতে লাগল, আর দূর দক্ষিণের পাগলা হাওয়া হা হা করে ছুটে এল।

ও আপনার কাছে গেছে

সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। একটা গল্প—ছোট গল্প লিখতে হবে। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। গল্প তো আর হঠাৎ হঠাৎ গজিয়ে ওঠে না। আমার মস্তিষ্কটা তেমন জলে ভেজা উর্বর না, বারো মাস যেখানে ব্যাঙের ছাতার মত গল্প গজায়। ঘরে বাইরে অনেক সময় অনেক ঘটনা আর চরিত্রের নানা সমাবেশে, বিদ্যুচ্চমকের মত হঠাৎ এক একটা গল্প ঝলকিয়ে ওঠে। পথে, পান্থশালায়, শুঁড়িখানায়, ট্রেনে, বাসে, এমন কি আকাশপথেও, এক একটা সামান্য বিষয় কল্পনার আশ্চর্য স্পর্শে হঠাৎ গল্প হয়ে বিদ্যুচ্চমকের মত মস্তিষ্কে বিঁধে যায়। এটা কি বলে! উপাদান? বিষয়বস্তু? ভাষা সেই মুহূর্তে কোন কাজই দেয় না। নারীর ডিম্বাণুকোষে পুরুষের শুক্রকীটের প্রবেশের মত, সেই মুহূর্তে মস্তিষ্ক কেবল ধারণ করে। অথবা জন্ম নেয়। একটা আশ্চর্য সুখের মত হৃদয় তখন মথিত হয়। আলোড়িত হয়। এই পর্যন্তই। আর সেই বিদ্ধ হওয়ার মুহূর্তেই, ভাষা তার ছাঁচে ঢালাই হয়ে যায়। মস্তিষ্কে বিদ্ধ ভ্রূণের সঙ্গে, তার ভবিষ্যৎ অবয়ব বা কলেবর, যাকে আমি সহসা-বিদ্ধ সেই গল্পের বিষয়বস্তুটির ভাষা বলে মনে করি, যা দিয়ে বিষয়টি তার যথার্থরূপে ফুটে উঠছে ধীরে ধীরে—ভাষা যার নাম, দীর্ঘকাল গর্ভধারণের মতই যা একাধারে কষ্টকর, যন্ত্রণাদায়ক, অথচ অনিবার্য স্বাভাবিক এবং ভবিষ্যতের একটি দ্বিধা দ্বন্দ্ব ভরা স্বপ্নের মূর্তি, সেই বাহনও সেই মুহূর্তেই জন্ম নেয়। আসলে এই রূপের বাহন নিহিত থাকে ভ্রূণের মধ্যেই।

বিদ্যুচ্চমকের মত যা ঝলকিয়ে ওঠে, বা জন্ম নেয়, আমি তো তখনই—তৎক্ষণাৎ তা লিখে উঠতে পারি না। আমাকে নোটবুকে টুকে রাখতে হয়। সেই ঝলকটাকে ধরে রাখতে হয়। পেশাদার লেখকের মত, কথাগুলো মনে হচ্ছে? ঠিক, আমি সত্যি একজন পেশাদার লেখক। সব বিদ্যুচ্চমকই যথেষ্ট জলভারাক্রান্ত গাঢ় মেঘের বুকে ঝলকিয়ে ওঠে না, অতএব কিছু তো বিফলেও যায়। তবু, যা কিছু বিঁধে যায়, সবই আমি নোটবুকে নোট করি। একজন অতিশয় পেশাদার লেখকের মত সঙ্গে নোটবুক থাকলে, তখনই নোট করি। আমার লেখার টেবিলের নির্জনতায় এ রকম ঘটলে তো কথাই নেই। নোটবুক

হাতের সামনেই থাকে। বাইরে থাকলেও আমার পকেটে অনেক সময়েই নোটবুক থাকে। না থাকলে বাড়ি ফিরেই আমি সেই ঝলকটাকে নোট করি, যা গল্পের আলোয় ঝলকানো। আর একটামাত্র নোটবুকে তা সম্ভব হয় না। একাধিক নোটবুক, বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন জায়গায় আমার সঙ্গে ঘোরে।

সবই আমি সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। একটা গল্প লিখতে হবে। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি। রাজনীতি, সমাজ, গ্রাম শহর, বিভিন্ন শ্রেণীর নরনারী, প্রেম ঘৃণা লাম্পট্য, সংঘর্ষ, হাসিকান্না, অত্যাচার উৎপীড়ন, সবই যেন মিছিল করে চলেছে নোটবুকের পাতায়। দেখে মনে হচ্ছে, প্রত্যেকটাই এক একটা বর্ণাঢ্য আর উজ্জ্বল সবল আর গতিশীল মাছের মত। মনের বঁড়শি ডুবিয়ে, কলমের ছিপে গেঁথে তুলতে পারলেই হয়। যদিও ব্যাপারটা আদৌ সহজ না।...হ্যাঁ, আর একটা চিঠিও আছে। রুলটানা কাগজে, কয়েক পাতা দোমড়ানো মোচড়ানো, খাঁজে-খাঁজে জলে ভিজে অস্পষ্ট হয়ে যাওয়া লেখা, অথবা একেবারেই ধুয়ে যাওয়া কোন কোন অক্ষর, কয়েক জায়গায় আঙুল দিয়ে মুছে দেওয়া কালির দাগ, যার পাশে কাদার দাগও কিছু কিছু আছে, এমন কি একটা জায়গায় যেন আবছা সিঁদুরের দাগও রয়েছে। তিনটে নোটবুক দিয়ে চিঠির পাতাগুলো মেলে চাপা দিয়ে রেখেছি। প্রথমে দেখলে মনে হবে, অনেক কালের পুরানো চিঠি, মহাফেজখানার দলিল দস্তাবেজ থেকে টেনে বের করা হয়েছে। এমন ভাবে মোচড়ানো, ভাঁজের জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে। হাতের লেখাগুলো বড় বড়, গোল গোল। যে কেউ দেখলেই বুঝতে পারবে, চিঠি যে লিখেছে, লেখা তার হাতে নিয়মিত সরে না। অনভ্যাসের একটা আড়ষ্টতার ছাপ স্পষ্ট, অথচ তার নিজস্ব গ্রামীণ ভাষায় বেশ একটা আঁটসাট বুনোট দানা বেঁধে উঠেছে। এই চিঠিটাও আমি নোটবুকগুলো চাপা দিয়ে, এক রকম সাজিয়ে নিয়েই বসেছি। সাহিত্যের থেকে কি জীবন বড়? এই তীক্ষ্ম জিজ্ঞাসা, গল্প লেখার এমন একটা সংকট সৃষ্টি করেছে, চিঠিটাও নিয়ে বসতে হয়েছে।

সংকট যেমনই হোক গল্প তো আমাকে একটা লিখতেই হবে। নোটবুকগুলো সাজিয়ে বসেও, কোন একটাকেও গেঁথে তুলতে পারছি না। সবই যেন অতল জলে ডুবে যাচ্ছে। কলকাতার আকাশে আজ অভাবিত রৌদ্র-মেঘের খেলা। আজ একুশে ভাদ্র, বেস্পতিবার। গত কয়েকদিন, প্রায় সময়েই আকাশের মুখ কালো ছিল। চিক্কুরহানা বাজের হুংকার, তার সঙ্গে মাঝে মাঝেই বৃষ্টি, আর বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল জমে যাওয়া—ট্রাম বাস বন্ধ। আবার জল সরে গেলেই, কলকাতার আর এক রূপ। যেমন আজ, সত্যি যেন শরৎ এসেছে। যদিও এ শরৎ ভ্যাপসা আর ঝাপসা, আসলে যেন শরতের একটা ছদ্মবেশ। কারণ, মেঘের দাপটই বেশি, মাঝে মাঝে চিড় খাওয়া ফাটলে আবছা নীল এবং সাদার সঙ্গে কালো মেঘ মাখামাখি, পুব থেকে ধেয়ে আসা, অতি বেগবতী। সব সাজিয়ে নিয়ে বসেও,

মাঝে মাঝেই আমার হাত চলে যাচ্ছে খবরের কাগজের দিকে। হাতে নিয়ে এক পলক দেখতে না দেখতেই, একটা অসহ্য গুমরানো যন্ত্রণায়, কাগজ দলা পাকিয়ে মুচড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। কিন্তু আবার পরমুহূর্তেই টেনে নিচ্ছি। না, কোন কোন সময় খবরের কাগজ সম্পর্কে আমি যেমন ক্যালাস হয়ে যাই, পাতা ওল্টাবার কোন কৌতূহল বা উৎসাহই থাকে না, এখন সে রকম হচ্ছে না। কেননা, এখন খবরের কাগজের পাতা জুড়ে লম্বা-চওড়া বক্তৃতা, দলবাজী, ক্ষমতা নিয়ে ষড়যন্ত্র আর ফেরেব্বাজীর কথা প্রায় নেই। যেটুকু আছে, তা ভয়ঙ্কর আর বিধ্বংসী বন্যার জলের তোড়ে, মলমূত্রের মত ভেসে যাচ্ছে। এখন খবরের কাগজে কেবল উপরঝান্তে বৃষ্টির শব্দ, বাঁধ ভাঙার প্রচণ্ড শব্দ, ঘরবাড়ি গ্রাম গ্রামান্তর ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার, অতি ভয়াবহ রাক্ষুসী বন্যার জলের অতি ভয়ঙ্কর গর্জন ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বাঁচবার—আর একবার, শেষবার এ জীবনের মত, আব একবার বেঁচে থাকবার শেষ চেষ্টায়, মানুষের দুরন্ত চিৎকার আর আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে। খবরের কাগজে তাদের চিৎকার আর আশ্রয়ের আশায় উত্তোলিত অজস্র হাত দেখা যাচ্ছে। মানুষ আর গৃহপালিত পশুরা সমান অসহায়, একই সঙ্গে তাদের আর্তনাদ, আর তাদের ভেসে যাওয়া শব থেকে দুর্গন্ধও উঠে আসছে খবরের কাগজ থেকে।

এ খবরের কাগজের চেহারা আলাদা। হাতে পাওযা মাত্র, অতি ব্যগ্রতায তার মুখ দেখবার জন্যে ভাঁজ খুলছি, আর মুহূর্তেই বন্যার রাশি রাশি জলের খলখল হাসি শুনে, দুমড়ে পাশে সরিয়ে রাখছি। কিন্তু স্থির থাকতে পারছি না, আবার টেনে তুলে নিচ্ছি, আর তৎক্ষণাৎ মরণ-চিৎকার শুনে মুচড়ে সরিয়ে রাখছি। তথাপি স্থির থাকতে পারছি না, আবার তুলে নিচ্ছি, আব মুহূর্তেই মানুষ আর পশুর শবের দুর্গন্ধে দলা পাকিয়ে সরিয়ে রাখছি। না, এভাবে সরিয়ে রেখেও নিশ্চিন্ত থাকার উপায নেই। দোমড়ানো মোচড়ানো খবরের কাগজ থেকে ক্ষুধার্তদের আকুল চিৎকার ভেসে আসছে। তার মধ্যেই আমি সব সাজিয়ে নিয়ে বসেছি, একটা গল্প লিখতে হবে।

কি আর কোন্ গল্প লিখব, এই সিদ্ধান্তই একমাত্র উদ্ধারের উপায়, আর মেঘেরই গাঢ় ছায়া ঘরের মধ্যে নিবিড়তর হয়ে উঠছে। রোদ ফুটলেই স্বাভাবিকের থেকেও আলো যেন উজ্জ্বলতর। কিন্তু গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে টেলিফোনটা বোবা আর কালা। মনে হচ্ছে, এই মুহূর্তে বাইরে কারও সঙ্গে কথা বলতে পারলে ভাল হত। অথবা বাইরে বেরিয়ে কোথাও খানিকটা ঘুরে এলে স্বস্তি বোধ করা যেত। আসলে, এ সব ভাবাই সার। কি লিখব, এই সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, আর মনে মনে ছটফট করে মরা, এর থেকে আমাকে এখন কেউই উদ্ধার করতে পারে না। এখন নিজেকে নিজে উদ্ধার করা ছাড়া উপায নেই।

কি আর কোন্ গল্প লিখব, এই সিদ্ধান্তই একমাত্র উদ্ধারের উপায়, আর এই ভেবেই নোটবুকের পাতার গল্পের চুম্বকগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখছি, ওরাই যেন

এক ধরনের ভ্রূকুটি আর অসহায় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। যেন ওরা আদৌ কেউ শিকার হতে রাজী না। কি আশ্চর্য আর করুণ সংকট! অতঃপর নোটবুকের পাতাগুলো মুড়ে, মলাট বন্ধ করে সরিয়ে রাখা ছাড়া কিছু করার নেই। এ শিকারের লেখাটা অন্য রকম। এভাবে এ খেলা, খেলা যায় না। নোটবুকগুলো সরিয়ে রাখতে, রইল শুধু রুলটানা কাগজে লেখা কয়েক পাতার সেই চিঠি। স্যাঁতসেতে দোমড়ানো, কাদার দাগ লাগা, জলে ধুয়ে যাওয়া অক্ষর, ভাঁজের মুখে মুখে ছিঁড়ে যাওয়া, পুরানো দলিলের মত চিঠিটা।

আশ্চর্য, সংকটের সমস্ত মূলে চিঠিটা আমার চোখের সামনে বিদ্যুচ্চমকের মত ঝলকিয়ে উঠল। আসলে, বিধ্বংসী বন্যা আর গল্পের মাঝখানে, এই চিঠিটাই অবচেতনে আমার মনকে ছিঁড়েখুঁড়ে দিচ্ছিল। কারণ, চিঠিটা এসেছে বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল থেকে। আজ একুশে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। এখন বেলা প্রায় বারোটা। চিঠিটা আমি আবার খুলে সামনে মেলে ধরলাম। সেই বড় বড় গোল হাতের লেখা। চিঠির একেবারে মাথায় লেখা আছে, "শ্রীশ্রীদুর্গা সহায়।" ডানদিকে তারিখ, "২০শে ভাদ্র. বুধবার।" তারিখের ওপরেই, যেখান থেকে চিঠিটা এসেছে, সেখানকার—সেই গ্রামের নাম লেখা ছিল। জল লেগে, গ্রামের নামটা উঠে গিয়েছে. সেখানে একটু কাদার দাগও আছে। কিন্তু গ্রামের নামটা আমার অজানা না। ঘাটাল মহকুমার. দাশপুর থানার এক গ্রামের নাম লেখা ছিল। হয়তো খুব ভাল করে লক্ষ্য করলে, এখনও, ধুয়ে যাওয়া আবছা কাদার দাগের ভিতরে গ্রামের নামটা পড়া যায়। তার আর দরকার নেই। দরকার নেই, কারণ এখন এই চিঠিটাই, আমার গল্প লেখার সংকট মোচনের উপায় স্বরূপ। সেইজন্যই গ্রামের নামটা আমি উল্লেখ করতে চাই না। অসুবিধা আছে। চিঠিটাই এখন গল্প, আর চিঠিতে ভয়াবহ বন্যার বিবরণের সঙ্গে, এমন সব কথা লেখা আছে, এমন বিষয়, আর ব্যক্তির বীভৎসতার কথা, ভয়ঙ্কর বন্যা যার কাছে এসেছে উল্লসিত সুখের পৌষ মাসের মত, এক্ষেত্রে গ্রামের নামটা উল্লেখ করার উপায় নেই।

স্বভাবতই চিঠিটা যে ডাকে আসে নি, এটা অনুমানের অপেক্ষা রাখে না। একটু আগেই চিঠিটা একজন হাতে করে নিয়ে এসেছে। সে এখন পাশের ঘরে রয়েছে। বিশ বাইশ বছরের একটি জোয়ান ছেলে। একটু আগেই এসে সে যখন আমার ঘরে ঢুকল আর আমি ভাল করে তার দিকে তাকাবার আগেই সে নিচু হযে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল, আমি প্রথমটা অবাক হয়েছিলাম। কে, এ কথা জিজ্ঞেস করবার আগেই সে যখন মুখ তুলল, আমি দেখলাম, প্রায় হাঁটুর ওপরে কাপড় তোলা, বোতাম খোলা হাফ শার্ট পরা, কালো বেঁটে গাট্টাগোট্টা আঁটসাঁট গড়নের একটি জোয়ান ছেলে, যার চুল উস্কখুস্ক, প্রায় জট পাকানো; চোখের কোল বসা, দৃষ্টিতে হতাশা, না ভয় না রুদ্ধ উদ্গত কান্না, না অসহায় একটা আর্তি, আমি বুঝে উঠতে পারি নি। কিন্তু এক

পলক তাকিয়েই আমি তাকে চিনতে পেরেছিলাম, আর ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠেছিলাম। হ্যাঁ, ভূত দেখার মতই, কারণ তার আসাটা কেবল আশাতীত না, সে কেমন করে এল, তা আমি কিছুতেই ভেবে উঠতে পারছিলাম না। এমন কি, সংবাদপত্র পড়ে আমি আশঙ্কা করছিলাম, সে, বা তাদের পরিবারের কেউ আদৌ বেঁচে আছে কি না। এ রকম একজনকে সশরীরে কলকাতার ঘরে হঠাৎ দেখলে ভূত দেখার মত চমকিয়ে উঠতেই হয়। আমি তার খালি পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখে বলে উঠেছিলাম, 'তুমি। তুমি কোথা থেকে এলে?'

ছেলেটির স্বর শোনা গিয়েছিল যেন ওর সেই দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসার মত, 'বাড়ি থেকে।'

'বাড়ি থেকে।' কথাটা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল আমার কানে, বলেছিলাম 'কি করে এলে?'

ছেলেটি জবাব দিয়েছিল, 'নৌকায় আর পিপের ভেলায় করে ঘাটাল-পাঁশকুড়া চাতালে এয়েচি, সেখান থেকে পাঁশকুড়া ইস্টিশনে, মিছিলগাড়িতে কলকাতা।'

চাতাল বোধ হয় পাকা সড়ককে বোঝায়। কিন্তু মিছিলগাড়ি? সেটা আবার কি? আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'মিছিলগাড়িটা কি?'

ছেলেটির কোল বসা চোখের সেই অদ্ভুত দৃষ্টির মধ্যে চকিতেই যেন অবাক জিজ্ঞাসা দেখা দিয়েছিল, তারপরে বলেছিল, আজ তো কলকাতার মিটিং আছে। মিটিং থাকলেই তো মিছিলগাড়ি আসে। মিছিলগাড়িতে আসতে ভাড়া লাগে না।

আমার তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, আজ একুশে ভাদ্র, বৃহস্পতিবার। বাম ফ্রণ্ট কমিটি না সরকার, কারা যেন আজ মিটিং ডেকেছেন। কিন্তু আশ্চর্য, কত কি জানি না। মিছিলগাড়ির কথা আগে কখনও শুনেছি বলে মনে করতে পারি নি। কবে থেকে, কারা এ ব্যবস্থা করেছেন, সে বিষয়েও কোন ধারণা নেই। আমি চমৎকৃত বিস্ময়ে বলেছিলাম, 'তুমি মিছিলগাড়িতে মিটিং-য়ে এসেছ?'

ছেলেটি মাথা নেড়েছিল, 'না আমি আপনার কাছে এয়েছি। কাকী আপনাকে একটা চিঠি দেচে।'

এ কথা বলবার সময় তার গলাটা যেন চেপে আসছিল, আর জামাটা তুলে কোমরের কাপড়ের কষির কয়েক ভাঁজ খুলে, দলা মোচড়া করা চিঠিটা বের করে আমার দিকে এগিয়ে দিয়েছিল। চিঠিটা বের করবার অবকাশেই আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'তা তোমাদের খবর কি? সব ভাল তো?

জোয়ান শক্ত সমর্থ অথচ স্পষ্টতই দুর্দশাগ্রস্ত ছেলেটি আমার দিকে না তাকিয়ে চিঠিটা এগিয়ে দিয়েছিল। তার মুখের অভিব্যক্তি বদলিয়ে যাচ্ছিল। বুঝতে পারছিলাম না, তার চোখে জল আসছে কি না, এবং নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল কি না। প্রায়-রুদ্ধ আর স্খলিত স্বরে কোন রকমে বলেছিল, 'কাকীর চিঠিতে সব কথা লেখা আছে।'

আমি ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে কাগজের দলাটা নিয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম, ও কথা বলতে পারছে না। আমি যতটা সহজ ভাবছিলাম, ব্যাপারটা মোটেই সে রকম না। শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলেটার ভিতরে প্রচণ্ড গোলমাল চলছিল। এটা বুঝতে পেরে আমি ওকে বলেছিলাম, 'আচ্ছা, তুমি ভেতরে গিয়ে বস।'

ছেলেটি এখন অন্য ঘরে, বাড়ির লোকদের সঙ্গে কথা বলছে। চিঠিটা আমি ইতিমধ্যেই একবার পড়েছি। তার এক জায়গায় লেখা আছে, "এক রকম জোর করেই ভাসুরপো দুলালকে চিঠি দিয়ে আপনার কাছে পাটালাম। জল এখন খানিক কমের দিকে। রেল এখনো চলচে শুনে কেউ কেউ মিছিলগাড়িতে কলকাতা যাচ্ছে। বুঝতেই পারচেন দাদা, আমার মনের কি দশা। দুলালকে এভাবে না পাটিয়ে পারছি না। জানি না, ও পাঁশকুড়া পর্যন্ত কেমন করে পৌঁছবে। ভগবানের একটা দয়া, কাল কলকাতায় মিছিলগাড়ি যাবে। হাতে একটা পয়সা নাই। দুলাল মিছিলগাড়িতে যাবে, আবার মিছিলগাড়িতেই ফিরবে। ভাড়া লাগবে না। আর এক ভরসা, ও একলা যাচ্ছে না, অন্য লোকেরাও যাচ্ছে। অন্য কারুর হাত দিয়ে এ চিঠি পাটাতে পারতাম। ভরসা হল না। তাই দুলালকেই বলে-কয়ে রাজী করেছি। দুলালের মেজকাকাকে বলবেন, সবই তো গেচে, এ বছরের মতন ঠিকা ব্যবসা মাথায় থাক, আর দরকার নাই। যে করে হোক, যেন চলে আসে।"...

দুলালকে পাঠানোর প্রসঙ্গ এইভাবে লিখেছে। কিন্তু চিঠির মূল প্রসঙ্গটা হল, "ও আপনার কাছে গেচে।"...'ও' মানে দুলালের মেজকাকা। চিঠিটি লিখেছে দুলালের মেজকাকী। ঠিক এভাবে, চিঠির টুকরো অংশ তুলে লাভ নেই। প্রথম থেকেই চিঠিটা আমি আবার পড়তে শুরু করলাম। চিঠির বয়ান এইভাবে শুরু হয়েছে, "পূজনীয় দাদা, আমাদের সর্বনাশ হয়ে গেচে. কিছু বলতে কিছুই নেই. সব ভেসে গেচে। বিষ্ণুপুরে বাপের বাড়িতে আপনার সঙ্গে দেখা হলে কতবার বলেচি, দাদা একবার আমার শ্বশুরবাড়ি আসবেন। ও যখন বিষ্ণুপুরে আপনাকে আমাদের বাড়িতে দেখেচে, তখন কত করে বলেচে, দাদা একবার আমাদের বাড়ি আসবেন, আপনার ভাল লাগবে। পুকুরের মাছ খাওয়াব, গাছের নারকেল খাওয়াব, গরমের সময় আমাদের পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসলে আপনার আরাম লাগবে। কিন্তু দাদা, আমাদের মাটির দোতলা ঘর জলে ধুয়ে ভেসে গেচে, কোন চিহ্ন নাই। পুকুরঘাট সব কত জলের তলায়, কিছু জানি না। আপনাকে আর কোন দিন বলতে পারব না, দাদা একবার আমাদের বাড়ি আসুন। আমাদের কি হবে, কিছু জানি না। এদিকে ১৬ই ভাদ্র শনিবার, বৃষ্টি মাথায় করে এক কোমর জল ভেঙে, ও আপনার কাছে গেচে। আমি বারণ করেছিলাম, শুনল না। বিষ্ণুপুর থেকে দু হপ্তা আগে মাল নিয়ে এসেচে। তারপর থেকেই সেই যে বৃষ্টি শুরু হয়েচে, তার আর ধরা কাটা নাই। এত বৃষ্টি আমি আমার জন্মে দেখি

নাই। বৃষ্টির জলেই উঠান ডুবেছিল, পুকুর ডোবা সব জলে থই থই। আর তার মধ্যে লোকটা কলকাতা যাবার জন্যে অস্থির। রোজই ভাবচে বৃষ্টি থামবে, আর মাল নিয়ে কলকাতায় রওনা দেবে। কিন্তু বৃষ্টি ধরা তো দূরের কথা, ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার অনেক রাত্রে আমাদের উঁচু দাওয়া ডুবিয়ে ঘরে জল ঢুকল। তখন কেউ ভাবি নাই, আমাদের কি সর্বনাশ হতে চলেচে। বরং ভেবেছিলাম, বৃষ্টির জলই ঘরে ঢুকেচে। আমাদের গাঁয়েও তেমন হাঁকডাক কিছু শুনো যায় নাই। আমরা উপরের ঘরে ছিলাম। তিন বছরের ভাসুরঝিটি আমার কাছে রাত্রে শোয়। ভাসুর আর ছোট দেওরের ডাকাডাকিতে আমাদের ঘুম ভাঙল। ও তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। ওর ভয়, মালের গাঁটরিটা নিচে রাখা ছিল, জলে ভিজে না যায়। আমি লণ্ঠন জ্বালাবার আগেই দেখি ও গাঁটরিটা মাথায় করে উপরে উঠে এল, বলল, মেজবউ মা কালীর কি দয়া গো, গাঁটরিটা আর একটু হলেই জলে ভিজত। এত টাকার মাল, সব বরবাদ হয়ে যেত। গাঁটরিটা রেখেই আবার নিচে চলে গেল। পাশে আমার খুড়শ্বশুরের বাড়ি। তাদের হাঁকডাকে বুঝলাম, তাদেরও আমাদের মতন হাল, দাওয়া উবজে ঘরে জল ঢুকেচে। ভাসুরঝিটা ঘুমাচ্চে দেখে আমি নিচে গেলাম। ঘরের মেজেয় পায়ের পাতা ডোবা জল ঢুকেচে। আমার বড় জা এক বছরের ছেলে কোলে কাঁদচে, আর খালি বলচে, মাগো এ কি বৃষ্টি, সব যে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। আর আমার ভাসুরঝি, যাকে আপনি বিষ্ণুপুরে দেখেচেন, ইস্কুলের এগারো ক্লাসে পড়ে, মাকে ধমক ধামক করচে, আর এটা সেটা মালপত্তর তক্তপোশের উপর তোলা করচে। ওদিকে ভাসুর তার দু ভাই আর দুলালকে নিয়ে উঠানের মরাই থেকে বস্তায় ভরে ধান ঘরে তুলে আনচে। দশ দিনের বৃষ্টির জলে উঠান ডুবলেও মরাই ডোবে নাই। সেই রাত্রে মরাই ডুবতে বসেচে দেখে ধান ঘরে না তুলে উপায় ছিল না। দাদা, তখন কি জানতাম, আমাদের উত্তরে শিলাই, দক্ষিণে কাঁসাই ভেসেচে। কি করে বা জানব। সবাই সারা রাত্র জেগে জেগে জল দেখিচি। ঘরের মধ্যে সেই পায়ের পাতা ডোবা জল তার বেশি উটে নাই। মনে করলাম, বৃষ্টির জল। বৃষ্টি ধরলেই নেমে যাবে। দুলালের মেজকাকাও তাই ভেবে রাত না পোয়াতেই গাঁটরি নিয়ে রওনা দিল। নিজের দাদা বউদি বারণ করল, কারুর কথা শুনল না। আমার কথা শুনল না, বললে, পুজা এসে গেল, আর কবে মাল বেচব। যা থাকে কপালে, চাতালে গিয়ে প্রথম বাস ধরে পাঁশকুড়ায় গাড়ি ধরব। মাল তো কম না। মাথার উপরে এত বড় গাঁটরি, তার উপরে ছাতা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে গেল। কয়েক বছর ধরেই তো এ সময়ে কলকাতায় আপনার কাছে যায়। এবারেও জল ভেঙে, বৃষ্টি মাথায় করে আপনার কাছে গেচে, কিন্তু দাদা, এদিকে আমাদের যে একেবারে সর্বনাশ হয়ে গেচে, ও জানতেও পারচে না। এখনও পাগল হই নাই, এখনও বেঁচে আছি, আর কাল রাত পোয়ালেই মিছিলগাড়ি যাবে, দুলালকে যেতে রাজী করেচি। সব

বৃত্তান্ত লিখে এই চিঠি দিচ্ছি, ওকে দেখাবেন, আর দুলালের সঙ্গে ফিরতি মিছিল-গাড়িতেই পাটিয়ে দিবেন…।"

আপাতদৃষ্টিতে চিঠিটি এই পর্যন্ত পড়লে, "সব বৃত্তান্ত" কত ভয়াবহ হতে পারে, তার একটিমাত্র ইঙ্গিত রয়েছে, "এখনও পাগল হই নাই" কথাটিতে। কিন্তু এই পর্যন্ত পড়ার পরে পত্রলেখিকার আর তার স্বামীর কিছু পরিচয় আর বিবরণ না লিখে পারছি না। চিঠির শেষে নিচে, আমি আগেই নামটি দেখে নিয়েছিলাম, "ইতি নির্মলা (নিমি)।" হ্যাঁ, ব্র্যাকেটে ডাকনামটা লিখতে ভোলে নি। আসলে চিঠিটি দেখবার আগে, দুলালের মুখে কাকী শুনেই একটি প্রায় চব্বিশ পঁচিশ বছরের মেয়ের চেহারা আমার চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। এখনও ভাসছে। মাজা মাজা ফর্সা রঙ, মাঝারি লম্বা, ছিপছিপে শরীরের গড়ন, এবং সব মিলিয়ে ওকে দেখায় যেন একটি স্বাস্থ্যোদ্ধত কুমারীর মত। এখনও ওর শরীরে উপচানো যৌবনের ঢল কোথায় যেন থমকিয়ে রয়েছে। বড় আর টানা দুই চোখ, নাক সরু, কিন্তু নিচু না, ঈষৎ মোটা ঠোঁট। অধিকাংশ সময়েই দেখেছি, লালপাড় শাড়ি, মাথায় সিঁদুর, পায়ে আলতা, নাকে নাকছাবি, গলায় একটি সোনার হার, হাতে শাঁখা নোয়া, কয়েক গাছা সামান্য চুড়ি, আর বাপের বাড়িতে দেখেছি বলেই বোধ হয়, ঘোমটা থাকত না কোন সময়েই। হয় এলো চুল, নয়তো খোঁপা বাঁধা। খুঁটিয়ে দেখলে ওকে সুন্দরী বলা যায় না, হঠাৎ দেখলে মনে হয় রূপসী। ওর একটা চটক আছে, মিষ্টি চটক, ঠিক আলগা না, এবং মুখে প্রায় সব সময়েই হাসি, চোখে মুখে প্রায় একটা দীপ্তি, চলাফেরায় একটা চঞ্চলতা।

নির্মলার এই মূর্তিটাই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, নিমি যার ডাক-নাম। আত্মীয়তার সূত্রে ওকে ঠিক কি বলা যাবে, জানি না। আমার এক শ্যালিকার ও ছোট ননদ। ক্লাস এইট অবধি পড়েছে। তারপরেই বিয়ে। কিন্তু ওর বাপের বাড়ি আর শ্বশুরবাড়ির সকলের একটাই দুঃখ, বিয়ের যা ফল, বিয়ের দশ বছরের মধ্যেও সেই "মা ষষ্ঠীর কৃপা" হয় নি। সেইজন্যই ওর বাঁ হাতে একটা মাদুলি বাঁধা আছে। গলার হারেও জড়ানো আছে একটা মাদুলি।

আমি বিষ্ণুপুরে ওর পিত্রালয়ে ওকে কয়েকবার দেখেছি। ওর মুখেই শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ির কথা। পুকুর, বাড়ি, বাগান আর চাষ আবাদের কথা। সমস্ত বছর খেয়ে আর কিছু বাড়তি ফসল বিক্রি করে, অন্যান্য প্রয়োজন মিটিয়ে জীবন ধারণের মত জমি আর চাষ আবাদ ওদের আছে। গ্রামীণ মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ পরিবার বলতে যা বোঝায়, সেই রকম। যদিও, বিষ্ণুপুরেই ওর স্বামী দিগ্বিজয়কে—যার ডাকনাম বুড়ো—দেখে আমার মনে হয়েছিল, কালো কুচকুচে শক্ত পোক্ত একজন চাষী মুনিষ ছাড়া কিছু না। অনেকটা পত্রবাহক দুলালের মতই বুড়োর চেহারা। সমস্ত চেহারা আর জামাকাপড়ের মধ্যেই একটি অতি গ্রাম্য যুবককে চিনে নিতে ভুল হয় না। কিন্তু তার কুণ্ঠা আর সংকোচ বিশেষ নেই। কথা সে একটু

বেশিই বলে। সে চাষ বোঝে, জল আর মাছ বোঝে, গাছ আর ফল বোঝে, গাই-বাছুরের রোগ শোক মর্জি বোঝে। এমন কি বলদের মর্জিমেজাজও বোঝে। যদিও নিজের হাতে চাষ করে না। সে নিজেই আমাকে তার ডাকনাম ধরে ডাকতে অনুরোধ করেছে।

নারী চরিত্রের সবটা বুঝি, এমন কথা কবুল করে বলা আমার পক্ষে সম্ভব না। কিন্তু নিমিকে আর বুড়োকে দেখে, আমার মনে হয়েছে, ওদের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর একটা সহজ আর অনায়াস বোঝাপড়া আছে। নিমি শ্বশুরবাড়িতে স্বামীর সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করে, আমি জানি না। বিষ্ণুপুরে ওর পিত্রালয়ে দেখেছি, স্বামীকে ও একটু বেশি বকা ধমক করে। বিশেষ করে, কোন আত্মীয়বাড়ি বা সিনেমায় যাবার সময়, স্বামীর সাজগোজ, জামাকাপড়ের ব্যাপারেই ওর যত ধমক-ধামক। বুড়ো অবিশ্যি হাসে, হেসেই ওকে বলতে শুনেছি, 'বিষ্টুপুরে এসে আমাকে ভদ্রলোক সাজতে শিখতে হবে? কিন্তু দোহাই মেজবউ, আমাকে হিমানী পাউডার মাখতে বলো না। উটি পারব না।' ....কিন্তু একটু দেশী সেন্ট না লাগালে নিমি ছাড়ে না। বুড়োকে বলতে শুনেছি, 'মাখাচ্ছ মাখাও, লোকে জানবে গন্ধ তোমার গা থেকেই বেরোচ্ছে। হাতে পায়ে চাষ করি না বটে, দেখতে তো হেলে চাষা ছাড়া লোকে আর কিছু বলবে না।'

নিমির আপত্তি আর ধমক এখনই। 'হেলে চাষা' কে বলবে? কার এত বড় সাহস? এ সব ঘটনা আর কথাবার্তা আমার সামনেই ঘটেছে, হয়েছে এবং ওদের সঙ্গে হাসাহাসিও করেছি। বুড়োদের পরিবারকে জোতদার বলা যাবে না, কেননা, সেই পরিমাণ জমি ওদের নেই। উদ্বৃত্ত ফসল, গাছের ফল পুকুরের মাছ বিক্রি করে নগদ যেটা আয় হয়, তার পরিমাণ এমন না, যে কোন রকম ব্যবসা বা মহাজনী ফেঁদে বসবে। ও খুব অকপটেই আমাকে বলেছে, 'দাদা, আপনারা যারা শহরে থাকেন, তারা বর্গাদারদের জন্যে খুব চোখের জল ফ্যালেন। সরকারও ওদের দিকে, যত অপরাধ আমাদের। একবার চলেন আমাদের ওখানে আপনাকে দেখাব দেখলে বুঝবেন, ওদের দয়াতেই আমরা বেঁচে আছি।'

এ ধরণের কথা শুনলেই কি রকম খটকা লাগে। ভূমিহীন কৃষক বা বর্গাদারদের এ রকম একটা ইমেজ কল্পনা করতেই পারি না। অবিশ্বাসের স্বরেই বলেছি, 'তা আবার কখনও সম্ভব নাকি?'

'সম্ভব কি অসম্ভব, একবার নিজের চোখেই দেখে আসবেন চলেন।' বুড়ো বলেছে, 'হাতে পায়ে চাষ করি না ঠিক, কিন্তু ধান তোলার সময় আমাদের পাগলের মত দশা হয়। নানা জায়গায় ছড়ানো ছিটানো জমি। চোখে চোখে না রাখতে পারলেই, ধান খড়, সবই ভাগে কম পড়ে যাবে। আমরা ভাবি, ওদের থেকে আমরা হিসাবে দড়। ওরাই আমাদের হিসাব শিখিয়ে দিতে পারে। কোথা দিয়ে যে কি লোপাট হয়ে যাচ্ছে, কিছু বোঝার উপায় নেই।'

আমি বুড়োর এ সব কথা কখনই পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারি নি, আর এখন, এই মুহূর্তে এ সব কথা আমি বলতেও চাই না। আসলে আমি বলতে চাইছি, বুড়ো চাষ আবাদ নিয়ে নেহাত অসুখী না। কিন্তু অন্য দিকেও ওর উদ্যোগ আর উৎসাহ আছে। আর সেই সূত্রেই, ওর সঙ্গে আমার কলকাতার যোগাযোগ। বিষ্ণুপুরে ওর শ্বশুরমশাই অর্থাৎ নিমির বাবার সৎ আর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ বলে খ্যাতি আছে। আমি নিজেও দেখেছি, তিনি পুজোআর্চা নিয়েই বেশির ভাগ সময় কাটান, দু বেলা দীর্ঘ সময় আহ্নিক জপ তপ, গীতা চণ্ডী পাঠ করেন। কয়েক বাড়ি নিত্য পূজাদিও করেন। অবিশ্যি এ রকম জীবনযাপন সম্ভব হয়েছে, তাঁদের জমির ফসলের জন্য। বিষ্ণুপুরে অনেক তাঁতীই তাঁর যজমান। বুড়োদেরও যজমানের অভাব নেই। কলকাতায়ও ওদের কিছু যজমান আছে, অতএব ওর যাতায়াতও আছে। নিমির বাবার কাছে প্রস্তাবটা একদা বুড়োই তুলেছিল, তাঁর তাঁতী যজমানরা যদি বিশ্বাস করে, কিছু ভাল কাপড়চোপড় দেয়, তাহলে কলকাতার যজমানদের, আর তাদের চেনাশোনা বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনদের বিক্রি করতে পারে। অবিশ্যি বাছাই করা রেশম তসরের কাপড়ই দরকার, বড়লোক যজমানদের যাতে সহজেই নজরে পড়ে। দোকানদারদের মত লাভ করার ইচ্ছা ওর নেই। খরচ বাদ দিয়ে মোটামুটি একটা লাভ থাকলেই ও তুষ্ট। তবু তো কিছু আয় করা যাবে।

নিমির বাবা রাজী হয়েছিলেন, আর তার তাঁতী যজমানদেরও কোন রকম টাকা না দিয়ে জামাইকে মাল দিতে রাজী করিয়েছিলেন। এ রকম ঘটে আসছে প্রায় বছর ছয়েক। ইতিমধ্যে বুড়ো বড়বাজারের দু-একজন মহাজনের সঙ্গে যোগা-যোগ করতে পেরেছিল, আর আমার সঙ্গেও পরিচয় ঘটেছিল। বছর তিনেক আগে, ও আমাকে প্রথম বলেছিল, 'দাদা, যদি কিছু মনে না করেন, আপনার কাছে একটা আবদার করব।'

আমি আদৌ ওর আবদারের বিষয়টি বুঝতে পারি নি, জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কি ব্যাপার ?'

বুড়ো বেশ কুণ্ঠার সঙ্গেই বলেছিল, 'প্রত্যেক বছরই পুজোর আগে বিষ্টুপুরি রেশম তসর নিয়ে কলকাতায় যাই। কিন্তু আপনার কাছে কখনও যাওয়া হয় না।'

আমাকে রেশম তসর গছাবে ?' হেসে জিজ্ঞেস করেছিলাম।

বুড়ো মা কালীর মত জিভ কেটে বলেছিল, 'ছি ছি দাদা, আপনাকে আমি খদ্দেরের চোখে দেখি না। দেখে শুনে আপনার যদি কিছু পছন্দ হয়, সেটা আলাদা কথা। আসলে কথাটা কি জানেন দাদা, যজমানরা আমার খদ্দের. আবার কলকাতায় তাদের বাড়িতে যেয়ে আমাকে উঠতে হয়। বড় লজ্জা করে। তাই বলছিলাম, পুজোর মাস খানেক আগে কয়েকটা দিনের জন্যে যদি আপনার কলকাতার বাসায় একটু মাথা গোঁজবার ঠাঁই দেন, তাহলে বর্তে যাই।'

সত্যি কথা বলতে কি, বুড়োর সেই আচমকা প্রস্তাবটা আমার মোটেই ভাল লাগে নি। আবদারটা যে আসলে ওর একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব হতে পারে, আমি আদৌ তা বুঝতে পারি নি। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমার কলকাতার বাসা, মানে বাসাই। মাথা গোঁজবার ঠাঁই বলা চলে। সেখানে ও গিয়ে উঠবে ওর রেশম তসরের বোঁচকাবুঁচকি নিয়ে ভেবেই কি রকম অস্বস্তি হচ্ছিল। অথচ এক কথায় 'না' বলে দিতেও কেমন যেন বাধছিল। তা ছাড়া, আমিই কলকাতার বাসার একলা বাসিন্দা না। পরিবার পরিজন নিয়ে আমার বাস। আমি একটু দ্বিধা করে বলেছিলাম, 'তুমি তোমার দাশপুরের বাড়ির ঠিকানাটা আমাকে দিয়ে দিও, আমি তোমাকে লিখে জানাব।'

বুড়ো গ্রাম্য হতে পারে, কিন্তু বোকা না। তাড়াতাড়ি বলেছিল, 'আমার থাকা খাওয়ার কথা আপনাকে ভাবতে হবে না দাদা। সে আমার ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। যজমানদের তো সে-কথা বলতে পারি না অথচ থাকতে লজ্জা করে। তারা ছাড়েও না, কিন্তু তাদের মনের কথা বুঝতে তো পারি। আপনার ঘরে কেবল আমার মালটা রাখব—তাও সারাদিন ঘুরে রাত্তিরে। সারাদিন তো আমার বাইরে বাইরেই কাটবে।'

বুড়ো কুণ্ঠিত হেসে কথাগুলো বলেছিল, কিন্তু আমার চোখে ওর সেই মুখ, সেই হাসি, আর কথা বলার ধরনটা বেশ করুণ লেগেছিল। আমি মনে মনে, দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোটানায় পড়ে গিয়েছিলাম। বুড়ো আবার বলেছিল, 'তাই হবে দাদা, আপনি আমাকে চিঠি লিখে জানাবেন। আপনাকে আমি ঠিকানা লিখে দোব। তবে দাদা, মনে কিছু রাখবেন না, অসুবিধে হলে সে-কথা লিখে দেবেন। মনে এল, তাই বললাম, তা বলে মানুষের সুবিধে অসুবিধে দেখতে হবে না? এ তো আর গাঁ ঘরের কথা নয়, এস বস খাও শোও, যেমন ইচ্ছে তেমন থাক। কলকাতা বলে কথা।'

বুড়ো তারপরেও অনেক কথা বলেছিল, কিন্তু আমি ক্রমেই অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলাম। মনে হচ্ছিল, ও প্রস্তাবটা করেই আমার কথা শুনে লজ্জা পেয়ে গিয়েছে, আর সেই লজ্জা ঢাকবার জনেই নানা কথা বলে যাচ্ছে। আমি অন্যমনস্ক অস্বস্তিতে চুপ করেই ছিলাম। আর আমার কানে বাজছিল, 'আমার থাকা খাওয়ার কথা ভাবতে হবে না দাদা···আপনার ঘরে কেবল আমার মালটা রাখব।···এ তো আর গাঁ ঘরের কথা নয়, এস বস খাও শোও, যেমন ইচ্ছে থাক। কলকাতা বলে কথা।'···শেষের এই কথাগুলো আমি বিদ্রূপ বলে মনে করতে পারতাম। কিন্তু বুড়োকে আমি যতটুকু বুঝেছিলাম, ও আমাকে বিদ্রূপ করতে পারে, সেটা অভাবিত। ও ওর ধারণা আর বিশ্বাসেই কথাটা বলেছিল। আমি অস্বস্তির ভাবটা কাটাতে পারছিলাম না, মনটাও খচখচ করছিল। আমি ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কলকাতায় তোমাকে ক'দিন থাকতে হয়?'

বুড়ো বলেছিল, 'ক'দিন আর। চার পাঁচ দিন, বড় জোর সাত দিন। বৎসরান্তে ক'দিনের ঠিকা ব্যবসা, বুঝতে পারছেন তো দাদা। এ তো আর আমার সারা বছরের কারবার নয়, ভাত কাপড়ের তাগিদেও করি না। পুজোর সময় হাতে দু-চারটে টাকা আসে, বাড়ির সকলের জন্যে এক আধখানি নতুন জামা-কাপড় কেনাকাটা করতে পারি. আপনাকে আর কি বলব, বুঝতেই পারছেন, ওতেই আমাদের অনেক সাধ মিটে যায়। তবে দাদা, আপনি ভাববেন না। আপনাকে সামনে পেয়ে কথাটা মুখ থেকে খসে গেল, আর যজমানদের কথা ভেবে, আপনাদের নিমিই কথাটা বলতে বলেছিল। তা সে থাক, আপনাকে ও নিয়ে এত ভাবতে হবে না।'...ওর কালো মুখে সাদা ঝকঝকে দাঁতের হাসিটা বড় করুণ আর কুণ্ঠিত দেখাচ্ছিল।

নিমির নামটা শুনে আমার অস্বস্তি আরও বেড়ে উঠেছিল। আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা থাকা সত্ত্বেও, শেষ পর্যন্ত আমি না বলে পারি নি, 'ভাববার আর কি আছে? এ তো সামান্য কয়েকদিনের ব্যাপার। তোমার সময় মত তুমি আমাদের কলকাতার বাড়িতে চলে এসো। তাতে তোমার যদি কিছু সুরাহা হয়, ভালই তো।'

বুড়োর কালো মুখখানি,বড় বড় চোখ দুটো খুশিতে জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠেছিল এবং বলেছিল, 'কিন্তু দাদা, আপনাদের যদি অসুবিধে হয়

'সে তো তোমারও হতে পারে।' আমি হেসে বলে উঠেছিলাম, 'কয়েকটা দিনের জন্যে সুবিধে অসুবিধেটা ভাগাভাগি করে নেওয়া যাবে।'

বুড়ো খুশিতে উপচে উঠে, আমার পায়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি ওর হাত দুটো চেপে ধরেছিলাম। একজন ব্রাহ্মণের ছেলে হয়ে আমার পায়ে হাত দেওয়াটা গ্রামীণ ব্রাহ্মণদের পক্ষে কতখানি বিগর্হিত ব্যাপার, আমি তা ভালই জানি কিন্তু আমার ব্রাহ্মণ আত্মীয়-স্বজনরা বিষয়টিকে সহজ করে নিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কি, বুড়োকে কলকাতার বাসায় আসবার অনুমতিটা দিয়েও, বাড়ির লোকদের কথা ভেবে, আমি মনে মনে বেশ কিছুটা উদ্বিগ্নই ছিলাম। আমার বাড়িতে আমি কর্তা হতে পারি, তবে সেটাই শেষ কথা না। পরিবারের—বিশেষত আমার স্ত্রীর ভাল-মন্দ বোধের প্রশ্নটা কোন রকমেই এড়িয়ে যাওয়া যায় না। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, বুড়োর আসা নিয়ে, আমাদের পরিবারে কোন সংকটেরই সৃষ্টি হয় নি।

মুখে আমরা যা-ই বলি না কেন, স্বার্থের ভাবনাটা আমাদের সকলেরই কম বেশি থাকে। সেদিক থেকে বুড়ো আমাদেরই বরং লজ্জা দিয়েছে। ও গত তিন বছর ধরে, পুজোর মাসখানেক আগে আমাদের কলকাতার বাড়িতে আসছে। এটা ওর চতুর্থ বছর। গত তিন বছর. প্রত্যেকবারই ওর রেশম তসরের গাঁটরি ছাড়াও, আমাদের জন্যে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এসেছে নারকেল, ডাব, মোচা, কলা, এমন কি

থোড় আর বড়িও বাদ যায় নি। আমি বা আমার স্ত্রী, হা হা করে উঠলেও, মনে মনে বেশ খুশিই হয়েছি। তা ছাড়া, সব থেকে বড় কথা যা, তা হল, বুড়ো যে ক'দিন থাকে, রাত্রে ছাড়া সারাদিনে ওর অস্তিত্ব টেরই পাওয়া যায় না। ও আমাদের সকলের আগে, ভোরবেলা উঠে বেরিয়ে যায়, সারাদিনে আর ফেরে না। মাঝে মাঝে এমনও হয়েছে, রাত্রেও ফেরে নি। জিজ্ঞেস করলে জবাব পেয়েছি, 'বড়বাজারে নতুন মহাজনদের সঙ্গে খাতির জমে গেচে, তাদের একজনের গদীতেই ছিলাম।

জানি না, বুড়ো কতখানি কুণ্ঠা আর সংকোচের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসে আর থাকে, কিন্তু ও যে খুবই সচেতন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এ বছরটা আমি এক রকম নিশ্চিন্ত ছিলাম, বুড়ো আসতে পারবে না। বরং খবরের কাগজ পড়ে, আমি যে অস্থিরতা বোধ করছি, তার একটা কারণও বুড়োদের পরিবার। ঘাটাল দাশপুরের ভয়াবহ খবর পড়ে, বুড়োদের জন্যে একটা অসহায় উদ্বেগ আর অস্থিরতা বোধ করা ছাড়া, কিছুই আমার করার ছিল না। তার মধ্যেই এল নিমির এই মর্মান্তিক চিঠি। "ও আপনার কাছে গেচে।" তারিখ আর সময়টাও স্পষ্ট করেই লেখা রয়েছে "১৬ই ভাদ্র শনিবার।" ভোর রাত্রের অন্ধকার থাকতেই এক কোমর জল ভেঙে, গাটরি মাথায় ছাতা ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল। আজ ২১শে ভাদ্র, বেস্পতিবার। দিনের হিসাবে আজ ষষ্ঠ দিন। ভাদ্র মাসের ১৬ তারিখেই তো বুড়োর কলকাতা পৌঁছুনো উচিত ছিল। কিন্তু ও আসে নি। এই ছ'দিন ও কোথায় ঘুরছে? ও কি কোন যজমানের বাড়িতে উঠেছে? অথবা বড়বাজারের কোন গদীতে? তা যদি হবে, আমাকে কি একটা খবর দিত না?

আমার চোখের সামনে, বুড়োর মাথায় গাঁটরি আর ছাতা ঢাকা দেওয়া চেহারাটা ভাসছে। ও কোমর জল ভেঙে হেঁটে আসছে। অথচ, আশ্চর্য আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, কারণ খবরের কাগজে দেখছি ১৫ই ভাদ্র শুক্রবার গভীর রাত্রে ঘাটাল একতলা সমান জলের নিচে ডুবে গিয়েছে। দাশপুর সেখান থেকে কতটুকু দূর? অথবা দাশপুরের সেই গ্রাম? সেখানকার মানুষ তখন বৃষ্টির জল ভেবে, কোমর জলে কেমন করে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? সেই অঞ্চলও কি একতলা সমান ডোবে নি?

ডুবেছে। নিমির থেকে আমার আরও বেশি অজানা, কেন একসঙ্গেই শুক্রবার রাত্রে ঘাটালের পার্শ্ববর্তী দাশপুরের সব অঞ্চল ঘরের মাথা ছাপিয়ে ডুবে যায় নি। আমি ওর চিঠিটাই আবার মেলে ধরলাম, "আর দুলালের সঙ্গে ফিরতি মিছিল-গাড়িতেই ওকে পাটিয়ে দেবেন। বলবেন, তা নইলে আমার মরণ কেউ ঠেকাতে পারবে না। দাদা, ভাববেন না, বানের জলে আমি ডুবে মরতে বসিচি। আমি এখন খুব ভাল জায়গায় আছি। পাশের গাঁয়ের একমাত্তর তেতলা বাড়ি, আমার শ্বশুরবাড়িরই আত্মীয়সূত্রতায় জ্ঞাতিদের বাড়ি। কিন্তু দাদা বড় পাপের জায়গায় এসে উটিচি! তবে সে-কথা পরে, আগে আমাদের সব বৃত্তান্ত লিখি। লিখব

কি, লিখতে হাত সরচে না দাদা। আমরা বৃষ্টির জল ভেবে নিশ্চিন্ত ছিলাম, কিন্তু ও চলে গেল আর আশেপাশের লোকের মুখে নানান কথা শুনতে লাগলাম। কেউ বলচে কাঁসাইয়ের হানা দিয়ে জল আসচে, কেউ বলচে শিলাইয়ের বাঁধের হানা দিয়ে উবজেচে, আবার কেউ বলচে রূপনারাণ ধেয়ে আসচে। গাঁয়ে লোকের হাঁকডাক কান্নাকাটি। সবাই গরু বাছুর ছাগল হাঁস উঁচু জায়গায় নিয়ে তুলচে। যাদের দোতলা ঘর আচে, তারা সেখানেই গরু ছাগল ঠেলে তোলা করচে। আমরাও বাদ যাই নি। তখনও ভাবচি, মাটির ঘরের দোতলায় থাকলে বিপদে পড়ব না।

"দাদা, ভগবানের কি কল, ও চলে গেল, ঘণ্টা দুয়েকও হয় নাই, আমরা সব দোতলা ঘরে তোলা করচি। বৃষ্টি তো আছেই, আচমকা দেখি চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে জল আসচে। দেখতে দেখতে মাটির ঘরের একতলায় কোমর সমান জল। প্রথম আমার খুড়োশ্বশুরের মাটির দোতলা ভেঙে পড়ল, তার শব্দেতেই মরে যাবার মতন হল। আর মানুষ গরু ছাগলের কি হাঁক চিৎকার! সারা গাঁ ঘরে কান্না-কাটি, কে কাকে দেখবে। আমার দেওর আর দুলাল তাড়াতাড়ি দক্ষিণের বাগানের একটা বড় আম গাছে মই ঠেকিয়ে আমাদের ডেকে উটতে বলল। বললেই কি উটা যায়? দেখতে দেখতে জল বাড়চে, আর জলের কি তোড়, কি মাতন। কোন্ দিক থেকে আসচে, কোন্ দিকে টানচে, কিছু বুঝতে পারি না। তখন আমাদের মাথা ডোবা জল। দুলাল ওর তিন বছরের বোনটাকে আগেই টেনে গাছে তুলেচে, সে আবার আমার ভারি ন্যাওটা, খালি কাকি কাকি বলে কাঁদচে। আমি ভেসে গাছ জড়িয়ে থাকলাম, ওদিকে আমার জাকে ঠাকুরপো টেনে আনচে মইয়ের কাছে। জা সাঁতার জানে, কিন্তু তোড় ঠেকাতে পারচে না। ঠাকুরপোর এক হাতে জায়ের এক বছরের ছেলেটা। জা কোন রকমে গাছ ধরে মই বেয়ে ওপরে উটল। ঠাকুরপো তার হাতে ছেলে দিল। তারপরে আমি উটলাম। তখনই দুলাল হাঁক দিল, টেঁপি—অ টেঁপি, কোতায় গেলি লো। মনে আছে তো দাদা, টেঁপি আমার সেই ভাসুরঝি, এগার ক্লাসে পড়ত। ভাসুর তখনও দোতলার ঘরে, সেখান থেকে বলল, টেঁপি তো তোদের কাচেই গেচে। কিন্তু কোতায় টেঁপি, কোতাও নাই। দাদা সর্বনাশের কথা কি বলব, জা দু হাত তুলে হাঁক দিল টেঁপি লো, আর অমনি ঝপাসে তার ছেলে পড়ে গেল জলে। পড়ল আর ডুবল, তোড়ে ভেসে গেল, দুলাল জলে ঝাঁপ দিল। আমার জাও ঝাঁপ দিতে যাচ্ছিল, আমি হাত টেনে ধরলাম। আমার কি শক্তি দিদিকে ধরে রাখি। সে আমার হাত ছাড়িয়ে নিতে গেল, আর কান্না, অরে আমার খোকা কোতায়। তখন ঠাকুরপো বউদির চুলের মুটি চেপে ধরল, ওদিকে ভাশুর দোতলার ঘর থেকে নামচে না। দুলাল ফিরে এল খালি হাতে, গাছে উটে বাপকে ডাকল। ভাশুর হেঁকে বলল, গরু বাছুর না নিয়ে সে ঘর ছাড়বে না। দুলাল মুখ খারাপ করে বাপকে ডাকল, উপায়ান্তর না দেখে আবার

জলে ঝাঁপ দিল। একতলা তখন ডুবুডুবু তার ভিতরেই ঘরে ঢুকে উপরে উটে, বাপকে টানতে টানতে জলে ভাসিয়ে নিয়ে এল। ভাশুর তখনও তার কোমরের কষিতে কিছু গুঁজচে। হয় তো নগদ টাকা যা ছিল সামান্য, আর সোনা দানার দু একটা টুকরো। দাদা, ভাশুর আমার প্রাণে মরত। দুলাল তাকে নিয়ে গাছে উটতে না উটতেই, আমার এতকালের শ্বশুরেঘর মুখ থুবড়ে পড়ল। গরু বাছুরগুলো ভাসল। তাদের মরণ ডাক এখনও শুনতে পাচ্ছি। ভাশুর পাগলের মতন গাছে মাথা ঠুকে ঠুকে রক্ত বের করে ফেলল। তাকে ধরে রেখেচে দুলাল, দিদিকে ধরেচে ঠাকুরপো। তিন বছরের মেয়েটা আমার কোমর জড়িয়ে কাঁদচে।

"দাদা, সর্বনাশের বাখান আর লিখতে পারচি না। একটা ছেলে গেল টেঁপির খোঁজ নাই—।"···হ্যা, টেঁপিকে আমি বিষ্ণুপুরে দেখেছিলাম। কালো ছিলছিলে হাসিখুশি চেহারা, তেমন ময়লা কাপড়চোপড় পরে থাকলে, ওকে বাউরিদের মেয়ে ছাড়া কিছু মনে হত না। কিন্তু ও সেজেগুজেই থাকত, আর চোখে মুখে ধারালো বুদ্ধির ছাপ ছিল। শুনেছি, মেয়েটি লেখাপড়ায় ভাল ছিল। ঘাটালের কলেজে সে পড়তে যাবে, এই তার বড় সাধ ছিল। তার ভাল নাম ছিল ঝরনা। আমার মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় সেই হাসিখুশি কালো, ছিলছিলে মেয়েটি, নিমির চিঠির ওপরে ভেসে উঠল। আবার নিমির চিঠির কথা পড়লাম,···"টেঁপির খোজ আর কোন দিন পাওয়া যাবে না। দাদা, টেঁপি সাঁতার জানে, তবু কি করে ভেসে গেল। দুলাল আর ঠাকুরপো সাঁতার দিয়ে কলাগাছ কেটেছে, গাছের উপর তোলা করেচে, বেঁধেচে। দুদিন কেউ খোঁজ করে নাই। লজ্জার কথা না দাদা, ঘেন্নার কথা, ময়লা কাপড়ে দুদিন কেটেচে, খাওয়া তো দূরের কথা, তারপরে নৌকা নিয়ে এসেচে গাঁয়ের জোয়ান ছেলেরা, সবাইকে ইস্কুলবাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য। কিন্তু ভগবানের কি মতি, তখনই আর একখানা নৌকা আমাদের গাছের সামনে এসে ভিড়ল। জল তখন কিছু নিচের দিকে, টান বেজায়। এসে আমার ভাশুরকে ডেকে একজন বলল, আপনাকে নিতে এসেচি রতনদা পাটিয়েচেন। নাম শুনেই চিনতে পারলাম, রতন চক্রবর্তী, আমাদেরই জ্ঞাতি, মস্ত বড়লোক, গাঁয়ের বুকে তেতলা বাড়ি। ভাবুন, আমাদের গাঁয়ের মুখে একতলা হাসপাতাল ডুবে গেছে, (আসলে হেল্থ সেন্টার) ইস্কুলের একতলাও ডুবেচে। আমার ভাশুর যাব না যাব না বলে হাঁক। ঠাকুরপো ঠেলে তুলে দিল নৌকায়। আমরাও সবাই উঠলাম। কিন্তু জানি না, আমারই মনের পাপ হবে বা, রতন চক্রবর্তী আমার সম্পর্কে ভাশুর হলেও, লোকটাকে কোন দিন ভাল লাগে নাই। এক একজনের চোখ মুখ হাসি দেখলেই কেমন যেন লাগে। লোকটার সামনে বেরলেই যেন কেমন গায়ে কাঁটা দেয়। দুলালের মেজকাকাও (বুড়ো) তার দাদাটিকে দেখতে পারে না। তবে সেই সময় মনে হল, আমাদের মতন ভাগ্যি কারুর নাই।

"দাদা, আজ ২০শে ভাদ্র, বৃষ্টি এখন নাই। তেতলার এক ঘরে বসে আপনাকে ছাই মাথা কি লিখচি জানি না। পাশের ঘরে বেটারির রেডিও বাজচে। গান বাজনা শোনা যাচ্ছে। এ বাড়িতে বেছে বেছে লোক তোলা হয়েচে। কোতা থেকে এত এত পোঁটলা খাবার আসচে, কোতা থেকে নৌকায় করে টিন টিন কেরোসিন আসছে, তেরপল পলিতিন আসচে, কিছু বুঝতে পারচি না। কি বলব দাদা, যেন এক যজ্ঞিবাড়িতে রয়েচি। খাবারের কোন অভাব নাই। আর আমার জ্ঞাতি ভাশুর—দাদা লিখতে লজ্জা করে, এর মধ্যে মদ খাচ্ছে। দু চারটি মেয়েমানুষকে দেখে আমার ভয় লাগচে, তারাও যেন মেতে উঠেচে, আর ভাশুরের সঙ্গে এক ঘরে দরজা বন্ধ করে কি হাসাহাসি করচে। গেল কাল ১৯শে ভাদ্র দিনের বেলা এসিচি, সন্ধের ঝোঁকেই জ্ঞাতি ভাশুর আমার হাত ধরে টানল। তার বউ এসে না পড়লে বোধ হয় ছাড়ত না।

"এ কার পাপ, কিসের পাপ জানি না, রাজ্যের মানুষ ডুবচে মরচে, চারদিকে মড়ার গন্ধ, তার মধ্যে এই পাপ। কেন বলচি দাদা, আমার জ্ঞাতি ভাশুরের বাড়িতে দেখচি ষণ্ডাগুণ্ডার মতন সব ছেলেরা রয়েচে, তাদের ভাবসাবও ভাল ঠেকচে না। তাদের চোখ টকটকে লাল, খলখল হাসচে, থেকে থেকে নৌকা নিয়ে চলে যাচ্ছে, আর খাবার দাবার বিস্তর দ্রব্য সব নিয়ে আসচে। আজ সকালেও জ্ঞাতি ভাশুর কয়েকবার আমাকে ধরবার ফাঁদ করেচে, পারে নাই। আমি একটা কাটারি যোগাড় করে কোমরে গুঁজেচি। কাগজ কলম যোগাড় করে, একঘর লোকের সামনে আপনাকে চিটি লিখচি। আমার নিজের জা ভাশুর পাগল পাগল মতন হয়েচে, কথা বলে না। দিদির তিন বছরের মেয়েটা সব সময়ে আমার আঁচল ধরে আছে। দাদা আর লিখতে পারি না। ওকে বলবেন, কাটারি সম্বল করে এখন বেঁচে আছি, ও যেন দুলালের সঙ্গে ফিরতি মিছিলগাড়িতে কাল চলে আসে। মা দুর্গা যখন আমাদের দেখলেন না, তখন ও আর কি করবে। দিনকাল ভাল হলে আবার কোতায় আপনার দেখা পাব জানি না। আমার প্রণাম নিবেন। ওকে ফিরে আসতে বলবেন। ইতি… ।"

আমি আবার ওপরের লেখা পড়ছি, ভাবছি, বন্যার তাণ্ডবের কথা সবাই জানে। সেই ভয়ঙ্কর মৃত্যুলীলার মধ্যে মানুষের এই পাপের ঘটনা অবিশ্বাস্য লাগছে। বুঝতে পারি না, কে বেশি ভয়াবহ। মানুষ, না প্রকৃতি? কিন্তু আমরা তো জানি মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। সেই জানাটাই কি নিমির কোমরে গোঁজা কাটারি?

যেন তাই হয়। নিমি, তুমি মহিষমর্দিনী হও। কিন্তু ভাই, যে আমার কাছে আসে নি, তাকে আমি তোমার কাছে ফেরত পাঠাব কেমন করে? সে কোথায়? বুড়ো? যোলেই ভাদ্র শনিবার ভোর রাত্রে বেরিয়ে—। মুহূর্তেই আমার মস্তিষ্কে যেন বিদ্যুৎ ঝলক ফালা ফালা করে দিল। দুলাল এসে কেবল চিঠিটাই

দিল, কিন্তু একবারও তো জিজ্ঞেস করে নি, মেজকাকা ভাল মত পৌঁছেছে কি না? অথবা মেজকাকা কোথায়। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে, চিৎকার করে ডাকলাম, 'দুলাল, দুলাল এ ঘরে এসো।'

আমার পাশের ঘরে এখন স্তব্ধতা। দুলাল এসে আমার সামনে দাঁড়াল। আমি ওর গর্তে ঢোকা চোখের দিকে তাকালাম, চেষ্টা করলাম গলার স্বর অকম্পিত রাখতে। বললাম, 'দুলাল, বুড়ো তো আমার কাছে আসে নি।'

'জানি।' দুলাল মুখ ফিরিয়ে নিল।

তীক্ষ্ণ কশাঘাতে চমকিয়ে উঠলাম, 'জানো! কি জানো?'

'কাকা, মোটর বাসের চাতাল তক্ পৌঁছতে পারে নাই।' দুলালের স্বর যেন সেই দূরের গ্রাম থেকে ভেসে আসছে, 'মাইল দুয়েক আগেই কাঁসাইয়ের হানায় তলিয়ে গেচে।'

আমি দুলালের মুখের দিকে তাকালাম, বুকের মধ্যে খামচাচ্ছে। দুলালের গলা আগের থেকে স্বচ্ছ, চোখে ওর জলের কোন আভাসই নেই। আমার গলার কাছে শক্ত কিছু আটকে যাচ্ছে, তবু জিজ্ঞেস করলাম, 'কেমন করে জানলে?'

'কাকাকে সবাই চেনে, সবাই বলেছে। গাঁটরি ছাতা, সব পাওয়া গেচে। সে-সব আমাদের বাড়ি থেকে তিন মাইল দূরের এক পঞ্চায়েতের লোকের কাছে রাখা আচে, আমি আসবার সময় দেখে এসিচি।' দুলাল আমার দিকে না তাকিয়ে, সেই দূর থেকে ভেসে আসা স্বরে বলল।

আমি মুহূর্তেই আমার সমস্ত ধৈর্য হারালাম, রূঢ় তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলাম, 'তার পরেও তুমি কাকির চিঠি নিয়ে আর আমার কাছে এলে কেন?'

দুলাল আমার দিকে তাকাল। অন্ধকার কোটরে সেই দুই চোখ, দৃষ্টিতে ভয়, না ব্যথা না যন্ত্রণা, কিছুই বুঝতে পারছি না। ও কোন জবাব দিল না। ওর মাত্র কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার চিত্রগুলো নিমির চিঠির অক্ষরে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। আমি ওর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে পারলাম না, মুখ ফিরিয়ে নিলাম আর আমার ধৈর্যচ্যুতির রূঢ় তীক্ষ্ণতা সবেগে ধাক্কা খেয়ে, আমাকে কোন্ অতলে টেনে নিতে লাগল। আমি অনুভব করলাম, আমার মস্তিষ্কটা একটা বিশাল মৃত্যুপুরীর মত হয়ে উঠছে, আর সেখানে প্রতি কক্ষে, কোণে, রন্ধ্রে নিমির চিৎকার বাজছে, 'ও আপনার কাছে গেচে। ও আপনার···।'

এস্প্ল্যানেড

রাত পুইয়ে এল। তবু খানিক দেরি আছে। সময়ের মাপে নয়। আকাশের মুখ কালো। আশ্বিনের শেষ। হেমন্ত আসছে। তবুও আকাশে বর্ষার মেঘবতীর গোমড়া মুখের ছায়া।

এ সময়ে কলকাতা থেকে কিছুদূর উত্তরে মাঠের মাঝে রেল স্টেশনটা যেন একটা বোবা বন্ধভূমি। স্তিমিত কয়েকটা আলো যেন অতন্দ্র প্রহরীর মত নিষ্পলক চোখে কিসের প্রতীক্ষা করছে। প্ল্যাটফর্ম, টিনের ছাউনি, দরজা-বন্ধ আপিস, খোঁচা লোহার বেড়া আর অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া মাঠ, জলা, সব বোবা, তবু জীবন্ত। নিশ্চল, তবু অনুভূতিময়।

থেকে থেকে আসছে একটা পুবে হাওয়ার ঝোড়ো ঝাপটা। পূর্ব আকাশে সামান্য আলোর ইশারা। সে আলোয় মেঘ দেখাচ্ছে যেন ছড়ানো লটবহর।

ঘটাং করে একটা শব্দ এল দূর থেকে। সিগন্যালের খবরদারি লাল চোখ বুজে গেল, ভেসে উঠল নীল চোখের আমন্ত্রণ। আসছে। ভীত পাখি কিচির-মিচির করে উঠল সিগন্যালের মাথার বাসা থেকে। আবার চুপচাপ।

দু-একজন করে লোক আসছে স্টেশনে। ধীরে নিঃশব্দে। বড় বড় ছায়া ফেলে, গা হাত পা এলিয়ে। স্টেশনের বাইরে আচমকা কালো আঁধার থেকে যেন হঠাৎ প্রতীক্ষারত আততায়ীর দল বেরিয়ে আসছে। আসছে।

তারপর বোঝা গেল সেই চিরপরিচিত কাশি। ঘুংরি কাশি। কাশি নয়, যেন কামারের নেহাই-এর বুকে হাতুড়ির ঘা। তীব্র শ্বাসরোধী, একটানা। কাশি শুনে বোঝা যায় না লোকটার বয়স, বোঝা যায় না মেয়ে না পুরুষ।

স্টেশনের পূর্বদিকের অন্ধকার মাঠ থেকে কাশিটা ধেয়ে এল প্ল্যাটফর্মের দিকে। সেই সঙ্গে কাশির প্রতি ক্ষমাহীন অস্ফুট কটূক্তি, 'শালার কাশির আমি ইয়ে করি।'

গাড়ি এসে পড়ল। তার কপালের তীব্র আলোয় দেখা গেল দুটো ভেজা লাল চোখ, শুকনো মোটা ঠোঁটের ফাঁকে লালচে ছোট ছোট দাঁত, কোঁচকানো মুখ, তামাটে রং, চট ফেঁসোর মত চুল, চটের বস্তা কাঁধে, গায়ে বুক-খোলা একটা তালি মারা হাঁটু পর্যন্ত হাফশার্ট, তার তলায় প্যান্ট বা কাপড় কিছু আছে কিনা বুঝবার

যো নেই। তার তলা থেকে নেমে এসেছে দুটো কঞ্চির মত পা আর পায়ের পাতা যেন পাতিহাঁসের চ্যাটালো পা। থ্যাবড়া, মোটা ফাঁক ফাঁক আঙুল। লম্বায় আড়াই হাত। সমস্তটা মিলিয়ে এমন একটা তীক্ষ্ণতা, যেন তলোয়ার নয়, বেখাপ্পা খাপে ঢাকা একটা শাণিত গুপ্তি।

বয়স বিশ কি পঞ্চাশ কি বারো, বোঝার উপায় নেই।

তবে আসল বয়স তেরো। নাম গৌরাঙ্গ। অর্থাৎ গোরা।

তবে যদি জিজ্ঞেস কর, 'তোর নাম কি র‍্যা ?'

শুনবে দোআঁশলা স্বরের জবাব, 'গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

এস্‌মাল্‌গার অর্থে স্মাগলার। কিসের স্মাগল্‌ ? অমনি শুনবে যাত্রার সুরে,

চাল চুলো নেই বেচালেরে
আমি যোগাই চাল।

দেখা যাবে, গাড়ির কামরার মধ্যে সে গানের দোহার আছে গণ্ডা কয়েক। তারাও গেয়ে উঠবে। সবাই এস্‌মাল্‌গার।

আশি মাইলের মধ্যে যে কটা জংশন স্টেশন আছে, সবগুলোর পুলিস রিপোর্টের খাতায় একটু নজর করলেই দেখা যাবে নাম, গৌরাঙ্গচন্দ্র দাশ, বয়স তেরো, অপরাধ বে-আইনী চাল বহন (পনের সের), কোর্টে প্রডিউসের অযোগ্য। অতএব··

গোরাচাঁদ তিনবার জেল খেটেছে। একবার পুরো একমাস, একবার পঁচিশ দিন আর আঠারো দিন একবার। জেলে ছোকরা ফাইলে থেকে জীবনের নোংরামি ও সর্বনাশের এক ধরনের শেষতলা অবধি সে দেখেছে। বুঝেছে কিছু কম। তবে নেশা তার জীবনের যেটা ধরেছে সেটা সর্বনাশের।

একবার ট্রেনের মধ্যে শুনল, সামনের স্টেশনে পুলিস রয়েছে চাল ধরার জন্য। গাড়ি স্টেশনে ঢোকবার আগেই গোরা প্রথমে ফেলে দিল তার পনের সেরের ব্যাগ, তারপর লাফ দিয়ে পড়ল নিজে।

একমাস পরে যখন হাসপাতাল থেকে এলো তখন তার গায়ে মাথায় অনেকগুলো ক্ষতের দাগ আর সামনের মাড়ির একটা দাঁতের অর্ধেক নেই, বাকীটা নীল হয়ে গিয়েছে। ফলে, তার পাকা পাকা মুখে যেটুকু ছিল ছেলেমানুষির অবশিষ্ট, তা হল এক মহা ফেরেব্বাজের হাসি।

তার পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো এস্‌মাল্‌গার বন্ধু রসিকতা করে বলল, 'বাবা গোরাচাঁদ, তোমার সেই চালগুলান এ্যাদ্দিনে গাছ হয়ে আবার ধান ফলেছে।'

অর্থাৎ, যে চাল নিয়ে সে লাফিয়ে পড়েছিল। যেমনি বলা, তেমনি দেখা গেল একরাশ বাদামের খোসা ও ধুলো বুড়োর মুখ চোখ ঢেকে দিয়েছে। সুতরাং গালাগাল আর অভিশাপ। কিন্তু ওসব তুচ্ছ ব্যাপারে গোরাচাঁদ মাথা ঘামায় না।

গাড়ি এল। গোরা তখন দম নিচ্ছে কাশির দমকের। স্টেশনের কুলিটা বিরক্তিভরে এমন করে এসে ঘণ্টা বাজাল, যেন কোন রকমে কর্তব্য সারা গোছের

পাড়ার নেড়ি কুকুরটার খিঁচোনি। গাড়ি যখন ছাড়ল তখন গোরা তার পছন্দসই কামরা খুঁজতে লাগল।

গাড়ির গতি বাড়ল তবু কামরা আর পছন্দ হয় না। সেই মুহূর্তে একটা কামরা থেকে কে চেঁচিয়ে উঠল, 'এ্যাই শালা গোরা!'

চকিতে কি ঘটে গেল। দেখা গেল, গোরা সেই কামরার হাতলে বাদুড়ের মত ঝুলছে আর তার বন্ধুরা চিৎকার জুড়েছে তাকে পেয়ে।

ব্যাপারটা বিপজ্জনক, কিন্তু ওটা অভ্যাস। একদিন ছিল, চেকার আর পুলিসের ফাঁদে পড়ার ভয়ে দেখে শুনে নিতেই গাড়ি ছেড়ে দিত, দৌড়ে উঠতে হত। এখন তো দুটো চোখ নয়, চোখ চারটে এবং সচকিত। তবু ধীরে সুস্থে থামানো গাড়িতে উঠবে, মনের এতখানি সুষ্ঠুপনা ভাবাই মুশকিল।

এর মধ্যে টিকেট কাটার কথা কল্পনাই করা যায় না। মূলধন তো পনের সের চাল। এ পনের সের আর কোন দিন আধমণে পৌঁছল না। অর্থাৎ ষাট মাইল দূর থেকে পনের সের চাল আনলে, প্রতি সেরে কোন দিন দু-আনা, দশ পয়সা, কখনও বা মেরে কেটে তিন আনা তার থাকে। সারাদিনে খাবার বরাদ্দ চার আনা থেকে পাঁচ আনা। বাকীটা বাড়িতে দিতে হয়। সেখানে আছে ছোট ছোট পাঁচটা ভাইবোন, আর একটি তার মায়ের পেটে বাড়ছে। বাপ না থাকার মধ্যে। অন্তত গোরার কাছে। সে লোকটি এককালে ছিল নিম্নবিত্তের ভদ্রলোক। আশা ছিল বিত্তমান হওয়ার। এখন কলকাতার বাইরে রেফিউইজি ক্যাম্পে বসে সে আশা তো কবেই উধাও হয়েছে। উপরন্তু সে এখন গোরাচাঁদের রোজগারে নির্ভরশীল একজন অবাঞ্ছিত রুগ্নভার মাত্র।

সুতরাং এ যুগের বাঙালীরা বাঙালী গোরাকে চেনে না। দু-বছর আগে ওদের এলাকার রেশন ইনস্পেক্টর এসে যখন গোরার মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'হেড অব দি ফ্যামিলি কে?' তখন ইঞ্জিরি কথা শুনে গোরার মা হাঁ করে তাকিয়েছিল। ইনস্পেক্টর ব্যাপারটা বুঝে বললে, 'তোমাদের সংসারের কর্তা কে?' তখন গোরার হাত ধরে এনে তার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। ইনস্পেক্টর তো থ।

এর উপরে ষাট মাইলের ভাড়া দুটো টাকা যদি গোরা খরচই করতে পারবে তবে আর এসমালগার হওয়ার কি দরকার ছিল।

এর পরে গাড়ির মধ্যে সে এক তুমুল কাণ্ড! মস্ত লম্বা কামরাটার মধ্যে আর কোন যাত্রীকে চোখে পড়ে না কেবল গোরা আর তার সমবয়সী সঙ্গীদের ছাড়া। তারা সকলেই গোরার সহগামী ও সহধর্মী, সকলের প্রায় একই ছাঁচ, একই গড়ন। তবে নেতা হিসাবে তারা যে কোন কারণেই হোক, গোরাকেই মেনে নিয়েছে।

সমস্ত গাড়িটার মধ্যে তারা এককোণে দলা পাকিয়ে বসল। যেন একগাদা কুকুরের ছানা জড়াজড়ি করে পড়ে আছে।

একজন বলল, 'সেই গানটা ধর এবার।'

'কোন্‌টা ?'

'সেই ঠাকুরের নাম রে। আমাদের গোরা শালার নাম !'

বলতে বলতেই তারস্বরে চিৎকার উঠল ঃ

'এহ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম হে'

সেই সঙ্গে এ ওর আর ও এর পিঠে চালাল খোলের চাঁটি। এ ভজনার মধ্যেও ছিল গোরার চিল গলার 'সখী হে' বলে টান।

হঠাৎ একটা চিৎকারে ওরা সবাই থামল। দেখল, কামরাটাতে যাত্রী একজন আছে। কিন্তু যাত্রীটি ছিল বেঞ্চির তলায়। বোধ করি আত্মগোপনের আশায়। বুড়ো। দুটো ভাঁটার মত চোখ, একমুখ দাড়ি আর সারা গায়ে অজস্র তালিমারা আলখাল্লা। খেঁকিয়ে উঠল, 'বলি কোন্‌ সুখে র‍্যা, অ্যাঁই কোন্‌ সুখে ?'

অর্থাৎ কোন্‌ সুখে এ চেঁচামেচি। গোরার দলটা এ বেঞ্চির তলার যাত্রীর দিকে এক মুহূর্ত হাঁ করে তাকিয়ে রইল। লোকটা শাসিয়ে উঠল, 'ফের আমাকে জ্বালাতন করলে—'

অমনি গোরা টকাস্‌ করে তার এক বন্ধুর মাথায় চাঁটি মেরে বলল, 'এই, কেন জ্বালাতন করছিস রে ?'

বন্ধু আর এক বন্ধুর মাথায় মেরে বলল, 'আমি নাকি ? এই শালা তো।'

আবার সে মারল আর একজনের মাথায়। তারপরে দেখা গেল, গানের চেয়ে চেঁচামেচি আরও বেড়ে গেল, সেই সঙ্গে হুড়োহুড়ি আর কোস্তাকুস্তি। বুড়ো অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত মুখে ঘটনাটা লক্ষ্য করতে করতে তেলচিটে আলখাল্লাটা এমনভাবে ঝাঁকানি দিল যে একরাশ ধুলো ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। বললে, 'শালারা হনুমানের জার—'

তারপর গাড়িটা একটা স্টেশনে দাঁড়াতেই বুড়ো আলখাল্লা ঝাপটা দিয়ে নেমে গেল, যেন রাজা দরবার ত্যাগ করছেন। বললে, 'আচ্ছা দেখে লোব।'

এতক্ষণে গোরাদের দলটা পাছায় চাঁটি মেরে হেসে গড়িয়ে পড়ল। ছুটে নেমে পড়ল বাইরে। একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'ও দাদু, ও জগাই, ও মাধাই—'

বুড়ো ততক্ষণে আর একটা কামরাতে উঠে একটা বেঞ্চির তলায় আশ্রয় নিয়েছে আর বলছে, 'শালারা মাথার উকুনের হদ্দ।'

উকুনের হদ্দ দল আবার তেমনি জড়াজড়ি করে বসেছে। কিন্তু প্রত্যেক স্টেশনে তারা নামবেই। চুপচাপ বসেই যদি যাবে তাহলে আর ভাবনা ছিল কি। বোধ করি এই গান, মারামারি, খেলা, নিজেকে আর নিজের সব কিছুকে ভুলে থাকার এ অবিশ্রান্ত উম্মাদনা না থাকলে এ দীর্ঘ পথ, সময় হত মরুভূমি ও রুদ্ধশ্বাস যন্ত্রণা। তাছাড়া পথ অতি দুর্গম। কোথায় বাঘের মত ওত পেতে আছে চেকার, মোবাইল কোর্ট, পুলিস, ওয়াচ অ্যান্ড ওয়ার্ড আর কালকেউটের মত সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, বলা তো যায় না।

ভোর হয়ে আসছে। হাজারো মেঘের ভিড় আকাশে, তব্‌ মেঘে মেঘে অপ্রতিরোধ্য বেলা আসছে। প্‌বের ধ্‌সরতায় যেন ছাই চাপা ম্‌ক্তোর জেল্লা। টেলিগ্রাফের তার যেন একটা দিকপাশহীন বেহালার তার। সেই তারে তারে জটলা ন্যাজঝোলা পাখির।

যাত্রী বাড়ছে। বাড়ছে কোলাহল। ভিড় বাড়ছে গোরার সহধর্মীদের। যেতে হবে বহ্‌দ্‌রে। এক জেলা থেকে আর এক জেলায়, পথ মাঠ ভেঙে, গাঁয়ে হাটে। তারপর ফিরে আসতে হবে রেশন এলাকায়, কর্ডনের অবরোধ ভেঙে।

বিড়ি খাচ্ছে গোরা। খাচ্ছে না, ফ্‌কছে। ব্‌ড়ো মন্দ হন্দ হয় তার নাক ম্‌খ থেকে ধোঁয়া বের্‌নো দেখলে। স্টেশনের ধারে কোয়ার্টারের জানালায় বসে একটা ছেলে পড়ছিল, 'সাজাহান অ্যা অত্যন্ত হৃদয় –' কিন্তু থেমে গেল পড়া, চোখাচোখি হয়ে গেল গোরার সঙ্গে।

গোরা চোখ নাচিয়ে একম্‌খ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'কি পড়ছিস ? বিড়ি খাবি ?'

বিড়ি ? ছেলেটার চোখে কৌত্‌হল, বিস্ময় ও ভয়। ব্‌ক জোড়া কপাটে কপাটে যেন হাজারো করাঘাত পড়ল। খিলখিল করে হেসে চলন্ত গাড়িটাতে গোরা ন্যাকড়ার ফালির মত উড়ে গেল। হাসির রেশটা একটা ভয় ব্যথা আনন্দের শিহরণ রেখে গেল শ্‌ধ্‌ জানালায়।

হঠাৎ যেন থমকে যায় গোরা। ব্‌কের দ্র্‌ত তালে ভাঁটা পড়ে মন উজানে চলে। জলা মাঠে ছিটেবেড়ার ঘর, একগাদা প্‌তুল আর পেট-উঁচু মা। পেটের বোঝার ভারে নত, চোখের কোল বসা, চোপসানো গাল, একটা অর্থহীন যন্ত্রণাকাতর চাউনি। সেখানে জানালা নেই, সবটাই খোলা, নয়তো সবটাই বন্ধ। ভয় কৌত্‌হল বিস্ময় আনন্দ নেই। একটা তীব্র হাহাকারের অসহ্য নৈঃশব্দ্য আর কিসের তাড়নায় দিগন্ত থেকে দিগন্তে ছ্‌টে চলা কিংবা আচমকা একটা স্‌রতালহীন ভাঙা স্বর, 'আর বিড় খাস নি বাবা !'

চকিতে গোরার ম্‌খের উপর একটা থাবা পড়ে আবার উঠে গেল। দেখা গেল তার ম্‌খের বিড়িটা আর একজনের ম্‌খে চলে গিয়েছে। সেটা নিয়ে আর একজন, তারপরে আর একজন, তারপরে আবার হল্লা ও চিৎকার।

শহরতলির ভিড়। রেললাইনের ধারে ধারে কারখানা, বস্তি, ধ্‌লো, ধোঁয়া আর মান্‌ষ। মান্‌ষ গাড়িতে। যাত্রী, অযাত্রী, ভিখিরি, হকার। বৈরাগী গাইছে :

গৌর বিনা প্রাণে বাঁচে না। কি যন্ত্রণা—

গোরা বলল চেঁচিয়ে, 'কি যন্ত্রণা বল না গো ! এখেনেই আছি।'

সবাই হেসে উঠল গাড়িস্‌দ্ধ। গোরা আরও গম্ভীর হয়ে বললে, 'অ ! ঠিক ধরেছি, আর বলতে হবে না ! দ্‌টো পয়সার যন্ত্রণা তো !' আবার হাসি। কিন্তু বৈরাগী ভিখিরির [illegible]স্তি জবলে গেল। গোরা আবার বলল, 'তা কি করব বল। আমি যে এখন গোরা এস্‌মাল্‌গার হইছি গো।'

গাড়ি থামতেই একগাদা মেয়েমানুষ হুড়মুড় করে ঢুকল। তাদের কাঁধে আর কোমরে চটের ব্যাগ। এরা সব গোরাদেরই সহযাত্রিণী। গোরা বলে এসমালগারিণী। এদের মাঝে সুবালা হল গোরার বান্ধবী। গোরা বলে, আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।

সুবালার ডাঁটো বয়স। আঁটো মেয়ে, খাটো গড়ন। ঘরে আছে পিঠোপিঠি দুই ছেলে। তারা একটু দড়ো হয়েছে। তিন বছর ধরে স্বামী নিখোঁজ, আর সুবালা রেফিউজী, কলোনীবাসিনী। কপালে আর সিঁথিতে জ্বলজ্বল করে সিঁদুর আর কি করে জানি না তার কালো মুখে সাদা দাঁতে নিয়ত ঝলমল করে হাসি। অতএব যা বলতে হয় তাই কলোনীঘরনীরা বলাবলি করে, 'পোড়া কপাল তোর বেঁচে থাকার আর সিঁদুর পরার। তোর কোন্ যমের ঘরে রইল সিঁদুর। তাকে রাখলি তুই মাথায়। ও, চাল না টিপেই বুঝি, ক-ফুট হল। সুবালারও নাম আছে পুলিসের খাতায়। সাতদিন হাজতবাস করেছে সে বেআইনী চাল বহনের অপরাধে।

আর এ পেশায় এ পথে, সহস্র চোখ ও তার দিকে বাড়ানো হাতের মাঝে সে নজর করল গোরাকে। ঘরে তার দুই ছেলে, বাইরের সারা দিনের জীবনে সে বোধ হয় স্নেহ দিয়ে বাঁধতে চেয়েছিল তাকে। কিন্তু গোরার জীবন ধারণের ক্ষেত্রে স্নেহ শাসন ভয় আইন শৃঙ্খলাটাই বে-আদবি।

সে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, 'তুমি কিন্তুন আমার বিষ্ণুপ্রিয়া।'

সুবালা খিলখিল করে হেসে বলেছিল, 'কেন, আমি—আমি তো শচীমাতা।'

একটা অদ্ভুত গোঁ ধরেছিল গোরা, 'সে আমার ঘরে আছে। তা হবে না।'

ফিক করে হেসে উঠতে গিয়ে চকিত যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল সুবালার গলা। দেখেছিল, তার সামনে সেই উস্কো-খুস্কো ক্ষুধার্ত ছেলেটার বয়স গৌণ, এ সংসারে ও একটা মস্ত দিগ্গজ। বয়সটার কথা গোরা নিজেও ভুলে গেছে। তাই তার দাবি আর দশটা বয়স্ক পুরুষের মতই।

কান্না চেপে অদ্ভুত হেসে বলেছিল সুবালা, 'আচ্ছা, তাই হল গো গোরাচাঁদ।'

হোক মিথ্যে, তবু সেই ভাল। সুবালার হৃদয় তো আর মিথ্যা নয়, আর সেই থেকে এ দলের মধ্যে তার মজার কাহিনী রাষ্ট্র হয়ে গেল। আসলে যেটা ঘটল, সেটা সুবালার কাছ থেকে গোরাচাঁদের দৈনিক এক আনা চায়ের বরাদ্দ। সম্পর্কের মধ্যে এ নগদ আদায়ের আত্মীয়তা ছাড়া আর কারও কিছু বোধ করার দরকার ছিল না। এ নিয়ে যারা টিপ্পনী কাটত, তারা হল সুবালার বয়স্ক মেয়ে পুরুষ সঙ্গীরা।

কে চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, তোর বিষ্ণুপিয়ে এয়েছে।'

অমনি গোরা গান ধরল, পরাণ ধরে বসে আছি, তোমারি পথ চেয়ে গো—

সুবালা খিলখিল করে হেসে ওঠে। অচেনা যাত্রীর দল অবাক হয়। একটু রসসন্ধানীও হয়ে ওঠে। মুহূর্তে সুবালা চুম্বক হয়ে ওঠে একটা।

সুবালার মনের মধ্যে একটা চাপা লজ্জাও হয়। তার সঙ্গিনীরা বিরক্ত হয় কেউ, কেউ হাসে।

গোরা বলে ঠোঁট উল্টে, 'তোমাদের ইস্টিশানটা বাপু বড় দূরে।'

সুবালা হেসে বলে, 'তোর বুঝি তর সয় না ?'

গোরা তার কোঁচকানো গালে হাসে আর ভাঙা নীল দাঁতটা জিভ দিয়ে ঠেলে। ভাবে, কিসের তরের কথা বলছে সুবালা। সেই চারটে পয়সার, না সুবালার। বলে, 'তর আবার কিসের ?

সুবালা বলে, 'আমার জন্যে ?'

গোরা সমানে সমানে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ গো, তুমি যে বিষ্ণুপিয়া।'

বেশি ঘাঁটায় না সুবালা। জানে, গোরার ছোট বড়, চেনা অচেনা, কোন মানামানি নেই। চারটে পয়সা দিয়ে বলে, 'যা পালা।'

বলতে হয় না। পয়সা পেয়েই লাফ দিয়ে উঠে পড়ে গোরা। জংশন স্টেশনে নামতে গিয়ে দরজার দিকে ছুটতে গিয়ে কারও হাঁটুর গুঁতো মাথায় চাঁটি ঠকঠক পড়ে। সে সব যেন গোরার গায়েই লাগে না। যেন কার পিঠে বা পড়ছে। জংশন স্টেশনটা আসতেই সে কোন রকমে লাফ দিয়ে নেমে পড়ে। একা নয়, সঙ্গীরাও আছে পিছে পিছে।

চার পয়সা দিয়ে এক গেলাস চা নিয়ে গোরা দু-এক চুমুক না দিতেই আর একজন চুমুক দেয়। সঙ্গে সঙ্গে আর একজন, তারপর আর একজন। সেই সঙ্গে কাড়াকাড়ি খেলার হাসি। যেন একটা পাত্রে ঝাঁপিয়ে পড়েছে একগাদা কুকুরের বাচ্চা। মুহূর্তে দেখা যায়, তপ্ত চা ভর্তি গেলাস একেবারে সাফ।

এমন সাফ বুঝি ধুতেও হবে না। চা-ওয়ালা কটূক্তি করে এক হ্যাঁচকায় গেলাসটা ছিনিয়ে নেয়, 'শালা ভিখ্-মাঙ্গার দল।'

'ভিখ্‌মেগো লয় হে, এস্‌মাল্‌গার।' জবাব দিল গোরা।

চা-ওয়ালা বুঝল না, জবাবও দিল না।

কিন্তু চা চেটে ওদের রসনা যেন লকলকিয়ে ওঠে। খাওয়ার পয়সাটা ওরা আরও দূরে মফস্বলে গিয়ে খরচ করবে। সেখানে ভাত দুটো বেশি পাওয়া যায়।

একজন বলল, 'মাইরি, আমারও যদি এট্টা বিষ্ণুপিয়ে থাকত।'

আফসোসটা বোধ করি সকলের। সকলেই চুপ করে থাকে।

গোরা নির্বিকারভাবে তাচ্ছিল্য ভরে বলে, 'বে···টা এবার করে ফেলব।'

এমন গম্ভীরভাবে বলে যে সঙ্গীরা সন্দেহ করলেও প্রশ্ন করতে সাহস করে না।

একজন বলে ফেলে, 'তোর চে তো বড়।'

গোরা বলে, 'কিসে ?'

'বয়সে।'

'ফ্ঃ!' যেন ফঃ দিয়ে ওড়ানো ছাড়া গোরার এতে জবাবই নেই।

গাড়ি ছোটে পূবে উত্তরে বাঁক নিয়ে। শহরতলির কারখানা এলাকা ছেড়ে এসে পড়ে দিগন্তবিসারী মাঠ গ্রাম। বেড়ে যায় স্টেশনের দূরত্ব। বেলা বাড়ে মেঘে মেঘে। কখনও বা গোমড়া মুখে হঠাৎ হাসির মত চকিত রোদ দেখা দেয়।

গোরাদের জীবনটাও এই মেঘেরই মত। বয়সটা যেন মেঘ ঢাকা সূর্য। হাজারো কষ্ট, যন্ত্রণা, নিষ্ঠুরতা ও পাকামি থাক, চাঞ্চল্য যেন উপচে পড়ে। চুপ করে বসে থাকা যে কুষ্ঠিতে লেখা নেই। তাই চলন্ত গাড়িতেই শুরু হয় খেলা। ইঁদুর আরশোলার মত এর পায়ের তলা দিয়ে, ওর ঠ্যাঙের তলা দিয়ে। কখনও বা একেবারে পাদানি ধরে ঝুলে পড়ে বাইরে, নয়তো কামরা থেকে কামরায় যায় ছুটে।

যাত্রীরা গালাগালি দেয়, খেঁকিয়ে ওঠে, ওরা ভ্রূক্ষেপ করলেও আবেগ বাগ মানে না।

সে খেলার দিকে চেয়ে চেয়ে সুবালা শিউরে শিউরে ওঠে। তারও জীবনের বিড়ম্বনাটা যেন মেঘের মত, আর বুকের ভেতরে যেখানটায় শিহরণ, সেখানটা মেঘচাপা সূর্যের মত। হাজারো অভিশাপ ওইখানে ম্লান। ঘরে দুটোকে রেখে আসার জন্যে উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা এখানে গোরাকে ঘিরে বুঝি মগ্ন হয়ে থাকে। সুযোগ বুঝে গোরার সেই পঞ্চান্ন বছরের বুড়ো বন্ধু সুবালার কাছেই গোরার ব্যবহার সম্পর্কে নালিশ করতে বসে। 'ছোঁড়া ভারী হারামজাদা, দেখ, যাচ্ছিস বিনি টিকিটে, করছিস বে-আইনী কাজ, আবার প্যাসেঞ্জারের গায়ে পড়বে।'

সুবালা বলে, 'ধরে আনো না।'

'কে ? আমি ?' মাথা ঝাঁকিয়ে বলে বুড়ো, 'রামো রামো। আমার মানজ্ঞান নেই ?'

সুবালা অবশ্য বলে না বুড়োকে যে, গোরা যখন রোজ তার চালের বস্তা মাথায় করে এনে গাড়িতে তুলে দেয় তখন কোথায় থাকে এ মানজ্ঞান।

একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'গোরা, একটা মামা রয়েছে রে।'

মামা মানে চেকার। গোরা বলল, 'কোথা ?'

'ফ্যাস্ট কেলাসে ঘুমোচ্ছে।'

গোরা বলল, 'খবরটা বিষ্টুপিয়েকে দিয়ে আয়।'

অর্থাৎ সকলকে সাবধান করে দেওয়া হচ্ছে। একটা চেকারের পক্ষে এ চাল বহনকারী বাহিনীকে অবশ্য ধরে নামানো সম্ভব নয়। তবু সাবধানের মার নেই। একজনকে মাঝপথে নামিয়ে দিলেই তো সে গেল। আর গোরার ভাষায় এই এসমালগার দলের সমস্ত খবর পাওয়া যাবে গোরাদের কাছেই। এদের ধরবার জন্যে কোথায় কোন শত্রু আত্মগোপন করে আছে, এরা নানান্ রকমে সে সন্ধান যোগাড় করে নেয়।

'মোশায়, এট্টুস আগুন দেবেন ?' গোরা বিড়ি মুখে দাঁড়াল একজনের সামনে।

লোকটি ভদ্রলোক। তিনি সিগারেট খেতে খেতে একবার খালি রাগে কট্‌মট্‌ করে গোরার দিকে তাকালেন।

কিন্তু বৃথা। ওর কাছে এ আত্মসম্মান, অপমান, ছোট বড়র কোন স্থান নেই। এ সমাজের শৃঙ্খলা ও আইনকে যে-কোন উপায়ে ভেঙে পলে পলে ওকে নিশ্বাস নিতে হয়। ও কিশোর নয়, বালক নয়, ছাত্র নয়, এমন কি একটা অফিস বয়ের আনুগত্যও ওর জানা নেই। ও এ যুগের হেড অব দি ফ্যামিলি। একটা মস্ত পরিবারকে পালন করে। ও এস্‌মাগ্‌লার। সভ্যতা ভদ্রতা এখানে অচল।

আবার বলল, 'দেবেন না?'

ভদ্রলোক পাশের লোকটিকে বলল, 'দেখলেন মশাই সাহসটা?'

কিন্তু যাকে বললেন, বোধ হয় দেখে বলেন নি লোকটা কোন্‌ কোয়ালিটির। সে বলে উঠল, 'শালাদের খালি উঠতে বসতে লাথাতে হয়।'

'মাইরি'! বলেই গোরা খানিকটা সরে গিয়ে অন্যদিকে মুখ করে গেয়ে উঠল:

যে বলে আমাকে শালা
তার বোনেরে দিব মালা।

অমনি একটা রাগ ও হাসির রোল প'ড়ে গেল। আর শালা বলেছিল যে লোকটা, সে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোরার উপর। চলল কিল, চড়, লাথি, ঘুষি, গালাগাল।

গোরার বন্ধুরা হঠাৎ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল। একটা ক্ষীণ প্রতিবাদও উঠল কামরাটার মধ্যে। সুবালা চেঁচিয়ে উঠল 'গোরা গোরা' বলে।

ততক্ষণে গোরাকে মুক্ত করে নিয়েছে তার বন্ধুরা, আর সে লোকটা আস্ফালন করেই চলেছে, 'মেরে ফেলে দেব আজ কুত্তার বাচ্চাটাকে।'

কিন্তু সবাই দেখছিল গোরাকে। মার খেয়ে তার তামাটে মুখটা আরও তামাটে হয়ে উঠেছে। চুলগুলো ঢেকে ফেলেছে প্রায় অর্ধেক মুখটা। তার ভেতরে শুকনো চোখ দুটো জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে।

পরের স্টেশনে যখন লোকটা নামতে গেল, সবাই দেখল একটা প্রকাণ্ড শরীর ধপাস্‌ করে আছড়ে পড়ল প্ল্যাটফর্মের উপর আর আঁট কাছাটা পড়ল ঝুলে।

পড়াটা এমনই মোক্ষম হয়েছে যে, সে ওঠবার আগেই গাড়ি ছেড়ে দিল আর সেই সঙ্গে কাঁচা পাকা দো-আঁশলা গলার সমবেত হাসির শব্দে ভরে গেল আকাশটা।

আবার খেলা। বোঝবার উপায় নেই কিছুক্ষণ আগে গোরা মার খেয়েছে। এ রকম ঘটনা তো প্রায় রোজই ঘটছে। বিড়ি খাচ্ছে, থুথু ফেলছে এখানে সেখানে, বক্‌বক্‌ করছে, পানের বোঁটা চিবোচ্ছে পানওয়ালার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে, ফেরী-ওয়ালার কাছ থেকে আচারের নমুনা চেয়ে খাচ্ছে। কাশছে ঘংঘং করে। যেন জ্বরের ঘোর। যেন পাগলাটে নিশি ওদের তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। যেন থামলেই সব শেষ হয়ে যাবে এখুনি। সময় নেই।

আর কত দূর? দুটো জংশন স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে। দূরের ঐ স্টেশনটায়

ওগুলো কি দেখা যায় সারি সারি ? মোবাইল ? না, জলার কাশবন।

বেলা বাড়ছে। রোদ নেই, পুবের ঝোড়ো হাওয়া জলো জলো। চোখ জ্বলছে, খালি তেষ্টা পাচ্ছে, পেটটা চোঁ চোঁ করছে। কিন্তু এখনও যে অনেক দূর।

কি দরে আজ চাল পাওয়া যাবে, কে কত সের কিনবে, কে কত নিয়ে এসেছে, সবাই আলোচনা করে।

গোরা কখনও কখনও ছুটে আসে সুবালার কাছে। ডাকে, 'বিষ্ণুপিয়ে।' সে ডাক যেমনই অদ্ভুত, তেমনই হাস্যকর। বলে, 'তুমি কবে আমার সঙ্গে যাবে ?'

সুবালা যেন ছোবল খেয়ে হাসে। বলে, 'যবে তুই নিয়ে যাবি।'

তারপরে গোরা হঠাৎ আনমনা হয়ে যায়। চোখ দুটো শূন্যে নিবদ্ধ, কিন্তু সেখানে যেন কত লুকোচুরি খেলা।

নিঝুম গেঁয়ো স্টেশনটার জলা ঝোপ থেকে সেই পাখিটা ডাকে কুর্ কুর্ করে, 'ওগো, খোকা কোতায় ! খোকা কো-তায় !' গোরার চোখে ভেসে ওঠে একটা গ্রাম, ঘর, আর নিকনো দাওয়া। মা সেই দাওয়ায় বসে নাদা-পেটা ছেলেকে তেল মাখায়। ছেলে কাঁদে তেলের ঝাঁজে। মা বলে, 'কেঁদো নি, সোনা, কেঁদো নি। তোমারে ফটিক জলে নাওয়াব, দুধে ভাতে খেতে দেব. সোনার কপালে চুমু খাব।'

সে কথা কোন্ জন্মের ? আবার চোখে ভাসে, শহরতলির কারখানায় রাবিশের স্তূপ। তার পাশে বিস্তৃত জলা, ছোট ছোট ছিটেবেড়ার ঘর, সারি সারি কতকগুলি রুগ্ন পুতুল আর পোয়াতী মা। মুখে কোন কথা নেই, শুধু নিষ্পলক অদ্ভুত দুটো চোখে চেয়ে থাকা, এ দুরন্ত জীবনেও এ চোখের কথা সরল, স্বরবর্ণের মত সহজ !

হঠাৎ গোরা আনমনে ফিস্‌ফিস্ করে ওঠে, 'মা।···মা।'

সুবালার নিষ্পলক চোখে কিছুই এড়ায় না। সে দেখে, গোরা যেন সত্যিই এক স্বপ্নাচ্ছন্ন তন্ময় কিশোর। সে ঝুঁকে পড়ে ডাকে, 'কি রে গোরা, কি হয়েছে ?'

বিমূঢ় গোরা অবাক চোখে সুবালার দিকে তাকিয়ে থাকে। তার মুখটা ঠেকে সুবালার বিশাল বুকের কাছে। ভাবে, মা বুঝি ডাকছে। তার মা।

পরমুহূর্তেই সংবিৎ ফিরে আসে। ততক্ষণে কি যেন ঠেলে আসছে গলায় আর চোখে। কিন্তু তাকে কিছুতেই আসতে দেওয়া হবে না। এ জীবনে আর যা-ই হোক, চোখের জল ফেলে অধর্ম গোরা করবে না।

হঠাৎ কাশিতে হাসিতে বিকট শব্দ করে সে ছুটে খেলায় যোগ দিতে যায়। অমনি একটা হৈচৈ পড়ে যায়। যেন ঝোড়ো হাওয়ায় সবাই শশব্যস্ত হয়ে পড়ে।

কে প্রাণ খুলে গান ধরেছে,

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও,
নগর ছানিয়া দিব, পরাণ ভরে খাইও।

আর গোরা একজন যাত্রীকে হাত মুখের ভঙ্গী সহকারে বলছে, 'জেলের ভয়

দেখাচ্ছেন ? মোশাই, তিনবার ঘুরে এয়েছি।' ভাঙা দাঁত আর মুখের দাগ দেখিয়ে বলছে, 'পড়ে মরব ? তা-ও হাসপাতালে থেকে এয়েছি। আমার নাম গোরাচাঁদ।' যাত্রীটি একমুহূর্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে বলল, 'ডেঁপো।'

'ডেঁপো নয় বাবু, ভেঁপু।' বলে মুখের একটা বিচিত্র শব্দ করে সরে গেল। তারপরেই হঠাৎ, 'সখী একবার ফিরে চাও গো।' বলে তীব্র চিৎকার।

কিন্তু আর কত দূর ! এ গাড়িটা মাঝে মাঝে থামতে পারে। ওরা যে পারে না। বিড়ি ভাল লাগে না। প্যাচ্ প্যাচ্ করে ফেলার মত থুথুও মুখে নেই। চোখ ছোট হয়ে আসে, গা-টা ঘুলোয়। ওই লোকটা কি সিভিল সাপ্লাইয়ের বাবু ? না, ওটা তো একটা এস্মাল্গার।

বেলা বাড়ে। এত তাড়াতাড়ি বাড়ে যেন রেলগাড়িটাকে মনে হয় ঠেলাগাড়ি। তবু রোদে নয়, ছায়ায় বাড়ে বেলা।

তারপর এক সময় সবাই হুড়মুড় করে নামতে আরম্ভ করে। একটা ছোট্ট স্টেশন, যেন কুলগোত্রহীন চালচুলোহীন গেঁয়ো ছেলের শহুরে ঢং-এর মত। সমান্তরাল পাথুরে প্ল্যাটফর্ম, টিকিটঘর, সাইনবোর্ড, তারপরেই বেতবন ও আসশেওড়ার ঝোপ। ধার দিয়ে সরু পথ চলে গেছে মাঠের দিকে। বুনো বুনো গন্ধ।

ওরা সব গাড়ি থেকে নামতেই যেন যাত্রীরা সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, 'শালা, মাথার উকুন নামল।'

উকুনের দল পিলপিল করে রাস্তায় নামে। যাবার সময় স্টেশনের কুলীটাকে সবাই দুটো করে পয়সা দিয়ে যায়। ওটাই রেওয়াজ। কে আর রোজ রোজ টিকিটের জন্যে বিবাদ করে।

চলে সবাই গঞ্জের দিকে। এখান থেকে ক্রোশখানেক দূর। তারপর ছোট নদী। নদীর ধারে গঞ্জ। সেখানে চালের আড়ত।

মাটি পায়ে ঠেকতে যেন আবার একটু দম ফিরে পায় সবাই। এখানে নেমেছে একটা দল মাত্র। বাদবাকীরা আগে নেমেছে। পরেও নামবে কেউ কেউ।

এ-দলটার সবার আগে চলেছে গোরা, চলেছে জোয়ান বুড়ো, মেয়ে পুরুষ। যেন একটা মিছিল চলেছে। ধুলো আর ধূসর বেলায় যেন একটা ছায়া মিছিল।

মাঠে মাঠে ধানে পাক ধরেছে। নিরালা, জনশূন্য মাঠ।

হঠাৎ ধুলোয় গড়াগাড়ি খেতে আরম্ভ করে গোরাদের দলটা। যেন উচ্ছ্বসিত চড়ুই দলের হুটোপুটি খেলা।

তারপরে গঞ্জ। অমনি সকলে অন্য মানুষ হয়ে ওঠে। যে যার কোমরে পকেটে হাত দেয়। বার করে তাদের প্রত্যহের মূলধন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে গোনে কত আছে। জানে না কত আছে, তবু গোনে। সন্তর্পণে মুঠো করে ধরে। তাদের জীবন, সেই সঙ্গে আরও অনেকের। যে পয়সা থেকে মরে গেলেও আধ পয়সা ছাড়া যাবে না। এমন কি এক পয়সার লজেন্স, দুটো মুড়ি, বিস্কুট কিংবা বুড়ির মাথার

পাকা চুল। কিছুই না। স্বাদ আস্বাদ ক্ষিধে ভালবাসাও নয়।

আড়ত দু-তিনটে। সবাই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে ব্যাগ আর পয়সা নিয়ে।

দেখা গেল দর একটু চড়েছে। শরতের শেষ, হেমন্তের শুরু। নতুন চাল বাজারে বেরোয় নি এখনও। চাষী বিক্রেতা একটাও নেই। শহরের লোকগুলো হন্যে হয়ে ফিরছে চালের জন্য। শহরে চাল নেই রেশনের আধপেটা ছাড়া। শহরের খুচরো দোকানওয়ালা তাই তখন ভারী খাতির করে গোরাদের।

ওদিকে নদীর বুকে নৌকা বোঝাই হচ্ছে চাল। যাবে কলকাতায়, কালো-বাজারে। যেমন যাবে গোরাদেরটা। ওদের নেই মোবাইল কোর্ট, পিছনে সিভিল সাপ্লাইয়ের গুপ্তচর, পথে পথে পুলিসের জুলুম। গোরা বলে, 'ওরা এসমালগার লয়, সরকারের বোনাই, তাই ঘর-কারবার।'

তারপর সবাই যায় গঞ্জের হোটেলে খেতে। কাঁচা মেঝেয় শুকনো কলাপাতা। কিন্তু ভাতের গন্ধে চারদিক ম ম করছে। একটু ডাল আর ভাত। রেট চার আনা।

গোরারা সবাই পাতাপাতি করে খায়। কারও কম কারও বেশি হয়। তারপর হঠাৎ খালি পাতের দিকে দেখে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সবাই বোকার মত হাসে। আর এঁটো পাতাগুলো যেন সদ্য ধোয়া পাতার মত হয়েছে।

ম্যানেজারকে পয়সা দিয়ে, নদীর জলে আঁচিয়ে উঠে গোরা বলে, 'শালা কেষ্ট ঠাকুরের খুব খাওয়া হল। এই দ্যাখ।' বলে পেটটা ফুলিয়ে দেখায়। আর একজন সেটা বাজায়। হাসি আর হল্লায় মনে হয় যেন বর্গী এসেছে গঞ্জে৷

এসমালগারিনীর দলও খেতে বসে হোটেলে। সুবালা বাইরের দিকে তাকিয়ে আনমনে ভাতের গরাস তোলে মুখে। বাইরে সদ্য খাওয়ার ঢেঁকুর তুলে সেইজন সেই গান গেয়ে উঠেছে :

বৈরাগী না হইও নিমাই, সন্ন্যাসী না হইও।...

আবার ফিরে চলা। এবার আরও হুঁশিয়ার। পদে পদে আরও ভয়, আরও উৎকণ্ঠা। আর সে শুধু প্রাণে নয়, ধনেও বটে। প্রাণ গেলেও এ ধন দেওয়া যায় না। এ যে মূলধন।

সবাই অভিন্ন, একক এখানে। এক কথা, এক চিন্তা, এক ভয়, এক ভাবনা। এর বোঝা ও নেয়, ওর বোঝা এ নেয়। গোরা বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে, তোমার বোঝাটা আমার মাথায় দেও।'

সুবালা হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, 'আর মরদাগিরি করতে হবে না, চল দি নি।'

এক বুড়ি তার বোঝা গোরার মাথায় দিয়ে বলে, 'নিবি তো, এটা নে বাবা।'

গোরা বলে, 'লোব গো বিষ্ণুপিয়ে ?'

'পারলে নিবি।' জবাব দেয় সুবালা। কিন্তু ক্ষুব্ধ হয় বুড়িটার উপর।

পিঠটা বেঁকিয়ে ঝুঁকে চলে গোরা। যেন একটা দুমড়ানো কঞ্চি।

দেখা যায়, সবাই নানান কথায় জমে উঠেছে। পারিবারিক আর অতীত জীবন।

কে কবে কাঁড়ি কাড়ি ভোগবতী চাল রেঁধে খাইয়েছে, কার উঠোন ভরে একদিন অমন পনের সের চাল চড়ুই পায়রায় খেয়েছে। কার ছেলে একটা চাকরি পাবে, কে পাকিস্তানে গিয়ে তার জমিজমা বিক্রি করে দু-পয়সা নিয়ে আসবে, কার নিখোঁজ ছেলে নাকি সত্যি ডাক্তার ছিল।

সুবালা ভাবতে চেষ্টা করে তার নিখোঁজ স্বামীর কথা। আশ্চর্য! ক'টা বছর, তবু মুখটা একদম মনে পড়ে না। গোরা হঠাৎ বলে, 'বিষ্ণুপিয়ে।'

'কি রে।'

গোরা একটা নিশ্বাস ফেলে বলে, 'আমার কিছু ভাল লাগে না।'

হঠাৎ যেন সুবালার ফিক্‌ ব্যথা লাগল বুকে গোরার কথা শুনে। দেখে গোরার ক্লান্ত হাঁ মুখ, মাথার বোঝার তলায় দুটো ম্লান চোখ, সমস্ত মুখে যেন একটা কিসের আচ্ছন্নতা। সুবালা তাড়াতাড়ি তাকে একেবারে বুকের কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, 'কেন রে, কেন?'

জবাব দিতে গিয়ে ফিক্‌ করে গোরা হেসে বলে, 'তোমার গায়েকি সোন্দর গন্ধ।'

'ও মা! সে আবার কি?'

সুবালা আছাড় খেতে গিয়ে সামলে নেয়।

বেলা ঢলো ঢলো। আকাশ আরও কালো হয়। এবার স্টেশন, তারপরে গাড়ি।

গাড়িতে তুমুল ব্যাপার। তবে প্রাত্যহিক। মালে-মানুষে ঠাসাঠাসি। দরজা দিয়ে জানালা দিয়ে গলে গলে ঢুকছে ব্যাগ আর মানুষ। গালাগাল, শিশুর কান্না, হকারদের চিৎকার। যেন গাড়ি নয়, চলন্ত হাট। কে ঠেলছে আর ঠেলা খাচ্ছে, কোন ঠিক নেই।

একফোঁটা গোরা যেন একটা অসুর। এরটা তুলে দেয়, ওরটা এগিয়ে দেয়। শেষটায় চাল বহনকারীর দল গাড়ির ছাদে উঠতে আরম্ভ করে। প্রাণের আশঙ্কা, কিন্তু না হলে নয়।

গোরা যেন জাদুকরের মত ভেতরে জায়গা করছে। এএকটা লাঠি মারে, ও একটা চড়। যা-ই কর, উপায় নেই। বেশি কিছু বললে গাঁক করে কামড়েও দিতে পারে। কে যেন বললে, 'এই হারামজাদা!'

গোরা বললে, 'কে তবে কলির গাধা?' বলেই সড়াৎ করে এক বেঞ্চির তলা থেকে আর এক বেঞ্চির তলায় চলে যায়। লোকজন চিৎকার করে ওঠে। কেউ বলে চোর, কেউ পকেটমার।

সে বলে, 'আজ্ঞে না, গোরাচাঁদ এস্‌মাল্‌গার।'

ছুটছে গাড়ি, আর প্রত্যেকটা স্টেশন থেকে উঠেছে চালবহনকারীর দল। মেয়ে পুরুষ বাছবিচার নেই। এ ওর বুকে, ও এর মুখে। তবে সেটা ভাববার অবকাশ নেই।

এর মাঝেও আছে গোরাদের ছুটোছুটি। আর প্রতেকটা স্টেশনে নেমে সন্ধান করছে, সামনে বিপদ ওৎ পেতে আছে কিনা। আবার দেখা যাচ্ছে দল বেঁধে সব স্টেশনে প্রস্রাব করতে বসেছে।

তারপরে একটা আপগাড়ির সঙ্গে তাদের দেখা হতে শোনা গেল সামনের জংশনেই মোবাইল আর সিভিল সাপ্লাই রয়েছে। অমনি কেউ কেউ ব্যাগসুদ্ধ লাফিয়ে নামতে আরম্ভ করে। যেন তাড়া খাওয়া ব্যাঙের দল ডোবায় পড়ছে। কিন্তু সে আর ক-জন। গাড়ি ছেড়ে দেয়।

ট্রেনের শিকল কাঠের ঢাকনা দিয়ে বন্ধ করা। সবাই চিৎকার করে বলাবলি করছে ফিকিরের কথা। কিন্তু ফিকির নেই।

গোরা হাঁ করে তাকিয়ে আছে শূন্যে। হাত দুটো ঝুলে পড়েছে। বিহ্বল, শূন্য মন। মনে পড়ল, জেল। সেটা কিছু নয়। কিন্তু মূলধন! ভাই বোন আর মা! তারা কি খাবে কাল? কেমন করে তাকাবে মা ওই অসহ্য অপলক দুটো চোখে। হঠাৎ সে ব্যাগ নিয়ে দরজার দিকে এগোয়।

বন্ধুরা বলে, 'ঝাঁপ দিবি।'

'না।'

'তবে?'

সুবালা ছুটে আসে। 'কোথা যাচ্ছিস?'

'ছেড়ে দেও বিষ্ণুপিযে।' হাত ছাড়িয়ে দিয়ে পাদানিতে নেমে পড়ে গোরা। আর নয় বিষ্ণুপ্রিয়াকে। তার চেয়েও কঠোরতর পরীক্ষা সামনে।

একগাড়ি লোককে অসহ্য কৌতূহল ও উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখে পাদানির শেষ ধাপে নেমে গেল। নিমেষে হারানো পাথুরে খোয়ার স্তূপ যেন জমানো সিমেণ্ট। তিন হাত দূরে লাইনের বুক পিষে চাকা ঘুরছে ঘর্‌ঘর্‌ করে। আধ হাত নিচেই মাটি।

গোরার চোখ রক্তবর্ণ, মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠেছে। সারা মুখে ঘাম: হাতের নীল পেশীগুলো যেন ছিঁড়ে পড়বে। চকিতে মুখ বাঁধা চালের ব্যাগ হাতের মধ্যে গলিয়ে পা-দানির শেষ ধাপে ধীরে ধীরে চিত হয়ে শুয়ে পড়ল আর একটু একটু করে তার দেহটা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগল গাড়ির তলায়। আস্তে আস্তে উঠে গেল ঠিক চাকার উপরে দুটো বাঁকানো রড ও সংক্ষিপ্ত রেলিং-এর মাঝখানে। চাকার দু-তিন ইঞ্চি উপরেই তার একটা লিকলিকে ঠ্যাং ঝুলছে। কোন রকমে একবার ছুঁতে পারলেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত বাঘের মতন টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

তারপরে যেন অত্যন্ত রাগে ও ঘৃণায় চলন্ত চাকাটার গায়ে সে বারবার থুথু ছিটিয়ে দিতে থাকে। গাড়ির উপরে হাজারো গেল গেল শব্দ, বন্ধুদের উৎকণ্ঠা. সুবালার মৃত্যু যন্ত্রণা সব যেন কেমন স্তব্ধ আড়ষ্ট বিকল হয়ে গেল।

তারপর জংশন স্টেশনে উন্মত্ত তাণ্ডব। পুলিস, মোবাইল কোর্ট, সিভিল সাপ্লাই গাড়িটাকে ঘিরে সবাইকে নামাতে থাকে। আর, মার খিস্তি চিৎকার আর কান্না। ছড়িয়ে পড়ছে কারও চাল, ছিটকে পড়ছে মুখ থুবড়ে কেউ। মারো আর উতারো। পুলিসের লাঠিতে তৈার হয় বেড়া। সেই বেষ্টনীর মধ্যে একদিকে মানুষের স্তূপ আর একদিকে চালের। চাল আর এস্‌মাল্‌গার।

গাড়ির ঘণ্টা পড়ল। সুবালা রুদ্ধ নিশ্বাসে বুক চেপে আপন মনে বলল, 'গোরা ধরা পড়বে না, কখনও না।'

কিন্তু পড়েছে। একটা তীব্র হট্টগোল ও ধস্তাধস্তির মধ্যে সবাই দেখল এক-টুকরো ন্যাকড়ার মত তাকে নিয়ে সবাই টানাটানি করছে।

লাঠির বেষ্টনীর মধ্যে সবাই বড়-বড় চোখে তাকিয়ে দেখল, অফিসারের সামনে তাদের গোরা, তাদের হিরো এস্‌মাল্‌গার। কি বলছে অফিসার। কিন্তু গোরা নিশ্চুপ।

তারপর এল একটা সরু বেত, খুলে দেওয়া হল গোরার জামা প্যাণ্ট। ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল চালের স্তূপে তার পনেরো সেরের ব্যাগ। শেষবারের জন্য অফিসাব চিৎকার করে উঠল, 'আর কোন দিন করবি?'

গোরা শক্ত, নির্বাক। কেমন করে বলবে। সেখানে যে ওরা রয়েছে, মা আর ভাইবোন। তার বোবা মা। পরমুহূর্তেই বেতের ঘায়ে সপাং সপাং শব্দ ওই মানুষের স্তূপটাকে, স্টেশনটাকে, সর্ব চরাচরকে কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে শিউরে তুলল। নেমে আসা রাত্রি যেন যন্ত্রণার কালিমা হয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

স্টেশনে আলো জ্বলছে। যেন অন্ধকার এখানে অনেক নির্বাক চোখে তাকিয়ে আছে।

গোরা এসে দাঁড়াল সেই মানুষগুলোর কাছে। উলঙ্গ, সারা গায়ে চিতাবাঘের মত লম্বা দাগ, হাতে জামা আর প্যাণ্ট। কিন্তু চোখে জল নেই, নাক দিয়ে শুধু সিকনি বেরিয়ে পড়েছে, ঠোঁটের দুই কষে ফেনা। ছায়াটা পড়েছে যেন উলঙ্গ আদিম কিম্ভূতাকৃতি একটা ওত পাতা মানুষের।

অসহ্য যন্ত্রণায় যেন সুবালার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে গেল। ঠাণ্ডা পাথরে জোরে ঠোঁট দুটো চেপে সে কেঁপে-কেঁপে উঠল। সেই লোকটা অকারণ গুনগুন করছে, 'বৈরাগী না হইও নিমাই······'

গোরার শূন্য চোখে ভাসছে, সেই কারখানার রাবিশের জলার ধারে, অন্ধকার আকাশের তলায় দুটো দিশেহারা চোখের অসহ্য প্রতীক্ষা। ঘরে ঘুমন্ত পুতুল, রুগ্ন একটা মানুষ, আর বাইরের অন্ধকারে বোবা মায়ের অপরিসীম তীব্র প্রতীক্ষা।

অকাল বৃষ্টি

'আবার তুই মেয়েমানুষ এনে তুললি এখানে?' জিজ্ঞাসা করল ভূতেশ হালদার তার কটা ক্রুদ্ধ চোখ তুলে।

'হাঁ, আনলুম।' কথা শেষ করে দেওয়ার মত একটা ভাব করে কোমরের কাছ থেকে কাপড় সরিয়ে দাদ চুলকোতে লাগল সিধু ডোম।

আর যে মেয়েমানুষটিকে আনা হয়েছে সে বুড়ো বেঁটে গাট্টাগোট্টা বটতলার চালাটার দরজায় বসে তার দীর্ঘ চুলে চিরুনি চালাতে-চালাতে মুখ টিপে-টিপে হাসছে এদের দুজনার দিকে আড়চোখে চেয়ে-চেয়ে।

ওদিকে পাঁচিল দিয়ে আড়াল-করা শ্মশানের মধ্যে একটা মড়া পুড়ছে। তাপ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। মড়া বয়ে-আনা দলটি পশ্চিম দিকের ঘাটে গঙ্গামুখো বসে নিজেদের মধ্যে জন্মান্তরবাদ সম্পর্কে একটা খুব উত্তেজিত আলোচনায় ব্যস্ত।

শ্মশানের কুকুরগুলো নেশাখোরের মত জ্বলজ্বলে চোখে লেজ গুটিয়ে শুঁকে-শুঁকে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে, নুলো পাড়িয়ে ছাই আর পোড়া কাঠের গন্ধ ঘাটছে, নয়তো তাদেব লাল দগদগে মুখের বিশাল কশ বিস্ফারিত করে লোভিষ্টির মত দেখছে মড়া পোড়ার দিকে।

ভাঁটা পড়ে গঙ্গা নেমে গেছে অনেকখানি। অগ্রহায়ণের গঙ্গা, জল খানিক স্বচ্ছ। স্রোতস্বিনী গাঙের মত গঙ্গা কলকল করে বইছে। তরঙ্গায়িতা গৈরিক সুরেশ্বরী যেন ছেয়ালো একহারা এক কিশোরী মেয়ে।

বেলা শেষ হয়ে আসছে। বটগাছের উপর মাটির দিকে ঘাড় নোয়ানো শকুনগুলোর চোখ কানা হয়ে যাচ্ছে। রাতকানা পাখি ওরা।

আগে গঙ্গার ধারে-ধারে ঘাটে-অঘাটে মড়া পোড়ানো হত। এখন এ গাঁ হয়েছে চটকল শহর। মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে মস্ত বড়। এক চটকলের সাহেব এ শ্মশান তৈরি করে দিয়েছে। ইঁটে খোদাই করে ইংরেজীতে লেখা আছে, এস্ট. ১৯২৬। মস্ত উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা শ্মশান। মড়া যখন পোড়ে তখন দূর থেকে মনে হয় বুঝি কোন চটকলের চিমনি থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। পুবদিক ঘেঁষে বটতলায় ডোমচালার মেঝেটা ইঁট দিয়ে বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ভূতেশ হালদার তার ছোট-ছোট কটা চোখের চোরা দৃষ্টিতে মেয়েটাকে একবার দেখে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়াল যেন একটা লম্বা ছিপছিপে পোড়া কাঠ। কালো নয়, গায়ের রংটা ছাই-ছাই। সারা মুখে বসন্তের দাগ, নাকটা ঘোড়ার নাকের মত লম্বা, চুলগুলি ছোট করে ছাঁটা। কানে একটা হলদে পেন্সিল গোঁজা, গায়ে তার শরীরের অনুপাতে নিতান্ত ছোট খাকী শার্ট, গঙ্গার জলে কাচা লালচে ধুতি, দশ হাত হলেও হাঁটুর বেশি নিচে নামে নি।

এই হল ভূতেশ, চিত্রগুপ্তের অবতার অর্থাৎ মৃত্যু রেজিস্ট্রার। মাইল কয়েকের এলাকার মৃত্যুর খতিয়ান তার কাছে। নাম-ধাম, কারণ-অকারণ, স্ত্রী কি পুরুষ, মৃতের চৌদ্দপুরুষের ঠিকানা লেখা আছে ভূতেশের চটের সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা খাতাটায়। এই হল তার আসল পদমর্যাদা, বাকী কাজটুকু স্যানিটারি ইনস্পেক্টরের অ্যাসিস্টান্ট হয়ে সকালের কয়েক ঘণ্টা এদিকে ওদিকে ঝাড়ুদার মেথরের পিছনে-পিছনে ঘুরে বেড়ান। তবে এটা হল ফালতু কাজ। মাইনে ত্রিশ টাকা। নামের গেরোতেই বোধ হয় তাকে এ কাজটি বেছে নিতে হয়েছে। এখানকার লোকে অন্তত তাই বলে। মৃত্যু-রেজিস্ট্রার হিসাবে তার এখানকার সহকর্মী হল সিধু ডোম। দোহারা শক্ত কালো শরীর, চোয়াল উঠানো গাল, আ-ছাঁটা গোঁফ, একজোড়া কালো কুচকুচে মস্ত বড় ট্যারা চোখ। এক মাথা কালো পাঁশুটে ভেড়ার লোমের মত কোঁচকানো চুল। রেজিস্ট্রি হয়ে গেলে চিতায় কাঠ সাজায় সে, মড়া তোলার আগে শত শোক ও আপত্তি সত্ত্বেও মড়ার গায়ের জামাকাপড় খুলে নেওয়ার চেষ্টা করে, মরা মেয়েমানুষের গায়ে গয়না থাকলে চেষ্টা করে তা খুলে নেওয়ার। সে হিসাব রাখে এ চাকলার কাকে পোড়াতে কত কাঠ লেগেছিল, কাকে আধা-পোড়ানো হয়েছিল, কার কোন্ অঙ্গটা পুড়েছিল আগে, কিংবা লোকে যেমন শুকনো ও ভেজা কাঠের গুণ বর্ণনা করে, তেমনি কার মড়া পোড়াবার পক্ষে বেশ খনখনে ছিল বা স্যাঁতসেঁতে ছিল তার হিসাবও সে কড়ায়-গণ্ডায় দিতে পারে।

ভূতেশ যদি চিত্রগুপ্ত হয়, সিধু ডোম তা হলে সাক্ষাৎ যম। সিধুর অবশ্য ধারণা, এটা তার রাজা হরিশ্চন্দ্রের মত এ জন্মের ভোগান্তি, আগামী জন্মটা তার ভালই হবে।

তারা দুজনে এ গাঁয়েরই মানুষ। তারা বলে গা, লোকে বলে শহর। উভয়ে তারা ছোটকাল থেকে পরিচিত। তবে একজন হল ডোম, অপর জন বামুন। মেলামেশা তাদের সম্ভব ছিল না, দরকারও ছিল না, আর আজ দীর্ঘ দশ বছর ধরে একই সঙ্গে কাজের মধ্যে ভূতেশ 'বাবু' থেকে সিধুর কাছে 'ঠাকুর' হয়েছে। সম্পর্কটা ঠিক বন্ধুত্ব না হলেও রেজিস্ট্রিবাবু আর ডোমের মর্যাদাপূর্ণ ফারাকটা যেন নেই। একজন কথায়-কথায় ইংরেজী বলে অপরজন রেগে গেলে বলে হিন্দি। ভূতেশকে উঠতে দেখে সিধু বলল, 'একটা বিড়ি দেও দিনি ঠাউর।

'বিড়ি নেই।' বলে ভূতেশ পকেট থেকে একটা বিড়ি নিয়ে তার নিজের ঠোঁটে চেপে ধরল।

বিড়ি এখন পাবে না বুঝেই সিধু চিতার কাছে গিয়ে তার হাতের পোড়া লাঠিটা দিয়ে ঝিমিয়ে পড়া আগুন উসকে দিল, দগ্ধ মৃতদেহটা দিল উলটে পালটে এবং দিতে-দিতে আগুনের তাতে দাঁতে দাত চেপে ভাবল সে, ঠাকুর মেয়েমানুষ দেখলেই এমন খেপে যায় কেন?

যাদের মড়া, তাদের একজন বলল, 'একটু আস্তে-সুস্থে দাও বাবা, এমন ঠ্যাঙাড়ের মত করছ কেন?'

সিধু হেসে বলল, 'মরতেও এত, তবু তো ঠেকে রাখতে পারলে না বাবু।' মনে মনে বলল, আর শালা আমি য্যাখন মড়ার জামাটা চাইলাম ত্যাখন তো দরদ দেখা গেল না।

কথাবার্তা একটু চেপেচুপে না বললে বখশিশটা ফাক যাওযার সম্ভাবনা। ভূতেশেরও পাওনা আছে। তবে ভূতেশ সেটাকে বখশিশ বলে না, বলে রেজিস্ট্রির নজরানা। পাওনা বলতে পারে না, কারণ দাবির ব্যাপার নয় ওটা। তা ছাড়া কারণে-অকারণে ভূতেশ নানান রকম গণ্ডগোল করে থাকে। আইবুড়ো মেয়ের মড়া হলে তো কথাই নেই। সে তার ঘোড়ার মত লম্বা নাক ফুলিয়ে কটা চোখ কুঁচকে জিজ্ঞেস করবে, 'কি হয়েছিল মেয়েটার?'

'কালাজ্বর।'

'হুঁ, মড়াটা থাক, কালকে মেডিকেল অফিসার এলে দেখে অনুমতি দেবে।

কারণ?'

বুঝুক না বুঝুক, অন্ধকারে ঢিল ছোড়ার মত ভূতেশ বলে, 'কি করব মশাই, এ রকম কত সুইসাইড কেস কিংবা এই ধরুন যুবতী মেয়ে কোন গোলমাল করে ফেলল, সেটাতে গিয়ে হয়তো ফসকে গেল জান। তখন—'

অপর পক্ষ থেকে হয়তো প্রশ্ন আসে, 'তা এটাও সে-রকম মনে হচ্ছে নাকি?

ভূতেশ তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'হয়তো নয়। তবে বোঝেনই তো, হুকুম আছে, কোন রকম সন্দেহ-টন্দেহ হলে।...আমি তো আর ডাক্তার নই।'

ফলে কখনও হয়তো পকেটে পাঁচ-দশ কিছু এসে পড়ে, নয় তো গালাগাল আর শাসানি। কিন্তু ঢিল একবার ছুঁড়ে দিলে যা হোক একটা হবেই। পয়সা এলে ভূতেশ আরও গম্ভীর হয়ে বলে, 'খামোখা বকালেন। যাই হোক, ডোমের পাওনাটা মিটিয়ে দেবেন।' না হলে রাতভর মড়া আটকে রেখে মেডিকেল অফিসারকে খবর দিতে ছোটে সকালে। সিধু ডোম এ সময়ে তার নিষ্পলক ট্যারা চোখে ঠাকুরের মারপ্যাঁচ লক্ষ্য করে আর মনে মনে তারিফ করে। কথা চলে। শ্মশানের কুকুরগুলোর মত উৎসুক নিবিষ্ট চোখে মুখের কশ বিস্ফারিত করে নীরবে হাসে সে।

সিধু ফিরে এসে দেখল তখনও ভূতেশ দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ঠোঁটের কোণে বিড়িটা গেছে নিভে। গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে সে। যেন যাবার জন্য পা বাড়িয়ে কিছু মনে পড়েছে তার। আর মেয়েটা আঁট করে খোঁপা পিটিয়ে-পিটিয়ে বেঁধে মুখ টিপে-টিপে হাসছে।

সিধু ফিরে এসেছে টের পেয়ে পিছন ফিরেই ভূতেশ বলল, 'আবার বলছি, মিছে এ সব ঝঞ্ঝাট করিস নি। শ্মশানে মেয়েমানুষ নিয়ে কেউ থাকে না। এর আগে যে মেয়েটাকে এনেছিলি, দেখলি তো সেবারের মড়কে ছুঁড়ি পালিয়ে গেল। মড়া ঠ্যাঙাচ্ছিস মড়া ঠ্যাঙা, ও সব রমজানি কেন?'

সিধু সবেমাত্র তাড়ির ভাঁড় নিয়ে প্রথম চুমুকটা দিয়েছিল। হঠাৎ সেই পুরনো স্মৃতিটা ঠাকুর উসকে দিতেই ভাঁড়টা নামিয়ে নিল মুখ থেকে। তার ট্যারা চোখের ভাব বোঝা দায়। মনে হল যেন জবাব দিতে গিয়ে অসহায় বোধ করছে সে। পরমুহূর্তেই আর একটা চোখের তারা কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে শুধু সাদা ক্ষেত্রটি চকচকিয়ে উঠল। গোঁফ জোড়া মুচড়ে দিয়ে চিবিয়ে বলল সে, 'তুমি কি ঠাউর তোমার মত হতে বলছ আমাকে? তা হবে না। একটা পালিয়েছে, এই তো নিয়ে এসেছি আর একটাকে। ক'টা পালাবে। যত পালাবে, তত আনব।'

'হাঁ, তোর জন্যে মেয়েমানুষ হত্যে দিয়ে পড়ে আছে।'

'ঠাউর, ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় না।'

'মেলা বকিস নি। ভাত তোর ঘরে হাঁড়ি ভরতি, না? বলে, তাড়ির দাম যোগাতে পারিস নে, ভাত ছড়িয়ে কাক ডাকবি।'

কথাটা নির্মম সত্য এবং তার নিয়ে-আসা মেয়েমানুষের সামনেই ভূতেশ ব্যঙ্গ করে সে কথা বলে তার বুকে অসহ্য জ্বলুনি ধরিয়ে দিল। কয়েক ঢোক তাড়ি গিলে সে হঠাৎ বলল, 'বউ নিয়ে তো কখনও ঘর করলে না ঠাউর, এ সবের আদর তুম নহি সমঝেগা।'

চকিতে ভূতেশ ফিরে দাঁড়াল। ভাঁটির মত জ্বলে উঠল তার কটা চোখ। পোড়া কাঠের ধারে ধারে যেন লুকানো অঙ্গার আচমকা হাওয়ায় গনগনে হয়ে দেখা দিল। বলল, 'বউ নিয়ে আমি ঘর করি নি, তুই করেছিস, না? শালা মাতাল ডোম!'

সিধুর গলা একটু ঠাণ্ডা হয়ে এল। 'তা বেলাডি-ফেলাডি যাতই বল, ওকে কি ঘর করা বলে? অমন অপ্সরীর মত বউ, কন্দর্পকান্তি ছেলে তুমি ত্যাগ দিয়ে রাখলে। পাণ তোমার অমন পাষাণ বলেই না আমাকেও তাই বলছ।'

'আমি পাষাণ আর তোরা সব কাদার মত নরম।' ভূতেশ তার লম্বা লম্বা দাঁতে যেন ভেংচে উঠল। পোড়া বিড়িটা ধরাল আবার।

বটগাছের ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে নামে অন্ধকার। পাখা ঝাপটার শব্দ শোনা যায় শকুনের। চিতার কাঠ পোড়ার চড়বড় শব্দে মনে হয় পটকা ফাটছে। ওদিকের

খেয়াঘাটে নৌকো বুঝি ভিড়ল। এলোমেলো গলার স্বর শোনা যায় দু-একটা। অনেক অদৃশ্য মানুষের নিশ্বাসের মত হাওয়ায় সরসরিয়ে ওঠে বটপাতা।

মেয়েটা একটা লম্ফ জ্বালিয়ে ভুতেশ-সিধুর মাঝখানে বসিয়ে দিয়ে গেল। গায়ে তার একটা দামী জামা। এ পরিবেশের মধ্যে যেন কাদায় আধ-ঢাকা সোনার চকচকানি। শাড়িটাও নিতান্ত অল্পদামী নয়, আর তার যৌবনভরা বলিষ্ঠ শরীরে আনাড়ীভাবে পরনে শাড়িতে তাকে মহাভৈরবী নয়, ইন্দ্রাণীর রূপ দিয়েছে। মৃতদের দৌলতে অমন দু-একখানা জামা আর শাড়ি সিধু ডোমের বেড়ার মাকড়সার ঝুলের মধ্যে গোঁজা আছে। মেয়েটির কালো-কালো টানা চোখের রহস্য, বঙ্কিম হাসি লেগেই আছে। শুধু মুখে কোন কথা নেই।

বিঁড়িটা ফেলে দিয়ে হঠাৎ ভুতেশ বলল, 'এক পাত্তর দে দিনি তোর ওই ভাঁড়ের মাল।' শান্ত আর গম্ভীর গলায় বলতে-বলতে সে বসল।

সিধুর কাছে এ সব নতুন নয়। সেজন্য একটা আলাদা ছোট হাঁড়ি বাড়িয়ে দিল ঠাকুরের দিকে। নিজের এঁটো সে কখনও দেয় না তাকে। কিন্তু ঠাকুর এমন তাড়ির ভাঁড় নিয়ে বসে খুব কদাচিৎ, যখন এ দুনিয়ার উপর বিরক্তির তার সীমা থাকে না। নেশার ঘোরে সারা দুনিয়ার, বিশেষ করে মেয়েমানুষের পিণ্ডি শ্রাদ্ধ করার জন্যে প্রাণ তার জ্বলতে থাকে।

পাত্রটি প্রায় নিঃশেষ করার পর ভুতেশের গম্ভীর আর বিদ্রূপ করা গলা শোনা যায়, 'অপ্সরীর মত বউ আর কন্দর্পের মত ছেলে আমি ত্যাগ দিলেছি, আমি পাষাণ। তুই ব্যাটা কানা, আমার দিকে একবার তাকিয়ে দ্যাক দিনি।'

ব্যাপারটা না বুঝে সিধু তার ড্যাবা ট্যারা চোখ তুলে ধরল ভুতেশের দিকে। মেয়েটিও তাকাল। ঠোটের কোণে হাসিটুকু তার ঝরব-ঝরব করছে।

চোখের কোণ কুঁচকে ভুতেশ বলল, 'আমার কখনও অপ্সরীর মত বউ হয়, না কন্দর্পের মত ছেলে হতে পারে—অ্যাঁ? বিয়ের রাতে তোদের অপ্সরী বউ ভয় পেয়ে বলেছিল, 'মা গো, যেন পোড়া কাঠ!' আমি হলাম পোড়া কাঠ। আমার সঙ্গে কেউ ঘর করতে পারে? কিন্তু তখনও নিজের মুখটা ভাল করে কোন দিন দেখি নি, তাই রাগে ঘেন্নায় মাথায় রক্ত চিনচিনিয়ে উঠল। ফুলশয্যার রাতে পায়ের জুতো খুলে বেধড়ক ঠ্যাঙালাম নতুন বউকে। আহা, দুধে আলতার সে রং, আমার বুক-জ্বালানো সে হাসি ফেটে বেরুল রক্ত আর চোখের জল। পরদিন শ্বশুর লোকজন নিয়ে এসে মেয়ে নিয়ে চলে গেল। একে হাভাতে বামুন ঘরের আকাট ছেলে, তায় এই কুৎসিত চেহারা আর নামটাও আমার কি চমৎকার বল দিনি? মাস কয়েক পরে শ্বশুরবাড়ি থেকে ডাক এল, জামাইয়ের ডাক, বুঝলি? গেলাম। অপ্সরী বউয়ের বোন সব উর্বশী শালীরা পালিয়ে গেল আমাকে দেখে। শাশুড়ি এল না দেখা করতে। বউ এল। তার কার্তিকের মত সুন্দর জামাইবাবুর গা ঘেঁষে ভয়ে-ভয়ে। ভায়রাভাইরা আমার সঙ্গে কথা বলল

না। রাতে শুতে গেলাম। মনের কথা আর তোকে বলব কি, সে-জীবনে একবারই হয়েছিল সে অবস্থা। কিন্তু সারারাত বউ এল না। পরদিন দেখলাম, বউ তার জামাইবাবুর সঙ্গে হেসে জমিয়ে কথা বলছে। আবার রাত হল, শুতে গেলাম। অনেক রাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। হঠাৎ চুড়ির শব্দে জেগে দেখি, অন্ধকার। পাশে হাতিয়ে দেখলাম বিছানা ফাঁকা। উঠে বারান্দার জানালার কাছে গিয়ে দেখি তোদের অপ্সরী বউ ভগ্নিপতির বুকে মুখ গুঁজে বলছে, 'ওই রাক্ষসটার কাছে যদি আমাকে তোমরা পাঠাও গলায় দড়ি দেব আমি।'

বলতে-বলতে ক্ষিপ্ত চিতাবাঘের মত জ্বলে উঠল ভূতেশের কটা চোখ, কান দুটো নড়ে উঠল, মাথার শিরে টান পড়ে, অশ্বনাসারন্ধ্র উঠল ফুলে-ফুলে। দাঁতে দাঁত পিষে বলল, 'যদি সত্যিই রাক্ষস হতুম তা হলে ঘাড় মটকে ওর রক্ত খেতুম আমি মাইরি ! মাইরি বলছি, রাক্ষস হলে এই মেয়েমানুষগুলোকে—'

বাকরুদ্ধ হল তার চালার দরজায় ঠায় তার দিকে তাকিয়ে থাকা মেয়েটার উপর চোখ পড়ে। ভয়ে বিস্ময়ে বেদনায় সে কালো চোখ বিচিত্র হয়ে উঠেছে। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে ভূতেশ আচমকা তাড়িশূন্য হাঁড়িটা বটতলায় ছুঁড়ে দিয়ে ছাইগাদায় গিয়ে দাঁড়াল গাঁয়ের দিকে মুখ করে।

সিধুর ট্যারা চোখের ভাব বোঝা দায়। সে চোখে বিস্ময় না বেদনা, বোঝা গেল না। সে আস্তে-আস্তে উঠে ভূতেশের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

শ্মশানের বটতলার আলো-আঁধারিতে মানুষ চেনা যায় না, মনে হয় দুটো কালো কালো প্রেতমূর্তি কাড়ানো ছাইগাদায় দাঁড়িয়ে গ্রামের দিকে তাকিয়ে মতলব ভাঁজছে। যেন প্রতীক্ষা করছে নতুন শব আসবার। পাশ দিয়ে খেয়াঘাটের পথ। যাত্রীরা সে মূর্তি দেখে ভয়ে পিছিয়ে যায়। বলাবলি করে শালা ভূত দুটো এবার কাকে শ্মশানে টানবে তাই দেখছে।

হঠাৎ ভূতেশ বলল, 'কি রে, লোহার না ইঁটের মড়া পুড়ছে যে এখনও শেষ হল না ?'

সে কথা বোধ হয় ভাবছিল না সিধু। আচমকা একটা নিশ্বাস ফেলে চিতার কাছে চলে গেল। যাওয়ার সময় নিচের হাঁড়িটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে গেল, 'নে, দু চুমুক দিয়ে নে।'

মেয়েটা তাকিয়ে দেখল কিন্তু চুমুক দিল না।

মাটিতে পোঁতা একটা শিশুর তাজা মৃতদেহ মুখে নিয়ে একটা শেয়াল গঙ্গার ধারে চলে যাচ্ছিল। কুকুরগুলোর নজরে পড়তেই অন্ধকারে হাওয়ার বেগে ছুটে গেল সেদিকে। একগাদা থুথু ফেলে কটূক্তি করে উঠল ভূতেশ, 'ভাল করে পুঁতেও দেয় নি। খা শালারা পেট ভরে।'

মড়া পোড়ানো শেষ হল। ভূতেশ এগিয়ে এল সামনে। মড়াওয়ালা দলের একজন ভূতেশের হাতে একটা টাকা দিল।

'এই দিলেন !' রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করল ভূতেশ।

লোকটা বলল, 'ওই নিয়ে নিন দাদা, আর বেশি নেই।' বলে সিধুর দিকে একটা আধুলি বাড়িয়ে দিল।

সিধুর ট্যারা চোখে নির্মম শ্লেষ। বলল, 'ওই পোকাণ্ড মড়াটা পুড়োতে মাত্তর আট আনা ? বারো আনার তো বাবু তাড়িই খরচা হয়ে গেল।'

'আমরা কি তোমার তাড়ির খরচা যোগাতে এসেছি ?' লোকটা বলল।

সিধু হাত উলটে বলল, 'তা ছাড়া আর খাই কি বাবু ? ও পয়সা আপনি মায়ের মন্দিরে দিয়ে দেনগে, জোর তো কিছু নেই।' মনে মনে বলল, মড়ার গায়ের জামাটা দিলেও না হয় কথা ছিল।

লোকগুলো এক বিচিত্র ভয়-ঘেন্না মেশানো চোখে শ্মশানের এ মানুষ দুটোকে একবার দেখে একটা টাকা ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে।

সিধু টাকাটা উঠিয়ে বলল, 'জন্মালে ধাইমাগী আর ম'লে এ ডোম বেটা, এ দু হাত ছাড়া তো চলে না বাবু।'

বলে সে চিতা সাফ করতে লেগে গেল। চিৎকার করে চালার দিকে মুখ করে ডাকল, 'আরে হই, কি নাম তোর, এগিয়ে আয় মাগী।'

মেয়েটা এগিয়ে এল গাছকোমর বেঁধে। শ্মশানের মাঝে এক বেখাপ্পা জীব, গাছকোমর বেঁধে শাড়ির রেখায়-রেখায় যার উছলানো যৌবন চলতে ফিরতে গায়ে ঝাপটা দেয়।

মুখ টিপে কটা চোখ খটাশ দৃষ্টি নিয়ে ভূতেশ দাঁড়িয়ে রইল।

কাজকর্ম সারা হলে সিধু এগিয়ে এসে বলল, 'দেও দিনি ঠাউর বিড়ি একটা এবার।'

'কেন, তাড়িতে হল না ?'

সিধুর তাড়িমত্ত লালচোখ হাসিতে বুজে এল।—'তোমার অমন বাবার পেসাদ পোরা বিড়ি ! দুটো টান দিলে শরীরের জাম একটু ছাড়ত।'

অর্থাৎ ভূতেশের বিড়ির মধ্যে শুখা তামাক নেই, আছে গাঁজা ভরা। সিধু তাকে বাবার পেসাদই বলে।

ভূতেশ মুখ ভেংচে বলল, 'মাইরি আর কি।' তারপর কি মনে করে একটা বিড়ি ছুঁড়ে দিল সিধুর দিকে।

সিধু বিড়িটা মেয়েটার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'বিড়িটা ছাইগাদা থেকে ধরিয়ে নিয়ে আয় তো !'

মেয়েটা ভুরু টেনে ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'মাগো ! এর মধ্যে গাঁজা পোরা রয়েছে যে ?'

'তা নয় তো কি, বিষ রয়েছে ?' সিধু বলল ট্যারা চোখ বাঁকিয়ে, 'বিড়ি-গাঁজা ফুঁকতে পারবি নে, পারবি নে তাড়ি টানতে, তবে কি পোড়া মড়া খেয়ে থাকবি ?'

মেয়েটা খিলখিল করে হেসে উঠল। অমনি ভূতেশ মুখটা বিকৃত করে ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। তারপর আবার জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে মেয়েমানুষ নিয়ে র‍্যালা করবি এখানে?'

কি একটা জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে সামনে এসে সিধু নেশামত্ত চোখ দুটো যতটা সম্ভব বড় করে জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে ঠাউর লোকে যে বলে সে কন্দর্পকান্তি ছেলেটা তোমারই?'

'তোমার মাথা ইস্টুপিড!' ধমকে উঠল ভূতেশ। মেয়েটা তখন জ্বলন্ত অঙ্গারের গায়ে বিড়িটা ঠেকিয়ে ফুঁ দিচ্ছে। সেদিকে একবার দেখে ভূতেশ ফিরে বলল, 'ব্যাটাচ্ছেলের শিক্ষা হয় নি। দাঁড়া আসুক ফাগুন-চৈত, লাগুক মড়কটা, কে ঠেকায় তোর মেয়েমানুষকে একবার দেখব।'

মড়ক লাগবে এটাও যেমন তোর কাছে নিশ্চিত, মেয়েটা পালাবে সেটাও তেমনি নির্ভুল!

সামনে শহরের ধারে জেলেপাড়াতেই হাফগেরস্ত শৈলী জেলেনীর বাড়িতে তার ঘর। পথটুকু এক লাফে পেরুতে পারলেই যেন ভাল হত, এত তাড়াতাড়ি লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগুলো ভূতেশ। মনটা তার ওলটপালট হয়ে গেছে, সিধুর উপর রাগ না নিজের উপর বিতৃষ্ণা, তা সে নিজেই বুঝল না।

খানিকটা এগুতেই বুড়ো হরেন কৈবর্তের একঘেয়ে কাশির শব্দ তার কানে এল। শৈলীর ভাশুর। কাশে বুড়ো সারা রাতই। মনে হতেই ভূতেশ খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা বুড়ো মলেও দুটো পয়সা আসত পকেটে।'

আর বস্তির ভিতরে যে সব মেয়েপুরুষেরা ঝগড়া লাগিয়েছে তাদের মৃত্যুতে অতগুলো পয়সা পাওয়া দুরাশা ভেবে বোধ হয় বলল, 'কবে এ-আপদগুলোর নাম উঠবে খাতায়, কে জানে!' অর্থাৎ তার মৃত্যু-রেজিস্ট্রার খাতায়।

কে একজন চেঁচিয়ে উঠল ভূতেশকে লক্ষ্য করে, 'কোত্থেকে খুড়ো?'

'দক্ষিণ দোর থেকে।' বলে বাড়ির অন্ধকার গলিটাতে ঢুকে পড়ল সে।

দিন যায়। ভূতেশ সেই সকাল থেকে দুপুর অবধি ঝাড়ুদার মেথরের পিছনে-পিছনে ছুটে বেড়ায়। কোথাও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দুটো গালাগাল শোনে কিংবা তাকে মধ্যস্থ করেই কেউ হয়তো মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, কমিশনারের আদ্যশ্রাদ্ধ করে। কেন না, সে মিউনিসিপ্যালিটির লোক তো? আবার এ সব লোকেরাই যখন শ্মশানে শব নিয়ে যায় তখন শত পরিচিত হলেও ভূতেশ তার কটা চোখ কুঁচকে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে, নাম কি? বয়স কত? বাপের নাম? ঠিকানা? যেন এখানকার জমিদারীটা তারই।

শীতকাল। শ্মশানের বটগাছটার পাতা ঝরে যায়, ন্যাড়া হয়ে যায় একেবারে। বেশির ভাগ সময় শ্মশান ফাঁকাই থাকে এখন। এ সময়টা মানুষ মরে একটু কম।

তবে একটা চটকল শহর, মানুষে ঠাসাঠাসি। গড়ে অন্যান্য জায়গা থেকে অবশ্য মৃত্যুর হারটা এখানে বেশিই।

তবু ভূতেশকে আজকাল সিধুর বটতলাতেই বেশি দেখা যায়। হ্যাঁ, তার বদ্ধজমাট প্রাণের কোঠায় যেন হাওয়া বইছে। সিধু খুব আড়ালে গিয়ে মাথা নাড়ে আর মনে-মনে বলে, হায় রে পোড়া কপাল!

কিন্তু এক অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে ভূতেশ আর সিধুতে। যেন একটা নূতন সংসার গড়েছে তারা এখানে। হিংসা দ্বেষ তো দূরের কথা, তাদের ফাঁকা জীবন যেন পুষ্ট হয়ে উঠেছে। ভূতেশ শুধু অবাক নয়, তার সারা গায়ের মধ্যে এক অপূর্ব শিহরণ জেগে ওঠে থেকে-থেকে, আর নিজের ছাইবর্ণ ধূসব বুক্ষ শরীরটাকে দেখে আঁতিপাতি কবে।

প্রথম দিনের সে কথা। একে গাজাভবা বিড়ি, তার উপরে সিধু আর সে ভাঁড়েব পর ভাঁড় শেষ করে শুধু বুঁদ নয়, একেবারে অচেতন হয়ে পড়েছিল। আর ওই মেয়ে গঙ্গার জলের ছিটা দিয়েছিল চোখে-মুখে, আঁচল দিয়ে মুছিয়ে দু'হাতে সাপটে ধরে টেনে তুলে নিয়ে গিয়েছিল ছাইগাদা থেকে। অচেতন শরীরে চেতন ফিরেই আসে নি, বিড়বিড় করে বাব-বাব বলেছিল, 'আমি যে পোড়া কাঠ, ছেড়ে দাও, ফেলে দাও।'

সে মেয়ে হেসেছিল। সে হাসিব নাম জানে না ভূতেশ। মনে হয়েছিল মাতাল। জীবনে এ মাতলামির স্বাদ যে জানত না।

তবু ভূতেশ মাঝে মাঝে বলে ওঠে, 'শ্মশানেব মধ্যে মেয়েমানুষ নিয়ে ধাপ্পাবাজি ছাড় বাপু। ও তো কাটল বলে।'

তারপর তাব কটা চোখ দিয়ে মেয়েটার দিকে তাকিয়ে বলে সিধুকে, 'ওকেই জিজ্ঞেস করে দেখ না।

মেয়েটা ভ্রূ বাঁকিয়ে নীরবে হাসে। কখনও বা কপট গাম্ভীর্যে বলে, 'হ্যাঁ বাপু, না ম'লে কে আসে তোমাদের এখানে?'

সিধু হাসে। ভূতেশের কটা চোখেব কোচকানিতে অবিশ্বাস্য হাসি ওঠে চকচকিয়ে। তারপরে ওরা তিনজনে বসে অদ্ভুত গল্প জুড়ে দেয়। কোন দিন মড়া পোড়ে কোন দিন পোড়ে না। শ্মশানের কুকুরগুলো তাদেব ঘিরে শুয়ে বসে থাকে।

মেয়েটি এখনও ওদের চা করে দেয়, বিড়ি ধরিয়ে দেয়, মাটির গেলাসে ঢেলে দেয় তাড়ি। নিজেও কোন-কোন সময় গেলে দু-এক ঢোক। তারপরে প্রাণের আবেগে তিনজনেই তারা খানিকটা সতেজ হয়ে ওঠে। ভূতেশ বলে, 'এক-এক সময় মনে হয়, শালা দুনিয়াটাকে খাতায় তুলে ছেড়ে দিই।'

সিধু বলে, 'খাতায় তুলে কি হবে ঠাউর, দিতে হয় চিতায় তুলে দেও কাজ হবে।'

মেয়েটি বলে অভিমান করে, ‘শ্মশানে-শ্মশানে থেকে তোমাদের খালি এক কথা। পুড়ুতেই শিখেছ খালি। আমাকে পুড়ুবার জন্যেই বুঝি হাঁ করে আছ তোমরা? চিতা ধুয়ে তবে গঙ্গাজলের ছিটা দাও কেন?’

জবাবে তারা দুজনে চুপ করে থাকে। খানিকক্ষণ পরে ভূতেশ বলে, ‘শুনলি কথা? দেখবি ও ঠিক কেটে পড়বে।’

কোন-কোন দিন সন্ধ্যার পরে দেখা যায় পুরনো ছাইয়ের ঢিপিটায় ভূতেশ সিধু অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে দুটো প্রেতের মত গাঁয়ের দিকে কিংবা গঙ্গার দিকে তাকিয়ে থাকে। আজকাল তাদের দুই মূর্তির মাঝখানে মাঝে-মাঝে আর একটা মূর্তি দেখা যায়। নারীমূর্তি। অন্ধকারে সে দেহের রেখায়-রেখায় কি যে প্রাণ-ভোলানো বাহার। দুই পুরুষের দিকে বারেক তাকিয়ে সে মেয়ে তাদের পায়ের কাছে বসে গুনগুনিয়ে গান গায়ঃ

মা গো, জম্মো দিলি এ সমসারে মেয়ে করে,
ত্যাখন তো বললি না গো, আবাগী আমি অবলা;
আজ য্যাতেই কেন কাঁদিস না মা, তবু। পাণ যারে চায়,
তার গলাতে পরাব আমি মালা।

নয় তো সাপের মত দুলে-দুলে মোহিনী হেসে গায়ঃ

মুখের ছায়া জলের তলে, মনের ছায়া দেখি না-হয়—
আমার মনের ছায়া তোমার চ’কেতে,
হায়, পোড়া মন এত ঢাকি এত চাপি সম্বো অঙ্গ উদাস করে
তবু ঘোমটা ঢাকা পড়ে না মোর মনেতে।

গঙ্গার বুকে থেকে হাওয়া উঠে সে গান ভেসে যায় পথ পেরিয়ে মাঠ পেরিয়ে জেলেপাড়ায়। হাওয়ার গায়ে সে সুর শুনে গাঁয়ের লোকেরা বলে, শ্মশানে বটগাছে শকুনবাচ্ছা বিনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদছে।

সিধু হয়তো তাড়ি আনার নাম করে চলে যায়। অনেকক্ষণ ধরে আর আসে না। তারা দুজনে এসে হয়তো দেখে, সিধু ঘরে না হয় বাঁধানো ঘাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কোন সময় ভূতেশ হয়তো খুব রেগে এসে মেয়েটির কাছেই সিধুর নামে অভিযোগ করে, ‘এ্যাই, একেই বলে মেয়েমানুষ নিয়ে শ্মশানে র‍্যালা চলে না। বললাম রাসকেল, ইস্টুপিড ড্যাম ডোম ব্যাটাকে যে, দুটো গোরু মরে গেছে আকালীর গোয়ালে। ভাগাড়ে কেন যাবে। তুই ও দুটোকে নিয়ে এসে ছাড়া, চামড়াটার দাম পাবি, কথার কথা বলছি—শকুনিগুলোরও পেটে ভরে। পড়ে তো থাকবে হাড়টা। তাও দেখি, কতগুলি ছোঁড়া আবার হাড় কুড়িয়ে বেড়ায়, কোথায় কোন্ ফ্যাক্টরীতে নাকি দু’পয়সা সের বিক্রি করে। লোকসানটা কোথায় বলতে পারো?’

মেয়েটি হেসে জবাব দেয়, 'এ সব তোমরাই ভাল বোঝ ঠাকুরবাবু। চেলা তোমার সারাদিন তো তাড়ি খেয়েই পড়ে আছে। শ্মশান তো আগলাচ্ছি আমি আর ওই কুকুরগুলো।'

কখনও-কখনও সিধুর মনে হয়, আর যাই হোক বামুনের ছেলে হয়ে ঠাকুর তা বলে ডোমের ছোঁয়াও খাবে। কিন্তু বলতে ভরসা পায় না, তাই কায়দা করে বলে, 'জানলে ঠাউর, আজ তোমার ইঞ্জিন সাহেবকে দেখলাম।'

'ইঞ্জিন সাহেবটা কে?'

'তোমার দাদা গো, বড় হালদার।'

ভূতেশ বলে, 'ব্যাটাচ্ছেলে, ইঞ্জিন সাহেব বলছিস কি রে। বল ইঞ্জিনিয়ার।'

'ওই হল।' একটু থেমে ট্যারা চোখে পিটপিট করে বলে, 'দাদা তোমার অত বড় মানুষ, আর তুমি বামুনের ছেলে হয়ে—'

'অনেক বড় রে, অনেক বড়।' ভূতেশ বলে ওঠে, 'ম'লে পরে এ শর্মার কাছে এসেই আমার লায়েক ভাইপোকে তার বাপ-ঠাকুর্দার নাম বলতে হবে।'

'কি বললে?'

ভূতেশ বলে, 'তবে হ্যাঁ, কথায় বলে কেলে বামুন, কটা শুদ্দুর, বেঁটে মুসলমান—এ তিন ঘুঘুই সমান। আমি তো পোড়া কাঠ।'

কিন্তু সিধু তার আগের কথাটার রেশ টেনেই বলে, 'কি বললে? তোমার ভাইপোকে তার বাপ-ঠাকুর্দার নাম তোমাকে বলতে হবে?'

'হবে বৈ কি।'

'ভাইপোর ঠাকুরদা মানে তোমার বাপ তো?'

ভূতেশ ঠোঁট বেঁকিয়ে বলে, 'হলই বা। বাপ বলে তো খাতির নেই। আমি তো ডেথ মানে মৃত্যু-রেজিস্ট্রার।'

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সিধু তার ট্যারা চোখ তুলে বলে, 'আচ্ছা বল তো ঠাউর, তুমি মরে গেলে ওই খাতায় তোমার নামটা লিখবে কে?'

জবাব দিতে গিয়ে থমকে থাকে কিছুক্ষণ ভূতেশ সিধুর চোখের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ মুখে কোন কথা যোগায় না তার। তারপর লোম-ওঠা ভ্রূ তুলে বলে, 'আর তুই মরে গেলে তোকে পোড়াবে কে, বল দি'নি?'

সিধুর ট্যারা চোখও হঠাৎ অপ্রতিভ হয়ে পিটপিট করতে থাকে। এক মুহূর্ত দুজনেই তারা তাকিয়ে থাকে দুজনের দিকে। তারপরেই মেয়েটি সুদ্ধ তিনজনেই তারা শ্মশান চমকে হাসিতে ফেটে পড়ে।

কিন্তু মেয়েটি আচমকা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে ভ্রূ বেঁকিয়ে, 'তোমাদের খালি এক কথা। মরা মরা আর মরা।'

সিধু বলে, 'তা, মরা নিয়েই তো আমাদের কারবার। জ্যান্ত আমরা আর পাব কোত্থেকে?'

এক বিচিত্র অভিমানক্ষুব্ধ গলায় মেয়েটি বলে, 'দেখতে পাও না বুঝি জ্যান্তটাকে ?' বলে চকিতে সিধু আর ভূতেশের দিকে চোখের দৃষ্টিতে মর্মঘাতী নালিশ জানিয়ে চলে যায়।

সিধু বলে, 'এ্যাই সেরেছে। কি হল রে ?'

ভূতেশ বলে বিড়বিড় করে, 'শালা! শ্মশানে মেয়েমানুষ! দেখিস ও ঠিক কেটে পড়বে।'

শীত যায়, বসন্ত আসে। বোল ধরে আম গাছে। ন্যাড়া বটগাছটায় গজায় নতুন পাতা। ফাল্গুনের হাওয়ায় উদাস করে প্রাণ—গুটি দেখা দেয় গায়ে-গায়ে-বসন্তের গুটি।

ভূতেশ রিপোর্ট দেয় পাড়া-ঘরের রোগের, আবার শ্মশানে এসে খাতায় মৃতের নাম-পরিচয় লিপিবদ্ধ করে। ঝিম-ধরা শ্মশান থেকে আস্তে-আস্তে আড়মোড়া ভাঙে। কুকুরগুলোর ঝিমুনি আরও বাড়ে, নেশায় যেন বুঁদ। কেঁদো হয় আরও বেশি। বটের শক্ত ডালে শকুনি গৃধিনী চঞ্চু ঘষে-ঘষে করে শক্ত, সাপের মত চোখ নিয়ে গ্রামজনপদের দিকে তাকিয়ে খাবার খোঁজে।

কিন্তু বসন্তের ফাঁড়াটা অল্পেস্বল্পে কেটে গেলেও চৈত্রের শেষে ভূতেশের কথাকে বেদবাক্য করেই যেন কলেরার মড়ক নেমে এল সারা চাকলা জুড়ে।

ইস্! এক দুরন্ত তার বিস্তৃতির বেগ। রোগ ছড়িয়ে পড়ল যেন হাওয়ার দমকে দমকে। আর এ ফাঁকা গ্রাম নয়, শিল্পাঞ্চল। চটকল শহর। সারিবীজের মত ঘন বস্তি ও বাড়ির ভিড়, তার চেয়েও বেশি ভিড় মানুষের, সরু সুড়ঙ্গের মধ্যে অগুণতি পিঁপড়ের মত।

ওলাইচণ্ডী রক্ষাকালীর পুজো শুরু হল, শুরু হল পাড়ায়-পাড়ায় অষ্টপ্রহর নামকীর্তন। হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে সারা এলাকার অল্প ক'টা ডাক্তার, ফেঁপে উঠেছে পকেটও। রোজগারের মরশুম এটা।

ভূতেশ তার খাতায় নতুন পাতা জোড়ে, পেন্সিল নিয়ে আসে নতুন। সময় নেই, অসময় নেই, কেবল মৃত্যু মৃত্যু মৃত্যু। শব শব শব।

চিৎকার, আর্তনাদ, কান্না। কান্না ভয়ের, আতঙ্কের, নিজের প্রাণের।

ভূতেশ বলল সিধুকে তার কটা খটাশ চোখ তুলে, 'শালা শুরু হয়েছে, দে তো তোর সতরঞ্চেটা চার পাট করে পেতে, একটু জমিয়ে বসি।'

সিধুও ক্লান্ত। চিতার আগুনের তাতে-তাতে কালো হয়ে উঠেছে সে। বেড়ে যাচ্ছে তাড়ি খাওয়া। মড়ার যেন পাহাড় জমে উঠছে শ্মশানে।

সিধু মাঝে-মাঝে খিস্তি-খেউড় করে উঠছে, 'কে পোড়াবে অত মড়া? টান মেরে ফেলে দেও গঙ্গায়, ভাল গতি হবে।' তারপর মনে-মনে ফিসফিস করছে, শালা কাঠ কোথা? মানুষ দে মানুষ পোড়াতে হবে।

বিড়িতে গাঁজা পোরার সময় নেই ভূতেশের। হাত চলেছে তো চলেছেই। নির্লিপ্ত নির্বিকার চিত্রগুপ্ত। শোকে কেউ ফুঁপিয়ে উঠলে, কেঁদে উঠলে খ্যাঁক করে ধমকে ওঠে সে, 'ও সব ন্যাকামো রাখ. নাম বল। বাপের নাম? বয়স? রোগ?' একজন যায়, আরেকজন, আরও-আরও। এক কথা, এক প্রশ্ন. নাম? বাপের নাম? বয়স? রোগ?' বলে যাও, বলে যাও।

কুকুরগুলোকে মারলেও নড়ে না। শেয়ালগুলো দিনের বেলাতেই এদিক-ওদিক করে বেরিয়ে আসছে ঝোপ-ঝাড় থেকে। গঙ্গার ধারে-ধারে শকুনের ভিড়। হাওয়ায় ভাসে যেন কোন অশরীরী প্রেতিনীর একটানা কান্নার ঢেউ।

এখন পোড়ানো মানে আধপোড়ানো, আধপোড়ানো মানে চিতায় একবার শোয়ানো, কিংবা একই চিতায় কয়েকটা শব। কাঠ নেই, ছোট ছোট চিতা। সিধু মটমট করে মৃতের হাত ভেঙে পা ভেঙে কোন রকমে ঢুকিয়ে দিচ্ছে চিতার মধ্যে। কেউ বারণ করলে চেঁচিয়ে উঠছে, 'তবে পুড়োও এসে তুমি। দেখি তোমার তাগদ। দেবে তো আট আনা কি চার আনা।'

হ্যাঁ. ক্রমাগত রেট কমে আসছে কি ভূতেশের কি সিধুর।

মেয়েটি মাঝে মাঝে যোগান দিচ্ছে ভূতেশ-সিধুর চা। একে তাড়ি, ওকে পুরে দিচ্ছে বিড়িতে গাঁজা। কিন্তু বাকরুদ্ধ হয়েছে মেয়েটার, দম আটকে আসছে বুকের। আর তো সে পারে না। মড়া মড়া মড়া। কেবলই মড়া। আর ওই ভূতেশ ঠাকুর আর সিধু। সেই হাস মস্করাই বুঝি সত্যি যে, ওরা চিত্রগুপ্ত আর যম। শুধু ওরাই জীবিত নির্লিপ্ত, নির্বিকার।

কখনও ভূতেশ কখনও সিধুর চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে সে। শ্মশানের ধোঁয়ায়-ধোঁয়ায় ধোঁয়াচ্ছন্ন তার মুখ। বাধা নেই বিনুনি, অচল যৌবনে লতিয়ে দেওয়া বুকে সাপের মত।

ভূতেশ ও সিধু চোখাচোখি করে আর তাকায় মেয়েটার দিকে। তারপর ভূতেশ বলে, 'দেখছিস একবার ওর চোখ-মুখ। ওরে, কেলেবামুন, পোড়া কাঠ হলেও চিত্রগুপ্তের বেদবাক্য! ও কাটল বলে।'

সিধুর গলা জড়িয়ে আসে। ঢুলুঢুলু ট্যারা চোখে তাকিয়ে বলে, 'এটা কাটবে, আবার আসবে।'

'ড্যাম ডোম কোথাকার!' ঘোড়ার মত লম্বা নাকের ভিতর থেকে ফ্যাস-ফ্যাস শব্দ করে ভূতেশ। হঠাৎ গলার স্বরটা তার মোটা ও চাপ হয়ে আসে, 'আবার যদি এ সব ফিকির করিস তবে তোর নামই আমি খাতায় উঠিয়ে ছাড়ব।'

অসীম ক্লান্তির সঙ্গে সিধু বলে. 'ঠাউর, দুনিয়াটা তো পেরায় খাতায় তুলে ফেললে।'

'যা বলেছিস সিধে। চিত্রগুপ্তের খাতাটা বড় সস্তা হয়ে গেছে।'

এক-একটা দিন কাটে না, যেন মাস কাটে। কিংবা বুঝি বছর।

হঠাৎ আকাশে মেঘ করে আসে. গুম-গুম শব্দ ওঠে মেঘের ডাকের। ঘরে-ঘরে ডাক পড়ে, আয় আয়, আয় বৃষ্টি আয়, নেমে আয়, নেমে আয়।

অপলক ট্যারা চোখে চালা থেকে সিধু এসে দাঁড়াল ভূতেশের সতরঞ্চির সামনে। ভূতেশ তাকিয়ে ছিল আকাশের দিকে। একমাত্র সে-ই জানে প্রাণভরে বৃষ্টিকে সেও ডাকছিল কি না, নাকি ওই শকুনগুলোর মত ভিজে-ওঠা ঠাণ্ডা শ্যামল পৃথিবীতে অনাহারে গন্ধ শুঁকছিল, আকাশের দিকে মুখ করে।

সিধু বলল, 'ঠাউর', কেটে পড়েছে ছুঁড়ি।'

'অ্যাঁ!' চমকে ফিরল ভূতেশ। যেন কথাটা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। পরমুহূর্তেই রেজিস্ট্রি খাতাটার দিকে চোখ নামিয়ে বিড়বিড় করে বলল, শালা, বেদবাক্যি, বেদবাক্যি!'

সিধু বলল ট্যারা চোখ ছোট করে, 'শ্মশানেও রেহাই নেই, মেয়েটা মরে গেছে গো ঠাকুর, ওলাউঠায়। বেদবাক্যি বটে তোমার।'

'মরে গেছে! ওলাউঠায়?' ভূতেশের কটা খটাশ চোখের চারপাশে মাকড়সার জালের মত হাজার রেখা ফুটে উঠল। চালার দরজাটার দিকে তাকিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগল সে, 'এ কখনও আমার বেদবাক্যি নয়, কখনও নয়।'

সিধু মেয়েটার শব এনে সামনে শুইয়ে দিল। মরা মেয়ের এলানো চুল, নোংরা জামা-কাপড়। আর সারা মুখখানি এক অপূর্ব শান্ত সুষমায় ভরা। আধবোজা চোখের পাতা দুটো খুলে দিলে বুঝি এখুনি সেই বিচিত্র লজ্জায় হেসে উঠে বসবে হয়তো গুনগুনিয়ে উঠবে 'মাগো, জম্মো দিল এ সমসারে মেয়ে করে···'

ভূতেশ সিধু পরস্পর একবার চোখাচোখি করল। দুজনেই তারা বোধ হয় কিছু বলতে চায় এ মেয়েটিকে নিয়ে। কিন্তু বলল না।

তারপর গম্ভীর মুখে ঠোঁট টিপে মৃত্যু রেজিস্ট্রার কান থেকে পেন্সিল টেনে নামাল, আঙুলের ডগায় জিভের থুথু লাগিয়ে পাতা উলটে চলল। তারপর থেমে মুখ না তুলেই জিজ্ঞেস করল, 'ওর নাম কি?'

সিধুর ট্যারা চোখ ভাবাল না। বলল, 'কি জানি ঠাউর, মাগী বলেই তো ডাকতাম। তবে ওর মা ওকে ডাকত, কি বলে তোমার গো—সুলোচনা বলে।'

হাতের পেন্সিল কেঁপে উঠল এই প্রথম। তারপর খসখস করে আঁকিয়ে বাঁকিয়ে নামটা লিখে ভূতেশ ঠায় গঙ্গার দিকে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে থেকে বলল, 'বলেই গেলি ড্যাম ডোম, সুলোচনা মানে জানিস?'

সিধু বলল, 'কি জানি ঠাউর। অত মানে বুঝলে কি আর মড়া ঠ্যাঙাই?'

ভূতেশ কয়েকবার খ্যাঁকারি দিয়ে চোখ বুজে বলল, 'সু-মানে সুন্দর, বুঝলি ব্যাটা? আর লোচনা মানে চোখ যার।'

সিধু বলল মুখ ফিরিয়ে, 'হবেই বা। তা ওর চোখ দুটো তো –'

আবার মেঘ ডেকে উঠল। পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘে কালো হয়ে উঠেছে আকাশ।

'ওর বাপের নাম ?' পেন্সিল তুলল আবার ভূতেশ।

'জানি নে ঠাউর' বলে সিধু কাঠ কোপাবার কুড়ুলটা নিল তুলে।

'তবে স্বামীর নাম ?'

কুড়ুলটা কাঁধে তুলে নিয়ে বলল সিধু, 'মিছিমিছি যদি লেখ, তবে—আমার নামটা লেখ ঠাউর।'

ভূতেশের আঙুল অযথা নড়ে উঠল। চোখ বুজেই বলল, 'আর যদি সত্যি সত্যি লিখি ?—'

'এত ন্যাকামোও তুমি জানো ঠাউর !' বলতে বলতে সিধু সরে গেল।

দূর গঙ্গার জলের দিকে চোখ মেলে তাকাল ভূতেশ তার খটাশ দৃষ্টি নিয়ে, ঠোঁটটা বেঁকিয়ে সে বিড়বিড় করতে লাগল, 'লিখব, লিখব, মিছিমিছিটাই লিখব চিত্রগুপ্তের খাতায়। কেবল—'

মরা মেয়ের মুখের দিকে তাকাল সে। মনে পড়ল সেই প্রথম দিনের কথা গঙ্গাজলের ছিটা আর পোড়াকাঠের প্রাণের মাতলামি। 'সুলোচনা !'···ঠোঁট নড়ল তার। গলার পেশীগুলি ভিতর থেকে ঠেলে উঠল।—ফিসফিস করে উঠল সে. 'ভূতেশ হালদারের খাতায় সত্য নাম লিখব।'

ঘাড় গুঁজে এলোমেলোভাবে খস খস করে লিখে গেল সে। কি লিখল সে নিজেই জানে না বোধ হয়।

সিধু সব ঠিকঠাক করে চিতায় তুলে দিল মেয়েটিকে। তারপর আগুন ধরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গিয়ে ঘরে জমানো সব কাপড়গুলো এনে চিতায় ফেলে দিল।

আকাশে-আকাশে দুরন্ত মেঘের কলরব। হাওয়া উঠেছে, মেঘ ছুটেছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে ঘন-ঘন। ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। হয়তো বৃষ্টি হবে, কিংবা কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে। ভেজা মাটির সোঁদা গন্ধ বাতাসে।

শকুনগুলো উড়ে-উড়ে গাছে গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, কুকুরগুলি জ্বলজ্বলে চোখে একবার আকাশ, একবার মাটি, একবার চিতাটার দিকে দেখছে।

ভূতেশ গিয়ে দাঁড়াল সেই বটতলায় পুরানো ছাইগাদায়। সিধুও দাড়াল এসে। আজ আর মাঝখানে তাদের কেউ নেই। কেউ নেই অন্ধকারে বাঙ্কম চোখে আলো ফুটিয়ে, শরীরের রেখায়-রেখায় প্রাণ-ভোলানো রূপের লহর তুলে গুন-গুনিয়ে ওঠবার, 'হায় আমার মনের ছায়া তোমার চ'কেতে ··'

কেবল অস্পষ্ট ছায়ার দুটো প্রেতমূর্তির মত গাঁয়ের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল তারা।

অনেকক্ষণ পর ভূতেশের মোটা গলা শোনা গেল। 'জানলি সিধে, শ্মশানটা শালা সত্যি শ্মশান হয়ে গেছে।'

দেওয়াল-লিপি

যেখানে লেখাটা ছিল দেওয়ালের গায়ে, সেখানে হঠাৎ ব্রেক কষল জীপ গাড়িটা।

ঘটনা খুব সামান্য। কারও নজরেই ছিল না ব্যাপারটা। কিন্তু ছোট মফস্বল শহর। সামান্য ঘটনাই অসামান্য হয়ে উঠল। ছোট হলেও জমজমাট শহর। দু-একটি কলকারখানা আছে। বাজারটি বেশ বড় বাজার। রেললাইনের ওপারের গ্রামের চাষীবাসীদেরও ভিড় হয়। মিউনিসিপ্যালিটি আছে, থানা আছে। ছেলে আর মেয়েদের হাইস্কুল আছে কয়েকটি। কলেজ হবে একটি, শোনা যাচ্ছে।

সবজনে কিছু নির্জনতা। ব্যস্ততার মধ্যেও মন্থরতা। যাকে বলা যায়, মফস্বলের একটু ঢিলে-ঢালা ভাব।

সেদিন তখন প্রায় বেলা দশটা। জীপ গাড়িটা হঠাৎ ব্রেক কষল সেখানে, যেখানে পেট্রোল পাম্পের পাঁচিলটা এসে পড়েছে রাস্তার কাছে অনেকখানি। আর পাঁচিলটার ধার দিয়ে চলে গেছে একটা গলি। গলির মোড়টাতেই জীপটা দাঁড়িয়েছে। কানা গলি—এঁকেবেঁকে খানিকটা গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে। খান-তিনেক দোতলা, গুটিছয়েক একতলা, আর কতগুলি খড়ো ঘর গলিটাতে। নাম, ঠাকুরগলি। আসলে বেশ্যাপল্লী এই ঠাকুরগলিটিকে আড়াল দেওয়ার জন্যেই যেন পেট্রোল পাম্পের দেওয়ালটা বেড়ে এসেছে অনেকখানি। সেই দেওয়ালটার সামনে ব্রেক কষল পুলিস অফিসারের জীপ। থানার নতুন অফিসার-ইন-চার্জ। মাসখানেক এসেছেন পূর্বদিক থেকে বদলী হয়ে। বয়স অল্প, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হবে। কিন্তু এর মধ্যেই খুব কড়া লোক বলে খ্যাতি হয়ে গেছে। এদিকে আবার রীতিমত সোশ্যাল।

জনসভায় বক্তৃতা দেন না বটে। কিন্তু সাতচল্লিশোত্তর দেশের দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করেন লোককে। এমন কি, ঠেলাগাড়িওয়ালা রং-সাইড দিয়ে গেলে, তাকে নিজের হাতে সাইড চিনিয়ে দিয়ে বলেন, 'কত দিন আর এভাবে চালাবে? এখন থেকে তোমাদের এ সব বুঝতে হবে। ঠিক রাস্তা পাকড়াও।'

পৌরকর্তৃপক্ষের কাছে পর্যন্ত তাঁর আনাগোনা। শহরটা যেন নীট অ্যান্ড ক্লীন থাকে। অবশ্যই অনুরোধ, কিন্তু তাড়া দেন রীতিমত। চোর আর গাঁট-কাটাদের মধ্যে সাড়া পড়েছে।

অফিসার বলেন, 'আমার এলাকা শান্তিপূর্ণ আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন চাই। রুচিবান ভদ্রলোক ছাড়া কারও আশ্রয় হবে না এখানে। যার ভাল না লাগে সে চলে যেতে পারে।'

এখানে আসার দু-দিন পরেই সেপাইদের নিয়ে বেরিয়েছিলেন। যত দোকানের সামনে ছিল বেঞ্চ পাতা, সব সরিয়ে দিয়েছিলেন। দোকান থেকে খানিকটা বাড়িয়ে হয়তো কেউ রাস্তার উপর চটের থলি টাঙিয়েছে রোদের জন্যে। দেখায় ভারি বিশ্রী আর বে-আইনী। রোদ লাগে দোকান বন্ধ করে রাখুন। তা বলে রাস্তার দেড় হাত জায়গা আপনি আটকে রাখতে পারেন না।

খুব উৎসাহী মানুষ। ব্যস্ত দ্রুত অথচ রাশভারী। নিজেই জীপ চালিয়ে শহর ঘোরেন একবার রোজ।

কিন্তু ঠাকুরগলির মোড়ে কেন? আশেপাশে অনেক দোকানপাট। অদূরেই বাজার। সকলেই বিস্মিত, দুশ্চিন্তায় ফিরে তাকাল। কি হল আবার! যে যার নিজের দোকানের চারপাশ দেখে নিল একবার।

ঠাকুরগলির-বাসিনীরা কেউ কেউ বসে ছিল দরজার কাছে, দাঁড়িয়ে ছিল দরজার আশেপাশে। কেউ বাসী চুল এলিয়ে, কেউ রাতজাগা চোখ মেলে। সচকিত হয়ে উঠল ওরা। ও মা। ও মা! দারোগা কেন গলির মোড়ে?

অদূরে টহল দিচ্ছিল একটি কনস্টেবল, সে এল ছুটে। এসে অফিসারের দৃষ্টি অনুসরণ করে তাকাল দেওয়ালের দিকে।

অফিসার বললেন, 'যত সব রাস্কেলের কাণ্ডকারখানা। ডাক তো ওই দোকানদারটাকে।'

কোন্ দোকানদার, না দেখেই সেপাই চেঁচিয়ে উঠল, 'এই, এদিকে এস।'

কাকে ডাকল, কেউ বুঝল না। সামনে ছিল হরি পানওয়ালা। সে ছুটে এল।

অফিসাব দেওয়ালের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, 'দেওয়ালে কে লিখেছে এটা?'

হরি উড়িষ্যাবাসী। বাংলা লেখা বোঝে না। লোকটি ভাল। কথা বলে একটু নেকিয়ে-নেকিয়ে। বলল, 'আমি তো জানি না বাবু।'

অফিসার বললেন ভ্রূ কুঁচকে, 'জানো না তো, দোকানটা রয়েছে কি করতে? কদ্দিনের দোকান?'

'আজ্ঞে, তা বছর দশেকের হবে। আমি তখন—'

'থাক। দশ বছর ধরে এইখানে দোকান করছ আর লেখাটা কদ্দিন থেকে দেখছ?'

এবার একটু ঘাবড়ে গেল হরি। ইতিমধ্যে আশপাশের দোকান থেকেও কয়েকজন এসেছে সন্ত্রস্ত মুরগীর মত পা ফেলে-ফেলে। আর ঠাকুরগলির মেয়েরা আধা-সন্ত্রস্ত মুখে দেখছে উঁকি মেরে।

স্টেশনারী দোকানদার কানাই বিশ্বাস। পোশাকে একটু ফিট্‌ফাট। বলল, 'স্যার, এই লেখাটা প্রায় এক বছর ধরে আছে।'

'এক বছর!' বিস্ময় চাপা গলা অফিসারের। বললেন, 'আর এক বছর ধরে শহরের এই বড় রাস্তার এই লেখাটা আপনারা দেখছেন, তবু ব্যবস্থা করেন নি? বাঃ খুব ভাল কাজ করেছেন।'

ধমক খেয়ে সকলের মুখগুলি কেমন বোকা বোকা দেখাতে লাগল। সত্যি, চোখে হয়তো পড়েছে, কিন্তু কারও কিছু মনে হয় নি তো! মনে হবে কি! খেয়ালও নেই কারও। শহরের নানান কিছুর মধ্যে দেওয়ালের এই লেখাটাও মিশেছিল।

আজ, এই মুহূর্তে টনক নড়ে উঠল সকলের। সত্যি কি বিশ্রী! প্রায় এক ফুট লম্বা-লম্বা অক্ষরের কথাগুলি পাঁশুটে রঙ দিয়ে লেখা রয়েছে কিংবা তার চেয়েও বড় কাঁচা হাতে লেখা রয়েছে ঃ

'যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।'

নিশ্চয়ই কোন বখাটে বদমাইসের কাজ।

অফিসার যত দেখতে লাগলেন, ততই চটে উঠলেন। সবাইকে বললেন, 'কেউ জানেন, কে লিখেছে?'

সকলেই চুপচাপ। কেউ জানে না। অফিসার ঠোঁট বেঁকিয়ে বললেন, 'কেউ জানেন না! শুধু এত বড় জঘন্য লেখা এক বছর থেকে দেখছেন! ছি-ছি-ছি। এ কি আপনাদের দেশ নয়, আপনাদের শহর নয়!'

সকলেই অপ্রস্তুত, অথচ ছি-ছি ভাবটা ফুটে উঠেছে মুখে। সত্যি, একেবারে বড় রাস্তার ধারে এত বড় বড় অক্ষরে এমন জঘন্য কথা লেখা রয়েছে।

'ইন্‌ডিসেণ্ট!' অফিসার বললেন, 'মুছে ফেলুন, মুছে ফেলুন তাড়াতাড়ি। এ শহরে এ সব চলবে না। আমি চাই ডিসেন্সি, নীট্‌ অ্যাণ্ড ক্লীন। এখন আর সেদিন নেই।'

নিশ্চয়ই। হরিই ছুটল তাড়াতাড়ি। জল নিয়ে এল এক বালতি। আর একজন একটি ন্যাকড়া দিয়ে ধুয়ে তুলতে গেল। উঠল না। কে একজন কনস্টেবলের হাতে একটি লোহার বাটালি এগিয়ে দিল। কনস্টেবল চেঁছে-চেঁছে তুলল।

যতক্ষণ না উঠল, ততক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন অফিসার। তারপর জীপে উঠে আবার দেখলেন। পরিষ্কার হয়ে গেছে দেওয়ালটি। নাইস্‌!

জীপ ছুটিয়ে দিলেন।

তারপরেও জটলা চলল কিছুক্ষণ। সেই কিছুক্ষণ অফিসারের প্রতিনিধিত্ব করল কনস্টেবল।

ব্যাপারটা মিটে যেত এখানেই। কিন্তু দিন কয়েক পরে, আবার অফিসারের

জীপ দাঁড়াল সেই দেওয়ালটার কাছে। আশ্চর্য! আবার তেমনি লেখা রয়েছে, তেমনি বড়-বড়, আলকাতরা দিয়ে, একই কথা ঃ

'যে এই গলিতে ঢোকে, সে শুয়োরের বাচ্চা।'

নিচে আবার খড়ি দিয়ে আঁকাবাঁকা ছোট অক্ষরে লেখা, 'ঢুকেছ তো মরেছ।'

অফিসার আঙুল তুলে, গলা চড়িয়ে ডাকলেন, 'এই, এদিকে এস।'

হরি ভাবল, তাকেই ডেকেছেন, সে তাড়াতাড়ি ছুটে এল। অফিসারের ফরসা মুখটি লাল হয়ে উঠেছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'আবার কে লিখেছে এটা?'

হরি অবাক বোকা চোখে, করুণভাবে বলল, 'আজ্ঞে জানি না তো?'

অফিসার ধমকে উঠলেন, 'তোমার দোকানের সামনে, তুমি জানো না কেন? কবে লেখা হয়েছে?'

হরি বলল, 'তাও দেখি নি বাবু। রাত্রিবেলা তো —'

'থাক।'

আজও এসেছে সকলে। কানাই বিশ্বাস বলল, 'স্যার, পরশু সকাল থেকে লেখাটা দেখছি।'

অফিসার বোঁ করে পাক খেয়ে ফিরলেন কানাইয়ের দিকে। তীব্র গলায় বললেন, 'তবে আর কি, আমার মাথা কিনেছেন। কিন্ত কে লিখেছে, তা জানেন?'

'না স্যার।'

'কেন জানেন না? সামনে বসে দোকান করেন, কে এই সব জঘন্য ব্যাপার করছে তা জানেন না কেন? আপনাদের জানতে হবে। শহরের বুকে এ রকম একটা ননসেন্স লেখা কার লিখতে সাহস হয়। পরশু থেকে দেখছেন, আর বহাল তবিয়তে আছেন? ছি-ছি, একটা কলঙ্ক। দেখলেও তো লজ্জা করে।'

সকলেরই মুখগুলি কেমন বোকা-বোকা করুণ হয়ে উঠল। সেই সঙ্গে চাপা-চাপা একটা রাগ। রাগটা অবশ্য ওই লেখকের প্রতি। কিন্তু সত্যি, কেউ জানে না, দেখে নি। এমন কি, আবার লেখাটা দেখেও উড়িয়ে দিয়েছে। কেন ও রকম জায়গায় এ তো হবেই।

অফিসার বললেন, 'গণ্যমান্য কোন লোক আপনাদের শহরে এলে, কি বলবে বলুন তো? না না, এ সব চলবে না। আমি আপনাদের উপরই ভার দিয়ে যাচ্ছি, লক্ষ্য রাখবেন, কে এ সব ন্যাংসেন্স কারবার করে। অ্যাবসার্ড। নইলে শেষ পর্যন্ত আপনাদের বিরুদ্ধেই আমাকে চার্জ ফ্রম করতে হবে।'

ঠাকুরগলির মেয়েরা তো অস্থির। অফিসার এদিকে ফিরে তাকাতেই তারা পড়ি-মড়ি করে বাড়ির মধ্যে ঢুকে গেল। ইতিমধ্যে বাজারের দিক থেকে ছুটে এসেছে একজন সেপাই। তাকে ধমকালেন অফিসার, 'কোথায় থাক? দেখতে পাও না, কে এ সব লেখে? আজকে আমি ডিউটি প্রোগ্রাম চেঞ্জ করে দেব। এখানে চব্বিশ ঘণ্টা পাহারা থাকবে। মুছে ফেল তাড়াতাড়ি।'

অমনি একজন মুদী এক বোতল কেরোসিন তেল আর ন্যাকড়া বাড়িয়ে দিল। আলকাতরায় লেখা, ও ছাড়া তোলা যাবে না।

কেরোসিন তেলেই কি যায়! শেষে লোহার বাটালি দিয়েই চাঁছতে হল।

অফিসার জীপটা স্টার্ট দিতে দিতে বললেন, 'যত সব শয়তান জুটেছে শহরে।' হাওয়ার আগে চলে গেল জীপ। তারপর গুলতানি, আজকের জটলাটা একটু বেশিই হল। সেপাইটি মুখ খিঁচিয়ে বলল, 'শালা, মরলাম আমরাই।'

কে একজন বলল, 'আপনাদের কি! যত দোষ আমাদের।'

তর্কাতর্কি, রাগারাগি এবং আলোচনা চলল খানিকক্ষণ। ব্যাপারটা অন্যান্য পাড়াতেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল এবং টনক নড়ে উঠল প্রায় সারা শহরটারই।

কিন্তু, যারা গলিটায় ঢোকে, তারা লেখাটা আছে কি নেই, কোন দিন চেয়েও দেখে নি। আজও দেখল না।

সময়টা যাচ্ছিল শীতকাল। পাহারাওয়ালারা খুবই বিরক্ত। যতক্ষণ দোকান-পাট খোলা থাকে, ততক্ষণ দোকানে বসেই পাহারা দেয়। তারপর রাত্রে ঠাকুর-গলির বারান্দায় ওঠে, একটু গল্প-সল্প করে আড্ডা দেয়। কিন্তু নজরটা রাখে।

দোকানদারেরাও নজর রাখছিল। সত্যি গায়ে লেগেছে তাদের। তারপর দোকানগুলিই যদি উঠিয়ে দেয়।

কিন্তু, কিমাশ্চর্যম! দিন পনেরো পর, শীতের সকালে, সুন্দর ঝকমকে রোদে আবার দেখা গেল সেই লেখা। দরজায় নাগাবার নীল রঙ দিয়ে, সেই একই লেখা, 'যে এই গলিতে ঢোকে—'

নিচে আবার খাড় দিয়ে ছোট করে লেখা, 'মাথা খাও যেও না।'

আর পড় তো পড়, একেবারেই অফিসারের চোখে। কাছাকাছি একজন সেপাইও ছিল না।

অফিসার রেগে অস্থির হয়ে উঠলেন। আশেপাশের অধিবাসী, দোকানদার, সবাই এল। অফিসার বললেন, 'আমি প্রত্যেককে এজন্য জরিমানা করে ছেড়ে দেব। কে লোকটা আপনাদের চোখের সামনে, আপনাদের মুখের উপর কলঙ্ক লেপে দিচ্ছে, আপনারা জানেন না?'

কে একজন বলল, 'কিন্তু আমরা কি করব স্যার?'

'দ্যাট আই ডোণ্ট নো। এখনও লেখাটা কাঁচা, কালকে রাত্রের লেখা। কেন আপনারা জানেন না? এখানকার দোকানপাট সব উঠিয়ে ছেড়ে দেব।'

আর ঠিক এই সময়েই, পাহারাদার সেপাইটি কোত্থেকে ছুটে এল। অফিসার প্রায় মারমুখো হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তার উপর, 'কোথায় ছিলে? কার ডিউটি ছিল কাল রাত্রে?'

'আজ্ঞে স্যার, বিনয় দাসের।'

'বিনয় দাসের? আচ্ছা, তাকে আমি দেখে নিচ্ছি।'

'বিনয়ের ডিউটি স্যার রাত্রি দুটো অবধি ছিল। তারপর ছিল নরেনের। কিন্তু সে সীক্।'

'কিসের সীক্! কে সই করেছে তার সীক লিভের কাগজ?'

'না, স্যার, হঠাৎ তার বাহ্যে বমি...'

'দ্যাট আই ডোণ্ট্ নো। যা তা জঘন্য কথা শহরে লেখা থাকবে, আর তোমরা ডিউটিও দিতে থাকবে, চলবে না। চলবে না আর এ সব; সে দিন নেই এখন আর। দেশের একটা ইজ্জৎ আছে। মোছো, মুছে ফেল তাড়াতাড়ি।'

আবার মোছামুছি। আবার জটলা। বড় রকমের জটলা। কে একজন বলে উঠল, 'যে লিখছে, তার খুব বুকের পাটা বলতে হবে।

পাহারার আরও কড়াকাড়ি হল। এমন কি, একটা ডিফেন্স পার্টি'রও তোড়জোড় চলতে লাগল।

এদিকে বিদ্বান বুদ্ধিমান শহরের ভদ্রলোকেরাও নিশ্চুপ রইলেন না। তাঁদের সঙ্গে কিছু-কিছু যুবক এবং মহিলাও যোগ দিলেন। কি করা যায়!

এক রবিবারে তাঁরা সবাই দেখা করলেন থানার অফিসারের সঙ্গে।

ব্যাপারটা নিয়ে, তাঁরাও ভাবছেন। অফিসার সবাইকেই চেনেন। স্কুলমাস্টার, উকিল, ডাক্তার, দোকানদার, সবাই আছেন এঁদের মধ্যে। দুজন স্কুল মিসট্রেস্, লেডী ডাক্তারও আছেন.।

অফিসার বললেন, 'কি ব্যাপার, আপনারা?'

মনোহরবাবু স্কুলমাস্টার, সদাশয় ব্যক্তি। বললেন, 'আমরা আপনার কাছে একটা দরখাস্ত নিয়ে এসেছি। ওই ব্যাপারটা, বুঝলেন? ওই যে সেই, গলির মোড়ে...'

'ওঃ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ভাল, খুব ভাল। নিশ্চয়ই, আপনারা ভাববেন বৈকি! আপনারা একটু আমার ঘরে বসুন, আমি আসছি।'

আগে অফিসার-ইন-চার্জের কোন আলাদা ঘর ছিল না। এখন বেশ বড় ঘর হয়েছে। কিন্তু সকলের বসবার জায়গা হল না। মহিলারা আর বয়স্করা কেউ-কেউ বসলেন।

অফিসার এলেন। বললেন, 'কি ব্যাপার বলুন।'

মনোহরবাবু বললেন, 'আমরা আপনার কাছে একটি গণ-দরখাস্ত নিয়ে এসেছি। ওই ব্যাপারটার একটা নিষ্পত্তি...'

'নিশ্চয়ই! খুব ভাল কথা। দিন দরখাস্ত।'

মনোহরবাবুরা তৈরি হয়ে এসেছেন অন্যভাবে। বললেন, 'আপনার হাতে কি সময় আছে?'

'কতক্ষণ, বলুন? ঘণ্টাখানেক?'

'হ্যাঁ, তা-ই। আলোচনা মুখে না করে, আমরা বাংলা দরখাস্তটা আপনাকে পড়িয়ে শোনাতে চাই।'

অফিসার বললেন, 'বেশ, পড়ুন।'

মনোহরবাবু ইশারা করলেন একটি ছেলেকে। সে সামনে আসতে বললেন, 'তুমি পড়, ভাল করে পড়বে।'

ছেলেটি পড়তে লাগল ঃ

শ্রীযুক্ত অফিসার-ইন-চার্জ, অমুক থানা, অমুক জেলা মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়, আমরা এই শহরের ভদ্রলোক বাসিন্দা। কিছুদিন যাবৎ শহরে একটি হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটিতেছে। এই ব্যাপারে আমরা যথার্থ মর্মাহত, আপনিও ব্যথিত। তাই, আমরা আর নীরব থাকিতে পারিলাম না।

আপনি জানেন, ইতিহাসও সাক্ষ্য দিতেছে, নারীদেহ ব্যবসা পৃথিবীতে বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। বর্তমান সভ্য-সমাজেও এই পাপ-ব্যবসা বিষাক্ত ক্ষতের মত...ইত্যাদি।

সকলেই খুব চমৎকৃত। অনুসন্ধিৎসু মুগ্ধ চোখে দেখছেন অফিসারকে। অফিসার গালে হাত দিয়ে, গম্ভীর মুখে টেবিলের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

ছেলেটি পড়তে লাগল ঃ

আমাদের শহরের ব্যাপার দেখিয়া আমরা অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছি। আমরা এই শহরের স্বাধীন নাগরিকরাই, এই দেশে প্রথম দাবি করিতেছি, এই পাপ-ব্যবসার বিলোপ সাধন করিয়া, দেহ-ব্যবসায়ী নারীগণকে সমাজের মঙ্গলময় কাজে লাগানো হউক।

যদি বিলোপ সাধন এখুনি সম্ভব না হয়, তবে ঠাকুরগলির ব্যবসা এই শহর হইতে অন্যত্র উঠাইয়া লওয়া হউক। অন্যথায়, শহরের বুকে, দেওয়ালের কলঙ্ক দূর হইবে না। ইতি—

সকলে উজ্জ্বল চোখে তাকালেন। সেই মুহূর্তেই অফিসার প্রায় ধমকে উঠলেন, 'এ সবের মানে কি?'

সকলেই একটু অবাক হলেন। অফিসার বললেন, 'তা হলে আপনারাই দেওয়ালে লিখেছেন?'

রুদ্ধশ্বাস ভীত সকলে। মহিলা তিনজন ঘামছেন। যেন থানার চারপাশ থেকে কাঁটাতারের বেড়া ঘিরে আসছে। 'আজ্ঞে? কি বলছেন?'

অফিসারের তীক্ষ্ন চোখ, তীব্র গলা। বললেন, 'নইলে, এ সব কথা লেখবার মানে কি? এই সব, এই পাপ ব্যবসার বিলোপ-টিলোপ, তারপরে ঠাকুরগলির ব্যবসা অন্যত্র রিমুভ করা, এ সব লেখার উদ্দেশ্য কি আপনাদের?'

একমাত্র মনোহরবাবুর গলাতেই তখন স্বর ছিল। ঢোঁক গিলে বললেন, 'আজ্ঞে, আমরা বলছিলাম, পাপের মূল না দূর হলে—'

অফিসার দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, 'ও সব পাপের মূল-টুল জানি না। আমি তার কি করব? ও-সব বিলোপ সাধন-টাধনের হুকুম নেই আমার উপর। ঠাকুর-

গলি ইজ্ ঠাকুরগলি। কিন্তু বাইরে কোন কিছু, ন্যুইসেন্স, ভালগারিটি করতে পারবে না। আমি সে-সব ধুয়ে-মুছে ফেলে দেব, কোন চিহ্ন রাখতে দেব না, যা আমার কাজ।'

সকলেই চুপ। ভ্যাবাচাকা খাওয়া করুণ চোখের চাওয়াচাওয়ি শুধু।

অফিসার উত্তেজিত। থমথমে মুখ। গলার শিরাগুলি ফুলে উঠেছে। তখনও বলে চলেছেন ঃ 'আমি দশজন পুলিস দিতে পারি, বিশজন পারি, আর্মড পুলিস দিতে পারি পাহারা দিতে। ও সব বিলোপ কে করতে পারে, আমি জানি না। রিমুভ করার কোন অর্ডার নেই আমার উপর। ওন্‌লি নীট্ অ্যান্ড ক্লীন…' বলতে-বলতে গুটি-গুটি বেরিয়ে গেলেন।

থানার বেড়ার বাইরে এসে সকলের গায়ে যেন একটি মুক্তির তরঙ্গ খেলে গেল। সবাই আটকানো দমগুলিকে হুস্ হুস্ করে ছাড়তে লাগলেন ভেতর থেকে। আঃ কি সুন্দর হাওয়া! কি সুন্দর রোদ!

আবার একদিন লেখাটা জ্বল্‌জ্বল্ করে উঠল, 'যে এই গলিতে…'

আবার মুছতে লাগল একজন সেপাই। ঊনত্রিশবার মোছবার পর, লেখাটি আর মোছা হল না। সেই অফিসার বদলী হয়েছেন। লেখাটার উপর ধুলো পড়তে লাগল। তারপর একদিন শহরের সব কিছুর মধ্যে আবার আগের মত অভ্যস্ত হয়ে গেল সকলের, দেওয়ালের লেখাটা।

শুধু জানা গেল না, কার এই লেখা লেখা খেলা, কেন এই খেলা। কেবল ঠাকুরগলির মেয়েরা তাদের মধ্যাহ্নের অবসাদে, জড়িয়ে জড়িয়ে বলে, 'আহা, কি মরণ গো! এত দাপাদাপি কিসের। যারা এই গলিতে ঢোকে, তারা তা ছাড়া আবার কি।'

তা বউ একখান আমারও চাই।

কথাটি বলে মাথায় একটি ঝাঁকি দিয়ে ঘাড় শক্ত করে গোঁজ হয়ে বসে ছিল পবন। যেন ও দাবি থেকে সে এক পা-ও সরতে রাজী নয়।

বউ ?

মেয়েদের উদ্গত হাসিটা খিলখিল করে ফেটে পড়েছিল বাঁধের গায়ে। বাঁধের কিনারে কিনারে লকলকে ঝাড়ালো কাল্‌চে গেমো বনও বাতাসের ঝাপটায় হেসে কুটিপাটি হয়েছিল।

কেন, সকল মানুষের হতে পারে, আর আমাব হতে পারে না ?

গোঙা গোঙা মোটা স্বরে কথাটি বলে পবন খুব গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। যদিও মাথা নত ছিল, তবু পিটপিটে চোখে মেয়েদের পর্যবেক্ষণে বিরত ছিল না সে। কেননা ও-মেয়েদের ওপর খুব ভরসা পবনের ছিল না। সারাদিন পরে নদীর ওপার থেকে ফিরছে জোতদারের খেয়ায়। রোয়া বোনা ভেজা-হাজা কোমর টাটানি গেছে সারাদিন ওপারের রাক্ষুসে বাদায়। তারপর কিসের থেকে কি হবে। দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ে কামড়ে-খামচে ছিঁড়ে-কুটে রেখে গেলেই হল। পবে তোমারটা তুমি বোঝ।

তবে কথা কি ? না, পবনেরও ইজ্জত আছে একটা। সে একটা ড্রাইভার মানুষ। বাদার এই বন শোরমারি থেকে মহকুমা শহর পর্যন্ত একমাত্র যাত্রীবাহী গাড়ির সে-ই চালক। আর তো সব ধান চাল পাট সবজী গরু ছাগলের লরী যায়।

তা ছাড়া আরও কথা কি, না, মেয়েরা যদি তোমাকে ওস্‌কায়, সত্যি কথা বলতে দোষ কি ? তারা দল বেঁধে রোজ যাবে, আর তোমাকে দেখে সব হাসবে। বলবে, অই গো, অই দেখ, গালে হাত দ্যে আবার বইসে আছে।

তা হাতটা তখন কোথায় দেবে পবন ? যখন সন্ধ্যা নামতে থাকে ঘনিয়ে। নদীটা যেন পশ্চিমের লাল ছায়া পড়ে কেমন হয়ে যায়। ওপারের পাখিগুলি এপারে আসে। এপারের গুলি যায় ওপারে। মশারা ফিরতে থাকে গুনগুনিয়ে। গেমো বন কালো হতে থাকে। সংসারে একলা মানুষটা সেই নালটন গাড়িটার আঁধারি কোটরে বসে, তখন হাত তার কোথায় যায় ?

আবার বলবে, ও মা গো, অই দেখ, আবার কেমন দমাদম নিশবাস পড়তে লেগেছে। বলেই হাসি।

তা নিশ্বাস পড়তে পারে। সংসারের একলা মানুষ। অমন ঝুকো ঝুকো সন্ধ্যায় তার চোখ জোড়া অবশ্য ওপারেই পড়ে থাকত। কখন সেই নৌকাটি ফিরবে। মেয়েরা যাবে সেই ভোরে, ফিরবে সন্ধ্যায়। তাদের দেখবার জন্যে চোখ দুটি তার আতুর হয়ে থাকত। কিন্তু কোন দিন ডেকে তো কিছু বলে নি। আর সে-দেখা কাকপক্ষীতেও কোন দিন টের পেয়েছে। তা বলতে পারবে না।

কিন্তু মেয়েরা দুদিন দেখে, চারদিন দেখে হাসতে আরম্ভ করলে। হাসির পরে ওই কথাগুলি। তবু পবন যেন কিছুই জানে না, এমনি উদাসীন হয়ে বসে থাকে।

হাসির রোলটা তখন বাড়ে বৈ কমে না।

তারপরে সেই একদিন মেয়েদের দলের মধ্যে একজন পা বাড়িয়ে দু পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অই ড্যাইভার অই, রোজ রোজ কি দেখ চেয়ে চেয়ে!

এই দেখ। দাঁড়িয়ে পড়ল যে মেয়েরা? চেয়েছিলাম চোখে, মনের কথা টের পাওয়া যায় না কি সেখানে! তা খেপলেই বা কি করা যাবে। অন্যায় তো কিছু করে নি পবন। তবু সাবধানের মার নেই। সে নালটনের জিরজিরে স্টীয়ারিং হুইলটার কাছ থেকে একটু একটু করে সরে এসেছিল। কারণ ওই হুইলের ওপরেই তার কনুই ছিল। হাত ছিল গালে। বলেছিল, দেখব আবার কি। এই বইসে আছি।

কিন্তু মেয়েদের সেদিন নড়বার নামটি নেই। উপরন্তু হাসি। দলের ধাড়ি সেই মেয়েটিই বলেছিল, তা বইসে থেকে কি হয়?

বোঝ? বসে থেকে কি হয়। কথাগুলি কেমন বাঁকা বাঁকা নয়? একদম বিশ্বাসযোগ্য নয় এ হাসি। ও সব বাদার খাটা মেয়ে। মেজাজের কিছু বোঝা যায় না।

পবন খুব ভাল মানুষের মত মুখ করে বলেছিল, কি আর করব?

অগ্রবর্তিনী তবু ছাড়ে নি। দক্ষিণের এ বাদাবনের মত গায়ের রং। মেঘলা-ভাঙা রোদের চলকানি তাতে। চোখ দুটিও ভেড়ির জলের মত কালো। পট্ করে বলেছিল, পুরুষরা যা করে।

পুরুষরা যা করে! পুরুষরা কি করে? কয়েক মুহূর্ত গায়ের মশা তাড়াতেও ভুলে গেছল পবন। তার গোঁফদাড়িহীন কালো মুখে গুটিকয় রোঁয়া কেঁপে উঠেছিল। হলদে চোখের দৃষ্টি কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছল। আর হাঁ হয়ে যাওয়া মুখে ভাঙা দাঁতের ফুটোয় অস্পষ্ট অন্ধকারের মত মনের জবাব যেন আঁকুপাঁকু করছিল তার। তারপরে সে বেশ সাব্যস্ত করেই জবাব দিয়েছিল, তা বউ একখানা আমারও চাই।

বউ?

মেয়েরা হেসে বাঁচে নি। পবনের পরের জবাবটা শুনেও মেয়েরা পিছোয় নি। বরং সেই মেয়েটি, মাথায় যার কাপড় ছিল না, আঁটো শরীরের কোমরে যার ঠাটে হাত দেওয়া ছিল, সে চোখ ঘুরিয়ে বলেছিল, তা এই দলের মধ্যে কাউকে পছন্দ নাকি?

এই সময়ে দলের মধ্যে থেকে কে একজন চাপা স্বরে ডেকে উঠেছিল, অই, অই বাসিনী।

পবনের বিভ্রান্তিটা তখনও যায় নি। কিন্তু কালো তালতোবড়া মুখের ভাঁজে ভাঁজে, হলদে চোখ দুটিতে তার একটি অবাধ্য অপরূপ হাসি ফুটে উঠেছিল। সেই যে বাসিনীর দিকে গুটি গুটি ল্যাজনাড়াভাবে তাকিয়ে ছিল, আর চোখ ফেরাতে পারে নি।

কে যেন দল থেকে বলেও ছিল, তা এ দলের সকলেব ঘবেই যে পুরুষবা খুঁটি গেড়ে আছে গো।

পুবে বাতাসলাগা বাঁধের গেমো গাছের মত দুমড়ে গেছল বাসিনী হাসতে হাসতে। তারপর চলে গেছল।

কিন্তু বাদার মশারাও সেদিন পবনের রক্ত খেয়ে খেয়ে এলিয়ে পড়েছিল। পবন আর নড়তে পারে নি। এবং সেই যে তার বিশ্বাস জন্মেছিল, বাসিনীব সঙ্গে তার প্রেম হয়েছে, সে বিশ্বাস থেকে আজ পর্যন্ত কেউ তাকে টলাতে পারে নি। ইতিমধ্যে বাসিনীর এক ছেড়ে দুই সন্তানের মা হবার সম্ভাবনাও বুঝি দেখা দিয়েছে। তবু পবন অটল।

আজ পবন বাসিনীকে খুঁজতে যাচ্ছে কলকাতায়। বাসিনীরা পরশু ভোর ভোর কলকাতায় চলে গেছে। পরশু রাত্রেই ফিরে আসার কথা ছিল। কাল রাত্রেও আসে নি। আজকে রাতেরও দেরি নেই আর।

শোরমারির মাঠেখাটা মেয়েপুরুষ, কৃষিমজুরেরা ঝেঁটিয়ে চলে গেছে কলকাতায়। বলে গেছে মন্ত্রীদের অফিসে যাচ্ছে চালের দাম কমাবার জন্যে। গঞ্জের আড়তদারেরা বলে চাল নেই। এদিকে দেখ, আডতদারের মনেব মত দাম দিলে যত চাও পাবে। দর-দামের বালাই নেই। যা বলে তাই। তাহলে রোজের খাটনির পুরো পয়সাটা শুধু চালেই দিতে হয়। তাতেও কুলোয় না। তার ওপরে সময়টি দেখ। রোয়া-বোনা সারা। জোতদারের কাছে আগামে নেওয়া পয়সায় খেতে হচ্ছে। আদি-বাসীগুলি পয়সাও নেয় না। ভাত খাবে বলে মালিকের কাছে চাল ধার করছে। সেই চালে হাঁড়িয়া তৈরি করে, বৃষ্টি নেই বাদলা নেই, বাঁধের ওপর বসে বসে খাচ্ছে, তারপরে দেখ দুদিন সাড়া নেই। কিন্তু জোতদারের চালের দাম বেশি বৈ কম নয়। তার ওপরে সুদ আছে। এ অবস্থায় দাম না কমালে চলে? পবনের অভিমত আদিবাসীরাই খুব ভাল আছে। সে তো পরশুদিন দুপুরে ভাত খেয়েছিল সেই মহকুমা শহরে। কাল আর হয় নি। পেট্রোলের পুরো দাম তোলাই মুশকিল ছিল। আজও তাই। কিন্তু তা বলে খায় নি কি? ফুলুরি কি খাবার নয়? মুড়িও কিছু মিনিমাগনা পাওয়া যায় না। আর চা?

নালটনকে দাঁড় করাতে হল পবনের। চায়ের কথাটা যখন মনেই পড়ল, আর

মহকুমা শহরের মুখে যখন নিরালা দোকানটা পাওয়াই গেল, হয়ে যাক এক পাত্র।

সন্ধে বুঝি হয় হয়। পবন নেমে এল গাড়ি থেকে। হলদের ওপর কালো ডোরা গেঞ্জি। সেটি দোকান থেকে কিনে মাস কয়েক আগে সেই যে গায়ে দিয়েছিল আর বোধ হয় খোলা হয় নি। খাকি হাফ প্যান্টটার বুঝি আসল রং নেই। বয়সও নেই। তেলকালির তো অভাব নেই-ই। তলা ছিঁড়ে ফুঁপাড় বেরিয়েছে অনেক দিন। কোমরে বাঁধা আছে গামছা। লম্বা নয়, বেঁটে নয়, মাঝারি লম্বা পবনের কালো শরীরে হাড়মাংস কতখানি আছে বোঝা মুশকিল। কিন্তু বাদায় নামিতে কালো মাটির বুকে অজস্র নদী-নালা খাল-বিলের মত মোটা মোটা শিরা-উপশিরার ছড়াছড়ি। মুখের সঙ্গে ক্ষুধার চিরদিনের অন্তরঙ্গতা। তবু সাফ-সজুত কালো মুখ। প্রথম তেলে-পড়া ফুলুরির মত রং দুটি চোখের। চুলগুলি বড় রাখার সখ, কিন্তু তেল জল দেবার সময় নেই।

দেওয়া হয় না কেন? সময় কই? দেখ, সকালে বেলা নটা পর্যন্ত? দুপুরে মহকুমা শহরে, চারটের পর শোরমারিতে?

ওই খালি কাকে পবন। জিবুবাবু আর দরকার নেই, না? শোরমারির গাড়ি চালাবে বলে পবন ক্যাংভান নয়? নালটনটা কি মটরগাড়ি নয়?

ওইটি বড়ো গাড়ি। ... সব পাঁচিশ চটে যাবে।

নালটন নাম কেন? তা জানে না পবন। নালটন আগে চালাত ফজল মিয়া ইটিন্ডাঘাটে। খুলনায় বাড়ি ছিল। পবন ছিল ফজলের শাগরেদ। গাড়ি চালানো ওই পবনের কাছেই শেখা।

তারপর। ফজল চলে গেছে পাকিস্তানে। নালটন অনেক দিন বেকার পড়েছিল বসিরহাটের অনাদি ঘোষের কাছে। শোরমারি থেকে মহকুমা শহরে তখন কোন সার্ভিস ছিল না। তদ্দিনে নালটনের লাল রংও কালোটন হয়ে গেছল। আর এখনও সেই কালোটনই আছে। থাকুক। ফজল বুড়ো হয়ে গেছে, দাঁত ঝরে গেছে। ফজলের নাম বদলায় নি।

লোকেরা ধরল অনাদি ঘোষকে। শোরমারির ওপারে, দক্ষিণ ঘেঁষে ঝিলেনগর গঞ্জ। বড় গঞ্জ, সপ্তাহে দু দিন হাট হয়। উত্তরের লোকদের লঞ্চ ছাড়া গতি নেই। সার্ভিস একটা হোক না।

হবে? হোক! লাভের গুড় পিঁপড়েয় খাবে। লোকসানের ব্যাপার। ভাল গাড়ি দেওয়া যাবে না। তাই নালটনের গতি হল। কিন্তু চালাবে কে? যে দু পয়সা করে খাবে, সে কেন শোরমারির লাইনে যাবে? অনাদি ঘোষ লাভ চান না। হলে ভাল। কিন্তু পয়সা খরচ করতে রাজী নন। এমন চালক কে আছে যে সপ্তাহে দুদিনের ওপর ভরসা করে ও-লাইনে পড়ে থাকবে?

থাকবে একজন। পবনচন্দর মৈত্তির। এ মৈত্র-ধারায় বারেন্দ্র রক্ত খুঁজতে গেলে চলবে না। জাতের নাম নাকি ছিল লোধা। আদি বাসভূমি বুঝি ছিল পশ্চিম-

মেদিনীপুরে। তারপরে বাদায় পবনের বাবা এসেছিল গোসাবায়। পবন ইটিণ্ডা-ঘাটে। সেই শুরু, আর এই গতি।

আজ সে বাসিনীকে খুঁজতে চলেছে কলকাতায়।

মোটা মোটা ঠোঁট দুটি কেমন একটা দুশ্চিন্তাচ্ছন্ন বিরক্তিতে উল্টে গেছে পবনের। পায়ের টায়ার-কাটা স্যাণ্ডেলে যদিও খট্‌খট্‌ করে শব্দ হয় না, কিন্তু ওই ভঙ্গিতেই হেঁটে গিয়ে দোকানে ঢুকল পবন। বলল, চা দ্যাও দিনি এ্যাট্‌টা।

দোকানী বলল, চললে কম্‌নে?

কলকাতা।

দোকানী চা করতে করতে পবনের বিরক্তগম্ভীর মুখের দিকে বারকয়েক তাকিয়ে নিল। বলল, কলকাতায় যাচ্ছ কি? সেখানে তো বড় হাঙাম।

শিরাবহুল সরু ঠ্যাং দোলাতে দোলাতে, খুব গম্ভীর মুখে একটা বিড়ি বার করল প্যাণ্টের পকেট থেকে। কানের কাছে নিয়ে টিপে টিপে তাজা তামাকের মড়মড়ানি শুনল। ফুঁ দিল, শুঁকল, তারপর কামড়ে ধরল দাঁত দিয়ে। কিন্তু ধরাল না। বলল, হাঙাম বলেই তো যেইতে হচ্ছে। নইলে কি যাই নাকি? কি কাণ্ড বল দিনি?

দোকানী চা দিয়ে বলল, নয়? আরে বাপ্‌রে। এত দাম চালের—

মেলা ফ্যাঁচফেচিও না গো। মেলা ফ্যাঁচফেচিও না। ও কথাখানি তোমার চে আমি বেশি শুইনেছি, বুইলে।

অ!

হ্যাঁ।

বিকৃত মুখে গায়ে গেলাসে চুমুক দিল পবন। ভাবল কি রকম লোক এরা? পবন কি না খেয়ে বাঁচে নাকি? কথাবার্তা নেই, খালি দাম। চাল ছাড়া কিছু খাবার নেই?

দোকানী বুঝল নাগালের আজ ভারী মেজাজ খুব সুবিধে নেই।

নেই সেটা কে বুঝবে? বুকের মধ্যে একটা কেমন করছে। সেটা যে কি জিনিস, সে নিজেও জানে না। থেকে থেকে কেবল বাসিনীর মুখটা মনে পড়ছে। ওই সেই মুখটা। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আর অপলক চোখ। গেঁয়ো বনের ছায়া পড়া নদীর জলের মত কি যেন থাকা-না-থাকার কোন হদিস না পাওয়া চোখের চাউনি।

সেই মুখখানি মনে পড়ছে আর বুকের মধ্যে কেমন যেন লাগছে। তার হাসতে ইচ্ছে করছে না, কথা বলতে ইচ্ছে করছে না। পথ চেয়ে তার দিন কাটছে। সে তো আর কিছু চায় না। ফিরে আসবে বাসিনী, এসে আবার কাজকর্ম সংসার করবে ফটিকের সঙ্গে। মিটে গেল।

অবিশ্যি আছে, আরও ব্যাপার আছে। পবনের সঙ্গে আছে বাসিনীর, মানে ভাব ভালবাসা বলতে যা বোঝায়। সেটা শুধু পবনই জানে না, শোরমারির ঘাটের

আশেপাশে যারা থাকে তারাও জানে বৈ কি।

ঘাটে একটা ছোট চায়ের দোকান আছে। দোকানদারের নাম কালো। পবনই তার সবচেয়ে বড় খদ্দের। আর সারা রাতের সঙ্গী। যদিও নালটনই পবনের একমাত্র বাসস্থান। তবু মাঝে মাঝে দোকানেও থাকতে হয় বৈ কি। ঝড় এলে নালটনের ভিতরে জল যায়, আর দোলে।

কালো বলেছে পবনকে, বাসিনী মরেছে, বুইলে হে পবন।

মরেছে ?

মরেছে, মানে তোমাকে বাসিনী মনে মনে ইয়ে করে আর কি, বুইলে না ?

আর বলতে হয় নি। ওইতেই বুঝে নিয়েছে পবন। ও সব তো বেশি ভেঙে বলতে হয় না। খাঁটি জিনিস, একটু ছাড়, তা হলেই বোঝা যায়।

পবন বলেছে, তা'লে তুমোও বুয়েচ ?

পবন আপন মনেই হেসে ঘাড় দুলিয়েছিল। কেবল তার পরদিন বকে ধমকে জিজ্ঞেস করেছিল বাসিনী, কি বলেছ আঁ, কালোকে কি বলেছ কাল রাতে ?

পবনের ভাঙা দাঁতের ফাঁকে জিভটি আটকা পড়ে গেছল। কোন জবাব দিতে পারে নি। সেই প্রথম দিনের মতই তাকিয়েছিল অসহায় হয়ে। যদিও ভয় করছিল বৈ কি।

কিন্তু একদম হাসে নি বাসিনী। জবাব না নিয়ে সে ছাড়বে না। বলেছিল, অমন জুল্‌জুল্‌ করে তাইকে রইলে যে বড় ? কি বলেছ বল।

সেদিন অবশ্য মেয়ের দল ছিল না। কারণ, ওপারের কাজ তখন বন্ধ। বাড়ি থেকেই এসেছিল বাসিনী। ঘাট থেকে তাদের পাড়া তো চোখের পলকের পথ। শোরমারির ঘাটপাড়াই বলা যায়।

অবশ্য এদিক ওদিক দু-চারজন মেয়ে-পুরুষ আড়ি পেতে ছিল। পবন টের পায় নি। সে বলেছিল মুখ কাঁচুমাচু করে, বলে ফেলেছি।

বলে ফেলেছ ?

বাসিনী হাত তুলবে কি না সন্দেহ হচ্ছিল। নাকের নাকছাবিটা তার ফুলছিল। চোখে চোখ রাখা যাচ্ছিল না।

পবন আবার মুখ করুণ করে বলেছিল, হ্যাঁ, বলে ফেলে দিইচি।

আর একবার ধমকে উঠতে গিয়ে বাসিনী খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠেছিল। বলেছিল, মরণ, মুখে আগুন তোমার, বুইচ ?

পবন বলেছিল, হ্যাঁ।

বাসিনী হাসতে হাসতেই চলে গেছল। শুধু শোনা গেছল, এ কি মরণ গো!

নালটন চালিয়ে দিল পবন। শব্দটা একটু বেশি হয় নালটনের। গায়ের হাড়-পাঁজরার শব্দই বেশি। তলার সাইলেন্সারটাও ভেঙে গেছে খানিকটা। অ্যাক-

সিভেণ্ট গোরুর গাড়িই বেশি করে নালটনের সামনে। বলদগুলির বোধ হয় কান ঝালাপালা হয়ে যায়। ওরা তো আর কানে হাত দিতে পারে না। একেবারে মাঠে নেমে যায় বিরক্ত হয়ে। গাড়িওয়ালা চাষারা গালাগাল দেয় শুধু পবনকে। গালাগালগুলি খুবই খারাপ। কিন্তু নালটনের দোষ নিজের গায়ে পেতে নিতে হয় তাকে।

মহকুমা শহরটা ছাড়িয়ে, আকাশের দিকে একবার ফিরে তাকাল পবন। রাত্রি নামতে হয়তো একটু দেরি আছে এখনও। কিন্তু মেঘ বোধ হয় কথা শুনবে না। পুবের আকাশটা যেন যত বাজে মাল খারিজ করছে। ঝরল বলে।

কিন্তু জায়গাটা চেনাই মুশকিল। যেখানে নাকি বাসিনীরা এখনও আছে। মহকুমা কোর্টে একজন তাকে বলেছে, কলকাতায় কি একটা জায়গায় সব জমা হয়ে আছে বাসিনীরা। লাঠি-গুলিও নাকি মেরেছে খুব। কিছু নাকি মরেছে।

কিন্তু বাসিনী কি মরেছে? মরলে শুধু শুধু পবনের মন টানবে কেন? ওই জমে থাকা দলের মধ্যেই আছে বাসিনী। ডাকলেও আসতে চাইবে না, কিন্তু পবন ছাড়বে না। আর পেট্রোল কিনে যে-কটি টাকা বাড়তি আছে, তা দিয়ে কলকাতার হোটেলে খেতে হবে। একলা নয়। বাসিনীর সঙ্গে। এখন বাসিনী রাজী হলে হয়।

রাজী করাতে হবে। সেই দিনের ধমক-ধামকের পরও রান্না কচুর শাক তো খাইয়েছিল বাসিনী। ফটিক নিজে এসে দিয়েছিল। অর্থাৎ বাসিনীর স্বামী। বড় রাশভারী লোক। এসে বলেছিল, এই নাও। ওই কর। নালটনের মধ্যে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে থাক, আর পরের বউয়ের হাতের ঘণ্ট চেয়ে চেয়ে খাও।

কথার আর প্রতিবাদ করতে সাহস করে নি পবন। কিন্তু পবন বাসিনীর কাছে খেতে চাওয়ার সাহস দেখিয়েছে কবে?

ফটিক আবার গম্ভীর গলায় বলেছিল, তা বাড়ি যেইয়ে খেয়ে এলেই হয়। ড্যাইভার হয়েছ বলে কি বয়ে ন্যে আসতে হবে?

পবন চুপ। ফটিক যে মারছিল না কেন, সেইটিই আশ্চর্য লাগছিল তার। তারপর বাসিনীর সঙ্গে যেই দেখা হয়েছিল সে জিজ্ঞেস করেছিল, খেয়েছ?

পবন একটি গূঢ় হাসি হেসে বলেছিল, হ্যাঁ।

তবু বেঁচে আছ?

কেন?

বাসিনী খিলখিল করে হেসে বলেছিল, ও মা! বুনো বিষকচু দিইছিলাম যে। গলা বুক জ্বলে দাপাদাপি করবে বলে।

পবনের গূঢ় হাসিটা আর থাকে নি। তার হলদে চোখের গূঢ় তলে একটি হাসি-মাখা অসহায়তা থমকে আড়ষ্ট হয়েছিল।

কিন্তু সেই বাসিনীর গোরুর বকনা বাচ্চা হয়েছিল বলে, বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেছল। বাতাসা খাইয়েছিল। আর আসন দিয়ে বলেছিল, বস এট্টু, খালি তো

নালটনেই ঠ্যাং তুলে বসে থাক।

তা বাসিনী যদি আসন পেতে বসতে দেয়, পবন তার সারা সময়টা কেন নালটনে গিয়ে বসে থাকবে।

কিন্তু আর কোন দিন ডাকে নি। পবন সাহস করে গেছল, বাসিনী বসতেও দিয়েছিল। কথাও বলেছিল। কিন্তু সেই হাসিটা কোন দিন যায় নি বাসিনীর। যে হাসিটার দিকে চিরদিন ধরে চেয়ে রইল পবন। আর ফটিক কখন কি বলে বসে, সে ভয়টা থাকত।

ফটিক যখন বাসিনীকে মাঝে মাঝে মারধোর করে ফেলত, এই অভাব অনটনের সময়েই অবশ্য, শুনে পবনের মুখ অন্ধকার হত। কিন্তু বাসিনীর সঙ্গে যখন দেখা হয়েছে, ঠোঁটে আর চোখে সেই গেমো বনের ছায়া-পড়া নদীর জলের মত কি যেন থাকা না-থাকা হাসি হারায় নি।

কিন্তু পবনের বুক ভরে টাটিয়েছে। তবে ফটিকের বউকে ফটিক মারবে, পবনের কি? তার তো বউ নয়। যা আছে তা তাই আছে। সময়ে সময়ে সন্দেহ হয়। বাসিনীও জানে কিনা সেটা।

জানে না কি? জানে বোধ হয়। মনটা কি তবে এমনি এমনি এ রকম করে। তবে জিজ্ঞেস করবার জো নেই।

সেই একদিন গঞ্জ থেকে ফিরতে সন্ধ্যে উতরে গেছল বাসিনীর। হাটের দিন ছিল না। শোরমারির ঘাট নিরালা ছিল। বাসিনীকে একলা দেখে কাছে যাবার অদম্য বাসনাটা চাপতে পারে নি।

সে কাছে গিয়ে খুব চাপা গলায় ডেকেছিল, বাসিনী!

বাসিনী থমকে দাঁড়িয়েছিল। বলেছিল, কে? মোটরঅলা।

গলার স্বর নামতেই থাকছিল পবনের, হ্যাঁ।

অমন করে কথা বলছ কেন? বলে অন্ধকারের মধ্যে কি দেখেছিল বাসিনী, কে জানে। হঠাৎ চিৎকার করে উঠেছিল, খবোদ্দার। আর এক পা এগুলি তো তোরও একদিন কি আমারই একদিন।

বলেই সে পেছুতে আরম্ভ করেছিল পায়ে পায়ে। তারপরে এক ছুটে পাড়ার মধ্যে। পবন শুধু ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। কি হল? কেমন একটা থমকানো অবাক অস্বস্তিতে সারাটা রাত কেটেছিল তার।

তার পরদিনই সেই বাসিনী ফটিকের সঙ্গে মহকুমা শহরে গিয়েছিল। কিন্তু ফটিকের কাছে বসে নি। সারাটা পথ পবনের পাশে বসে গেছে। নালটন সেদিন মাটি দিয়ে চলেছিল কি না, মনে নেই পবনের।

অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। পথ বড় নিঝুম লাগছে। নালটনের হেডলাইটের আলোয় শুধু শেয়ালের দেখা পাওয়া যাচ্ছে রাস্তায়—পথ তারা ছেড়ে দিচ্ছে বটে। ভাবখানা, মানুষের মত সরে একটু পাশ দিচ্ছে কেবল।

স্পীড বেশি দিলে কি একটা খুলে পড়ে যাবে, সেই ভয় পবনের। মাঝপথে আটকে থাকার চেয়ে যেতে পারাটাই লক্ষ্য তার। সেইদিকে খেয়াল রেখে চালাচ্ছে। অবশ্য উড়োজাহাজের ইস্টিশনের আলোটা দেখা যাচ্ছে অনেকক্ষণ ধরে। কিন্তু দেখাই যায়, কাছে আসতে চায় না যেন।

কিন্তু বাসিনীকে একটু বকবে পবন। মেয়েমানুষের এত রাগ ভাল নয়। এর আগেও একবার কলকাতায় গিয়েছিল বাসিনী। একলা নয়। এবারের মতই সেবারও শোরমারির সবাই দল বেঁধে। শুধু কি শোরমারির নাকি? মহকুমার কেউ কি বাদ ছিল। নদীর ওপার থেকেও কত লোক গেছল। এবারও তাই গেছে।

সেবার বলেছিল বাসিনী, কলকাতার লোকেরা নাকি ওদের আদর করে ডেকে খাইয়েছে। রুটি আর ভাতের পাহাড়ের ডাঁই। আবার নাকি ফুলের মালা দিয়েছিল সবাইকে। সেই শুকনো মালাটি আবার ফিরিয়ে নিয়ে গেছল বাসিনী।

এ সব বিষয়ে মানা করেছ তো গেছ। বাসিনীর সঙ্গে তোমার চিরদিনের জন্যে চটে গেল ভাব। বলে, গতরে খেটে খাব, তারও জো নেই। ঘরে বসে থাকি কেমন করে? বাবুদের কানের সামনে না গিয়ে বললে যে বাবুদের কানে যায় না, তাই যেতে লাগে।

রাস্তায় যেন একটু ভিড় দেখা যাচ্ছে। রাস্তার ধারে ধারে লোকজন জটলা করছে। দমদম রেললাইনের পুল দেখা যাচ্ছে। সব আলোগুলি জ্বলে নি।

কিন্তু কোথায় বাবা সেই সব লোকেরা, যারা বাসিনীদের খাওয়াবার জন্যে রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। খাবারের চ্যাঙাড়ি চুপড়ি কিছুই তো দেখতে পাচ্ছে না পবন। মুখ বাড়িয়ে দেখল আশেপাশে। তার দিকে কেউ ফিরেও দেখছে না। ফুলের মালার দরকার নেই। খানদুয়েক রুটি আর একটু ঘ্যাঁট হলেই এখন চলে যেত। সামনের দিকে তাকা-! পবন। আবার রাস্তাটা খালি খালি লাগছে। এখনও তো বাঁদিকে একটা মোড়, তারপরে সেই বড় একটা পুল। সেটা পার হয়ে আর একটা বড় পুল। তারপরেই খাস কলকাতা বলা যায়।

লোকজনকে জিজ্ঞেস করলে কি আর বলে দেবে না। অতগুলি মেয়ে-পুরুষ কোথায় জমা হয়ে আছে?

ওহো, অনেক দিন কলকাতায় আসে নি পবন। আজকাল তো পুলিশ আবার হাত দেখায় না। লাল নীল আলো দেখায়। লালে থামো, নীলে যাও। তাই তো? না কি জানি! যাকগে, খালি তো নালটন আর পবন নয়। হাজার হাজার আছে ও রকম কলকাতায়।

অবিশ্যি নালটনও কলকাতা ফেরতা। জীবনে বারতিনেক ঘুরে গেছে। পবনের হাত দিয়েই। ইটিন্ডাতে থাকতে তা হয় নি। নদীর ওপারে ছিল তখন গাড়ি।

প্রথম পুলটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু অন্ধকার। পুলটা যেন একটা কুঁজো পিঠ-ওয়ালা জীব। চুপ করে বসে আছে মেঘ আকাশের তলায়।

বাসিনীরা আছে ওপারে। গাঁয়ার আর এক ধাপ তুলল পবন। শব্দটা তার নিজের কানেই বড় ঘ্যাং ঘ্যাং করে লাগছে। বাসিনী দূর থেকে শুনলেই এ শব্দ চিনতে পারবে। হাসল পবন। হয়তো রাগ করবে বাসিনী। একটুও কি খুশি হবে না? কে জানে। বাসিনীর কথা বলা যায় না।

পবন এবারে বলেছিল, আমি তোমার সঙ্গে কলকাতা যাব?

কেন, মরতে? আর কলকাতা যেতে হবে না। এখানকার লোকগুলোকে শহরে বইবে কে? তুমি নালটন ন্যে থাক।

কথাটা অবশ্য বলেছিল পবন অন্য কারণে। এবার ফটিক যায় নি। যেতে পারে নি। সেবারে ফটিক গেছল। এবার সে অসুখ করে ঘরে পড়ে আছে।

কিন্তু ফটিকের ওপর একটু রাগই হয়েছে পবনের। সে তাই কলকাতায় আসবার আগে বলতে গেছল ফটিককে। কলকাতায় আসার কথা নয়, একটু রাগের কথা।

বলেছে, ঘরে তো শুয়ে রয়েছ, ওদিকে কি হচ্ছে, খবর-টবর পেলে?

ফটিক ককাচ্ছিল নিজের যন্ত্রণায়। বলেছে, না।

পবন বলেছে, তা তো জানবেই না। ঘরে চিতিত্তব দিয়ে পড়ে রইলে, আর বউটা গেল কম্‌নে সে খোঁজ নেই।

ফটিকের অসুস্থ মুখেও রাগ ফুটে উঠেছিল। বলেছে, যাও, যাও দিনি এখন। তোমার ও সব পীরিতের কথা এখন আমার ভাল লাগছে না।

পবন তবু না বলে পারে নি, পীরিতের কথা আবার কি? এখন যাও, বউকে গে নে এইস। তখন তো চুপটি মেরে ছিলে। বউয়ের মুখের সামনে গো—

শালা, যাবি তুই এখেন থেকে?

ফটিকের চিৎকারে কানে তালা লেগে যাবার যোগাড় হয়েছিল পবনের। কিন্তু ফটিক উঠতে পারবে না, এটা সে জানত। তাই সে আর একটু দাঁড়িয়ে ছিল এবং ফটিকের দিকে তাকিয়েই বিড়ি ধরিয়েছিল একটা। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে খালি ভেবেছিল, রাগ। খালি রাগ! মনের সংবাদটা কেউ রাখে না। একটা ছা কোলে নিয়ে গেল মেয়েমানুষটা, আজও এল না। সেটি কিছু নয়।

আর একবার তাকিয়ে দেখেছিল পবন ফটিকের দিকে। হুঁ! বোঝ, ম্যালেরিয়া ধরেছে বোধ হয়। নইলে অমন উপুড় হয়ে কাঁপছে কেন?

পবন খুব গম্ভীর হয়ে বলেছিল, আমি তা'লে যাচ্ছি, বুইলে?

কোন জবাব দেয় নি ফটিক। পবন চলে এসেছিল।

পুলটার ওপরে উঠে হকচকিয়ে গেল পবন। যা বাবা! এ যে ঘোর অন্ধকার। এখনও যে পবনদের মহকুমা শহরের আলোই নেভে নি। আর কলকাতার আলো সব এর মধ্যেই নিভে গেল! কেন? তা কেন হবে? মহকুমা শহরের মতই বিজলীর গোলমাল হয়েছে নিশ্চয়।

কিন্তু এত নিঝুম কেন? রাস্তায় যে একদম লোক নেই। একটাও না। ভিখিরিও নেই একটা। কত রাত হয়েছে এখন?

প্রথম পুলের পর দ্বিতীয় পুল। কিন্তু, কি ব্যাপার? গাড়ি নেই, ট্রাম নেই। নালটনের লালচে হেডলাইটের আলোয় সামনের একটুখানি রাস্তা যেন তার দিকে থাবার মত তাকিয়ে আছে।

চলন্ত অবস্থাতেই, এক হাতে স্টিয়ারিং ধরে আর এক হাতে বিড়ি বের করল পবন। ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে ধরাল কায়দা করে।

এবারে কয়েকটা মেড়োর আভাস। কিন্তু জিজ্ঞেস করা যায় কাকে? কলকাতায় কোথাও আলো নেই? আলো শুধু নালটনের। ডাকও শুধু তারই।

তারপরে পবনের মনের মধ্যে যেন কেউ টেনে টেনে বলল, ব্যাপারটা যেন কেমন! গাড়িটাকে সে ডানদিকের মোড়ে ঘোরাল। গতিটা কমিয়ে দিল আগের চেয়ে।

আলো নেই, লোক নেই। বাসিনীদের খোঁজ বা কোথায় পাওয়া যাবে। রাতই বা কাটে কোথায়?

এমন সময় কার গলার একটা চেঁচানি শোনা গেল, হল্ট!

আর সঙ্গে সঙ্গেই পবনের চোখ দুটি ঝলসে গেল। তার সারা নালটনের গায়ে আলো এসে পড়ল।

পবনকে কি কিছু বলছে? পবন গাড়িটা ওই জোরালো আলোর দিকে ঘোরাল।

আবার একটা চিৎকার, হল্ট!

গাড়িটা থামাল পবন নালটনের অস্পষ্ট আলোয় সে দেখল সামনে আর একটা কালো গাড়ি। মানুষের ইশারা দেখা যায় যেন।

বিড়িটা কামড়ে ধরে পবন নামল। হাফ্ প্যান্টের পকেটে হাত দুটি ঢুকিয়ে এগিয়ে গেল সে গাড়িটার দিকে। ওদের জিজ্ঞেস করলে যদি বাসিনীদের খোঁজ পাওয়া যায়। কিছুই তো বোঝা যাচ্ছে না।

মনে হল ওই গাড়িটা থেকেও যেন কারা নামল জুতো খটখটিয়ে। পবন তাদের সামনে যেতে না যেতেই, তারা কয়েকজন পবনকে ঘিরে ফেলল। আর কয়েকটা প্রচণ্ড ঘুষি পড়ল তার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে কড়া হুকুম, আগে বাত্তি বুতাও।

পবন ঘুষি কটা সামলে, মুখে হাত দিয়ে অবাক হয়ে দাঁড়াল। যদিও একটা চোখ তার টাটাতে লাগল, কিছুই দেখতে পেল না; কিন্তু আর একটা চোখে দেখে তার মনে হল, খাকি পোশাক আর টুপি মাথায় লোকগুলি পুলিশের মত দেখতে।

তাকে ওরা ধাক্কা দিতে দিতে নালটনের কাছে নিয়ে এল। বলল, বুতাও, বাত্তি বুতাও আগে।

আন্দাজেই হাত বাড়িয়ে বাতিটা নিভিয়ে দিল পবন। তারপরে লোকগুলি তাকে ঠেলে দিল নালটনের ওপর। যাও, ভাগো জলদি। বলে তারা কালো গাড়িটার দিকে চলে গেল।

পবনের মুখে কি একটা ঠেকল। থুঃথুঃ করে সেটা ফেলে দিল সে। একটা দাঁত। বাসিনীর মুখটা মনে পড়ল তার। এ কথাটা সে বলবে কেমন করে বাসিনীকে? কেমন করে বলবে যে, পুলিশের মার খেয়ে চলে এলাম।

মুখে হাত বুলিয়ে সে আবার কালো গাড়িটার দিকে এগিয়ে গেল। সে খানিকটা এগুবার আগে, ওরাই এগিয়ে এল তাড়াতাড়ি। যদিও অন্ধকার, তবু ওরা যেন কেমন স্তব্ধ। যেন অবাক হয়ে গেছে।

পবন দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরে গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল, মারলেন কেন, অ্যাঁ? আমাকে মারলেন কেন, সেইটি বলেন।

কথাটা শেষ হবার আগেই, পবন খালি বুঝল সে মাটিতে পড়ে গেছে। আর ওদের পা কি ভীষণ শক্ত। মারতে মারতে তারা তাকে নালটনের কাছে নিয়ে এল। তারপরে তার ডোরাকাটা গেঞ্জিটা ধরে তুলল। আর গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেল পড়পড়িয়ে।

অনুভূতিটা অসাড় লাগছিল। কিন্তু ওরা জবাবও দিলে না। ধবে খালি মেরেই দিলে। আবার সেই হুকুম, ভাগো, নেহি তো মরোগে।

সেটি বুঝতে পারছে পবন। কিন্তু স্টিয়ারিং ধরে একসেলারেটর ঠেলে স্টার্ট নিতে গিয়ে বুঝল, হাতে তার জোর নেই। তবু দিতেই হবে।

খুব একটা ব্যথা পেলেও, স্টার্ট নিল নালটন। একটু একটু এগুতে লাগল। বাতি সে জ্বালাতে পাববে না, হুকুম আছে।

কিন্তু, প্যাণ্টটা ভিজে যাচ্ছে পবনের। আপনি আপনি বেরিয়ে যাচ্ছে। পেটটা, ঠ্যাং দুটি, পায়ের পাতা অবধি গরম তরল স্পর্শটা ভাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু কোমর সোজা করে, নর্দমার ধারে হেঁটে যাওয়াই মুশকিল।

ছি ছি! বুড়ো বয়সে ছেলেমানুষের মত কাণ্ড করছে পবন। ছেলেমানুষের মতই তার চোখ দুটিও যেন ঝাপসা হয়ে আসছে। অন্ধকারে সে ভাল দেখতে পাচ্ছে না। চোখ তাকানোও যাচ্ছে না।

কিন্তু বাসিনীর মুখটা তার মনে পড়ছে। সেই হাসি মুখটা। যা দেখে কোন দিন কিছু বোঝা যায় নি। তবে আছে, বাসিনীর সঙ্গে তার আছে। মানে ভাব-ভালবাসা যাকে বলে আর কি।

কিন্তু খোঁজটা কোথায় পাওয়া যায়। গাড়িটা নিয়ে কোথাও আশ্রয় দরকার পবনের। কলকাতা যে এত অন্ধকার, কে জানত!

কপালকুণ্ডলা

কলম্বাস বা কুকের সঙ্গে নিজের তুলনা করতে পারলে মন্দ হত না। কিন্তু ব্যাপারটা নিতান্তই হাস্যকর শোনাবে, অতএব সেদিক দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না।

তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাটা অনেকখানি খেটে যায়। অবিশ্যিই তাঁর সাহিত্যপ্রতিভার সঙ্গে তুলনা আদৌ করতে চাই না। সম্রাট হবার কোন বাসনা আমার নেই।

যোগ্যতা থাকলে তো বাসনার প্রশ্ন ওঠে। বরং দীন কাঙাল হরিনাথের মত কিছু গান গেয়ে যেতে পারলেই সার্থক মনে করব।

বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে ছিলেন ম্যাজিস্ট্রেট, অপর দিকে সাহিত্যসম্রাট। আমি ও সবের ধারেকাছে নেই। কিন্তু আমার একটি জিজ্ঞাসা মনকে খুবই উতলা করে। তিনি কি সত্যি কপালকুণ্ডলা নাম্নী কোন তরুণীকে বনমধ্যে দেখেছিলেন? না কি কপালকুণ্ডলা একান্তই তাঁর কল্পনার প্রতিমা?

কাঁথি শহরের এক প্রান্তে আমি কপালকুণ্ডলার মন্দির দর্শন করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় যে কাঁথি বা ইংরেজী উচ্চারণের কণ্টাই শহরটি ছিল, নিশ্চয়ই তা অনেক ছোট ছিল। সেই হিসাবে তৎকালীন কাঁথি মহকুমা শহর থেকে কপালকুণ্ডলার মন্দির নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা দূরে গ্রামে ছিল। সেখানকার গ্রামীণ পরিবেশটা এখনও যায় নি, যদিও নতুন শহর সেই দিকেও ছড়িয়েছে। সেই মন্দিরের দেওয়ালে, শ্বেত-পাথরের ফলকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপস্থিতির কথা লিখিত আছে।

এখানে একটি কথা না বলে পারছি না। আমি প্রত্নতত্ত্বের লোক নই, অনুসন্ধানীও বলা চলে না। কিন্তু একটা শুধু জিজ্ঞাসা আমার থেকেই গিয়েছে। আমি প্রথম যখন কপালকুণ্ডলার মন্দিরে গিয়েছিলাম, তখন প্রতিমার রূপ দেখেছিলাম এক রকম। সেই মূর্তি ছিল রক্তস্তনী। পাশেই কয়েকটি খড়্গ ঝোলানো ছিল, পুরনো আর জীর্ণ, ধারগুলো মরচে পড়া। মন্দিরের পূজারীর মুখে শুনেছিলাম, ওখানে যে পশুবলি হয় খড়্গগুলো তারই।

কপালকুণ্ডলা মন্দিরের পূজারীর একটি প্রথা, যে খড়্গ দিয়ে বলি হয়, তার রক্ত কখনও খড়্গের গা থেকে জল দিয়ে ধোয়া হত না। রক্ত খড়্গের গায়েই লেগে

থাকার দরুন একটি খড়্গ দিয়ে বেশি দিন বলির কাজ চালানো যেত না। সেইজন্যই অনেক খড়্গ জমে যেত।

মন্দিরের পিছনে একটি বড় জলাশয় আছে। আশেপাশে বেশ কিছু জমিও। সেখানে শবদাহ করা হয়, তার চিহ্নসকলও আছে। বক্রেশ্বর বা তারাপীঠের মত মহাশ্মশানের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

কয়েক বছর পরে আবার যখন যাই, দেখলাম কপালকুণ্ডলা আর রক্তস্তনী নেই, মাটির প্রতিমাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। খড়্গগুলো নেই, ইতিমধ্যে পূজারী পুরোহিতেরও পরিবর্তন হয়েছিল। জিজ্ঞেস করতে সে আমাকে পরিষ্কার জানিয়ে দিল, এই মূর্তিই ছিল, যা আদৌ সত্যি না। খড়্গগুলো যে কোন কালে ছিল, তা-ই সে বলতে পারল না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েই আমাকে ফিরতে হয়েছিল।

যাই হোক, সংবাদপত্রের চিঠির মত আমি কোন বক্তব্য এখানে তুলতে বসি নি। কপালকুণ্ডলা এবং তার মন্দির, এবং বঙ্কিমচন্দ্রই আপাতত আমার জিজ্ঞাসা আর কৌতূহলের বিষয়। আমি জিজ্ঞাসু মনে ভাবি, বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই মন্দির দর্শনে এসেছিলেন (নিশ্চয়ই ঘোড়ার পিঠে চেপে!) তখন কি এর চারপাশে গভীর বন ছিল? সমুদ্র কি ছিল খুবই নিকটে, যার উত্তুঙ্গ ঢেউয়ের আছড়ে পড়ার গর্জন শোনা যেত?

আশ্চর্যের কিছুই না। স্থানীয় মৃত্তিকায় আমি বালির স্তর দেখেছি। আশে-পাশে যে সব গাছপালা রয়েছে, নারকেল গাছসহ সবই প্রায় সামুদ্রিক অঞ্চলের। কাঁথি থেকে সমুদ্র যে এখন খুব বেশি দূর সরে গিয়েছে তাও নয়। সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কপালকুণ্ডলার মন্দিবের বাস্তবতা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই অভিভূত হয়েছিলেন, এবং কপালকুণ্ডলা উপন্যাস রচনার কল্পনা, সেই মুহূর্তেই হয়তো তাঁর ধ্যানে ঝিলিক হেনেছিল।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কি দেখে? কপালকুণ্ডলার মত তরুণী কি তাঁর চোখে পড়েছিল? কাপালিকের মত কোন তান্ত্রিক যোগীকে তিনি কি কপালকুণ্ডলা মন্দিরে বা তার আশেপাশের বনের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন? নাকি সে-সবই তাঁর কল্পনা, প্রতিভার দ্বাবা রচিত? এ সব প্রশ্ন আমার মনকে চঞ্চল করেছিল। মনে হয়, এর জন্য বর্তমান কালের একজন সাহিত্যিক হওয়ার প্রয়োজন হয় না, যে কোন মানুষের মনকেই এ সব জিজ্ঞাসা কৌতূহলিত ও চঞ্চল করতে পারে। এ সবই হল, আমার নিজের কপালকুণ্ডলার ভূমিকা। কপালকুণ্ডলা, উনিশশো আটষট্টি। কথাটা এভাবেই আমাকে বলতে হয়। উনিশশো আটষট্টি থেকে এটাই বোঝাবার চেষ্টা করছি, ঘটনাটা সেই সালের।

আমরা কয়েকজন বন্ধু সেই সালের শীতের সময় একটি বড় নৌকায় সুন্দরবন ভ্রমণে বেরিয়েছিলাম। যাত্রা করেছিলাম মোল্লাখালি থেকে। খুব বিশদ বর্ণনায় আমি যাব না, কারণ আপাতত আমি কোন ভ্রমণ কাহিনী লিখতে বসি নি।

কলকাতা থেকে বিশেষ যোগাযোগে আগে থেকেই একটি বড় নৌকার ব্যবস্থা করা ছিল। এক্ষেত্রে লঞ্চে যাবার আমি ছিলাম ঘোরতর বিরোধী। লঞ্চের মোটরের যান্ত্রিক শব্দটাই আমার কাছে বিরক্তিকর। সমুদ্র নদী আর বনকে চকিত চমকে জাগিয়ে দিয়ে দাপিয়ে বেড়াবার পক্ষপাতী আমি মোটেই ছিলাম না।

নৌকাটি আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। বড় না বলে সেটাকে বিরাট আখ্যা দেওয়া ভাল। আমাদের শোবার বিছানা পাতার ভাল পরিসর ছিল। রান্নার জায়গাও অনেকখানি। মস্ত বড় বড় দুটো জলের জালা উঠেছিল। কেননা নোনা জলের অকূলে ভাসতে হলে, মিষ্টি পানীয় জলের ব্যবস্থা যথেষ্ট রাখতেই হয়। দশ দিনের খাদ্য তুলে নিয়েছিলাম। প্রধানত চাল ডাল নুন লঙ্কা তেল ইত্যাদি। চিড়ে-মুড়ি, যতটা সম্ভব আনাজপাতি আর মিষ্টি। প্রধান মাঝিটিকে আমার খুবই পছন্দ হয়েছিল। শক্ত স্বাস্থ্যবান অভিজ্ঞ, কিন্তু অল্প বয়সের পুরুষ। মাথায় বড় বড় চুল। সে ভক্ত মানুষ, ভাল গান জানে। সে ছাড়া আরও দুজন যুবক শক্তিশালী মাঝিও তার সঙ্গী ছিল। প্রধান মাঝির নাম সত্য সাঁই।

দয়া করে এর থেকে কেউ ধরে নেবেন না, সাঁইবাবা নামক সাধক সিদ্ধপুরুষের বিষয়ে কিছু বলছি। মাঝি তার এই নামটিই বলেছিল। সে একদা সাঁইদার ছিল। তারও আগে ছিল মৌলি—অর্থাৎ যারা সুন্দরবনে মধু সংগ্রহ করে। সুন্দরবনের বাঘকে সে নিতান্ত বাঘ মনে করে না, দেবতা মনে করে এবং তাকে বশ করার মন্ত্রতন্ত্রও তার জানা আছে। বাঘ, ভূত, ডাকাত সুন্দরবনের জলে ডাঙায় এই ত্রিবিধ জীবদেরই একমাত্র ভয়। এ সব নিতান্ত ছেলেভুলানো গল্প নয়, সত্য সাঁইদের আন্তরিক বিশ্বাস। ভূত যতই অবায়বীয় হোক, অতি বাস্তব সত্য। সত্য সাঁই সে-সব ভূতদের বন্ধন আর মুক্তির মন্ত্রও জানে। এ সবই হচ্ছে একজন খাঁটি সাঁইদারের লক্ষণ। কারণ সে নেতা। মাঝিদের জীবনের দায়দায়িত্ব সবই তার। সুন্দবনের গভীরে সর্পিল খাড়ি এবং অকূলে সর্বত্রই মাঝিদের মৃত্যু হাতছানি দিয়ে ডেকে নিয়ে যায়। মাঝিরা নিশি পাওয়া আচ্ছন্নের মতই সেই ডাকে সাড়া দিয়ে নিজের অজ্ঞাতে চলে যায়। আর কখনও ফিরে আসে না।

সাঁইদারের কাজ সেই সব অদৃশ্য দুরাত্মাদের তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য রাখা এবং তাদের বিতাড়িত করা, অথবা তুষ্ট করে ফিরিয়ে দেওয়া। বনবিবি প্রধানত ব্যাধির দেবী। অসুখের মধ্যে আমাশয়, কলেরা আর ঘা-পাঁচড়া। বনবিবির পূজা এক্ষেত্রে অতি আবশ্যিক। আর দক্ষিণরায় হলেন ব্যাঘ্রদেবতা। অর্থাৎ দক্ষিণের রাজা।

সত্য সাঁইয়ের গল্পের ভাণ্ডার এতই ঐশ্বর্যপূর্ণ, আমি তার কাছে একান্ত গরীব। ধরে নিতে হবে, এই যাত্রায়, সেই আমাদের রক্ষক এবং নেতা। আমরা তা সর্বাংশে মেনেও নিয়েছিলাম।

এবার কপালকুণ্ডলার কথায় আসা যাক।

যাত্রা করবার তৃতীয় দিনে সাতজেলিয়াতে আমরা স্নান করবার সুযোগ নিয়েছিলাম। সাতজেলিয়ার হাটের ধারেই টিউবওয়েল ছিল। শীতের দিন হলেও আমাদের প্রতিটি রোমকূপ একটু মিষ্টি জলে স্নান করার জন্য উন্মুখ হয়েছিল। মলমূত্র ত্যাগের জন্য আমাদের সব সময়ই বিপজ্জনক ব্যবস্থা নিতে হত। বিপজ্জনক এই কারণে, আমরা মাঝিদের পদ্ধতিতে অভ্যস্ত ছিলাম না।

নৌকার ধার থেকে একটি দড়ি আর বাঁশের ঝোলানো মই নেমে গিয়েছে জলের গায়ে। সেই মই বেয়ে নিচে নেমে প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ব্যবস্থা। বিপজ্জনক বলার কারণ এই না যে সাঁতার না-জানা। সাঁতার আমরা সকলেই জানি। কিন্তু সুন্দরবনের নদী নালায় কেউ নামে না, স্নান তো দূরের কথা। জলে নেমে জলশৌচের কথাও কেউ ভাবে না। সেটা যে কেবল জল লবণাক্ত বলেই, তা না। কুমির কামটের ভয়। কুমিরের থেকেও স্থানীয় লোকের ভয় কামটকে। কামট হাঙর শ্রেণীর এক জাতীয় হিংস্র জলজন্তু। হাঙরের মতই অতি তীক্ষ্ণ দুই পাটি দাঁত। আকারেও কম বেশি সেই রকম। রঙটা কালো-সবুজ শ্যাওলার মত, মুখ অনেকটা শূকরের মত ছুঁচলো। অতি ক্ষিপ্র আর দ্রুতগামী এবং সজাগ জলচর প্রাণী। মানুষবাহী নৌকা এবং মনুষ্যবসতি ডাঙার কাছেপিঠেই তারা ঘুরে বেড়ায়। আর সুযোগ পেলেই ধারালো দাঁতে নিমেষে অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে নেয়। কুমির তবু চিবিয়ে খায়, কামট যান্ত্রিক করাতের মত দাঁতে চোখের পলকে শরীর টুকরো টুকরো করে দেয়।

অতঃপরও যে আমরা প্রাকৃতিক ক্রিয়াকর্মগুলো সারতে পেরেছি সেটা ভাগ্য বলতে হবে। নোনা জলে স্নান করার কোন প্রশ্নই ছিল না। সারা গা যে কেবল চটচট করে তাই না, শুকিয়ে যাবার পরে চুলকাতে আরম্ভ করে। সুন্দরবনের মাঝিদের একটা বড় চর্মরোগই হল দাদ। হাজা-র কথা তো বাদই দিলাম।

সাতজেলিয়াতে আমরা কেবল স্নান করলাম না, জালার জল যতখানি ব্যয় হয়েছিল তা আবার পূর্ণ করে নিলাম। গোটাকয়েক মুরগীও কেনা গেল। সত্যি বলতে কি, মুরগী কেনার কোন দরকার আমাদের ছিল না। নিতান্ত মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যেই কেনা হয়েছিল। মাছ আমরা প্রচুর পেতাম। ভোরবেলা যে কোন নদীর বুকেই জেলে-মাঝিরা যখন জাল তুলত, প্রথম সূর্যালোকে জালে আটক পড়া নীলকান্তমণি রঙের ভেটকির গায়ে যেন সাত রঙ খেলে যেত। অথবা রুপালি আভাস। অতি তৈলাক্ত স্বাদু মাছ। দামেও পেতাম অনেক কম।

সাতজেলিয়ার পরে পঞ্চম দিন আমাদের কুমিরখালি পৌঁছবার কথা। এবং সেখানেই রাত্রিবাস হবে এ রকম ঠিক ছিল। কিন্তু সত্য সাঁইয়ের মত মাঝিও রাতের অন্ধকারে ঘোষণা করল, পথ ভুল হয়েছে। ইতিমধ্যে রান্না হয়ে গিয়েছিল। আমরা কম্বল আর লেপ মুড়ি দিয়ে ছইয়ের ভিতরে হ্যারিকেনের আলোয় তাস খেলছিলাম।

তখন ভাঁটা চলছিল। পথ ভুলের কথা শুনে বাইরে গেলাম। দুটো দাঁড় পড়ছিল ঝপ্ ঝপ্ করে আর অন্ধকারে দাঁড়ের আঘাতে জলের মধ্যে ফসফরাসের জন্য অজস্র জোনাকির মত জল ছিটকে উঠছিল। দিগন্তব্যাপী আর কিছুই দেখা যায় না। তারাভরা আকাশ আর দিগন্তবিস্তৃত জল মেশামেশি করে আছে।

সত্য সাঁইকে কেমন চিন্তিত আর উদ্বিগ্ন দেখলাম। সে উৎকর্ণ হয়ে চারদিকে তীক্ষ্ণ চোখে দেখতে লাগল। আমরা ভয় পেলাম, বোধ হয় নৌকা সমুদ্রের অকূলে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বলল, 'সমুদ্র না, ডাকাত। আমরা এখন যেখান দিয়ে যাচ্ছি, এখানে প্রায়ই ডাকাতি হয়।'

তারপরেই সাঁইদারের নির্দেশ, হারিকেন নিভিয়ে দিন। কেউ বিড়ি-সিগারেট খাবেন না। একটু আলোর বিন্দুও যেন দেখা না যায়। কথাবার্তা একদম বন্ধ। একটি কথাও যেন কেউ উচ্চারণ না করি। এবং মাঝিরা ছাড়া আমরা সকলেই যেন ছইয়ের ভিতরে থাকি। এই নির্দেশের পরে ছইয়ের মধ্যে আমরা কেবল নিজেদের বুকের স্পন্দনের শব্দ শুনতে লাগলাম। সে শব্দ দাঁড়ের ঝপ্‌ছপ্ শব্দের থেকেও যেন প্রচণ্ড হয়ে বাজছিল।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এই রকম রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার পরে সত্য সাঁইয়ের স্বরে বিপদ-মুক্তির সাইরেন শুনতে পেলাম, 'বাবুরা, বাতি জ্বালেন, এবারে খেয়ে নেয়া যাক। খারাপ জায়গাটা পেরুইয়ে এসেছি।'

ভোরবেলার ঝাপসা কুয়াশায় আবিষ্কার করা গেল, আমরা পাখিরালা বন-বিভাগের অফিসের ঘাটের নিচে রয়েছি। আমার এক বন্ধু বোধ হয় রাত্রের উদ্বেগের ধকল সহ্য করতে পারছিল না। সে মুখে জল না দিয়েই হুইস্কির বোতল তুলে নিট্ চুমুক দিল।

তারপরে আমরা যখন বড় বড় মোটা গাছের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে বনবিভাগের অফিসের মাটিতে পা দিলাম, তখনই একটা ঘরের ভিতর থেকে রীতিমত ধমকানো আর উদ্বিগ্ন চিৎকার শুনতে পেলাম, 'আরে মশাই, কে আপনারা? কোন্ সাহসে এখানে উঠে এসেছেন? তিন দিন ধরে একটা বাঘ অফিসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শীগ্‌গির পালান।'

আমরা নিরস্ত্র, বন্ধুরা আর মুহূর্ত বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি সেই পলিপড়া পিছল কাঠের গুঁড়ির সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলাম। একজন আছাড়ও খেলো। কিন্তু আমরা প্রাণে বাঁচলাম।

আমার এ সব বিষয়কেও বিংশ শতাব্দীর অর্ধশতক অতিক্রান্ত কপালকুণ্ডলার ভূমিকাই বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার নবকুমারকে আমাদের মত বিপত্তি ভোগ করতে হয় নি। কামট কুমির ভূত বাঘ ইত্যাদির কথা কপালকুণ্ডলা পড়তে গেলে মনেই আসে না। বরং আরণ্যক ভয়াবহতার মধ্যে কেমন একটা রোমান্টিক ভাবই জেগে ওঠে। তারপরে যখন শুনতে পাই, 'পথিক, তুমি পথ

হারাইয়াছ ?' তখন তো মনে হয়, নবকুমারের পরিবর্তে আমিই কেন সেখানে উপস্থিত হতে পারলাম না ! রমণীর স্বরে সেই কথা উচ্চারিত হওয়া মাত্র, সুন্দর বনের ভয়াবহতার কথা আর একটুও মনে থাকে না। সুন্দরবন হয়ে ওঠে এক রহস্যময় নন্দনকানন।

এখন বেলা প্রায় বারোটা। ভোরবেলায় পাখিরালার স্যাংচুয়ারির মাচায় আমরা চুরি করে উঠেছিলাম। আমাদের কোন অনুমতি ছিল না এবং বিনানুমতিতে অভয়ারণ্যের খালে যাওয়া বা মাচায় ওঠার অধিকার আমাদের ছিল না।

কিন্তু আমরা নিরস্ত্র, শিকার আমাদের লক্ষ্যও ছিল না, লাভের মধ্যে পাখি দেখা। এই চৌর্যবৃত্তিটুকু আমরা না করে পারি নি। এমন কি বাঘের ভয় থাকা সত্ত্বেও। সেখান থেকে ভাসতে ভাসতে আমরা কুমিরখালির উদ্দেশে রওনা হলাম।

বেলা বারোটার সময় যখন রান্নাবান্না প্রায় শেষ, আমরা আবার স্নানের জন্য উন্মুখ হলাম। কিন্তু মিষ্টি জল পাবার কোন উপায় নেই। আমরা কোমরে সংক্ষিপ্ত বাস জড়িয়ে খালি গায়ে মাচার রোদে বসে ছিলাম।

এমন সময় আমাদের চোখে পড়ল একখণ্ড জমি। একটি ছোট্ট দ্বীপ, যেন জলে ভেসে রয়েছে। বড় গাছপালা চোখে না পড়লেও জনমানবহীন ছোট্ট দ্বীপটিকে সবুজ দেখাচ্ছিল। আমাদের সকলের দৃষ্টিই দ্বীপটি আকর্ষণ করল। দ্বীপটির পঁচিশ-তিরিশ হাত দূর দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্ছিল। আমি প্রস্তাব করলাম, 'মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে স্নান করতে আমাদের অনেক দেরি হবে। আমরা এই দ্বীপে নেমে গায়ে তেল মাখতে পারি, তারপরে খানিকটা রোদ খেয়ে নোনা জলেই স্নানটা সেরে নেওয়া যেতে পারে। গায়ে যা জ্বালা ধরেছে, একটু স্নান না করলে আর চলবে না।'

আমাদের মধ্যে যে সাঁতার জানে না সে বলল, 'নোনা জলেই না হয় চান করব, কিন্তু জলে নামব কি করে ? এখানে কুমির না থাক, কামট কি নেই ?'

কামটের কথা আমার মনেই ছিল না। আর এক বন্ধু বলল, 'তা ছাড়া এ দ্বীপে আমাদের নামা উচিত হবে কি না, সেটাও জানা দরকার।'

নিঃসন্দেহে। সত্য সাঁইয়ের অনুমতি না পেলে আমরা দ্বীপে নামতে পারি না। তবে দ্বীপটি সবুজ দেখে আমার মনে হল, ভরা বর্ষায়ও হয়তো দ্বীপটি পুরোপুরি জলে ডোবে না। অন্যথায় সবুজ হাঁটু-সমান জঙ্গলে ভরে উঠত না। আমি সত্য সাঁইয়ের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমরা কি ওই ডাঙায় নেমে একটু তেল মেখে চান করতে পারি ?'

সত্য সাঁই দ্বীপটির দিকে তাকিয়ে দেখল, বলল, 'তা পারেন। জ্বল হলে নামতি পারবেন না। একটা বালতিতে দড়ি বেঁধে দিতেছি, জল তুলি তুলি মাথায় ঢালতে পারবেন।' বলেই সে হালে মোচড় দিয়ে মুখ ঘোরাল।

তার কথা শুনে বড় আনন্দ পেলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'এটা জোয়ারের জলে ডুবে যায় না?'

সত্য সাঁই বলল, 'ইদানী বছর-দুই ধরি দেখতিছি ডাঙ্গাটা জাগতিছে। মনে হয় কি, আর দু-এক বছর বাদে এটা আরও বড় হবি, ত্যাখন আবাদ হতি পারবে।'

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, দ্বীপটির একটা অংশ খানিকটা উঁচু ঢিপির মত উঠে গিয়েছে। সেদিকটায় এক শ্রেণীর গাঢ় সবুজ লতানে ঝোপঝাড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে আছে। সত্য সাঁইকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এ ডাঙায় বাঘ বা কুমির নেই তো?'

সত্য সাঁই হেসে বলল, 'আইজ্ঞে না। উঁয়ারা (বাঘ কুমির) এখেনে কি করতি থাকবেন বলেন? খাবেনটা কি? জঙ্গল বাড়লি পরে জানোয়ার-টানোয়ার থাকলি উঁয়ারা থাকতেন। সোম্‌সারের জীব যেখেনে খাতি পায়, সেখেনে যায়। তয় মেছো কুমির এক আধটা থাকলি থাকতি পারে। একটু দেখে শুনি চলবেন।'

আবার মেছো কুমির কেন? মনে একটু ভয়-ভয় ভাব থেকে গেল। কিন্তু ডাঙায় নামতে পারার আনন্দে সে ভয় বেশিক্ষণ টিকল না। মাটির ওপরে রোদে পিঠ দিয়ে পা ছড়িয়ে বসে কত দিন তেল মাখি নি। শত হলেও ডাঙার জীব আমরা। দু-এক দিন জলে থাকলেই হাঁপিয়ে উঠতে হয়। আজ আমাদের সপ্তম দিন।

নৌকা দ্বীপের ভূমি স্পর্শ করল। এক জোয়ান দাঁড়ি দড়ি ধরে লাফিয়ে নামল, আর একজন লোহার ভারি নোঙর ছুঁড়ে ফেলে নিজেও লাফিয়ে নামল। তারপরে নোঙর গাঁথল। আমরা তেলের শিশি, সিগারেটের প্যাকেট, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে আণ্ডারওয়্যার পরে নামলাম। শীতকাল বটে, তবু মাটির ঠাণ্ডা স্পর্শে যেন একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি হল।

দ্বীপের যে গাছগুলো হাঁটু-সমান মনে হয়েছিল, এখন দেখলাম সেগুলো প্রায় কোমরের সমান। দেখতে অনেকটা আসশ্যাওড়ার মত, কিন্তু তা নয়। গাছের পাতাগুলো তার চেয়ে বড়। অনেকটা ডুমুরের মত, তবে খসখসে নয়, মোলায়েম। এক বন্ধু হুইস্কির বোতল নিয়ে নামতে ভোলে নি। সকলেই আমরা যেন মুক্তির স্বাদ পেলাম। সিগারেট ধরিয়ে সবাই যে যার ইচ্ছামত ছড়িয়ে পড়লাম।

অল্প অল্প বাতাস বইছে। গাছের মাথাগুলো হেলে পড়ছে। নীল আকাশ, চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত জলরাশি। উত্তর দিকে আকাশের গায়ে ঠেকে আছে গাছ-পালাহীন একটি ভেড়ি বাঁধের রেখা। পূর্ব-দক্ষিণে কোন গভীর বনের সীমানা জেগে আছে, দেখাচ্ছে একটি কৃষ্ণনীল দ্বীপের মত। সেই দিকেই কিছু দূরে জলের বুকে ঢেউয়ে দোল খাচ্ছে কয়েক সহস্র বেলেহাঁস। মাঝে মাঝে তাদের অদ্ভুত ডাক শোনা যাচ্ছে।

আমার কৌতূহলিত দৃষ্টি উঁচু ঢিবির দিকে। আমি আস্তে আস্তে সেদিকে এগিয়ে চললাম। জমিতে এখনও বালির ভাগই বেশি। মৃত্তিকার জন্ম হয় নি।

যতই এগোতে লাগলাম ততই গাছগুলো যেন পাল্লা দিয়ে বড় হতে হতে আমার বুক আর মাথার সমান হয়ে উঠতে লাগল। এক ধরনের লতাঝোপও গাছগুলিকে জড়িয়ে উঠেছে। আমার ভয় হল জোঁকের জন্য। জোঁককে আমার বড় ভয়। তবে নোনাজলে জঙ্গলে জোঁকের কথা কখনও শুনি নি। বড় বড় মিষ্টিজলের বাওরে জোঁক থাকে। আর জোঁকের সব থেকে বেশি উৎপাত দেখেছি তরাইয়ে, পাহাড়ে আর আসামের জঙ্গলে, যেখানে নোনার কোন স্পর্শ নেই।

আমি হঠাৎ থমকিয়ে দাঁড়ালাম। আর একটু হলেই আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরিয়ে আসতো। কিন্তু আমি রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে আমার বাঁদিকে তাকিয়ে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলাম। অভাবিত আর অবিশ্বাস্য দৃশ্য! একটি মেয়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখছে সম্ভবত আমার বন্ধুদেরই সে দেখছে। এবং এমনই নিবিড় অন্যমনস্ক আর কৌতূহল, কিছুটা উদ্বেগেও দেখছে, আমাকে সে দেখতেই পেল না। টেরও পায় নি, আর একজন মানুষ তার কাছ থেকে মাত্র দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে আছে।

এই দ্বীপে মানুষ! তাও একটি মেয়ে? বয়স ষোল-সতেরোর বেশি কোন মতেই না। গায়ের রঙ কালো, স্বাস্থ্যটি উজ্জ্বল। মুখের এক পাশ থেকে দেখে মনে হচ্ছে, নাক তেমন চোখা নয়, চোখ ভাসা-ভাসা। চোখে রোদ পড়ে ঝক্‌ঝক্‌ করছে। বিস্ময়ে আর কৌতূহলে তার ঠোঁট ফাঁক হয়ে গিয়েছে, সাদা কয়েকটি দাঁত দেখা যাচ্ছে। নাকের নিচেই ওপর-ঠোঁটের ওপরে একটি চুটকি নোলক দুলছে। সেটি সোনা না পিতলের বুঝতে পারছি না। গায়ে কোন জামা নেই। নীলের ওপরে কালো ডোরাকাটা কালো পাড়েরই একটি সস্তা শাড়ি তার পরনে। পুষ্ট বাহু, উদ্ধত বুক, ক্ষীণ কটির নিচেই সুগঠিত কোমর থেকে স্তম্ভের মত ঊরুদেশ। দুই হাতে লাল আর নীল কাঁচের চুড়ি।

আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তদুপরি মানুষ দেখে কেমন যেন ভয় হতে লাগল। এখানে মানুষের অস্তিত্ব অকল্পনীয়। চাষ আবাদ নেই, জেলেদের মাছ শুকোবার কারবার নেই। তাহলে দুই চারটি নৌকা অন্তত দেখা যেত। নৌকায় আসবার সময় অন্য কোন নৌকাকে নোঙর করে থাকতে দেখি নি।

শহরের মানুষ হিসাবে এবং আধুনিকতার বড়াই থাকা সত্ত্বেও, ভূতের প্রসঙ্গটা আমার বুকের স্পন্দনের সঙ্গে বাজতে লাগল। এ কোন অশরীরী মায়া নয় তো? যাই হোক আমি পালাতে চাই, মেয়েটিকে বা সে যা-ই হোক, ফাঁকি দিয়ে। ফিরে গিয়ে বন্ধুদের, বিশেষ করে সত্য সাঁইকে এ খবরটা দিতে চাই।

ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে সামান্য নড়তেই মেয়েটি সচকিত বাঘিনীর মতই ঝটিতি আমার দিকে ফিরে তাকালো। ঘাড়ের ঝটকায় তার কপালে চুল এলিয়ে পড়ল। আমি চিত্রার্পিতের মত দাঁড়িয়ে পড়লাম। মেয়েটির চোখে-মুখে প্রথমে অপার বিস্ময় ও ভয়ের অভিব্যক্তি ফুটে উঠল। এবং তারপরেই তার মুখ আর

ভাসা-ভাসা চোখের দৃষ্টি যেন কঠিন হয়ে উঠল। কিন্তু আমি মানুষ। বিস্ময়-চমকের মধ্যেই একটা মুগ্ধতা আমার চোখে ফুটে উঠল। মেয়েটির কালো মুখখানি যে এত সুন্দর, এই নির্জন দ্বীপবাসের রুক্ষতাও তা ম্লান করতে পারে নি। তার মুখে একটা তেজোদৃপ্ত ভাব।

আমার চোখে চোখ রেখে কয়েক পলক দেখেই মেয়েটি পিছন ফিরে দৌড় দিল। আমি কি করব ভেবে পেলাম না। পালাব? চিৎকার করে সবাইকে ডাকব? কিন্তু নিজের আচরণে আমি নিজেই বিস্মিত হলাম। মেয়েটির পলায়মান পথের দিকেই আমি এগিয়ে চললাম এক অতি আকর্ষক চুম্বকের টানে আমি যেন নিশি-পাওয়া ঘোরে চলতে লাগলাম। কিছুটা দূরে গাছের পাতা নড়ে উঠতে দেখে সেই দিকে গেলাম। কিন্তু মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না।

আমি তখন ঢিবিটার কাছে। আমার নাকে একটা দুর্গন্ধ লাগল। প্রথমে মনে হল শুকনো মাছের গন্ধ। কিন্তু শুকনো মাছের গন্ধ আমার চেনা। এ গন্ধ যেন আরও বিকট আর চামসা। কিসের গন্ধ হতে পারে? মানুষ মরে পড়ে নেই তো কোথাও? একবার ভাবলাম ফিরে যাই। কিন্তু পারলাম না।

মানুষ সব সময়ে দৈবকে এড়িয়ে যেতে পারে না। সে নিজেই তাকে টেনে নিয়ে যায়। আমি নিচের দিকে তাকালাম। মানুষের পায়ের ছাপ স্পষ্ট বাঁদিকে গিয়েছে। আমি সেই ছাপ অনুসরণ করে ঢিবিটা প্রদক্ষিণ করতে উত্তর দিকে বাঁক নিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। দেখলাম গোলপাতার একটি অবিন্যস্ত ছাউনি ঢিবির নিচেই যেন গুঁড়ি মেরে রয়েছে। কয়েকটি ছোট ছোট মোটা গাছের গুঁড়ির ওপরে গোলপাতার চাল মাটি স্পর্শ করেছে। ভিতরে প্রবেশের একটি প্রায় সুড়ঙ্গের মত ফাঁক। নিশ্চয়ই মাথা নিচু করে উপুড় হয়ে ঢুকতে হয়।

এটি যদি একটি বাসস্থান নয়, তবে বাইরে থেকে তা দেখবার কোন উপায় নেই। ঢিবির নিচেই অন্যান্য গাছের সঙ্গে গোলপাতার চাল মিশে রয়েছে। তারপরেই আমার চোখে পড়ল, কতকগুলো হাড়গোড় আশেপাশে ছড়িয়ে আছে। কিন্তু স্পষ্টতই তা মানুষের নয়। কোন জন্তু-জানোয়ারেরই হবে। গন্ধ ওখান থেকেই উত্তরের বাতাসে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তারপরেই হঠাৎ আমার চোখে পড়ল একটি ছোট বাহারি নৌকা। ভেজা হোগলা পাতা দিয়ে ঢাকা।

কি এর অর্থ? নিশ্চয়ই কেউ এই নৌকায় বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। কিন্তু কোথায় গেল সেই মেয়েটি? আমি কি কোন ডাকাতের আস্তানায় এসে পড়েছি? এই কথা ভাবতেই গোলপাতার ছাউনির সুড়ঙ্গের ফাঁকে সেই মেয়েটির মুখ দেখা গেল। যেন সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে একটা বাঘিনী উঁকি দিয়ে আমাকে দেখছে। তারপরেই হঠাৎ আমার বুক হিম করে দিয়ে একটি লোহার নল আমার দিকে এগিয়ে এল। বন্দুকের নল। দেশী পাইপগানের নল আমার অচেনা না।

আমি চিৎকার করে উঠবার আগেই মেয়েটিকে সরিয়ে দিয়ে একটি মূর্তি বেরিয়ে এল। পেশীবহুল শক্তপোক্ত খালি গা একটি মধ্যবয়স্ক লোক। মাথায় কাঁচাপাকা রুক্ষ, বাবরি চুল, গোঁফদাড়ি ভরা মুখ। গলায় একটি তাবিজ, স্পষ্টই সেটা বাঘের নখের তাবিজ। পরনে একটা লুঙ্গি। হাতে তার একটি পাইপগান। কিন্তু তা আমার দিকে উদ্যত নয়। লোকটির দুই চোখে বাঘের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসা। মেয়েটি বোধ হয় এসে তার পাশে দাঁড়াল।

মেয়েটির চোখে-মুখে এখন সে-রকম কাঠিন্য নেই। কেবল বিস্ময় আর কৌতূহলে ভরা। দুজনেই আমার আণ্ডারওয়্যার পরা খালি গায়ের আপাদমস্তক দেখল। তারপরে লোকটিই জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কে বাবা? এখেনে কি করি এলেন?'

আমি যেন একটু ভরসা পেলাম। এ নিতান্ত কাপালিক না, মেয়েটিকেও কপালকুণ্ডলার মত বন্দিনী মনে হল না। লোকটির কথার মধ্যেও কিঞ্চিৎ কোমলতা আর সম্ভ্রমের স্পর্শ আছে। আমি সত্যি কথাই বললাম।

আমার কথা শুনে লোকটির চোখমুখের ভাব একটু নরম হল। বলল, 'আমাব বেটি ছাওয়ালের মুখিও তাই শোনলাম। কলকাতার থেকে আসিছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

লোকটি আমার চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, 'কোথা থেকে নৌকা নিইছেন, মাঝির নাম কি?'

বললাম, 'মোল্লার হাট থেকে। মাঝি সত্য সাঁই।'

লোকটি মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি হাসল। তাব নোলক দুলে উঠে চিকচিক করল। বেটি ছাওয়াল মানে নিশ্চয়ই কন্যা। এরা তাহলে পিতাপুত্রী? কিন্তু এখানে কি করে? হাতে এই দেশী পাইপগান বা কেন?

মেয়েটির সঙ্গে আমার দৃষ্টি বিনিময় হতেই এবার তার মুখে লজ্জার ছটা ফুটল। লোকটি বলল, 'ময়না, বাবুকে একটা চ্যাটাই পাতি বসতি দে। তামুক খাবেন?'

রীতিমত আতিথেয়তা। মেয়েটির নাম ময়না? কপালকুণ্ডলা নয়? বললাম, 'আমি তামাক খাই না।'

ময়না একটা হোগলার চাটাই নিয়ে বাইরে আসতেই লোকটি আবার বলে উঠল, 'থাক, বাইরি বসতি লাগবে না। আপনি ঘরের ভিতর চলেন।'

ঘরের ভিতর? ঐখানেই কি হাড়িকাঠ আছে নাকি? ময়না কিন্তু হেসে উঠে মুখে আঁচল চেপে এই প্রথম কথা বলল, 'বাপজানের মাথার ঠিক নাই'।

লোকটি হাসল। গোঁফদাড়ির মধ্যে তার শক্ত অটুট দাঁতের সারি দেখতে পেলাম। বলল, 'তুই ঘরের মধ্যি বাতি জ্বালা গা।'

ময়না আব একবার আমার দিকে দেখে হেসে হোগলার চাটাই নিয়ে ভিতবে চলে গেল। আমি বললাম, 'ভেতরে যাবার আর দরকার কি? আমি বরং যাই, আমার বন্ধুরা আমাকে খুঁজবে।'

লোকটি বলল, 'খুঁজলিও আপনারে পাবে না। আসেন।'

স্বর নিরীহ, কিন্তু আমার অমান্য করার সাহস হল না। আমাকে এগিয়ে দিয়ে সে পিছনে দাঁড়াল। ভিতরে উঁকি দিয়ে একটা লম্ফর শিস্ দেখতে পেলাম, তার পাশে আলুলায়িত ময়নার কেশ-মুখ। আর কিছুই চোখে পড়ল না। ঢুকতেই ময়না আঙুল দিয়ে হোগলার চাটাই দেখিয়ে বলল, 'ওটোয় বস।'

বসতে গিয়েই বুক কেঁপে উঠল। দেখলাম আমার দু হাত দূরেই একটি প্রকাণ্ড রয়েল বেঙ্গল টাইগার অপলক তাকিয়ে আছে। ময়না খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'ওটা মরা বাঘ। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডুটা জোড়া রয়িছি।'

ধড়ে প্রাণ এল। এখানেও সেই চামসা গন্ধ। তার সঙ্গে তামাক। আরও নানা কিছুর গন্ধ মেশানো। লোকটি ভিতরে ঢুকে বাঘের মুণ্ডটার সামনেই বসল। পাশে রাখল বন্দুক। মাথার ওপরে তাকিয়ে দেখলাম। বাঁশের ফ্রেমের ওপরে গোলপাতা বিছানো। গোলপাতা আসলে খড়ের মতই লম্বা। কিন্তু খড়ের থেকেও বেশি শক্ত। এক পাশে মাটির হাঁড়ি কলসী রয়েছে। পিতলের ঘটি, লোহার কলাই করা দু-একটা থালা দেখতে পেলাম।

লোকটি বলল, 'বাবা, আপনারে একটা কথা কই। আমি ফেরার মানুষ। জঙ্গলপুলিস আমারে খুঁজি ফিরিতেছে। তয় মানুষ খুন করি নাই। বাঘ মেরে আমার নামে হুলিয়া হয়িছি। এখেনে এইসি পালায়ে রয়িছি। এখনও বাঘ মারি, এই বন্দুকে।' বলে সে বন্দুকটি তুলে দেখাল, আবার পাশে রেখে বললে, 'একটা নয়, আরও আছে, নিজের হাতেই বানাই। টোটা কিনতি লাগে। তার জন্যে লোক আছে। আপনি তোরাপ সর্দারের নাম কখন শুনিছেন?'

তোরাপ সর্দার? নামটা খুবই চেনা লাগল। কোথাও শুনেছি, না খবরের কাগজে পড়েছি, ঠিক মনে করতে পারলাম না। বললাম, 'আমার খুবই শোনা মনে হচ্ছে।'

লোকটি বলল, 'আমার নাম তোরাপ সদার। এক সময়ে বাউলি ছিলাম। এই সোন্দরবনে ঘুরাফিরা করতাম। আমার এক ওস্তাদ ছিল, ওনার কাছে বন্দুক বানান শিখি, বাঘ মারতে আরম্ভ করি। আজতক অনেক মাইরেছি। কিন্তু বাবা, নিজির জন্যে না, আমার পিছনে লোক আছে। তাদের ট্যাকার কাঁড়ি আছে। তারা বাঘ মারতি পারে না, কিন্তু মরা বাঘের ব্যবসা করে। বড় মানুষ আর সাহেব সুবোদের বিক্রি করে মেলাই টাকা রোজগার করে। আমি বাঘ মারি, ওরা মারে আমারে। তারাই এখেনে আমারে লুকোয়ে রেখিছে। হপ্তায় একদিন ওরা আমারে মিঠা পানি আর চাল ডাল দিয়ি যায়। বাইরে একখান লোকা দেখিছেন?'

বললাম, 'দেখেছি।'

তোরাপ সর্দার বলল, 'ওই লৌকায় করি আমি সুযোগ মত বাঘ মারতি যাই। ছাল ছাড়ায়ে মুণ্ডু রাখি, আর বাঘের চার পায়ের নখ, সব রাখি। হাড়

মাংস ফেলি দিই। কিন্তু বাবা, আপনারে বলি, এই বেআইনি কাম আর করতি পারি না, মন চায় না।'

আমার বিস্ময়ের সীমা নেই। জীবনে কখনও এমন একটি লোকের সংস্পর্শে আসব, এমন এক অজানা দ্বীপে, আর এই কাহিনী শুনব ভাবি নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'তবে কেন করছেন ?'

তোরাপ সর্দার বলল, 'কি উপায় বাবা ? যারা আমাদের দিয়ে বাঘ মারায়, তাদের গায়ে বিস্তর তেল, জল লাগে না। পুলিশ তাদের কিছু বইলবে না। তারা আমাকে ধরায়ে দিবে। তার উপরে এই বেটি ছাওয়াল আমার, বয়সটা দেখেন। ওরে আমি কোথায় রাখব ? এক এক সোমায় ভাবি যে, ওরে একটা গুলি করে মারি তারপরে নিজির গলায় নল ঢুকিয়ে গুলি খেয়ি মরি।'

শেষের দিকে তোরাপ সর্দারের স্বর ভারি শোনাল। আমি ময়নার দিকে তাকালাম সে নত মুখে লম্ফর কাছে বসে আছে। খোলা দীর্ঘ রুক্ষ চুলের রাশি তার মুখের দু-পাশ দিয়ে এলিয়ে পড়েছে। আমি তাব ভুরু, নাকের ডগা, নোলক ঠোঁট চিবুক দেখতে পাচ্ছি। সে হঠাৎ তোরাপের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'বাপজান, তুমি তা কোন দিন পারবে না। বন্দুক চালাতে আমি শিখিছি। একদিন আমিই নিজিরি মারি ফ্যালাব।'

তোরাপেব গোঁফদাড়িতে বিষণ্ণ হাসি, বলল, 'অই শোনেন বাবা।'

ময়না ঘাড়ে ঝটকা দিয়ে বাবার দিকে দীপ্ত চোখে তাকিয়ে বলল, 'এতে আবাব শুনবার কি আছে? তা না হলি আমাবে কও, বন্দুক নিয়ি গোসাবায় যেয়ি তোমার কত্তা বাবুদের খুন করি আসি।'

কৃষ্ণাঙ্গী ময়না কোন মনস্তাত্ত্বিকের সৃষ্টি জটিল চরিত্রের কপালকুণ্ডলা না। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই রক্তস্তনী শক্তি দেবী কপালকুণ্ডলার মূর্তি। যে কাপালিকের কাছ থেকে পালিয়ে যায় না। নিজের হাতে খড়্গ ধারণ করতে চায়। আমি বিস্ময় বিমুগ্ধ চোখে দেখলাম। ময়নার চোখে আগুন, নাসারন্ধ্র স্ফীত। উদ্ধত বুক দ্রুত নিশ্বাসে ঢেউয়ের মত ওঠা নামা করছে। নীলের ওপর কালো ডোরায় তাকে অন্য এক রূপদান করেছে।

তোরাপ গম্ভীর মুখে বলল, 'বাঘ মারার জন্যি যদি জেলে যেতি হয়, তা বাবুদের খুন করি যাওয়া ভাল। কিন্তু বেটি, মানুষ তো কখনও মারি নাই।'

ময়না বলল, 'আমি মারব।' বলে আমার দিকে ফিরে বলে উঠল, 'আমি বাপজানরে বলি, তুমি আর বাঘ মারতি যেইও না। পুলুশকে বুঝয়ে বললি কি তারা শুনবি না ?'

আমি কি বলব ভেবে পেলাম না। ময়না আমাকে কথাগুলো বলে লজ্জা পেয়ে গেল। তাড়াতাড়ি চোখ নামিয়ে নিল। লম্ফর আলো ওর গায়ে কাঁপছে। অস্বীকার করব না, আমি এক বিশেষ আবেগের স্রোতে ভেসে চলেছি। মনে হল,

এই পলাতক তোরাপ সর্দারের ঘরে তার মত করেই তার ঘরে জীবনটা কাটিয়ে দিই।

আমার এই আবেগ আচ্ছন্নতার মধ্যে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল। তারা আমার নাম ধরে ডাকছে।

সত্য সাঁইয়ের স্বরও আমি চিনি। সেও 'বাবু বাবু' বলে চিৎকার করছে।

তোরাপ সচকিত হয়ে বাইরের দিকে মাথা নিচু করে তাকাল। বলল, 'বাবা, সত্য সাঁই আমারে চিনে। সে যদি জানতে পারে আমি এখানে আছি, আর আমার উপায় নাই। ধর্মের নাম করি বলি যান, ওদের কিছু বলবেন না।'

সেই ধর্ম যদি মানুষের ধর্ম হয়, তাহলে নিশ্চয়ই বলব না। কিন্তু এ কি ভয়াবহ অবাস্তব জীবনযাত্রা? এর হাত থেকে কি মুক্তি নেই? আমি আবার ময়নার দিকে তাকালাম।

তোরাপ কি ভেবে বলে উঠল, 'বাবা, আমার এই বেটিও আজ তক তিনটা বাঘ মারিছে। ওরে যদি একটা শাদী দিতে পারতাম! সে যাক বাবা, আমার কথাটা রাখবেন।'

আমি বললাম, 'মানুষের ধর্ম বলে যদি কিছু থাকে, সত্য সাঁইদের আমি আপনার কথা বলব না। কিন্তু আপনি এ মেয়েকে নিয়ে এভাবে এখানে আর কত দিন থাকবেন?'

তোরাপ বলল, 'সেটা বাবা খোদায় বলতি পারে, আর দক্ষিণ রায়।'

একটা কথা সহসা মনে এল। বললাম, 'আপনি তো মুসলমান। আপনি যশোর বা খুলনায় পালিয়ে যান না কেন! সেটা তো ভিন্ন দেশ। এ দেশের পুলিশ আপনাকে ধরতে পারবে না।'

ময়না ক্রুর চোখে আমার দিকে তাকাল।

তোরাপ বলল, 'সে কথা যে ভাবি নাই, তা না। কিন্তু বাবা, সে দেশের পুলিশ কি আমারে ছেড়ি দেবে? আমার কাগজ-পত্তর নাই।'

বাইরে বন্ধুদের আর সত্য সাঁইয়ের চিৎকার ক্রমে যেন এদিকেই এগিয়ে আসছে। আমি বললাম, 'আপনার কোন শাস্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনি সব সত্যি কথা বলবেন। দেখুন, আপনি জানেন একটা কথা আছে, যুদ্ধে ছল বল কৌশল সবই দরকার হয়। পাশের দেশ ইসলামের দেশ, মুসলমান হলে মাপ। আপনি চলে যান। এ ছাড়া আপনার আর কোন বাঁচার রাস্তা ছিল না। তবু যদি বলবার আপত্তি না থাকে আপনার সেই বাঘের ব্যবসায়ী বাবুদের নামগুলো আমাকে বলতে পারেন।'

তোরাপ সর্দার দ্বিধা করল, কন্যার দিকে তাকাল। ময়না বলে উঠল, 'বল, কেন বলব না! আমিই বলতিছি, একজন যোগেন দয়াল, আর একজন ভূষণ চৌধুরী। তাদের ধান চাল মধুর মস্ত ব্যবসা আছে।'

তোরাপ বলল, 'বাবা আপনি ওঠেন।'

আমি হামাগুড়ি দিয়ে চালার বাইরে এলাম। আমার পিছনে ময়না আর তোরাপ সর্দার। তোরাপ নিচু স্বরে বলল, 'তয় বাবু, আপনার কথা মতন পাকিস্তানের কথাটাই আমার মনে ধরতিছে। গেলি পরে খুল্‌নেতেই যাবগা।'

চিৎকার ক্রমেই নিকটবর্তী হচ্ছে। আমি যেদিক দিয়ে এসেছিলাম, সেদিকে পা বাড়াতে যেতেই ময়না আমার হাত চেপে ধরল, টেনে নিয়ে গেল বিপরীত দিকে, এবং রীতিমত ছুটতে লাগল। আমার পতনের ভয় প্রতি মুহূর্তে। বেশ খানিকটা ছোটার পরে ময়না থেমে ফিসফিস করে বলল, 'এখেন থেকে জবাব কর। বল তুমি এখেনে।'

আমি মুহূর্তেই ময়নার মনোগত উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম। আমার বন্ধুরা পাছে তোরাপদের গোপন ডেরায় চলে যায়, তাই তাদের বিপথগামী করাই ময়নার উদ্দেশ্য। আমি চিৎকার করে বললাম, 'আমি এখানে—।'

ময়না আবার আমার হাত ধরে খানিকটা ছুটিয়ে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আবার হেঁকি বল।'

আমি কয়েকবার চিৎকার করলাম। তার উত্তরে বন্ধুদের চিৎকার শোনা গেল, 'শালা বেঁচে আছিস? দাঁড়া যাচ্ছি।'

ময়না ফিক করে হেসে উঠল। আমি তার হাতের দিকে তাকালাম, যে হাত দিয়ে সে আমার হাত ধরে রেখেছিল। আমি তাকাতেই ও আমার হাতটা ছেড়ে দিল। ভাসা ভাসা উজ্জ্বল চোখে লজ্জা ফুটল। এই শীতেও তার কপালে চিবুকে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অবিন্যস্ত চুলে তাকে এলোকেশীর মত দেখাচ্ছে।

আমি বুঝতে পারছি, আমার আবেগ মুগ্ধতা এমন কি রক্তেও সঞ্চারিত হচ্ছে। আমি আমার নাগরিক মনটাকে কথঞ্চিৎ চিনি। কিন্তু এই দুর্জয় কপালকুণ্ডলার কাছে নিজেকে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব না। কেবল বলতে পারলাম, 'ময়না, চলি।'

ময়না কোন জবাব দিল না, ঘাড় কাত করে সম্মতি জানাল। তারপর নিজেই পিছন ফিরে চলতে লাগল।

কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে ফিরে তাকাল। ওর হাসিটা বিষণ্ণ হয়ে উঠেছে। একটু আবেগও কি চোখের তারায় সঞ্চারিত? ও আবার ঘাড় কাত করে বলল, 'এইস গা।'

বলেই গাছলতাগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সত্যসাঁইকে আমি নৌকায় কিছু বলি নি। মোল্লাহাটে ফিরে গিয়ে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে তোরাপ সর্দারকে চেনে কি না। সত্য সাঁই জবাব দিয়েছিল, 'আরে বাপরে বাপ! তোরাপ সর্দার তো বাবু আর এক দক্ষিণ রায়। তারে পুলিশ

খুঁজি বেড়াতিছি। বাঘেরাও খুঁজি ফিরাতিছ। সে মন্তর দিয়ি বাঘেরে ঘুম পাড়াতি পারে। আর তার এক মেয়ে আছে। শুনি বাপ বেটিতে এই সোন্দরবনে বাঘের সঙ্গেই থাকে।'…

এই ঘটনার ছ'মাস পরে, খবরের কাগজে একটি ছোট সংবাদ বেরোয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সংবাদদাতা জানায়, 'বাঘের যম তোরাপ সর্দার নিখোঁজ। অনেকেরই সন্দেহ, সে শেষ পর্যন্ত বাঘের পেটেই গিয়েছে। সরকারী হিসাবে এ পর্যন্ত সে প্রায় পনেরোটি বাঘ হত্যা করেছে।……

সংবাদটা আমাকে দ্বিধান্বিত ও বিচলিত করে। তোরাপ কি সকন্যা বাঘের পেটে গিয়েছে, অথবা সীমান্তের ওপারে পালিয়েছে? বাঘের পেটে গেলে সম্ভবতঃ কোন না কোন ভাবে জানা যেত।

বাংলাদেশে বিপ্লবের পর সেই দেশে গিয়েছিলাম। তোরাপের খুলনেয় (খুলনায়) নানা জায়গায় খোঁজখবর করেছি। তোরাপ সর্দারের সন্ধান কেউ দিতে পারে নি। অতএব ময়নারও না।

ময়না না, আমার কাছে সে কপালকুণ্ডলা। নবকুমারের দুর্জয় মোহ আর লুব্ধ হৃদয়ের কথা শোনবার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা কোনটাই আমার নেই।

সেই দিক থেকে আমার ট্র্যাজেডির রূপটা আলাদা।

মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা...

আজ ছুটি। আজ উৎসবের দিন। আজ পনেরোই আগস্ট। আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার বত্রিশ বছর পূর্তি দিবস। আজ ভারতের নয়া প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যেই দিল্লীর ঐতিহাসিক লালকেল্লায় জাতীয় পতাকা উড়িয়ে দিয়েছেন। (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল !) লক্‌কা পায়রা ওড়াবার খবর পাওয়া যায় নি, তবে একুশবার তোপধ্বনির খবর সারা দেশের লোক জেনে গিয়েছে। কারণ এখন বেলা প্রায় সাড়ে এগারোটা।

আজ যে-যাই বলুক বা বলুন, 'গণতন্ত্রের আসন্ন বিপদের সংকেত দেখা দিয়েছে' 'দেশ জুড়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে' কিন্তু আজ আনন্দের দিন। আজ পতাকা ওড়াবার দিন, গৃহস্থেরাও সন্ধ্যা পর্যন্ত পতাকা ওড়াতে পারে. আজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবীদের বিশেষ ব্যস্ততার দিন, কারণ আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে. জনসাধারণকে তাদের মহান কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, বিশাল বোঝা বহন করবার দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দেবার দিন, তথাপি আজ বড় আনন্দের দিন, (মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল !) কারণ এই বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, অতএব আজ আলিপুরের চিড়িয়াখানা শিশু উদ্যানে চোদ্দ বছর বয়স পর্যন্ত খোকাখুকুদের বিনা পয়সায় ঢুকতে পারা থেকে শহরে গ্রামে গঞ্জে তাবৎ বাচ্ছাদের মিষ্টি খাওয়াবার দিন, নানা রকম খেলাধুলা, ছবি আঁকা ইত্যাদির হারজিতের দিন, নানা রকম কুচকাওয়াজের দিন, ভবিষ্যতে তারা কি হবে বা হতে যাচ্ছে, সে-কথা ওদের মনে করিয়ে উপদেশ দেবার দিন, কারণ, ওরা কারা ? ('বাচ্ছালোগ, এক দফে হাততালি লাগাও, ইয়ে হ্যায় মাদারিকা খেল' রাস্তায় আজ এখন খেলোয়াড় খেলা দেখাচ্ছে, কেননা আজ ছুটির দিন, খুশির দিন। চটপট হাততালি পড়ছে, এবং সেই সঙ্গে 'লে হালুয়া, লে হালুয়া !' খুশির চিৎকার শোনা যাচ্ছে।) ওরা দেশের ভবিষ্যৎ !

আজ এই উৎসবের দিনে তাই দিকে দিকে মাইকের চড়া আওয়াজে গান বাজছে, কে কত আওয়াজ বাড়াতে পারে, তার জন্য রেষারেষি চলছে। সব অবশ্য দেশাত্ম-বোধক গান না, কেননা আজ ফুর্তির দিনও তো বটে ! যাদের যেমন ইচ্ছা, হিন্দি, বাংলা, সিনেমার গান, পপ্‌ সং সব রকমই শোনা যাচ্ছে। আকাশ মেঘলা ? বৃষ্টি

পড়ছে ? বাজার চড়া ? তা হোক, আজ ছুটি, আজ উৎসব, আজ পনেরোই আগস্ট। আজ এই উত্তর শহরতলির পথে পথেও লোকজন ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, জটলা করছে, আর হাসিখুশির মধ্যে ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করছে। কেননা প্রতিবাদও তো করতে হবে। খুশি উৎসব ছুটি প্রতিবাদ, সব মিলিয়েই আনন্দ। সেই কত কালের দুর্ভাগিনী দেশমাতাকে ডাস্টবিনের পাশ থেকে তুলে এনে, খড়মাটি রঙ দিয়ে নতুন করে বানানো হয়েছে। মায়ের আজ বত্রিশ বছর পূর্ণ হচ্ছে। তার সঙ্গেই এ বছরটা আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ পড়ে গিয়েছে। মায়ের জন্মদিনে আজ শিশুদেরই তো সব থেকে বেশি কদর করতে হবে।

'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল !'···আট দশ থেকে চোদ্দ পনেরো বছরের, খালি গায়ে ধুলা কাদা মাখা বেশে সব ছেঁড়া ঝোল ঝাপ্‌পা পাতলুন ইত্যাদি পরে আধ ন্যাংটার দল। একটা বাঁশের সঙ্গে বাঁধা, একটা ছেলের মড়া কাঁধে বয়ে, রাস্তা দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে, আর চেঁচাচ্ছে, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল !'—মড়া ছেলেটার ঘাড়সুদ্ধ মাথাটা ঝুলে পড়েছে, আর বাঁশ কাঁধে ছেলেদের নাচের তালে তালে, ছেলেটার মাথাও নাচছে।

খুশির দিনে অবাক জলপান ! কি মজা ! হা-ঘরে ভিখিরি, শহরের আপদগুলোর ধ্বনি আর নাচের তালে, অনেকেরই শরীরে তাল লেগে যাচ্ছে। হাসছে কেউ, অবাক কেউ। শহরের যত খুদে আপদ, নেংটি ইঁদুরের বাচ্ছাগুলো এ আবার কি সঙ বের করেছে ? সত্যি মড়া বয়ে নিয়ে যাচ্ছে, নাকি মজা মারছে। বাঁশে বাঁধা ছেলেটা কি আজই মরেছে নাকি ? বড় ভাল দিনে মরেছে তো !

কিন্তু আজকের ভাল দিনটিতে প্যাল্‌গা ফরসা মরে নি। সে সৌভাগ্য ও করে আসে নি। ও মরেছে গতকাল দুপুরের একটু পরে। শহরের যে খাল নর্দমাটা গঙ্গায় গিয়ে পড়েছে, যার দুপাশে ঘিঞ্জি শহরের খাটা পায়খানা, বাড়ি-বাজারের পিছন দিকে, যত নোংরা জল আবর্জনা ভেসে যায়, তারই ধারে কোন এক কালের একটা পুরনো ধসে পড়া বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে, লোক চোখের আড়ালে, ওদের একটা আস্তানা আছে। শহরের বাজারের পাশে একটা গলি দিয়ে ঢুকলে, খোলা খাল নর্দমাটার ধার দিয়ে সেই পোড়োর চাতালে যাওয়া যায়। ডানদিকে ঘিঞ্জি পাকা বাড়ি, নিচে সবই দোকান-পাট, দোতলা তেতলায় মানুষ থাকে। সামনের দিকে শহরের বাজার দোকানের রাস্তা। পিছন দিকে খোলা খাল নর্দমাটা, যত নোংরা ফেলার পক্ষে বড় সুবিধা।

বাঁদিকে, খাল নর্দমাটার পাড় বাঁচিয়ে, বেশ্যাপল্লী, জুয়ার আড্ডা, বেআইনি মদ চোলাইয়ের কারখানা। যেটুকু পাড় বাঁচিয়ে রেখে শহরের এই অংশ মৌমাছির চাকের মত জমে উঠেছে, সেই পাড়টুকুতে যে কোন বয়সের মেয়ে পুরুষই প্রস্রাব পায়খানা করে। নোংরা জঞ্জাল তাদেরও কিছু কম না। সবই খাল নর্দমার ধারে ধারে জমা হয়। তারই পাশ কাটিয়ে, ময়লা নোংরা মাড়িয়ে, প্যাল্‌গা ফরসাদের পোড়োয় যাবার রাস্তা।

আর গঙ্গার ধারের ক্যাওরাপাড়ার যত ধাড়ি শুয়োরের দল, সেই খাল দিয়ে, বাজারের গলির মোড় অবধি যাতায়াত করে। বাড়ি বাজারের যত নোংরা, জঞ্জাল, বিষ্ঠায় আর খালের পাঁকে, ধারে ধারে জঙ্গলের শিকড় মূলে খাবারের বড় মোচ্ছব তাদের।

গতকাল দুপুরে প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা, পোড়ো বাড়ির জঙ্গল ঘেরা চাতালে গিয়ে দেখতে পায়, ও একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে শুয়ে আছে। সাধারণত, ঘোর দুপুরে বাজার যখন ফাঁকা থাকে, দোকানপাটগুলো ঝিমোয়, রাস্তা-ঘাটে লোকজনের ভিড় কমে যায়, এমন কি রেল ইস্টিশনেও যাত্রীদের আনাগোনা কম, আর সিনেমার ম্যাটিনি শো শুরু হয়ে যায়, তখন ওরা যে যেখানেই থাকুক, ওদের নিরালা আস্তানায় এসে জড়ো হয়। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত যার যা আয় সব ওরা নিজেদের সামনে ঢেলে দেয়। আয়ের সব থেকে মূল্যবান বস্তু হল পয়সা। সবই ভিক্ষের পয়সা। চুরি, পকেটমারি, বাটপাড়ি করে পয়সা রোজগারের পথে এখনও ওরা যায় নি। অথবা যাবার সাহস হয় নি। তার জন্যে শহরে আলাদা দল আছে। তারা ওদের সঙ্গে মেশে না, বরং কাছে পিঠে দেখলেই তাড়া করে। চেহারা আলাদা, ভাবভঙ্গি আলাদা আর তাদের আস্তানাও অন্য জায়গায়। সেখানে অনেক বড় বয়সের লোকেরা আছে। সেই সব লোকেরা আবার শহরের পুলিশদের, বাবুদের কপালে হাত ঠুকে সেলাম করে, হেসে কথা বলে, হাবভাব অনেকটা বাবুদের মত। তাদের আস্তানাটাও প্যাল্‌গা ফরসার বন্ধুরা চেনে। পাড়ায় ঢোকবার বাঁ পাশেই দিদি, মাসীদের (বয়স অনুপাতে, বেশ্যাদের ওরা এই রকম সম্বোধন করে, এমন কি খুড়ি জেঠি দিদিমাও আছে) পাড়ার ভিতরে তাদের আস্তানা। সেই আস্তানায় এদের যাওয়া নিষেধ। ওদের যাবার কোন দরকারও হয় না। পাড়ার ভিতর দিয়ে চলাফেরা করলেই সব জানা যায়।

বরং সেই আস্তানার অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ ওদের জঙ্গল ঘেরা পোড়োব চাতালে হানা দেয়। চোখ পাকিয়ে মুখ শক্ত করে ওদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, আশেপাশে নজর করে, জিজ্ঞেস করে, 'কি বে ছুঁচো হাবামীব দল, কি করছিস? ছিঁচকেমির মালগুলো কোথায় গাপ্‌ করে রেখেছিস?'

প্যাল্‌গা ফরসাদের মধ্যে সব থেকে যার বয়স বেশি, ওর নাম চটা। চটা শব্দের মানে নাকি চড়ুই পাখি, এটা ও নিজেই বলে। কিন্তু দলপতি হিসাবে ওর সাহস সব থেকে বেশি। ও ওর ছেঁড়া পাতলুনের গিঁট খুলে ন্যাংটো হয়ে দাঁড়িয়ে বলে, 'দ্যাখ কোথায় রেখেছি।'

চটার কাণ্ড দেখে, ওর বন্ধুরা হেসে ওঠে, আর 'আস্তানা'র চোখ পাকানোর দল তেড়ে মারতে আসে। চটারা তখন ছুটোছুটি করে, কিন্তু হাসে, আর জবাব দেয়, 'আমরা চোর চোট্টা নই, বুইলে বাবা? আমরা মেগে নিই, চেয়ে চিন্তে খাই।'

'আর রোজ ভিখ্‌ মেগে যে নগদ পয়সা নিয়ে আসিস, সেগুলো কোথায় যায়?' আস্তানার ওস্তাদরা জিজ্ঞেস করে, চোখে তাদের কুটিল সন্দেহ। অবিশ্যি এই সব

ওস্তাদরা কেউই বয়সে খুব বড় না। চটাদের থেকে দু-চার বছরের বড়, দলের হয়ে কাজ করে। ওরাই মাঝে মাঝে চটাদের ওপর খবরদারি করতে আসে। এটাই নিয়ম। একদল, আর এক দলের ওপর সর্দারি করে। চটারাও সর্দারি করে। শহরের একেবারে পুঁচকে মাগার দলগুলো, নাকে শিক্নি, চোখে পিচুটি, পেটে চাপ পড়লে রাস্তার যেখানে-সেখানেই বসে যায়, অনেকের মুখের বুলি এখনও পরিষ্কার ফোটে নি, চটারা তাদের ওপর সর্দারি করে।

চটারা জবাব দেয়, 'নগদ পয়সা ? বাবুদের হাতে ঘা, নগদ কে দেবে ? যা দু এক পয়সা পাই, তখুনি কিছু কিনে খেয়ে ফেলি। যাবে আবার কোথায় ? ওই যে, দেখছ না ? ওখেনে সব আছে।' বলে চারপাশের বিষ্ঠা দেখিয়ে দেয় আর হাসে।

আস্তানার ওস্তাদেরা গরগরিয়ে তেড়ে আসে। যাকে ধরতে পারে, চাটি গাট্টা মেরে সারা গায়ে মাথায় হাতড়ায়। হয়তো কারও ছেঁড়া ঝোল-ঝাপ্পার ভিতর থেকে বেরিয়ে পড়ে দু একটা দুই পাঁচ দশ পয়সা। তাই নিয়েই কেটে পড়ে। যাবার আগে হেঁকে যায়, আবার আসবে।

আসে ওরা, পায় ওই রকমই, তার বেশি না। কিন্তু চটাদের সকাল থেকে দুপুরের নগদ আয়, সাত আট জনের মিলিয়ে, কোন দিনই এক দেড় টাকার কম হয় না। অবিশ্যি সব দিন না। কোন কোন দিন আরও অনেক কম হয়। তবে, কোন সকালে বেরিয়ে, ঝিমনো দুপুরে ফিরে আগে ওরা যে যার নগদ পয়সা এক-সঙ্গে হিসাব করে। তখন একজনকে চাতালের থেকে এগিয়ে, জঙ্গলের ধারে লুকিয়ে পাহারা দিতে হয়, কেউ আসছে কি না। নিজেদের মধ্যে নিয়মটা কেমন করে গড়ে উঠেছে, ওরা নিজেরাই জানে না। আসলে, এদের সাত আট জনের দলটা যখন কয়েক বছর থেকে গড়ে উঠেছে, তখন থেকেই, ওরা যে যার মেগে পেতে পাওয়া যা কিছু একসঙ্গে জড়ো করে। হিসেব নিয়ে ঝগড়া মারামারিও আছে। কেননা, কেউ হয়তো যা পেয়েছে, তা থেকে খরচ করে খেয়ে ফেলেছে বেশি। হিসাব তো কেউ দেয় না। একজন আর একজনের চোখে পড়ে যায়। ইস্টিশান আর বাজার আর সিনেমা হল ঘিরে, শহরে মেগে বেড়াবার চৌহদ্দি খুব বড় না।

পয়সার হিসাবের পরে, আগেই সেগুলো চালান হয়ে যায়, পোড়োর পিছনের জঙ্গলে একটা ইট, চুন সুরকির চাংড়ার নিচে। পাহারাদারকে ডেকে এনে, তারপর যে যার ভিক্ষের ঝুলি ঝোলকোটা খোলে। একটা খবরের কাগজ পেতে, তার ওপর সব ঢালে। মুড়ি, চিঁড়ে, ভাঙা বিস্কুটের টুকরো, পাঁউরুটির টুকরো, বাবুদের মুখের থেকে ছুঁড়ে দেওয়া সিঙাড়া, নিমকি, জিলিপি, গজা, এমন কি রসগোল্লা সন্দেশের কুচিও তার মধ্যে থাকে। সব মিলিয়ে মাখিয়ে, এক একজনের এক আধ মুঠো করে হয়ে যায়। তারপর যে যার ঝোল-ঝাপ্পার কষি কোমর খুঁজে বের করে পোড়া সিগারেটের টুকরো। আগেই বড়গুলো বাছাই করে, যে যার মত তুলে নেয়। দেশলাইও একটা থাকে। আগে একজন ধরায়, বাকিরা তার কাছ থেকে

ধরায়। শুরু হয় ধূমপানের মজলিস আর খ্যাকর খ্যাকর কাশি। প্যাল্‌গা ফরসা বা কোড়ে, ওদের বয়স আট-নয়ের বেশি না। লুকা, চেনো, রামের দশ-বারোর মধ্যে। চটা, টোনা তের-চোদ্দর কাছাকাছি। বগ্‌গিরও তাই, তবে ও প্রায়ই দলছুট হয়ে হঠাৎ হাওয়া হয়ে যায়। দলের মধ্যে বগ্‌গিই একমাত্র বেশি দিন এক জায়গায় থাকতে পারে না। প্রায়ই ভবঘুরের মত এদিকে ওদিকে চলে যায়, আবার ফিরে আসে।

প্যাল্‌গা ফরসা, কোড়ে, লুকা, চেনো, রাম—ওরা এখনও পাকা সিগারেটখোর হয়ে উঠতে পারে নি। টানতে টানতে কাশে, কাশতে কাশতে লালা ঝরে, চোখগুলো লাল হয়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসে, হাঁপায়, তবু টানতে ছাড়ে না। ওরা এ শহরের ছেলে না, নানা জায়গা থেকে ভাসতে ভাসতে এসেছে। কার বাপ মা কোথায় কেউ জানে না। কারো কারো বাপ মায়ের কথা একটু আধটু মনে আছে, কোথায় কবে যেন ছিল। এখন আর কেউ তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কাকে কার বাপ মা এ শহরে ছেড়ে গিয়েছে, মনে করতে পারে না। কতটুকু বয়সে কে এই শহরে এসেছিল, মনে নেই। বাজারের ধারে, ইস্টিশানে, রাস্তার ধারের দোকানের ঝাঁপের তলায় থাকতে থাকতে ওরা এ বয়সে পৌঁছেছে। আস্তে আস্তে মিলেছে। এ শহরে খুঁজলে এ রকম আরও দু চারটে দল পাওয়া যাবে।

কে বা কারা ওদের নামগুলো রেখেছে? তাও ওরা জানে না। ওরা নিজেরা নিজেদের নাম রাখে নি, অথচ যে যার একটা নাম নিয়েই এসেছিল। এর থেকে বোঝা যায়, একদা কেউ ওদের ছিল, বোধ হয় যারা জন্ম দিয়েছিল, আর তারাই নামগুলো দিয়েছিল। কেবল প্যাল্‌গার নাম পাগলা কি না এটা ওরা কোন দিন ভেবে দেখে নি। ও নিজের থেকেই বলত ওর নাম প্যাল্‌গা। আর ফরসা কথাটা জুড়ে দিয়েছে দলের সবাই মিলে। কারণ ওর রঙ বেশ ফরসা। কেউ কেউ শুধু ফরসা বলেই ডাকে। পুরো নাম প্যাল্‌গা ফরসা।

দুপুরে শহর যখন ঝিমোয়, সে সময়টা ওদেরও আড্ডা বিশ্রাম গল্পের সময়। কেউ চিত হয়ে শুয়ে পড়ে, তার ঘাড়ে আর একজন। কেউ কারও পিঠে তাল ঠুকে গান গায়। কেউ কোমরের ঝাল-ঝোপ্‌পা খুলে, বসে যায় খাল নর্দমার ধারে, আর দরকারে নর্দমার জলই ব্যবহার করে। ধাড়ি শুয়োরের দল সাধারণত গন্ধের ঝোঁকে আসে। দুপুরে এসে গেলেই ওরা ইট ছুঁড়তে শুরু করে। খাল নর্দমায় শুয়োরের দাপাদাপি, চিৎকার, তার সঙ্গে ওদেরও শিকারের হৈ হল্লা উন্মাদনা। কে ঠিক তাগ্‌ করে মারতে পেরেছে, তাই নিয়ে বাদানুবাদ। বাদানুবাদ থেকে মারামারি। মারামারিটা আসলে খেলা।

ওদের সব থেকে মজার গল্প হয় দোকানদার, রাস্তার, সিনেমার আর ইস্টিশানের বাবুদের নিয়ে। অধিকাংশ দোকানদারের হাতের কাছেই ছপ্‌টি থাকে, বিশেষ করে ওদের তাড়োবার জন্যই। একবারের বেশি দু-বার হাত বাড়ালেই, 'তবে রে হারামির বাচ্চা!'...কোন্‌ দোকানদারের ভাবভঙ্গি ভাষা কেমন, সব ওদের মুখস্থ, নকল করে

দেখায়। ওরা তরিতরকারি মাছের বাজারে ঢোকে না। কিন্তু খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজারে ওরা ছোঁক ছোঁক করে বেড়ায়। দড়ি ছেঁড়া গরু ছাগলের সামনে, শাকের খেতের মত, খৈ মুড়ি চিঁড়ের বাজারটা। বড় বড় বস্তার মুখগুলোও দোকানের সামনে খোলা থাকে। খদ্দের এসে হাতে করে ভাল মন্দ পরখ করে। খদ্দেরের ভিড়েব মধ্যে গরু ছাগল যে আসে না, তা না। বিশেষ করে গোটা দুয়েক ষাঁড়, তাদের জন্যে দোকানীরা সব সময়েই ডাণ্ডা উঁচিয়ে আছে। ওরাও সেই ফাঁকে এক আধ মুঠো, ঝটিতি তুলে মুখে পুরে দেয়, না তো ঝোলায় ঢোকায়। দোকানীর চোখে পড়লেই ডাণ্ডা নিয়ে তাড়া। মাঝে মধ্যে দু-চার ঘা পিঠে পড়েই। আর খিস্তি খেউড় ?

গালাগালগুলো ওরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে, আর হাসতে হাসতে পেট ফেটে যায়। শহরের দোকানদাররা সবাই ওদ্রের চেনা। কিন্তু বাবুরা না। বাবুদেব এক একজনের এক একরকম ভাব। খিটখিটে মেজাজের বাবুদের চেনা যায়। 'বাবু, সারাদিন খাই নি বাবু, বাবু—' কথা শেষ হবার আগেই তারা খেঁকিয়ে ওঠে, 'ভাগ, পালা ! যত্তো এঁটুলির দল !'

ওরা মনে মনে বলে, 'তোর বাবা এঁটুলি।'...কিন্তু মুখ চুন করে দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কোন বাবু আছে, তাকায়ও না. কথাও বলে না। যেন দেখতেও পায় না, শুনতেও পায় না। কিন্তু রাগও করে না, বড় জোর অন্য দিকে তাকিয়ে রুমাল দিয়ে মুখ মোছে। কোন কোন বাবু কেবল হাতের ইশারায় সরে যেতে বলে, গায়ের কাছে ঘেঁষতে দেয় না। কোন কোন বাবু বলে, 'মাপ কর বাবা।' আবার এমন বাবুও আছে, কাছে গিয়ে হাত বাড়ালে, কথা বলে না, কপালে একটা আঙুল ছোঁয়ায়। যেমন অনেক বাবু রাস্তা দিয়ে মড়া নিয়ে যেতে দেখলে, বা ঠাকুর-দেবতার মন্দির পড়ে গেলে, ঠিক একটা আঙুল কপালে ছোঁয়ায় সেই রকম।

এক এক বাবুর এক একরকম চাল। মা-দিদিমণিদেরও সেই রকম। সবাইকেই ওরা নিখুঁত নকল করে, আর নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে। আবার সেই সব বাবু মা-দিদিমণি দোকানদারদের কাছ থেকেই ওদের যা জোটবার জোটে। কে কেমন দেয়, কি ভাবে দেয়, কি বলে দেয়, সে-সবও ওরা নিজেদের নকল করে দেখায়।

দুপুর গড়িয়ে যাবার পরেই আবার ওরা বেরিয়ে পড়ে। যাবার আগে, চাতালের পিছনে, ইট-চুন-সুরকির চাংড়ার নিচে থেকে পয়সাগুলো তুলে নিয়ে যায়। রাত্রের ভিড়টা কমে আসতে আসতেই, ওরা গিয়ে জড়ো হয় ইস্টিশান থেকে দূরে, রেল-লাইনে। সারাদিনের মেগে পেতে পাওয়া পয়সা নিয়ে, খাল নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে ফিরে যাওয়া মানে, সব হাপিস্। ও পাড়ার আস্তানার মস্তানরা এসে সব কেড়ে নেবে। এ রকম কয়েকবার হয়েছে। সেই থেকে রেললাইনের নিরালায় বসে ওরা আগে পয়সার হিসাব করে। জমাবার কোন প্রশ্ন নেই। রেললাইন থেকে চলে যায় শহরের হোটেলগুলোর দরজায় দরজায়। গরম টাটকা ভাত-তরকারি নিয়ে ওদের:

জন্যে কেউ বসে থাকে না। বাসি, বাড়ন্ত, নষ্ট সব মিলিয়ে যা জোটে, পয়সা দিয়ে কিনে নেয়। কাগজে শালপাতায় মুড়ে খাবার নিয়ে ফিরে যায় আবার রেললাইনে। একপাল কুকুরও সঙ্গে জুটে যায়। একদিকে কুকুর তাড়ানো, আর একদিকে ভাগ-বাটরা। সারাদিনে সেটাই ওদের আসল খাওয়া। সব মিলিয়ে সাত-আটজনের পক্ষে অবিশ্যি সেই খাবার পেট ভরবার মত না।

তারপরে ইস্টিশানের কলের জলে, পেট ঢাক করে, আবার খাল নর্দমার ধারে, জঙ্গলে ঘেরা পোড়োয়। আস্ত ঘর বলতে কিছু নেই, দু-একটা ঘরের মাথায় এখনও দু-চার হাত ছাদ ঝুলে আছে। তার সঙ্গে গাছপালার আড়াল। সেখানে গিয়ে যে যার ঘাড়ে-ঠ্যাঙে-মাথায়-পায়ে দলা পাকিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু বাঁদিকের পাড়াটা তখন, মেয়ে-পুরুষ মাতালের চিৎকারে হল্লায় সরগরম। ওদের তাতে কিছু যায় আসে না। নেহাত খুন-টুন হয়ে গেলে, পুলিস এলে, ওরা খাল-নর্দমার জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে গঙ্গার ধারে চলে যায়।

পিছনে কিছু নেই, সামনেও কিছু নেই। দিন আসে, রাত যায়, ওদের জীবনটাও কাটে। জীবন? তাই বলতে হবে। সব জীবেরই জীবন বলে একটা বস্তু আছে। জীবন তো নিরবধি। মানুষ অমর, কোন সন্দেহ নেই। না হলে নিরবধি জীবন মিথ্যা হয়ে যায়। সেই নিরবধি জীবনের ছোট একটা গুচ্ছ, গতকাল দুপুরে, খাল-নর্দমার ধারে পোড়োর চাতালে এসে দেখল প্যাল্‌গা ফরসা একটা ভাঙা দেওয়ালের কোণে ঘাড় গুঁজে আছে। ফরসাটা তখন সাদা প্যাংলা। মুখের কষে রক্ত, ঠোঁটের ফাঁকে কয়েকটা মুড়ি লালায় জড়ানো। চোখ দুটো মরা মাছের মত, তারা দুটো নড়ছে না। ঘাড় আর কানের কাছে দু-তিনটে বড় পটলের মত ফুলে উঠেছে।

প্রথম এলো টোনা আর কোড়ে। কোড়ে বলল, 'ফরসা শালা কোথায় পাঁদানি খেয়ে এসেছে।'

টোনা কাছে এসে বলল, 'কি রে প্যাল্‌গা ফরসা, কেউ মেরেছে?'

প্যাল্‌গা ফরসার গলা দিয়ে গোঙানো শব্দ বেরুল, 'অঁ-অঁ-অঁ।'

'কে মেরেছে?' টোনা জিজ্ঞেস করল।

প্যাল্‌গা ফরসা তখনই জবাব দিতে পারল না। একে একে ওদের সবাই প্যাল্‌গা ফরসাকে ঘিরে বসল। চটা প্যাল্‌গা ফরসার ঘাড় আর কানের কাছে হাত দিয়ে বলল, 'শালা, খুব জোর মেরেছে। কে মেরেছে রে?'

প্যাল্‌গা ফরসা গোঙানো স্বরে যা অস্পষ্ট উচ্চারণ করল, তা বোঝা গেল না, শোনা গেল, 'কঁ-অঁ-সা।'

সবাই মুখ তুলে সকলের মুখের দিকে তাকাল। বগ্‌গি বলল, 'কদম সা, মুড়িওয়ালা।'

'শালা নিজে যেমন মোটা, ওর ঠ্যাঙাবার ডান্ডাটাও তেমনি।' বাম বলল।

লুকা বলল, 'ওর মুখে মুড়ি লেগে রয়েছে।'

চেনো জিজ্ঞেস করল, 'বস্তা থেকে মুড়ি খেতে গেছিলি, না?'

প্যাল্‌গার গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, 'অঁ-অঁ-অঁ...'

'ওর মুখের থেকে রক্ত বেরুচ্ছে।' রাম বলল।

জটা প্যাল্‌গাকে টেনে চিৎ করল। প্যাল্‌গার হাত দুটো ল্যাটপেটিয়ে ছড়িয়ে পড়ল। গা-টা ঠাণ্ডা। জটা জিজ্ঞেস করল, 'কি রে, যন্তন্না হচ্ছে?'

প্যাল্‌গার গোঙানো স্বরটা আরও ঝিমিয়ে গেল, চোখের কোণ বেয়ে জল পড়ল। অথচ ও কারোর দিকে তাকিয়ে নেই। চোখের তারা দুটো নিথর। মুখটা একটু হাঁ-করা, কয়েকটা মুড়ি বাইরে ভিতরে লালায় জড়িয়ে এখন শুকনো, আর কষে রক্ত। রোগা ফরসা খালি গায়ের নানা জায়গায় ধুলো কাদা। কোমরে একটা ঢলঢলে ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট দড়ি দিয়ে বাঁধা। একপাশের অর্ধেক নেই, আর একপাশেরটা ছিঁড়ে সুতো ঝুলে পড়েছে।

বগ্‌গি জিজ্ঞেস করল, 'কখন মেরেছে? কখন এখেনে এইচিস?'

প্যাল্‌গা ফরসার ঠোঁট নড়ল, কথা বেরুল না। ওর ঠোঁটে মাছি বসছে দেখে, রাম হাত নাড়ল। কোড়ে ডাকল, 'প্যাল্‌গা ফরসা! এই প্যাল্‌গা!'

প্যাল্‌গার ঠোঁট নড়ল না। টোনা বলে উঠল, 'ও মরে যাচ্ছে রে!'

চটা ঝুঁকে পড়ে দু হাত দিয়ে প্যাল্‌গাকে জড়িয়ে ধরে নাড়া দিল, ডাকল, 'এই ফরসা! ফরসা!'

বগ্‌গি প্যাল্‌গার বুকে হাত দিল, বল্‌ল, 'ধুকধুকি নেই। নিশ্বেসও পড়ছে না।'

'কি হবে এখন?' লুকা লাফ দিয়ে দাঁড়াল, ওর চোখে-মুখে ভয়।

ওর দেখাদেখি চেনো আর রামও উঠে দাঁড়াল। টোনা বল্‌ল, 'ভয় পাচ্ছিস কেন? আমরা কি মেরেছি?'

রাম উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'পুলিসে ধরে নিয়ে যায় যদি?'

স্বাভাবিক। এ পাড়ায় কেউ মরলে, খুন হলে, আগেই পুলিস আসে, আর লোকজনকে পাকড়াও করে থানায় নিয়ে যায়।

এ সব চোখে দেখা ঘটনা। কেবল কোড়েটাই চটা টোনা বগ্‌গির সঙ্গে বসে, প্যাল্‌গা ফরসার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে।

চটা বলল, 'কিন্তু মরেছে কি না, কি করে বুঝব? মার খেয়ে তো অনেকে অজ্ঞান হয়ে পড়ে থাকে। প্যাল্‌গাও সেই রকম রয়েছে কি না, কে বলবে?'

বগ্‌গি বলল, 'চল্ তালে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।'

'এই দুপুরে কোন ডাক্তারবাবু থাকে না।' টোনা বলল, 'এখন বাবুরা বাড়িতে খেতে গেছে। তবু দেখ তো আবার ডেকে, কথা বলে কি না।'

কোড়ে প্রায় চিৎকার করে ডেকে উঠল, 'প্যাল্‌গা! প্যাল্‌গা, এই প্যাল্‌গা!'...

প্যাল্‌গা যেমন ছিল, তেমনি পড়ে রইল। এখন দেখা গেল, ওর কানের ভিতর থেকে গালের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা রক্ত চুঁইয়ে পড়ল। বগ্‌গি বলল, 'মরেই গেছে মনে হচ্ছে।'

ইতিমধ্যে লুকা চেনো রাম সরে পড়েছিল। একটু পরেই দেখা গেল, পাড়ার মেয়ে পুরুষরা কেউ কেউ চাতালে এসে উঁকি মেরে দেখে যাচ্ছে। একজন এগিয়ে এলো। পাতলুন আর শার্ট পরা, চোখ টকটকে লাল, ষণ্ডামার্কা। সবাই জানে, ওর নাম 'টাড়ু'। মদ চোলাই, জুয়া আর বেশ্যাপাড়ার সব থেকে বড় মস্তান। হাতে লোহার বালা, গলায় সোনার হার। চুরি-ডাকাতি, ছিনতাইয়ের মধ্যে থাকে না। পাড়ার সবাই ভয় পায়। সে এ পাড়ার যম। টাড়ু এসে চাতালে দাঁড়াল, দেখল, তারপরে আস্তে আস্তেই বলল, 'এ তল্লাট থেকে নিয়ে চলে যা। তোল।'

লুকা চেনো রাম টাড়ুর পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল। তাছাড়া টাড়ুর সাঙ্গপাঙ্গরা তো ছিলই। একমাত্র কোড়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় নিয়ে যাব? এখন তো ডাক্তার পাওয়া যাবে না।'

'আর ডাক্তার দেখাতে হবে না।' টাড়ু মেজাজ না দেখিয়েই বলল, 'রাস্তার ওপরে নিয়ে যা। এখান থেকে ঝামেলা হটিয়ে ফ্যাল।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি নিজেদের মধ্যে একবার চোখাচোখি করল। জানতো এর ওপরে কথা চলবে না। ইচ্ছা করলে ওরা দৌড়ে পালাতে পারে। কিন্তু প্যাল্‌গাকে ফেলে পালাবার মতলব ওদের ছিল না। প্যাল্‌গাকে সবাই তুলে, হাত-পা ধরে ঝুলিয়ে বাজারের রাস্তার সামনে এসে দাঁড়াল। শুইয়ে দিল রাস্তার ধারে। লুকা, চেনো রাম অবিশ্যি পিছনে পিছনেই এল, রইল কিছু দূরে। বিকাল হতে না হতেই রাস্তায় ভিড় জমতে আরম্ভ করল। তারপরে এল একজন লাঠিধারী সেপাই। সেপাই এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

ওরা সবাইকে যা জবাব দিয়েছে, সেপাইকেও তাই বলল, 'কদম সা মেরেছে।'

সেপাই ডাণ্ডা তুলে বলল, 'বাজে কথা বলিস না। কদমবাবুর খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই। চল থানায় নিয়ে চল। রাস্তায় ভিড় করা চলবে না।'

চটা, টোনা, বগ্‌গি আর কোড়ে প্যাল্‌গাকে বয়ে নিয়ে গেল থানায়। সঙ্গে সেপাই। তার পিছনে লুকা, রাম, চেনো ছাড়াও আরও কিছু ওদেরই মত ছেলের দল। দারোগা বাবু সব শুনলেন, দেখলেন। সেপাইকে কি বললেন। সে ছুটে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ কদম সা প্রায় দশ-বারোজন লোক নিয়ে থানায় এল। আর থানার উঠোনের অন্ধকারে, প্যাল্‌গার মড়া নিয়ে ঘিরে বসে রইল ওর সঙ্গীরা। ঘরের ভিতরের কথা ওরা কিছুই জানতে বা শুনতে পেল না।

এক সময় কদম সা সদলবলে থানা থেকে বেরিয়ে চলে গেল। সেই সেপাইটা এসে চটাদের বলল, 'মড়া তোল। আজ নিয়ে গিয়ে রেলগুদামের ধারে রাখ, কাল সকালে আমি যাব। বৃষ্টি হলে গুদামের চালার নিচে থাকবি।'

চটারা ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না। থানায় কোন কথা বলতেও শাহস হল না। প্যাল্‌গার মড়া বয়ে নিয়ে চলে গেল রেলগুদামের ধারে, লাইনের পাশে খোলা জায়গায়। লুকা, চেনো, রামও দূরে এসে দাঁড়াল। খোলা জায়গাটা থেকে দূরে একটা মাত্র আলো। সেই আলোয় চটারা যে যার সকালের পয়সা বের করে হিসাব করল। টোনা শহরে চলে গেল পয়সা নিয়ে। হোটেলের দরজায় দরজায় ঘুরে যা পাওয়া গেল, বাসি-বাড়ন্ত সারাদিনের ভ্যাপসা নষ্ট খাবার নিয়ে এল। প্যাল্‌গার মড়া ঘিরে বসে গেল। রাস্তার ধারেই টিউবওয়েল। জল খেয়ে যে যার কোমরের কষি থেকে সিগারেটের পোড়া টুকরো বের করে, ধরিয়ে টানল।

বগ্‌গি বলল, 'প্যাল্‌গাকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতে হবে, নইলে কুকুরে টেনে নিয়ে যাবে।'

ওরা সবই জানে। বিশেষ করে ভবঘুরে বগ্‌গি। কিন্তু সেপাইটা প্যাল্‌গাকে এখানে নিয়ে আসতে বলল কেন? থানায় কদম সার দল এসে কি করল? কি কথা হল? থানার দারোগাবাবু কি বললেন? শুভদিনের আগের মেঘলা রাত্রে, ওদের জিজ্ঞাসার জবাব দেবার কেউ ছিল না। বাতাসহীন গুমোটে জিজ্ঞাসাগুলো ওদেরই ঘিরে ভাসতে লাগল। কেবল দেখা গেল, লুকা, চেনো, রাম আস্তে আস্তে বন্ধুদের কাছে এগিয়ে এল, আর প্যাল্‌গাকে ঘিরে সকলে একসঙ্গে দলা পাকিয়ে শুয়ে রইল। বগ্‌গি মিথ্যা বলে নি। কয়েকটা কুকুর সারা রাত্রিই ওদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করল।

রাত্রে চটা আর বগ্‌গি ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল। মেঘলা সকালে সবাই থানার সেপাইয়ের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তোড়ে বৃষ্টি ঝরছে না, কিন্তু ঝিপঝিপ ঝরছেই। কিন্তু প্যাল্‌গার মড়া আগলানো বন্ধুদের এ বৃষ্টিতে কিছু যায় আসে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কেন অপেক্ষা করছে, কি করতে হবে, কিছুই জানে না। এদিকে ঝিপঝিপ বৃষ্টি শহরের মেঘলা আকাশে, একটা একটা করে মাইকের গান বাজতে শুরু করেছে। বাদলা দিনেও শহরটা ক্রমেই যেন খুশি আর ব্যস্ততায় মেতে উঠছে। কেন? আজ কি? চটারা কিছুই জানে না। ওরা সেপাইয়ের অপেক্ষা করছে। কিছু কিছু ভিখিরি ভবঘুরে এসে ভিড় জমাচ্ছে। আর নানা রকম কথা বলছে। চটাদের মত আরও যে সব ছেলেরা শহরে ঘুরে বেড়ায়, ওরাও আসছে। কেবল প্যাল্‌গা ফরসার গায়ে হাত রেখে, কোড়েটা মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। কাঁদতে বারণ করলেই, দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, 'কদম সার ভুঁড়িটা শালা কামড়ে খেয়ে দেব।'...

অবশেষে সেপাইটি এল। সে একলা না, সঙ্গে আর একজন, মাথায় ঢাকা রিক্‌শায় চেপে। গত দিনের সেপাইটি রিক্‌শা থেকে নেমেই একটা গালাগাল দিল, 'কুত্তার বাচ্চাগুলোকে নিয়ে আর পারা যায় না।'...তারপরে চারদিকের ভিড়ে একবার শাসানো নজর বুলিয়ে চটাকে হাত তুলে ডাকল, 'এই ছোঁড়া, এদিকে আয়।'

চটা উঠে তার কাছে গেল। সেপাই একটু সরে গিয়ে বলল, 'ওই মড়াটাকে পোড়াতে হবে, বুঝলি? পোড়াবার খরচ আমি দেব, কিন্তু তোদের হাতে তো টাকা দেব না, মেরে দিয়ে কেটে পড়বি। একটা বাঁশ-টাঁশে ঝুলিয়ে মড়াটাকে নিয়ে শ্মশানে যা, আমি সেখানে থাকব। পোড়াবার কাঠ কিনে দিয়ে, ডোমের খরচা দিয়ে চলে আসব। বুঝলি?'

চটা ঘাড় কাত করে জানালে, বুঝেছে। সেপাইটি আর কোন কথা না বলে, রিক্শায় চেপে চলে গেল। তার পরে চটার মুখ থেকে খবরটা শুনে সবাই হৈ হৈ করে উঠল। জীবনে এ রকম একটা ঘটনার কথা ওরা ভাবতেই পারে নি। শ্মশানে পোড়াতে নিয়ে যাবার কথা শুনে, সকলেই কেমন খুশি আর ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা বাঁশ যোগাড়ের অসুবিধা হল না। বাঁধা ছাঁদা হয়ে গেল। তারপর কাঁধে ঝুলিয়ে যাত্রা। কে যেন প্রথমে বলে উঠল, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা, দে হরিবোল!'...

ঝরুক ঝিপ ঝিপ বৃষ্টি, তবু আজ উৎসব। প্যাল্‌গা ফরসার শববাহীদের দলটা বাড়তে বাড়তে একটা বড় মিছিলের মত হয়ে উঠেছে। শহরের লোকেরা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চাগুলোর নতুন সঙ দেখে খুব মজা পাচ্ছিল। কিন্তু একটা সিনেমা হলের সামনে যেতেই, কয়েকজন নানা বয়সের বাবু ছুটে এসে হাঁকল, 'এই চুপ! এখানে তোরা ও সব হাঁক ডাক বাচলামো করবি না। মুখ বুজে চলে যা। এগিয়ে গিয়ে যত খুশি হরিবোল দে।'

প্যাল্‌গার শববাহী বন্ধুরা, আরও অনেকে চুপ করে গেল, আর নিঃশব্দে সিনেমা হলটা পেরিয়ে গেল। দেখল, হলের সামনে কয়েকটা গাঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে। একপাশে একটা পুলিস ভ্যান। আশেপাশে বাবু, মা আর খোকা খুকুদের ভিড়। হলের মধ্যে ঢোকবার জন্যে আঁকুপাঁকু করছে। শুধু হলের মাথায় লাল কাপড়ের ওপর সোনালী অক্ষরের লেখাগুলো ওরা পড়তে পারল না। সেখানে লেখা ছিল,

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ, ১৯৭৯!
'শিশুরাই জাতির ভবিষ্যৎ'
'সুখী ও সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠুক ওদের জীবন'

প্যাল্‌গা ফরসার শবযাত্রীরা সিনেমা হলটা পেরিয়ে আবার হাঁক দিল, 'মরেছে প্যাল্‌গা ফরসা...।' কেবল কোড়েটাই কাঁদছে, আর দুধের দাঁতগুলো চিবিয়ে বলছে, 'কদম সার ভুঁড়ির মাংস একদিন কামড়ে ছিঁড়ে খাব।'...

শুভ্রা-সন্ধ্যা সংবাদ

শুভ্রার কথা

আর কত দিন এভাবে চালাতে পারব, বুঝতে পারছি না। এত বড় সংসারটা বাবার একলার ঘাড়ের ওপর। চটকলের কেরানী, সামান্য বেতন। আমরা ছ'টি ভাই বোন। আমিই সকলের থেকে বড়। আমার পরে এক বোন। তারপরে পর পর দুই ভাই। সকলের ছোট দুটিও বোন।

আমি কোন রকমে বি. এ. পাস করেছি। অনার্স ছিল—ইংরেজিতে। রাখতে পারি নি। পাস কোর্সেই পাস করেছি। কোন প্রফেসারের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পাই নি। কলেজের মাইনে দেওয়াই কঠিন ছিল। প্রাইভেট পড়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। আমার সহপাঠী সহপাঠিনীদের নোট দেখে, একলা পড়ে যতটা সম্ভব নিজেকে তৈরি করেছিলাম। স্বীকার করতেই হবে, আমার এতটা গুণ ছিল না, বন্ধুদের নোট দেখে, একলা পড়ে অনার্স পাস করি। অথচ অনেকেরই আশা ছিল, আমি নিশ্চয়ই অনার্স রাখতে পারব।

আশার আর এক নাম বোধ হয় মরীচিকা। জীবনে আশা তো আমিও কম করি নি। অবিশ্যিই সে সব ছেলেবেলার জীবনে। তখন পুরনো নারকেল কাঠির ঝাঁটার মত সংসারটা ছড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে নি। বাবা মায়ের শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ছিল, হাসি ছিল দুজনের মুখে। মনে হয় তখন বাবা মায়ের চোখেও একটা সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল। বাবা বলতেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের আমি আলাদা করে দেখব না। সবাইকে সমান ভাবে শিক্ষা দেব। দিয়েছিলেনও তাই। তবু, কিছুতেই নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সবদিকে তাল বজায় রেখে গড়ে তুলতে পারেন নি।

বাবাকে সেজন্য কখনই দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেব এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্রব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেব আমাদের সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এই সব ব্যবস্থাই গরীবকে আরও গরীব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরও বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল, জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পরে, আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার বাবা এই ব্যবস্থারই শিকার। চটকলে বিস্তর চুরির সুযোগ নাকি আছে। তার প্রমাণও পেয়েছি। আমার বাবারই সহকর্মীদের কারো কারোকে যখন দেখি, বাড়ি ঘর-দোর করে বেশ ভালই আছে। আমার বাবার চুরির যোগ্যতা ছিল না। উন্নতির একমাত্র সোপান ছিল বাৎসরিক ইনক্রিমেন্ট, তাও বছরে দশ টাকার বেশি না। অতএব, বাবা মায়ের স্বাস্থ্যের দীপ্তি আর মুখের হাসি নিভে যেতে খুব বেশি কাল সময় লাগে নি। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে, আমি সে-সব খুব ভাল করেই দেখেছি আর জেনেছি। এক হিসাবে বলতে গেলে, আমি আমার মায়ের থেকে কত বছরেরই বা ছোট। সতেরো আঠারোর বেশি না। ফলে আমি বাবা মায়ের এক-রকম বন্ধু আর সমব্যথী।

আমি জানি, আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে, আমার বাবা মা, আমাদের ভাইবোনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। এ বিষয়ে আমি কখনও তাঁদের সমালোচনা করতে পারব না, সে-অধিকারও আমার নেই। তবে আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এ বিষয়ে বাবা মায়ের কোথাও একটা অসহায়তা ছিল। এখন অবিশ্যি বাবা ভ্যাসেকটমি করিয়েছেন। নইলে হয়ত আমাদের আরও কিছু ভাইবোনের জন্ম হত।

আমার বাবা এ অবস্থাতেও, কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে, আমাদের সব ভাই-বোনকেই লেখাপড়া শিখিয়ে যাচ্ছেন। এতে আমার মায়ের অবদান কোন অংশেই কম নয়। খিদের সময়ে মাকেই তো সকলের পাতে খাবার বেড়ে দিতে হয়। এখনও আমাদের কারোকেই মা উপোস করিয়ে রাখেন নি। আমাদের সংসারে অশান্তি যা, তা কেবল আমার ভাই দুটিকে নিয়ে। বিশেষ করে বড়টিকে নিয়ে। ওর বয়স এখন উনিশ চলছে। ওর চালচলন, ভাব ভাষা, মেলামেশার সঙ্গীসাথী, কোন কিছুকেই ভাল বলা চলে না। ওর ভঙ্গিও বেশ দুর্বিনীত। ও এই বয়সে পার্ট ওয়ান দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে একবার ফেল করেছিল। সেই হিসেবে আমার পরের বোন পার্ট টু দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইউনিভারসিটি আর কলেজগুলো জীবনে কত বড় অভিশাপ হয়ে উঠেছে, সে-কথা কারোরই অজানা নেই।

আমার এখন বাইশ চলছে। আমি সকাল সন্ধ্যায় দুটি টুইশানি করি। মাত্র দু সপ্তাহ হল, টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখেছি। তিন মাসের কোর্স। টাইপ-রাইটিং শিখছি কয়েক মাস। স্পীড খারাপ তুলি নি। সঙ্গে শর্টহ্যান্ডও শিখছি। কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে, আমাদের উপকণ্ঠেও আজকাল নানা রকম কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপকণ্ঠ থেকে কলকাতায় শেখাটাই আমি বেছে নিয়েছি। টেলিফোনের কোর্সটা তো কলকাতার বাইরে থেকে কোন রকমেই সম্ভব না। টুইশানির টাকা থেকেই, কলকাতার মান্থলি টিকিট আর চায়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার সাকুল্যে পঁয়ত্রিশ টাকা উপার্জনের থেকে, মাঝে মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা মাকেও দিয়ে থাকি।

আমার খুব হাসি পায়, দুঃখও হয়, যখন বাবা আমার আর আমার ছোট বোন শিপ্রার বিয়ের কথা বলেন। বাবার কথাগুলো এই রকম ঃ 'আমার মেয়ে দুটি তো দেখতে খারাপ না। রঙ ফরসা, চোখ মুখ ভাল, শাকপাতা খেয়েও শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে ভগবান কিছু কিঞ্চিৎ রূপও দিয়েছেন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, পাড়ায় এ রকম মেয়ে আর ক'টি আছে? তবু এত যে চেষ্টা-চরিত্তির করছি, কেউ ফিরেও তাকায় না। সবারই নজর মেয়ের বাপের ট্যাঁকের দিকে। এদিকে মুখে সব বড় বড় কথা।'

বাবার কথাগুলো সর্বাংশে মিথ্যা না। অবিশ্যি নিজের কথা বলছি না। তবে হ্যাঁ, শাকপাতা খেয়েও, একেবারে হাড় জিরজিরে নির্জীব হয়ে পড়ি নি। এটা বয়সেরই ধর্ম কি না জানি না, নিজেরই এক এক সময় মনে হয়, শরীরটা যেন বড় বেশ চোখে পড়ার মত। আসলে এটা বাবা-মায়ের রক্ত মাংসের থেকে পাওয়া, তাই কুড়িতেই বুড়িয়ে যাই নি। আমার ছোট বোন শিপ্রার স্বাস্থ্য তো রীতিমত উদ্ধত। কিন্তু চাকুরিজীবি অবিবাহিত ভদ্রলোকের ছেলেদের ব্যাপারটা সত্যি লজ্জাজনক। এই সব মধ্যবিত্ত তরুণরা বড়-বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ায় বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে পারে না। সেইদিক থেকে আমাদের পাড়ার দিবাকর ছেলেটা অনেক ভাল।

না, দিবাকরের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, তবে দুর্বলতা বোধ হয় উভয় পক্ষেরই আছে। দিবাকর লেখাপড়ায়ও ভাল। কিন্তু বেকারির অভিশাপ ওর গলায়ও ফাঁস পরিয়ে রেখেছে। ওর একটা চাকরি হয়ে গেলে, আমার জীবনে কি ঘটতে পারে, কে জানে। তবে এ সব আমি মনে আসতে দিই না। আশা যে মরীচিকা, তা ভালই জানি। পাড়ার বাকি ছেলেদের 'হিড়িক' কিছু শুনতেই হয়। ও সব নষ্টবুদ্ধি নিরূপণ ছেলেগুলোর বাঁদরামী এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে।

আমি সপ্তাহে পাঁচদিন, শনি রবি বাদে, খেয়ে-দেয়ে গড়ে এগারোটার গাড়িতে কলকাতা যাই। তার আগে সকালে একটি ক্লাস সিক্সের মেয়েকে পড়াই। সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে ক্লাস এইটের একটি মেয়েকে পড়াই। ট্রেনে আমি মেয়েদের নির্দিষ্ট কামরাতে যাতায়াত করি। বসবার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে যাই। প্রায়ই তা ঘটে। পুরুষদের কামরা সম্পর্কে আমার কোন কুসংস্কার নেই বা ছুঁৎমার্গিতাও আদৌ নেই। তবে মেয়েদের কামরায় আমি অনেকখানি স্বস্তিবোধ করি। যদিও মেয়েদের কামরাটা কিছু স্বর্গ না, সেখানেও অনেক জটিলতা কুটিলতা নীচতা দেখা যায়। জায়গা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি তো সামান্য কথা। এর ওকে নানা রকম ঠেস মারা কথা, ব্যঙ্গ, বিদ্রুপ, আর মেয়েদের বিষয়েই নিন্দাচর্চার কোন কিছু কমতি নেই। অনেক সময় এমন কথাও কানে আসে, মনে হয় কানে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। লজ্জায় মুখ তুলে তাকানো যায় না।

যাই হোক, এ সব নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে কিছু দিন ধরেই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছিল। নামটা আমি পরে জানতে পেরেছি। আমার ঠিক পরের স্টেশন থেকেই সে ওঠে। চালচলনে, সাজগোজে সে খুব স্মার্ট। মেয়ে হয়ে বলতে সংকোচ হয়, তার যেন রূপের থেকে প্রসাধনই বেশি। সেই সঙ্গে শাড়ি জামা স্যান্ডেল, ঝুটো পাথরের সাঁট মেলানো হার বালা কানের ফুল, আর রকমারি ব্যাগ, চোখের সানগ্লাস, সব মিলিয়ে মেয়েটি নজর কাড়ার মতই।

মেয়েটিকে আমি কলকাতায় যাবার প্রথম দিন থেকেই দেখেছি। একই গাড়িতে সে যায়, আর মেয়েদের কামরাতেই। দেখেছি, সে কামরায় উঠলেই, কিছু মেয়ে নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারা, ঠোঁট মুচকে হেসে নানা রকম ভঙ্গি করে। কিন্তু সন্ধ্যা নামে মেয়েটির যেন কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে কামরায় ঢোকে, আশেপাশে তাকিয়ে যদি জায়গা দেখতে পায়, বসে, তা নইলে দাঁড়িয়েই থাকে। ব্যাগ খুলে, রোজই কোন না কোন ইংরেজি পকেট বই পড়ে।

মেয়েটির সাজের উগ্রতা আছে বটে, তবে ওর স্মার্টনেস, বিশেষ করে অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করা, আমার খারাপ লাগে না। একদিন, আমি দরজা থেকে, সীটের কাছে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যা আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ একজন মোটাসোটা মহিলা মাঝের একটা স্টেশনে নেমে যেতেই সন্ধ্যা ঝটিতি বসে পড়েছিল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে কি মনে হতে, একটু সরে গিয়ে হেসে বলেছিল, 'বসুন না। আমাদের দুজনের হয়ে যাবে।'

আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা বারে-বারে অনুরোধ করাতে, আমি বসেছিলাম। কথায়-কথায় নাম ধাম জানা হয়ে গিয়েছিল। ওর নাম সন্ধ্যা তরফদার। আমার পরের স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি হলেও, পড়াশোনা করেছে কলকাতার কলেজে। বুঝেছিলাম, সেইজন্যই ওর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি। তা না হলে, পনেরো বিশ মাইলের মধ্যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আমাদের কলেজেই পড়ে। সেই হিসাবে পরিচয় হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সন্ধ্যার সঙ্গে আমার মোটামুটি আলাপ হয়ে গিয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, ও একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। মোটামুটি আলাপটাকে সন্ধ্যা নিজেই যেন একটু তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় করে তুলতে চাইল। কথায়-কথায় এমন আশ্বাসও দিল, ও ওদের অফিসে আমার একটা চাকরির চেষ্টা করবে। যার মাইনে শুরুতেই, চার পাঁচশোর কম না। এ রকম একটা অফার তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাবার মত। সত্যি কি এমন ভাগ্য আমার হবে?

সন্ধ্যার সঙ্গে ট্রেনে মেলামেশার ফলে, লক্ষ্য করেছি, আমার দিকেও যেন কোন-কোন মেয়ে একটু বাঁকা চোখে তাকায়। সন্ধ্যাকেও সে-কথা বলেছি। সন্ধ্যা বলে, 'এরা সব নীচ। ওদের কোন কিছুর দিকে মন দেবে না। তুমি একটু সাজলে

গুজলে, বা দুটো মেয়ের সঙ্গে কথা বললেই, ওরা তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবে নেবেই। আমি তো ওদের দিকে ফিরেও তাকাই না।'

সেটা মিথ্যা কথা নয়, নিজেই অনেক দিন দেখেছি। তবে সন্ধ্যাকে আমার কেমন যেন মনে হয়, সর্বদাই জ্বলছে, ফুঁসছে, দুর্বিনীত কথাবার্তা। ওর এই ব্যাপারে আমি একটু অস্বস্তিবোধ করি। আবার ভাবি, হয়তো ওর জীবনেও অনেক জ্বালা-যন্ত্রণা আছে। ওর মুখে শুনেছি, আমার মতই ওর অনেকগুলো ভাইবোন। ওর ওপরে দুই দাদাও আছে। বাবা রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। উপার্জন যা করার, সন্ধ্যা আর ওর এক দাদাই করে।

অবিশ্যি, এ সব ভেবেও আমি কি বা করতে পারি। সন্ধ্যার দৌলতে যদি আমার একটা চাকরি হয়ে যায়, তবে ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

সন্ধ্যার কথা

বাড়িটার কথা ভাবলে, থাকতে ইচ্ছা করে না। একবার বাড়ি থেকে বেরোলে, সেখানে আর ফিরতেও ইচ্ছা করে না। বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হয় না, যেন একটা নরক। অথচ, যা-ই করি, যেখানেই যাই, বাড়িতে ফেরা ছাড়া জায়গাও নেই। কোন রকমে যা-ও বা টিকে আছি, বাইরে থাকলে পশুরা আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। তবু বাবা মা ভাইবোন, সংসার, এই সব পরিচয়ের একটা আবরণ আছে। এই আবরণটাই এখন আমাকে বাইরের হিংস্র থাবা থেকে আড়াল করে ফেলেছে।

অথচ বাড়ির চেহারাটাই বা কি? লোকের কাছে বলি বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। আসলে বাবাকে আমি কোন কালে কিছু করতেই দেখি নি। অন্তত লোকে যাকে 'কাজ' বলে, সে-রকম কিছুই করতে দেখি নি। ভদ্রলোক জীবনে একটি কাজই কোন রকমে করতে পেরেছেন। দেশ বিভাগের পরে কোন রকমে কিছু জমি দখল করে, টালির চালের একটা কাঁচা বাড়ি করতে পেরেছেন। বাকি জীবনের সবটাই উঞ্ছবৃত্তি, আর প্রতি বছর একটি করে সন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছেন। কলসী থেকে জল উপছে পড়ার মত, আমাদের ভাই-বোনগুলোর অবস্থা! কি করে যে আমরা বেঁচে থাকলাম, এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। ছেলেবেলাতেই আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাবার কথা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরে নাকি আমার জন্ম। আমাকে কয়েক মাসের কোলে নিয়ে, দুই দাদাসহ বাবা মা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার একজন ঠাকুরমাও নাকি ছিলেন। তিনি এ দেশের জল হাওয়ায় বেশি দিন বাঁচেন নি। মরে বেঁচেছিলেন। সে-সব অবিশ্যি আমার কিছুই মনে নেই। সবই বাবা মায়ের কাছে শোনা কথা।

বাবা চাকরি না করুন, ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি, ভদ্রলোক রীতিমত ডাকাবুকো। অনেকটা দস্যু রত্নাকরের মতই, আশেপাশে ত্রাস সঞ্চার করে, যেখান

থেকে যখন যা পেয়েছেন, তাই সংগ্রহ করে এনে সংসার চালিয়েছেন। কিন্তু বাল্মীকি হবার কোন লক্ষণই তাঁর চরিত্রে নেই। রাজনীতি দলাদলি বরাবর করে এসেছেন, এখনও করেন। ওটা একটা মুখোশ ছাড়া, আমার আর কিছুই মনে হয় নি। বরাবরই শুনে আসছি, আমার বাবা নগেন তরফদার একজন ডাকাত বিশেষ।

একদিক থেকে ভাবলে, বাবাকে দোষ দিতে পারি না। বাবা তো আর নিজে দেশ বিভাগ করতে যান নি। অথচ রাতারাতি আমাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছিল। শুনেছি, সেখানেও আমাদের সোনার মঠ ছিল না। তবু যা হোক খেয়ে পরে চলে যেতো। এখানে এসে বাবার কিছুই করার ছিল না। ডাকাবুকো যাই যা হতেন, আমাদের বাঁচাতে পারতেন না, নিজেও বাঁচতেন না। মাকেও মরতে হত।

কিন্তু তিনি নিজে যা-ই করুন, আমাদের জন্য কি করেছেন? কেবল উঞ্ছবৃত্তি করে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই কি শেষ কথা? নিজের অবস্থা বুঝে, জন্ম-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটাও করতে পারতেন। আমাদের ভালভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারতেন।

আমার ভাই বোনের সংখ্যা আট। নেহাত মায়ের আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। তা না হলে বোধ হয় এখনও গুচ্ছের ভাইবোন প্রতি বছরই জন্মাতো। বাবা যদি বা কোন রকমে আমাদের উদরপূর্তি করে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, লেখাপড়া শেখাবার কোন চেষ্টাই ছিল না। বাবা যে-ভাবে দিন যাপন করতেন, সেই জীবনে সুস্থভাবে পরিবার গড়ে তোলার কথা চিন্তায় আসা সম্ভব না। নেহাত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে বলে পরিচয় দিতে হবে, তাই রিফিউজি ফ্রি ইস্কুলে অল্পসল্প লেখাপড়া শিখেছিলাম।

বাবার এখন বয়স হয়েছে। তাঁর জায়গা দখল করেছে আমার দুই দাদা। সমাজবিরোধী বলতে যা বোঝায়, ওরা তাই হয়ে উঠেছে। অথচ ওরা দুজন, আমাদের বাকি ছ' ভাইবোনের থেকে লেখাপড়া কিছু বেশিই শিখেছিল। তার পরিণাম যে এই হবে, তা বোধ হয় বাবাও ভাবেন নি। এখন তো বাবার সঙ্গেই দুই দাদার সব সময়ে খিটিমিটি ঝগড়াবিবাদ লেগেই আছে। বাবা আর দাদাদের কথাবার্তা এত খারাপ, নোংরা, বাবার ছেলে বলে মনে হয় না।

রাজনীতি আর সমাজবিরোধিতা এক কিনা, জানি না। আমার বাবাকেও দেখেছি, এখন দাদাদেরও দেখছি। দাদারা রাজনীতি করে, আবার ওয়াগন ভাঙে। দলাদলি মারামারি লেগেই আছে। আর তার ধাক্কা বাড়িতেও এসে পড়ে।

এ অবস্থায় বাড়ির আবহাওয়া যেমন হতে হয়, তাই হয়েছে। আমরা অন্যান্য ভাইবোনেরাও দাদাদেরই সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকেই জেনেছি, জীবনে এ সব করেই বাঁচতে হয়। আর মেয়ে হিসাবে সুস্থ রুচিশীল জীবনধারণ? বারো বছর বয়স না পেরোতেই, দাদার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যে-খেলা খেলেছে, তারপরে আর সুস্থ জীবনের কথা চিন্তাই করা যায় না। মা যেন সে-সব চোখে দেখেও দেখতেন না।

কিন্তু বাবা রেগে যেতেন। রেগে গেলেও বাবার কিছু করার ছিল না। দাদারা আর তাদের বন্ধুরা বাবাকে রীতিমত চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে দেখছিলাম, আমি একলা না, একদল মেয়েকে নিয়ে, দাদারা আর ওদের বন্ধুরা নরক গুলজার করে তুলেছিল। আমিও আস্তে-আস্তে ও-সবেই ভাল অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কি, একটু আধটু মদ সিগারেট খাওয়াটা খুবই সহজ বলে মনে হত। কেবল আমার বয়সী না, আমার থেকে বয়সে বড় মেয়েরাও, আমাদের বেশ ভাল ভাবে হাতেখড়ি দিয়েছিল।

বাড়িতে তো পেট ভরে খাওয়া জুটত না। জুটলেও, ভাতের পাতে বড় জোর উসুনি জলের মত দু হাতা ডাল। খেতে হয় খাও, নয় তো পথ দ্যাখ। সেই তুলনায়, দাদার বন্ধুরা ভাল ভাল খাবার খাওয়াত, ভাল শাড়ি জামা জুটত। হাতে কিছু নগদও আসত। মা আবার তা থেকে ভাগ বসাতে আসত। না দিলেই, নোংরা গালাগালি।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন ষোল বছর বয়সে, প্রায় আধবুড়ি বাণীদি নামে একজনের সঙ্গে প্রথম কলকাতায় যাই খালিকুঠি বেশ্যালয়ে। বড়লোক লম্পট, মাতাল, মদের এত ঢেলখেল, মেয়েদের ভিড়, আগে আর কখনও দেখি নি। প্রথম দিনেই রোজগার করেছিলাম একশো টাকা, মাত্র দুটো লোকের কাছ থেকে। বাণীদি আর দালালের পাওনা আলাদা ছিল।

এইভাবেই শুরু। তারপরে এই ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে অনেক দেখলাম। অভিজ্ঞতাও কিছু কম হয় নি। তবে উত্তর কলকাতার নাম-করা পাড়ায় যাই না। রাস্তায় রাস্তায়ও ঘুরে বেড়াই না। আমার ব্যবসাটা একটু স্বতন্ত্র। যে-কারণে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমি চাকরি করি। তা এক রকমের চাকরিই তো। বেলা বারোটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ। মাসে হাজার বারোশো টাকা অনায়াসেই রোজগার হয়। এখন দাদারাও আমার টাকায় ভাগ বসাতে চায়। বাবা মায়ের তো কথাই নেই। আমার দেখাদেখি, আমার ছোট বোন দুটোও এদিকেই পা বাড়িয়েছে। নিয়মই তাই। একবার চৌকাঠের বাইরে পা দিলে, এ পথ থেকে আর সহজে ফেরা যায় না।

এখন আমিও মাঝে মধ্যে দু-চারটে মেয়েকে আমার পথে টেনে আনি। এতেও লাভ কিছু কম নেই। সম্প্রতি শুভ্রা নামে যে-মেয়েটির সঙ্গে ট্রেনে আমার পরিচয় হয়েছে, ভাবছি ওকেও টোপ দেবো। মেয়েটার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি, গরীব, বাড়িতে অভাব। মেয়েটা অবিশ্যি ভাল। নানাভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একবার আমার জীবনের স্বাদ পেলে, টাকা আর আরাম পেলে, এ সব ভুলে যাবে। তবে মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, একটু সাবধানে এগোতে হবে। মেয়েটার চেহারাটি বেশ মিষ্টি, চোখে পড়বার মত। একবার হাত করতে পারলে, কাজ ভালই দেবে।

শুভ্রার কথা

সন্ধ্যার সঙ্গে ইদানিং আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও প্রায়ই বিকালে ওর অফিস ছুটির পরে আমার কাছে কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউটে চলে আসে। আমাকে টেনে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টে, খাওয়ায়। আমার ভারি লজ্জা করে। একতরফা ও খাইয়ে যায়, আমি একদিনও খাওয়াতে পারি না। অথচ বাধা দিলেও সন্ধ্যা শুনতে চায় না। বলে, 'তোমার যখন চাকরি হবে, তখন তুমি খাইও, কিছু বলব না।'

কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না। সন্ধ্যাকে খাওয়াবার মত আর্থিক যোগ্যতা আমার নেই। মেয়েটা সত্যি ভারি প্রাণখোলা। আমাকে ভালবেসেই ফেলেছে। মাঝে মাঝে ও কেমন যেন এলোমেলো কথাবার্তা বলে। বাড়ির বিষয়ে, সমাজ পরিবারের বিষয়ে ওর কোন টান নেই। ভাইবোনদের কথা কখনও ওর মুখে শুনি না। একদিন তো ফস করে বলেই বসল, 'ভদ্রলোকের মেয়েদের থেকে যারা শরীর ভাঙিয়ে খায়, তারা অনেক ভাল।'

কথাটা আমার একটুও ভাল লাগে নি। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, 'না ভাই, তোমার এ কথাটা আমি কখনও মানব না।'

সন্ধ্যা হেসে বলেছিল, 'সত্যি সত্যি কি আর বলছি। জ্বালাস জ্বলে বলছি। তা ছাড়া শরীর ভাঙিয়ে বলতে তুমি কি বুঝেছ? খারাপ কিছু? মোটেই আমি তা বলি নি। চাকরি করাটাও তো শরীর ভাঙিয়ে রোজগার করাই, না কি?'

সে কথা হয়তো ঠিক। তবু 'শরীর ভাঙিয়ে' কথাটা যেন মেয়ে হয়ে কানে কেমন লাগে। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্যে' যেন পড়েছিলাম, শ্রমজীবী পুরুষ ও দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কথাটা আমি মেনে নিতে পারি নি।

সন্ধ্যা কয়েকদিন ধরেই ওর এক বউদির বাড়ি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। বালিগঞ্জের দিকে কোথায় নাকি সেই বেলা বউদি থাকেন। মানুষ নাকি খুব ভাল। আমার যাবার ইচ্ছা থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। কারণ সন্ধ্যার সঙ্গে সন্ধ্যার সময়ে বউদির বাড়ি গেলে, ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আমার টুইশানি আছে। বিকেল পাঁচটা বাজলেই আমি কলকাতা থেকে পালাই-পালাই করি।

সন্ধ্যা তবু জেদ করে। শেষ পর্যন্ত একদিন বেলা তিনটের সময় যাওয়া ঠিক হল। সন্ধ্যা ওর অফিস থেকে এসে আমাকে নিয়ে গেল। সেদিনটা আমার শর্টহ্যান্ডের ক্লাসটা করা হল না। গিয়ে দেখলাম, দক্ষিণ কলকাতার বেশ অভিজাত পাড়া, তিনতলায় বেলা বউদি থাকেন। আগেই শুনেছিলাম, বেলা বউদির স্বামী ব্যবসায়ী। গড়িয়াহাটে নাকি কাপড়ের দোকান আছে। তবে তিনি বাড়িতেই বেশিক্ষণ থাকেন। বিশ্বস্ত কর্মচারিরাই ব্যবসা দেখাশোনা করে।

সন্ধ্যার সঙ্গে বউদির দোতলার ফ্ল্যাটে গেলাম। বাইরের বসবার ঘরটি বেশ সুন্দর। শোফা সেট, বইয়ের আলমারি, আরও নানা কিছু দিয়ে সাজানো, পরিষ্কার

পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই, বেলা বউদির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, কেমন একটা গন্ধ পেলাম। বেলা বউদি আমাকে জড়িয়ে ধরতেই গন্ধটা যেন বেশি করে নাকে লাগল। তাঁর চোখ দুটোও যেন লাল ছিল। অথচ তাঁর ঘাড় ছাঁটা চুল, লাল পাড় শাড়ি, চেহারাটি বেশ সুন্দর। একটু বেশি মোটা। তা হলেও হাসি খুশি। কিন্তু গন্ধটা কি মদের ?

সন্ধ্যা আমাকে বউদির কাছে বসিয়ে দিয়েই ভিতরে কোথায় চলে গেল। তার পরেই এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর চোখও রীতিমত লাল আর ঢুলু ঢুলু। এসেই আমাকে দেখে বলে উঠলেন, 'বাঃ, এ যে দেখছি খাসা। ওকে কোথা থেকে যোগাড় করলে বেলা ?'

বেলা বউদি চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'কি যা তা বলছ ? এ আমাদের সন্ধ্যার বন্ধু, বেড়াতে এসেছে।' বলে বউদি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্বামী।'

কিন্তু ভদ্রলোককে আমার একটুও ভাল লাগল না। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে আছেন। এ আবার কি রকম পরিবার। পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বা কোথায় গেল ?

বউদি বললেন, 'বস শুভ্রা। কি খাবে বল। চা না কফি ?'

বললাম, 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যা কোথায় গেল ?'

বউদি বললেন, 'তুমি বস, আমি ডেকে দিচ্ছি। হয়তো কোন মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। তিনতলাটাও আমাদের। সেখানেও যেতে পারে।'

বউদির স্বামীটি ইতিমধ্যে শোফায় এলিয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন। আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বউদি, আপনি যাবেন না।'

বউদি হেসে উঠলেন, 'আরে কোন ভয় নেই। তোমার দাদা অতি ভাল মানুষ। শরীরটা তো ভাল নেই, তাই ও রকম করছেন।'

শরীর খারাপ হলেও কি কেউ ও রকম ভাষায় একটা নতুন মেয়ের সামনে তার প্রশংসা করে ? খাসা, যোগাড় করা, এ সব কথার মানে কি ?···আমার এ সব ভাবনার মধ্যেই সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকল। আমাকে বলল, 'চল, তেতলায় যাই।'

আমি ভাবলাম, সেখানে বউদির ছেলেমেয়েরা আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে তিনতলায় গেলাম। তিনতলার একটি ঘরে একজন যুবক বসে ছিল। তার চোখ লাল, আর সেই গন্ধ। সন্ধ্যা আমাকে আলাপ করিয়ে দিল, 'বউদির ছোট দেওর।'

কিন্তু যুবকটির সামনে টেবিলে মদের বোতল ও গেলাস দেখেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। যুবকটি হেসে আমাকে ডেকে বলল, 'আসুন, বসুন। চলবে ?' বোতল দেখাল।

সন্ধ্যা বলল, 'বীয়র তো, শুভ্রা একটু খাবে।'

আমি মাথা ঝেঁকে ঝেঁকে বললাম, 'না না, এ সব মদ-টদ আমি খাই না। আমি এখুনি চলে যাব।'

সন্ধ্যা হেসে বলল, 'বীয়র আবার মদ নাকি ? ও তো জল।'

যুবকটি বলল, 'আরে এখানে একবার ঢুকলে কি সহজে বেরনো যায় ?'

কথা শুনে, আতঙ্কে আমার বুকটা কেঁপে উঠল। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমি এক নারকীয় ফাঁদে পা দিয়েছি। এই সময়েই সে ঘরে আরও তিন চারটি মেয়ে এলো। সঙ্গে দুজন পুরুষ। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, হাসাহাসি করছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে অসহায় ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বললাম, 'সন্ধ্যা, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে এসেছ ? আমি তো তোমাকে কখনও এ রকম ভাবতে পারি নি।'

সন্ধ্যা বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করবে না।

আমি বললাম, 'সে-সব আমি জানি না। তুমি এখুনি আমাকে এ বাড়ির বাইরে নিয়ে চল।'

সন্ধ্যা বলল, 'আহা, এত তাড়া কিসের ? আমরা দোতলায় যাই।'

আমি সন্ধ্যার সঙ্গে দোতলায় যেতে-যেতে বুঝতে পারলাম, এই হচ্ছে সন্ধ্যার প্রাইভেট ফার্মের চাকরি। কিন্তু সে-কথা আমি ওকে মুখ ফুটে বললাম না। দোতলার বসবার ঘরে এসে দেখলাম, নতুন দুজন লোক ও একটি মেয়ে বসে আছে। বউদি তাদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন। সন্ধ্যার মুখে, আমি তখনই চলে যেতে চাই শুনে বউদি বিশেষ অবাক হলেন না। আলমারি থেকে ব্যাগ বের করে, পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে শুভ্রা, আবার তোমার ইচ্ছে হলে এসো। আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে যাও।'

উপহার। তাও আবার টাকা ? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আমাকে টাকা দেবেন না।'

বউদি বললেন, 'কেন, তোমার টাকার দরকার নেই ? যদ্দুর শুনেছি তোমাদের অবস্থা ভাল নয়।'

আমি বললাম, 'নাই বা হল। তা বলে আপনার টাকা আমি নিতে যাব কেন ?'

আমার কথা শুনে বউদি রাগ করলেন না, হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তোমার যদি কোন দিন দরকার পড়ে, আমার কাছে এসো। ভয় নেই, আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না।'

আমি কোন কথা না বলে, সন্ধ্যার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়িতেই সন্ধ্যাকে বললাম, 'তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারব।'

কি ভাবে কথাটা বললাম জানি না। সন্ধ্যা আর এক পা-ও আমার সঙ্গে আসতে পারল না। আমার তখন দু চোখ ফেটে জল আসছে। সব ঝাপসা, রাস্তা, গাড়ি, আলো, সবই যেন কাঁপছে। কি ভাবে যে স্টেশনে এসে বাড়ি ফিরলাম, নিজেই জানি না। আর এই প্রথম, আমি সন্ধ্যার টুইশানিতে যেতে পারলাম না।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, পরের দিন সকালবেলায় বাবার হঠাৎ শরীর খারাপ করল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হল। ডাক্তার দেখেই, হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। বাবার বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। মিউনিসিপ্যালিটিতে ছুটলাম, যদি অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না। ভোরবেলাতেই একজন রুগী নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছে। অগত্যা বাবাকে সেই সাড়ে এগারোটার গাড়িতেই আমরা চার ভাইবোন হসপিটালে নিয়ে চললুম।

পরের স্টেশন থেকে সন্ধ্যা উঠল। আমি অন্য কামরা থেকে দেখলাম, কিন্তু কোন কথা বললাম না। বাবাকে নিয়ে শিয়ালদায় নেমে, একটা ট্যাক্সি ডেকে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গেলাম। বাবাকে এমারজেন্সিতে ভর্তি করিয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা সেখানে এসে হাজির।

আমি মুখ শক্ত করে অন্য দিকে ফিরে তাকালাম। সন্ধ্যা আমার কাছে এসে বলল, 'শুভ্রা, জানি, এখন তুমি আমাকে ঘেন্না করছ।'

বললাম, 'তা করছি।'

সন্ধ্যা নিচু গলায় ঢোক গিলে বলল, 'করতেই পারো। কিন্তু তোমার বাবার অসুখের কথাটা শুনে না এসে পারলাম না।'

আমি বললাম, 'কোন দরকার ছিল না। আমার বাবার অসুখ, আমরাই দেখব। তোমার কিছুই করবার নেই। তুমি যেতে পারো।'

সন্ধ্যা কালো মুখ করে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, বলল, 'আচ্ছা শুভ্রা, বলতে পারো, অত অভাবে দুঃখে, তুমি কি করে এমন শক্ত থাকলে, আর আমি নর্দমার জলে ভেসে গেলাম?'

আমি অবাক চোখে সন্ধ্যার দিকে তাকালাম। দেখলাম ওর কাজল পরা চোখের কোণে জল। আমি রেগে বলতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বললাম, 'সন্ধ্যা, এ কথার জবাব আমার সত্যি জানা নেই। আমার কাছে জীবনের চেহারাটা অন্য রকম। সুখ আমিও চাই, কিন্তু তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে পারব না।'

সন্ধ্যা কোন রকমে বলল, 'বুঝেছি। চলি ভাই শুভ্রা।'

সন্ধ্যা ভেজা চোখে, মুখ নামিয়ে চলে গেল। উদ্বেগ সত্ত্বেও সন্ধ্যার জন্য আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কথা

জীবনে এ রকম হোঁচট আর কখনও খাই নি। আজ বউদির বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না। বাড়ি ফিরে যাব, কি গঙ্গার ধারে যাব, বুঝতে পারছি না। কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছে। শুভ্রা এত শক্তি কোথা থেকে পেল? অথচ আমাদের মধ্যে সমাজ সংসারে তফাৎ কতটুকু? জানি না, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন কি না। থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি শুভ্রার মত শক্তি দিতে পারো না?

নিষিদ্ধ ছিত্র

'শুয়োরের বাচ্ছা !' কান্ত কুণ্ডুর হুংকার।

'আজ্ঞে।' বৃন্দাবন—বৃন্দা—বেন্দার জবাবের সুরে অনামনস্কতা।

'বান্‌চোত !' কান্ত কুণ্ডুর হুংকারে পূর্ব সম্বোধনের তুলনায় ঝাঁজের মাত্রা তীব্রতর।

'বলেন কত্তা।' বেন্দা ছুটে কাছে এল, পূর্ণ সচেতন স্বর, মুখে কাঁচমাচু ভাব, কপট ভয়। আসবার আগে, স্টেশনারি কাউণ্টারে দাঁড়ানো দশ-এগারো বছরের ছেলেটাকে চোখের ইশারা করল।

কান্ত কুণ্ডু বলল, 'ভেড়ার বাচ্ছা, কানে শুনতে পাস না, না? তিন নম্বরের তাক থেকে মিছরির টিনটা ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুসহুস করে ভাজা তামাকের সিগারেটে টান দিল, মুদিখানার কাউণ্টারের সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা প্রৌঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'লোকে এ সব জানে না। চিনি দিয়ে পায়েস খায়। আরে শীতের সময় পায়েস খেতে হলে নলেন গুড়ের পায়েস খাবে, নয় তো অন্য সময় মিছরি দিয়ে। মিছরি হল ঠাণ্ডা জিনিস। মিছরির পায়েসে পেট ঠাণ্ডা থাকে। আমি রোজ পায়েস খাই, মিছরির পায়েস। হ্যাঁ, আপনার কি চাই? দালদা? নেই।···তুমি কি চাইলে? ভেলি গুড়?'

কান্ত কুণ্ডু ক্যাশ বাক্সের সামনে, শীতলপাটি পাতা গদীতে বসে এক-একজন খরিদ্দারকে জিজ্ঞেস করছে, কর্মচারীদের সওদা মেপে দিতে বলছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কি হল ঈশেন? দেড় কে. জি. মিছরি ওজন করতে কতক্ষণ লাগে? ভেলি গুড় কতটা? পাঁচ কে. জি.? আচ্ছা। এই—এই ভোঁদড়ের বাচ্ছা!'

বেন্দা স্টেশনারি কাউণ্টারে দাঁড়ানো সেই ছেলেটার সঙ্গে তখন কথা বলছিল, 'পটলা? যে পটলা রোজ এখান থেকে চারটে লজেন্স কেনে? ও গোল দিল? ওর পায়ের ডিম খুব শক্ত, না?'

ছেলেটি বলছিল, 'হ্যাঁ, ও রোজ নাকি কচ্ছপের মাংস খায়। আমাকে একটা ছ-পয়সার টফি দে।'

বেন্দা বলছিল, 'দিচ্ছি। আচ্ছা, ইস্কুলের মাঠে বিকেলে রোজ খেলা হয়?' এই জিজ্ঞাসার সময়েই, 'ভোঁদড়ের বাচ্ছা' ডাক শুনে ও জবাব দিল, 'বাবু।'

'গুখেগোর ব্যাটা, এদিকে আয়, ভেলি গুড়ের টিনটা এক নম্বরের তাক থেকে ঈশেনকে দে।' কান্ত কুণ্ডু হুকুম করল।

বেন্দা কাউন্টারের সামনে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারায় দাঁড়াতে বলে মাল ঠাসা তাকের দিকে ছুটে গেল। ওর বয়স বারো। খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা। গায়ে ময়লা থাকলেও, আশ্চর্য রকমের ফরসা, গোরাচাঁদ বললেই হয়। আরও আশ্চর্য, ও মোটেই হাড় জিরজিরে রোগা না। একটু যেন থলথলে নরম শরীর। খোঁচা খোঁচা পাঁশুটে চুল, চোখ দুটো প্রায় গোল। নাকটা বড়ির মত। ময়লা দাঁত বের করে হাসলে, চোখ দুটো বুজে যায়। অথচ দাঁতগুলো সবই নতুন। এক নম্বর তাক থেকে প্রায় কুড়ি কে. জি. ওজনের ভেলি গুড়ের টিনটা দাঁতে দাঁত চেপে তুলল। তুলে ধরতে পারল না, মেঝের ওপর দিয়ে ঠেলে-ঠেলে ঈশেনের কাছে, পাল্লার সামনে রাখল।

ঈশেন বেন্দার পশ্চাদ্দেশে একটি চিমটি কাটল। বেন্দা পাছায় হাত ঘষে, স্টেশনারি কাউন্টারে গিয়ে, টফির বোয়েম থেকে রঙিন কাগজে মোড়া একটা টফি বের করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল। ছেলেটি একটি পাঁচ, আর একটি এক পয়সা বেন্দার হাতে দিল। বলল, 'তুই কলেজের মাঠে খেলা দেখতে আসতে পারিস না?'

বেন্দা বলল, 'ছুটি পাই না।'

ছেলেটা বলল, 'কেন, বেস্পতিবার তো দোকান বন্ধ থাকে।'

বেন্দা বলল, 'বেস্পতিবার কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মা'র কাছে যাই। যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গেলে মা রাগ করে, আর বাবুও প্যাঁদায়।' বলে কান্ত কুণ্ডুকে চোখের ইশারায় দেখাল।

ছেলেটা মোড়ক ছাড়িয়ে টফি মুখে দিয়ে বলল, 'মা'র কাছে তোর যেতে ইচ্ছে করে না কেন?'

বেন্দা মুখ বিকৃত করে বলল, 'মায়ের লোকটাকে আমার ভাল্ লাগে না। আমাকে খুব খাটায়, আর খিস্তি দেয়।'

ছেলেটা অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মায়ের লোকটা কে? তোর বাবা না?'

বেন্দা বলল, 'আমার বাপ তো কবেই পটল তুলেছে। এখন মায়ের একটা লোক আছে। আর মায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। আমার ভাল্ লাগে না। একটা বেস্পতিবার আমি কাট মারব, মেরে খেলা দেখতে যাব।'

ছেলেটা নির্ভেজাল অবুঝ বিস্ময়ে বেন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। বেন্দা আবার বলল, 'আমার খুব খেলতে ইচ্ছা করে। ফুটবল। এয়সা গেদে শট মারতে ইচ্ছা করে যে বল ফাটিয়ে দিই।'

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোন খেলা করিস না?

বেন্দা ঘাড় কাত করে, চোখ ঝলকিয়ে বলল, 'খেলি, রোজ রাত্রে ইঁদুর মারা খেলি।' বলতে-বলতে ওর মুখে কঠিন খুশি ঝলক দিল, 'আমি তো রাত্তিরে দোকানের পেছুকার ঘরে থাকি। ঘর অন্ধকার করে ইঁদুর মারা খেলি। আমি অন্ধকরে দেখতে পাই—'

'এই কুত্তার বাচ্ছা!' কান্ত কুণ্ডুর হুংকার শোনা গেল, 'খইলের বস্তা থেকে ঠোঙায় করে পাঁচ কে. জি. খইল ভরে দে।'

বেন্দা বলল, 'যাই বাবু।' যাবার আগে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারা করে গেল।

কান্ত কুণ্ডু নরম স্বর চড়িয়ে বলল, 'গোপাল, তুমি কি কর, বান্‌চোৎটা খালি গল্প করে।'

স্টেশনারি কাউণ্টারের এক পাশে, প্রৌঢ় স্বাস্থ্যহীন গোপাল একটি টুলে বসে ঝিমুচ্ছিল। সে কান্তর আগের পক্ষের শালা। সে স্টেশনারি বিভাগ দেখাশোনা করে। সে কান্তর কথার কোন জবাব না দিয়ে ছেলেটিকে বলল, 'তোমার কি চাই খোকা?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। গোপাল বলল, 'তা হলে এখন চলে যাও. ও কাকের বাচ্ছাটা খালি গল্প মারে।'

এই সময়ে একজন খরিদ্দার এসে টুথপেস্ট চাইল। ছেলেটা দাঁড়িয়েই থাকল। বেন্দা ঠোঙায় খইল ভরে, ঈশেনের কাছে এগিয়ে দিল। দিয়ে আবার স্টেশনারি কাউণ্টারে এল। গোপাল তখন আলমারি খুলে খরিদ্দারকে টুথপেস্ট দিচ্ছে। ও সব কাজ বেন্দার না। তেল সাবান টুথপেস্ট স্নো পাউডার হিমানী খাতা কাগজ কলম পেনসিল—এ সবে ওর হাত দেবার হুকুম নেই। ও কেবল লজেন্স আর চানাচুর দিতে পারে। আর গোটা দোকানের ফাইফরমাস খাটে। ও সামনে আসতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তোকে কেউ নাম ধরে ডাকে না কেন?'

বেন্দা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, 'তোকে সবাই শুয়োরের বাচ্ছা নয়তো কাকের বাচ্ছা, বলে কেন?

বেন্দা হেসে নিচু স্বরে বলল, 'ওহ্! ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্ছা।'

'বাঁদরের বাচ্ছা।' হঠাৎ আবার কান্ত কুণ্ডুর হুংকার, 'ঠোঙায় 'আড়াইশো সরষে দে।'

'এই যে বাবু।' বেন্দা ছুটে চলে গেল।

কান্ত কুণ্ডুর জমজমাট দোকান। স্টেশনারি, মুদিখানা। পাশেই র‍্যাশন শপ। র‍্যাশন শপের দায়িত্বভার এ পক্ষের শালার ওপর। হিসাবনিকাশ সলাপরামর্শ সব কান্তর সঙ্গেই। কান্ত সব কিছুর মালিক। বেন্দা তার সব থেকে অল্প বয়সের কর্মচারী। খাওয়া-পরা পায়, মাইনে কুড়ি টাকা ওর মা এসে মাসে-মাসে নিয়ে যায়। খেতে যায় কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে। তার আগে রাস্তার কলে চান করে যায়।

কান্তর প্রথম বউ মরেছে। ছেলেপিলে ছিল না। এ পক্ষে বিয়ে করেছে চার বছর। ছেলেপিলে হয় নি। এ বউটার বয়স কম, দেখতে সুন্দরী। নিজের বিধবা মাসিকে পুষে রেখেছে। সে বেন্দাকে বলে বোঁটকা পাঁটা। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ। কান্তর বউ বলে ওল কচু। ওর মুখটা নাকি ওল কচুর মত দেখতে। ওর নিজের মা বলে, খ্যাংরামুখো, যেঁড়ো, ড্যাকরা, মড়া ভাতারের ছাঁ...।' বাদ বাকি উচ্চারণের যোগ্য না। উচ্চারণের যোগ্য না, এমন অনেক বিশেষণ কান্তর আছে।

বেন্দার তাতে কিছু যায় আসে না। ও সবাইকে মনে-মনে ইঁদুর বলে, বা ইঁদুরের বাচ্ছা। কান্তর মাসি-শাশুড়িটা খেতে কম দেয়। তবু ওর কিছু যায় আসে না। জীবনে একটি মাত্র উত্তেজনা নিয়ে ও বেঁচে আছে। একটি মাত্র কারণে। ইঁদুর মারা খেলা। এই খেলার সঙ্গে আছে উত্তেজনাময় বাজী। জুয়ার মত। এক নেংটি ইঁদুরে পাঁচ পয়সা। একটা ধাড়ি ইঁদুরের জন্য দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু দেয়।...

রাত্রি সাড়ে ন'টা। বেন্দা খেয়ে এল। কান্ত কুণ্ডু এ পক্ষের শালার সঙ্গে বসে, হিসাবপত্র শেষ করে, চাবির গোছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দোকানের সামনের দরজা আগেই বন্ধ হয়েছে। দোকানের পিছনে একটি খালি গুদামঘর আছে। বেন্দা রাত্রে সেই ঘরে থাকে। সেই ঘরের পিছনে যাবার একটি দরজা আছে। দরজার বাইরে তিন ফুট চওড়া লম্বা ফালি, তার পশ্চিম সীমান্তে খাটা পায়খানা। ফালি জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপরে তিন প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া। দোকানঘর থেকে গুদামঘরে ঢোকায় একটি মাত্র দরজা। বেন্দাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কান্ত কুণ্ডু চারটে তালায় চাবি দিল। তারপরে বাইরের দরজা, তার ওপরে কোলাপসিবল গেট টেনে, এক ডজন তালা মেরে চলে গেল। ব্যবস্থা সব পাকা।

বেন্দা এখন গুদামঘরে একলা। মোমবাতি আর দেশলাই এক জায়গায় রাখা থাকে। এ ঘরে বিজলিবাতি আছে, তার সুইচ দোকান ঘরে। রাত্রে নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেন্দাকে আলোর প্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালাতে হয়। ও অন্ধকারে এগিয়ে গেল একটা পিপের কাছে। হাত বাড়াল পিপের ওপরে অব্যর্থ জায়গায়। দেশলাই হাতে নিয়ে, কাঠি জ্বালিয়ে, পিপের ওপরে দাঁড় করানো সরু মোমবাতি জ্বালল। দুই বস্তা ভুষির ফাঁক থেকে টেনে বের করল কাঁথা আর তেলচিটে বালিশ। ভুষির বস্তার ওপরে তা পাতল। একটা বার্লির ছোট কৌটো বের করল ছোলার বস্তার আড়াল থেকে। খুলে দেখল তিনটি বিড়ি আছে। একটি বিড়ি নিয়ে, কৌটো যথাস্থানে রেখে, মোমবাতির শিষে বিড়ি ধরাল। তারপর গুদামঘরটার চারিদিকে দেখল।

সরু মোমবাতির আলোয় লম্বা ফালিতে গুদামঘরের সবটা দেখা যায় না। বাঁক আলোর গায়ে বস্তা টিন পিপে, নানা কিছুর ফাঁকে-ফাঁকে খামচা-খামচা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আর লাল আলোয় ওর ছায়াটা বিরাট, যার অবয়বটা অমানুষিক। বেন্দা বিড়ি টানতে-টানতে, পাঁচিলের দিকের দরজাটা খুলল। প্যাণ্ট খুলে প্রস্রাব করল। পাঁচিলের ওপাশে বাজার। ও প্রস্রাব করে দরজা বন্ধ করে আবার পিপের কাছে ফিরে এল। স্থির অপলক চোখে চারিদিকে দেখতে লাগল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাক মুখ দিয়ে। ওর মুখের চামড়া টান-টান হয়ে উঠছে, চোখ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ভিতরে বাইরে, যে-কোন শব্দ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। সারাদিনের কাজের মধ্যে ওর এই চেহারা দেখা যায় না। ও যেন কোন মন্ত্রের সাধনে শরীরে শক্তি সঞ্চার করছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে চোখে মুখে। বিড়ি টানতে লাগল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল, ওর নরম থলথলে শরীরের পেশী-গুলো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। মুখে ফুটে উঠতে লাগল একটা কঠিন হিংস্রতা। গুদামের কোথায় খুট করে একটা শব্দ হল। ও মুখ ফেরাল না, চোখের পাতা নামিয়ে ঘাড় কাত করে উৎকর্ণ হয়ে শুনল।

বিড়ি টানা শেষ হল। বিড়ির অঙ্গারটা একবার চোখের সামনে তুলে দেখল, তারপর অনায়াসেই অঙ্গার দুই আঙুলে টিপে নিভিয়ে বিড়িটা ফেলে দিল। পিপের পিছনে হাত বাড়িয়ে বের করে নিয়ে এল একটা বাঁশের লাঠি। তেলে চকচকে, এক-দিক মুগুরের মত মোটা। লাঠিটা তুলে একবার চোখের সামনে দেখল। তারপর সরু দিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে মোমবাতির শিষটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। ঝুপ করে অন্ধকার নামল একটা ভারি পর্দার মত। বেন্দা পিপের কাছ থেকে আস্তে-আস্তে নিঃশব্দে হেঁটে কয়েক পা গিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মত এসে দাঁড়াল।

বেন্দার পৃথিবীও এখন নিশ্চল। জগৎসংসার অন্ধকার, মানুষ নামক জীবদের অস্তিত্বহীন। সময় থমকিয়ে আছে।

বেন্দা দেখতে পেল, দুটি ছোট লাল অঙ্গারের বিন্দু। দেখা দিয়েই তা একদিকে ছুটে চলে গেল। বেন্দা স্থির। আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওপরের চালের কাছে ফুটে উঠেই, দ্রুত নিচের দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। বেন্দা নিশ্চল। চারটি অঙ্গারবিন্দু ওর কয়েক হাত দূর দিয়ে এপার ওপার চলে গেল। বেন্দা পাথরের মূর্তি। দুটি অঙ্গারবিন্দু ঝটিতি এগিয়ে এল, মুহূর্তেই থমকিয়ে পিছনে হারিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওর বাঁ পাশ থেকে, পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, চকিতেই পায়ের পাশ দিয়ে ডানদিকে চলে গেল।

এই রকম জোড়া-জোড়া অঙ্গারবিন্দুরা, ওপরে নিচে, দূরে সামনে ছুটে ছিটকে বেড়াতে লাগল। তারপরে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সম্মোহিতের মত, কতগুলো অঙ্গারবিন্দু ওর সামনে এসে লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হল, লাঠি

উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে লাঠি প্রচণ্ড আঘাতে উঠল, থামল। ও লাফিয়ে দাপিয়ে লাঠির মোটা মুণ্ডু দিয়ে পেটাতে লাগল। তারপরেই আর একপাশে সরে গিয়ে আবার পাথরের মূর্তির মত দাঁড়াল। পৃথিবীও আবার থমকিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

সময়ের কোন হিসাব নেই, অন্ধকারের গাঢ়তার কোন মাপজোখ নেই। আবার জোড়া-জোড়া অঙ্গারবিন্দু ওপরে নিচে মেঝেয় বস্তায় পিপের জেগে উঠতে লাগল। ছুটে ছিটকে ঘুরে ফিরে আবার সম্মোহিতের মত বেন্দার কাছাকাছি কতগুলো অঙ্গারবিন্দু লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাত আবার উঠল, আর প্রতিটি আঘাত যেন বিদ্যুচ্চকিতের মত পড়তে লাগল। তারপরে পিপের কাছে সরে এসে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালো। মোমবাতির আলো আস্তে-আস্তে অন্ধকার ঠেলে সরালো। বেন্দা এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল তিনটে নেংটি একটা ধাড়ি ইঁদুরের মৃতদেহ। তুলে রাখল পিপের ওপরে মোমবাতির কাছে। চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখল। ওর উত্তেজিত মুখে হিংস্র হাসি। গায়ে মুখে ঘাম চিকচিক করছে। মাথার চুলগুলো কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'শালা, ইঁদুরের বাচ্ছা ইঁদুর।'…লাঠিটা পিপের পিছনে রাখল। ফুঁ দিয়ে নেভাল মোমবাতি। অন্ধকারে অব্যর্থ ভুষির বস্তার ওপরে পাতা কাঁথার ওপরে গিয়ে, চিটে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন নামহীন জীবনের দুর্জয় পরিশ্রমের পরে, অনেক অপমান আর অপূর্ণ খাওয়ার পরে, এই এক সুখের খেলা। এত সুখ, গভীর ঘুম আসতে দেরি হয় না। এই সুখ আর আরাম ভোর পর্যন্ত। তারপরে আবার শুরু, আর একটা অভিশপ্ত দিনের। রাত্রি নটার পরে আবার সেই খেলা, খেলার উত্তেজনা আর সুখ, তারপরে গভীর নিদ্রার আরাম।

বেন্দার ভাববার অবকাশ নেই। কোন অজ্ঞাত শক্তির হাতে, ওর এই দিন ও রাত্রের জীবন নির্ধারিত আর পরিচালিত হয়। এই জীবনের শেষ কোথায়, ওর জানা নেই। এই জীবনযাপনের শরীরে কতগুলো ছিদ্র ক্ষণেকের জন্য ফেটে বেরোয়। সেই সব ছিদ্রে ভেসে ওঠে খেলার মাঠে খেলার ছবি। অনেক কিশোরের উল্লাসের ধ্বনি। সেই সব ছবি আর শব্দ থাকে নিষেধের গণ্ডীতে। ছিদ্রগুলো নিষিদ্ধ।

পেলে লেগে যা

'হেই শালা আরশোলার বাচ্চা!' কান্ত কুণ্ডুর ক্রুদ্ধ হুংকার বা গর্জন না, চিৎকারের হাঁক শোনা গেল। হাঁকের মধ্যে হুকুমের থেকে, এক ধরনের মত্ততার ঝাঁজ বেশি। বৃন্দাবন-বৃন্দা-বেন্দার পক্ষে এই চিৎকারের হাঁকই যথেষ্ট। কিন্তু ও শুনতে পেল না। ওর দশ বছর বয়স থেকে, দশ-এগারো-বারো তিন বছরের জীবনে এ রকম একটা ঘটনা এই প্রথম। দশ বছরে পড়তেই কান্ত কুণ্ডুর মস্ত দোকানে ও কাজে এসেছিল। এখন বারো হব-হব করছে। এই তিন বছরের মধ্যে এমন একদিনও হয় নি, কান্ত কুণ্ডুর নামহীন ডাক ও শুনতে পায় নি। কান্ত কুণ্ডু কখনই ওর নাম ধরে ডাকে না। দরকারও হয় না। হয়তো বেন্দাকে সে মানুষের বাচ্চা বলে মনে করে না, বা কখনও তা ভাববার অবকাশই হয় নি। সে, বা তার দুই শালা যাদের একজন দোকানের স্টেশনারি বিভাগ, আর একজন পাশের র‍্যাশন শপের দায়িত্বে আছে, তারা, এবং বাড়িতে তার দ্বিতীয় পক্ষের বউ, আর হেঁশেল ঠেলে যে মাসি, কেউই ওর নাম ধরে ডাকে না। ডাকলে, সেটা ওর আশ্চর্যের ব্যাপার হত। এমন কি ওর মা-ও ওর নাম ধরে ডাকলে, হয়তো ওর পক্ষে জবাব দেওয়া সম্ভব হত না। ওর অনভ্যস্ত কান নিশ্চয়ই ভুল করত। বা ভুল শুনেছে ভেবেই নির্বিকারভাবে চুপ করে থাকত।

কান্ত কুণ্ডুর এখন এই চিৎকারের হাঁক না শোনাটাও, আরও আশ্চর্য আর অস্বাভাবিক ব্যাপার। বেন্দা ডাক শুনতে পেল না, বরং বেশ খানিকটা উঁচুতে শূন্যে লাফিয়ে উঠেও গলা ফাটিয়ে চিৎকার করল, 'পেলে লেগে যা।'

'পেলে লেগে যা।' কতগুলো অসম স্বর মত্ত চিৎকারে প্রতিধ্বনি করল।

কথাগুলোর অর্থ কি, বেন্দা জানে না। অথচ একটা উল্লাস আর উত্তেজনা বোধ করছে। কথাগুলো ও কান তৈরি হবার পর থেকেই শুনে আসছে। আজও শুনেছে। যাদের মুখ থেকে শুনেছে, তাদের স্বরেও উল্লাস-উত্তেজনা। এমনই এক আশ্চর্য কথা, উল্লাস আর উত্তেজনার মধ্যে একটা মত্ততাও থাকে—যা আছে এখন বেন্দার গলা ফাটানো চিৎকারে। এতকাল শুনেই এসেছে, এ রকমভাবে কখনও বলে নি। কথাটার অর্থ আগে জানত না, এখনও জানে না। কথাটার পিছনে যেন অনেক অবাক কথা আর রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। আর সেই জন্যই,

কথাগুলো যত বার চিৎকার করে বলল, প্রত্যেকবারই কেউ যেন ওর ভিতর থেকে অবাক নিচু স্বরে ফিসফিস করে উচ্চারণ করল, 'পেলে লেগে যা!' তারপরেই হঠাৎ হাহা করে হেসে উঠতে লাগল। আবার হাত পা ছুঁড়ে নেচে চিৎকার করে সেই একই ধ্বনি করতে লাগল। কান্ত কুণ্ডুর ডাক ও শুনতে পেল না।

এখন অবিশ্যি দোকান খোলা নেই। বেন্দা দোকানের বাইরে, খানিকটা দূরে রাস্তার ওপরে, একটু আগে এসে হাজির হয়েছে। আশেপাশের দোকানে বা বাজারে কাজ করে, এ রকম আরও কয়েকজন ওর সঙ্গে ছিল। যারা সকলেই ওর থেকে বয়সে কিছু বড়। তারাও সবাই বোকার মতই হাত পা ছুঁড়ে নাচছে, আর উত্তেজিত উল্লাসে ধ্বনি প্রতিধ্বনি করছে, 'পেলে লেগে যা।'

আজকের দিনটা সকাল থেকেই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। আজ দুর্গা পুজার দশমী। এখন পুরোপুরি বিজয়া দশমীর উৎসবের আবহাওয়া। রাত্রি প্রায় দশটা বাজতে চলেছে। কিন্তু এখনও রাস্তায় বেশ ভিড়। কল-কারখানা, বিশেষ করে চটকল আজ ছুটি। অধিকাংশ দোকানপাটই বন্ধ, কেবল মিষ্টির দোকান ছাড়া। এখন এই ভিড় উৎসবের, কেনাবেচা নেই। কান্ত কুণ্ডু ওর মুদিখানা স্টেশনারি র‍্যাশন শপের সামনে রাস্তার ধারে বেঞ্চি পেতে বসে আছে। তার দুই পাশে দুই শালা। প্রথম পক্ষের বউ মারা গিয়েছে, কোন ছেলেপিলে হয় নি। দ্বিতীয় পক্ষের বউটির বয়স অল্প, সুন্দরী। চার বছরে কোন ছেলেপিলে হয় নি। আগের পক্ষের শালা, স্টেশনারি বিভাগ দেখা শোনা করে। দ্বিতীয় পক্ষের শালা র‍্যাশন শপ চালায়। কান্ত কুণ্ডু নিজে তার বাবার আদি ব্যবসা মুদিখানায় বসে। সকলের মাথার ওপরে সে। তার কর্মচারীদের মধ্যে সব থেকে বয়সে ছোট বেন্দা।

মিষ্টির দোকান, আর মুসলমানদের কয়েকটা দোকান ছাড়া সবই বন্ধ। কান্ত কুণ্ডুর পাশাপাশি দোকানগুলোও বন্ধ। মুদিখানা আর স্টেশনারি, একই লম্বা ঘরের দুই প্রান্তে। র‍্যাশন শপটা আলাদা। বেন্দার কাজ মুদিখানা আর স্টেশনারিতে। স্টেশনারি বিভাগের টফি লজেন্স আর চানাচুর বোয়েম থেকে বের করে ও বিক্রি করতে পারে। আর কিছু না। মুদিখানার ওজনদারের কাছে বিভিন্ন মালের বস্তা বা টিন এগিয়ে দেওয়া একটা বড় কাজ। অনেক দিনের পুরনো আর ব্যস্ত দোকান।

বেন্দা সব থেকে খুশি হয়, যখন ওর বয়সী কোন ছেলে টফি লজেন্স চানাচুর নিতে আসে। ও তাদের কাছ থেকে জেনে নেয় ইস্কুলের বা শহরের মাঠে কবে কোন্ দিন কি খেলা হয়। স্পোর্টসের প্রস্তুতি কেমন চলছে। ওর কাছে সেই সংবাদগুলো অনেকটা স্বপ্নের মত। অথচ মাঠে গিয়ে খেলা দূরের কথা, খেলা দেখতে যাবার ও সময় নেই। কেবল কল্পনাই করতে পারে, যার ফলে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। কাজের কথা ভুলে যায়। তখন কান্ত কুণ্ডু ওকে চিৎকার

করে ডাকে, 'এই শুয়োরের বাচ্চা' কিংবা 'কুত্তার বাচ্চা', আর তা শুনেই ও সচকিত হয়ে ওঠে। কারণ ও জানে, এই সব নামেই ওকে ডাকা হয়ে থাকে। স্টেশনারি বিভাগে, কান্ত কুণ্ডুর আগের পক্ষের শালা ওকে 'কাকের বাচ্চা' বা 'ফড়িং-এর বাচ্চা' ইত্যাদি বলে ডাকে। লোকটা প্রায় সময়েই বসে-বসে ঝিমোয় আর পাখি পতঙ্গের বাচ্চা বলে ডাকে। কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে ও খেতে যায় দু বেলা। সেখানে কান্ত কুণ্ডুর বউ তাকে 'ওল কচু' বলে ডাকে। ওর মুখটা নাকি সেই রকম। আর হেঁশেলে থাকে, খেতে দেয় যে-মাসী, সে বলে 'বোঁটকা পাঁটা'। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ।

বেন্দার বয়সী কোন খরিদ্দার বালক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে এরা কেউ তোকে নাম ধরে ডাকে না কেন?'

বেন্দা হেসে জবাব দেয়, 'ওহ্, ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্চা।'

তথাপি মানতেই হবে, বেন্দার তিন বছরের জীবনে, এ রকম ঘটনা এই প্রথম, ও কান্ত কুণ্ডুর ডাক শুনতে পেল না। সকাল থেকেই আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। কাটছেও একেবারে অন্যভাবে। গত দু বছরে এই দিনটাতে, কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে ওকে ওর মায়ের কাছে যেতে হয়েছিল। সপ্তাহে একদিন বেস্পতিবার আর বছরে চৈত্র সংক্রান্তি আর বিজয়া দশমীর দিন কাঁচরাপাড়ার কলোনিতে মায়ের কাছে ওকে যেতেই হত। ওর মাসের মাইনেটা মা এসে নিয়ে যেত। তাতেও ওর কিছু আসত যেত না। কিন্তু মায়ের কাছে যাওয়াটা, ওর কাছে নরকে যাবার থেকেও খারাপ ছিল। ওর বাবা অনেক দিন আগেই মরে গিয়েছে। এখন ওর মা অন্য একটা লোকের সঙ্গে থাকে। প্রত্যেক বছরই মায়ের একটা করে ছেলে মেয়ে হয়। ওর মা আর লোকটা ওকে খুব খাটিয়ে মারে। আর মা ওকে, 'খ্যাংরামুখো, ষেঁড়ো, মড়া ভাতাবের ছাঁ' ইত্যাদি বলে ডাকে।

কিন্তু তিন বছরের মধ্যে এই প্রথম, আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা এই ব্যতিক্রমে খুশিই হয়েছিল। কান্ত কুণ্ডুর আগের পক্ষের শালা গোপাল, দোকানের তালা খুলে বেন্দাকে বের করেছিল। মুদিখানা আর স্টেশনারির দোকানের পিছনে, দেওয়াল দিয়ে আড়াল করা, তিন ফুট চওড়া, লম্বা ফালি একটা গুদামঘর আছে। দোকান থেকে গুদামঘরে যাবার একটি মাত্র দরজায় তালা মারা থাকে। গুদামের পিছনে একফালি লম্বা জায়গা, তার পশ্চিম প্রান্তে একটা খাটা পায়খানা। পায়খানায় যাবার জন্য গুদামঘরে একটি দরজা আছে। বেন্দা রাত্রে কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে খেয়ে এসে, সেই গুদামঘরে শোয়।

আজ সকালে গোপাল দোকানের সামনের দরজাগুলোর তালা খুলে ভিতরে ঢুকে গুদামঘরের দরজার তালা খুলেছিল। বেন্দা প্রস্তুত হয়েই ছিল। ও জানত, ওকে যেতে হবে কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মায়ের কাছে। কান্ত কুণ্ডুর দেওয়া নতুন হাফপ্যান্ট আর ছিটের শার্ট গায়ে দিয়ে ও তৈরি ছিল। গতকাল রাত্রে খেয়ে ফেরার

পথে, প্রতিমা দেখবার জন্য ওর আধ ঘণ্টা ছুটি ছিল। ফিরে এসে, গুদামঘরের অন্ধকারে ও মাত্র দুটো নেংটি ইঁদুর মারতে পেরেছিল। একটা নেংটি ইঁদুরের রেট পাঁচ পয়সা, একটা ধাড়ি ইঁদুর দশ পয়সা। কান্ত কুণ্ডু ওকে দেয়।

বেন্দা মাঠে ঘাটে খেলতে যেতে পারে না। এই একটি মাত্র খেলাই ওর জীবনে ছিল। সারা দিন পরে, গুদামঘরের অন্ধকারে জোড়া-জোড়া লাল বিন্দু জ্বলে ওঠে। একটা বিড়ি খাবার পরে ও লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। ওর শরীরে জেগে ওঠে একটা আশ্চর্য শক্তি। যেন মন্ত্রের সাধনে শক্তহাতে লাঠি নিয়ে দাঁড়ায়। আর জোড়া-জোড়া অঙ্গারের বিন্দুগুলো, কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে ছোটাছুটি করতে-করতে, যেন সম্মোহিতের মত ওর সামনে এসে দাঁড়ায়। সাপের ফণার থেকেও ভয়ংকর উদ্যত হয়ে ওঠে ওর লাঠি। বিদ্যুৎবেগে ঝাঁপিয়ে পড়তে থাকে জোড়া-জোড়া লাল অঙ্গার বিন্দুগুলোর ওপর। কয়েক বার এই খেলার পরে, মোমবাতি জ্বালিয়ে ও খেলার ফলাফলগুলো লম্বা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নেয়। কটা নেংটি, কটা ধাড়ি। তারপরেই কয়েকটা বস্তার ওপরে ও শুয়ে পড়ে। নামহীন জীবনের সারাদিনের প্রচণ্ড খাটুনি আর পেট পুরে না খেতে পাওয়ার মধ্যে, এই একটি মাত্র খেলা, যেন গভীর সুখের আর একমাত্র জীবনধারণের জন্য।

আজ সকালবেলা গোপাল গুদামঘরের দরজা খুলে বেন্দার দিকে তাকিয়ে, কালো ঠোঁট ছুঁচলো করে হেসেছিল। নিশ্চয় নতুন ঢলঢলে সস্তা জামা প্যান্ট দেখেই হেসেছিল। বেন্দার চাকরির এটাও একটা সর্ত, বছরে একটি জামা আর একটি প্যান্ট। গোপাল বলেছিল, 'গুয়ো শালিকের বাচ্চা! সাজগোজ করে বসে আছিস?'

বেন্দার জবাব দেবার কিছু ছিল না। ও দোকানের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়িয়েছিল। আজ দোকান বন্ধ। গোপাল জিজ্ঞেস করেছিল, 'যাচ্ছিস কোথায় রে উচ্চিংড়ের বাচ্চা?'

'কাঁচরাপাড়া।' বেন্দা জবাব দিয়েছিল।

গোপাল বলেছিল, 'উঁহু। আজ তোকে কর্তা তার বাড়িতে যেতে বলেছে। দশেরার দিন, মেলাই কাজ। কাজের লোকের অভাব।'

অথচ কান্ত কুণ্ডুরই কড়া হুকুম, ছুটির দিনে বাড়িতে মায়ের কাছে যেতে হবে। বেন্দা যাতে কোন রকমেই এদিকে ওদিকে যেতে না পারে সেই রকম ব্যবস্থা ওর মাসি করে রেখেছিল মনিবের সঙ্গে। সকালে গোপালের কথা শুনে ও খুশি হয়ে উঠেছিল। আজকের এই দিনটিতে মায়ের কাছে ছাড়া যে কোন জায়গাতেই যেতে হোক, ও তাতেই খুশি। বলতে গেলে ও তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে ছুটেছিল।

কান্ত কুণ্ডুর বাড়িতে আজ অনেক কাজ ছিল। নারকেল দিয়ে নিরামিষ ঘুগনি, নারকেলের ছাঁচ তৈরি হয়েছিল। রোজকার রান্নাবান্না তো ছিলই। কলাপাতা কাটা, মাটির ভাঁড় ধোয়া ছিল। দুপুরের খাবার পেতে বেলা তিনটে বেজেছিল।

কিন্তু তারপর থেকে বলতে গেলে কোন কাজই করতে হয় নি। একটানা সন্ধে পর্যন্ত ছুটি পাওয়া গিয়েছিল। কাঁচরাপাড়ায় গেলে এ ছুটি কখনই পাওয়া যেত না। মায়ের আর তার লোকটার ফাইফরমাস খাটতে হত। মায়ের ছেলেমেয়েগুলোকে কোলে কাঁখে করে রাখতে হত। তার বদলে পুজামণ্ডপে যেতে পেরেছিল। ঢাকের বাদ্যির তালে-তালে নাচতে পেরেছিল, আর সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে পেরেছিল, 'ঠাকুর থাকবে কতক্ষণ? ঠাকুর যাবে বিসর্জন।'...তারপর ভাসানের সময় সেই ধ্বনি শোনা গিয়েছিল, 'পেলে লেগে যা।'

কোন সন্দেহ নেই আজকের দিনটা অন্যভাবে শুরু হয়েছিল। বেন্দা ওর জীবনে এই প্রথম একটা ভাসানের দলের সঙ্গে-সঙ্গে নাচতে-নাচতে অনেক দূর গিয়েছিল। অনেক ছেলের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় ওকে কান্ত কুণ্ডুর বাড়ি ফিরে যেতেই হয়েছিল। সেখানে ওর অনেক কাজ ছিল। যদিও সত্যি কাজ তেমন ছিল না। বাড়িতে তখন নমস্কার আর কোলাকুলির ব্যস্ততা। তার মধ্যেই উটকো ফাইফরমায়েস। কারোকে এক ভাঁড় জল দেওয়া, কারোর জন্য কলাপাতা এনে দেওয়া।

বেন্দার খুব ভাল লেগেছিল। হাসি খুশি উৎসবে মুখর ছিল মনিবের বাড়ি। সবাই সিদ্ধি খেয়েছিল। বেন্দাকেও দেওয়া হয়েছিল। একবার নয় কয়েকবার। কান্ত কুণ্ডুর এই পক্ষের ভায়রাভাই নিজে ভাঙ তৈরি করে সবাইকে খাইয়েছিল। বেন্দাকে খাওয়াতেও সে কুণ্ঠিত হয় নি। আর লোকটা তাকে নাম ধরেই ডেকেছিল। এ সবই অভাবিত আর বিস্ময়কর। মনিবের ভায়রাভাই ওকে নাম ধরে ডেকেছিল। ওর খেয়ালই ছিল না, কখন থেকে ও মেতে উঠে বারে-বারে চিৎকার করে উঠেছিল, 'পেলে লেগে যা।'

ওর কথা শুনে সবাই হেসেছিল। আর ও কান্ত শম্ভুর বউ থেকে শুরু করে বড়দের সবাইকে বারে-বারে পায়ে হাত দিয়ে নমস্কার করেছিল। ওর নমস্কারের ঘটা দেখে কেউ ওর চুল টেনে দিয়েছিল, ঘাড়ে মাথায় চাঁটি লাগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু তা মারবার বা পীড়নের উদ্দেশ্যে নয়। এবং সবাই খুব হেসেছিল। সবাই ওকে নিয়ে মজা পেয়ে গিয়েছিল। এমন কি, যাকে রাণীর মত সবাই খাতির করছিল, সেই কান্ত কুণ্ডুর বউ পর্যন্ত ওর মুখে মিষ্টি আর ঘুগনি গুঁজে দিয়েছিল। এ রকম ঘটনার কথা ও কল্পনা করতে পারে না। আজকের দিনটাই অন্যভাবে শুরু হয়েছিল।

আজ কান্ত কুণ্ডুর হেঁশেলের মাসীও বেন্দাকে নিয়ে মজা করেছিল। ভাঙের নেশার ঝোঁকেই ও বারে-বারে ভাত চেয়েছিল। মাসীও দিয়েছিল। আর ও মাসীর পা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে উঠেছিল, 'পেলে লেগে যা।' সারা গায়ে খাবার মাখিয়ে ও যত হাত পা ছুঁড়ে নাচছিল, সবাই ওকে তত ক্ষেপিয়ে তুলেছিল। বলির মহিষ বৎসকে মদ খাইয়ে, অণ্ডকোষে খোঁচা দিয়ে যেমন ক্ষেপিয়ে তোলা হয় ওকেও

সেই রকমই নাচিয়ে কঁদিয়ে ক্ষেপিয়ে তোলা হয়েছিল। আর সবাই হাততালি দিয়ে হেসে লুটোপুটি খেয়েছিল।

বেন্দা নিজেকেই ভুলে গিয়েছিল। এখনও ভুলে আছে। ওর পক্ষে এখন কান্ত কুণ্ডুর চিৎকারের হাঁক শোনা সম্ভব নয়। আজকের দিনটাই শুরু হয়েছিল অন্যভাবে। ওর জীবনে আজকের দিনটা একটা ব্যতিক্রম এ কথা ওর এখন মনে নেই। ভাঙের প্রকোপে ও এমন মত্ত, কাদের সঙ্গে নাচতে-নাচতে দোকানের কাছে চলে এসেছে বুঝতে পারছে না। এখন ওর খালি গা, জামাটা গলায় জড়ানো। সারা গায়ে মাথায় মুখে খাবারের দাগ আর মিষ্টির রস লাগানো। কিন্তু ওর নাচন-কোঁদনে এখন আর তেমন জোর নেই। চোখের পাতা সীসার মত ভারি হয়ে এসেছে। কি ভাবে কোমরের প্যাণ্টটা খুলে পড়ে যাচ্ছিল, ও জানে না। সেটা এক হাতে চেপে ধরে আছে। এখন ওর জিভটাও সীসার মতই ভারি। তবু লাফিয়ে উঠে হাঁকল 'পেলে লেগে যা।'

দোকানের সামনে কান্ত কুণ্ডু মদের গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে বলল, 'গোপাল, এবার বাড়ি যেতে হয়। ঘাউরার বাচ্চাটাকে গুদামের মধ্যে ঢুকিয়ে দোকান বন্ধ কর। ওকে বোধ হয় বাড়ি থেকে গুচ্ছের ভাঙ গিলিয়ে দিয়েছে।' বলে সে হাসল, এবং আবার বলল, 'বানচোত ছাগল বাচ্চার মতন লাফাচ্ছে।'

গোপাল উঠে গেল বেন্দার কাছে। ওর গলায় জড়ানো শার্টটা চেপে ধরে বলল, 'এই গোঁদো পিঁপড়ের বাচ্চা, এবার শুয়ে পড়বি চল।' বলে টেনে নিয়ে চলল।

বেন্দা কোন আপত্তিই করল না। এক হাতে খসে পড়া প্যাণ্টটা ধরে টানতে-টানতে এগিয়ে এল। দোকানের দরজা খুলে, ওকে ভিতরে ঢোকানো হল। তারপরে গুদামের অন্ধকারে ঠেলে দিয়ে, গোপাল দরজায় তালা লাগিয়ে দিল।

বেন্দা অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেল না। কোন শব্দও ওর কানে আসছে না। কোমরে প্যাণ্ট ধরা হাতের মুঠি আলগা হতেই সেটা খুলে গেল। ও টানতে লাগল। আর টলতে-টলতেই জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, 'পেলে লেগে যা।'

লাফাতে গিয়ে কয়েকটা বস্তার ওপর গড়িয়ে পড়ল। এখনও ও হাসছে আর অবাক মজার কথাটাই মনে মনে বলছে, 'পেলে লেগে যা।'

অন্যান্য দিন গুদামঘরের অন্ধকারে ও যে খেলা করে আজ আর ওর সে উপায় নেই। জীবনের একটি মাত্র খেলার কথা আজ ওর মনে নেই। কিন্তু সেই লাল অঙ্গার বিন্দুগুলো কাছে দূরে উঁচুতে নিচুতে জ্বলে উঠতে লাগল। তারপরে এক সময়ে অনেকগুলো, প্রায় অগুনতি লাল অঙ্গার বিন্দু সম্মোহিতের মত ওর সামনে এগিয়ে এল। সম্ভবত ওর আঘাতের জন্যই তারা অপেক্ষা করল। কিন্তু ওকে একেবারে স্থির নিশ্চল দেখে ওরা ওর গায়ের ওপর উঠল। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ল আর ওর গায়ে ঠোঁটে কানে চুলে, গলায় বুকে পেটে বস্তিদেশে, যত জায়গায় যত খাবার লেগেছিল সেগুলো খেতে আরম্ভ করল।

পরের দিন সকালবেলা গোপালই গুদামঘরের দরজা খুলল। বেন্দার কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে ভিতরে ঢুকল। অন্ধকারে দৃষ্টিটা সয়ে আসতে বেন্দার নগ্ন শরীরটা চোখে পড়ল। গোপাল ডাকল, 'এই টিকটিকির বাচ্চা।'

বেন্দা নড়ল না, কোন জবাব দিল না। কেবল ওর গায়ের কাছ থেকে কয়েকটা ইঁদুর ছুটে পালাল। গোপাল ঝুঁকে মাথা নিচু করে দেখল। দেখা গেল বেন্দার সারা গায়ে মুখে লাল ঘায়ের মত দাগ। কোথাও-কোথাও ঘায়ের থেকে যেন টাটকা রক্ত চুঁইয়ে পড়ছে। গোপালের গা-টা কেমন শিরশির করে উঠল। সে ডাকল, 'বনুই একবার এদিকে এসো।'

কান্ত কুণ্ডু এগিয়ে এল। দোকানঘর থেকে আগেই গুদামেব আলোর সুইচটা টিপে দিল। গুদামের ভিতরে এসে সে বেন্দাকে দেখল। খানিকক্ষণ দেখে অবাক হয়ে বলল, 'এই শুয়োরের বাচ্চাটার চোখের মণি, নাকের ডগা শুদ্ধ খেয়ে ফেলেছে। বানচোত কি বেঁচে আছে এখনও?'

গোপাল আতঙ্কিত স্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কিসে খেয়েছে?'

'ওরই পাঁচ আর দশ পয়সাব রেটেব মালেবা।' কান্ত কুণ্ডু বলল, 'নেংটি আব ধেড়েগুলো।' বলে সে দোকানের অন্যান্য কর্মচাবীদের চিৎকার কবে ডাক দিল। বলল, 'এই ইঁদুরের বাচ্চাটাকে বের করে রাস্তায় নিয়ে যাও। গোপাল তুমি তারাপদ ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এসো।'

কয়েকজন নগ্ন বেন্দাকে ধবাধরি কবে রাস্তায় এনে শুইয়ে দিল। দেখলেই বোঝা যায়, ওব সারা শবীরটা একটা কাপড়ের মতই কুটিকুটি কবে খাওয়ার চেষ্টা হয়েছে। শরীবের অস্থিহীন প্রায় সব অংশই খেয়ে নিয়েছে। ও নিশ্চয়ই অচেতন অবস্থায় হাঁ করে ছিল। জিভটা পর্যন্ত কিছুটা কুরে খাওয়া হয়েছে।

ভিড় বাড়তে আরম্ভ কবেছিল। তারপর ডাক্তার এলেন। দেখে বললেন, 'বেশিক্ষণ মরে নি। যে ভাবে খেয়েছে, বাঁচানো যেতো না। গোটা শরীব বিষিয়ে গেছে। ওকে একটা ঢাকা দিয়ে দাও।'

সকালেব রোদ পড়েছে বেন্দার গায়ে। চোখেব রক্তাক্ত কোটর দুটোতে রোদ চিকচিক করছে। একটা খুশিব দিনের ব্যতিক্রম কতখানি সুদূরপ্রসারী হতে পারে, ও কি তা জানত? বোধ হয় না।

সোনাটাবাবু

আড়ে-আড়ে চেয়ে-চেয়ে শিবির টেপা ঠোঁটের হাসিটা যেন গজলের প্রথম বিস্তারের মত ব্যাপারটাকে লহরার দিকে টেনে নিয়ে গেল। আর বিষ্টুপদ না-হাসি না-রাগ গোছের মুখে অপ্রতিভ তবলচির ভঙ্গিতে একটা শব্দ করে থেমে যাওয়ার মত জিজ্ঞেস করল, 'মাইরি?'

শুনে শিবি সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে তার মিঠে গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল যেন তালফেরতা পেরিয়ে তবলায় বাজল দ্রুত রেলার বোল।

বলল, 'মাইরি আবার কি। মিছে বলছি বুঝিন?'

মনে হল বিষ্টুপদর মুখে একটা ঘুষি মেরেছে কেউ। সে প্রায় খ্যাঁক করে উঠল, 'তাহলে সাত নম্বর?'

শিবি অমনি ঘোমটা একটু সরিয়ে ছোট মেয়ের মত মুখখানি বেজার করে বলল, 'আমার দোষ নাকি? এই নিয়ে তো আট হত, একটা চলে গেল, তাই···।'

বিষ্টুপদ হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। সে অবাক হয়ে একটা মুহূর্ত তাকিয়ে রইল শিবির দিকে।

তার বউ শিবি। লম্বা চওড়ায় দোহারা শরীর, মাজা মাজা রং, সাধারণ দুটো চোখ। বয়স প্রায় তিরিশ। বিচার করলে রূপ তার কিছুই হয়তো নেই। কিন্তু তার এ সাদাসিধে চেহারাটার মধ্যে কোথায় যেন একটা অপরূপের ছোঁয়া লেগে রয়েছে যে, পিছন ফিরলে আবার ফিরে দেখতে হয়। তার বয়স হয়েছে, বয়সের দাগটা পড়ে নি। যেন পাতিহাঁসটার হাজারবার জলে ডোব্যানো, তবু ঝরঝরে শরীরটার মত। মুখটা কাঁচাটে অর্থাৎ রূপের যদি কোন কাঁচামিঠে স্বাদ থাকে, তবে তাই। ওই মুখে তার নিয়ত হাসির কারণ বোঝা দায়।

বিষ্টুপদর স্যাতসন্ধালে এ বিস্ময় ও ক্ষুব্ধতা এখানে নয়, অন্যত্র। সে ভাবছে, এই মেয়ে ন' বছর বয়সে তার ঘরে এসেছে, তেরো বছর বয়স থেকে যথানিয়মে সন্তান প্রসব করে চলেছে। শরীর একটু টসা দূরে থাক, বিষ্টুপদ যখন জ্বালা-যন্ত্রণায় রোজই বলছে, 'এবার শালা কেটেই পড়ব, ঠিক তখনই শিবি সোহাগ করে, হেসে, খাপ্‌চি কেটে-কেটে বললে কিনা, 'মিটুর দোকান থেকে এট্টুস লঙ্কার আচার এনে দেবে?' এই সামান্য কথাটাই একটা মস্ত সর্বনাশের মহাইঙ্গিতপূর্ণ বিষ্টুপদর

কাছে। এই কথাটা যতবার সে শুনেছে শিবির মুখ থেকে, ততবারই তার পিতৃত্বের খঞ্জনি বেজে উঠেছে আঁতুড়ঘরে। যেন মৃত্যু ঘোষণা করেছে বিষ্টুপদর। তাই সে খানিকটা ভ্যাবাচাকা খেয়েই জিজ্ঞেস করেছে, 'মাইরি?' যেন তাহলে সে শুনতে পাবে, 'না।' কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ নিয়মের মত শিবি হেসে উঠেছে খিলখিল করে। উপরন্তু মুখ বেজার করে বলেছে, এই নিয়ে তার আট হত। বোঝ, যেন গাছের ফল।

এক মুহূর্ত সে শিবির দিকে জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইল যেন শিবি তার কোন নিষ্ঠুর আততায়ী। পরমুহূর্তেই মোটা ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠল, 'নঙকাব আচার না, এবার আমার মুণ্ডুটা এনে দেব। রইল শালার সম্সার আর ঘর আর রোজগার।' বলেই ঘটঘট করে বেরিয়ে যেতে-যেতে তাব সেই স্বভাবসিদ্ধ ইংরেজী কথা ক'টি শোনা গেল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

কাদেব দুড়দাড় করে ছুটে পালাবার শব্দ শোনা গেল। আর কেউ নয়, বিষ্টুপদর ভীত সন্ত্রস্ত ছেলেমেয়ের দল পালাচ্ছে বাপের খ্যাঁকানি শুনে, আর ছ'টি সন্তানের মা শিবি প্রায় একটি বালিকার মত অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিযে বইল সেদিকে। তারপর বালিকার মতই ঠোঁট কেঁপে চোখ ফেটে তার জল এল। কথায় বলে, মন গুণে ধন, দেয় কোন্ জন। শিবির ধন নেই কিন্তু পুত্র দিযে লক্ষ্মী লাভের সৌভাগ্য যে সংসারে এত বিড়ম্বনা, তা কে জানত।

বিষ্টুপদ চলেছে হনহন করে। চলা না বলে তাকে ছোটা বলাই ভাল। লম্বায় প্রায় ছ ফুটের উপর, গাযেব রং ক্ষয়-পাওয়া বোদে পোড়া ন্যাড়া গাছের মত। তেমনি শুকনো শক্ত হাড়কাঠি সার শরীর। খোঁচা-খোঁচা গোঁ-মারা চুলগুলিকে তেল-জলেব সার দিয়ে যেন পেড়ে ফেলার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চুল ভাঙে তো মচকায় না। মোটা ঠোঁট আর যাকে বলে অশ্বনাসিকা। গুলিভাটা গোল চোখ। আব খাকী ফুলশার্টেব হাতে গলার বোতামটি পর্যন্ত আটকানো। দশ হাত কাপড় হাঁটুর বেশি নামে নি। তার তলা থেকে নেমে এসেছে আগুনে সেঁকা বাঁশের মত শিরাবহুল সরু পা। পায়ে পবেছে পুরানো ফাটা টায়ার কাটা বে সাইজের স্যাণ্ডেল।

এই হল বিষ্টুপদর চেহারা। বংশমর্যাদায় কুলীন কায়েত। কোন্ অজানা যুগে নাকি বাপ-ঠাকুরদা প্রজা শাসনও করত। আর সে এখন কাজ করে মিউনিসিপ্যালিটিতে। ডেজিগনেশন লেখা আছে, কন্সারভেন্সি সুপারভাইজার, ১নং ওয়ার্ড। বিষ্টুপদ নিজে বলে, এ এস আই অর্থাৎ অ্যাসিস্টাণ্ট স্যানিটারি ইন্সপেক্টর। ডোম মেথর ধাঙড়ধাঙড়িরা বলে, ছোট সোনাটরবাবু। মানে স্যানিটারিবাবু। পাড়ার ছোঁড়ারা আড়ালে বলে, শালা ধাওড়ার ভূত, ধাঙড়-সর্দার।

সত্যি, চলেছে যেন তেঢঙ্গে লম্বা একটা একরোখা ভূতের মত। সামনে-পিছনে, ডাইনে-বাঁয়ে, কোন দিকে হেলে না। মোটা ঠোঁট কুঁচকে রয়েছে অসহ্য তিক্ততায় ও যেন কিসের প্রতিজ্ঞায় ফুলে-ফুলে উঠছে নাকের পাটা, আর কোঁচকানো চোখ জোড়ার দূরে নিবদ্ধ অপলক চাউনিটা হয়ে উঠেছে শিকারসন্ধানী হন্যে শ্বাপদের মত।

ফাল্গুন মাস, আকাশ নির্মেঘ। হাওয়া পাগল। সকালবেলাটা যেন গোলাপী নেশার আমেজে দুলছে। রোদে তাত নেই। পাতা নেই গাছে গাছে। ধুলো উড়ছে, শুকনো পাতা উড়ছে, উড়ছে কাগজের টুকরো আর শুকনো রাবিশের ডাঁই।

মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের কম্পাউণ্ডে ঢুকতে না ঢুকতেই ফ্যালা ডোম হ্যা-হ্যা করে হেসে তাকে অভ্যর্থনা করল, 'এই যে সোনাটরবাবু, এসে পড়েছ?'

বিষ্টুপদ থমকে দাঁড়াল। তার চোখ মুখ আরও বিকৃত হয়ে উঠল রাগে। ক্ষেপে উঠে ভেঙচি কেটে বলল, 'তা' পথের মাঝে কেন, অফিস থেকে ঘুরে এলে হত না! কানা ডোম কোথাকার!' বলে সে যেন বাতাসে ধাক্কা মেরে চলে গেল অফিসে। ফ্যালা আবার হ্যা-হ্যা করে হেসে আপন মনে বলল, 'যাও, অর্ডারটা নিয়ে এস।'

সত্যি, ফ্যালা একে ডোম, তায় কানা। চেহারাটা এমনিতে মন্দ ছিল না। কালো মাংসালো মাঝারি শরীর, ঘাড়ের কাছে বেয়ে পড়া ঝাঁকড়া চুল, গলার কালো সুতোয় বাঁধা মাদুলি। কিন্তু এক-চোখো। একটা চোখ তার ভাল, এমন কি টানা সুন্দরও বলা যায়। আর একটা চোখে মণি নেই। সাদা ক্ষেত্রটা সাদা নীলে মেশানো ঘষা কাচের আবরণ বলে মনে হয়। হাসলে কিংবা রাগলে তার ভাল চোখটা বুজে যায়, আর কানা চোখটা বড় হয়ে ঠেলে ড্যালা পাকিয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে গজদাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার মুখটা।

ফ্যালা বিষ্টুপদর সারাদিনের কাজের সঙ্গী হলেও সকালবেলা ওই এক-চোখো ডোমের মুখ দেখতে সে রাজী নয়। কিন্তু কপাল গুণে দোষ। বোধ করি ফ্যালার মুখটা দেখার দোষেই অফিসে ঢুকতে না ঢুকতে স্যানিটারি ইন্সপেক্টর ছেঁড়া শোলার টুপিটা মাথায় চাপিয়ে তাকে এক বিদঘুটে নতুন হুকুম শুনিয়ে দিল। নতুন নয়, এর আগে অবশ্য আরও দু-চারবার তাকে এ কাজ করতে হয়েছে। তাকে কুকুর মারতে যেতে হবে। কিন্তু লাঠি দিয়ে কুকুর মারা সাম্প্রতিক আইনে নিষিদ্ধ। তাছাড়া খাবারে বিষ দিয়ে মারলে হয়রানিও কম। ইন্সপেক্টর স্টিকনিয়া বিষের শিশিটা আর ক'টা টাকা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'বেরিয়ে পড় বাবা বিষ্টুচাঁদ। তোমাদের এক নম্বর ওয়ার্ড থেকে কাঁড়ি-কাঁড়ি দরখাস্ত এসেছে। গাদা-গাদা বাড়তি কুকুরে নাকি এলাকা ছেয়ে গেছে। তার উপরে একটা নাকি পাগলা খেপী, দুজনকে কামড়েছে। টাকা দিয়ে মেঠাই মণ্ডা যা কিনবে, ভাল দেখে কিনো আর কুল্যে এক কুড়ি না হোক, ডজন খানেক সাবড়ে এস, বুঝলে?'

কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইল বিষ্টুপদ। এখন তার দাঁত চাপা মুখটা ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। তার চোখের সামনে ভাসছিল ফ্যালা ডোমের মুখটা। পরমুহূর্তেই সে মুখটা চাপা দিয়ে দেখা দিল শিবির টেপা হাসির সোহাগী মুখ। আসলে ঐ অশুভক্ষণটি থেকেই আজকের এই অভিশপ্ত দিনটার শুরু।

ভেবেই গোঁখরা ভূতের মত কাঁকড়ার দাঁড়ার মত শক্ত হাতে বিষের শিশিটা তুলে নিল। মনে-মনে বলল, 'সেই ভাল, আজকের থেকে সকলের মুখে আমার বিষ দেওয়ার পালাই শুরু হোক।'

তারপর কি মনে করে খ্যাপা শিম্পাঞ্জীর মত দাঁতগুলি বের করে খ্যাক করে উঠল, 'তা এবার আমাব ওই ডেকিজনেশন না ডেক্‌চিনেশনে সোপারভাইজারটা কেটে ডোম করেই দেওয়া হোক।'

স্যানিটারি ইন্সপেক্টব হি-হি কবে হেসে বলল, 'আরে ছ্যা, ডোম তো তোমাব শাগরেদী করবে। তোমার পোস্টটা তাহলে বিষ্টুচাঁদ ডগ্‌কিলার করতে হয।'

'ডগ্‌কিলাব?'

'হ্যাঁ, ডগ মানে কুকুর, আর কিলাব মানে খুনী।' বলে ময়লা হাফ-প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে আবাব হি-হি কবে হেসে উঠল ইন্সপেক্টর।

নাকেব পাটা ফুলিয়ে, চোখ ঘোঁচ কবে বিষ্টু বলল চাপা গলায়, 'তার চে' মানুষখুনী পোস্টই ভাল।'

জবাব দিতে গিয়ে স্যানিট্যাবি ইন্সপেক্টরের জিভে কামড় পড়ে চোখ দুটো গোল হয়ে উঠল।

বিষ্টুপদ ততক্ষণে টাকা ক'টা ছোঁ মেবে তুলে নিয়ে একেবাবে রাস্তায় গিয়ে পড়েছে। পিছনে তাব ফ্যালা ডোম।

খানিকটা গিয়ে ঘাড়েব থেকে লোহা-বাঁধানো লাঠিটা নামিয়ে বলল ফ্যালা, 'আচ্ছা সোনাটববাবু, আগে তো শালা ডাণ্ডা হেঁকেই কাজ হত, আজকাল এ নিয়ম কেন?'

'আইন নেই।'

কেশো গলায় খ্যালখ্যাল করে হেসে বলল ফ্যালা, 'শালা এ্যাইনটা বড় মজার। মারো, তবে পিটে লয়, বিষ দিয়ে।···অল শালা বেলাডি বোকাস্‌।'

ঠাট্টাটা বুঝতে পেরে চোখের কোণ দিয়ে অগ্নিদৃষ্টি হেসে বিষ্টু বলল, 'খচাসনি ফ্যালা, টুঁটি চেপে এই বিষ ঢেলে দেব গলায়।'

ফ্যালার কানা চোখের সাদা ড্যালাটা বেরিয়ে এসে তার চাপা হাসির মত কাঁপতে লাগল।

প্রায় আধঘন্টা বাদে তারা দুজনে যখন আধা শহর, আধা গ্রামাঞ্চলটার সীমানার নিরালা মাঠের ধারে, বাজ পড়া মাথা মুড়নো তালগাছটার তলায় এসে দাঁড়াল, তখন মনে হল যেন যমালয়ের দুটো গুপ্তচর নেমে এসেছে মারণ-যন্ত্র নিয়ে।

ইতিমধ্যে ফাল্গুনের রোদে একটু-একটু তাত ফুটতে আরম্ভ করেছে। হাওয়াটা উদাস বৈরাগীর দীর্ঘশ্বাসের মত একটা চাপা হাহাকার তুলে যাচ্ছে মাঠের মাঝে। ফ্যালা ট্যাঁক থেকে একটা কলাপাতার পুরিয়া বের করে ভেতর থেকে কালো মত একটা ছোট ড্যালা বাড়িয়ে দিল বিষ্টুর দিকে। জিনিসটা বাটা সিদ্ধি। বলল, 'ইচ্ছাপূরণের গুলিটা খেয়ে লাও সোনাটরবাবু। যেটাকে ধরবে আর প্রাণ নিয়ে সেটাকে ফিরতে হবে না।'

বস্তুটির দিকে এমনভাবে তাকাল বিষ্টু যেন এতেও তার মেজাজ খচে যাচ্ছে। দাঁত চেপে বলল, 'শালা মাতাল কোথাকার।' বলেই ছোঁ মেরে সিদ্ধিটুকু মুখে দিয়ে কোঁত করে গিলে ফেলল।

ফ্যালাও একটা গুলি মুখে পুরে, ভাল চোখটা বুজিয়ে কানা চোখটা দিয়ে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটার দিকে তাকিয়ে বোগড়া দাঁত বের করে ফেলল। সুড়ুত করে মুখেব নালটা গিলে নিয়ে বলল, 'ওই বস্তু একখান বার কর সোনাটরবাবু। লইলে ইচ্ছা শালা আধখ্যাচড়া থাকবে।'

'মাইরি?' বলেই জ্বলন্ত চোখ দুটো ফিরিয়ে বিষ্টু সোজা হাঁটতে আরম্ভ করল। অনুপায় বুঝে পিছন ধরল ফ্যালা।

খানিকটা গিয়েই বিষ্টুর হাত চেপে ধরল ফ্যালা। দুজনেই থমকে দাঁড়াল। আঙুল বাড়িয়ে হাত কুড়ি দূরে একটা কুকুর দেখাল। একেই বলে ডোমের চোখ। তাও কানা। যেন দুটো গুপ্তঘাতক শিকার পেয়েছে।

বিষ্টু দেখল, কুকুরটাও থমকে দাঁড়িয়েছে। সাদা কালো মেশানো বেশ বড়সড় কিন্তু হাড় বের করা ক্ষীণজীবী জানোয়ারটার হলদে চোখের ভাবটা, এ লোক দুটোকে দেখে খ্যাঁক করে উঠবে কি না। বিষ্টুর নজরটা তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল, 'মনে হচ্ছে দোআঁশলা মদ্দা। এক নম্বর ওয়ার্ডের মাল তো?'

ঠোঁট উল্টে বলল ফ্যালা, 'না-ই বা হল। এলাকাটা তো তোমার?'

'যা বলেছিস। তুই ব্যাটা ডান্ডা নিয়ে একটু তফাত যা।' বলে সে হাঁড়ির শালপাতার ঢাকনা খুলে বের করল একটা রসগোল্লা। ছুরি দিয়ে রসগোল্লাটা একটু ফুটো করে তার মধ্যে পুরে দিল এক টিপ বিষ। তারপর ফুটোটা বন্ধ করে সে ফিরে তাকাল কুকুরটার দিকে। এবার তার গুলিভাটা চোখে খুনীর হিংস্রতা। যেন সে কাউকে পিছন থেকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছে।

কুকুরটা চাপা গলায় গর্জাচ্ছে। অর্থাৎ এদের মতলবটা কি। কিন্তু সেই সঙ্গেই ল্যাজ নেড়ে, জিভ দিয়ে গাল চেটে লুব্ধ চোখে দেখছে রসগোল্লাটা।

বিষ্টু জিভ দিয়ে তু তু করতেই কুকুরটা কয়েক পা পিছিয়ে ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। কিন্তু পালাল না। বিষ্টু এবার কয়েক পা এগিয়ে গেল। কুকুরটাও পিছুল। কিন্তু লোভ আর সন্দেহের দোটানায় পড়ে কুকুরটা ল্যাজ নেড়ে খ্যাক-খ্যাক করছে।

বিষ্টু হঠাৎ দাঁড়িয়ে, একটি পরিষ্কার জায়গায় রসগোল্লাটি রেখে সটান পিছন ফিরে একেবারে সেই ন্যাড়া তালগাছটার তলায় ফ্যালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

কুকুরটা কয়েক মুহূর্ত থমকে রইল। তারপর আড়চোখে তাকিয়ে পায়ে-পায়ে এগিয়ে এসে দাঁড়াল রসগোল্লাটার কাছে।

উত্তেজনায় বিষ্টুর দাঁতগুলি চেপে বসেছে ঠোঁটের উপর। চাপা গলায় বলল, 'খা খা শালা।' ফ্যালার সাদা চোখটা বড় হয়ে হাঁ করা মুখের কস দিয়ে লাল গড়িয়ে এল খানিকটা আর নিশপিশ করে উঠল লাঠিধরা হাতটা।

কুকুরটা আর একবার তাদের দিকে দেখেই কপ করে রসগোল্লাটা মুখে নিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে খানিকটা ছুটে গেল। কিন্তু লোক দুটোকে না আসতে দেখে দাঁড়িয়ে চিবিয়ে খেল। খেয়ে মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ল।

'খেয়েছে শালা, খেয়েছে।' সাফল্যের উল্লাসে বিষ্টুর বেজীর মত চোখ দুটো যেন আরও জ্বলে উঠল। বলল, 'চ দেখি টেঁস করে ম'ল কিনা।'

ফ্যালারও গজদাঁতগুলি বেরিয়ে পড়েছে খ্যাপা কুকুরের মত। বলল, 'মরবে না আবার! তবে এট্টা রসগোল্লা খেয়ে ম'ল মাইরি।'

বলে সে লালার দবানি জিভ দিয়ে চেটে নিল। তারপর দুজনেই মাঠ পেরিয়ে জঙ্গলে গিয়ে ঢুকল।

কুকুরটা ইতিমধ্যেই শুয়ে পড়েছিল একটা আসশেওড়া ঝোপের তলায়, লোক দেখেই ছুটে পালাল। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। খানিকটা গিয়েই টলতে লাগল আফিমখেগো আড-মাতলার মত।

তীরবিদ্ধ শিকারের পিছনে-পিছনে ক্ষিপ্ত ব্যাধের মত ফ্যালা আর বিষ্টু ছুটতে-ছুটতে এসে পড়ল পাড়ায়।

কুকুরটা দাঁড়িয়ে পড়েছে ঝিম ধরা মাতালের মত।

চোখ দুটো আধবোজা রক্তবর্ণ। ঘং-ঘং করে কাশছে, কেঁপে-কেঁপে উঠছে বুকের পাঁজরা। ঠিক যেন এটা মুমূর্ষু বুড়ো। উগরে ফেলতে চাইছে পেটের বিষ।

বিষ্টু এক নজরে মুখ বিকৃত করে এ মরণলীলা দেখছিল। ফ্যালা হঠাৎ খ্যাল খ্যাল করে হেসে হেঁড়ে গলায় চিৎকার করে গান ধরে দিল ঃ—

'ও তোর ভবের খেলা সাঙ্গ হল
যম দাদাকে যেয়ে বলো,
খেয়েছি মণ্ডা মেঠাই,
সোনাটরবাবুর হাতে।'

আবার হাসতে গিয়ে থেমে বলল, 'সোনাটরবাবু ঠাউরের নাম লেও।'

'কেন?'

'এট্টা পাণী হত্যে করলে, পাপ লাবাতে হবে না?'

পাপ ? বিষ্টুর প্রাণের কোথাও চাপা পড়া আগুন যেন উসকে উঠল পাপ কথাটায়। তীব্র চাপা গলায় বলল, 'দাঁড়া! ঘর বার সব সাবড়াই প্রাণ খুলে, তারপর দেখা যাবে তোর ঠাকুরের নাম।' বলে সে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়াল।...

কুকুরটা সামনের দিকে বাড়ানো পায়ের মাঝখানে হাঁটুতে মাথা গোঁজার মত এলিয়ে পড়েছে, আর ঠেলে বেরিয়ে আসা নিষ্পলক চোখ দুটো তাকিয়ে আছে বিষ্টুর দিকে। মরে গেছে কুকুরটা।

বিষ্টু মুখটা ফিরিয়ে এগুতে-এগুতে বলল, 'ফ্যালা, বিকেলে গাড়ি করে ভাগাড়ে নিয়ে ফেলে দিস। তারপর হঠাৎ নাকটা কুঁচকে বলল, 'অল শালা ব্লাডি বোগাস।'

তারপর চলল সারা এলাকা জুড়ে কুকুর মারার পালা। কখনও গঙ্গার ধার থেকে পুবের রেললাইন পর্যন্ত, কখনও লাইনের উপর উত্তর দক্ষিণের এক নং ওয়ার্ডের দুই সীমানা পর্যন্ত।

কি রকম একটা নেশায় পেয়ে বসেছে বিষ্টুপদকে। ক্ষিপ্ত হিংস্র, একরোখা। যেন কোন খুনী হত্যালীলায় মেতেছে।

ফ্যালার হাতের লাঠি ঠাণ্ডা তো ফ্যালাও ঠাণ্ডা। তার কোন উত্তেজনা নেই। সে খালি লুব্ধ কুকুরগুলির মতই জ্বলজ্বলে চোখে দেখছে বিষ্টুর হাতের হাঁড়িটা আর জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে।

কিন্তু সোনাটরবাবুর খ্যাপামি দেখে চাইতে ভরসা পাচ্ছে না। যা হয় ওই দেখে-দেখেই। আশা আছে শেষের বেলায়। বোধ হয় শেষের বেলার কথা ভেবেই কানা চোখটা নাচিয়ে-নাচিয়ে হাতের লাঠিতে তাল ঠুকে গুনগুন করছে সে।

কিন্তু বিষ্টুর নজর শুধু একদিকে, কুকুর! যেমনি দেখা, অমনি রসগোল্লা, ছুরি আর বিষ। তারপর, 'খা, খা শালা জন্মের মত।' বলে আর জিজ্ঞেস করে, 'ক' নম্বর হল ফ্যালা ?'

ফ্যালা বলে, 'আধ ডজন লম্বর দাঁড়াল।

পিছনে-পিছনে ভিড় করে পাড়ার বাচ্চা ছেলের দল। বিষ্টু খেঁকোয়, 'দোব রসগোল্লা ?' ফ্যালা তাড়া দেয় বাচ্চাগুলোকে।

কেউ বলল, 'অমুক কুকুরটা মেরে দিও তো। রোজ শালা রাত ডিউটি থেকে ফেরবার পথে কামড়াতে আসে।'

কেউ বা বলল আবার, 'অমুক কুকুরটা মেরো না হে বিষ্টুপদ। ওটা সারারাত খেঁকোয়, আমি তাই জেগে থাকি। যা চোর ডাকাতের ভয় বাবা।'

বিষ্টু ও সব কমই শোনে। যেটাই সামনে পড়ুক, গলায় দড়ি, বেল্ট বাঁধা না থাকলেই হল। কিন্তু সেই খেপী কুকুরটা কোথায় গেল ? খেঁকি খেপীটা ?

যেতে-যেতে থমকে দাঁড়ায় বিষ্টু। বলে, 'ফ্যালা, ওই যে একটা শুয়ে আছে।'

ফ্যালা কানা চোখ বড় করে হেসে বলে, 'ওটা শোওয়া নয়, মরা।'

'মরা ? কে মারল ?'

'কেন, তুমি, সোনাটরবাবু।'

তা বটে। খেয়াল নেই বিষ্টুর। প্রায় সব পাড়াতেই গাদা গাদা কুকুর দেখে তার মাথাটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। জিজ্ঞেস করে, 'ফ্যালা, এত কুকুর এল কোত্থেকে ?'

ফ্যালা বলে, 'কেন, ভাদ্দর মাস গেছে, হারামজাদীরা বিইয়েছে কাঁড়ি-কাঁড়ি।'

বিষ্টু খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে মাথা নেড়ে বলে 'হুঁ! কি খেয়ে বাঁচে এগুলো ?'

'কি আবার, পচা পাত্‌কুড় বিষ্ঠা।'

খ্যাঁক-খ্যাঁক শব্দ করে বোধ হয় বিষ্টু হেসেই ফেলে। বলে, 'ঠিক মানুষের বাচ্চার মত, না ?' বলেই বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে আবার হনহন করে এগোয়। আবার চলতে থাকে কুকুর নিধন অভিযান। আর ফ্যালা আবার বাড়িয়ে দেয় ইচ্ছাপূরণের গুলী। শুধু তার ইচ্ছা পূরণ হয় না।

ফাল্গুনের হাওয়া থেকে-থেকে অনাগত চৈত্রের ঘূর্ণিতে মেতে উঠছে। বেলা বাড়ছে চড়চড় করে। নীল আকাশটা ধুলোয়-ধুলোয় ফ্যালা ডোমের ঘষা চোখটার মত রং ধরেছে। হঠাৎ ফ্যালা বলে, 'আচ্ছা সোনাটরবাবু, মানুষও কি শালা বাড়তি হয়ে গেছে ?'

বিষ্টু বলে, 'নইলে এত মরে ? খাবে কি! খায় তো সব পচা বিষ্ঠু।'

ফ্যালা ভাল চোখটা বুজিয়ে বলে, 'তাহলে মানুষের মাথার 'পরেও শালা সোনাটরবাবু আছে বল! সে ব্যাটা কে ?'

হঠাৎ বিষ্টুর অপ্রতিভ মুখে কোন কথা যোগায় না। তারা দুজনেই তিনটে নেশাচ্ছন্ন চোখে পরস্পরের দিকে এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকে। দুজনেই তারা কি এক ভাবনায় যেন তলিয়ে যায় কয়েক মুহূর্তের জন্যে। বোধ হয়, সত্যিই ভাববার চেষ্টা করে, মানুষের বিষবাহী সেই জীবটা কে।

পরমুহূর্তেই বউ শিবির সকালবেলার মুখটা মনে হতেই বিষ্টু রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'দ্যাখ কানা ডোম, কাজের সময় বকিস নি। নিকুচি করেছে তোর মানুষের সোনাটরের। শালা মরুক সব। হেজে যাক, সেই ভাল। এবার হিসেব দে, ক'টা মরেছে।'

ফ্যালা ভাবে, কুকুর মারার মত মানুষের সোনাটরবাবুও বোধ হয় এ রকমই ভাবে। বলে, 'তা কুল্যে আটটা হল।'

'মাত্তর!'

আবার শুরু। আবার সন্ধান। বিষের শিশি যেমন তেমনিই তো আছে। খরচ কোথায় ? সেই খেপীটা কোথায়, যেটা কামড়ায় ? ঘোর দুপুর নিঝুম! ফাঁকা পথ, লোকজন নেই। ঘরে-ঘরে দরজা জানালা সব বন্ধ। এখানে ওখানে

মরা কুকুর। চারিদিকে মাছির উল্লাস। হয়তো আকাশে উড়ে চলেছে শকুনকে সংবাদ দিতে। আর ভ্যানভ্যান করে উড়ে চলেছে বিষ্টুর সঙ্গে হাঁড়ির গায়ে-গায়ে। আর এ বসন্ত দুপুরে, বিষ্টু ও ফ্যালাকে মনে হয়, সত্যি বুঝি দুটো হন্যে হওয়া যমেরই অনুচর।

হঠাৎ দূর থেকে একটা ছেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'হেই ফ্যালা, শীগগির আয়, এখেনে আছে সেই খেপীটা।'

দুজনেই তারা সেদিকে এগিয়ে গেল। ছেলেটা দূর থেকে আঙুল দিয়ে দেখিয়েই পালাল।

দেখা গেল অদূরেই নর্দমাতে মুখ নিচু করে কি যেন খাচ্ছে একটা কুকুর। রোগা, লম্বা, ছাই রঙের মাদী কুকুর। সমস্ত শরীরের ভারটা নিচের দিকে ছ'টা পুষ্ট স্তনের ভারে ঝুলে পড়েছে। নিটোল মেটে বর্ণের চোষা স্তন। দেখেই বিষ্টুপদব চোখের দৃষ্টি জ্বলে উঠল। বলল, 'ফ্যালা, হারামজাদী বিইয়েছে।'

ফ্যালা বলল, 'ওই জন্যেই বোধ হয় খেঁকি হয়েছে। দেখ না, মেয়েমানুষে বিয়োলে খেঁকি হয়?'

'হুঁ। এটাকে মারলে একটা বিউনী কমবে। ওকে শালা আমি জোড়া রসগোল্লা খাওয়াব।' বলে সে দুটো রসগোল্লা বের করে কেটে বিষ পুরে দিল।

কুকুরটা হঠাৎ নর্দমা থেকে মাথা তুলল। এদেব দেখে আরও খানিকটা গলাটা টান করে ঘাড় বাঁকিয়ে বিষ্টুর হাতের বস্তুটির দিকে তাকাল। হলদে মণি আর লাল চোখে সামান্য একটু কৌতূহল ফুটল। কিন্তু একটা শাণিত খ্যাপামি ও সন্দেহে চকচক করছে চোখ দুটো।

বিষ্টু রসগোল্লা দুটো নামিয়ে ফ্যালাকে নিয়ে সবে গেল দূরে।

কুকুরটা রসগোল্লা দুটোর কাছে এসে এক মুহূর্ত মাথা নিচু করে দাঁড়াল। আবার মুখ তুলে একবাব বিষ্টুকে দেখে। হঠাৎ পিছন ফিরে দুধের বাঁট দুলিয়ে-দুলিয়ে চলে গেল।

বিষ্টু আর ফ্যালা অবাক হয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে এগিয়ে এসে দেখল, কুকুর রসগোল্লা ছোঁয় নি পর্যন্ত। আশ্চর্য! আশাতীত।

রাগে বিস্ময়ে বিষ্টু জলন্ত চোখে কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওরে শালা, হারামজাদী যে মানুষের বাড়া দেখছি।'

ফ্যালা বলল, 'সেয়ানা হয়ে গেছে। হবে না, ও যে মাদী। পেটের বাচ্চা পালতে হবে যে!'

দৃঢ় চাপা ক্রুদ্ধ গলায় গর্জে উঠল বিষ্টু, 'পালাচ্ছি বাচ্চা। যাওয়াচ্ছি ওর মাই দুলিয়ে দুলিয়ে।'

খপ্ করে সে রসগোল্লা দুটো তুলে নিয়ে পলকে দেখে নিল, বাঁদিকের গলিতে অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। বলল, 'চ' ফ্যালা, বিষ, না হয় তোর ডাণ্ডা দিয়েই

ওকে সাবাড় করতে হবে।'

ফ্যালার ওতে কিছু যায় আসে না। বলল, 'চল। কিন্তু দুটো মিষ্টি নষ্ট করলে তো সোনাটরবাবু।'

বিষ্টু খেঁকিয়ে উঠল, 'তবে কি তোকে দেব ?

ফ্যালা কানা চোখের ড্যালা কাঁপিয়ে হেসে বলল, 'আমাকে না হয়, আমার ডোমনিটাকে তো দিতে পারতে ?' বলে হ্যা হ্যা করে হাসে। 'জানলে বাবু, বউটা ওই হাঁড়ির জিলিসট' এখন খালি খেতে চায়। মানে, পোয়াতি কি না।'

বিষ্টুর গায়ে যেন আগুন লাগে কথাটা শুনে। বলে, 'ও, তাই সক্কাল থেকে মিষ্টি দেখে তোমার এত ফুর্তি। বলি, ক'বিওনী হল তোর বউ ?'

'তা তোমার এবার লিয়ে পাঁচবার।'

মনে হল বিষ্টু এবার ঘুষি কষাবে ফ্যালার ওই চোখটাতে। ভেংচে বলে, 'আরও চাই ?

ফ্যালার হাসিটা অদৃশ্য হয়ে যায়। ভাল আর কানা দুটো চোখই মেলে ধরে চাপা গলায় বলল, 'তবে আর তোমাকে বলছি কি। পাইখানা-ঘাটা ধাওড়ার মায়ের পেটের ছেলে যে বাঁচে না। এও জানো না। চারটে তো শালা মরেই গেছে।'

বিষ্টু তেমনি ভেংচে খেঁকিয়ে বলে, 'তবে বিষ পুরে দো'খনি, সবশুদ্ধ গায়েব হয়ে যাবে।'

কিন্তু ফ্যালা ডোমের প্রাণ তাতে বাগ মানে না। ওই ভরদুপুরে বেসুরো গলায় গেয়ে ওঠে,

'ভালবেসেছিলুম বলে
মালাটি দিলে গলে
সোহাগ করে কোলে দিলে
নাদাপেটা ছে—লে !'

বিষ্টু আচমকা মুখ চেপে ধরে ফ্যালার। বলে, 'থাম্ শালা, ওই দ্যাখ।'

দেখা গেল সেই মাদী কুকুরটা একটা ঝোপের আড়াল থেকে ঠিক মানুষের মত উঁকি মেরে তাদের দেখছে।

দুজনেই একটু দাঁড়াল। ফ্যালা বলল, 'সরে এস, পেছু দিয়ে যাব।'

বলে তারা পিছন ফিরে একটা বাগানের ভেতর দিয়ে সন্তর্পণে এগুলো। এদিকটা এলাকার শেষ, তাই জায়গাটা গাছে, জঙ্গলে, বাঁশঝাড়ে ছাওয়া গ্রাম্য নিঝুমতায় আচ্ছন্ন।

বাগানের পিছন দিয়ে, খুব ধীরে সেই ঝোপটার কাছে এসেই তারা হতাশভরে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। নেই কুকুরটা। কোথায় গেল ?

হঠাৎ খড়খড় শব্দে চমকে ফিরে দেখল, বাগানের মাঝখান দিয়ে কুকুরটা ছুটছে! তারাও দুজনে ছুটল। কিন্তু খানিকটা ছুটেই তারা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কুকুরটা। নিঃশব্দ। দুজনেই কয়েক মুহূর্ত কান পেতে রইল। শুধুই হাওয়ার সড়সড়, পাতার মড়মড়। দুজনেই থেমে গেছে।

বিষ্টুর চোখ দুটো আরও হিংস্র হয়ে উঠেছে। সেই ছোঁয়াটা লেগেছে এবার ফ্যালারও। ঠেলে উঠেছে তার কানা চোখটা। বলল, 'হারামজাদী আমাদের চেয়েও সেয়ানা। চল দেখি ওই বাঁশঝাড়ের দিকে।'

দুজনেই পা টিপে-টিপে বাঁশ বাগানের মাঝখান দিয়ে চলল। খানিকটা গিয়েই বিষ্টু ফ্যালার হাত ধরে দাঁড়াল। বলল, 'মনে হচ্ছে, আমাদের ডানদিকের বাঁশঝাড়টা দিয়ে কে যেন যাচ্ছে!'

দুজনেই কান পাতল। না, কোন শব্দ নেই।

কিন্তু আবার তারা পা বাড়াতেই প্রতিধ্বনির মত ডানদিক থেকে শব্দ শোনা গেল। তারা থামলেই ওই শব্দটাও থেমে পড়ে। তারা তিন চোখে বোকার মত পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করে। ভূত নাকি? তবে তারা দুজনে কি?

বাঁশ বাগানটা শেষ হওয়ার মুহূর্তেই তাদের চমকে হতাশ করে দেখা গেল কুকুরটা তাদের চোখের সামনে দিয়ে সড়সড় করে মাঠের দিকে ছুটল। তার ছোটার দোলায় যেন ছিটকে পড়ার উপক্রম করল পেটের তলার স্তনগুলি।

এবার দুজনেরই রোখ চেপে গেল। দুজনেই ছুটল মাঠের দিকে মাথা নিচু করে। দেখল, মাঠের উপর দিয়ে ছুটে চলেছে কুকুরটা। ছুটে একেবারে পুবের সড়কটার উপর গিয়ে ফিরে দাঁড়াল। কিন্তু এরা দুজনেই মাথা নিচু করে রইল।

তবু কুকুরটা উত্তর দিকে ছুটে হঠাৎ রাস্তার নাবিতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সূর্য ঢলে পড়েছে। দুপুর শেষ হতে চলেছে। এই নিঝুমতার সুযোগে হাওয়া যেন আরও দুর্বার হয়ে উঠেছে। হাঁপাচ্ছে বিষ্টু আর ফ্যালা ডোম।

ফ্যালা বলল, 'আজ ছেড়েই দেও. কাল হবে।'

বিষ্টু খ্যাপার মত উঠে দাঁড়াল—'না, আজই ওকে নিকেশ করব, চ' পা চালিয়ে।' তারা যখন ছুটতে-ছুটতে সড়কে এল, তখন দেখা গেল কুকুরটা রেল লাইন দিয়ে ছুটছে। আরও উত্তর দিকে খানিকটা ছুটে পুবের নাবিতে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিষ্টু হতাশ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল, 'যাঃ ইউনিয়ন বোর্ডের এলাকায় চলে গেল।'

দুজনেই খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল তারপর হাঁপাতে-হাঁপাতে ফিরে চলল আবার মাঠ ভেঙে। বিষ্টুর চোখ ধক ধক করে জ্বলছে শিকার ফসকানো নিষ্ফল আক্রোশে। ফ্যালার ভাল চোখটা বন্ধ থাকায় ভাবটা ঠিক ঠাওর করা গেল না।

ক্লান্ত পায়ে মাঠ পেরিয়ে বাগান পেরিয়ে ঠাকুরপাড়া ঘুরে মুচিপাড়ার ঝোপে ছাওয়া সরু গলি দিয়ে তারা এগিয়ে চলল।

মুচিপাড়ার শেষ সীমানায় বিষ্টু আবার থমকে দাঁড়াল। দেখল এর মধ্যেই ফিরে এসেছে সেই মাদী কুকুরটা। শুয়ে পড়েছে একটা মানকচু গাছের পাতার

ছারায়। মেলে দিয়েছে ঠ্যাং, ছড়িয়ে দিয়েছে বুক পেট। আর তার পুষ্ট স্তন-গুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কতগুলো নধর তুলতুলে ছোট-ছোট বাচ্চা। চকচক শব্দে মাই খাচ্ছে, আর আরামে কুঁই-কুঁই করছে।

ফ্যালা দাঁতে দাঁত চিপে নিঃশব্দে ডাণ্ডাটা তুলতেই বিষ্টু চেপে ধরল তার হাতটা। ফ্যালা অবাক হয়ে লাঠিটা নামিয়ে নিল।

ক্লান্ত কুকুরটা টেরও পেল না তার দুশমনেরা এসে দাঁড়িয়েছে। দুধের ভারে তার টনটনে স্তন হালকা হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চাঠাসা বুকে আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে। হাওয়া বইছে আর কোথা থেকে একটা বসন্ত পাখি উল্লাসভরে ডাকছে।

বিষ্টুপদর ক্লান্ত ঘর্মাক্ত বিকট মুখটার সমস্ত আঁকাবাঁকা রেখাগুলো জাদুবলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের ক্ষিপ্ততা কেটে গিয়ে একটা চাপা বেদনায় ছায়াচ্ছন্ন হয়ে উঠল দৃষ্টিটা। বারবার তার চোখের সামনে ভাসছে এমনি একটা ছবি। এমনি, তবে সেটা গাছতলা নয়, ঘরের নিরালা কোলে একটা মানুষীর, দুপুরে অথবা মধ্যরাত্রে শুয়ে থাকার ছবি। এমনি, কিন্তু বাচ্চাগুলো মানুষের। এমনি, কিন্তু সে তার শিবি, খেপী নয়, তবু খেপী।

যেন ঘুম না ভাঙে, এমনি ফিসফিস করে বলল বিষ্টু, 'শুধু এই জন্যে জানিস, হারামজাদী ছুটছিল। ছেড়ে দে এবারের মত।' বলে সে খানিকটা গিয়ে আবার দাঁড়াল। আবার মুখটা বিকৃত করে, চোখ কুঁচকে পকেট হাতাতে-হাতাতে বিড়বিড় করে বলল, 'অল- শালা ব্লাডি বোগাস। ফ্যালা।'

ফ্যালা ভাবছিল শালা পাগলা সোনাটরবাবু। বলল, 'বল।'

'চারটে পয়সা দিবি?'

ফ্যালা ট্যাঁক হাতড়ে একটা আনি দিয়ে বলল, 'কেন, ওই হারামজাদীকে দেবে নাকি?' বলে খ্যালখ্যাল করে হেসে ফেলল।

বিষ্টু তখন ভাবছে, এতক্ষণে বোধ হয় মিঠুন লঙ্কার আচারের দোকানটা বন্ধ হয়ে গেছে। আনিটা নিয়ে রসগোল্লার হাঁড়িটা হাতে দিয়ে বলল, 'যাঃ শালা নিয়ে যা।' বলে উল্টো দিকে ফিরে হনহন করে এগিয়ে গেল। তেঢেঙে লম্বা, ভূতের মত ঠ্যাং ফেলে-ফেলে চলেছে যেন সেই মাথা মুড়নো তালগাছটা।

ফ্যালা একবার হাঁড়ি আর একবার সোনাটরবাবুর দিকে ভাল চোখটা বুজিয়ে বলল, 'অল শালা বেলাডি বোকাস। বলে হাঁড়ি নিয়ে ডাণ্ডা কাঁধে ফেলে ধাওড়ার দিকে ছুটল।

উত্তাপ

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়াল। আর ঠিক সেই সময়ে মেয়েটা আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। আবার ধকধক করে উঠল হরেনের বুকের মধ্যে। তার লিকলিকে শরীরের রক্তে-রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরও তোলপাড় করে উঠল। দেখল, মেয়েটাও ওর লোকজনের সঙ্গে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা?

ছোট স্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কয়েকজন। কিছু খেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে-ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে-ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকি-টাকি জিনিস হাতে, কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা-ভেজা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয়, এখনও হচ্ছে। তেমন জোরে নয়। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইলশেগুঁড়ি ছাঁট। এর আগের রাস্তায় জল আরও তোড়ে নেমেছে। ট্রেনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে কামরাগুলো পর্যন্ত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছিল গাড়িটাই লাইন থেকে হড়কে পড়ে যাবে।

আষাঢ় মাস, কিন্তু যেন শ্রাবণের ধাবা লেগেছে। মাঝে-মাঝে থমকায়। একটু আশা দেয়। আকাশ দাঁত খিঁচোয় দূরে-দূরে। ভাবখানা যাবি যা, নইলে এলুম বলে।

এসেই আছে। গড়িয়ে-গড়িয়ে আকাশটা অষ্টপ্রহর নামছে। মেঘ দলা পাকাচ্ছে উঁচু চড়াইয়ের মাথায়। মনে হয়, চড়াই পেরিয়ে উৎরাইয়ের ঢালু প্রান্তর দলা-দলা মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও চাষ-আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। যা আছে, খুবই সামান্য। সবটাই লাল কাঁকর-পাথরে ভরা। মাঝে-মাঝে কাজল চোখের চকিত চাউনির মত সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক-সার ভূতের মত মাথা তুলেছে সোজা-বাঁকা তালগাছ। তার ঘন বেষ্টনীতে খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে মেঘ অন্ধকার। তারপর দম আটকে চড়াই উঠেছে ঠেলে-ঠেলে, হামাগুড়ি দিয়ে। অন্য দিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা পলাশগাছ জলের ফোঁটা-পড়া পাতায়-পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ণ চোখে। তারপর কিছুই নেই, যত দূর চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই বিশাল প্রান্তর যেন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী, পড়ে-পড়ে প্রতি লোমকূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আষাঢ়ের ঢলে।

স্টেশনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল পরগণার সীমানা। পশ্চিমে, দূরে মেঘের কোলে মেঘের মত জেগে রয়েছে রাজমহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূর দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগল মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতিবিধি। যাদের সঙ্গে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো একটা বুড়ি, একটি মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে, কাঁধে ঝুলছে। চাষের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে। প্রথমে মনে হয়েছিল সাঁওতাল। কথা শুনে বুঝল, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগদী হবে। গাড়িতে উঠেছে ওরা নলহাটি থেকে।

মরদ নেই সঙ্গে। মনে হচ্ছে মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়ের। যেন ঝুঁটিওয়ালি একটি কলো মেয়ে-পায়রা। মদ্দা এসে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায়, বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে-দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্-বকম্। কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে। আর সঙ্গেও কয়েকটা বুড়ো-বুড়ি। তবে এত হাসির ঢুলুনি ঢলানি কিসের।

গাড়িতে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। হরেন তাব জীবনে অনেব মদ খাওয়া মেয়েমানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটাব টানা-টানা চোখ দুটিও যেন মদ-খাওয়া, চোখে একদিকে যেমন শান দেওয়া, আর একদিকে তেমনি ঢুলুঢুলু! নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধবেও গেছে হরেনের। হেসে-হেসে গাড়ির অনেকের প্রাণেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বোধ হয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায়, হাসিতে। রং করার ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এরা?

সে ওই দলটার পিছনে-পিছনে এসে দাড়াল, স্টেশনের বাইরে। তার ফিন্‌ফিনে মিলের ধুতি, পপলিনের চকচকে শার্ট। পায়ে কালো রং-এর বুট জুতো। রংটা ফর্সা কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চল্লিশেরও বেশি। শরীরের ক্ষয়টা জামার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। যেন বাঁশ-বাখারীর কাঠামোর উপরে ঝুলছে জামাটি। শালিকের মত সরু বুক। তার ওপরে বোতাম খুলে দিয়েছে বুকেব। গায়ে এসেন্সের গন্ধ।

বাপের আছে ভাল জমি-জমা—ঘর—পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুল কুনুটি বংশ কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহর শিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজের এক ক্লাসে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা সরস্বতীর পায়েই দেয়। তিনি হলেন দুষ্টু সরস্বতী। বিদ্যের প্রকৃতিটা একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, এ নেশা আট বছর ধরে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়, আর নেশার মত বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটিকে ভাল করে দেখল সে। গায়ে জামা নেই। নিভাঁজ গ্রীবার নিচে দিয়ে রুপোর বিছেহার বুকের টান-টান কাপড়ের ঢাকায় হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা দুটি পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁদুরের আভাস দেখা গেল এবার। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

মেয়েটা তাকাল হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটির কাছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে কি যেন বলল ফিসফিস করে। মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি ফিরে তাকাল। তারপর তাকাল বুড়ো-বুড়ি। কেমন যেন ছেলেমানুষের মত চাউনি বুড়ো-বুড়ির।

বুড়ো বলল হরেনকে, 'কুথাকে যাবেন গো, বাবু ?'

যাক, মুখ খোলা গেল। এবারে জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বলল, 'কে, আমি ? যাব তো রলাটি, কিন্তু—'

রলাটি ? ওরা সবাই ফিরে তাকাল ওর দিকে। বলল, 'অলাটি যাবেন আপনি! আরে বাপ ! গাড়ি নাই, দুস্তর রাস্তা, ম্যাঘ-বিষ্টি, কি করে যাবেন গো ?'

সেইটেই এতক্ষণে হুঁশ হল হরেনের। তাইতো! চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে গরুরগাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিগোস করল, 'তোমরা কোথায় যাবে ?'

'অলাটি।'

'রলাটি ?'

'হুঁ। ফি বছরে মজুরি খাটতে যাই গো। ইবারে এট্টুস আগে-আগে বেরোলম। দেখেন ক্যানে, আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে লিবে মনে হচ্ছে।'

হরেনের প্রাণে রস নামল আরও। রলাটি যাবে তাহলে ? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইল সে। বলল, 'কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস ?' কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটার দিকে। জবাব বুড়োই দিল, 'ইন্দির চাটুজ্যেমশায়ের ঘরে। অলাটির কুন্ ঘর আপনাকাদের ?'

'গদাই রায়, মানে গদাধর—'

'হুঁ হুঁ, বুঝলাম গো। তা, আপুনি—'

কথার মাঝেই সেই মেয়েটি কপট রোষে ফুঁসে উঠল, 'আ, কি যন্তনা গো, গপ্প করছ, ইদিকে যে দিন যায়।'

সবাই নড়েচড়ে উঠল। বুড়ো বলল হরেনকে, 'চলি গো, বাবু। সাত কোশ রাস্তা যেতে-যেতে বাতি জ্বলবে ঘরে।'

হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা-বোকা মনে হতে লাগল। সে কিছু স্থির করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার ওপরে জল। ফিটফিট করে পড়ছেও। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মত হাঁ করে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে।

চোখাচোখি হতে মেয়েটা আবার হেসে উঠল খিলখিল করে। সারা শরীরের সঙ্গে রূপোর বিছে হারটিও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মত চমকে উঠল। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পিছনে। খোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটা তুলে, মাথায় বসিয়ে দিল টোকা। বুকে কেটে-কেটে-বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ড-হীনের মত দাঁড়িয়ে রইল হরেন। ভাবল, হুঁ! রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে-বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাটকা রক্ত ক্ষতের মত ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। ক্রুদ্ধ খ্যাপা কুকুরের মত দূর আকাশ গবগব করছে থেকে-থেকে। থেকে-থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে একেবারে। আবার যেন কেউ পেন্সিল টেনে দাগ বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একটিও। সামনের রাস্তাটা গরু আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে বীরভূমের সীমানা পার হয়ে সাঁওতাল পরগণা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পরগণার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ বাঙালী গ্রাম। কয়েক ঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইল হরেন। আবাব ফিরে তাকাল দলটির দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পিছনে। তাকিয়েও বুকটা রনরন করে উঠল। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু পিছনটা যেন সমস্ত দলটিকে সাপটে হস্তিনীর মত দুলে-দুলে চলেছে। দেখতে-দেখতে আবার কানে এসে পৌঁছল অস্ফুট নিক্বণ।

আর দেখতে-দেখতে, শুনতে-শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মত পা বাড়াল হরেন। সঙ্গে-সঙ্গে পুবে-পশ্চিমে আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎ-কশায়। মাটি যেন রক্তাক্ত মুখ হাঁ করে হেসে উঠল। বাজ হানল আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে-নুয়ে পড়ল। সামনেব নেড়া তালগাছে সভয়ে কা-কা করে ডেকে উঠল একটা কাক।

হরেন চিৎকার করে-ডাকল 'ওহে, ও বুড়ো শুনো ক্যানে!'

ওরা দাঁড়াল চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝল হরেন, বুট জুতো কামড়ে-কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকুনি যেতে হাঁফ ধবে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটির দিকে তাকাল সে।

মেয়েটি তার দিকেই নিষ্পলক তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মস্করা, বোঝা যায় না। কালো পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বলল হরেন, 'গাড়ি আসে নি, আসবে কিনা কে জানে। চ' তোদের সঙ্গেই হাঁটা দিই।'

বুড়ো বলল, 'আরে বাপ! ই হয় না। আমরা জন-মজুর মানুষ, তাতেই আলামরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।'

বুড়ি সস্নেহ গলায় বলল 'হ'। না, না, ই হয় না।'

মেয়েটি হঠাৎ ধারালো ছুরির মত চকিতে হেসে বলল, 'প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে।' বলেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠল।

বুড়ি বলল, 'আঃ, ই কি হাসি। বড় বেহায়া তু, বউ।'

মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বলল, 'আকাশের গতিক ভাল না। আপুনি থাকেন গো। অলাটি কি এখানে? আমরা যেছি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলব।'

হরেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'না, যাব। এই তোরা ক'জনা রইছিস। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে-বলতে চলে যাব।'

আবার চিকচিক বিদ্যুৎ হানল। মেয়েটাও হাসল বিদ্যুতের মত। আবার এক ঝলক বাতাস নামল হুস করে। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মত চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়াল।

বুড়ো বুড়ি খানিকটা অসহায়ের মত চুপচাপ রইল। তারপর হাঁটা ধরল। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে-মেঘে হারিয়ে যাবে, সেই দিকে নিশানা। বাতাস এলে ছাট বেশি আসে। নইলে মন্থর ফিসফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ে ধরে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা হাঁটলে পাঁচ পা এগুনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিক ঘেঁষে চলল। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে গান মনে পড়ল। মনে পড়তেই গুনগুন করে গেয়ে উঠল, 'সখি, আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও···'ওদিকে চোখাচোখি হল মাঝ-বয়সীর সঙ্গে মেয়েটির। আবার হাসি। বুড়ো-বুড়ি নির্বিকারভাবে উঠছে ঠেলে-ঠেলে।

ওরা যত ওঠে, আকাশ তত ওঠে। উপরের বাতাসের জোর বেশি। বড় চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপরে উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের পর দিয়ে চলল সবাই। ঘাসে পেছলায় কম। কিন্তু ঘাসের তলে-তলে পাঁক। টেনে-টেনে ধরে। যত না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশি জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে-ধাপে হঠাৎ মাথা তুলেছে কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতকগুলো দত্যি মাথা নেড়ে-নেড়ে কানাকানি করছে। খসখস শব্দে হাসছে মানুষ দেখে। আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নিচু উঁচু। মেঘ বসেছে চেপে-চেপে।

মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিগ্যেস করল বুড়োকে, 'বউ দুটো কে হয়, বটে?'

বুড়ো টোকার তলা থেকে বলল, 'বিটার বউ। দুটো বিটার বউ। বিটারা গেলছে সক্কালবেলা, আগে-আগে। ইয়াদের লিয়ে এখন আমি চলছি।'

সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে-আগে। যেখানে জলের মত তরতর করে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দু'খানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিটকে যাচ্ছে রক্ত পঙ্ক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা। হরেনের কালো জুতো লাল হয়ে এসেছে। কাপড়ে লেগেছে চাপ-চাপ রক্তের মত।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সঙ্গে ভাব করা যাক আগে। রলাটির ছোকরা-বাবুদেব মন চেনে ওরা। কথার ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বলল, 'তবে ই বয়সে তুমার, দুটা বুড়ো-বুড়ির তো বড় কষ্ট, হে?'

বুড়ো হাসল টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মত। বলল, 'কস্‌ট? কস্‌ট কি গো, বাবু। ই কি রোগ-ব্যামো যে, কস্‌ট হচ্ছে? সম্‌সারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুনো কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবো, তখন মনে কস্‌ট হবেক।'

হরেনের মন বিগড়ে উঠল বুড়োব কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই-সাঁই শব্দ। কোমরে গাঁটে-গাঁটে কনকনানি। আর ওর বুড়ো-হাড়ে কোন কষ্ট নেই। ব্যাটা বজ্জাত, বেশি দূর হরেনকে এগুতে দিতে চায় না। হরেন আবার বলল, 'তা, বউ-বেটা সব চলেছে, লাতিলাত্‌কুর নাই?'

বুড়ো খালি বলল, 'নাঃ!'

বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে রইল। আটকে রইল যেন সকলের বুকেই। বুড়ো-বুড়ি, মাঝ-বয়সী আর···না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। ঝুঁটি-পায়রার মত বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা!

কেবল পাঁকে-পাঁকে থপ-থপ চপ-চপ। কালো-কালো কতকগুলো থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে। ডাকছে ওই সামনের চড়াইটার মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে হিলিবিলি বিদ্যুৎ, চিকচিক করছে তালবনের মাথায়। দগদগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুর গাড়ির লিক বেয়ে-বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মত। তরল কিন্তু আঁটালো। অন্ধকার নামছে। কে বলবে, এখন ভরদুপুর, যেন সাঁঝের শাঁখ বাজানোর সময় হল।

আস্তে-আস্তে ওদের চারজনের গতি বাড়ছে। বাড়াতে হচ্ছে হরেনকেও।

তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। যেন এতক্ষণ ধরে চেপে ছিল দম। আর সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে-গলে পড়তে লাগল। পট্‌পট্ ফুটতে লাগল ওদের তালপাতার টোকাগুলোতে।

তার মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বলল, 'হঁ, ছোট বিটার এট্টা ছেল্যা হয়েছিল। তা, পরে মরে গেল গো, বাবু। এই সিদিনে, ছ'মাসের ছেল্যা ···'

বুড়ির গলা দিয়ে শব্দ বেরুল, 'হুঁ-হু-হু···।'

ও! ওই মেয়েটারই ছ'মাসের ছেলে মরে গেছে। কিন্তু···

'দূর! বিরক্ত হয়ে উঠল হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ভিজে ঢোল। কাপড়ের কোঁচা দিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপসপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মত ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করল।

সে লাফিয়ে-লাফিয়ে আগে গেল! আগে, মাঝ-বয়সীটিকে পার হয়ে তার আসলটির কাছে। হুঁ। গালের পাশে এখনও সেই হাসিটি লেগে রয়েছে। আড়-চোখে দেখছে হরেনকে। দেখছে, আর কেঁপে-কেঁপে উঠছে ভ্রূ দু'টি। মন্দার খুনসুটি চায়। পাশাপাশি দু'হাত ফারাকে এসে পড়ল হরেন। হাঁপিয়ে পড়েছে আসতে। বলল 'কির‍্যা বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস!'

মেয়েটি চকিত চোখে একবার তাকিয়ে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। দেখে আরও হাসি পেল। পাওয়ার মত চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে, একটুখানি শরীরটি দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে দপদপ।

জ্বলছে রক্তের মধ্যে। পথচলা আর দুর্যোগকে কাবু করে দিচ্ছে। তবু নিজের রক্তে-রক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে। পশ্চিমে ছাট জলের। টোকার তলা দিয়ে জলের ছাটে বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে-ভিজে যেন আরও তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায়-রেখায়। রেখার বাঁকে-বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মত রুপোর বিছে-হারটির শেষ দেখা যাচ্ছে। খেয়াল নেই, টানাগোছার সময়ও নেই। শুধু টেপা ঠোঁটের কোণে-কোণে, টানা-চোখের আঙিনায় কি যেন খেলে বেড়াচ্ছে। রং খেলছে। রং চায় কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। দু'হাত ফারাক। দেড়-হাত ফারাক করল হরেন। ওই আকাশের মেঘের মত মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে-দুলে যেন নেমে আসছে হরেনের চোখের সামনে। বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচু-নিচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এল পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিয়ে দিল চোখ। যেন অনেকগুলো খ্যাপা কুকুর তীব্র চিৎকারে মাতামাতি শুরু করল। চোখের নজর হারিয়ে গেল হরেনের। সামনে শুধু জলের ধারা। সেই সঙ্গে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বুড়োর গলা শোনা গেল 'সামলে গো। সামলে চল। আবার জোর লেমেছে। সামনে কিন্তুক লদী।'

নদী আছে। হরেন দেখল, সে সকলের পিছনে। ছায়ার মত চারজনের দলটা তার আগে-আগে। সে মনে-মনে বলল, 'এঃ শালা, মরতে হবে নাকি? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পিছনে।

পরনের কাপড়টা সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘৎ ওপরে তুলে ফেলল। তার সরু পায়ে জুতো-জোড়া যেমন বড়, তেমনি ভারি দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছড়ানো রাস্তা। বড়-বড় চাংড়া, খোঁচা-খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হরেনের চেয়েও বড়-বড় পাথর। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থমকে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এরই তলে-তলে পাঁক।

সামনে নদী। ছ'হাত চওড়া নদী। এখন কোমর জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর-জলেই যা টান। ব্যাং ছানার মত টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খলখল করে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নিচে পাথরে হোঁচট খেয়ে একেবারে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হল। বুড়ি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকার তলায় কলকে সাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ তখন আধ-ঘোলা। দেখল মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় না জলের ঝাপটায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরল। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক হানছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে খুলে। কাছে যাবার জন্যে ব্যাঙের মত লাফাতে লাগল হরেন। মাঝ-বয়সীকে কি যেন বলছে মেয়েটি। ফিরে-ফিরে দেখছে হরেনকে আর বৃষ্টিধারার মত মরছে হেসে।

আবার, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন তবু কাছে গেল, মাঝ-বয়সীকে জিগ্যেস করল, 'তোরা হাসছিস যে?'

মাঝ-বয়সী এতক্ষণে বলল, 'ক্যানে? তুমাকে দেখে। ক্ষ্যামতা নেই, আসতে ক্যানে গেলে।'

হরেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে জবাব দিল, 'ক্যানে, এই তো চলছি।'

তার হাঁপ-ধরা দেখে ওরা দুজনেই হেসে উঠল। মেয়েটা আবার কাছাকাছি। চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বলল, 'সামনে লিদেন আসছে যে।'

নিদেন! বুকের মধ্যে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল হরেনের। মরণ আসছে তার সামনে! পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিলহিল করে।

মেয়েটা আরও কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তার নাকে। ওর নিচে ওপরে, বিশাল শরীরের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হরেনের। যেন রং চায় ওর প্রতি অঙ্গ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হয়ে উঠেছে হরেনের চোখে। নিশিরাইয়ের কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিয়ে বলল, 'নিশিআই আসলো, গো। আর একটু পা চালাও।'

নিশিরাই। হরেনের দাঁতে দাঁত লাগছে ঠকঠক করে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎ-কষায় লাল তেপান্তর দগদগে ঘায়ের মত লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেতনী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুজে চলেছে এবার। এদেরও নিশ্বাস হয়েছে ঘন-ঘন। থ্যাবড়া পায়ে মাটি থ্যাঁতলাচ্ছে।

মেয়েটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পায়রা নয়, নাগিনীর মত লকলক করে চলেছে। আর মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলা দিয়ে, আর নিচের থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। অবশ, অবশ একেবারে।

আবার বাজ হানল কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল হরেনের চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে। পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়ল সে।

'আ হা হা···' বুড়োটা সস্নেহে সভয়ে চিৎকার করে উঠল। বুড়ো-বুড়ি ছুটে এল। তারপরে মাঝ-বয়সী। তার পিছনে সংশয়ান্বিত পায়ে-পায়ে এল মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিল, 'আ-হা-হা! উঠো, উঠো গো বাবু। বলছিলাম তখন।'

ওঠে না হরেন। জলে ভিজে-ভিজে, হাড় কেঁপে অচৈতন্য হয়েছে। বুড়ো বলে উঠল, 'হে ভগবান। ইয়ার জ্ঞান লাই যে গো।'

জ্ঞান নেই। কে টেনে তোলে? বুড়ো-বুড়ি কাহিল। মাঝ-বয়সী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুলল। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়ার তলায়। বুড়ো অসহায়ের মত তাকাল পশ্চিমে। এখনও দেড় ক্রোশ। উই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরও সরে। তার নিচে একটি কালচে রেখা। ওইটে অলাটি। অর্থাৎ রলাটি।

হরেন কাঁপছে থরথর করে। কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ দিয়ে।

বুড়ি বলল, 'বউ, নোকটার কাঁপন নেগেছে যে? বাঁচবে তো?'

মেয়েটির চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও ব্যথা। বলল, 'তা—ই তো! আগে শুখ্না কাপড় একখান দেও এখন।'

বুড়ি তাই দিল বোঁচকা খুলে। মেয়েটি তার কোলে টেনে নিয়ে বসেছে হরেনকে। ভেজা জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড় জড়াল তাকে। নিজের টোকাটি দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝ-বয়সী তার টোকাটি দিল হরেনের পায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন করে বলে তেমনি সস্নেহ গলায় বলল, 'ইয়ার বড় বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অলাটি, তো খবর দিতুমনি? তা ই নোকের বড় বাড়াবাড়ি।'

বলতে-বলতে হেসে ফেলল মেয়েটি। স্নেহ-করুণ হয়ে উঠল চোখ। সেই চোখে সে দেখল হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করল মাঝ-বয়সীর সঙ্গে।

বুড়ো বলে উঠল, 'হুঁ। নোকটাকে তু বাঁচা গো, বউ। ই বুড়ো হাড়ে তো ক্ষ্যামতা লাই।'

মেয়েটা বলল, 'অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি না'ক গো। বাপ-মায়ের ছেল্যা তো এট্যা।'

'হুঁ। বাপ মায়ের ছেল্যা!'

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রক্ত তেপান্তরের খাড়াই-উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তালপাতার বাতাসে গুমরে-গুমরে উঠল কান্না। বাবলা ঝাড় বাতাসে মাটির বুক ভরে নুয়ে-নুয়ে পড়তে লাগল।

ছোট বিটার ছ'মাসের ছেল্যাটার শোক চারটে বুকে পাথর হয়ে জমে আছে। সে তো বাপ মায়ের ছেল্যা ছিল!

মেয়েটা দু হাত দিয়ে সাপটে ধরল হরেনের অচৈতন্য মুখ, 'ই কি বাড়াবাড়ি বাপু তোমার, অ্যাঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস! ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি করে মরণ ডাকে!'

হঠাৎ আবার কেঁপে উঠল হরেন। হাত-পা খিঁচিয়ে থরথরিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ।

'এ্যাই, এ্যাই দেখ ক্যানে, কাণ্ড। সভয়ে বলতে-বলতে মেয়েটি বুকের কাছে আরও আঁকড়ে নিল হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যত না জলে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে। বলল, 'তোবা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেয়ে গাড়ি পাঠায়ে দিই।'

মেয়ে বলে উঠল, 'হঁ, তুমি যাও গো, বাবা, ই তো ভাল বুঝি না।'

বুড়ো চলে গেল।

মাঝ-বয়সী বলল মেয়েটিকে, 'গরম করতে হবে। শরীরে কিছু নাই।'

মেয়েটি আরও বুকে চেপে ধরল। মাঝ-বয়সী বলল, 'মা, মরণ! বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস। আরও জল নাগছে যে মুখে। কাপড় সরা। নজ্জা কিসের? বাপ-মায়ের ছেল্যাটা। বুকের ওম্ পেলে গরম হবে।'

মেয়েটি কাপড় সরিয়ে দিল। কড়-কড় করে বাজ হানল। সাপিনীর মত বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে নেমে এল মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব ভয় সমারোহ এখানে কেমন শান্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাকে আড়াল করে মানুষ মানুষের মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনও। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে-চাপে গরম করতে লাগল। একটু-একটু করে অনেকক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।

এবার সত্যিকারের অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনও গরাইয়ের সেই মানুষ-ডোবা রক্ত-পাঁক পার হতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠল। বিছের মত সুড়সুড় করে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে, কোমরের আশপাশে। দেখল চোখ চেয়েছে হরেন। যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি বিস্ময়! যেন সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই আর একবার কেঁপে উঠল সে। বিস্ফারিত চোখে আর একবার দেখে হিংস্র চোখে হেসে উঠল সে। মুহূর্তে সরু-সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরল মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে দিল গায়ের ওপর থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের রুগ্ন মুখটার হিংস্রতা দেখে থমকে

গেল। রক্তের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরেন প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিল মেয়েটার দুই হাতের তলা দিয়ে। মুখ তুলে আনতে চেষ্টা করল ওপরে।

দপদপ করে জ্বলে উঠল মেয়েটার টানা চোখ। তার বলিষ্ঠ নিটোল হাতের এক ঝটকায় ছিটকে ফেলে দিল হরেনকে। বলল, 'আ মরণ, কেন্নোর মরণ গো!' বলে, সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠল মেয়েটি, 'ই আর বাঁচবেনি দেখছি, গো।'

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে-দিকে, উঁচু-নিচু তেপান্তর যেন হাসছে রক্তাক্ত মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়ার মত পায়ে-পায়ে আসছে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখামাখি। আবার কাদা লাগল। পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করল। চোখ তার তখনও মেয়ে-বুকের উত্তাপে চকচক করছে।

এমন সময় ওপরের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োর। বলদের ঘণ্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

গাড়ি এল, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুলল। তুলে চলল।

এতক্ষণে শরীরের যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটি নোনা-ধরা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনও তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে চলল। মেয়েটির চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হয়ে উঠল। বুকের কাপড়টি কষে টেনে দিল সে। ওদের পিছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চাকা দুটো কঁকাচ্ছে। কঁকিয়ে কাঁদছে।

উৎপাত

সুরীন দাঁতে দাঁত ঘষল। হলদে চোখজোড়া আর খয়েরি তারা দুটো দপদপিয়ে উঠল। মনে মনে বলল, 'মাগীর ছিনালিটা একবার দ্যাখ। ভিক্ষে মাগতিছে, না ভেটকে মারতিছে, অ্যাঁ? লোকটারে বুকের ওলান খুলি দ্যাখাবে নাকি? বীজ খাগী।'

বীজ কি ও-মাগী একলা খেয়েছে নাকি? তা খায় নি। সবাই মিলে খেযেছে। ঘর-গোষ্ঠীর কেউ বাদ ছিল না। কিন্তু সে-ই শেষ খাওয়া। সুরীন নিজেও খেয়েছে। নিজেদের ভিটেয় বসে, সেই শেষ ধান কাটা, শেষ ঝেড়ে-বেছে ফুটিয়ে খাওয়া। দাদা যোগীন খেয়েছে। তার পরিবার—অর্থাৎ কিনা বউ। সুরীনের হল গিয়ে বউদি, সে আর তার চার ছেলেমেয়ে। তারপরে ধরা যাক যমের অরুচি বুড়ি মা। দাঁত নেই একটাও, চোখে এই মোটা পর্দা পড়েছে, দেখতে পায় না। কিন্তু খাবার জন্যে সব সময়ে ঘ্যানঘ্যান করে। সেও খেয়েছে। সুরীন তো খেয়েছেই, তার বউ আর দুটো ছেলে, তারাও খেয়েছে। হালে এই ইষ্টিশানের রকে, চালার নিচে মাস পাঁচেক হল, আর একটা মেয়ে বিইয়েছে। তা বিয়োতেই পারে। বাহ্যে পেচ্ছাব করে। 'প্যাটে ভাত না থাকিলে, শরীলির কুড়কুড়োনি বাড়ে' এ বৃত্তান্ত দেবতায়ও জানে। সেইজন্যেই কথায় বলে, 'প্যাটে ভাত নাই, পুরুষাঙ্গে সিঁদুর। এ তো আর মজা মারার কথা না, যন্ত্রণার কথা। এমনি-এমনি কেউ বানায় নি। তা যদি না হত, সুরীনের মত সব মানুষের বউয়েরা কাকবাঁজা হত। এক বিয়োনি যাকে বলে। ভাত, কড়ায়ের ডাল, মাছের অম্বল, হালুইকরের দোকান থেকে লাল রঙের বোঁদে, পঞ্চাশ-ষাট জন লোকের খাওয়া, কম কথা না। তার সঙ্গে লম্প হ্যারিকেন ছ-সাতটি, একটি হ্যাজাক বাতি, কয়েক ঘণ্টার জন্য। একে বলে বিয়ে। ঠ্যালার নাম বাবাজী। সবটাই ধার দেনা গলা অবধি ঋণের বোঝা নিয়ে, এই ভাবে সুরীনদের বিয়ে করতে হয়।

তার মধ্যে উনিশ-বিশ থাকে না, এমন না। বোঁদের সঙ্গে মণ্ডা কর। দুটো হ্যাজাক বাতি জ্বালাও। কি রমরমা। সুরীনের দাদা যোগীনের বেলায় তাই হয়েছিল। বাপ নাগিন মাহাতো তখনও বেঁচেছিল। যত রমরমা তত ঘা। ধার দেনা সুদ মানুষের বয়সের মত। কমে না, বাড়তেই থাকে। বাড়তে-বাড়তে একদিন মরণ ধরে। তার মধ্যে কথা আছে। বিয়ে হল, বউটি ঘরে এল, অমনি বিয়েনের

ভিয়েন চড়ল, তা হবার তো যো নেই। শুনতে বিয়ে, আসলে একরত্তি মেয়ে। নাকের নোলকে সিকনিতে মাখামাখি। একগলা ঘোমটা টেনে, ক্যাওড়া ঝাড়ের আড়ালে কাপড় তুলে বসে যায়। শাবল খুঁচিয়ে মাটি গর্ত করা না, যে গর্তে জল ঢেলে, বীজ পুঁতে দিলে বা চারা লাগিয়ে দিলে, আর ফলন হল। মাঠ-মাটি জল বীজের ব্যাপারে বটে। মানুষের রকম-সকম একটু আলাদা। তবে হ্যাঁ, কথায় বলে মেয়েমানুষ। বারোতেই সড়গড়। তেরোতে বিয়েন। তার আগের বছরগুলো ঘরে মাঠে ঘাটে কাজের বিস্তর সুরাহা হয়। সংসারে কেউ বসে খেতে আসে নি। বাপের বাড়ি না, শ্বশুরবাড়ি। বিয়েনের আগেই সংসার, মাঠ-ঘাটের কাজের গোছ রপ্ত হয়ে যায়। তারপরে ভিয়েন যখন হল, তখন তো মহাসুখ! এমন না যে তে-রাত্রি পোহাতেই সুখ শেষ। আসলে শুরু। তখন সুখ আর সুখ থাকে না, 'কিছু তো খাতি হবে। খাবাটা কোন্ লবডংকা?' ওই জন্যে বলেছে 'প্যাটে ভাত না থাকলে, শরীলির কুড়কুড়োনি বাড়ে।' তা না হলে সুরীনদের ঘরে মা ষষ্ঠীর এত কৃপা হয় কেমন করে। বউ কাকবাঁজা হয়ে থাকত। এমন তো কেউ বলতে পারবে না, চারবেলা ভাত গিলে, গায়ে গত্তি করে, এ-বেলা ও-বেলা ভিয়েনের খুন্তি নাড়া হচ্ছে। বরং চারবেলা খাবার সঙ্গতি আছে, তারা কেবল ঘরে ভিয়েন করে না। হাটে-গঞ্জে বারোভাতারিদের কাছে যায়। গাঁয়ে-ঘরেও কি ছেড়ে কথা কয়? নোলা ছোঁকছুঁকিয়েই আছে। এর ঘরে কড়ে রাঁড়ি। তার ঘরে জামাই-খ্যাদানো মেয়ে। ঘাড়ের বোঝা অভাবের সংসার হলে তো কথাই নেই। কাজই বা কোথায়, খেতেই বা দেয় কে। না খেয়ে মরার থেকে, তখন নষ্ট হওয়াটাকে মার্জনা মনে হয়। তার জন্যেই বলেছে, 'পেটে নাই ভাত, নাঙের উৎপাত।' শুনতে মজা লাগে, উৎপাত যে সয়, যন্ত্রণার কথা সে জানে।

চারবেলার খাওয়ার চেকনাই যাদের গায়ে, তাদের জোতজমা খামার বিষয়-আশয়ের কথা বুঝিয়ে বলতে হয় না। দেখলেই বোঝা যায়। সুরীনের মতে তাদের বউয়েরাও কাকবাঁজা হয় না, তবু তারা ভাত ছিটিয়ে সুখে চরে বেড়াতে পারে। সুরীনদের কি সুখ? পেটে ভাত নেই, তবু এত কুড়কুড়োনি কিসের? এমন না যে কুড়কুড়োনি কেবল সুরীনদের শরীরে। বউদেরও। কেন? বৃত্তান্ত কি?

বৃত্তান্ত ক্ষুধা। ক্ষুধা রাগ কষ্ট, সব মিলেমিশে, এঁড়ে লাগা ছেলের মত, মায়ের শুকনো বোঁটা চোষা। ক্ষুধা মেটে না, জ্বালাও জুড়োয় না। তখন থাকে তো কেবল উপবাসী ন্যাতাজোবড়া দুটো শরীর। ক্ষুধা মেটাবার ক্ষুধা তখন শরীরে-শরীরে। কেউ শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় না, বলে দেয় না। যেন মরার ভয়ে আঁকড়া-আঁকড়ি। কি জ্বালা! তবে আর সুরীনদের বউরা কাকবাঁজা হবে কেমন করে? ষষ্ঠীঠাকরুণ যে শরীরের অঙ্গ বুঝে, সেখানে রায়তী স্বত্ব নিয়ে ঠাঁই করেছেন।

'বাবুরা দুটো পয়সা দিয়ে যান। না খেয়ি মরতিছি। গাঁয়ে কিছু নাই, ঘর চাষবাস সব ছেড়ি এসেছি, বাবুরা। দুটো পয়সা দিয়ে যান, এই ছাওয়ালডারে

বাঁচান।' অমনোযোগী সুরীন কেবল বলার অভ্যাসে বলে যাচ্ছে। সে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের বাইরে, গাছতলায় বসে নিতান্ত অভ্যাস বশে আর্তস্বরে, হাত বাড়িয়ে মেগে চলেছে। গাছতলায় খালি গা ল্যাংটো পাঁচ মাসের ছেলেটা ঘুমোচ্ছে। সারা গায়ে, নাকে মুখে মাছি। তবু ঘুমোয়। ছেলেটা ঘুমোলেই, বউ সুরীনের ভিক্ষে করার গাছতলায় শুইয়ে দিয়ে যায়। দিয়ে, নিজে ঘুরে-ঘুরে ভিক্ষে করে।

সকলেরই একটা করে জায়গা আছে। সুরীন চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে, গাছের নিচে। যোগীন অন্য প্রান্তে। প্ল্যাটফর্মের পোলের নিচে ছায়ায়। সামনের যে-দুটো প্ল্যাটফর্মে ঘন-ঘন গাড়ি দাড়ায়, বেশি যাত্রী ওঠা নামা করে, তার প্রথমটার ছাউনির তলায় ঘোরাফেরা করে যোগীনের বউ আর বড় মেয়েটা। ছেলে দুটো স্টেশনের বাইরে রাস্তায় দোকানের দরজায়-দরজায় ঘোরে। বছর তিনেকের মেয়েটা, আর সুরীনের দুটো, চার নম্বরের নিরালা কোণে, অন্ধ বুড়ি মায়ের কাছে থাকে। থাকে বললে ভুল বলা হয়। ওরাও লোক দেখলে 'বাবু গো বাবু গো' করে হাত পেতে বেড়ায়। আর নিজেদের মধ্যে খেলা করে মারামারি করে। একমাত্র রবিবার বুড়ি মাকে রেখে, সবাই আলাদা-আলাদা পাড়ায়-পাড়ায় লোকের দরজায়-দরজায় যায়।

সুরীনরা এইভাবে স্টেশন বন্ধন করেছে। চারটে প্ল্যাটফর্ম জোড়া স্টেশনে, একমাত্র সুরীনদের পরিবারই স্থায়ী বাসিন্দা। চার নম্বর প্ল্যাটফর্মের ছাউনির এক কোণে তাদের ভিখারির সংসার। সুরীনরা নিজেদের বলে, 'গাঁয়ের গরীব দুঃখী চাষী।' চার নম্বর প্ল্যাটফর্মকে ওরা বলে, 'পেছুনকার রেল দাওয়া।' এই প্ল্যাটফর্মে গাড়ি কম চলে। যেগুলো চলে, তার বেশির ভাগই ঝমঝমিয়ে চলে যায়, দাঁড়ায় না। সেইজন্য এই প্ল্যাটফর্মে চড়ুইয়ের ঝাঁক নামে। কাক এসে সুরীনদের ডেয়োঢাকনা বোঁচকাবুঁচকি ঠোঁট দিয়ে খোঁচায়। বুড়ি মায়ের ঘাড়ে বসে, মাথা মুখ ঠোকরায়। বুড়ি ভয়ে কেঁপে ওঠে। কাক মানুষকে কখন ঠোকরায়? বুড়ি হাত পা ছুঁড়ে ভয়ে চিৎকার করে, 'বাঁচাও বাচাও, জ্যান্তে মড়া খায়। আমি মরি নাই।' চিৎকার শুনে ল্যাংটো নাতি-নাতনীগুলো এসে কাক তাড়ায়।

সুরীন প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে, রাস্তার ধারে গাছতলা আগলিয়ে, নিতান্ত অভ্যাসবশে ভিক্ষে মাগার বুলি আউড়ে চলেছে। রাস্তা দিয়ে যাত্রীদের যাতায়াত। সেইজন্যে রাস্তার ধারে গাছতলা-বন্ধন। দু বছর ধরে ধীরে-ধীরে এই আসন-অবস্থান -বন্ধন তৈরি হয়েছে। একদিনে হয় নি, ভেবে-চিন্তেও না। আপনি আপনিই, যার যেখানে ঠাঁই, ঠিক হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখন সুরীন অমনোযোগী। যাত্রীদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে না, কেবল মেগে যাচ্ছে। তার লক্ষ্য দুই আর তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের এক নিরালা ধারে, যেখানে তার বউ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে একটা লোকের সঙ্গে কথা বলছে। কথা বলছে, হাসছে। তার খয়েরি চোখ দুটো দপদপ করছে, দাঁতে দাঁত পিষছে। 'হাসি আসে কমনে থেকি? বুকের কানি

ন্যাকড়া নিয়ে এত নাড়াচাড়া কিসের ?' দাদার আর তার, একটা বউও শুটকায় নি, বর্ষার বুনো কচু গাছের মত খাড়া ডগডগে। ওলান দুটি বড়সড় বুনো মত। সুরীন রাগে অবাক হয়ে ভাবে, বৃত্তান্ত কি ? লোকটাও তো বউয়ের বুকের দিকেই তাকিয়ে হাসছে, আর কি যেন, বলছে। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুজনে এমন হেসে-হেসে কথা বলছে, যেন কত কালের চেনাশোনা। সেই উৎপাত নাকি ? 'হারামজাদী বীজখাগী !' সুরীন দাঁতে দাঁত পিষে আবার বলে, আর সেই সঙ্গে, 'বাবুরা, দুটো পয়সা দিয়ি যান।'

না, ও-হারামজাদী একলা বীজ খায় নি। ঘর-গোষ্ঠীর সবাই খেয়েছে। ঘরে বসে সেই শেষ খাওয়া। বর্গাদার হিসাবে সরকারের কাছ থেকে পাওয়া দশ কিলো বীজধান। দুই ভাই বীজতলা কোদাল দিযে কুপিযে তৈার করেছিল। কিন্তু জল কোথায় ? বৃষ্টির আলসেমি না নষ্টামি, কে জানে। খরার কোপে, কোপানো বীজ-তলায় ধুলো উড়তে আরম্ভ করেছিল। ওদিকে জোতদার বল, মহাজন বল, ঠাকুর একজনই। সমস্ত বছরের পাওয়ানা ধান আগেই দিয়ে দিয়েছিল। তা খেয়ে সাবাড়ও করা হয়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি হলে, কাজ শুরু হলে, আবার হাতে পায়ে ধরে, পরের বছরের পাওয়ানাটা চাওয়া যেত। ধার দেনা সুদ কমে না, বাড়ে। দু বছরের ভাগের ফসলের ঋণ তো ছিলই। বৃষ্টি হল না, কাজ শুরু করা গেল না, আর ঋণ চাওয়া গেল না। বীজধান কুটে চাল করে খেযে ফেলেছিল। সে-খাওয়া তো দু দুদিনের। তারপরে ?

না, কানে কেউ মন্ত্র দেয় নি। খবর প্রায়ই পাওয়া যাচ্ছিল। ও গায়ের অমুকেরা শহরে পালিযে গিযেছে। সেই গায়ের তমুকেরাও গিয়েছে। প্রথম-প্রথম গা ছেড়ে যাবার খবর শুনলে, সুরীন আর যোগীন, দুজনে চোখে-চোখে তাকিযে থাকত। তা নিয়ে কোন কথা বলত না। পরে কথাবাতা একটু-আধটু বলত। কিন্তু আশা ছাড়তে পারত না। তারপর সেই বীজধান কুটে খেয়ে, পেটের খরা দু দিনের জন্য মিটিয়ে, সব আশা শেষ হয়েছিল।

দুই ভাইয়ে কথাবার্তা তেমন কিছু হয় নি। যোগীন যেন তৈরি হয়েই জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হলি ?'

সুরীন বলেছিল, 'বাঁধাছাদি করি রাখ। রাত পোহাবার আগে, রাত্তিরি রাত্তিরি যাত্রা।'

মন তৈরি হয়ে গিয়েছিল। মরার ভয় নিয়ে, ঋণের বোঝা আর আগামী আরও দু বছরের শ্রমস্বত্ব ফাঁক দিয়ে, পালানো ছিল অনিবার্য। প্রথমে কলকাতা। সেখানে রাস্তার বাসার ভারি টানাটানি। বড় রেষারেষি আর আকচা-আকচি। তারপরে কলকাতা থেকে, এই স্টেশনে। কয়েক স্টেশনের ফারাক। সবাইকেই বাসা খুঁজে নিতে হয়। কিন্তু এ বাসা গেমোতলির সেই ভিটে না। গোলপাতার চালা, ছ্যাঁচা বাঁশের বেড়ার ঘর। এখনও কি মনে আছে ?

কিন্তু সুরীনের এত রাগ কিসের ? এখনও রাগ ? উৎপাতের কথা কি সে জানে না ? সন্ধ্যে না হতেই পেছনকার রেল দাওয়ার আলো আঁধারিতে কারা সুরীনদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করে, বউ আর বড় ভাজ অন্ধকারে হঠাৎ-হঠাৎ কোথায় উধাও হয়ে যায়, এ সব কি না জানবার, না বোঝবার কথা ? পেছনকার রেল দাওয়ায় রাত্রের অন্ধকারে ইঁট পাতা উনোনে কাঠ-কুটোর আগুন জ্বলে, সেই আগুনকে চিতার আগুনের মত দাউদাউ মনে হয়। প্রতি রাত্রে না, কোন-কোন রাত্রে। সেই উনোনে হাঁড়ি চাপে কেমন করে ?

উৎপাতে চাপে, সুরীন জানে। দাদার মেয়েটা বারো পার হতে চলেছে। সারাদিন গায়ে গতরে এমনিই অনেক আঁচড়ের দাগ লাগে। অন্ধকার হলেই বাপ-খুড়োর মাঝখানে এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে। যেন হাঁস মুরগির ছা, কখন শেয়ালে ছোঁ মারবে। নিজের মাকেও বিশ্বাস করতে পারে না। খুড়িকেও না।

সুরীন বুঝবে না কেন ? সবই বোঝে। হাজার-হাজার মানুষ তাদের চোখের সামনে দিয়ে রোজ রেলগাড়িতে যাওযা আসা করে। এই স্টেশনে ওঠানামা করে। তাদের চোখের সামনে সুরীনদের এই বাসা। বউ আর ভাজ সকালে সন্ধ্যায় স্টেশনের জলকলে গা ভিজিয়ে চান করে। কত লোকের সঙ্গে হেসে-হেসে কত কথা বলে। ছায়ারা আশেপাশে আনাগোনা করে। ছেলে-মেয়েগুলো দলা পাকিয়ে শুয়ে থাকে। কাঁদে না, হয়তো ঘুমায়। মা কেবল 'খাতি দিবা না' বলে ঘ্যানঘ্যান করে। সুরীন আর যোগীন দুজনে, স্টেশনের যেদিকে বেশি আলো, সেই দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। গেমোতলির কথা কি মনে পড়ে ? ফিরে যেতে কি ইচ্ছা করবে ? কেন বুঝবে না সুরীন, বউ কেন এত হাসে, লোকটাব সঙ্গে এত কি কথা হয় ? কেন বুকের কানি ন্যাকড়া ধরে বারে-বারে নাড়াচাড়া করে ? লোকটার চোখ-খাবলা নজর যে সরে না। বউ স্ত্রীলোক তো ? অস্বস্তিতে ও রকম করে। সুরীন বুঝবে না কেন ? আর হেসে-হেসে এত কথা ? কথা তো একটাই। উৎপাত, উৎপাত, উৎপাতের কথা। তবু কেন প্রাণে জ্বালা ধরে ?

এই জ্বালাও আর এক উৎপাত ? সুরীন গাছতলায ঘুমন্ত ছেলেটার দিকে একবার তাকায়। পেটে ভাত না থাকলি শরীলির কুড়কুড়োনি বাড়ে। এ কি সেই উপবাসের ধন, এই ছেলে ? নাকি উৎপাতের ধন ? কে জানে ?···'আ-বাবুগো, মরি যাতিছি, দুটো পয়সা দিয়ি যান, ছাওয়ালডারে খাওয়াব।'······

বিকাল গড়িয়ে যাবার আগেই বউ, স্টেশনের জলকলে নেয়ে ধুয়ে এল। বোঁচকা খুলে, একখানি মাত্র জলের মত পাতলা আস্ত কাপড়টি বের করে, গায়ের ভেজা ন্যাকড়া ছাড়ল। ন্যাকড়া নিঙড়ে মাথা মুছতে-মুছতে আবার রাস্তার দিকে হাঁটা দিল। বড় ব্যস্ত, তাই না ? এখনও তো অন্ধকার নামে নি, কোথায় যায় ?

উৎপাতের সময় তো এখনও হয় নি। পালাবার তাল নাকি? মাঝে মধ্যে যখন ঝগড়াঝাটি খামচাখামচি মারামারি হয়, তখন প্রায়ই বলে, 'আমার কি চিন্তে? গতরে তো পোকা পড়িছেই। চলি যাব।'

যেতে পারে। তবু সুরীনের জ্বালা ধরে, ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে, আর এখন পায়ে-পায়ে এগিয়ে যায়। যায়, বেশি দূরে না। কয়েক পা গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। দেখতে পাচ্ছে, বউ স্টেশন থেকে নেমে বাঁদিকের রেল গেটের তলার ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়াল মুদী দোকানটার সামনে। কেন? রোজগার কত হয়েছে? দোকানদারকে হেসে-হেসে কি বলছে। দোকানদারও তেমনি। সুরীন কথা শুনতে পাচ্ছে না, মারমুখী ভঙ্গিটা দেখতে পাচ্ছে। তবু বউয়ের সরে আসবার নাম নেই। হাত জোড় করে ভিক্ষে মাগছে। এই অসময়ে? তা আবার কোন দোকানদার দেয় নাকি? এখনই গায়ে জল ছিটিয়ে দেবে। হ্যাঁ, এখানে তাড়াবার ওটা একটা ফন্দি, গায়ে জল ছিটিয়ে দেওয়া।

কিন্তু দোকানদার কাগজের একটা পুরিয়া যেন ছুঁড়ে দিল। বউ পুরিয়াটি নিয়ে হাসতে-হাসতে আবার গেটের তলা দিয়ে মাথা গলিয়ে, এদিকেই আসতে লাগল। আসতে-আসতে থামল, এদিকে ওদিকে দেখে, লোহার বেড়ার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। দু হাতে পুরিয়াটা আস্তে-আস্তে খুলল। সন্ধক নুনের গুঁড়ো না? আবার মেগে নিয়ে এল? লুকিয়ে খাবে। ওইটুকু বস্তু, লুকিয়ে না খেলে ছেলেমেয়েরা কেড়ে খেয়ে নেবে। তা খেয়ে নিতে পারে। কিন্তু এত সাবধান কেন? ওতে কতটা পেটের জ্বালা জুড়োবে?

সুরীন অবাক হয়ে দেখল, বউ পুরিয়ায় আঙুল ডুবিয়ে মুখে দিল না। সিঁথেয় টেনে দিল। আবার পুরিয়ায় আঙুল ডুবিয়ে কপালে ছোঁয়াল। বার কয়েক সিঁথে কপালে ছুঁইয়ে পুরিয়াটা কোমরে গুঁজে রাখল। এদিকে ফিরে এগিয়ে এল। সুরীন দেখল, বউয়ের সিঁথেয় লাল টকটকে সিঁদুর। কপালে ফোঁটা। সিঁদুর ভিক্ষে করতে গিয়েছিল?

বউ সুরীনের সামনে দিয়ে চলে যেতে গিয়ে দাঁড়াল, হেসে বলল, 'নোকেরা বলতিছিল, আজ নাকি বেস্পতিবার। পানের দোকানির আয়নাতি দেখলাম, সিঁথেটা বিধবাদের মতন সাদা। তা দোকানিটার কাছে এক চিমটি সিঁদুর মাগতি গেছি, এই মারে তো সেই মারে।'

বউ হাসতে-হাসতে চলে গেল। সুরীনের মনটা কেমন আনচান করে উঠল। মনে মনে বলল, 'মনের মদ্যি গেমোতলি উৎপাত করি উঠতিছে। গেমোতলির কি উৎপাত!'

লড়াই

আবার জল বাড়তে লাগল। বেত্‌নি নদীতে জল আবার বাড়তে লাগল। কালো হল। ফুলতে লাগল। কিন্তু শব্দ নেই। ঢেউগুলি ফণার মত বড় হতে লাগল। উঁচু হতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দ নেই। চুপি-চুপি আবার সে এল সমুদ্র থেকে, নদীর তলে-তলে। চোরা 'ঝুটো'র মত এল সমুদ্রের জল নিয়ে। আর ফুলতে লাগল। উঁচু হতে-হতে বাঁধ ছাড়িয়ে গেল। ছাড়াতে-ছাড়াতে আকাশের সমান উঁচু হল। আকাশে ফটফটে তারা ছিল। ঢেকে গেল, লেপটে গেল। আর জলের তলা থেকে সেই জলস্তম্ভের ঝুটো এবাব প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে-ঘুরতে এগিয়ে আসতে লাগল। কিন্তু কোন শব্দ নেই।

বদি সরতে লাগল। এই! এই আবার আসছে। বাদ গা ঘষটে-ঘষটে বড় নখ দিয়ে মাটি খামচে সরতে লাগল। এই! অপ্‌ঘেতেটা আবাব আসছে। আবার সোহাগ করে বলত, 'অ সোনা, তোব নাম রেখেছি বদবালাবাযোন। বদি সরতে লাগল। কুঁকড়ে বেঁকে ছোট হয়ে একটা দেযাল খুঁজতে লাগল। একটা কোণ। আর গায়ের মধ্যে চটচট করতে লাগল ওরই বিষ্ঠা আর মূত্র।

কিন্তু আকাশ-সমান সেই কালো জল সাপেব মত নিঃশব্দে এগিয়ে আসতে লাগল। আর জলস্তম্ভের ঘূর্ণিপাকে পড়ে মাছগুলি ছিটকে যাচ্ছে। রাক্ষুসে কামটগুলি ওলটপালট খাচ্ছে। কিন্তু কোন শব্দ নেই। আর এগিয়ে আসতে লাগল। বাঁধ ডিঙিয়ে নেমে একেবারে বদির সামনে এসে দাঁড়াল। জল দু-ভাগ হয়ে গেল। আর জলস্তম্ভটা আবার সেই মূর্তি ধরল।

সেই কুলোর মত বড়-বড় কান। সাদা মুলোর মত দাত। পাঁশুটে রোঁয়া-ভরা প্রকাণ্ড মুখ আর ঝুলে-পড়া চোখ। ঝুলে-পড়া চোখ দুটো চোযালের ওপর নেমে এসেছে, আর সেখানেই অঙ্গারের মত তারা দুটো জ্বলছে, নড়ছে। সে ফিসফিস করে ডাকল, বদি!

বদি চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না।

সে বলল তেমনি, চেঁচাস না বদি। তোর সময় হয়ে গেছে।

বদি মুখ ঢেকে বলল, না, আমি তোর সঙ্গে যাব না। তুই দানো!

আমি তোর বাপ নেতাই।

এখন তুই দানো। তুই অপঘাতে মরেছিস, তুই ঝুটোতে গা ঢেকে এইছিলি।
হ্যায়, আমি দানো, কিন্তুন তোর বাপ। তোকে নিতে এইছি।
বদি দু-হাত দিয়ে বুক ঢেকে চিৎকার করে উঠল, আমি যাব না।
যাবি। তোর সময় হয়েছে।
আমি যাব না।
আমি একলা আছি বদি। আমার আর কেউ নেই।
আই কামটের বাচ্চা, তুই দানো। আমি যাব না।
গাল দিস না বদি।
হেই শোরের বাচ্চা, তোকে, গুনিনে খাক।
ও-নামটা করিস না বদি।
আ-ই গু-নি—ন-হে··· !

জল সরতে লাগল। মূর্তিটা জলের ঘূর্ণিস্তরে ঢুকতে লাগল। বদির নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। হঠাৎ নিশ্বাস পড়তে লাগল জোরে-জোরে। সে আরও জোরে-জোরে চিৎকার করে উঠল, আ-ই গুনি-ন, বাউল—হে !···

জল সরতে লাগল আর নিচু হতে লাগল আর ঝুটোর জলস্তম্ভে দানোটা আস্তে-আস্তে ঢুকতে লাগল। বদি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল, আই দানোরো শমনো হে গুনিন—! আই দ্যাখসে, আই তেরো বছরের বদিকে শালা নে যেতে এয়েছে।

জল বাঁধের ওপর সরে গেল। নিচু হতে লাগল আর আকাশটা দেখা গেল। তারা দেখা গেল। চুপি-চুপি স্বর ভেসে এল আবার, কিন্তুন তোকে যেতে হবে বদি।

আই মা বনবিবি গ··—, আই দ্যাখসে, আমার বাপ বিষ্ঠাখেগো দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ ··। হে খোকাঠাকুর গ, আই দ্যাখসে, আমি জোয়ান হুই নাই, মাছ মারতে যাই নাই, আর ঢ্যামনার বাচ্চা দানোটা আমাকে নে যেতে চায় গ—

জল সরে গেল বাঁধের ওপারে, নদীর ওপরে। আর নিচু হয়ে গেল, নদীর সঙ্গে মিশে গেল। ঝুটো গলিয়ে গেল। ভাঁটা-পড়া বেতুনি ছলছল করতে লাগল। যেন এতক্ষণ কে মন্ত্র দিয়ে বেতুনিকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল। আবার গেমো-বন দুলতে লাগল বাঁধের ওপরে। তারাগুলি হাসতে লাগল মিটমিটি। পশ্চিমের অনেক দূরের আকাশে ঝাপসা একফালি চাঁদ টিমটিম করতে লাগল।

আর বদি এখনও হাঁপাচ্ছে। কাঁপছে থরথর করে। চোখ মেলে আছে ও। ও দেখতে পাচ্ছে এখন বাঁশের আড়াগুলি। অন্ধকারেই দেখতে পাচ্ছে, বাঁশের আড়ার ওপরে গোলপাতার চালা। মনে পড়ছে, এটা ধানের গুদাম-ঘর। ধানের শূন্য গুদাম-ঘর। এটা গঞ্জ।

· আবার যেন কে এল নিচু হয়ে। এসে ওর নিম্নাঙ্গগুলি চাটতে লাগল। অ! কুকুরটা এসেছে। নোংরা চাটছে। গরম জিভ দিয়ে চাটছে। ভাল লাগছে বদির।

যেন বাছুরকে গাই চাটছে। কিন্তু ও আর চোখ বুজবে না। চোখ বুজলেই সে আসে। সেই দানোটা। টের না পেলেই, ঘুমিয়ে পড়লেই, টপ করে তুলে নিয়ে যাবে। আর একবার তুললেই শেষ। ছুঁলেই গেল। ওকে জেগে থাকতে হবে। খারাপ-খারাপ গালাগাল দিতে হবে। গুনিন বাউলের নাম নিতে হবে। খোকা-ঠাকুর বনবিবিকে ডাকতে হবে। আর তখনই পালাবে।

আর বাপ যখন অপঘাতে মরে দানো হয়, তখন সে কাউকে খাতির করে না। ছেলেকেও না। কিন্তু বদি এখনও কত ছোট। এখনও জোয়ান হয় নি। মাছ মারতে যায় নি। আর এখনই তাকে নিযে যেতে চায়।

কান্না ঠেলে উঠল। তার সঙ্গেই আবার সেই তেতো জলে ভরে উঠল মুখটা। আর মুখের মধ্যে কিলবিল করে উঠল সেই জিনিস। কিরমি, কিরমি। থু থু করে উঠল বদি। যেন বানমাছের মত লাফাতে-লাফাতে মুখ থেকে ছিটকে গেল গলার কাছে। তার পরে মাটিতে।

আবার কিসের শব্দ? বাতাস। বৈশাখের বাতাস। সমুদ্র থেকে আসছে। আবার ঘুম পাড়িয়ে দিতে চায়। গোলপাতার ছাউনিতে শনশন শব্দ তুলছে। আর খোলা দরজা দিয়ে খালি গুদাম-ঘরে এসে ঢুকছে। গাযে বেশ করে বুলিযে-বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে চাইছে। কিন্তু বদি আর ঘুমোবে না।

আবার কিসের শব্দ? অ! পুবের চালাগুলিতে কালীদিদিরা হাসছে। খাঁদুদিদি আর টেপীমাসীরা হাসছে। এখন গঞ্জ মরা। ধান মন্দা। পাট নেই। গঞ্জ এখন গা মুড়ে শ্মশানের মত মহাশ্মশান। তবু বুঝি কেউ এসেছে। বাজার মন্দা হলেও যে-মহাজনদের অনেক টাকা থাকে, সেই রকম কেউ। আদিবাসীদের কাছ থেকে পচুই এনেছে, তাড়ি এনেছে। তাই খেয়ে হাসছে। আর ওই তো, হারমনিয়া বাজছে। বোধ হয় খাঁদুদিদি গান করছে, মাতা খাও, যেয়ো না। আর কালীদিদিরা পচুই খেলে কি রকম খেপে যায়। গাযে জামা-কাপড় রাখে না। খালি হাসে। এখন সেই রকম হাসছে।

তবে কি রাত বেশি হয় নি। কিন্তু চোখের পাতা বুজে আসছে কেন? শালা আমাকে মন্ত্র দিচ্ছে। আই গুনিন হে–। কিন্তু বাঁশের আড়াগুলি হারিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসছে। আর মুখের মধ্যে আবার কিলবিল করছে। কিন্তু ফেলতে পারছে না। কেবলই যেন তলিযে যাচ্ছে। টানছে নাকি কেউ? কে? কে? আই খোকা-ঠাকুর হে –

এই সব ঠিক হয়ে গেছে। এই তো সব দেখা যাচ্ছে। এখন দিনের বেলা। সকালবেলা। এই তো নদী। বেত্নি নদী, কেমন কলকলাচ্ছে, ছলছলাচ্ছে। আর চলেছে ভাঁটার টানে। আকাশটা ফর্সা। কোথাও মেঘ নেই। বাতাসে গেমো-বন দুলছে, নুইছে। আর বদি বসে আছে বাঁধের ওপরে। ও দেখছে, জল নতুন। নদী দক্ষিণে ছুটেছে।

ওর নাকে গন্ধ লাগছে। সেই গন্ধ। পাকা ওড়চাকা ফল আর গেমো ফলের। ওর নাকে গন্ধ লাগছে পাকা কেওড়া ফলের। আর চোখ দুটো কামটের মত তীক্ষ্ম এবং অপলক হয়ে উঠছে। মুঠি পাকিয়ে যাচ্ছে। জলে যেন কি দেখতে পাচ্ছে ও। আর বিড়বিড় করছে, এসেছে! এসে পড়েছে। আরও আসছে। এইবার। এই সময়! ওই তো সেই চোখ। লাল হীরার মত চোখ আর রুপোর মত শরীর।

আর বদির কানে বাজছে সেই শব্দগুলি, এই সেই খোকাঠাকুরের আশীর্বাদ। অনেক দূর সমুদ্র আর সেই পাতাল থেকে ওরা এসেছে খোকাঠাকুরের হুকুমে। লড়ে নিতে হবে। বদি উঠে দাঁড়াল। ও উলঙ্গ, কিন্তু ঘা-পাঁচড়াগুলি নেই। শরীরটা তাজা লাগছে। বমি আসছে না, মুখে কিছু কিলবিলিয়ে উঠছে না। বদি তাকাল চারদিকে। সাবধানী সতর্ক চোখে চারদিকে দেখল। না, কেউ নেই।

কেউ নেই আশেপাশে। আর বাঁধের নিচেই গেমো-বনের মধ্যে ঢোকানো রয়েছে নৌকাটা। তীরের মত নৌকা, ছই নেই। পাটাতনের ওপর জড়ো করা রয়েছে জোড়া-লাগানো বিনুজাল। বৈঠা রয়েছে গলুয়ের কাছে।

কেউ নেই আশেপাশে। আর ওরা আসছে। লাল-লাল হীরার মত চোখ আর রুপোর মত শরীর, বিশাল এবং গম্ভীর। নির্ভয় আর শান্ত। পুচ্ছ দোলাচ্ছে জলে। লড়বার জন্যে ডাকছে।

বদি ঝাঁপিয়ে পড়ল গেমো-বনে। নৌকা খুলল তাড়াতাড়ি। বৈঠা তুলে চাড় দিয়ে ভেসে গেল নদীর জলে। ভেসে গেল দক্ষিণে, ভাটার টানে। জোরে-জোরে বৈঠা টানতে লাগল। তীরের মত ছুটল দক্ষিণে।

গন্ধ লাগছে নাকে। ওরা আসছে।—'দূর সমুদ্র থেকে খোকাঠাকুর ওদের পাঠিয়েছে। গন্ধে ওদের পাগল করে ছুটিয়ে দিয়েছে। বলেছে, যা, খেগে যা। লড়ে খেগে যা।'

ওরা আসছে। এখন ভাঁটা, সমুদ্রে যাচ্ছে। যাচ্ছে গন্ধ বয়ে নিয়ে। আর ওরা আসছে। উজান ঠেলে, নিঃশব্দে, দল বেঁধে, গায়ে গা দিয়ে আসছে। আর বদি যাচ্ছে, মুখোমুখি হতে। —'জীবনের সঙ্গে, আর মনের সঙ্গে এই রকম আমাদের সামনাসামনি দাঁড়াতে হয় বাবা বদি।'

জোরে, আরও জোরে। কোথায় মুখোমুখি হবে? শালুকির চরে? না। বৈচকের বনে? না। তবে? আরও নিচে, আরও। সাঁইমারা চরে। ওই দূরে, সাঁইমারা চরে। জোরে, আরও জোরে হে বদি। নৌকাওয়ালারা যদি পিছনে তাড়া করে, যদি ধরে ফেলে, তবে আর হবে না। পিটিয়ে মেরে ফেলবে।

এই সাঁইমারার চর। চর নয়, জঙ্গল। গোলপাতার বন আর গেমো, ওড়চাকা, কেওড়ার জঙ্গল। পাকা-পাকা ফলে গাছ ভরতি। তলায় বিছানো। অন্ধকার সাঁইমারার জঙ্গল গন্ধে আমোদিত। এইখানে, এই সেই জায়গা। জলের ধারেই নৌকা বাঁধল বদি। লাফিয়ে ডাঙায় নামল। পলিমাটির পিছল। পা হড়কে যায়।

চরে জল নেই। ভাঁটায় নেমে গেছে। জোয়ার আসবার আগেই লড়বার জায়গা গণ্ডি দিতে হবে। ওরা আসছে। যাত্রা করেছে দূর সমুদ্রের অন্ধকার পাতাল থেকে। এখন উজান ঠেলছে। তার পরে জোয়ারে গা এলিয়ে দেবে।

অনেকগুলি বিনু জাল একসঙ্গে জোড়া। জুড়ে-জুড়ে লম্বা করা হয়েছে। প্রায় দু-মন বোঝা টেনে-টেনে নামাল বদি। পাটাতন তুলল। খোলের মধ্যে জোয়ান মানুষের বুক-সমান বাঁশ। তাড়াতাড়ি নামাল বদি। কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল। দেখল সাঁইমারার অন্ধকার জঙ্গলাবৃত চরকে। তারপর গেমো ওড়চাকা আর কেওড়ার ঘনসন্নিবিষ্ট অংশকে ঘিরে পায়ে হেঁটে, গোল করে পাক খেয়ে এল। মাটিতে তাকিয়ে দেখল। পায়ের ছাপ পড়েছে পলিমাটিতে। এবার শাবল।

শাবল দিয়ে গর্ত করে বাঁশ পুঁতল। কয়েক হাত দূরে-দূরে। একটা করে বাঁশ গোল করে ঘিরে পুঁতল। তারপর হঠাৎ চমকে ফিরে তাকাল। জলে শব্দ নেই। সব স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছে। ভাঁটা শেষ হয়ে আসছে। সময় নেই, আর।

বিনু জাল বাঁশের গায়ে-গায়ে পেতে ফেলল। পেতে ঘিরল চারদিক গোল করে। দু-হাত দিয়ে নরম পলিমাটি নিয়ে জাল চাপা দিতে লাগল। সবটা জাল পলিমাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। ওরা আসছে। গায়ে একবার একটু ইশারায় জালের সুতো ঠেকলেই সজাগ হয়ে যাবে। 'এসো না! আর এসো না! আমরা টের পেয়েছি, ওরা হেরে গেল। এসো না কেউ!' সংবাদ চলে যাবে দূর পাতালে।

মাটি-ঢাকা শেষ হবার আগেই প্রবল গর্জন কানে এল বদির। মাথা তুলে দেখল, বাসুকির মত ফেনা মুখে নিয়ে আকাশের বুক ঘেঁষে বান আসছে। আর সময় নেই। কোন রকমে শেষ সীমা পর্যন্ত মাটি ঢেকে, ছুটে এসে নৌকায় উঠল বদি। দু-হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে অর্জুনের গোড়ার সঙ্গে বাঁধা মোটা দড়ি আঁকড়ে ধরে রইল।

আর সেই মুহূর্তেই সহস্র ফণা এসে প্রচণ্ড গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়ল ওর ওপর। মনে হল, অর্জুনের মগডালে ঠেলে তুলল নৌকাসুদ্ধ। আবার আছড়ে নামাল। আবার তুলল, আবার নামাল। আবার, আবার···। তারপর এক সময়ে স্থির হল। উলঙ্গ শরীরটা নিয়ে ও শুয়ে পড়েছিল। বান চলে যাবার পর, আরও খানিকক্ষণ ও চুপ করে পড়ে রইল। যখন নৌকাটা শান্ত হল, বদি আস্তে-আস্তে মুখ তুলল।

ডুবে গেছে। সাঁইমারার চর ডুবে গেছে। আরও ডুবছে। জোয়ার এসেছে। আরও ডুবছে। আর বদির মুখে একটা হাসি ফুটছে। ও উঠে দাঁড়াল। উলঙ্গ, কালো, শণনুড়ি চুল আর দুধের এবং নতুনে মেশানো দাঁতের হাসি। কিন্তু অপলক চোখে তীক্ষ্ম শিকারীর দৃষ্টি। জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। চুপি-চুপি বলল, আসছে, আমি দেখতে পাচ্ছি, আসছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, লাল-লাল হীরার মত চোখ। আর রুপোর মত শরীর। সুচতুর, উৎকর্ণ, মন্থরগতি আর গম্ভীর।—'সেও বাঁচবার জন্য আসে। আমিও বাঁচবার জন্যে আসি।'

হঠাৎ জল একবার চলকে উঠল। লোভ দেখাচ্ছে, পরীক্ষা করছে। কেউ আছ? শত্রু কেউ আছ? বদি নিশ্বাস বন্ধ করে রইল। এই ওদের লড়াই। এই লোভ দেখানো আর এই স্তব্ধতা, উৎকর্ণ মন্থরগতি, সুচতুর নড়াচড়া। 'কিন্তুন আমি মাছমারার ছেলে। তোর সঙ্গে আমার এই হারজিতের খেলা।'...কথাগুলি সব মনে পড়তে লাগল বদির। ও স্থির হয়ে রইল। আর তীক্ষ্ন চোখে দেখল আর বেশি দেরি নেই খুঁটিগুলি ডুবতে। তার আগেই কাজ শেষ করতে হবে।

নিঃশব্দে, নিঃসাড়ে জলে নামল বদি। ওর নাভি পর্যন্ত ডুবে গেছে। আর তরতর করে জল বাড়ছে। একটু শব্দ না করে আস্তে-আস্তে খুঁটির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু হল। নিচু হয়ে একেবারে নিঃশব্দে জাল টেনে তুলে খুঁটির ডগায় বাঁধল। আবার আর-একটা খুঁটির কাছে গিয়ে তুলল, জাল বাঁধল ডগায়। নিঃসাড়ে সমস্ত খুঁটির ঘেরাওটা ঘুরে-ঘুরে জাল তুলে-তুলে গণ্ডি বাঁধতে লাগল খুঁটির সঙ্গে।

যত সময় যেতে লাগল, ততই জল বাড়তে লাগল। আর ওর গলা অবধি ডুবে গেল। তখন ডুব দিয়ে-দিয়ে জাল তুলে বাঁধল খুঁটির ডগায়। কিন্তু সাবধান, শব্দ যেন না হয়। ওরা হারছে। ওরা নিশ্চিন্তে খাচ্ছে পাকা গেমো ফল। ওড়চাকা আর কেওড়া ফল। ওই ফলের গন্ধে পাগল করে ওদের ছুটিয়ে দিয়েছে খোকাঠাকুর। বলে দিয়েছে, 'সাবধান। সেই তোমার শত্রুপুরী। সেইখানে তোমার বাঁচা-মরার লড়াই।'

আর বদির মনে পড়ছে সেই কথাগুলি, 'সংসারের এই বিধি, লড়েই বাঁচতে হয় বাবা। আমাদের লড়েই মরতে হয়।'

গণ্ডির শেষ সীমা অবধি যখন জাল বাঁধা হয়ে গেল, তখন বদির ডুবজল। স্রোত ওকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে উত্তরে। কিন্তু শব্দ করার উপায় নেই। নিঃশব্দে সাঁতার কেটে কাছের একটা গাছ ধরল ও। নৌকায় ফিরে যাওয়া আর সম্ভব নয়। জল না চলকিয়ে আস্তে-আস্তে গাছে উঠে পড়ল।

সময় যেতে লাগল। জল বাড়তে লাগল। বেলা মাঝামাঝি উঠল। জল বাড়তে লাগল। ওরা হারছে। বেলা ঢল খেল। জলও ঢল খেল। জল নামছে। আসে যত জোরে, নামে তার থেকে জোরে। জল নামছে। আর ওদের লোভ বেড়ে গেছে। ওরা গন্ধে পাগল হয়ে গেছে। পেটে ওদের অভর ক্ষুধা।— 'মানুষকে ক্ষুধা দিয়েছেন উনি, আর তার জ্বালায় লড়তে বলেছেন। মানুষকে ঘর-সংসার ছেলেমেয়ে দিয়েছেন উনি। তাদের লড়ে বাঁচাতে বলেছেন, বুইলি কিনা বাবা।'

কথাগুলি মনে পড়ছে। আর ক্ষুধা সত্যি অভর। ঘর-সংসার ছেলে-মেয়ে কি, জানে না বদি। ও দেখল, জল নামছে। খুঁটি জেগে উঠছে, জাল দেখা দিচ্ছে। বদি নেমে এল গাছ থেকে। এখনও সাবধান! নিশ্চুপে এল নৌকায়। পাটাতন সরিয়ে বার করল মুগুর। শাল কাঠের ভারী আর মোটা মুগুর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে অনেকখানি জল চলকে উঠে একটা রুপোলী গা লাফিয়ে উঠল। মুহূর্তেই অদৃশ্য হল আবার। বদি চিৎকার করে উঠল, 'আই পাঙাস! আই পাঙাস! আমি আছি।'

মুগুরটা সে তুলে ধরল। জল নামছে তরতর করে। আর বাঁশের খুঁটিগুলি দুলে উঠছে। ওরা ঘাই মারছে জলে। আবার একটা লাফ দিয়ে উঠল জলে। বিরাট পাঙাস। আঁশ নেই, পালিশ-করা রুপোর মত শরীর! বদি লাফিয়ে জলে পড়ল। জল তার হাঁটুতে। গণ্ডির মধ্যে মাছগুলি লাফাচ্ছে। পাঙাস, ছোট বড় রুপোলী পাঙাস। দূর সমুদ্রের আশীর্বাদ। লাফিযে জাল টপকে ভিতরে ঢুকল বদি। আর বিস্ময়ে থমকে রইল। এত বড়-বড়! হে বাবা খোকাঠাকুর। আমার থেকে বড় পাঙাস।

দু-হাতে মুগুর তুলে মাছগুলির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল বদি। মাছগুলি লাফাতে লাগল। যেন গাছে উঠতে চাইছে। আর পড়ন্ত বেলার রোদে যেন, রুপোলী উড়ন্ত মাছ মনে হচ্ছে। ঝলকে উঠছে। মুগুর দিয়ে আপ্রাণ পিটতে লাগল বদি। চিৎকার করতে লাগল, 'লড়ে যা, লড়ে যা।'

জল লাল হয়ে উঠতে লাগল। কিন্তু কেউ শান্ত হচ্ছে না। এক দুই তিন চার প্রায় দশ-বারোটা হবে। আর সবগুলিই বড়। আ রে বাবা! ওটা কত বড়! শালা আমাকে দেখছে। আমার থেকে বড়। বাবার থেকেও বড়।

বৃহৎ পাঙাসটার অর্ধেক শরীর তখন জলে ডুবে আছে। বদি মুগুর তুলল। মাছটা লাফ দিল। এক লাফে বদির মাথা ছাড়িয়ে উঠল। আর পড়ল একেবারে ঘাড়ের উপরে।—'এই শালা, ছাড়।'

বদি সরতে চাইল। কিন্তু মাছটা ওকে নিয়ে মাটিতে পড়ল। ও নিজেকে ছাড়াতে চাইল। কিন্তু কেমন যেন জুড়ে রইল পাঙাসটার গায়ে। আর মনে হল কাঁধের কাছে একটা অসহ্য যন্ত্রণা। বদি দু-হাত দিয়ে প্রকাণ্ড পাঙাসের পিছল শরীরটাকে জড়িয়ে ধরল, আর ছাড়াতে চাইল। পারছে না। জল আরও নেমেছে। বদি দেখল, রক্ত পড়ছে। কাদায় আর জলে রক্ত-মাখামাখি। কিন্তু মানুষের সঙ্গে হাতাহাতি লড়বার বুদ্ধি নেই মাছের। পাঙাসটাও ছটফট করছে। ওলটপালট খাচ্ছে। আর বিশাল মাছটার সঙ্গে বদিও ওলটপালট খাচ্ছে। অসহ্য যন্ত্রণা! মনে হল, বদির বুকের মধ্যে কিছু বিঁধেছে গিয়ে আমূল।

বদি মাছটার মাথায় মুখ ঠেকিয়ে উঁকি দিল নিচের দিকে। দেখল, পাঙাসের কানের কাছের তীক্ষ্ণ কাঁটাটা তার কণ্ঠার পাশে নরম জায়গার মধ্যে ঢুকে গেছে। রক্তের স্রোত দেখা মাত্র আতঙ্কে কেঁপে উঠল বদি। চিৎকার করে উঠল, 'আই শালা, তুই আমাকে মারছিস!'

সারা গণ্ডিটা জুড়ে তখন অন্যান্য মাছগুলি দাপাদাপি করছে। যেন একটা তাণ্ডব চলেছে পলির পাঁকে। বদি আবার চিৎকার করে উঠল, 'আই খোকা-

ঠাকুর! তুমি আমাকে দানো করলে হে।' ও শেষবারের জন্যে মুক্তির চেষ্টা করল। পারল না। আর সেই কথাগুলি ওর মনে পড়তে লাগল; 'আমরা দুজনেই লড়ি। আমরা দুজনেই মরি। আগে আর পরে, বুইলে বাবা।'

গঞ্জে সকাল হল। এখন গঞ্জ মরা। ধান মজা। পাট নেই। নেহাত ঘরের বেড়াগুলি, চালগুলি পাহারা দেবার জন্যে গদিতে-গদিতে এক-আধজন করে থাকতে হয়। তাই কিছু লোক আছে। আর তারাই আবিষ্কার করল, বদি মরে পড়ে আছে গুদাম-ঘরের মধ্যে। খবর দেওয়া হল মালোপাড়ায়। মালোরা এল। দেখল, মাথাটা ঘাড়ে গুঁজে মরে পড়ে আছে নিতাই মালোর ছেলেটা। মরতই, আজ আর কাল। সবাই অপেক্ষা করছিল কেবল।

নাকে কাপড় চেপে ঘাড়গোঁজা শক্ত দুর্গন্ধময় শরীর সবাই বার করে এনে বাঁধের ওপর শোওয়াল।···কতটুকুনি আর শরীরটা।

কত বয়স হয়েছিল ছেলেটার? একজন জিগ্যেস করল।

আর-একজন বলল, কে জানে। নিতাইও মরল, সঙ্গে সঙ্গে বউটাও মরল। ছেলেটা তো মেগে-মেগে খাচ্ছিল। ক'দিন দেখছিলাম খালি শুয়ে পড়ে থাকে।

সকলেই চুপচাপ। একজন বাঁশ আনতে গেছে। একটা বাঁশেই ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়া চলবে। ওর দূরের বাঁকের মুখে জ্বালিয়ে দিলেই হবে।

একজন বলল, ওর বাবা নিতাই গিয়ে মরল সেই সাঁইমারার জঙ্গলে।

হ্যাঁ। কালীনগরওয়ালাদের জাল নৌকো চুরি করে নে' গেছল। নিজের তো কিছু ছিল না। কত দিন বেকার বসে ছিল। পেটের টানে অত বড় জোয়ানটা···

আর মরল কি ভাবে বল। ইস! অত বড় পাঙাস মাছ কোন দিন দেখি নাই। কিন্তুন কণ্ঠায় গিঁথল কি করে, বল দিনি।

মাছমারার মাথার ঠিক না থাকলে অই হয়। সামলাতে পারে নাই, আর দ্যাখ ভাগ্যি, পড় তো পড় একেবারে ঘাড়ে। মরণ-ধরা মাছটা নিচ্চয় পেল্লায় একটা লাফ দিয়েছিল। কপাল! কত মন ওজন ছিল যেন?

দেড় মনের ওপরে। এই গঞ্জেই তো এনে বিকোলে নিতাইয়ের মহাজন পঁচানন দাস।

হ্যাঁ, অনেক নাকি পাওয়ানা হয়েছিল নিতাইয়ের কাছে।

তবু নাকি মহাজানের পাওয়ানা মেটে নাই।

সকলে চুপ করল। তার পরে বাঁশটা নিয়ে একজন এল।

শানা বাউরীর কথকতা

তিন দিনের মত্ততার পর, সমস্ত গ্রামটা অবসাদে ভেঙে পড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তার ধারে, নালার পাশে, মন্দিরের চত্বরে, গোলায়-গোলায়, উঠোনে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েক পসলা। সাঁওতাল পরগণার এ আরক্ত কার্তিক-মাটিতে সবে ধুলো উঠতে আরম্ভ করেছিল। বৃষ্টি পড়ে কাদা হয়েছে খানে খানে, ফাঁক হয়েছে জায়গায়-জায়গায়, পিছল হয়েছে ঢালু চড়াইয়ে। মাটি থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে একটা। তার সঙ্গে মিশেছে পচাই আর তাড়ির গন্ধ।

আকাশে এখনও আলুথালু মেঘ। ফাঁকে-ফাঁকে অস্পষ্ট নক্ষত্র দেখা যায়। সাঁওতাল পরগণার পূর্বে, বীরভূম ঘেঁষে গ্রামটা। দূর-অন্ধকার পশ্চিমে রাজমহল মাথা তুলে আছে গাঢ় এক পোঁছ মেঘের মত। আর পূবে পশ্চিমে, দুটি নদীর এপারে ওপারে শালবন। অন্ধকারে, গায়ে-গায়ে জড়ানো বন মেঘের মত জমে আছে এখানে ওখানে, উঁচু-নিচু উঁচুতে। শালবন, তারপর হঠাৎ খাড়া-খাড়া তালের সারি। সারি নয় তো ঘিরে থাকা জটলা। যেন কোন এককালে মানুষ ছিল। এখন অভিশপ্ত, নিশ্চল বোবা।

কয়েক বছরের একটা বাঙালী গ্রাম। বাঙালীরা তখন ছিল গ্রামের রাজা। এখন মধ্যবিত্ত গেরস্ত। কুলটি আর বার্নপুরের লোহা-কারখানায় মেশিনঘরে গেজ মাপে, আপিসে কলম পেষে, খাদের কুলি-কামিনদের হাজিরা নেয়, কলকাতার রেলে, সওদাগরী আপিসে কাজ করে। গ্রামে থাকে তারা স্মৃতির ভারে দুর্বল। দিন চলে গেছে, মনটা পড়ে আছে পিছনে।

এই সময়টা সবাই একত্র হয়। কালীপুজোর সময়ে। এক রাত্রি কি দুই রাত্রি। তারই চিহ্ন থাকে লেগে সবখানে। শূন্য মণ্ডপে মশা ডাকে, তাড়ি-পচুয়ের কলসী গড়াগড়ি যায়, হাঁড়িকাঠের কোল থেকে নিহত পশুর রক্ত জমে থাকে পথে-পথে, উঠোনে, মন্দিরের দেওয়ালে। গ্রামের আর আশেপাশের সাঁওতাল-বাউরীরা আদাড়ে-পাদাড়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষে খোয়ারি কাটায়।

কর্তারা বাক্স-তোরঙ্গ নিয়ে ছোটেন রেল-স্টেশনে, দুমকার পথে বাস স্টপেজে। চাকরিস্থলে যাবেন।

শানা, হেই শানা কুথা গেলি রে!

ভদ্র-অভদ্রের এক ভাষা, মাতৃভাষা। সুন্দর রায় মশায় ডাকলেন বাউরী-বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, হেই তুরা কেউ ঘরকে নাই নাকি রে! শানা!……

সুন্দর রায় যাবেন জামশেদপুরের লোহা-কারখানায়। কোম্পানির কাজ, একদিন দেরি হলে চলবে না।

শানার মা বুড়ি। তার খোয়ারি ভাঙে নি এখনও। কথা কানে গেল, জবাব দিতে পারল না।

সুন্দর রায়ের বাড়ি থেকে বড় ভাইয়ের ডাক শোনা গেল, এ সুঁদোর, তুর দেরি হয়ে গেছে। শানাকে পেলি?

সুন্দর বললেন, না দেখছি।

দু দিনের জন্যে মেলা বসেছিল গাঁয়ের মধ্যে। তারই সব চিহ্ন পড়ে আছে এখনও। পড়ে আছে সাঁওতাল-নাচিয়ে-মেয়েদের খোঁপার বাসী ফুল। খ্যাপা ভালুকের নখে ছেঁড়া কাপড়ের মত সাঁওতাল-মেয়ের কাপড়ের টুকরোও চোখে পড়ে। বলির পশুর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে সাঁওতাল-মরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্ত। এখানে-ওখানে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে বলদহীন গাড়ি। কোথাও বা একাকী, বে-জোড় বলদ। গন্ধ শুঁকছে বলি দেওয়া মোষ-রক্তের।

দু দিনের জন্যে, সারা গ্রামটা তার শতাব্দীর আদিম উৎসব-মত্ত আসরে চলে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরে আসছে। খারাপ কথায়, খোয়ারি ভাঙছে।

সুন্দর আবার ডাকলেন চেঁচিয়ে, শানা!

এবার জবাব পাওয়া গেল, বুলেন কেনে! কি বুলছেন?

আশ্চর্য! দশ জায়গা ঘুরে শেষে এই গাড়ির তলায় শানা। জবাব দিল, মোটা ভারী গলায়।

সুন্দর বললেন. আরে, তু ওখেনে কি করছিস?

ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিল শানা, শুয়্যা আছি।

শুয়্যা আছিস? কেনে? ওখেনে কেনে? ঘরে জাগা নাই?

না।

মনে-মনে হেসে বললেন সুন্দর, তাড়ি গিলে মরেছিস কেনে?

না ও মুতো খাই নাই।

একটু অবাক হলেন সুন্দর। শানা বাউরীর বড় রাগ-রাগ ভাব বোঝায়। বললেন, ইদিকে আমার যে আর দেরি নাই। ওঠ কেনে তাড়াতাড়ি।

কেনে?

কেনে? কথা বলার ছিরি দেখ। আজকাল সবাই এমনি করেই কথা বলে, তবে এতটা নয়। শানা বাউরীর মত মুখের উপর অত কাটা-কাটা কেউ বলে না। আগের দিন হলে, চোখ তুলতে সাহস করত না। এখন মুখে-মুখে কথা বলে।

সুন্দর বললেন, আরে, আমাকে জামশেদপুর যেতে হবেক নাই?

শানার জবাব এল গাড়ির তলা থেকে, এট্টা বলদ নাই, গাড়ি টানবে কে ?

কুথা গেল ?

কুন্ শালো লিয়ে গেল্ছে ।

তবে মোটর-বাসে তুলে দিয়ে আসবি চ । মালটা লিতে হবেক ।

মাল ?

হুঁ ।

মাল ?

সুন্দর মনে-মনে চটে উঠছিলেন । আবার বলেন, তাড়ি গেলে নি ।

বললেন, হুঁ হুঁ, বেগার লয়, পয়সা দিব, চ কেনে ?

শানা বেরিয়ে এল গাড়ির নিচে থেকে । কুচকুচে কালো গুলি-ভাঁটা চেহারা । মোটা ঠোঁট আর পাকানো চুল । কোকিলের মত লাল চোখ । এক চিল্তে কাপড় আছে কোমরে ; গায়ে জড়ানো পুরানো গামছা । পাশে লম্বায় অনেকখানি জীবটি কি করে গাড়ির তলায় ছিল, সেইটাই আশ্চর্য ।

সুন্দর রায় বললেন মনে-মনে, হারামজাদা বলে তাড়ি খায় নি । জরো রুগীর মত গরগর করছে । নেশায় চোখ খোলে না । তাড়ি খায় নি আবার !

নেশাখোরের মতই বলল শানা, পয়সা দিবেন ছোটকত্তা ?

হুঁ ।

ব্যাগারটা উঠে গ্যাল্ছে তা-লে ।

হুঁ, ব্যাগারটা উঠে গ্যাল্ছে ।

জমিদারিটাও উঠে গ্যাল্ছে কেনে ?

সুন্দর রায় ভাল মানুষ, কিন্তু এই অযথা প্রশ্নে রাগ সামলাতে পারলেন না । যেন শানা কিছু জানে না । মুখ্যু, ঝগড়া যদি করতে চায়, তার কি এই সময় ? এই হাতে পাঁজি মঙ্গলবার । বললেন, গ্যাল্ছে গ্যাল্ছে, তু কি জানিস না ? অখন তু যাবি কিনা বল ?

গামছা ঝেড়ে বলল শানা, যাবেক কেনে নাই ? শরীলটো মন্দ, মনটা ভাল লয় । চলেন, কেনে যাবেক নাই ।

সুন্দর রায় আর দাঁড়ালেন না । হনহন করে চলে গেলেন বাড়ির দিকে । মন্দিরের এই চত্বরে জল জমে নি । রাস্তায় কাদা । একটু-একটু বাতাসও ছেড়েছে । শানা সুন্দর রায়ের উঠোনে এসে দেখল, এক গোরুর-গাড়ির মাল । কোন কথা না বলে, মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিল, দু হাতে নিল সুটকেস আর বড় একটা পুঁটলি । সুন্দর রায়ের দাদা রতন রায় বললেন, এই শানা, ট্রাঙ্কটা রেখে দে । ওটা যাবে না । এই চালের বস্তাটা লে ।

ট্রাঙ্ক রেখে বস্তা নিল শানা । জামশেদপুরে বসে ঘরের চাল ফুটিয়ে খাবেন সুন্দর রায় । দু মন চাল নিয়েছেন । সুন্দর রায় পরিবারের কাছে

বিদায় নেওয়ার আগে আরও দুজন এসে জুটল জামশেদপুরের যাত্রী। জীবন বাঁড়ুজ্জে আর হারান গাঙ্গুলী। দুজনেই কাজ করেন কারখানায়। হারান গাঙ্গুলী নিয়েছেন একটি হারিকেন, বাঁড়ুজ্জে একটি এক-ব্যাটারি টর্চলাইট। সেটাও নিবু-নিবু।

বেরুলেন তিনজনে। শানা ততক্ষণে অনেক দূর।

হেই শানা!

সুন্দর রায় ডাকলেন চিৎকার করে।

দূর-অন্ধকার থেকে শানার গলা শোনা গেল, হুঁ, ছোটকত্তা, জমিদারিটো উঠে গ্যাল্‌ছে কেনে?

সুন্দর রায় ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাকালেন বাঁড়ুজ্জে আর গাঙ্গুলীর দিকে। তারাও তাকালেন। সুন্দর বললেন, হারামজাদা কি বলে। চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, হুঁ, হুঁ। তু কুথা?

হেথা সাদা শিবের মন্দিরের কোণায় —জবাব এল শানার।

সাদা শিবের মন্দিরের কোণে! এই লতাগুল্মের ঘোর জটার ভাঙা মন্দিরটার অন্ধকার কোণে কোন্ সাহসে গেছে শানা! সুন্দর বললেন, তু ওখেনে কেনে গেলছিস? ঘাটের সাঁকো দিয়ে পার হবি নে?

আপনারা বাতি লিয়ে আসছেন, তাই ইদিকে আসলেন, সোজা পথে যাবেক। ছোটকত্তা—

সাদা শিব অর্থাৎ শ্বেত শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত মন্দিরের কাছে এসে পড়ল তিনজনে। পুরনো হ্যারিকেনের নানান ফুটোফাটা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ঘোর অন্ধকারে থরথর করে কাঁপছে তার ভুতুড়ে আলো। আলোর চেয়ে তিনজনের ছায়া বেশী। ছায়ার আড়ালে মানুষ দেখা যায় না।

শানাকে নিয়ে চারজন। তার মুখ দেখা যায় না। বোঝার ভারে ছায়াটাও অমানুষিক। যেন একটা পাহাড় মাথায় মানুষের দেহ। কালো শরীরে সর্পিল স্ফীত শিরাগুলি কিলবিল করছে। থ্যাবড়া-থ্যাবড়া খালি পা দুটি লাল কাদায় মাখামাখি হয়ে দেখাচ্ছে দগদগে ঘায়ের মত।

মন্দিরের কাছ থেকে জমিটা নেমেছে। এলোমেলো পাথর ছড়ানো। নুড়ি আর চাংড়া। নামতে-নামতে গিয়ে ঠেকেছে নদীতে। যার কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক নিচে। চার হাত চওড়া নদী' আসলে একটি কাঁদর।

তারপর আবার উঠেছে। উঠেছে শালগাছের শিকড় বেয়ে বেয়ে।

শানা বলল, হুঁ ছোটকত্তা—

কি? কি? বুলছিস তু?

বুলছি পাপটো উঠে নাই।

কি পাপ?

শানা নামছে কর্দমাক্ত ঢালু জমি দিয়ে। মাথার বোঝার ভারটা চেপে-চেপে বসেছে তার পায়ের তলায়। হড়কে যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। বাঁড়ুজ্জে, রায়, গাঙ্গুলী জুতো হাতে করেছেন।

শানা বলল, প্যাটের। পাপটো প্যাটের। জমিদারিটো খারিজ হয়্যা গেলছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক আমাকে ভাত দিবার কুনকালে কেউ নাই।

সুন্দর ভাবছিলেন, ঠিক কথাই তো। আমরা রাজা ছিলাম এককালে। দানার অভাবে গ্রাম ছেড়েছি। আর এই গ্রামের সাত ঘর বাউরী, সব ছিল কেনা গোলাম। এখন আমরাও গোলাম। হিসেবে, শানারা গোলামের গোলাম। কে ভাত দেবে ওদের?

কাঁদরের এক হাঁটু জলে কলকল ডাক। নুড়ি পাথরে জলের স্রোত লেগে ধাতব শব্দ উঠেছে।

শানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝাসুদ্ধ নত হয়ে পায়ে হাত দিল সুন্দর রায়ের। সুন্দর বললেন, এই হেই, তু কি করছিস রে?

এই ছোটকত্তা, আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, ও মদটো আমি খায নাই।

খায নি কিন্তু ওর ভাবভঙ্গিটা তাড়ি খাওয়ার মতই।

সুন্দর বললেন, তা পা ছাড় কেনে।

কাঁদরের জলে হারিকেনের আলো পড়েছে, বাতাস ঘা খাচ্ছে চড়াইয়ের অন্ধকারে, শালবনে।

শানা বলল, ঐ কাদরের জলে বাউনদেব আত্মা আছেন। মলে সবাই আসেন ইখ্যানে। মিছে বললে আমার ঘাড় মটকাবেন ওঁয়ারা। হুঁ ছোটকত্তা।

কাঁদরের হাঁটু জলের স্রোতে কারা যেন হাসছে খিলখিল করে। হারান গাঙ্গুলীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এল, হেই শানা বাউরী—

হারিকেনের শিষটা কাঁপছে। মড়ুইপোড়া ঘাটের কাছে। মুচকুন্দের বাতাসের ঝাপটায় পাক খাচ্ছে অস্থির জোনাকিরা।

সুন্দর গলা বাড়িয়ে বললেন, কাঁদরটা পার হ, হেই শানা।

পার হয়ে গেল শানা। পিছনে-পিছনে পার হলেন বাকি তিনজন।

এবড়ো-খেবড়ো চড়াই, পাথরে আর শালের গোড়ায় জল পড়ে পিছল হয়ে আছে। অন্ধকার এখানে ভারী। এলোমেলো শালগাছ। বাতাসে গায়ে-গায়ে পড়ে। বড়-বড় পাতায় সাঁ-সাঁ ডাক দেয় উত্তুরে বাতাস। হারিকেনের আলোয় শালের ছায়ায়, মানুষের ছায়ায় জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে।

শানা আবার বলল, আমার মনটো অবুঝ হয়ে গেলছে ছোটকত্তা, আমার পানটো জ্বলে।

কথা বলে যেন শানা এই কার্তিকে বর্ষা-অন্ধকার শালবনে মানুষের অস্তিত্বটা ঘোষণা করল। সুন্দর বললেন, কেনে?

কেনে ? এই মাজি-মাজিনরা নাচ-ফুর্তি করে গেল আমি দেখি নাই ।

কেনে ?

দেখি নাই । এত বলি হল, পাঁটা মোষ খাওয়া হল, তাড়ি পচুই ভেইস্যা গেল লদীর জলের মতন, আমি দেখি নাই ।

কেনে ?

আমার মনে সুখ নাই ।

সুখ নাই, তু গাড়ির তলায় শুয়্যাছিলি ?

হুঁ ।

ঘরকে যাস নাই কেনে, তুর ঘরকে মানুষ নাই ?

না । নাই ?

সুন্দর দেখবার চেষ্টা করলেন শানার মুখ । দেখা যায় না । বাতাসের ভয়ে কাঁপা হ্যারিকেনের আলোয় শুধু কিলবিলে শিরাগুলি আরও স্ফীত হচ্ছে । কালো রঙ চকচক করছে উরুতের পেশীতে, পিঠের শিরদাঁড়ার দু পাশে ।

ঘন শালবন ফিকে হয়ে এল । একটা দূর-উতরাই হারিয়ে গেছে নিচের অন্ধকারের কোলে । তারপরে আর কিছু নয় ।

সুন্দর বললেন, তুর মা—

মাটো আমার কুটনী ।

হেই শানা, আপন মাকে গাল দিস না ।

কেনে ?

দিস না ।

কেনে ?

থেমে আসে শানার পা । সুন্দর চুপ করে গেলেন ।

জীবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, তুর মা-টোর কি দোষ ?

দোষ ?

হুঁ ।

আপনকার ঘর থিকে দু ধামা ধান আনতে গিয়ে, উ আমার বউকে শুতে দেয় ।

শুতে দেয় ?

হুঁ, আপনকাদের সঙ্গে, আপনকাদের ব্যাটা-লাতীদের সঙ্গে, বুইলেন ন-জামাইঠাউর । অ ছোটকত্তা, আমার ঘরে কেউ নাই । বউটো পলায়ে গেলছে উয়ার বাপ ভায়ের কাছে ।

রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলী নিজেদের অজান্তেই একবার চোখাচোখি করলেন । একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরছে যেন তিনজনকেই । এই অন্ধকারের মত । পায়ের তলায় রক্তবর্ণ পাঁকের মত আঁকড়ে ধরছে । চুপ করে থাকলেই বাতাসের ডাকটা

যেন বুকে চেপে বসতে চায়। আগে-আগে বোঝা মাথায় শানা। আলোর প্রয়োজন নেই তার। অন্ধকারেই ভাল দেখতে পায়।

যেন বাতাসের গায়ে ঝাপটা দিল শানার গলাঃ না। বউটো আমার ছেলেমানুষ, উয়ার নাম সুখী। এই সবে ডাগর হয়্যা উঠেছে। কিন্তুক ছোটকত্তা, উয়ার সুখ নাই। মা-টো আমার কুটনী। আপনকাদের ব্যাটা-লাতীরা বাউরীপাড়ার আঁস্তাকুড়ে ঘুরর-ঘুরর করে। পরের বাগানের অসাল্ ফল দেখলে ছেলেমানুষেরা যেমন করে। নোলা যেমন ছোঁক-ছোঁক করে, সি ধরন। তা বাউরীপাড়ার বাগানে যায় উয়ারা। আপনকাদের ঘরবাসী ব্যাটারা, মায়ের হাতে দুটো পয়সা দিলে, বউকে জোর করে তুলে দেয়। শহরে বাজারে মেয়েমানুষের পাড়া আছে, ইখ্যানে বাউরীপাড়াটো আছে। উয়াদের ঘরে ধান আছে, শানা বাউরীর ডাগর বউকে লিয়ে শুতে উয়াদের রক্তে বড় দপদপানি। ছোটকত্তা, বউটো আমার ছেলেমানুষ, সবে ডাগর হয়্যা উঠেছে, উয়ার নাম সুখী, কিন্তুক সুখ পায় না। উয়ার সুয়ামিকে উ রেয়াত করে, ভালবাসে, কাঁদে। জমিদারিটো উঠে গেল্ছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক পাপটো যেছে না।

জীবন বাঁড়ুজ্জে বলে উঠলেন, এই শানা, চুপ যা।

কেনে ?

হারান গাঙ্গুলীও বলে উঠলেন, হুঁ, তু চুপ যা।

কেনে ?

সুন্দর বললেন, তু বউটোকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়।

শানা বলল, না।

লাল কাদায় হারিকেনের আলো পড়ে গাঢ় রক্তের মত দেখাচ্ছে। সেই গাঢ় ভারী রক্তে মানুষ আর জানোয়ারের পায়ের দাগ, গোরুর গাড়ির চাকার সর্পিল ক্ষত। কয়েকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আবার শালবন। রাজমহলের কালো রেখা যেন গুঁড়ি মেরে কাছে এগুচ্ছে।

শানা বলল, না। দুবার পলায়ে গেল্ছে দুবার লিয়ে আসছি। কেনে? না, মেয়েমানুষটোর জন্যে আমার পান কাঁদে। উকে দেখতে না পেলে মনটো কেমন করে। উ আমার কাছে সব আপন মুখে বুলেছে। মনে উয়ার অং নাই। সব বুলেছে। পেথমবারে যখন শুনলাম, আমার পানটো জ্বলতে লাগল। বউটোকে খুব পিটলম। মা-টোকে পিটতে গেলম, কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়্যা পলায়ে গেল। কিন্তুক, বউটো রইল নি। মাসখানেক পর, পলায়ে গেল বাপের কাছে। তখন আষাঢ় মাস। ছোটকত্তা, আপনাদের সি বড় লদীর পারে জমিতে কাজ হচ্ছিল। কিন্তুক মনটো মানল না। সবাই বলতে লাগল, শানা বাউরীর বউটো এট্টা সাঙা করছে। বিষ্টি মাথায় করে গেলম শাউড়বাড়ি। তো বউটো আমার ছেলেমানুষ। যেতেই আমার পায়ে-পায়ে চলে আসল গুটি-গুটি। মাঠে,

পড়ে, ছোট দুখান হাত দিয়ে আমাকে মারতে লাগল। বললে, কেঁদে-কেঁদে বললে. 'কেন লিয়ে যেছ আমাকে? ই মাঠে পুঁতে কেনে আকো না? আমার মনটো পোড়ে, বাপের ঘরকে মন বসে না, সুয়ামির ঘরে টিকতে পারি না।' হুঁ, বললে বউটো ·····'মাঠে পুঁতে আকো, তালগাছ হয়্যা জন্মাব।'

তালগাছ, খাড়া-খাড়া, একটু বা বাঁকা-বাকা, হঠাৎ যেন দল বেঁধে নেমে চলেছে উত্তরাইয়ের ঢালুতে। তালপাতার শত-শত খাঁজে বাতাস যেন চাপা রাগে ডাক ছাড়ছে গরগর করে।

সুন্দর বললেন, শুনু, শানা, তু বউটোকে লিয়ে আয় কেনে।

না।

পিছলে পড়তে-পড়তে শানা সামলে গেল। এখানে মাটি বেশি, পাথর কম। সামনে ধানক্ষেত। যত বাতাস, অন্ধকার তত গাঢ় হয়। দুমকার মোটর-বাসের রাস্তাটা ঠাওর করা যায় না। দিনের বেলা দেড় ক্রোশ দূরের চড়াই থেকে দেখা যায়। রাত্রে দেখা যায় দু-একটা আলো। এখন লেপে মাটি।

শানা আবার বলল, না, আর না। আমি ভাতের ধান্দায় ফিরি, পুরুষমানুষ কতক্ষণ ঘরে থাকবে। কিন্তুক আমার মা-টো আন্ কথা শুনায় বউকে। বলে, এত বড় জোয়ান, যোবতী বউ, তার শাউড়া সুয়ামির কেনে এত দুঃখুক। মাগীটো চোখ চেয়ে কিছু দেখে কেনে নাই? বলে, আর ভর-দুকুরে পাড়ায় বার হয়্যা যায়। সি সময়ে আসে আপনাদের লারান মুকুজ্জে মশায়ের লাতা ক্যাদার বাবু। শালো বাবুটোর চার কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে—

হারান গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, আচ্ছা-আচ্ছা, তু চুপ যা।

কেনে?

বাতাসের ঝাপটাও যেন সেই কথা জিজ্ঞেস করে. কেনে?

রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলী গায়ে-গায়ে চলেন। কি যেন একটা জড়িয়ে ধরতে আসছে তাদের তিনজনকে। যেন হারিকেনটা নিবিয়ে অন্ধকারটাই ঠেসে ধরতে চাইছে।

শানা আবার বলে, উয়ার চার কুড়ি বিঘা জমি আছে তো, ভর-দুকুরে উয়ার জল-তিষ্টা পাবে কেনে নাই। ক্যাদার মুকুজ্জের মন বড় ভাল, উ বাউরীর ঘরে জল খেতে চায়। ঘরের দরজায় গিয়া বলে, ই বউ, হেই কুথারে, ইট্টুস জল দে দেনি, খাই। ইয়ার ঘরে ধান আছে, সে উ শানা বাউরীর ঘরে ঢুকে যায়। উয়ার ধান আছে, তো বউটোর শাউড়ী ই সময়ে বাড়ি আসে। দরজায় খাড়া হয়্যা বউটোকে শাসায়, হুঁ, তুর শাউড়ী ঘরে নাই, দুকুর ঘোরে তু বাবু ঢুকিয়ে লিছিস, অখন কেঁদে কেটে ঢং মারাছিস। ই সব ছিনালী আমরা জানি না, কেনে? উয়ার ধান আছে খাবার ধান, বিক্‌বার ধান, তো সোমসারটা কাঁদরের জলের পারা উয়ার গা ভাসিয়ে যায়।

কি যেন বলতে চান সুন্দর রায়। বলতে চান গাঙ্গুলী, বাঁড়ুজ্জেও, কিন্তু কথা ফোটে না গলায়। কেবলই মনে হয় হ্যারিকেনের আলোর বেষ্টনীটা ক্রমেই যেন ছোট হয়ে আসে। বড় হয়ে আসে অন্ধকার। সামনে অনেকখানি মাঠ। যুদ্ধের সময় সৈন্য-ব্যারাক হয়েছিল। এখন চারদিকে ভাঙাচোরা, ছড়ানো, এলোমেলো, কেমন যেন মড়কে সব ফেলে পালিয়ে যাওয়া প্রেতপুরীর মত। বাতাসটা এখানে কেমন-কেমন শব্দ করে। আশেপাশে বড় গাছ নেই একটিও। ছিল শাল তাল—কেটে ফেলেছে। এখন শুধু বাবলা—বাবলার ঝাড়। পাথরে কাদায় মাখামাখি পথটা অনেক পায়ের দাগে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। অনেক মানুষ আর গোরু আর গাড়ির চাকার দাগ। ভারী বোঝা টেনে, শানার শরীরের পেশীগুলি আরও শক্ত হয়ে উঠেছে, শিরা-উপশিরাগুলি আরও স্ফীত সর্পিল দেখাচ্ছে। ঘামও দেখা দিয়েছে বিন্দু-বিন্দু। শুধু ওর মুখটা দেখা যায় না।

বলে, এই বিশাল প্রান্তর ব্যাপ্ত, আকাশবিস্তৃত অন্ধকারের মত যেন অশেষভাবে বলতে থাকে, বউটো আমার ছেলেমানুষ, হুঁ ছোটকত্তা। উয়ার সুয়ামীর ধান নাই, তাই বউটোর বড় পাপ। তো ফের পলায়ে গেল। হুঁ, পলায়ে গেল ফের। আর ই শালো শানা বাউরীটো ই শালোর পানটো আমাদিগের কাঁদরের জলের মতন সি জলটো যেমন বড় লদীতে গিয়া পড়ছে, ই মনটা শালোর তেমনি বউয়ের কাছে ছুটতে নাগল। মাটো আমার কুটনী। উকে মারলম, খুব মারলম, কাঁদরের পারে দু দিন শুয়্যা রইলম, তাপরে গেলম বউটোর বাপের বাড়ি। লিয়ে আসলম। তো মাঠে পড়ে, সি ওই সায়েব-শালবনের মুখে এসে বুললে, 'সুয়ামিটো আমাকে কুথা লিয়ে যেছে? শরীলের কাপড়খান খুলে লিয়ে আমাকে শালবনে ফাঁস কেনে লটকায় না। সায়েব-শালবনে আমি শাল গাছ হয়্যা থাকব। আমার বাঁচতে সাধ নাই।' শালবনে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করল আমার। কিন্তুক, বউটোকে পেয়ে মরতে পান চায় না।

সুন্দরের গলাটা গম্ভীর শোনাল, এই শানা, তু বউটোকে ফিরিয়ে লিযে আয়।

না। ছোটকত্তা, আমি মরতে পারি না। কিন্তুক ক্যাদার মুখুজ্জের ধান আছে, তো উয়ার আপনকারা আছেন, পুলিস দারোগা আছে, দুমকা সদরটো আছে। আমার কি আছে? বউটো আছে, ই গতরটো আছে।

হারান গাঙ্গুলী বললেন, শুন শানা, তু বউটোকে লিয়ে আয়।

না। আর লয়। পুজা পাবোন গেল, বলি হলেন, মাজিমাজিনরা নাচল, সবাই কত তাড়ি পচুই খেল, আমার মাটোর এখনও খোয়ারি কাটে নাই, ক্যাদার উকে এক ভাঁড় তাড়ির পয়সা দিছে। উয়ার ধান আছে। আমি গাড়ির তলায় পড়ে ছিলম।

সামনে একটা সুদূর চড়াই। আস্তে-আস্তে উঠছে, উঠতে-উঠতে গিয়ে ঠেকেছে সেই সাঁকোর বাঁশের খোঁচা নিয়ে, অস্পষ্ট আকাশের সীমায়। সাঁকোর নিচে নদী।

উঠতে দম নিতে হয়, কাদায় পা হড়কে যেতে চায় বারে-বারে। হারিকেনের আলোয়-ছায়ায় একটা আদিম যাত্রার ছবি উঠছে ভেসে। রায় গাঙ্গুলী বাঁড়ুজ্জে তিনটে ছায়া একরকম। শানার ছায়াটা একটা ভয়াবহ জানোয়ারের মত থলথলে রক্ত-পাঁকে কাঁপছে। ওপারের ওপরের উতরাইয়ে এসে আটকে গেছে যেন বাতাসটা।

জীবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, ক্যাদারকে সামলে দেওয়া যাবে। তু বউটোকে লিয়ে আয়।

শানা বলে, না। নজামাইঠাউর, ক্যাদার মুখুজ্জের ধান আছে, উকে আপনকারা সামলাতে লারবেন। না, আর লয়। বউটো চলে গেল্‌ছে আবার। ছোটকত্তা—

হুঁ।

জমিদারিটা উঠে গেল্‌ছে ব্যাগারটো নাই, ক্যাদারটো আছে, উয়ার অনেক ধান আছে, তো আমার বউটো সুয়ামির সঙ্গে ঘর করতে পারে না।

সুন্দর আবার বললেন, আরে শুন-শুন, তু মন গুমরে মরিস না, বউটোকে লিয়ে আয়।

না। শানা বলে, আর ঠেলে-ঠেলে চড়াই ওঠে। তারপর হঠাৎ গলাটা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে শানার, আপনকারা এত বলি দিলেন মার থানে, ক্যাদার পাঁটাকে বলি দিলেন কেনে না?

এই শানা, চুপ যা।

কেনে?

আবার সব চুপ। চড়াইটা উঠছে ঠেলে-ঠেলে। শানা আবার বলে, শানা বাউরীর ধান থাকলে, ক্যাদারের বউটোকে লিয়ে শুতে যেত?

সুন্দর বললেন, হেই শানা, গালি দিস না।

কেনে?

জীবন বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করে উঠলেন, না, দিস না।

কেনে?

হারান গাঙ্গুলীও হেঁকে উঠলেন, না, গাল দিস না।

কেনে, কেনে?

দাঁড়িয়ে গেল শানা। তিনজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন শানাকে ঘিরে। বোঝা মাথায় গভীর অন্ধকার থেকে, দুটি শ্বাপদ-চোখ চকচক করছে। কেউ কোন কথা বলে না। রায়, গাঙ্গুলী বাঁড়ুজ্জে, তিনজনেই বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ। কিন্তু সাতপুরুষের গোলামটাকে একলা পেয়েও তিনজনে কিছু বলতে পারছেন না। দেড়শো বছরের মধ্যে তিনটে বাউরীকে শুধু পিটিয়েই মারা হয়েছে কর্তাদের আত্মসম্মানের জন্য। আর একটা শানা বাউরী, বোঝা মাথায় গোলামটাকে অসুরের মত মনে হচ্ছে। যেন কি মায়া আছে লুকিয়ে শানার চোখে। যেন

ওপরের উতরাইয়ের কোলে কারা ঘাপটি মেরে আছে—শানার একটি ইশারায় উঠে আসবে তারা। চড়াইটাসমেত ধরিত্রীকে উলটে দেবে।

হারিকেনের আলোটা সত্যি কমে এসেছে। তেল আছে কিনা ঝুঁকে দেখতে পারছেন না জীবন বাঁড়ুজ্জে। নিচের একটা তালগাছের মাথা প্রায় এই চড়াইয়ের গায়ে এসে ঠেকেছে। তার পাতার বাতাস ডাকছে কানের কাছে।

শানা আবার উঠতে আরম্ভ করে। তিনজনে পিছু নেন আবার। আর শানা বলতেই থাকে: ক্যাদার শালো, উয়াদের মতন মানুষের ঘরে কত বেজম্মা আছে আমি জানি। গগন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের দশ কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে, ওঁয়ার ছোট ব্যাটা ক্যাদারের আইবুড়ো বুনটার সঙ্গে শোয। কেনে? না, চার কুড়ি দশ কুড়িতে অনেক তফাত আছে হিসেবে। বিশ কুড়ি বিঘার মানুষ নাই আর গাঁয়ে, না হলে গগন বাঁড়ুজ্জা মশায়ের টুকটুকে লাতীনটাকে মন্দিরে লিয়ে শুয়্যা থাকত আর একজনা।

তিনজনে প্রায় একসঙ্গে ফুঁসে উঠলেন, তু চুপ যা শানা বাউরী।

কেনে?

হুঁ, চুপ যা।

কেনে?

বাঁশের সাঁকোটা দুলছে বাতাসে। মানুষের পায়ের চাপে মড়মড় করছে। নিচে কলকল করছে নদীর জল। শানার গলাটা আরও চড়ল, হিসাব করেন কেনে, আপনকাদের চেয়ে ক্যাদার শালোর জমি বেশি আছে।

একটা ভয়ংকর ইঙ্গিতে সুন্দর এবার শানার মতই চিৎকার করে উঠলেন, হেই শানা বাউরী।

শানা বলে, আপনকারা বাউরী লয। ক্যাদারের ধান আছে, উয়ার চোখে সবাই বাউরী।

জীবন বাঁড়ুজ্জে প্রায় ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, হেই হেই রে!

অন্ধকার উতরাইয়ের পাকে প্রায় গড়িয়ে নামছে শানা। বলে, হুঁ, আপনকারা শহরকে যান, বউঝিগুলান গাযে থাকে। আপনকাদের সোত বছরের ধান নাই, বিকবার ধান নাই, কিন্তুক আপনকারা বাউরী লয। ক্যাদারের চোখে সবাই বাউরী।

রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলী—তিনজনে গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করছেন। রাগ নয়, ভয়ে যেন তিনজনে মিলে একটা দেখাচ্ছে, একটা ছায়া নামছে উতরাই বেয়ে।

তারপরে হঠাৎ অদূরেই, একটি চড়াইয়ের মুখ থেকে মোটর-বাসের হেড-লাইট ঝলসে উঠল। এই উতরাইটার নিচেই, পূবে-পশ্চিমে লম্বা, নিচে রাস্তাটায় এসে দাঁড়াবে।

শানা বলে, আমি শানা বাউরী, আমার ধান নাই। ই গতরটো আছে, বউটো ছিল, চলে গ্যাল্‌ছে। গতরটোর মধ্যে পানটো আছে—

মোটর-বাসটা এগিয়ে আসছে উঁচু-নিচু দিয়ে, শাল-তালের ছায়া ফেলে, ছায়া গিলে। সুন্দর শানার কাছে-কাছে যান। চাপা গলায় মোলায়েম করে ডাকেন, ই, হেই শানা, আরে, তুর গা পুড়ে যেছে রে!

শানার গলাটাও নেমে গেল। আর কেমন যেন গোঙাতে লাগল, হুঁ, ছোটকত্তা, শরীলে বড় আগুন জ্বলছে!

শানা, শুন, তুই বউটোকে লিয়ে আয়।

না।

হুঁ, লিয়ে আয়, উয়ার প্রাণটাও কাঁদছে তুর জন্যে। কেনে? আঁ?

জীবন বাঁড়ুজ্জে আর হারান গাঙ্গুলীও কাছে আসেন, তেমনি চাপা গলায় বলেন, হুঁ লিয়ে আয় তু বউটাকে।

না।

মোটর-বাসটা এসে পড়ল। সুন্দর বললেন, তুর বউটা তুর, উয়ার ইজ্জতটো স্বামীর হাতে, কেনে? তু বউটোকে লিয়ে আয়।

না। ছোটকত্তা, মোষ-পাঁঠার অক্ত দেখে-দেখে, আমার পানটো অক্ত চাইছিল গ। বউটো চলে গ্যালছে, আমার পানটো অক্ত দর্শন করতে চাইছিল. আমি পলায়ে ছিলম।

মাথার বোঝা খালি করে গাড়িতে তুলে দিল শানা। দেখা গেল কোকিলের মত লাল চোখ তার। চুলগুলি ভাল্লুকের মত ঘাড়ে কপালে ছড়িয়ে পড়েছে।

সুন্দর বললেন, তবু তু আমার কথা শুন শানা, তু আপন বউটোকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়। আর এই নে, ধর কেনে?

চার আনা পয়সা বাড়িয়ে ধরলেন সুন্দর রায়।

শানা পায়ে হাত দিল সুন্দর রায়ের, বলল, ব্যাগারটো উঠে গ্যাল্‌ছে ছোটকত্তা, গাঁয়ের পীরিতটো ওঠে নাই, উতে আমার ধম্মো লণ্ট হবেক।

গাড়ি গর্জন করে ছেড়ে দিল। তিনজনেই ডাকতে লাগলেন, হেই শানা, হেই!

শানা বলতে লাগল, না—না—

গাড়িটা হারিয়ে গেল একটা উতরাইয়ের ঢালুতে। শব্দটাও থেমে গেল আস্তে-আস্তে।

সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারটা যেন আস্তে-আস্তে সুন্দর বিচিত্র মায়ায় উঠতে লাগতে ভরে। বাতাসে দুলতে লাগল অন্ধকার, ঝিঁঝি বাঁশী বাজাতে লাগল।

শানা বলতে লাগল আপন মনে, তবু বউটোকে লিয়ে আসব, কেনে? কিন্তুক ক্যাদারটো, তবে মরবেক শানা বাউরীর হাতে, আপনকারা বুঝেন না। হুঁ...

পিচের রাস্তাটা শুকনো মাটির চেয়ে খারাপ নয়। শরীরটা টলছে শানার। গামছাখানা পেতে শুয়ে পড়ল রাস্তার উপর। আবার সেই বেলা দশটায় গাড়ি আসবে, তার আগে রাস্তা ফাঁকা থাকবে।

কিন্তু বাতাসটা বার-বার বলতে লাগল, তবু তু আপন বউটোকে লিয়ে আয়—হুঁ—

গা-টা পুড়ছে, চোখ জ্বলছে শানার, জ্বলে-জ্বলে জল পড়ছে। ভোরবেলা উঠে দাঁড়াল সে।

দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। চড়াই, উতরাই, বিচিত্র এক অনিয়মে সব সেজে আছে যেন। কোথাও চড়াই ঠেকেছে আকাশে, কোথাও শাল-পলাশের মাথায় এসে ঠেকেছে আকাশ। অনেকগুলি পথ এসে মিশেছে এখানে। ঠিকানা হারাবার মত দিশেহারা দিগ্‌দিগন্তে চলা পথ। কাদা পাঁক শুকু-শুকু। রাজমহলটাকে মনে হচ্ছে একটা পাঁশুটে দৈত্য আসতে-আসতে থমকে গেছে। আর তার মাঝখানে, এবড়োথেবড়ো কালো শানাকে দেখাচ্ছে যেন একটা আদিম মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দিশেহারা হয়ে।

শানা তার রক্তাভ চোখ দুটো তুলে তাকাল পুবে। বলল, হুই দেখা যাচ্ছে সায়েব শালবন। দুবার হয়েছে, ইবারে তিনবার।

সায়েব শালবনের পরে দুটো ছোট-ছোট মাঠ। তারপরে ছেলেমানুষ বউটোর বাপের বাড়ি। কাঁদরের নিরন্তর জলের মত শানার লাল কাদামাখা থ্যাবড়া পা দুটো একটা উতরাই ধরে নামতে লাগল সাযেব শালবনের দিকে। হুঁ, বউটো ছেলেমানুষ তার। ধান নাই, সুয়ামীটোর পানও নাই, কেনে?

প্রাণ-পিপাসা

এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগময়ী রাতের কথা বলছি।

দুর্যোগটা হঠাৎ মেঘ করে হাঁক ডাক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে মুষলধারে দু-এক পসলা হয়ে যাওয়ার মত নয়। একঘেয়ে রুগ্ন গলার কান্নার মত কয়েক দিন ধরে অবিরাম ঝরছেই বৃষ্টি, তার সঙ্গে একটানা ঝড়। শহরতলির বড় সড়কটি ছাড়া আর সব কাঁচা গলিপথগুলো। সুদীর্ঘ পাঁক-ভরা নর্দমা হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ আর আবর্জনায় ছাওয়া। অসংখ্য বাড়ির ভিড়, ঠাসা, চাপাচাপি।

পথ চলছিলাম রেললাইনের ধারে মাঠের পথ দিয়ে। কিন্তু ভিজে-ভিজে শরীরের উত্তাপটুকু আর বাঁচে না। হাওয়াটা মাঠের উপর দিয়ে সরাসরি এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা! রীতিমত দাঁতে-দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বেগতিক দেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অন্তত হাওয়ার ঝাপটাটা কম লাগবে তো।

একটা নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে-পড়া ভাব চটকল-শহরটার। যেন কাজ এবং চাঞ্চল্য সবটুকু এই অবিরাম বৃষ্টি ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিয়েছে। কুকুরগুলো অন্য দিন হলে বোধ হয় তেড়ে এসে ঘেউ-ঘেউ করত। আজ দায়সারা-গোছের এক-আধবার গরর-গরর করে গায়ের থেকে জল ঝাড়তে লাগল। গেরস্তদের তো কোন পাত্তাই নেই। কোন জানালা-দরজায়, একটি আলোও চোখে পড়ে না। রাস্তার আলোগুলো যেন কানা জানোয়ারের মত স্তিমিত এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে কমে নি একটুও।

রাস্তাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, তবে উত্তর দিকেই চলেছি তা বুঝতে পারছি। একটা ধার ঘেঁষে চলেছি রাস্তার। নিচু রাস্তা, জল জমেছে। কোন বারান্দায় যে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেব তার কোন উপায়ই নেই। কারণ বারান্দা বলতে যা বোঝায়, এখানে সে-রকম কিছু ঠিক চোখেও পড়ছে না, আর বস্তিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরের ঘরগুলোও বোধ হয় শুকনো নেই। তা ছাড়া, অবস্থাটা তো নতুন নয়। জানা আছে, যেখানে সেখানে শুয়ে পড়লে লোকজনেও নানান কথা বলতে পারে। পুলিসের বেয়াদপি তো আছেই তার উপর।

যেতে হবে নৈহাটি রেল-কলোনির এক বন্ধুর কাছে। অন্তত কয়েকটা দিনের খোরাক, শুকনো কাপড় একখানি আর এমন বিদঘুটে প্যাচপেচে ঠাণ্ডা রাতটার জন্যে একটু আশ্রয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আড্ডা ছেড়ে না বেরুনোই ভাল ছিল। তবে উপায় ছিল না। বিশেষ করে, কয়েকদিন আগে আমাদের আড্ডার হা-ভাতে বন্ধুদের মধ্যে একজন মরে গেল, তখন থেকেই একটু নিশ্বাস নেওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। বন্ধুটির মরা হয়তো ভালই হয়েছে। তা ছাড়া আর কি হতে পারত ; আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। বাঁচার জন্যে যা দরকার তার কিছুই তো ছিল না. তবু বুকটার মধ্যে…যাক। ওটা কোন কথা নয়। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়ে গেছে, ছোট্ট জিনিস, অথচ মনে হয় পর্বতপ্রমাণ তার ভার আর কষ্টকর। বোঝাটা হল…

আরে বাপ রে, হাওয়াটা যেন শিরদাঁড়াটার ভিত ধরে নাড়া দিয়ে গেল। জলটাও বেড়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ পরে মেঘের গড়গড়ানিও যাচ্ছে শোনা। এবার আর দাঁত নয়, রীতিমত হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। গাছের মরা ডালের মত ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি। এসে পড়লাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে, চটকলের মাল চালানের রেল সাইডিংয়ের পাশে। জায়গাটা একটু ফাঁকা। কাছাকাছি একটা মোষের খাটাল দেখে ঢুকব কি না ভাবতে-ভাবতে আর একটু এগোতেই হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলাম, এই যে, এদিকে।

না, অশরীরী কিছু বিশ্বাস না করলেও ভয়ানক চমকে উঠলাম। আমাকে নাকি ? জলের ধারা ভেদ করে গলার স্বরের মালিককে খুঁজতে লাগলাম। ডান দিকে একটা মিটমিটে আলোর রেশ চোখে পড়ল আর আধ-ভেজানো দরজায় একটা মূর্তি। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ। তা হলে আমাকে নয়। এগুচ্ছি। আবার : কই গো, এসই না। দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে ?

জবাব এল, তা ছাড়া আর কে আছে পথে ?

কথার রকমটা শুনে চমকে উঠলাম। এতক্ষণ ঠাওর হল পথটা খারাপ। ঠিক বেশ্যাপল্লী নয়, তবে এক রকম তাই, মজুর-বস্তিও আছে আশে-পাশে।

আমি মনে মনে হাসলাম। খুব ভাল খদ্দেরকে ডেকেছে মেয়েটা। তাই ভেবেছে নাকি ও ? কিন্তু সত্যি, এ সময়টা একটু যদি দাঁড়ানোও যেত ওর দরজাটায়। তবু আমাকে যেতে না দেখে মেয়েটা বলে উঠল, কি রে বাবা, লোকটা কানা নাকি ?

মনে-মনে হেসে ভাবলাম, যাওয়াই যাক না। ব্যাপার দেখে নিজেই সরে পড়তে বলবে। আর কোন রকমে বৃষ্টির বেগটা কমে আসা পর্যন্ত যদি মাথার উপরে একটু ঢাকনা পাওয়া যায়, মন্দ কি ! এমনিতেও নৈহাটি দূরের কথা মোষের খাটালের বেশি কিছুতেই এগনো চলবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম-প্রবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা এ রকম অবস্থায় কখনও পড়ে নি।

উঠে এলাম মেয়েটার দরজায়। একটা গতানুগতিক সংকোচ যে না ছিল তা নয়, বললাম, কেন ডাকছ?

কোন্ দেশী মিন্‌সে রে বাবা!—হাসির সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলল সে, ভিতরে এস না।

আমি ভিতরে ঢুকতেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির শব্দটা চাপা পড়ে গেল একটু। হাওয়া আসবার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু দেখলাম, এ ঘরের মেঝেও টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজে নি। ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস, থালা গেলাস কলসি।

কোথায় মরতে যাওয়া হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে? এমন ভাবে বলল সে, যেন আমি তার কত কালের কত পরিচিত।

বললাম, অনেক দূরে, কিন্তু—

বুঝেছি।—মুখ টিপে হাসল সে : ঘরটা তুমি একেবারে কাদা করে দিলে। এগুলো ছেড়ে ফেল জলদি।

ঠাণ্ডায় আর আচমকা ফ্যাসাদে রীতিমত জমে যাওয়ার যোগাড় হল আমার। বললাম, কিন্তু এদিকে—

সে বলে উঠল, কি যে ছাই পরতে দিই! ভেজা জামাটা খুলে ফেল না।

ফেলতে পারলে তো ভালই হয়। কিন্তু·· গলায় একটু জোর টেনে বলেই ফেললাম, মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা।

এবার মেয়েটা থমকে গেল। যা ভেবেছি তাই। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল, কিছু নেই?

তার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিবে গেছে, এমন মুখের ভাবখানা।

বললাম, তাহলে আর দুর্যোগ মাথায় করে পথে-পথে ফিরি?

মেয়েটা অসহায়ের মত চুপ করে রইল। এ তো আমি আগেই জানতাম। কিন্তু মেয়েটা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে, না, ভিক্ষে করতে বসেছে! আমি দরজাটা খুলতে গেলাম।

পিছন থেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে এখন?

বললাম, ওই মোষের খাটালটায়। দরজাটা খুলে ফেললাম। ইস। হাওয়াটা যেন আমাকে হাঁ করে খেতে এল। পা বাড়িয়ে দিলাম বাইরে।

মেয়েটা হঠাৎ ডাকল পিছন থেকে, কই হে, শোন। রাত্তিরটা থেকেই যাও, ডেকেছি যখন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কপালটাই খারাপ আমার।

বললাম, কেন, কপালটা ভাল থাকুক তোমার, আমি খাটালেই যাই।

যা তোমার ইচ্ছে। হতাশভাবে বসে পড়ল সে তক্তপোশে : আজ তো আর কোন আশাই নেই।

ভাবলাম, মন্দ কি। এই দুর্যোগে এমন আশ্রয়টা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, কেন আর ছাড়ি! কিন্তু মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা ভারি বিশ্রী মনে হল। কেননা, এটা একেবারে নতুন আমার কাছে। অবশ্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তোমাদের আর-দশজনের চেয়ে হয়তো একটু বেশিই আছে। তা বলে এখানে? ছি-ছি! সে আমি পারব না।...তবে ওর সঙ্গে না শুয়েও রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।

লম্বা ছেয়ালো গড়ন মেয়েটার। মাজা-মাজা রঙ। গাল দুটো বসা, বড়-বড় চোখ দুটো অবিকল কচিঘাস-সন্ধানী গরুর চোখের মত। ওই চোখে মুখে আবার রঙ কাজল মাখা হয়েছে। মোটা ঠোঁট দুটোর উপরে নাকের ডগাটা যেন আকাশমুখো।

খুঁজে-খুঁজে সে আমাকে একটা পুরনো সায়া দিল পরতে, বলল, এইটে ছাড়া কিছু নেই।

সায়া! হাসি পেল আমার। যাক, কেউ তো দেখতে আসছে না, কিন্তু—

ধক করে উঠল আমার বুকটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি পকেটে চাপ দিলাম আমি। মরবার সময় আমার বন্ধু যে ছোট্ট জিনিসটা পর্বতের বোঝার মত চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা দেখে নিলাম। জিনিস নয়, একটা রক্তের ডেলা। হ্যাঁ, রক্তের ডেলাই। ভীষণ সংশয় হল আমার মনে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে তখন পিছন ফিরে জামার ভিতরের বডিস খুলছে। বললাম, কিছু কিন্তু নেই আমার কাছে, হ্যাঁ।

কবার শোনাবে বাপু আর ওই কথাটা?—সে হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ বাবা।—বললাম, বলে রাখা ভাল। তবে আমার কোন ইচ্ছে নেই কিছু। খালি মুসাফিরের মত রাতটা কাটিয়ে দেওয়া।

মেয়েটা ওর গরুর মত চোখ তুলে একদৃষ্টে দেখল আমাকে। বলল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

তা বটে। আমি সায়াটা পরে নিলাম। কিন্তু খালি গায়ে কাঁপুনিটা বেড়ে উঠল। বাইরে জল আর হাওয়ার শব্দ দরজাতে বেশ আলোড়ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একপ্রস্থ হেসে নিয়ে একটা পুরনো শাড়ি দিলে ছুঁড়ে। নাও, গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়। বলে আমার জামা কাপড় দড়িতে ছড়িয়ে দিল। বলল, একটু আঁসিয়ে যাবে'খন।

আরাম জিনিসটা বড় মারাত্মক, বিশেষ করে এ-রকম একটা দুরবস্থার মধ্যে। আমি প্রায় ভুলেই গেলাম যে, আমি একটা বাজারের মেয়েমানুষের ঘরে আছি। বললাম, পেটটা একেবারে ফাঁকা দু দিন ধরে, তাই এত কাবু করে ফেলেছে।

সে কোন জবাব দিল না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। বললাম, তা হলে শোওয়া যাক!

সে মুখ তুলল। মুখটা যন্ত্রণাকাতর, তার সুস্পষ্ট বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে ওঠানামা করছে। বলল, খাবে? ভাত চচ্চাড় আছে।

ভাত চচ্চাড়? সত্যি, এটা একেবারে আশাতীত। ভাতের গন্ধেই যার অর্ধেক পেট ভরে, তার সামনে ভাত! জিভে জল কাটতে লাগল আর পেটটা যেন আলাদা একটা জীব। ভাত কথাটা শুনেই নড়ে-চড়ে উঠল। কিন্তু—

সে ততক্ষণ এনামেলের থালায় ভাত বাড়তে শুরু করেছে। দেখে আমার মনের সংশয়টা আবার বেড়ে উঠল। আমি দড়ির উপর থেকে জামাটা তুলে নিলাম তাড়াতাড়ি। গতিক তো ভাল মনে হচ্ছে না। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, ভাতের পয়সা-টয়সা কিন্তু নেই আমার কাছে।

গরুর মত চোখ দুটোতে এবার বিরক্তি দেখা গেল। বলল, মোষের খাটালই তোমার জায়গা দেখছি। কবার শোনাবে কথাটা!

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল। হতভাগা মরবার সময় এমন জিনিসই দিয়ে গেল, এখন সেই বোঝা নিয়ে আমার চলাই দায়। রাখাও বিষ, ছাড়াও বিষ। বাইরে পড়ে থাকলে এ বোঝাটার কথা হয়তো মনে থাকত না। সে আবার বলল, মানুষের সঙ্গে বাস কর নি তুমি কখনও?

শোন কথা! তাও আবার জিজ্ঞেস করছে কারখানা বাজারের মেয়েমানুষ! বললাম, করেছি, তবে তোমাদের মত মানুষের সঙ্গে নয়।

সে নিশ্চুপে তাকিয়ে রইল আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রয়েছে যখন খেয়ে নাও, নইলে নষ্ট হবে।

ভেবে দেখলাম তাতে আর আপত্তি কি। বিনা পয়সার ভাত। আর দেখছেই বা কে! জামাটা হাতে গুটিয়ে নিয়ে গপ-গপ করে ভাত খেয়ে নিলাম, তারপর এক ঘটি জল। এ-রকম বাড়া ভাত খেয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চূড়ান্ত বাবু-গিরি বলে মনে হল আর সেই জন্যই সংশয়টা বাঁধা রইল মনের আষ্টেপৃষ্ঠে।

তারপর শোয়া। সে এক ফ্যাসাদ। আমি শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম তুমি শোবে কোথায়? সে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে খসা-ঘোমটাটা টেনে দিল। তাহলে তুমি শোও আমি বসে রাতটা কাটিয়ে দিই—আমি বললাম।

সে পাশতলার দিকে বসে বলল, তুমিই শোও, আমি তো রোজই শুই। একটা রাত তো। ডেকেছি যখন…বলতে-বলতে আমার হাতের মুঠির মধ্যে জামাটা দেখে সে দড়ির দিকে দেখল। তারপর আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম। বলল, জামাটা ভেজা যে।

হোক তাতে তোমার কি?

চুপ করে গেল সে। শরীরটা আরাম পেয়ে আমার মনে হল সিটানো তন্ত্রীগুলো স্বাভাবিক সতেজ ও গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের যে জল হাওয়া

আমাকে এতক্ষণ মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তারই চাপা শব্দ যেন আমার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মত মিষ্টি মনে হল। চোখের পাতা ভারী হয়ে এল।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তেমনি বসে আছে। চোখের দৃষ্টিটা ঠিক কোন্ দিকে বোঝা যাচ্ছে না। অত্যন্ত ক্লান্ত আর একটা চাপা যন্ত্রণার আভাস তার চোখে। কি জানি! এদের নাকি আবার ঢঙের অভাব হয় না। হয়তো যখন ঘুমিয়ে পড়ব, তখন—

নাঃ, হতভাগার এ জিনিসটার একটা ব্যবস্থা আমি কালকেই করে ফেলব। কি দরকার ছিল মরবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যাওয়ার? একটা রক্তের ডেলা। রক্তের ডেলাই তো! ঘামের গন্ধে ভরা ছোট্ট ন্যাকড়ার পুঁটলিটা। একটা রাক্ষুসে খিদে-খিদে গন্ধও আছে। ছোঁড়া মরতে-মরতে মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল, এটা তুই রাখ। এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে, আজও মনে করলে বুকটার মধ্যে—যাক সে কথা।

মেয়েটা তখনও ওইভাবে বসে আছে দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমিও শুয়ে পড় খানিকটা তফাত রেখে।

সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, ছিষ্টিছাড়া মানুষ বাবা! তারপর শুয়ে পড়ল।

আমার শরীরটা তখন আরামে রীতিমত ঢিলে হযে এসেছে। আর মেয়েমানুষের গা যে এত গরম তা মেয়েটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থেকেও আমি বুঝতে পারলাম। কি অদ্ভুত আর বিচিত্র পরিবেশ। লোকে দেখলে কি বলত! ছি-ছি! কিন্তু এতখানি আরাম, আমার দুঃস্থ ক্লান্ত শরীরে এতখানি সুখবোধ আর কখনও পেয়েছি কি না মনে নেই। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। কিন্তু—

নাঃ, তা হবে না। সেই বন্ধুটির কথা বলছি। হতচ্ছাড়া মরবার সময় বলে গেল পুঁটলিটা দিয়ে, আমার রক্ত।

বললাম, রক্ত কিসের?

চোখের জল আর কষের রক্ত মুছে বলল, আমার বুকের। না খেয়ে-খেয়ে রোজ—বলতে-বলতে রক্তশূন্য অস্থির আঙুলগুলো দিয়ে হাতড়াতে লাগল পুঁটলিটা।

আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, কিসের জন্য র‍্যা?

বলল, ঘর বাঁধার আশায়।

এমন ভাবে বলেছিল কথাটা যে ফের গালাগালি দিতে গিয়ে আমার গলাটার মধ্যে···যাক সে কথা।

মেয়েটা একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠল। জিজ্ঞেস করলাম, কি হয়েছে?

সে তাকাল। চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় লাল আর কান্নার আভাস তাতে। বলল, কিছু না।

তার গরম নিশ্বাসে এত আরাম লাগল আমার গায়ে। ঠাণ্ডা-জমে-যাওয়া গায়ে যেন কেউ তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে হল হঠাৎ, খুব খারাপ নয় দেখতে। ঠোঁট আর নাকটা যা একটু খারাপ। বোজা চোখের পাতা, বুকে জড়ানো হাত দুটো আর তার নমিত বুকে বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করল। সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, ঘুম আসছে না তোমার ?

আমি ঘুমুব না।—বললাম। মনে মনে ভাবলাম, তাহলে তোমার বড় সুবিধে হয়, না ? সেটি হচ্ছে না বাবা। কথা বললেই তো সংশয়টা বাড়ে আমার মনে। তার চেয়ে চুপ করে থাকুক না।

বাইরের তাণ্ডব তখনও পুরোদমেই চলেছে। টালি-চোয়ানো জলের ফোঁটার শব্দ আসছে মেঝে থেকে, সঙ্গে ছুঁচোর কেত্তন।

সে আবার কঁকিয়ে উঠল।

কি হয়েছে ?

একটু চুপ করে থেকে বলল, রোগ।

রোগ ! কিসের রোগ ?

সে নীরব।

বল না বাপু।

তবুও নীরব।

আমি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলাম, বল না কেন রোগটা ! যক্ষ্মা-কলেরা-টলেরা হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। রোগের সঙ্গে পীরিত নেই বাবা।

সেও মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, কার সঙ্গে আছে তোমার পীরিত, শুনি ?

তা বটে, পীরিতের কথাই তো ওঠে না এখানে। বললাম, তা বলই না কেন রোগটা কি।

যা হয় এ লাইনে থাকলে—সে বললে।

লাইনে থাকলে ? সর্বনাশ ! ভীষণ সিঁটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর উপরও সন্ধ্যারাত্রে নিশ্চয়ই—

পাঁচজন—সে বলল।

ইস ! কি সাংঘাতিক ! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন ?

পয়সা পাব কোথায় ?

কেন, নিজের রোজগার ?

সে তো মনিবের পয়সা।

মনিব ? এটা কি চাকরি নাকি ?

নয় তো কি। মনিবের ব্যবসা, ঘর-দোর জিনিস। আমরা আসি খাটতে।

ভয়ানক দমে গেলাম কথাগুলো শুনে। এরা বেশ মজায় থাকে না তা হলে ? এও চাকরি ! বললাম, তোমাদের মনিব শালাই বা কেমন, চিকিচ্ছে করায় না কেন ?

করায়। যখন মার্জ হয়। কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকরা তাদের চিকিচ্ছে করায়?

ঠিক। তার বেদনার্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি এবার আমাকে সত্যই দিশেহারা করে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কি প্রতিরোধের লড়াই? বললাম, তাহলে···

সে বলল, তাহলে আর কি। মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে যেটা রোজগার হয়, তাতে চিকিচ্ছে করাই।

বাঁচতে?—হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল আমার।

সকলেই বাঁচতে চায়।—সে বলল যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে।

ঠিকই। ডাঙায় বাঘ আছে জেনেও মানুষ এ ডাঙাতেই তার বাস ও জনপদ গড়ে তুলেছে। বন্যা, ঝড়, ক্ষুধা, কি নেই। তবু। আর সেই হতচ্ছাড়া চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। হ্যা, তবু পুঁটলির প্রতিটি পয়সা রক্তের ফোঁটা। রক্তের ডেলা একটা—এই পুঁটলিটা।

সে বলল, ঘুমুবে না?

না, ঘুম নেই চোখে। ওর নিশ্বাস লাগছে। যন্ত্রণার গরম নিশ্বাস। মিঠে তাপ, তেপে-তেপে গনগনে আগুনের মত মনে হল। শক্ত করে পুঁটলিশুদ্ধ জামাটা চেপে ধরে উঠে পড়লাম। বাইরে ঝড়-জলের দুর্যোগ তেমনই। রাত প্রায় কাবার। নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম।

সে উঠল। হাসতে চাইল: চললে?

পকেটে হাত দিয়ে শক্ত করে পুঁটলিটা চেপে ধরে বললাম, হ্যাঁ।

হতভাগা মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল মরতে-মরতে, এটা তুই রাখ! কেন? কেন?

মেয়েটা বলল, যন্ত্রণায় চাপা গলায়, আবার এসো।

মেয়েটার কি চোখ! সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনার দাগে ভরা, আকাশমুখো নাক, মোটা ঠোঁট। কিন্তু এমন মুখ তো আর কখনও দেখি নি।

ভীষণ বেগে ওর দিকে ফিরে পুঁটলিটা ওর হাতে তুলে দিলাম। ওর নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে। মুহূর্তে চোখ নামিয়ে একটা অশান্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষে বেরিয়ে এলাম পথের উপরে।

সে কি একটা বলল পিছন থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল সে কথা। বললাম, পিছু ডেকো না।

বোঝামুক্ত আমি উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। বানপ্রস্থ নয়, বন্ধুর বাড়িতে পুবে হাওয়া ঠেলে দিতে চাইল পশ্চিম গঙ্গার ঘাটের দিকে। পারল না।

১২

ঠিক যে মুহূর্তে সংবাদটি এল, 'উনি' এসেছেন, সেই মুহূর্তেই গোটা কারখানায় একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। সেকশান কেরানীদের নিঃশব্দ কিন্তু দ্রুত ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। যেন একটা ভয়ংকর আতঙ্কজনক কোন ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত গোপনীয় কিছু। তাই সকলের চোখে মুখেই একটি চাপা উৎকণ্ঠা। কেউ গলা খুলে কথা পর্যন্ত বলছে না। সবাই ফিসফিস করছে, কানে-কানে কথা বলছে।

একমাত্র রাজার মৃত্যু আসন্ন হলেই, রাজপ্রাসাদে এমনি একটি আতঙ্ক এবং ফিসফিসানি চারদিকে চলতে পারে। কেন না, সেখানে মৃত্যুই শুধু নয়, সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রটাও চলতে থাকে শোকবিহ্বলতার মধ্যে।

কিন্তু এখানে রাজার মৃত্যু নয়, রাজপ্রাসাদও নয় এটা।

এটা কারখানা। তাও কোন এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী নয়, চটকল।

সেখানেই এ রকম একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটছে।

সেকশানে-সেকশানে অফিসে-অফিসে, মজুর, কেরানী, ওভারসিয়ার, লেবার অফিসার সকলের কাছে সংবাদ চলে গিয়েছে, 'উনি' এসেছেন।

যদিও গতকালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শ্রমিকেরা সকলেই ফর্সা জামা কাপড় পরে আসতে পারে নি, কেরানীরা সকলেই টিপটপ হতে পারে নি, ওভারসিয়াররা এবং অফিসাররা পর্যন্ত 'চয়েস' অনুযায়ী টাইয়ের রং ফলাতে পারে নি, তবু সকলেই স্মার্ট, দক্ষকর্মী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

শ্রমিকদের অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে এনে কোন লাভ নেই। লোকগুলি চিরদিনই 'ক্যালাস'। আর ঠোঁট উল্টে-উল্টে 'ওঁর' সম্পর্কে দু-চারটে বাজে কথা বলবেই। যদিও মেশিন থেকে তারা কেউই নড়ছে না। ম্যানেজার, অফিসার, ওভারসিয়ারের কথানুযায়ী খুব মনোযোগ দিয়েই কাজ করে চলেছে। তারাও জানে, 'উনি' এসেছেন। আর 'উনি' খোদ মালিক, খোদ কলকাতার খোদ আলুগুদোম অর্থাৎ হেড অফিস থেকে আসছেন। আর কাজ মানেই যেহেতু ইজ্জতের ব্যাপার, সেই জন্য কোন সময়েই সেটা হারাতে রাজী নয়। অবশ্য এ কথা সত্যি, সাধারণ দিনে কাজকর্মে কিছু শৈথিল্য তাদের থাকে। কেন না, তাদের ওপর ওভারসিয়ার

দারোগার মত নজর রাখে। যেন তারা চোর, কাজ চুরি করবে। এ অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্যে, একটা নীরব প্রতিবাদই, তার যতটুকু না করলে নয়, ততটুকুই করে। তার বেশি নয়।

আজ তারা প্রত্যেকেই বীরের মনোভাব নিয়েই কাজ করছে। কারণ এখনও আলুগুদামের প্রতি তাদের একটি ক্ষীণ বিশ্বাস আছে। তাছাড়া এটাও বলা হয়েছে, 'উনি' যদি কারুর কাজ দেখে খুশি হন, অর্থাৎ 'ওঁর' নজরে পড়ে যেতে পারে, তার আখের আর দেখতে হবে না।

মনে তাদের একটা আশা আছে। যদিও এ রকম আশা তারা অতীতে অনেক করেছে। তবু আশার আর এক নাম নাকি মরীচিকা।

তাই আশা এবং নিরাশা, কাজে মনোযোগ এবং 'ওঁর' প্রতি বিদ্রূপ এই উভয় রকমের মনোভাব রয়েছে তার মধ্যে।

অফিসের 'বাবুদেরও' তাই। একসঙ্গে সব টাইপ মেশিনগুলি কখনও কোন সময়েই এমন কোরাস খটখট সঙ্গীত করে না। সবাই এত ব্যস্ত যে, বুড়ো টাইপিস্ট হরিহরবাবু কাগজ না সাজিয়েই টাইপ করছিলেন এবং যখন সেটা আবিষ্কৃত হল, তখন 'উনি' হরিহরবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে। হে ভগবান, হে ভগবান!

কিন্তু 'উনি' কিংবা 'ওঁরা' তাকান নি। কেবল, এই দারুণ ভুলের জন্য হরিহরবাবুর হার্টের রোগটা অনেকখানি বেড়ে গেল।

'উনি' একলা আসেন নি, একজন সহকারী হোমরাচোমরা প্রতিনিধিও এসেছেন। কেননা, ব্যাপারটা আসলে চটকলগুলির ওপর সরকারের সাম্প্রতিক কালের অনুসন্ধান। কোম্পানির মুনাফা,, নতুন মেশিন, র‍্যাশানালাইজেশনের প্রশ্ন নিয়ে নানা রকমের কথাবার্তা চলছে। সেই উপলক্ষ্যেই খোদ কর্তা এবং সরকারি প্রতিনিধিরা নানান জায়গায় চটকল সফর করছেন।

ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর, আর তাই ভগবান বুদ্ধকে অশেষ ধন্যবাদ, চটকলের ম্যানেজাররা পরিদর্শনের পর ক্লাব-হলে রিফ্রেশমেণ্টের অবস্থা ভালই করেন। সকলেই গলদঘর্মপ্রায়। কিন্তু খবরদার। এক চুলও যেন এদিক ওদিক না হয়। ওভারসিয়াররা যেন নতুন মেশিনের তৎপরতা বোঝাতে যথেষ্ট সচেতন থাকেন, কেননা র‍্যাশানালাইজেশনের ওটাই আসল ভিত্তি। আর 'সেল মাস্টার' অর্থাৎ বাণিজ্যের ব্যাপারে যাঁর দায়িত্ব, তিনি যেন টুপিওয়ালা সরকারী প্রতিনিধিটিকে সব বিষয়ে বুঝিয়ে, বলে-বলে তাঁর সমর্থন আদায় করতে পারেন। আর পারবেনই, কারণ সরকারী প্রতিনিধি নিজেও একজন ভাল সওদাগর।

ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারনীরা জেনারেল ল্যাট্রিনের আড়ালে দাঁড়িয়ে এই সব বড়কা আদমিদের দেখছিল আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল তাদের ঝাড়ু দেওয়া কোন্ কোন্ জায়গা সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার হয়েছে এবং সাহেবরা কার ঝাড়ু দেওয়া জায়গাটাকে দেখে খুশি হচ্ছেন মনে-মনে।

ঠিক সেই সময়েই, বনোয়ারির হাতটা কেটে গেল।

এ ভয়টা ছিল গত তিন মাস থেকেই। মেশিনটা খারাপ—যে কোন মুহূর্তে মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চাকাটা তার ডানার ওপরে পড়তে পারত। মেশিনটা নতুন, তাগবাগ সে ঠিক জানত না। ওভারসিয়ার এঞ্জিনিয়ারবাবু ঠিক ওয়াকিবহাল নয়, তাই মেশিন যারা বসিয়ে গিয়েছে, সেই আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারটি না হলে মেশিনটা কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না।

অবশ্য কোম্পানি বনোয়ারির বিপদটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু তারা লাচার। বনোয়ারি কাজটা ছেড়ে দিতে পারে—নিজেই সে জবাব দিয়ে আখেরি ছুটি নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু বনোয়ারি যে তাহলে খেতে পাবে না। বেকার হয়ে যাবে যে।

সেটাও একটা কথা। তাহলে কোম্পানি কি করবে? বসিয়ে মাইনে সে দিতে পারবে না। আর একজন জোয়ান মজুর বসে-বসে মাইনে খায় কখনও? বনোয়ারিই বলুক না।

তা তো বটেই।

তবে? সুতরাং বিপদের ঝুঁকিটা নিয়ে সে চালিয়ে যাক। ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে।

তাই চালিয়ে যাচ্ছিল বনোয়ারি। আর আজকে সবচেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে, সামলাতে পারলে না সে। টিথ্-রোলটা যখন ওপরে উঠেছে, সে মেশিনের মধ্যে হাত দিয়ে, ব্রাশ দিয়ে, তেলের গাদ আর পাটের ফেঁসো পরিষ্কার করছিল। সেই সময়েই, মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চক্রটা তার ডানার ওপর নেমে এল চোখের পলকে।

বনোয়ারি দেখল, তার ডান হাতটা মেশিন রোলিং-এর নিচে পড়ে, একবার মুঠি পাকাল, তারপর খুলে গেল।

সে চিৎকার করতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। পড়ে গিয়ে সে গোঙাতে লাগল।

সর্দার টের পেয়ে ছুটে এল। খবর গেল ওভারসিয়ার, ম্যানেজার, লেবার অফিসারের কাছে। অমনি সকলের প্যাণ্টের বোতামগুলি ছিঁড়ে পড়বার যোগাড় হল যেন।

সর্বনাশ! 'ওরা' যে এখুনি ওখানেই যাচ্ছেন!

ম্যানেজার বলল, ওভারসিয়ারের কানে কানে, শীগ্গির যাও। সরিয়ে ফেল।

ডাক্তারকে বললেন, জলদি যাও, দেখ কি ব্যাপার।

ওভারসিয়ার, চীফ ডাক্তার ছুটলেন। এসে দেখলেন, গোটা সেকশানের লোক ভিড় জমিয়ে ফেলেছে।

হটাও, হটাও। জলদি হটো। মেশিনে যাও সব। 'উনি' এসে পড়লেন বলে। দোহাই তোমাদের, যাও।

তাড়া দিলেন ওভারসিয়ার, সর্দার।

সরে গেল সবাই। একটা ভয়ংকর জরুরী ব্যাপার। মিটে যাক, তারপরে তারা বনোয়ারিকে দেখবে, যদিও কাজে আর কারুর ভাল মন বসছে না। একটা আতঙ্ক আর ক্ষোভে ওদের সকলের দু'চোখে ভয় আর ঘৃণা জমে রইল।

কিন্তু কোথায় সরানো যায় বনোয়ারিকে? ওভারসিয়ার আর ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। ওভারসিয়ার দেখলেন, ডাক্তারের মুখটা একেবারে সাদা।

কেন? বনোয়ারি মারা গিয়েছে নাকি?

কিন্তু যাই হোক, তাড়াতাড়ি সরাতে হবে। 'ওরা' এসে পড়ছেন। এসে পড়লেন বলে।

ওভারসিয়ারের চোখের সামনে ভাসতে লাগল, কোম্পানির দৌলতে তার আসন্ন বিলেত যাত্রা, আর ভাবী শ্বশুরের কাছ থেকে 'পণ' হিসেবে সেভ্রলেট লেটেস্ট মডেলের গাড়িখানা। সব, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

তিনি চাপা গলায় প্রায় কেঁদে উঠলেন, সর্দার, শীগগির।

সহসা চোখে পড়ল, দশ ফুট সমান উঁচু প্যাকিং বাক্স সেকশানের এক কোণে জড়ো করা আছে। ওইখানেই, ওর আড়ালে সরিয়ে দিতে হবে।

কয়েকজন ধরাধরি করে তুলল বনোয়ারিকে। রেখে এল প্যাকিং বাক্সের আড়ালে। একটা চটও ঢাকা দেওয়া হল। যদি 'ওঁরা' এদিকে আসেন, তবে নিশ্চয় চটের ঢাকা খুলবেন না।

কিন্তু, কি সর্বনাশ। সর্দার, বনোয়ারির হাতটা পড়ে আছে রেলিং-এর পাশে।

ছোট্ ছোট্।

সর্দার হাতটা নিয়ে এল। ঢুকিয়ে দিল চটের তলায়।

ওঁরা এলেন। ঘুরলেন, দেখলেন।

এটা কি মেশিন? আই সি। সরকারী প্রতিনিধির উক্তি।

এই মেশিনটার গ্রোয়িং ক্যাপাসিটি কি রকম? নমুনা মাল দেখাও তো একটু। বাঃ, বেশ হয়েছে। বড়কর্তার মন্তব্য।

ওঁরা দেখলেন, একটিও মানুষ নেই সেকশানে। সকলেই এমন ভাবে মেশিনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, মানুষ আর মেশিন তফাত করা যাচ্ছে না। বাঃ নাইস।

ভগবান বুদ্ধের কি অপরূপ লীলা! নব-ভারত সত্যি উন্নতি করেছে। এরাও মেশিনে এ রকম সুশৃংখলভাবে কাজ করতে পারে!

আচ্ছা, এগুলো কি? এই লাল মত?

ম্যানেজারের বুক কেঁপে উঠল, ওভারসিয়ারের মুখ সাদা হয়ে গেল, ডাক্তার ভয়ে ও উত্তেজনায় কেবলই খ্যাকারি দিতে লাগলেন।

বড়কর্তা আবার জিজ্ঞেস করলেন, মেঝেতে এই লাল মত তরল পদার্থটা কি ?

ইস। ছি ছি, কি হবে ? লাল তরল পদার্থটা বনোয়ারির রক্ত। সেটা মুছে দিতে কারুর মনে হয় নি।

আর রক্ত অনেকখানি। গাঢ়, টকটকে লাল। ঠিক প্রকৃতির খামখেয়ালি ভূ-খণ্ডের মত, অর্থাৎ ম্যাপের মত একটা দলা। কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে, আবার থেমে গেছে।

ভারতবর্ষের মত ? না, বোধ হয় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মত। উঁহু, ঠিক তাও নয়, বেশ চওড়া, লম্বা নয় খুব। ইংল্যাণ্ডের মতই বোধ হয়। চীনের মত নয়তো ?

ম্যানেজার হেসে, জুতো দিয়ে একটু ঠেকিয়ে দেখে বলল, ওহো, এটা, এটা, মানে—এটা রং।

রং ?

হ্যাঁ, রং। মানে, এদের জানেন তো, এরা একটু রং ভালবাসে। বোধ হয় নিজেদের মধ্যে একটু ফষ্টিনষ্টি করার জন্য কারুর গায়ে ছুঁড়ে দেবে বলে, মানে, আর কিছুই নয়, বুঝলেন না। এ দেশের লোকেরা একটু রসিক। কাজের মধ্যেও নিজেদের মধ্যেই একটু ইয়ার্কি ফাজলামি করতে ভালবাসে। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন স্যার—এই আর কি।

ও, রং এটা ?—সরকারী প্রতিনিধি বললেন।

হ্যাঁ, রং।

নিশ্চয় কোন ভাল কারখানার ম্যানুফ্যাকচারিং, নয় ?—বড়কর্তার উক্তি।

হ্যাঁ। ভাল কারখানার।

দিশী কারখানার কি ?—সরকারী প্রতিনিধির প্রশ্ন।

বোধ হয়।

হুঁ! রংটা খুবই ভাল। খুব গাঢ়—বড়কর্তা বললেন।

আর রংটা পাকা নিশ্চয়ই, আর খুবই উজ্জ্বল। সরকারী প্রতিনিধির বক্তব্য। বড়কর্তা মেশিনটার দিকে তাকালেন। এটা বন্ধ কেন ?

মেশিনটা একটু বিগড়ে আছে। চালালে অ্যাকসিডেণ্ট হতে পারে। একটা শারীরিক ক্ষতি হতে পারে, তাই আমরা এটা বন্ধ রেখেছি।

খুব ভাল করেছেন। যদিও আপনাদের উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে, তবু এ রকম ক্ষতি স্বীকার করেও কাউকে বিপদে না ফেলাটা, সত্যি আপনাদের চরিত্রের এটা, কি বলব, মানে, একটা আধুনিক শিল্পোন্নতির মহানুভবতা।

বললেন সরকারী প্রতিনিধি।

বড়কর্তা বললেন, আমার তাই বিশ্বাস।

বলে তিনি দাঁড়ালো মেশিনটার গায়ে হাত দিয়ে কাবাব করার কাঁচা মাংসের মত একটুকরো মাংস আঙুল দিয়ে তুলে আনলেন।

এটা কি ?

এটা ? এটা মানে, আপনার মানে, পশুর চর্বি দিয়ে এটা মাজা হয়েছিল, যদিও সেটা খুবই ভুল হয়েছে। মানে, আমরা এই পদ্ধতিতে মেশিন চালাই না যদিও। ওটা তারই, একটা ফ্র্যাগমেণ্ট হবে। মানে—চর্বির।

হুঁ। বড়কর্তা বললেন।

সংসারে কিছুই ফেলা যায় না।—বললেন সরকারী প্রতিনিধি।

তারপরে ওঁরা আরও অনেক জায়গায় ঘুরলেন। ওভারসিয়ার, ম্যানেজার সবাই ঘুরতে লাগলেন ওঁদের সঙ্গে।

মেমসাহেব এবং অন্যান্যেরা ক্লাবরুমে রিসেপশনের ব্যবস্থা রেডি করে রেখে-ছিলেন। 'ওঁরা' খুবই ক্লান্ত হয়ে ঘুরে এলেন।

মিসেসরা রং মাখা ঠোঁটে খুব হাসলেন। দেশী-বিদেশী, সব মিসেসরাই। বুকের সবটা তারা খুলে রাখতে পারেন নি, তাই বুকের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পাতলা জামায় তারা ঢেকেছেন। না ঢাকলেও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই যতটা সম্ভব নিপুণতার সঙ্গে ঢাকা ও দেখানোটা বজায় রেখেই পুরুষচিত্ত ক্ষত-বিক্ষত করা পোশাক তারা পরেছেন। তারা মশগুল করছেন ক্লাব-বার। তারা নিজেরাই মাননীয় অতিথিদের পরিবেশন করছেন।

তারাই প্রোগ্রাম করেছেন, আর সেই অনুযায়ী কনসার্ট শুরু হল। বিদেশী নাচের প্রোগ্রামটাই আগে রাখা হয়েছে।

বনোয়ারির চটের ঢাকনাটা অবশ্য আর খোলার দরকার হল না। ও তখন মারাই গিয়েছে। ওর হাতটা ওর পেটের ওপর বসিয়ে, একটা প্যাকেট করে ফেলা হল।

এর ব্যবস্থা কি হবে ?

সমবেত প্রশ্নটা পাঠানো হল ক্লাব হলে।

জবাব এল, পরে জবাব দেওয়া হবে।

এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হল আজ। চটকলের ইতিহাসে এ রকম ঘটনাও ঘটে। কারণ, 'ওঁরা' আজ এসেছিলেন, এটা শ্রমিকদেরই সুকৃতির ফল।

শ্রমিকরা মৃতদেহটা নিয়ে বসে রইল। 'ওঁরা' থাকা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে বলে পাঠিয়েছেন ক্রুদ্ধ ম্যানেজার।

দেশী নাচের ঘূর্ণিতে, নটীর ঘাগরা ফোলানো আর দেহের নানান আঁকেবাঁকে অদ্ভুত সব ইন্দ্রিয়-কলাকৌশল দেখে, সরকারী প্রতিনিধি বললেন কর্তাকে, দেখুন, বৌদ্ধ শ্রমণ অবশ্য সুন্দরী যুবতী নারীকে অবলোকন মাত্র তার ভিতরের কঙ্কালটাকেই দেখতে পেতেন। আমিও এই নটীর একটা কি যেন দেখতে পাচ্ছি বুদ্ধের কৃপায় সেটা একটা আশ্চর্য জিনিস বলতে হবে।

কঙ্কাল কি ?—বড়কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

না।—সরকারী প্রতিনিধি।

বড়কর্তা সোহাগ করে বললেন, জানি তবে, সেটা মাংস নিশ্চয় ?

সরকারী প্রতিনিধি বললেন, আশ্চর্য ! কি করে বুঝলেন ?

যন্ত্রটা দেখে।

কোন্ যন্ত্র ?

যে যন্ত্রটা মাংস কাটে। মানে, (কানে কানে) আপনার বাসনা।

সরকারী প্রতিনিধির ভীষণ হাসি পেল। চোখ তাঁর আগেই লাল হয়েছিল। বড়কর্তার পেটে খোঁচা মেরে বললেন, দুষ্টু !

ওঁরা সকলেই ভগবান বুদ্ধের শিষ্য্যা কঙ্কালটার নানান অঙ্গভঙ্গি দেখে, নির্বাণ লাভের জন্য হাত নিশপিশ করতে লাগলেন।

— —